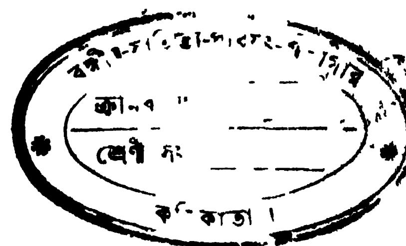
ঢাকা-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক পরিচালিত



প্রতিভা

মাসিক পত্রিকা



শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম, এ, বি, এল, সম্পাদিত

পঞ্চম বর্ষ

১৩২২ সন

প্রবন্ধ-সূচী

(বাঙ্গালা বর্ণমালানুসারে)

ঢাকা-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত

গ্রন্থের সূচী

১।	পূর্ব্ববঙ্গের মেয়েলী শ্লোক	শ্রীগোপীনাথ দত্ত সংগৃহীত—জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবন, ভাদ্র, আশ্বিন, অগ্রহায়ন, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র
২।	কবি শ্যামদাস সেনের মীনচেতন	শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম, এ, সম্পাদিত,—বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবন, আশ্বিন-কার্ত্তিক,
৩।	ভাটিয়াল গান	শ্রীমহিমচন্দ্র নন্দী—অগ্রহায়ন, পৌষ, ফাল্গুন

প্রতিভা

৫ম বর্ষ | বৈশাখ ১৩২২ | ১ম সংখ্যা

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব *

১। কণিষ্ক

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে যে সকল বিষয় খুব বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইতেছে তাহার মধ্যে কুশান সম্রাট কণিষ্কের সময় নিরূপণই প্রধান বলিয়া মনে হয়। অনেকে মনে করিবেন, একটা তারিখ ঠিক করার জন্য এতটা হৈ চৈ করার দরকার কি? কণিষ্ক খৃষ্টের ৫৮ বৎসর পূর্ব্বে বা ৭৮ বৎসর পরে রাজা হইয়াছিলেন, তাহা ঠিক করিতে না পারিলেই বা এমন গুরুতর বিপদের সম্ভাবনাটা কি? ইহার উত্তরে বলিতে পারা যায় যে, অন্যের কথা যাহাই হউক কণিষ্কের তারিখ ঠিক জানিতে পারা বিশেষ দরকার। কারণ এই তারিখ ঠিক না জানিতে পারিলে ভারতবর্ষের ইতিহাসের অনেকটা দিক আমাদের অজ্ঞাত থাকিয়া যাইবে। যেমন, ধরুন বৌদ্ধধর্ম্মের বিকাশ। আমরা জানি যে, কণিষ্কের কালে মহাযান ধর্ম্মমতের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এই মহাযান ধর্ম্মমতের প্রতিষ্ঠা বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিকাশ-কাহিনীর একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ। বৌদ্ধধর্ম্মের ক্রমশঃ বিস্তৃতি, উন্নতি ও অবনতির ইতিহাস বুঝিতে হইলে, কোন সময়ে এই মহাযান মতের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল তাহা জানা চাই। অথচ কণিষ্কের তারিখ ঠিক করিতে না পারিলে তাহা জানিবার উপায় নাই। সাহিত্যের দিক দিয়া দেখিলেও কণিষ্কের সময় নির্ণয়ের আবশ্যকতা উপলব্ধি হইবে। অশ্বঘোষ কণিষ্কের

* প্রবন্ধের নামমাত্র পাঠ করিয়াই যে অনেকে পাতা উলটাইয়া যাইবেন সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। কারণ প্রত্নতত্ত্ব অনেকেরই পক্ষে পেত্নী-তত্ত্ব অপেক্ষাও অধিকতর ভয়ের জিনিষ। তথাপি যে এই দুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহার একমাত্র কারণ প্রতিভা সম্পাদকের অনুরোধ অথবা আদেশ। তাঁহার মতে ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্বাদি সম্বন্ধে যে সকল নূতন তথ্যাদি আবিষ্কৃত বা আলোচিত হয় তাহা সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের বোধগম্য আকারে প্রকাশিত করা উচিত। এই কর্ত্তব্যের ভার তিনি আমার স্কন্ধেই অর্পণ করিয়াছেন, সুতরাং আমাকে কয়েক সংখ্যা 'প্রতিভার' পাঠকগণের বিরক্তি উৎপাদন করিতেই হইবে।—লেখক।

সমকালে বর্ত্তমান ছিলেন, কাহারও মতে কনিষ্কের গুরু ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় রচিত সৌন্দরনন্দ নামে তাঁহার গ্রন্থ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কণিষ্কের তারিখ জানিতে পারিলে এই গ্রন্থেরও সময় নির্ণয় করা যায় এবং তাহাতে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের পারম্পর্য্য সম্বন্ধে আমাদের উপলব্ধি স্পষ্টতর হয়। আরও অনেকেই জানেন, পূর্ব্বে পালিতে গ্রন্থাদি লেখাই বৌদ্ধদিগের রীতি ছিল। কবে তাহাদের মধ্যে সংস্কৃতে গ্রন্থ লেখার রীতি প্রচলিত হয় তাহা জানিতে পারিলে প্রাচীন ভারতে ভাষা-বিবর্ত্তনের ইতিহাসও পূর্ব্বাপেক্ষা বোধগম্য হয়।

এইরূপ নানাদিক দিয়া দেখিতে গেলেই কণিষ্কের সময় নির্ণয় যে কত আবশ্যক তাহা প্রতীত হইবে। অবশ্য মোটামুটি একটা আনুমানিক তারিখ যদি সর্ব্বসম্মতরূপে গৃহীত হয় তাহা হইলেই চলে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহার সম্ভাবনাও কম। কাহারও মতে কণিষ্ক খৃষ্টের ৫৮ বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। আবার কাহারও মতে তাঁহার রাজ্যলাভ-কাল খৃষ্টের ২৭৮ বৎসর পরে। কণিষ্কের তারিখ সম্বন্ধে 'নানা মুনির নানা মত'। তাহার সবিস্তার উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। এ বিষয়ে যাঁহার সবিশেষ আলোচনা করিবার ইচ্ছা তাঁহাকে ১৯০৮ সালের ইণ্ডিয়ান্ এণ্টিকোয়ারী পত্রিকা (Indian Antiquary) পাঠ করিতে অনুরোধ করি। উহাতে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কণিষ্ক সম্বন্ধে বিভিন্ন মতাবলী নিঃশেষে উল্লেখ করিয়াছেন। এই কণিষ্ক-সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য বিলাতের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির গৃহে (Royal Asiatic Society) এক বিশেষ বিতর্ক সভার অধিবেশন হয়। উহার বিশদ ও বিস্তৃত বিবরণ উক্ত সোসাইটির ১৯১৩ সালের পত্রিকায় দেওয়া হইয়াছে।

সম্প্রতি শ্রীযুত মার্শাল সাহেব (Dr. Marshall) প্রাচীন তক্ষশিলার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে কণিষ্কবংশের একখানি লিপি আবিষ্কার করিয়াছেন। একটি রূপার পাত্রের মধ্যে এই লিপিখানি ও একটি সোনার কৌটা পাওয়া গিয়াছে। এই সোনার কৌটায় অস্থিভস্ম রক্ষিত ছিল। মার্শাল সাহেব (Dr. Marshall) লিপিখানির যে অর্থ করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই- "অ্যাজেস (Azes) প্রবর্ত্তিত অব্দের ১৩৬ বৎসরে বক্ট্রিয়া (Bactria) নিবাসী ধুরসক কর্ত্তৃক ভগবান 'বুদ্ধের' অস্থি-ভস্ম রক্ষিত হইল। মহারাজ রাজাধিরাজ দেবপুত্র কুশান যাহাতে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিতে পারেন এই উদ্দেশ্যে (এবং আরও অনেক উদ্দেশ্যে) তক্ষশিলার বোধিসত্ত্ব মন্দিরে এইরূপ অস্থি রক্ষিত হইল।"

ইহার মধ্যে ঐ অ্যাজেসের (Azes) নামটি বিশেষ মূল্যবান। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ফ্লীট (Fleet), টমাস (Thomas) প্রমুখ মহাপণ্ডিতগণ একবাক্যে অ্যাজেসের (Azes) সহিত এই লিপির কোন প্রকার সম্বন্ধ অস্বীকার করিয়াছেন। মূলে কথাটি আছে, "স ১৩৬ অয়স অষডস মসস"। মার্শাল সাহেব ইহার ব্যাখ্যা করেন "অয় (অর্থাৎ অ্যাজেস প্রবর্ত্তিত অব্দের ১৩৬ বর্ষে আষাঢ় মাসে"। টমাস প্রভৃতির মতে ইহার অর্থ—"সং ১৩৬, এই বৎসর আষাঢ় মাসে"।

এই লিপিখানির গুরুত্ব অথবা অ্যাজেসের সহিত কণিষ্কের সম্বন্ধের বিষয় বুঝিতে হইলে কণিষ্ক সম্বন্ধে কয়েকটী মোটামুটি কথা জানা আবশ্যক।

পুরাণকারগণের মতে কাণ্ববংশের ধ্বংসের পর শক, যবন, তুষার, পহ্লব প্রভৃতি বৈদেশিক জাতি ভারতবর্ষে আধিপত্য করিয়াছিল। প্রাচীন মুদ্রা, শিলালিপি প্রভৃতি দ্বারা ভারতবর্ষের ইতিহাস যতটুকু জানা গিয়াছে তাহার সহিত এই উক্তির সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। শকগণ সুপরিচিত জাতি। ইহাদের এক বংশ সিন্ধুনদের তীরে বিশাল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। এই

বংশের রাজা মস্ বা মোস (Maues), প্রথম আ্যাজেস্ (Azes I), অ্যাজিলাইসিস্ (Azilises), দ্বিতীয় অ্যাজেস্ (Azes II) প্রভৃতি। ইহাদের অপর এক শাখা—চষ্টনের বংশধর—উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করিতেন।

যবন বলিতে প্রাচীন ভারতবাসীগণ গ্রীক বুঝিতেন। বস্তুতঃ এই সময়ে গ্রীকগণ পাঞ্জাব ও আফগানিস্থানে রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে বিখ্যাত রাজা মীনাণ্ডার বা মিলিন্দ (Menander), ষ্ট্র্যাটো (Strato) প্রভৃতি। তুষার বা তুরুষ্ক অর্থে যে কণিষ্কের বংশ বুঝিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ কণিষ্কের বংশের নাম ছিল 'তোচারি'। আর রাজতরঙ্গিণীতে ও আলবেরুণীর গ্রন্থে কণিষ্ককে তুরুষ্ক বলিয়াই বর্ণনা করা হইয়াছে। এই বংশের রাজা প্রথম ও দ্বিতীয়, কডফিসেস (Kadphises I, II) কণিষ্ক, বাসিষ্ক, হুবিষ্ক ও বাসুদেব।

'পহ্লব' অর্থে, যাহাদের সহিত পরাক্রান্ত রোম সাম্রাজ্যের বহুবার সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল সেই পার্থিয়ান জাতি বুঝিতে হইবে। পার্থিয়ানেরা যে ভারতবর্ষে রাজত্ব করিত তাহার অনেক প্রমাণ আছে। পেরিপ্লাস (Periplus) নামক গ্রন্থের অজ্ঞাত লেখক তাঁহাদিগকে সিন্ধুনদের তীরে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়াছিলেন। এই বংশের রাজা ভনোনিস্ (Vonones) প্রভৃতি।

এই চারিটি বংশ যে মৌর্য্যবংশ পতনের পর এবং গুপ্ত রাজগণের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম প্রদেশে রাজত্ব করিত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, কাহারা কোন সময়ে রাজত্ব করেন?

চীনদেশীয় গ্রন্থে এ বিষয়ে কতক আভাস পাওয়া যায়। চীনদেশীয় গ্রন্থোক্ত বিবরণ অনেকে সংগ্রহ করিয়াছেন। তন্মধ্যে মুঁশে বয়ার (M. Boyer) কর্ত্তৃক 'জুর্নাল এশিয়াটিক' পত্রে ফরাসী ভাষায় লিখিত প্রবন্ধ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। এই চীন গ্রন্থে দেখিতে পাই যে ২০০ খৃঃ পূঃ হিয়ুংনু নামক জাতির অত্যাচারে গৃহতাড়িত ইয়ু-চি জাতি শকজাতিকে আক্রমণ করে, এবং অক্সাস (Oxus) নদীর উত্তর দিক হইতে শকদিগকে তাড়াইয়া তথায় বসবাস করে। ক্রমে অক্সাস্ নদীর দক্ষিণ তীরও তাহারা অধিকার করে, এবং এইরূপে সমস্ত বক্ত্রিয়া প্রদেশ তাহাদের হস্তগত হয়। এই বক্ত্রিয়ায় অবস্থান কালে ইয়ু-চিগণের জাতীয় জীবনে গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটে। তাহারা যাযাবর বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া গৃহস্থ বৃত্তি অবলম্বন করে, এবং পাঁচটি শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। একশত বৎসরের অধিক কাল তাহারা এইরূপ বিভক্ত অবস্থায় থাকে। পরে ঐ পাঁচ শাখার অন্যতম কুশান শাখার দলপতি কুজুল কডফিসেস (Kozoulo Kadphises) অপর চারি শাখাকে পরাভূত করিয়া সমস্ত ইয়ু-চি জাতিকে স্বীয় অধীনে আনয়ন করেন। পরে তিনি কাবুল ও অন্যান্য প্রদেশ দখল করেন এবং তাহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র উইম কডফিসেস্ সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষ দখল করেন। তিনি প্রতিনিধি সেনাপতি দ্বারা ভারতবর্ষ শাসন করেন।

চীনগ্রন্থের এই বিবরণে ঘটনাগুলির কোন তারিখের উল্লেখ নাই। সুতরাং উপরোক্ত ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির তাৎপর্য্য জানা থাকিলেও, তাহাদের সময় নির্ণয় লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে বিষম বাকবিতণ্ডা উপস্থিত হইয়াছে।

উল্লিখিত বর্ণনায় কণিষ্কের উল্লেখ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষে কণিষ্ক এবং বাসিষ্ক, হুবিষ্ক, বাসুদেব প্রভৃতি তাঁহার বংশধরগণের মুদ্রা ও শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে (বাসিষ্কের মুদ্রা পাওয়া যায় নাই; তবে শিলালিপিতে তাহার নাম পাওয়া গিয়াছে)। অধিকাংশ লিপিই তারিখযুক্ত। সংবৎসর ৩ হইতে আরম্ভ করিয়া সংবৎসর ৯৮ পর্য্যন্ত বহু বৎসরের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। এই সকল শিলালিপি ও মুদ্রায় তাঁহাদিগকে কুশান বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, সুতরাং তাঁহারা যে ইয়ু-চি জাতির অন্যতম শাখার অন্তর্গত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এক্ষণে প্রশ্ন

এই যে, চীন গ্রন্থোক্ত কুশান নরপতি ১ম ও দ্বিতীয় কডফিসেস্, এবং ভারতবর্ষের মুদ্রা ও শিলালিপি হইতে আবিষ্কৃত কণিষ্ক প্রভৃতি কুশান সম্রাট, এই উভয়ের মধ্যে কি সম্বন্ধ। রক্তের সম্বন্ধ যে খুব নিকটে ছিল তাহা বোধ হয় না, কারণ আরা শিলালিপিতে কণিষ্কের পিতার নাম পাওয়া গিয়াছে। তাহা কাহারও মতে বাসিস্‌প, কাহারও মতে বাঝেস্ক কিন্তু তাহা যে 'কডফিসেস্' নহে ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। অবশ্য কেহ কেহ এই আরা লিপির কণিষ্ককে কুশান সম্রাট কণিষ্ক হইতে বিভিন্ন বলিয়া অনুমান করেন, কিন্তু এরূপ অনুমান অত্যন্ত কষ্টকল্পিত। রক্তের সম্বন্ধ ছাড়িয়া দিয়া এখন সময় সম্বন্ধের বিষয় লক্ষ্য করা যাউক। দুই কডফিসেস ও কণিষ্ক, বাসিষ্ক প্রভৃতি ইহাদের কোন দল আগে। কানিংহাম (Cunningham) হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাচীন মুদ্রা-তত্ত্ববিদগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, মুদ্রার গঠন প্রভৃতি বিচার করিলে কডফিসেস্ দ্বয় যে কণিষ্ক দলের পূর্ব্ববর্ত্তী তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। কিন্তু তাহা হইলে, কণিষ্ক ৫৮ খৃঃ পূঃর লোক ফ্লীট সাহেবের এই মত টেকে না। তাই তিনি কণিষ্ককে কডফিসেসের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চান। এ সম্বন্ধে তিনি যে যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়াছেন তাহা তাঁহার মত পণ্ডিতের উপযুক্ত হয় নাই। মাণিক্যাল নামক স্থানে একটি পাথরের সিন্দুক পাওয়া যায়। তাহার ঢাকনির উপরে কণিষ্কের নামযুক্ত শিলালিপি; সুতরাং উহা যে কণিষ্কের সময়েই প্রোথিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। অথচ ইহার মধ্যে কডফিসেসের মুদ্রা পাওয়া যায়। সুতরাং স্বীকার করিতেই হইবে কডফিসেস কণিষ্কের পূর্ব্বের লোক। ফ্লীট এই সিদ্ধান্ত এড়াইবার জন্য মাণিক্যাল লিপির কণিষ্ককে দ্বিতীয় কণিষ্ক বলিয়া খাড়া করিয়াছেন, কিন্তু এই সব কষ্ট-কল্পনা বিশেষ প্রমাণ ব্যতিরেকে গ্রাহ্য হইতে পারে না। সুতরাং অধিকাংশ পণ্ডিতগণের মতরূপে আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, সময়ানুক্রমে প্রথমে দুই কডফিসেসের পরে কণিষ্ক, বাসিষ্ক প্রভৃতি।

এখন বিচার্য্য, কডফিসেস্ কোন সময়ের লোক। কারণ তাহা হইলেই কণিষ্কের সময় নির্দ্ধারণ সহজ হইবে। এ সম্বন্ধে অনেকে অনেক সূক্ষ্ম গবেষণা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইবার আবশ্যকতা দেখি না। সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলিলেই চলিবে।

চীন দেশীয় প্রথম হান্ রাজবংশের ইতিহাস লেখক প্যান-কু স্বীয় গ্রন্থে ইয়ু-চি জাতি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে তাহারা এক্ষণে বক্ট্রিয়া প্রদেশে পাঁচটি শাখায় বিভক্ত হইয়া আছে। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে প্রথম কডফিসেস্ এই পাঁচশাখাকে একীভূত করেন। সুতরাং প্যান-কু যে সময়ের ঘটনা লিখিয়াছেন, কডফিসেস তাহার পরের লোক। ২৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে সমুদয় ঘটনা ঘটিয়াছে প্যান-কু তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং ২৪ খৃষ্টাব্দের পরে কোন সময় কডফিসেস্ ইয়ু-চি জাতির পাঁচ শাখাকে একত্র করেন, ইহা সর্ব্ববাদী-সম্মত সিদ্ধান্ত।

কিন্তু এই ঘটনা ২৪ খৃষ্টাব্দের কত পরে, ঘটে, তাহা সঠিক জানিবার উপায় নাই। যাঁহারা কণিষ্ককে শকাব্দের প্রবর্ত্তক বলিয়া মনে করেন, তাহাদের বেশী দিন অপেক্ষা করিবার যো নাই। কারণ ২৪ খৃষ্টাব্দ ও ৭৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে, সময়ের ব্যবধান বড় বেশী নহে, অথচ ইহারই মধ্যে দুই কডফিসেসের স্থান করিতে হইবে। এবং প্রথম কডফিসেস্, চীন গ্রন্থ অনুসারে, ৮০ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। এই দলের মতে প্রথম কডফিসেস ৪০ খৃঃ অব্দে প্রাণত্যাগ করেন। অন্ততঃ এই দলের মুখপাত্র টমাস সাহেব এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। (J. R. A. S. 1913 P. 634) তাহা হইলে কথাটা দাঁড়াইল এই যে, কডফিসেস্ তাঁহার ৬৪ বৎসর বয়সের পরে অর্থাৎ প্রায় ৭০ বৎসরের সময় রণযাত্রা আরম্ভ করেন। প্রথমে ইয়ু-চি জাতির

অন্তুতর চারিশাখাকে স্বীয় অধীনে আনয়ন করেন, পরে প্রবল পরাক্রান্ত পার্থিয়া রাজ্য আক্রমণ করেন ওবিধ্বস্ত করেন। পো-টা নামক রাজ্যও তাঁহার দ্বারা বিধ্বস্ত হয়, এবং তিনি কাবুলও জয় করেন। আবার কাবুল জয়ের পর্য্যায়ভেদ আছে। কতকগুলি মুদ্রায় একদিকে কডফিসেসের নাম, আর একদিকে কাবুলের গ্রীক রাজা হারমিউসের (Hermaios) নাম। দ্বিতীয় শ্রেণীর মুদ্রায় এক দিকে হারমিউসের মূর্ত্তি, কিন্তু দুই দিকেই কডফিসেসের নাম। তৃতীয় শ্রেণীর মুদ্রায় হারমিউসের নাম বা মূর্ত্তি কিছুই নাই। এই তিন শ্রেণীর মুদ্রায় দেখা যায় কিরূপে ধীরে ধীরে কাবুল সম্পূর্ণরূপে কডফিসেসের হস্তগত হয়। অথচ এই সমস্তই টমাস প্রমুখ দলের মতে ৭০ বৎসরের বৃদ্ধ কর্ত্তৃক আরব্ধ হয়, এবং দশবৎসরের মধ্যেই সম্পন্ন হয়।

কডফিসেসের তারিখ সম্বন্ধে আর একটি যুক্তি এই যে, তাঁহার কতকগুলি মুদ্রা রোম সম্রাট অগষ্টাস্ বা টাইবিরিয়াসের মুদ্রার অনুরূপ। এই দুই রোম সম্রাটের মৃত্যুকাল যথাক্রমে ১৪ ও ৩৭ খৃঃ অব্দ। সুতরাং কডফিসেসের রাজ্যকালও ইহার নিকটবর্ত্তী। আমাদের মতে এই যুক্তি দ্বারা এই কথা মাত্র প্রমাণিত হয় যে, কডফিসেস্ অগষ্টাস্ ও টাইবিরিয়াসের পরবর্ত্তী; কত পরবর্ত্তী তাহা বলা অসম্ভব। টাইবিরিয়াস বা অগষ্টাসের মুদ্রা ভারতবর্ষে অন্ততঃ শতাধিক বৎসর কাল প্রচলিত ছিল, ইহা অনুমান করিতে পারি; ইহার মধ্যে কোন সময়ে কডফিসেসের মুদ্রা প্রস্তুতকারকগণ ঐ সকল মুদ্রার অনুকরণ করিয়া থাকিবেন। সুতরাং কডফিসেস ১৪ খৃঃ অব্দেও বর্ত্তমান থাকিতে পারেন, আবার ১১৪ খৃঃ অব্দেও তাহার বর্ত্তমান থাকার পক্ষে কোন বাধা দেখা যায় না।

প্রথম কডফিসেস্ ৪০ খৃঃ অব্দে প্রাণত্যাগ করেন টমাস প্রমুখ দলের এই সিদ্ধান্ত অন্য কোন বিশিষ্ট যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এরূপ বোধ হয় না। কিন্তু অন্যদিকে ইহা বিশ্বাস না করিবার পক্ষে দুই একটি কারণ আছে। প্যান-কু তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, ইয়ু-চি জাতি এক্ষণে পাঁচ শাখায় বিভক্ত। তিনি স্পষ্টতঃ বর্ত্তমান কালের ব্যবহার করিয়াছেন—অন্ততঃ ফরাসী ও ইংরাজী অনুবাদে তাহাই প্রতীয়মান হয়। এ কথা সকলেই স্বীকার করেন যে, ৯২ খৃঃ অব্দে প্যান-কুর মৃত্যু হয়, এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভগিনী কর্ত্তৃক উক্ত গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। সুতরাং উক্ত গ্রন্থ ৯০ খৃষ্টাব্দের অনধিক পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। যদি ৪০ খৃষ্টাব্দে কডফিসেস ইয়ু-চি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকেন, তবে ৯০ বা ৮০ খৃষ্টাব্দে একজন গ্রন্থকার 'বর্ত্তমান কালে ইয়ু-চি জাতি পাঁচশাখায় বিভক্ত' এইরূপ লিখিবেন ইহার সম্ভাবনা অতি কম। আর এই গ্রন্থকার যে ঘটনা সমুদয় পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে জানিতেন ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরাই তাহা স্বীকার করিয়াছেন। *

তারপরে আরও একটি বিষয় সন্দেহজনক। বক্ট্রিয়ার ইয়ু-চি জাতিকে পরাস্ত করিয়া চীন সেনাপতি তাহাদের নিকট হইতে বার্ষিক কর আদায় করিয়া নিবৃত্ত হন। এই সময়ে ইয়ু-চি জাতির রাজা কে ছিল, চীন গ্রন্থে তাহার উল্লেখ নাই। কণিষ্ক শকাব্দ-প্রবর্ত্তক হইলে তিনিই এ সময়ে ইয়ু-চির রাজা। অথচ চীন গ্রন্থে কণিষ্কের নামগন্ধ নাই। বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত কণিষ্কের যে সম্বন্ধ তাহাতে এই সময় কণিষ্ক রাজা থাকিলে নিশ্চয়ই চীন গ্রন্থে তাঁহার নামের উল্লেখ থাকিত, ইহাই সম্ভব পর বলিয়া মনে হয়। আর কণিষ্ক বা উইম কডফিসেসের সময় এই ঘটনা ঘটিলে কেবল মাত্র

* ভিন্সেন্ট স্মিথ লিখিয়াছেন "Pan-ku had exceptionally good sources of information" J. R. A. S. 1903.

ইয়ু-চির রাজা না, বলিয়া ভারতবর্ষের রাজা পরাজিত, এইরূপ উল্লেখ চীন গ্রন্থে থাকা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়। পণ্ডিতপ্রবর ফ্র্যাঙ্ক (Franke) বলিয়াছেন যে এই সময়ে প্রথম বা দ্বিতীয় কডফিসেস্ রাজা থাকিলে নিশ্চয়ই চীনগ্রন্থে তাহাদের নামের উল্লেখ থাকিত, কারণ এই উভয় নামই চীন ইতিহাসে সুপরিচিত। কণিষ্ক সম্বন্ধে যে এই যুক্তি আরও বেশী প্রযোজ্য তাহা বলাই বাহুল্য।

সুতরাং প্রথম কডফিসেসের তারিখ সম্বন্ধে নিম্ন লিখিতমত বলিতে পারা যায়।

(১) তিনি ২৪ খৃঃ অব্দের পরে বর্ত্তমান ছিলেন। কত পরে তাহা জানা যায় না।

(২) প্রথম কডফিসেসের মৃত্যুকাল ৪০ খৃঃ অব্দ ইহা অনুমানমাত্র। ইহার কোনও বিশেষ ভিত্তি নাই।

(৩) কডফিসেস্ রোম সম্রাট অগষ্টাস্ ও টাইবিরিয়াসের মুদ্রার অনুকরণ করিয়াছেন। ইহাতে এই মাত্র প্রমাণিত হয় যে, সম্ভবতঃ তিনি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন।

(৪) ৯০ খৃষ্টাব্দে চীন সৈন্য কর্ত্তৃক ইয়ু-চি জাতি পরাজিত হয়। খুব সম্ভবতঃ এই সময় প্রথম বা দ্বিতীয় কডফিসেস, অথবা কণিষ্ক বর্ত্তমান ছিলেন না; কারণ, থাকিলে তাহাদের নাম চীন গ্রন্থে উল্লিখিত হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল। প্রথম কডফিসেস্ ঐ সময়ে জীবিত থাকিতে পারেন, কিন্তু ঐ সময় পর্য্যন্ত বিশাল কুশান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা দ্বারা তিনি সুপরিচিত হন নাই।

(৫) ৮০ বা ৯০ খৃঃ অব্দে প্যান-কু তাঁহার গ্রন্থ লেখেন। ইয়ু-চি জাতি বর্ত্তমানে পাঁচভাগে বিভক্ত, এই গ্রন্থে তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন। সুতরাং খুব সম্ভব প্রথম কডফিসেস কর্ত্তৃক ইয়ু-চি জাতির পাঁচশাখার একতা সম্পাদন ৯০ খৃষ্টাব্দের পরে হইয়াছিল।

পরবর্ত্তী সংখ্যায় কণিষ্ক সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয়ের অবতারণা করিব।

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার।

চন্দ্রকান্ত প্রসঙ্গ

(৮)

শিক্ষা ও তৎসম্বন্ধে দুই একটী কথা

'ব্যায়াম' ও 'স্ত্রীশিক্ষা'

ব্যায়াম—'শিক্ষা'র সপ্তম পরিচ্ছেদে তর্কালঙ্কার মহাশয় ছাত্রগণের ব্যায়াম শিক্ষার উপযোগিতা ও একান্ত আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা 'ব্যায়াম' সম্বন্ধে আমাদের দেশের আশাভরসার স্থল প্রিয়তম ছাত্রমণ্ডলীর মনোযোগ আকৃষ্ট করিবার জন্য দুই একটী কথা সংক্ষেপেই বলিব।

শারীরিক ও মানসিক শ্রমের সমতাবিধান স্বাস্থ্যরক্ষার মূলসূত্র। মানসিক শ্রম যাঁহাদের অনিবার্য্য শারীরিক শ্রম ও ব্যায়াম তাঁহাদের পক্ষে একান্তই আবশ্যক। আমরা দেখিতে পাই শারীরিক শ্রম-বিমুখ ব্যক্তিগণ দুরারোগ্য রোগের অধীন হইয়া চিরজীবন কষ্ট ভোগ করিয়া থাকেন। অনেকে বা অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। ইহাঁদের অনেকেই সংসারে কোনও বড় কাজ করিয়া যাইতে পারেন না। চিরকাল অতি অনিচ্ছা ও অশান্তির সহিত দুর্ব্বহ মাংসপিণ্ড-দেহভার বহন করিয়া থাকেন। আমাদের বিদ্যার্থিগণ রাশীকৃত গ্রন্থের অতিমাত্র অনুশীলনে অনেক সময়েই অবসন্ন হইয়া পড়েন। যাঁহারা 'ভাল ছেলে' তাঁহাদের অনেকেই সমগ্র জীবনী শক্তি 'প্রবেশিকা' বা 'ইণ্টারমিডিয়েট্' পরীক্ষার নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়া

কৃতিত্ব লাভ করিতে, কাহাকেও বা বড়জোর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডিগ্রি'গুলি প্রাণপাত পরিশ্রমে যোগ্যতার সহিত অতিক্রম করিয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করিতে দেখা যায় বটে,—কিন্তু শারীরিক শ্রম বা ব্যায়ামানুশীলনের অভাবে তাঁহাদের অনেকেরই দেহটী এমনি ভাঙ্গিয়া যায় যে, এই জন্য তাঁহাদিগকে চির-জীবন অতিকষ্টে অতিবাহিত করিতে হয়। শুধু তাহাই নহে তাঁহারা যে লক্ষ্য ধরিয়া এমন প্রাণপাত পরিশ্রমের সহিত অগ্রসর হইতেছিলেন, দুর্ভাগ্য ও অবিমৃষ্যকারিতার জন্য তাঁহারা তাঁহাদের সেই অতি সাধের লক্ষ্যস্থলে অনেক সময়েই পৌঁছিতে না পারিয়া মর্ম্ম-বেদনায় 'জীবন্মৃত' হইয়া থাকেন। এইরূপ দৃশ্য বাঙ্গালার ঘরে ঘরে।

দৈহিক শক্তির পরিপুষ্টি মানসিক শক্তিকে অতিমাত্র পরিপুষ্ট, কর্ম্মক্ষম ও তেজস্বিনী করিয়া তুলে। আমাদের ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে সংযম, ব্রহ্মচর্য্য ও ব্যায়ামানুশীলন-জনিত শারীরিক দৃঢ়তা যতদিন না প্রতিষ্ঠালাভ করিবে ততদিন তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভবপর হইবে না।

তর্কালঙ্কার মহাশয়ও এ সকল কথা অতি সুন্দর রূপে বিবৃত করিয়াছেন। এক্ষণে কি কি প্রণালীতে ব্যায়ামানুশীলন হইতে পারে, তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস শিক্ষার সপ্তম পরিচ্ছেদ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। "ব্যায়ামের ঔচিত্য সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদে উক্ত হইয়াছে—

"ব্যায়ামোঽপি সদাপথ্যো বলিনাং স্নিগ্ধ ভোজিনাং
স চ শীতে বসন্তে চ তেষাং পথ্যতমঃ স্মৃতঃ"।—

বলবান্ ও স্নিগ্ধভোজীদিগের সম্বন্ধে ব্যায়াম সর্ব্বদাই হিতকারী, শীত ও বসন্ত ঋতুতে উহা অতিশয় হিতজনক।

"সর্ব্বেষ্বৃতুষু সর্ব্বৈর্হি মর্ত্ত্যৈরাত্মহিতার্থিভিঃ।
শক্ত্যর্দ্ধেন চ কর্ত্তব্যো ব্যায়ামো হন্ত্যতোঽন্যথা॥"

সকল ঋতুতে নিজ হিতার্থী মনুষ্য শক্ত্যর্দ্ধ ব্যায়াম আচরণ করিবে। ইতোধিক ব্যায়াম-সেবা অপকারী।

'শক্ত্যর্দ্ধ ব্যায়াম' কাহাকে বলে তাহাও বলা হইতেছে—

"কুক্ষৌ ললাটে গ্রীবায়াং যদা ঘর্ম্মঃ প্রবর্ত্ততে।
শক্ত্যর্দ্ধং তং বিজানীয়াৎ আয়তোচ্ছ্বাসমেবচ॥"

যে পরিমাণ ব্যায়ামসেবা করিলে কুক্ষি, ললাট ও গ্রীবাতে ঘর্ম্মের আবির্ভাব এবং শ্বাস দীর্ঘ হয় তাহাকেই শক্ত্যর্দ্ধ ব্যায়াম কহে।

প্রাতঃকাল ব্যায়ামের কাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ব্যায়ামানুশীলন আর্য্যদিগের চিরন্তন রীতি। আর্য্য ভারতীয় রাজগণ প্রতিদিন নিয়মিতরূপে ব্যায়ামানুশীলন করিতেন, তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ছাত্রগণ অন্যান্য বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ব্যায়ামশিক্ষা করেন ইহা নিতান্ত প্রার্থনীয়। ব্যায়ামানুশীলন শিক্ষার এক প্রধান অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত।"

এখানে ব্যায়ামের উপকারিতাসূচক কয়েকটী আয়ুর্ব্বেদীয় শ্লোকও তর্কালঙ্কার মহাশয় উদ্ধৃত করিয়াছেন—আমরা তাহার মূলমাত্র তুলিয়া দিলাম।

"লাঘবং কর্ম্ম সামর্থ্যং স্থৈর্য্যং ক্লেশসহিষ্ণুতা।
দোষক্ষয়োঽগ্নিবৃদ্ধিশ্চ ব্যায়ামাদুপজায়তে॥"
"ব্যায়ামং কুর্ব্বতাং নিত্যং বিরুদ্ধমতিভোজনং।
বিদগ্ধমবিদগ্ধং বা নির্দ্দোষং পরিপচ্যতে॥"
"নচ ব্যায়ামিনং মর্ত্ত্যং সংমর্দ্দয়ন্ত্যরয়ো বলাৎ।
নচৈনং সহসাক্রম্য জরা সমধিগচ্ছতি॥"
"ব্যায়াম-ক্ষুণ্ণগাত্রস্য পদ্ভ্যামুদ্বর্ত্তিতস্যচ।
ব্যাধয়ো নোপসর্পন্তি বৈনতেয়মিবোরগাঃ॥"

ইতঃপর তর্কালঙ্কার মহাশয়, মহামান্যা ভারতেশ্বরীর নিকট ভারতের ছাত্রগণের ব্যায়ামশিক্ষা ব্যবস্থার জন্য তাঁহার প্রার্থনা, অতি আবেগপূর্ণ ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার প্রার্থনাটী সমগ্র বাঙ্গালীজাতির লুপ্ত বীরত্বের রাজ-অনুগ্রহে পুনরুদ্ধারের করুণ কাহিনীতে পরিপূর্ণ। তাঁহার সেই প্রার্থনায় স্বদেশানু-রাগের সঙ্গে অকৃত্রিম রাজভক্তিও ফুটিয়া উঠিয়াছে।

অনেকদিন ধরিয়া ভারতীয় বিদ্যালয় সমূহে ব্যায়াম-শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু সত্যের অনুরোধে আমরা আবারও এ কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, ছাত্রদিগের মধ্যে সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্য্যন্ত কেবল ব্যয়াম অনুশীলন দ্বারা বিশেষ কিছু ফললাভের সম্ভাবনা নাই। আমাদের ভবিষ্যৎ আশাভরসার স্থল ছাত্রগণের দৈহিক দৌর্ব্বল্য ও তজ্জনিত মানসিক অবসাদ, প্রকৃত পক্ষেই চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহা হউক এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতর ব্যক্তিগণের চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে সুতরাং আমরা আশ্বস্ত থাকিতে পারি। এখানে আরও একটি বিষয়ের দিকে ছাত্রগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তাঁহারা ইদানীং যেরূপ ব্যায়াম অনুশীলন করেন, তাহা পাশ্চাত্য দেশে প্রচলিত ক্রীড়া ছাড়া অন্য কিছু নহে। এই ক্রীড়াতে শারীরিক শক্তির চালনা ও আমোদ এ দুইই হইয়া থাকে সন্দেহ নাই, কিন্তু আমরা প্রায় অনেক ক্ষেত্রেই দেখিতে পাই এই ক্রীড়ায় 'শক্ত্যর্দ্ধ' ব্যায়ামের ব্যতিক্রম ঘটে। ইহাতে এত পরিশ্রম ও অঙ্গচালনা হইয়া থাকে যে, তাহা আমাদের এদেশবাসীর পক্ষে বিশেষ হিতকারী কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। আমাদের বিবেচনায় এদেশবাসীর পক্ষে এ দেশের যুগযুগান্তরের অভিজ্ঞতাপ্রসূত আয়ুর্ব্বেদীয় নিয়ম অনুসারেই শক্ত্যর্দ্ধ ব্যায়াম-সেবা কর্ত্তব্য। এ সকল ক্রীড়া করিতে বাধা নাই, তবে শুধু ক্রীড়ার জন্যই ক্রীড়া করা সঙ্গত নহে. শক্ত্যর্দ্ধ ব্যায়াম হওয়ামাত্র উহা সেদিনকার মত ত্যাগ করা উচিত।

শিক্ষার অষ্টম পরিচ্ছেদটী স্ত্রীশিক্ষার আলোচনায় পূর্ণ। তর্কালঙ্কার মহাশয় জানিতেন তাঁহার সমসাময়িক অধিকাংশ পণ্ডিত, বা রক্ষণশীল সমাজ, স্ত্রীশিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী। তথাপি তিনি সমাজের অশেষ মঙ্গলজনক, পরন্তু শাস্ত্রসম্মত স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে নিজের অভিমত দৃঢ়তার সহিত পরিব্যক্ত করিলেন। শুধু পরিব্যক্ত করা নহে, কলিকাতার ময়মনসিংহ সম্মিলনী নামক স্ত্রীশিক্ষা বিধায়িনী সভায় তিনি অনেকবার উপস্থিত থাকিয়া এবিষয়ে সকলকে উপদেশ ও উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। এই খানেই তাঁহার চরিত্রের একটা বিশিষ্ট অংশ প্রকাশ পাইয়াছে। সম্মিলনীর অনুষ্ঠাতৃগণ অধিকাংশ ব্রাহ্ম; ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে একান্ত নিষ্ঠাবান্ তর্কালঙ্কার মহাশয় তাঁহাদেরই অনুষ্ঠিত একটী দেশহিতকর কার্য্যে প্রসন্নচিত্তে যোগদান করিলেন, দেশের সাধারণে কি বলিবে বা মনে করিবে, এ বিষয়ে সংস্কার বা ভীতিলক্ষণ একদিনের জন্যও তাঁহাতে প্রকাশ পায় নাই। দলাদলির প্রভাব তাঁহাকে কর্ত্তব্যচ্যুত করিতে পারে নাই। ময়মনসিংহের—শুধু ময়মনসিংহের নহে, ভারতের—গৌরব স্বর্গীয় আনন্দ মোহন বসু মহাশয়ের সহিত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বিশেষ প্রীতি ছিল। সম্মিলনীর কার্য্যে তাঁহারা অভিন্ন-মতাবলম্বী বন্ধু ছিলেন। যাহাহউক তর্কালঙ্কার মহাশয় স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষা লাভের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ সংক্ষেপে স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। অমূল্যনিধি বিদ্যাধনে স্ত্রীজাতি বঞ্চিত থাকিবে, ইহা তাঁহার বিবেকানুমোদিত নহে। তিনি স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষার বিরোধী মতের খণ্ডন করিবার জন্য বলিতেছেন—

"কেন যে স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকতা নাই তাহা বুঝিতে পারা যায় না। বিদ্যা ইতর জন্তু হইতে মনুষ্যকে পৃথক করে। বিদ্যা প্রভাবেই মানব ক্রমে দেবভাব প্রাপ্ত হয়, ইহাতে কাহারও বিপ্রতিপত্তি নাই। সুতরাং স্ত্রীপুরুষ-সাধারণ্যে বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে কোনও সংশয় হইতে পারে না। স্ত্রীজাতির গঠন প্রণালী পুরুষজাতি অপেক্ষা ভিন্নরূপ, এবং তাহারা স্বভাবতঃ মৃদুপ্রকৃতি বলিয়া তাহাদের বিদ্যাশিক্ষার অনৌচিত্য প্রতিপন্ন হয় না। অন্যরূপ গঠনপ্রণালী ও মৃদুতা ইহাই প্রতিপন্ন করে যে, তাহারা পুরুষের ন্যায়

কঠিন কর্ম্মে অসমর্থ। এই হেতুতেই দূরদর্শী আর্য্য মহর্ষিগণ যুদ্ধপ্রভৃতি সাহসিক কার্য্যের ভার কোমলাঙ্গী-দিগের প্রতি অর্পণ করেন নাই। যদিও ইতিহাস বলিয়া দিতেছে রণরঙ্গিনীদিগের শাণিত তরবারি শত শত বীরমুণ্ড ছিন্ন করিয়াছে এবং তাহাদের মৃণাল-সুকুমার শরীরে শোণিতবিন্দুপরম্পরা অভূতপূর্ব্ব অলঙ্কার-শোভা সম্পাদন করিয়াছে, তথাপি উহা স্বাভাবিক নিয়ম বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না। স্ত্রীজাতির শরীরের ন্যায় অন্তঃকরণও কোমল। তাহারা সাধারণতঃ হঠকারীদিগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হয় না। প্রত্যুত অন্তঃকরণের কোমলতা ও সরলতা প্রযুক্ত সহসা প্রলোভনে বিচলিত ও দুষ্ট-দিগের কুচক্রে প্রতারিত হইতে পারে. এইজন্য পবিত্রতা রক্ষার নিমিত্ত তাহাদের অবরোধ বাসের বিধি হইয়াছে। দৈহিক ও মানসিক কোমলতা কোনও মতে বিদ্যা-শিক্ষার পরিপন্থী হইতে পারে না। বরংচ কোমলা-ন্তঃকরণই বিদ্যাশিক্ষার সমধিক উপযোগী * * * * বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা স্ত্রীদিগের দুর্ব্বল অন্তঃকরণে বল সম্পাদন করা সমধিক যুক্তিসঙ্গত।” যাহারা বলেন স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজনাভাব, অবশ্য তাঁহাদের মতে অর্থ উপার্জ্জনই বিদ্যার প্রয়োজন, তর্কালঙ্কার মহাশয় উক্ত মতে অশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। তাঁহার মতে বিদ্যার জন্যই বিদ্যা, পশুত্ব অপনোদনের জন্যই বিদ্যাশিক্ষা—অর্থের জন্য নহে, সুতরাং স্ত্রীজাতি বিদ্যা-লাভের সম্পূর্ণ অধিকারিণী।

“আত্মানমাত্মনা যাস্তু রক্ষেযুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ”—এই মনুবাক্য উদ্ধৃত করিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয় বলেন—“যে স্ত্রী আপনি আপনাকে রক্ষা করেন তিনিই সুরক্ষিতা। স্ত্রী বিদুষী হইলে তিনি এই শ্লোকার্দ্ধ অনায়াসে কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন। অবিদুষীদিগের পক্ষে উহা কঠিন ব্যাপার সন্দেহ নাই।” এই আত্ম-রক্ষা ব্যাপারে বিদুষী এবং অবিদুষীদিগের মধ্যে যে তারতম্য নির্দ্দেশ করা হইয়াছে উহার ভিতরে একটা কথা রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। তর্কালঙ্কার মহাশয় স্ত্রী-জাতির বিদ্যাশিক্ষার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন বটে কিন্তু তিনি ‘জেনানা’ প্রথার বিরোধী ছিলেন না। বর্ত্তমান ভারতে নানা কারণে স্ত্রীজাতির অবরোধ-বাস তিনি সমর্থন করিতেন। অবরোধবাসিনী রমণীরও আত্মরক্ষার প্রয়োজন হইয়া থাকে। সাধারণতঃ পর-পুরুষের কুদৃষ্টি হইতে নিজের সম্ভ্রম বা পবিত্রতা রক্ষাই আত্মরক্ষা নহে। পুরুষের ন্যায় সাধারণ নিয়মে স্ত্রীজাতিও সংবদ্ধ। তাঁহাদেরও হৃদয়ে সুবৃত্তি ও কুবৃত্তি সমভাবে বিরাজমান। তাঁহাদেরও হৃদয়ে অনেক সময়ে পুণ্যের কঠোরতার সঙ্গে সঙ্গে পাপের সরলতা মনোহারিতা ও সুখপ্রসূতার চিত্র অতি আড়ম্বরের সহিত ফুটিয়া উঠে। তাঁহারাও সেই প্রলোভনে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে পারেন। যদি বিদ্যা বা সুশিক্ষা তাঁহাদের হৃদয়ে জ্ঞানের শক্তি সঞ্চার করিয়া না দেয়, আপাতমনোহর সাংসারিক সুখ, স্বার্থপরতা, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি দোষগুলি কোমলপ্রাণা রমণী-হৃদয়েও স্থান পাইয়া থাকে, তাঁহাদের অবিমৃষ্যকারিতায় অনেক সময় সোনার সংসার ছারখার হইয়া যায়। তাঁহারা যদি বিদ্যামার্জ্জিত বিবেক লইয়া আমাদের সংসারে প্রবেশ করেন, তাঁহারা যদি রীতিমত সাংসারিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের প্রশস্ততাসম্পাদক অন্যান্য শিক্ষালাভ করিয়া আমাদের সংসার আগলাইয়া সকলকে আপন করিয়া লয়েন, তাঁহারা যদি শিক্ষামার্জ্জিত সুরুচির প্রসাদে সংসারের অনাবশ্যক আবর্জ্জনা ও কেলেঙ্কারী হইতে নিজকে ও নিজের দৃষ্টান্তে পরিবারের সকলকে দূরে রাখিয়া গৃহলক্ষ্মীর স্বর্ণময় আসনটী জুড়িয়া বসেন, তবে একদিনে শ্মশানের বুকে নন্দনকানন নির্ম্মিত হইয়া উঠে। কোন্ রমণী সেই স্পৃহনীয় মর্য্যাদার আসনটীর জন্য আকাঙ্ক্ষাশালিনী নহেন? স্ত্রীজাতির শিক্ষা যাহাতে সর্ব্বতোভাবে সমাজের মঙ্গলপ্রসূ হয়,

সামাজিকগণের তাহাই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। মনুর আত্মরক্ষার কথা তুলিয়া যদিও তর্কালঙ্কার মহাশয় তাহা দ্বারা রমণীজাতির দেহ ও সম্মানরক্ষার কথাটাই বলিয়াছেন তথাপি আমাদের মনে হয় উহা তাঁহার সংক্ষেপোক্তি মাত্র, বাস্তবিক বিদ্যা দ্বারা কেবল দেহরক্ষা হয় না, কেবল বিদ্যা বা সুশিক্ষাই রমণীজাতিকে তাঁহার প্রকৃত মহত্ব ও অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দিতে পারে। এবং শিক্ষা দ্বারা চরিত্র সমধিক উন্নত হইলে স্ত্রীজাতি কেবল নিজেদেরই রক্ষয়িত্রী হন এমন নহে, তাঁহারা নিজেদের পবিত্রতা ও জ্ঞানগরিমা-বলে আমাদের পতিত সংসারকেও উদ্ধার করিতে পারেন। এই রমণীজাতির মহত্বের উপর আমাদের সংসারের সুখ-স্বচ্ছন্দতা মাত্র নহে, পৃথিবীর সমগ্র কল্যাণ নির্ভর করিয়া থাকে। আমাদের যে বংশধরগণ ভবিষ্যতে পৃথিবীর মনুষ্য-সমাজের সভ্য বলিয়া গণ্য হইবে তাহাদের ইষ্টানিষ্ট ভালমন্দ তাহাদের জননীদেরই সম্পূর্ণ করায়ত্ত। তাহারা মাতৃ-রক্তের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃশক্তি ও মাতৃদোষগুণের সম্পূর্ণ অধিকারী হইবে। মাতার ক্রোড়ে মাতৃস্তন্যে তাহাদের জীবন-গঠনের প্রথম কালটা অতিবাহিত হয় বলিয়া মাতৃ-শিক্ষাদীক্ষায় তাহাদের জীবনের গতি সূক্ষ্মভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে—এই সত্যের অপলাপ করিবার উপায় নাই। সুতরাং এই রমণীজাতি যদি সুশিক্ষা লাভ না করেন, তাঁহারা যদি মানুষের শ্রেষ্ঠ অধিকার জ্ঞান-রাজ্যের বাহিরে পড়িয়া থাকেন, তবে জগতের দুর্গতির বীজ এখানেই নিহিত রহিল না কি? আর পুরুষ জাতি যতই শিক্ষিত হউন্ না কেন, স্ত্রীজাতি যদি অশিক্ষিত থাকেন, তবে তাঁহাদের অর্দ্ধেকটা জীবন অন্ধকারময় হইয়া থাকিবে। বাজসনেয় ব্রাহ্মণ বলেন,—

"অর্দ্ধো বা এষ পুরুষো যাবজ্জায়াং ন বিন্দতে।
অথ জায়াং বিন্দতে অথ পূর্ণো ভবতি" ইতি॥

—দারপরিগ্রহের পূর্ব্বে মানুষ আধখানা থাকে, দারপরিগ্রহ করিলে তবে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ "শরীরার্দ্ধং স্মৃতা জায়া"। বুঝি বা বাজসনেয় ব্রাহ্মণের উক্তিটী আরও উদার, তাহাতে শরীরের নাম উল্লেখ নাই। দারপরিগ্রহ দ্বারা মানুষ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে—সে দেহে হউক, মনে হউক, প্রাণে হউক্ বা আত্মাতে হউক্—পূর্ণ হইবে,—তৎপূর্ব্বে সে আধখানা। যে স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে শাস্ত্র এত উদার, তাঁহাদেরও পূর্ণতা সম্পাদনের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহারা যদি জ্ঞানলাভ করিয়া শিক্ষাদীক্ষায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া গৃহিণীর পদের যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন, তবেই ত পুরুষ জাতিকে পূর্ণ করিতে পারিবেন।

আমরা দেখিতে পাই, উচ্চ ধারণা ত্যাগ ও সংযমের অভাবে আমাদের গৃহিণীগণ অনেক সময়ে এমনতর পৈশাচিক লীলার অভিনয় করিয়া থাকেন যে বলিতে লজ্জা বোধ হয়। আমরা শিক্ষিত পুরুষ জাতিও সে অভিনয়ের 'ভূমিকা' গ্রহণ করিতে অনেক সময়েই বাধ্য হইয়া পড়ি। এই বাধ্যতা নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে। এ সকল ব্যাধির প্রতিকার স্ত্রীশিক্ষা।

এই স্ত্রীশিক্ষা বলিতে আমরা যেন কতকগুলি কেতাব মুখস্থ করা না বুঝি। আমাদের পিতামহীগণ লেখাপড়া জানিতেন না বটে, কিন্তু তাঁহারা মনস্বিনী ছিলেন, তাঁহারা সংসারকে নিজের করিয়া লইতে জানিতেন এবং পারিতেন। পরকে আপন করিয়া লইবার মত সদ্‌গুণ বা শক্তি যে রমণীর নাই, তিনি গৃহিণী হইবার উপযুক্ত নহেন। বর্ত্তমান যুগে তাদৃশ গৃহিণী দুর্লভ, এ কথা বলিলে হয়ত অনেক গৃহিণীই চটিয়া যাইবেন, সুতরাং সে কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। তবে এই পরকে আপন করিয়া লইবার শক্তি যে সকল হেতুতে দৃঢ় হয়, সেই সকল হেতুবাদের মূল হৃদয়ের প্রশস্ততা, ত্যাগশীলতা ও সংযম। এই ত্যাগে, স্নেহে, সংযমে,—এই জ্ঞানে, দানে, ধর্ম্মে,—এই শ্রমে, শিল্পে, সেবায় এবং সকলকার পরিসমাপ্তি কর্ত্তৃত্বে, মাতৃত্বে ও দেবীত্বে নারীর প্রকৃত সার্থকতা, রমণীর প্রকৃত রমণীত্ব, এবং গৃহিণীর প্রকৃত গৃহিণীত্ব। যে শিক্ষা

দ্বারা নারী-জীবনের স্বার্থকতা সম্পন্ন হয় তাহাই প্রকৃত শিক্ষা, কেতাব পড়া শিক্ষার অঙ্গমাত্র।

তর্কালঙ্কার মহাশয় প্রাচীন কাব্য, ইতিহাস, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি হইতে নানাপ্রকার দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতের রমণীগণ রীতিমত বিদ্যাশিক্ষা করিতেন। তাঁহার মতে স্ত্রীপুরুষ তুল্যরূপেই বিদ্যাশিক্ষার অধিকারী। আমরা সে সকল কথার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক মনে করি, কিন্তু এমন একটী কথার পুনরুল্লেখ এখানে করিব যাহার মূল্য ভাষা জগতের বিবর্ত্তনের ঐতিহাসিকতার হিসাবেও নিতান্ত সামান্য নহে। "অতি প্রাচীনকালে আর্য্য ভারতে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক স্বতন্ত্র বিধি বা বিধান নাই কেন?" এই প্রশ্নের উত্তর করিতে গিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয় বলেন—"* * * অতি প্রাচীনকালে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে স্বতন্ত্র বিধি প্রণীত না হইবার আরও কারণ ছিল, অতি পুরাকালে আর্য্যভারতে স্ত্রীপুরুষ সাধারণ সন্তানের প্রতিই পুত্র শব্দের প্রয়োগ হইত।" অশ্বলায়ন বলিয়াছেন—

"অঙ্গুষ্ঠমেব গৃহ্নীয়াৎ যদি কাময়ীত পুমাংস এব মে পুত্রাজায়েরন্" ইতি—(আশ্বলায়ন গৃহ্য)

কেবল পুত্রের জন্য ইচ্ছা করিলে পাণিগ্রহণকালে স্ত্রীর অঙ্গুষ্ঠ মাত্র গ্রহণ করিবে।

"পুত্র শব্দঃ পুংসি স্ত্রিয়াংচ স্মৃতৌ দৃষ্টঃ। * * * লোকে চ দুহিতরি পুত্রশব্দং প্রযুঞ্জানা দৃশ্যন্তে এহোহি পুত্রেতি। মন্ত্রে চ দৃশ্যতে পুমাংস্তে পুত্রো জায়তামিতি। তস্মাৎ পুমাংসঃ পুত্রা ইতি বিশেষণং"।

(গার্গ্য নারায়ণ)

পুরুষ ও স্ত্রী উভয় সন্তানেই পুত্র শব্দের প্রয়োগ স্মৃতিতে দৃষ্ট হইতেছে। লোকে ও দুহিতাতে পুত্রশব্দের প্রয়োগ করিতে দেখা যায়। 'তোমার পুরুষ পুত্র হউক' এই মন্ত্রেও পুরুষ বিশেষণ থাকায় বোধ হইতেছে কন্যাও পুত্র শব্দ বাচ্য। অতএব 'পুমাংস এব মে পুত্রাঃ' এই স্থলে 'পুত্রা' ইহার বিশেষণরূপে 'পুমাংস' এই পদ প্রযুক্ত হইয়াছে, কেন না 'পুত্রাঃ' বলিলে স্ত্র্যপত্যও বুঝায়, অতএব কেবল পুমপত্য বুঝাইবার জন্য 'পুমাংস এব' এই বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে।

যাস্ক বলেন—

"অবিশেষেণ মিথুনাঃ পুত্রাদায়াদাঃ"

(নিরুক্ত নৈগমকাণ্ড)

স্ত্রীপুরুষ উভয়বিধ পুত্রই অবিশেষে ধনাধিকারী।

"অবিশেষেণ পুত্রাণাং দায়ো ভবতি ধর্ম্মতঃ।
মিথুনানাং বিসর্গাদৌ মনুস্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ॥"

স্বায়ম্ভুব মনু বলিয়াছেন অবিশেষে স্ত্রীপুরুষ-পুত্রদিগের ধনাধিকার ধর্ম্মানুগত।

উদাহৃত প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে অতি প্রাচীন-কালে স্ত্র্যপত্য ও পুরুষাপত্যসাধারণ্যে পুত্রশব্দ প্রযুক্ত হইত। সুতরাং তৎকালে স্ত্রীশিক্ষার জন্য কোনরূপ স্বতন্ত্র বিধির প্রয়োজন ছিল না। স্ত্রীপুরুষ উভয় জাতিই সামান্য শিক্ষা-বিধির বিষয় হইত। কালে ইহার পরিবর্ত্তন ঘটিল। পুত্রশব্দ কেবল পুমপত্যে প্রযুক্ত হইতে আরম্ভ হইল, পুমপত্যের সহিত প্রভেদ করিবার জন্য স্ত্র্যপত্যে পুত্রী শব্দের প্রয়োগ হইতে লাগিল, অমনি বিধি হইল—

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ,"

পুত্রের ন্যায় কন্যাকেও প্রতিপালন করিবে, এবং অতিযত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।"

স্ত্রীশিক্ষার প্রণালী—তর্কালঙ্কার মহাশয় বলেন—"অন্যান্য বিদ্যাশিক্ষার ন্যায় গৃহকার্য্যাদি শিক্ষা স্ত্রীদিগের অতীব প্রয়োজনীয়। ইদানীন্তন শিক্ষিতা স্ত্রীদিগের মধ্যে অনেকে গৃহকার্য্যাদি বিষয়ে তত অভিজ্ঞা নহেন, অনেকে আবার দুইচারিখানা পুস্তক পড়িয়া এবং সামান্য শিল্পকর্ম্ম শিক্ষা করিয়া অভিমানে স্ফীতা হন, গৃহকর্ম্ম বা রন্ধনাদি অপমানকর বিবেচনা করেন, শ্বশ্রূ ও ননন্দা প্রভৃতি রন্ধনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ

করেন, ভৃত্য দ্বারা অন্যান্য গৃহকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়, অধিক কি তাঁহাদের সন্তান পালনাদি কার্য্যেও ধাত্রী নিয়োগ আবশ্যক হইয়া উঠে।" * * * আমরা এই অপ্রিয় সমালোচনার পুনরুল্লেখে এখানেই নিবৃত্ত হইলাম।

অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী—"অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার প্রণালীও আশাপ্রদ নহে, * * * দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় রাজকীয় হস্তাবলম্বন ব্যতীত কোনও বিষয়ের উন্নতির আশা করা যায় না। রাজকীয় বৃত্তি সংস্থাপিত হইলে অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার কতকটা উন্নতির আশা করা যাইতে পারে। সর্ব্বতোভাবে কুলবধূদিগের পবিত্রতা ও লজ্জাশীলতা রক্ষা করিয়া সচ্চরিত্রা শিক্ষিতা ললনা দ্বারা (নিতান্ত অসম্ভব হইলে সচ্চরিত্র বিশ্বস্ত শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের দ্বারা) অন্তঃপুরেই কুলবধূদিগের পরীক্ষা গৃহীত হইলে, এবং গুণনির্ণায়ক বর্ণপরম্পরাসংবদ্ধ রাজদত্ত অলঙ্কারাদি পারিতোষিক, পরীক্ষার ফলানুসারে তাঁহাদিগকে প্রদত্ত হইলে প্রিয়মণ্ডনা কুলাঙ্গনাদিগের মধ্যে প্রতিযোগিতা আবির্ভূত হইবে। তদ্দ্বারা অনেকটা উন্নতি হইতে পারে। যিনি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে শিক্ষালাভ না করিবেন, তিনি গৃহকর্ত্রী হইতে পারিবেন না, আপাততঃ শিক্ষিত পরিবার মধ্যে এরূপ নিয়ম অবলম্বিত হইলে ভাল হয় এইরূপ নিয়ম হইলেও কিয়ৎপরিমাণে অন্তঃপুর-স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির আশা করা যাইতে পারে।"

প্রাথমিক স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী—"প্রচলিত প্রাথমিক স্ত্রীশিক্ষা প্রণালীও সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। অধুনা স্থানে স্থানে 'বালিকা বিদ্যালয়' নামে কতকগুলি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে ও হইতেছে। ইহার শিক্ষকতা ও তত্ত্বাবধান প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই পুরুষদিগের হস্তে ন্যস্ত। বালিকাগণ সাধারণতঃ এই সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়। এ প্রণালী বিশুদ্ধ নহে। * * * সত্য বটে ভবভূতির আত্রেয়ী উদগীথ বিদ্যা অধ্যয়নের জন্য কখন বাল্মীকির তপোবনে, কখনও দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিদিগের পর্ণকুটীরে বিচরণ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি পরিব্রাজিকা, পক্ষান্তরে ভারতসীমন্তিনী অবরোধবাসিনী। অবরোধবাসিনীদের পক্ষে পরিব্রাজিকার দৃষ্টান্ত প্রযুক্ত হইতে পারে না। * * * অবরোধবাসিনীদের পক্ষে ঈদৃশ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করা সৎ যুক্তির অনুমোদিত হইবে না। বালিকাদিগের লজ্জাশীলতা উহা দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে শিথিল হইয়া পড়ে। প্রাচীনকালে রাজা এবং ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের 'কন্যকান্তঃপুরে' নর্ত্তনাগার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত থাকিত, তাঁহারা এবং প্রতিবেশিনী ভদ্রবালিকাগণ তথায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেন।"

স্ত্রীশিক্ষার সমীচীন প্রণালী—"ভারত-ললনাদিগের পক্ষে বাল্যকালে পিতা ও বিবাহের পরে স্বামীই উপযুক্ত শিক্ষক। ভগবান্ মনু এ বিষয়ে এইরূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন—

"বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ।
পতিসেবা গুরৌবাসো গৃহার্থোঽগ্নি পরিক্রিয়া॥"

স্ত্রীদিগের উপনয়ন-সংস্কার স্থানে বৈবাহিক বিধি, গুরুকুল বাসস্থানে পতিসেবা, এবং অগ্নিপরিচর্য্যা স্থানে গৃহকার্য্য বিহিত হইয়াছে। বিদ্যাশিক্ষার জন্যই উপনয়ন সংস্কার ও গুরুকুল-বাসের বিধি। সুতরাং স্ত্রীদিগের উপনয়ন স্থানে বিবাহাদি বিধান দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে বালক যেমন পিতার নিকট সামান্য শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া উপনীত, এবং উপনীত হইয়া গুরুকুলে বাস পূর্ব্বক গুরুর নিকট সম্যক্‌রূপে শিক্ষিত হয়, বালিকাও তেমনি পিতার নিকট সামান্য শিক্ষালাভ করিয়া বিবাহিতা হইবে, বিবাহিতা হইয়া পতির নিকট বিশেষরূপে শিক্ষালাভ করিবে। এই রীতির সমীচীনতা বুদ্ধিমানদিগকে বলিয়া দিতে হইবে না।"

স্ত্রীজাতির পাঠ্য—"কেহ কেহ বলিয়া থাকেন—সাহিত্য প্রভৃতি সহজ সহজ বিষয়গুলিই কোমল-প্রকৃতি মহিলাদিগের পাঠ্য হওয়া উচিত। গণিত দর্শন

বিজ্ঞান প্রভৃতি কঠিন কঠিন বিষয় তাহাদের পাঠের উপযুক্ত নহে। এই মত যুক্তি সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। বালকদিগের কোমল অন্তঃকরণে যে সমস্ত বিদ্যাবীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে, বালিকাদিগের অন্তঃকরণে তাহা হইতে পারিবে না, ইহার কোনও কারণ লক্ষিত হয় না। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় সকল বুঝিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই ইহাও নিষ্প্রমাণক। * * * ফলতঃ রুচি অনুসারে সকল বিষয়ই স্ত্রীজাতির শিক্ষণীয় হইতে পারে।

ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিলেও এই সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীকৃত হয়। খনার জ্যোতির্ব্বিদ্যার বিষয় সকলেই অবগত আছেন। লীলাবতী গণিত ও খগোলাদি কঠিন বিষয়ের আলোচনা করিতেন, বিশালদেবী প্রভৃতি মহিলাগণ ধর্ম্মশাস্ত্রের উৎকৃষ্ট 'নিবন্ধ' প্রণয়ন করিয়াছেন। পুরা-তত্ত্বানুসন্ধায়ীদিগের মতে সুপ্রসিদ্ধ মিতাক্ষরা গ্রন্থের টীকাকর্ত্রী "বালম্ভট্ট" স্ত্রীলোক। "বালম্ভট্ট" তাঁহার উপাধি মাত্র। রাজমহিষীগণ সন্ধিবিগ্রহ সংক্রান্ত মন্ত্রণা প্রদান করিতেন, ঋষিদিগের প্রশান্ত তপোবনে ঋষিপত্নী দিগের নানাবিধ শাস্ত্রতত্ত্বের সমালোচনা অনেকেই জানেন। 'মৈত্রেয়ী', 'গার্গী' প্রভৃতি ভারতসীমন্তিনীগণ স্বামীর সহিত ব্রহ্মতত্ত্বের সমালোচনা করিতেন, এবং ঐ বিষয় লইয়া দম্পতির মধ্যে বিলক্ষণ দার্শনিক তর্কবিতর্ক হইত। ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

পাঠকগণ, আপনারা দেখিলেন ভারতবাসী আর্য্য-গণ রমণীজাতির প্রতি কিরূপ উদার ব্যবহার করিতেন, —ভারতের আর্য্য বিদুষীগণ অন্যান্য বিদ্যার সঙ্গে ধর্ম্ম শাস্ত্রের—ভারতীয় সমাজের একমাত্র নিয়ন্তা স্মৃতি বা আইন শাস্ত্রের শুধু সমালোচনা করিতেন এমন নহে, তাঁহারা স্মৃতি বা ভারতীয় আইন শাস্ত্রের 'নিবন্ধ' রচনা করিয়া গিয়াছেন। আর অসংখ্য শিক্ষিত অশিক্ষিত ভারতবাসী, সেই শাস্ত্র বেদবৎ প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। একটী রমণীর অঙ্গুলি-সঙ্কেতে সমগ্রভারতের আর্য্যসমাজ নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। এই ভারতেরই একজন কবি বলিয়াছিলেন—

"গুণাঃ পূজাস্থানং গুণিষু নচলিঙ্গং নচ বয়ঃ"

ভারত চিরকাল গুণের পূজা করিয়াছে—বর্ত্তমান যুগে যে পাশ্চাত্য সমাজ স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার ধ্বজা উড়াইয়া নিজদের উদারতা ও গৌরব খ্যাপনের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীজাতির প্রতি অনুদার ভাব পোষণ করিবার অপবাদে ভারতবাসীদিগকে 'বর্ব্বর' আখ্যা প্রদান করিতেও লজ্জা বোধ করা আবশ্যক মনে করেন না, কৈ তাঁহাদের দেশের স্বাধীনতা ও শিক্ষাপ্রাপ্ত রমণীগণকে আজিও আইন সভার সংস্রবে মিশিতে দেওয়া হইল না কেন? স্ত্রীজাতির এই অধিকার লইয়া তাঁহাদের সভ্যদেশে প্রতিদিন কি সব লজ্জাকর কাণ্ডের অভিনয় হইতেছে তাহা কাহারও অবিদিত নহে!—কোন দেশের আদিম শাস্ত্র এমন তারস্বরে প্রচার করিয়াছে—

"অর্দ্ধো বা এষপুরুষো যাবজ্জায়াং ন বিন্দতে।
অথ জায়াং বিন্দতে অথ পূর্ণোভবতীতি" ?

প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা প্রভৃতির গোড়ার পার্থক্য লক্ষ্য না করিয়া যাঁহারা নিন্দা করেন বা প্রশংসা করেন, তাঁহাদের নিন্দা-স্তুতির কোনও মূল্য আছে বলিয়া স্বীকার করা যায় না। যাহা-হউক আমরা স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মতামত ব্যক্ত করিতে চেষ্টা পাইলাম, চেষ্টা কতদূর সার্থক হইয়াছে বলিতে পারি না।

তর্কালঙ্কার মহাশয় স্ত্রীজাতির অজ্ঞানান্ধকার দূর করিবার জন্য তাঁহাদের অজ্ঞতাপ্রসূত সমাজের অধিকংশ দুঃখ দুর্দ্দশার মূল উচ্ছিন্ন করিবার জন্য তখনকার দিনের অনেকেরই মতের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি স্ত্রীশিক্ষার যে উন্নত আদর্শ কল্পনা করিয়াছিলেন, হিন্দু সমাজ সেই রূপ স্ত্রীশিক্ষার অবশ্যই পক্ষপাতী। আমাদের সমাজসংস্কারকগণ, সেইরূপ লজ্জাসম্ভ্রমশীলা গৃহিণীপদের যোগ্যশিক্ষিতা সীমন্তিনী প্রস্তুত করিবার জন্য চেষ্টা করিলে ভারতের আদর্শ অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

বিদেশীয় আদর্শে পুরুষের শিক্ষাই যে দেশে তেমন সুফল প্রসব করিতে পারে নাই, সেই দেশে রমণীগণের পক্ষে বিদেশের আদর্শ যে কতটুকু সুবিধাজনক হইবে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। বিদেশীয় রমণীগণের আদর্শ আমাদের এই দুঃখদারিদ্র্যময় সম্মিলিত পরিবারের দেশে মোটেই খাপ্ খাইবে না। ইহা আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রাচ্য প্রাচ্যই, উহা পাশ্চাত্য নহে! যাহাহউক স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ গঠন সম্বন্ধে আমাদের সমাজ সংস্কারকগণ চিন্তা করিতে থাকুন, ততক্ষণ আমরা আমাদের 'গৃহলক্ষ্মী' গণের নিকট আমাদের কয়েকটী বিনীত নিবেদন 'পেশ' করিয়া বর্ত্তমান প্রস্তাব পরিসমাপ্ত করিব। তোমরা আমাদিগকে স্বার্থপরই বল আর যাহাই বল, আমাদের প্রাণের কথা—হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা তোমাদের কাছে না বলিয়া থাকিতে পারি না, তাই বলি, আমরা তোমাদের কাছে 'শেলি' 'বায়রণ' হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র বা দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথের কাব্য-কাহিনী শুনিয়া, তোমাদের দর্শন বিজ্ঞান বা গণিত ইতিহাসের চমৎকার বিশ্লেষণ বা মীমাংসা শক্তি অবলোকন করিয়া রাজনীতি, সমাজনীতি বা ধর্ম্মনীতির কূটতর্কের ফেনিল আবর্ত্তে তোমাদিগকে আকণ্ঠ মজ্জিত থাকিতে দেখিয়া তেমন সুখী হইতে পারিব না, যদি সারাদিনের কর্ম্মক্লান্ত দেহ ও 'অভাব অনটনে' ততোধিক অবসন্ন হৃদয়ের সকল ভার তোমাদের সেবা ও প্রসন্নতার কোলে ঢালিয়া দিয়া শান্তিলাভ করিতে না পারি!

রমণীগণ! যদি তোমরা ত্যাগে ও সংযমে, স্নেহে ও কর্ত্তব্য জ্ঞানে, সেবা ও কর্ম্মে আমাদের অহরহঃ ক্ষীয়মাণ জীবনী শক্তি উজ্জীবিত করিয়া তুলিতে না পার, যদি তোমাদের মহান্ আদর্শ ও চরিত্র-সম্পদের গুণে আমাদের বিভিন্ন ভাব ও চরিত্রময়—এক কথায় "নানামুনির নানা মতের" মত—উচ্ছৃঙ্খল পরিবার বর্গকে একটী স্নেহের সূত্রে, ঐক্যের বন্ধনে, ও প্রেমের নিগড়ে না আবদ্ধ করিতে পার, যদি তোমরা একাধারে মাতৃত্ব, সখিত্ব, কর্ত্তৃত্ব বা গৃহিণীত্ব * অবলম্বন করিয়া আমাদের চিরদুঃখময় সংসারে স্বর্গের নন্দন কানন রচিয়া তুলিতে না পার, যদি তোমাদের সন্তান সন্ততিগণ তোমাদের মহত্বে অনু-প্রাণিত হইয়া দেশের আশাভরসার স্থল হইতে না পারে, তাহারা যদি চিরকাল তেমনি জ্বরে 'সাগু' আর সুস্থতায় পান্ত (অবশ্য সকল পরিবার নহে) মাত্র পাইয়াই জননীকে মাতৃত্বের দায় হইতে মুক্তি দিতে শিক্ষা পায়, আর তোমরাও যদি মাতৃত্ব ও গৃহিণীত্বের যোগ্যতা লাভের উপযুক্ত ত্যাগটুকু স্বীকার করিতে ইতস্ততঃ কর, পরন্তু নিজেদের ভোগ ও বিলাসকে, স্বামী ও পুত্র কন্যাগণকেই সকলকার চাইতে বড় করিয়া দেখ, তোমাদের গৃহধর্ম্ম, তোমাদের নারী ধর্ম্ম, তোমাদের অতিথি-সেবা, তোমাদের গোসেবা,—তোমাদের নারায়ণ-সেবা প্রভৃতিকে যদি তোমরা আত্মসেবা বা আত্মরতির চাইতে ছোট বলিয়া মনে কর, তবে তোমাদের কোন বিদ্যাই তোমাদিগকে মুক্তির পথে লইয়া যাইতে পারিবে না। যে সকল ভাব তোমাদের নারীত্বের দ্যোতক, যাহাদের লইয়া তোমরা মাতা, ভগিনী, গৃহিণী ও দেবী, তোমরা নিশ্চয় জানিও সেই সকল ভাব ও ধর্ম্ম লইয়াই তোমাদের নারীত্বের সার্থকতা, এবং এই নারীত্বের সার্থকতাই নারীজাতির মুক্তি।

যে বিদ্যা তোমাদের নারীত্বের সার্থকতা সম্পাদন করিবে, তোমরা সেই বিদ্যার অনুশীলন করিও, কিন্তু দেখিও যাহা লইয়া তোমাদের সংসার, যাহা লইয়া তোমাদের গৌরব, সেই সেবা সংযম ত্যাগ ও ধর্ম্মের

---

* "সচিবঃ * * * প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ" এ কথাটী আর তুলিলাম না। রহস্য সচিবত্ব আর 'ললিত কলাবিধির' অন্ততঃ অপরিপুষ্ট অনুকরণে বর্ত্তমান ভারত বিশেষতঃ নব্যবঙ্গ একপ্রকার অস্থির!—

ক্ষমার্হ প্রবন্ধ লেখক।

মূলে কুঠারাঘাত করিও না। যে ভাব ও যে আচার তোমাদের ভারতীয় প্রকৃতির অনুরূপ বা অনুকূল, তাহাই তোমাদিগকে মুক্তির পথে লইয়া যাইবে।

"নান্যঃপন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"।

শ্রীকালীকৃষ্ণ সিদ্ধান্ত শাস্ত্রী।

পঞ্চরাত্র

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ভীষ্ম। হাঁ, বিগতশ্রম করাবেন বৈ কি।

তুমি যজ্ঞে দীক্ষিত হ'য়ে তরুণবয়স্ক ব্রাহ্মণ-প্রদত্ত সোমরস পান করেছ—তুমি যশস্বী এবং রাজচ্ছত্রের ছায়া উপভোগ ক'রে থাক। ক্ষত্রিয়গণের আচার্য্য যে স্থলে দরিদ্র সে স্থলে দ্রব্য, ফল বা বিশিষ্টতার আবার বিচার কি? *

দুর্য্যো। আচার্য্য, আপনার কি ইচ্ছা আজ্ঞা করুন। আদেশ করুন, আমাকে কি কত্তে হবে।

দ্রোণ। পুত্র দুর্য্যোধন, এই বলছি।

দুর্য্যো। আপনি আবার কি চিন্তা কচ্ছেন, প্রভো? আমি আপনার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর, আপনিই আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন, আমি শূরের মধ্যে গণ্য, সাহসের কাজও আমি অনেক করেছি। আপনার যা' ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে বলুন; বলুন আমাকে কি দক্ষিণা দিতে হবে। যতক্ষণ আমার হস্তে গদা আছে ততক্ষণ সমস্তই আপনার হস্তগত আছে মনে করবেন।

দ্রোণ। পুত্র, বলব বৈ কি। এই বল্‌ছি, শুধু বাষ্পবেগে আমার কণ্ঠরোধ হ'য়ে আসছে।

* কিং তদ্ দ্রব্যং, কিং ফলং, কো বিশেষঃ
ক্ষত্রাচার্য্যো যত্র বিপ্রো দারিদ্রঃ।—
এ সকলের বিচার না ক'রেই দান কত্তে হবে।

সকলে। কি! আচার্য্যও অশ্রুবিসর্জ্জন কচ্ছেন!

ভীষ্ম। পৌত্র দুর্য্যোধন, তোমার পরিশ্রম নিষ্ফল হ'ল দেখছি।

দুর্য্যো। কে আছ এখানে?

ভটের প্রবেশ

ভট। মহারাজের জয় হ'ক।

দুর্য্যো। জল নিয়ে এস।

ভট। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ

মহারাজের জয় হ'ক। জল এনেছি।

দুর্য্যো। নিয়ে এস। (কলশ গ্রহণ)

আচার্য্য. অশ্রুপাতে আপনার মুখ কলুষিত হ'য়েছে, ধুয়ে ফেলুন।

দ্রোণ। হাঁ, তাই বটে। এখন আমার মুখ ধোয়াই কর্ত্তব্য।

দুর্য্যো। হা ধিক্!

আচার্য্য. আমার পূর্ব্ব শঠতার কথা মনে ক'রে যদি আমাকে সন্দেহ করেন, অথবা কৃত প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করব না যদি আপনার মনে এরূপ সন্দেহ হ'য়ে থাকে, তা'হ'লে শত শত শর-প্রহারে আপনার যে হস্ত কঠিন হ'য়েছে সেই হাতখানি বাড়িয়ে দিন, এই জলই দান-গ্রহণের প্রধান উপাদান † হ'ক।

দ্রোণ। বেশ। এখন আমি আশ্বস্ত হ'লেম। পুত্র শ্রবণ কর—

যারা নিরাশ্রয়, দ্বাদশ বৎসর যাদের গতিবিধির কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নি, সেই পাণ্ডবদিগকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান কর—ইহাই আমার ভিক্ষা ও দক্ষিণা।

শকুনি। (উদ্বেগের সহিত) মশায়, এরূপ বলবেন না। যে শিষ্য আপনার গৌরব-সম্পাদনে চেষ্টিত, যে শিষ্য আপনাকে বিশ্বাস করে, ও যে শিষ্য এখন আপনার সম্মুখেই দাঁড়িয়ে রয়েছে তার কাছে সে যা প্রদান কত্তে প্রস্তুত নয় এইরূপ প্রস্তাব ক'রে ধর্ম্মবঞ্চনা করবেন না।

† প্রতিজ্ঞা স্বরূপ।

দ্রোণ। বলি ধর্ম্মবঞ্চনা কেমন ক'রে হ'ল। শকুনি, তুমি গান্ধার দেশের রাজা ব'লে নিজকে বড় মনে কচ্চ. এবং সকলকেই নিজের মত ভাবচ। *

ভাইদের ন্যায্য প্রাপ্য পৈতৃক রাজ্য দিতে বলছি এটা বঞ্চনা হ'ল বটে! বলি তারা ভিক্ষা চেয়েছে ব'লে কি রাজ্য তাদের দান করা হচ্ছে. না তারা জোর ক'রে রাজ্যটা কেড়ে নিচ্ছে?

সকলে। না. না. জোর ক'রে নেবে কেন! এ কি কথা!

ভীষ্ম। পৌত্র দুর্য্যোধন, তুমি এখন যজ্ঞশেষে স্নান করেছ এটা যেন মনে থাকে। † সুতরাং যার মুখের কথাটি মাত্র মিত্রের কথার ন্যায় ‡ এই রকম শকুনির কথা এখন তোমার শোনা উচিত নয়। পৌত্র ভেবে দেখ—

দ্রৌপদীর সঙ্গে পাণ্ডবেরা যে দুর্গম বনে ধূলিধূসরিত পদে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তুমি যে তাদের প্রতি বিমুখ, এবং তারাও যে তোমার প্রতি বাম—এই সকলের একমাত্র কারণ শকুনির অসহনীয় অহঙ্কার।

দুর্য্যো। বেশ, আচার্য্য, ধ'রে নিলুম এ কথা ঠিক। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

দ্রোণ। পুত্র, স্বচ্ছন্দে বল।

দুর্য্যো। আচ্ছা পূর্ব্বে যে সভার মধ্যে তাদের অপমান করা হ'য়েছে বলছেন এবং রাজ্য সম্বন্ধে তাদের উপর অন্যায় হ'ল বলছেন তারা ত তখন ইচ্ছা কল্লে বলপ্রয়োগ কত্তে পাত্ত, তবু তারা ক্রোধ প্রকাশ কল্লে না কেন?

দ্রোণ। এই বিষয়ে যে যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, এবং ধর্ম্মচ্ছলে যাকে বঞ্চনা করা হ'য়েছে, তাকেই জিজ্ঞাসা করা উচিত।

যখন ভীম সভাগৃহের একটি স্তম্ভ প্রায় তুলছিলেন তখন যুধিষ্ঠিরই তাকে বারণ করেছিলেন। যদি সেই স্তম্ভ (তখন) সেখানে একজনের উপর পড়ত তা'হ'লে শকুনির কি হ'ত? *

ভীষ্ম। 'উদোর পিণ্ড বুধোর ঘাড়ে গেল' † দেখছি। আচার্য্য, এ বড় গুরুতর বিষয়। কলহ করা উচিত নয়।

দ্রোণ। তাই ব'লে অপমানের দান নোব না ‡। কলহই হ'ক।

ভীষ্ম। আচার্য্য, প্রসন্ন হ'ন। পৌত্র দেখ,

যারা দুর্ব্বল, বিপন্ন ও নিরাশ্রয় তারাই অনুগ্রহ চায়, অহঙ্কার করে না। তুমি ক্ষমতাশালী (শ্রেষ্ঠ), তুমি (তাদের) আত্মীয়, তোমার কাছে তারা যাচক। তুমি কি তাদের বাঁচাবে, না তারা বনে বনে পশুর সঙ্গে থাকবে?

শকুনি। বেশ, পশুর সঙ্গেই থাকুক।

কর্ণ। আচার্য্য, রাগ ক'রে ফল নাই। এ দুর্য্যোধন। ভাল কথা জোর করে শোনাতে চাইলে রেগে যায়। আর সামনে ভাল লোকের গুণ কীর্ত্তন

* "গান্ধার-বিষয়বিস্মিত! শকুনে! ত্বমনার্য্যভাবাৎ সর্ব্বলোকমনার্য্যমিতি মন্যসে?"—'বিষয়' শব্দটি দ্ব্যর্থক—দেশ এবং সম্পত্তি। তাৎপর্য্য এই—

(১) তুমি গান্ধার দেশের রাজা, সুতরাং নিজকে বড় মনে ক'রে লঘু-গুরু বিচার না ক'রে মুখে যা আসচে তাই বলচ। (২) তুমি গান্ধার দেশের লোক সুতরাং অনার্য্য (গান্ধার দেশে তখন অনার্য্যদিগের বসতি ছিল বুঝিতে হইবে) কাজেই নিজে যেমন অনার্য্য তেমনি অন্যকেও নিজের মত অনার্য্য ভাবে পূর্ণ মনে কচ্ছ।

† তাৎপর্য্য, এখন তুমি পাশা খেলছ না।

‡ "মিত্র মুখস্য," পড়িলে 'বিষকুম্ভ পয়োমুখ' কথা মনে আসে।

* 'ন শকুনিরাক্ষিপেৎ'—শকুনির আক্ষেপের কিছু কারণ হইত না। মরিলে তোমাদের ভাইদের মধ্যেই কেহ মরিত।

† "অন্যৎ প্রস্তুতমন্যদাপতিতম্"—কথা হচ্ছিল এক বিষয়ে এখন গেল অন্য বিষয়ে।

‡ "অত্র কদর্থং ন কার্য্যং"—কুৎসিৎ যাচ্ঞা করব না।

শুনতে পারে না। শিষ্যের কাজ কত্তে উদ্যত হয়েছেন—কাজ যে প্রায় পণ্ড হ'ল। কাজটি যাতে কত্তে পারেন তারই চেষ্টা করুন। দুষ্ট হাতীকে যেমন নরম হ'য়ে চালান যায় (দুর্য্যোধনকেও) সেই রূপে চালাতে চেষ্টা করুন।

দ্রোণ। বৎস কর্ণ, ব্রাহ্মণের তেজ এখনও লুপ্ত হয় নি। সময় থাকতেই সাবধান করেছ। আমি তোমার ইচ্ছা মতই কাজ করব। বৎস দুর্য্যোধন, তোমার উপর কি আমার প্রভুত্ব খাটে না?

ভীষ্ম। (স্বগত) হাঁ, এখন পথে এসেছে। মিষ্ট কথাই দুষ্টের ঔষধ।

দুর্য্যো। কেবল আমার উপর কেন, আমার বংশের উপরও আপনার প্রভুত্ব খাটে।

দ্রোণ। হাঁ, তোমার উপযুক্ত কথাই বলেছ। পুত্র, তোমাকে আমি যদি বঞ্চনা করি তা হ'লেও তোমার কোন দোষ হবে না। তোমাকে যদি আমি পীড়ন করি তা'হলেও তোমার লাভ। মহাবংশে যে পরস্পর মনান্তর থাকে ধর্ম্মকথায় তা দূর হয়।

দুর্য্যো। হাঁ, পরামর্শ কত্তে হবে।

দ্রোণ। কার সঙ্গে, পুত্র? ভীষ্মের সঙ্গে, কি কর্ণের সঙ্গে, কি সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের সঙ্গে, কি অশ্বত্থামার সঙ্গে, কি বিদুরের সঙ্গে, কি পিতার সঙ্গে, কি ভাইদের সঙ্গে—কার সঙ্গে পরামর্শ কত্তে চাও বল।

দুর্য্যো। না, এঁদের সঙ্গে নয়। মাতুলের সঙ্গে।

দ্রোণ। কি! শকুনির সঙ্গে! (স্বগত) তা, হ'লেই সব মাটি হ'ল।

দুর্য্যো। মাতুল, এদিকে আসুন। বয়স্য কর্ণ, এদিকে এস।

দ্রোণ। (স্বগত) আচ্ছা তা'হ'লে এক কাজ করা যা'ক। (প্রকাশ্যে) বৎস গান্ধাররাজ, এদিকে এস।

শকুনি। এই যে, এসেছি।

দ্রোণ। বৎস, জীবনে যথেষ্ট ক্রোধ প্রকাশ করেছ। এখন দিন ত প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। ব্রাহ্মণের চপলতা থাকেই, কিছু মনে করো না। কোলাকুলি করলেই রুক্ষ কথার দোষ শান্তি হয়।

ভীষ্ম। (স্বগত) শিষ্যের স্নেহের বশবর্ত্তী হ'য়ে গুরু দ্রোণ শকুনিকেও অনুনয় কচ্ছেন। কিন্তু শকুনিকে শান্ত কত্তে চেষ্টা কল্লেও সে কুটিলতা ছাড়বে না।

শকুনি। (স্বগত) হাঁ, আচার্য্যও শঠ কম নয়। কার্য্যসিদ্ধির জন্য আমাকে শান্ত কত্তে চেষ্টা কচ্ছেন।

[আসিয়া সকলের উপবেশন।

দুর্য্যো। পাণ্ডবদের রাজ্যের অর্দ্ধেক দেওয়া সম্বন্ধে আপনার কি মত।

শকুনি। আমার মত না দেওয়া।

দুর্য্যো। মাতুল, 'দেওয়াই' কর্ত্তব্য এ কথাই আপনার বলা উচিত।

শকুনি। যদি রাজ্য দেওয়াই তোমার অভিপ্রায় তা'হ'লে আমাদের সঙ্গে অবার পরামর্শ কেন? সবটাই দিয়ে দাও—অর্দ্ধেক আর কেন?

দুর্য্যো। বয়স্য অঙ্গরাজ, তুমি ত কিছু বলছ না।

কর্ণ। এখন আমার কি বলবার আছে। ভাইয়ে ভাইয়ে যে ভাব—রাম যা দেখিয়ে গেছেন, এবং নিজে পালন করছেন, সেই ভাব আমি নষ্ট কত্তে ইচ্ছুক নই। ক্ষমা করা উচিত কি না, কিংবা কাকে ক্ষমা কত্তে হবে ইত্যাদি বিষয় আপনিই বিচার করবেন। আমরা যুদ্ধের সময় আপনার সহায়।

দুর্য্যো। মাতুল, এমন একটা দেশের নাম বলুন ত যেখানে প্রজাগুলি ভাল নয়, যেখানে শস্য জন্মে না। সেখানেই না হয় পাণ্ডবেরা থাকবে।

শকুনি। শোন বলি,

আমার মতে কিছুই দেওয়া উচিত নয়। পার্থের

চাইতে পরাক্রমশালী আর কে আছে! মরুভূমি হ'লেও যুধিষ্ঠির যেখানে রাজা সেখানে শস্য হবে।

দুর্য্যো। মাতুল, এখন আমি গুরুর হাতে জল দিয়েছি। কুলবৃদ্ধদের মতে ইহার অন্যথা করা উচিত নয়। সুতরাং আমার পক্ষে ভাল নীতিই হ'ক আর মন্দ নীতিই হ'ক এই জলের (সত্যের) মর্য্যাদা আমি রাখব।

শকুনি। অসত্য বিষয় থেকে তোমার মুক্ত হওয়া উচিত।*

দুর্য্যো। হাঁ, মাতুল।

শকুনি। তা'হ'লে এদিকে এস। (আসিয়া) আচার্য্য, কুরুরাজ আপনাকে জিজ্ঞাসা কচ্ছেন—

দ্রোণ। বৎস গান্ধাররাজ, স্বচ্ছন্দে বল।

শকুনি। যদি পাঁচ রাত্রের মধ্যে পাণ্ডবদের কোন খবর পাওয়া যায় তা'হ'লে দুর্য্যোধন বলছেন পাণ্ডবদের রাজ্যার্দ্ধ দেবেন। সুতরাং তাদের খবর আনুন।

দ্রোণ। যারা ছলনা কত্তে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'য়েছে তারাই বার বৎসর যাদের কোন সংবাদ পেল না, পাঁচ রাত্রের মধ্যে আমাকে তাদের খবর নিয়ে আসতে হবে! এর চাইতে "বরং রাজ্য দেওয়া হবে না" এ কথা পরিষ্কার ক'রে বল না কেন?

ভীষ্ম। পৌত্র দুর্য্যোধন, ধর্ম্মের মধ্যে ছলনা থাকতে নেই। আমরা সকলেই তোমার কার্য্যে সন্তুষ্ট হয়েছি। পৌত্র দেখ, এক বৎসরের মধ্যেই হ'ক আর শত বৎসরের মধ্যেই হ'ক, পাণ্ডবদিগকে অর্দ্ধেক রাজ্য দাও। হে বীর, কুরুবংশীয়েরা সর্ব্বদাই প্রতিজ্ঞা পালন ক'রে থাকে। তুমিও সত্য পালন কর।

দুর্য্যো। যা বলেছি তাই ঠিক।

দ্রোণ। (স্বগত) হনুমান যেমন সাগর লঙ্ঘন ক'রে নষ্ট সীতার সংবাদ এনেছিলেন এস্থলে আমার আকাঙ্ক্ষাও হনুমানের দশা প্রাপ্ত হ'ল দেখছি। কোথা থেকে পাণ্ডবদের সংবাদ আনব?

ভট। মহারাজের জয়। বিরাট নগর থেকে একজন দূত এসেছে।

সকলে। শীঘ্র সভায় নিয়ে এস।

ভট। যে আজ্ঞা।

ভটের প্রবেশ

দূত। মহারাজের জয়।

সকলে। বিরাট-রাজ কি এলেন?

তিনি বড় বিষণ্ণ, তাই আসতে পারেন না। রাজার সম্বন্ধী কীচক ও কীচকের যে একশত ভাই তাঁর কাছে থাকতেন তাদিগকে কে রাত্রিকালে গুপ্তভাবে শুধু বাহু দিয়ে পিষে মেরে ফেলেছে! দেখে বোধ হয় শস্ত্রের আঘাতে মৃত্যু হয় নি।

ভীষ্ম। কি! শস্ত্রের আঘাতে মৃত্যু হয় নি! (স্বগত) আচার্য্য, পাঁচ রাত্রি স্বীকার করুন।

দ্রোণ। কেন?

ভীষ্ম। নিশ্চয় বাহুশালী ভীমেরই এই কাজ! এই শত ভাইর উপর যে রাগটা ছিল, সেই রাগটা সেই শত ভাইর উপর প্রকাশিত হয়েছে।

দ্রোণ। কি ক'রে বুঝলেন?

ভীষ্ম। বংশে যারা অভিজ্ঞ তাদের বালকসুলভচঞ্চলতা থাকে না। বাছুরের কোথায় শিং উঠবে ষাঁড় তা জানে।

দ্রোণ। কি ষাঁড়! বটে! তা হ'লে কার্য্য সিদ্ধ হ'ল। (প্রকাশ্যে) পুত্র দুর্য্যোধন, আচ্ছা পাঁচ রাত্রই স্বীকার।

দুর্য্যো। বেশ।

দূতের প্রবেশ

দ্রোণ। যে সকল রাজা যজ্ঞ দেখতে এসেছেন সকলে শুনুন। এই কুরুরাজ দুর্য্যোধন—না না মাতুলের সহিত এই কুরুরাজ দুর্য্যোধন—বলছেন যদি পাঁচ রাত্রের মধ্যে পাণ্ডবদের সংবাদ পাওয়া যায় তা'হ'লে অর্দ্ধেক রাজ্য তাদিগকে ছেড়ে দেবেন। পুত্র, বটে ত।

* 'অনৃতবচনাম্মোচয়িতব্যো ভবান নন্থ'—শকুনি এক ভাবে বলিলেন, দুর্য্যোধন আর এক ভাবে বুঝিলেন।

দুর্য্যো। হাঁ।

দ্রোণ। আচ্ছা, এই খা দুই তিন বার বল।

শকুনি। আচ্ছা, সময় হ'লে বুঝব।

দ্রোণ। গাঙ্গেয়, শুনলে ত ?

ভীষ্ম। (স্বগত)

যখন আচার্য্যের আনন্দ ধৈর্য্য অতিক্রম ক'রে প্রকাশিত হয়েছে তখনই বুঝেছি যিনি বঞ্চিত হ'তে যাচ্ছিলেন তিনিই দুর্য্যোধনকে এস্থলে বঞ্চনা কল্লেন। (প্রকাশ্যে) পৌত্র দুর্য্যোধন, বিরাটের সঙ্গে আমার শত্রুতা আছে। ইহা তোমরা কেউ জান না। আবার বিরাট তোমার যজ্ঞ দেখতেও এলেন না। অতএব তাঁর সমস্ত গরু নিয়ে আসা যা'ক। (স্বগত) হে সরলবুদ্ধি ব্রাহ্মণ, পাণ্ডবেরা রথের শব্দ শুনে, ধর্ষিত হ'য়ে ক্রুদ্ধ হবে। তাদের কৃতজ্ঞতা আছে। জোর ক'রে গরু আনতে গেলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

ভটের প্রবেশ

ভট। রথ ও বাহন সজ্জিত হ'য়ে বিরাটের গো-গৃহে গমন কত্তে উদ্যত হয়েছে।

দুর্য্যো। এ সকল রথ নিয়ে গিয়ে সত্বর বিরাটের গরুগুলি নিয়ে এস। যজ্ঞের সময় গদা শাস্তি ভোগ করেছে, এখন আবার হাতে নিব।

দ্রোণ। লোক পাঠিয়ে দাও আমার রথও নিয়ে আসুক।

শকুনি। আমার হাতী নিয়ে এস।

কর্ণ। যুদ্ধ সামগ্রী ব'য়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ঘোড়ার রথ নিয়ে এস।

ভীষ্ম। বিরাট-নগরে যাওয়ার জন্য আমার মন (বুদ্ধি) ব্যগ্র হয়েছে। ধনুটাও যাওয়ার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করুক।

সকলে। আমরা সকলে আপনার আজ্ঞাকারী। আপনি এখানে থাকুন। শুধু অস্ত্রশস্ত্র আমাদের সঙ্গে যাবে।

দ্রোণ। আমরা দু'জনে কিন্তু এই যুদ্ধে তোমার পরাক্রম দেখতে চাই।

দুর্য্যো। আপনাদের যা অভিরুচি তাই হবে।

দ্রোণ। বৎস গান্ধাররাজ, এই গরু আনার কার্য্যে তোমার রথই প্রথম যাবে।

শকুনি। বেশ ভাল কথা।

[সকলের প্রস্থান।

প্রবেশক

বৃদ্ধ গোপালকের প্রবেশ

বৃদ্ধ গোপালক। আমাদের গাইগুলির যেন বাছুর না মরে। গোপ-যুবতীগণ যেন বিধবা না হয়। আমাদের রাজা বিরাট পৃথিবীর একচ্ছত্র রাজা হ'ন। বিরাটের জন্মোৎসব * উপলক্ষে গোদানের জন্য নগরের উপবন-বীথীতে গরুগুলি এবং উৎসব-হৃষ্ট † গোপদের ছেলে মেয়েরা আসুক। যাই আমিও তাড়াতাড়ি গিয়ে আমোদ করি। একি! শুকনা গাছের শুকনা ডালে কাকটা ঠোঁট ঘসছে, আবার সূর্য্যের দিকে তাকিয়ে বিকট শব্দও কচ্ছে। গরুগুলির ও আমাদের মঙ্গল হ'ক। যাই তাড়াতাড়ি গিয়ে গোয়ালাদের ছেলে মেয়েদের ডেকে নিয়ে আসি। গোমিত্রক, গোমিত্রক।

গোমিত্রক। মাতুল, প্রণাম করি।

বৃদ্ধ গোপালক। আমাদের ও আমাদের গরুগুলির শান্তি হ'ক। ওরে গোমিত্রক, মহারাজ বিরাটের জন্মোৎসব উপলক্ষে গোদানের জন্য নগরের উপবন-বীথীতে সমস্ত গোধন এবং উৎসব-হৃষ্ট গোয়ালাদের

---

* 'বর্ষবর্দ্ধনগোপ্রদান নিমিত্তং'—বর্ষবর্দ্ধন শব্দের তিন রকম অর্থ হ'তে পারে—

(১) জন্মোৎসব (২) বার্ষিক সমৃদ্ধিলাভের উৎসব (৩) বৃষ্টির জন্য উৎসব।

† 'কৃতমঙ্গল মোদকাঃ'—ইহাও দ্ব্যর্থক—

(১) উৎসব হেতু হৃষ্ট। (২) উৎসবোপলক্ষে প্রস্তুত মোদক সহ।

ছেলে মেয়েরা আসুক। ওরে গোমিত্রক, গোয়ালাদের ছেলে মেয়েদের ডেকে আন।

গোমিত্রক। যে আজ্ঞা মাতুল। ওগো গো-রক্ষিণিকা, ঘৃতপিণ্ড, যামিনী, বৃষভদত্ত, কুম্ভদত্ত, মহিষদত্ত, শীঘ্র এস, শীঘ্র এস।

সকলের প্রবেশ

সকলে। মাতুল, প্রণাম।

বৃদ্ধ গোপালক। আমাদের ও গোয়ালাদের ছেলে মেয়েদের মঙ্গল হ'ক। মহারাজ বিরাটের জন্মোৎসব উপলক্ষে গোদানের জন্য এই নগরের উপবন-বীথীতে সমস্ত গোধন আসুক। যতক্ষণ না সব গরু আসে আমরা সকলে নাচব গাইব।

সকলে। যে আজ্ঞা, মাতুল।

বৃদ্ধ গোপালক। বাঃ! বেশ নেচেছ। বেশ গেয়েছ। আমিও নাচব এখন।

সকলে। হায় হায়! মাতুল, দেখ কত ধূলি উড়ছে। *

বৃদ্ধ গোপালক। কেবল ধূলি নয়, শঙ্খ এবং দুন্দুভির শব্দও শোনা যাচ্ছে।

সকলে। দিবসে চন্দ্রের প্রভার ন্যায় পাণ্ডুর বর্ণ জ্যোৎস্নাঢাকা শতমণ্ডল-বেষ্টিত সূর্য্য † যেন এই দেখা যাচ্ছে আবার এই দেখা যাচ্ছে না।

গোমিত্রক। হায়! হায়! মাতুল, দধিপিণ্ডের ন্যায় ছাতামুক্ত সাদা ঘোড়ার গাড়ীতে চ'ড়ে এই সকল চোর সমস্ত ঘোষপল্লী ছেয়ে ফেল্লে যে! এরা কে?

বৃদ্ধ গোপালক। হায়! হায়! বাণে বাণে আকাশ ছেয়ে ফেল্লে! ছেলে মেয়েরা সব বাড়ীতে ঢুকে পড়।

সকলে। যে আজ্ঞা, মাতুল।

বৃদ্ধ গোপালক। হায়! হায়! থাম,থাম। মার, মার, ধর, ধর। যাই মহারাজ বিরাটকে খবর দেই গিয়ে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

ভটের প্রবেশ

ভট। ওহে সকলে বিরাট-রাজকে বল গিয়ে যে দস্যুর কাজে বিক্রম প্রকাশ * ক'রে ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা গরু চুরি ক'রে নিয়ে যাচ্ছে। বাছুরগুলি পালিয়ে যাচ্ছে, গরুগুলি ব্যথিত হ'য়েছে, ষাঁড়গুলি চকিত-নয়নে মুখ তুলে চাচ্ছে। চারিদিকেই আকুল চীৎকার। গরুগুলি ভারী ভয় পেয়েছে। এদের দিকে তাকান যাচ্ছে না।

নেপথ্যে

কি! ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা গরু চুরি ক'রে নিয়ে যাচ্ছে!

ভট। হাঁ, আর্য্য।

কাঞ্চুকীয়ের প্রবেশ

কাঞ্চু। যারা ভ্রাতৃদ্রোহী এই কার্য্য তাদের উপযুক্তই বটে। তারা—

ধনুতে গুণ চড়িয়ে, গোধার চামড়ার অঙ্গুলিত্র প'রে, বর্ম্ম দিয়ে শরীর ঢেকে, সুসজ্জিত রথে চ'ড়ে, বলে দর্পিত হ'য়ে, যুদ্ধ সজ্জা ক'রে এবং অস্ত্র নিয়ে বিরাট রাজার গরুগুলির উপর শত্রুতা প্রকাশ কচ্ছে।

জয়সেন, মহারাজ এখন জন্ম-নক্ষত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূজায় ব্যাপৃত। এই সংবাদ এই অসময়ে দিলে তিনি

---

* 'মহান রেণুরুৎপতিতঃ'—অমঙ্গলের চিহ্ন।

† "শতমণ্ডলঃ সূর্য্যঃ"—মণ্ডল = উপসূর্য্যক। কখন কখন সূর্য্যের চারিদিকে সূর্য্যের ন্যায় মণ্ডল দৃষ্ট হয়। ইহা অমঙ্গলের চিহ্ন। জ্যোতির্ব্বিদগণ এই জ্যোতিক সম্বন্ধীয় বৃত্তকে দৃষ্টিবিভ্রম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

* 'দস্যুকর্ম্মপ্রচ্ছন্নবিক্রমৈঃ'—প্রচ্ছন্ন শব্দের সার্থকতা—ভাল কাজে বিক্রম দেখাবার ক্ষমতা নেই। চোর সেজে বিক্রম কলুষিত করা হ'ল।

রাগ করবেন। সুতরাং দেবকার্য্য শেষ হ'লে রাজাকে সংবাদ দিব।

ভট। আর্য্য, এটা বড় গুরুতর বিষয়। শীঘ্রই সংবাদ দিন।

কাঞ্চুকীয়। আচ্ছা, তবে দিচ্ছি।

রাজার প্রবেশ

রাজা। রথের শব্দে ভীত হ'য়ে গরুগুলি ছোট ছোট বাছুর গুলির সঙ্গে ত্রাসে চারিদিকে পালিয়ে যাচ্ছে, এবং (ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা) আমার গোধন চুরি ক'রে নিয়ে যাচ্ছে—আর কি না কাঁধের দিকে স্থূল, চঞ্চল বলয়যুক্ত, চন্দনচর্চ্চিত আমার হাত দুটি এখন উপাদেয় অন্ন § তুলে মুখে দিচ্ছে! এ বড় লজ্জার কথা। জয়সেন! জয়সেন!

ভটের প্রবেশ

ভট। মহারাজের জয় হ'ক।

রাজা। মহারাজ ব'লে আর আমাকে ডেকো না। আমার ক্ষত্রিয়ত্ব অপমানিত হয়েছে। যুদ্ধের বিস্তারিত খবর বল।

ভট। অপ্রিয় খবর বিস্তারিত বলতে নেই। মোটামুটি বলছি—

রথের ধূলিতে সমস্ত গরুর এক রং হ'য়ে গেছে কেবল কশাঘাত কল্লে পর এদের গায়ের নানা বর্ণের রেখা দেখা যায়।

রাজা। তা'হ'লে, আমার রথ শীঘ্র সাজিয়ে আন। আমার প্রতি যাদের প্রকৃত ভক্তি আছে তারা আমার অনুগমন করুক। গোধন উদ্ধারের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু-সৈন্যের সম্মুখে থেকে যত্ন কত্তে হবে। মৃত্যু হ'লেও তাতে যশ। আর মোচন কত্তে পাল্লে ত ধর্ম্ম আছেই।

ভট। যে আজ্ঞা মহারাজ।

[প্রস্থান।

রাজা। আমার সঙ্গে দুর্য্যোধনের শত্রুতার কারণ কি? আ! তাই! যজ্ঞ দেখতে যাই নি। হাঁ, বুঝেছি। কীচকেরা মরেছে—আমাদের এখন শোকের সময়—কাজেই আক্রমণের এই সুযোগ। অথবা আর একটা কারণ আছে। আমি পরোক্ষে পাণ্ডবগণের সুহৃৎ—সুতরাং আমার সঙ্গে যুদ্ধ কত্তে হবে। ভগবান (যুধিষ্ঠির) হস্তিনাপুরে ছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই দুর্য্যোধনের প্রকৃতি বেশ জানেন।

অথবা দুর্য্যোধনের দোষ জানলেও ভগবান বলবেন না। কিন্তু আমার প্রয়োজন। যার প্রয়োজন আছে সে অক্লান্ত ভাবে বারে বারে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রে থাকে (শিষ্টতা মানে না)।

কে আছ এখানে?

ভটের প্রবেশ

ভট। মহারাজের জয় হ'ক।

রাজা। ভগবানকে ডেকে দাও।

ভট। যে আজ্ঞা, মহারাজ। [প্রস্থান।

ভগবানের প্রবেশ

ভগবান। (চারিদিকে দেখিয়া) ব্যাপার কি?

হাতী সব সাজছে, ঘোড়াগুলি বর্ম্ম পরেছে। এই উদ্যোগ দেখে আমি যেরূপ ভয় কখনও অনুভব করি নি আজ আমার মনে সেরূপ ভয় আসছে। আমি স্থির-বুদ্ধি সুতরাং নিজের জন্য ভয় করি না, কিন্তু আমার ভাইরা সব যে চপল।

রাজা। ভগবান, আপনার জয় হ'ক। বিরাট আপনাকে অভিবাদন কচ্ছে।

ভগবান। স্বস্তি।

বিরাট। ভগবান, এই আসনে বসুন।

ভগবান। (বসিয়া) মহারাজ, যুদ্ধের উদ্যোগ কেন? রাজলক্ষ্মী কি এখনও সন্তুষ্ট হন নি? গর্ব্বিতকে পীড়ন করবেন, না পীড়িতকে মুক্ত করবেন?

রাজা। ভগবান, আমার গরু নিয়ে গিয়ে যে আমার অপমান করেছে।

ভগবান। কে?

§ 'করাণি' অন্ন বিশেষণ্।

রাজা। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা।

ভগবান। (স্বগত) হায়! কি কষ্টের কথা।

জ্ঞাতিদের (শোণিত সম্পর্কের) কথা মনে হ'লে মনস্বীর মনও আকুল হয়। বৈরনির্য্যাতনপ্রিয় ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা অপরাধ কল্লে আমাদেরও অপরাধ হ'য়েছে মনে হয়।

বিরাট। ভগবান, ভাবছেন কি?

ভগবান। না কিছু নয়। এদের বিষয়ই চিন্তা কচ্ছি।*

রাজা। আজ থেকে সব শেষ হবে। ক্ষমতা থাকলেও যুধিষ্ঠির ক্ষমা করেছেন, কিন্তু আমি কচ্ছি না।

ভগবান। (স্বগত) এখন যে খড়ের বিছানায় মাটিতে শুই, আমাদের যে রাজ্যনাশ হয়েছে, দ্রৌপদীর যে অপমান হয়েছে, আমরা যে ছদ্মবেশ ধ'রে আছি, আশ্রিতের আশ্রয় ল'য়ে বাস কচ্ছি—এই সমস্তই এখন শ্লাঘ্য মনে হচ্ছে—কেন না, এতে আমার ক্ষমা প্রকাশ পাচ্ছে।

ভটের প্রবেশ

ভট। মহারাজের জয় হ'ক।

রাজা। দুর্য্যোধন কি কত্তে চাচ্ছে?

ভট। কেবল দুর্য্যোধন নয়—পৃথিবীর সমস্ত ক্ষত্রিয়ই এসেছে। দ্রোণ এসেছেন, জয়দ্রথ এসেছেন, শৈল্য, অঙ্গরাজ, শকুনি ও কৃপ এসেছেন। তাঁদের রথের দোলায় পতাকার সঙ্গে ধ্বজ-দণ্ড নড়েই আমাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে তাড়িয়ে দিয়েছে, বাণের আর প্রয়োজন হয় নি।

রাজা। (উঠিয়া করযোড়ে) কি! গাঙ্গেয়ও এসেছেন।

ভগবান। বেশ! বেশ! অপমানিত হ'য়েও আপনি শিষ্টাচার দেখালেন।

(স্বগত) কুরুদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও পূজনীয় গুরু কিজন্ত এলেন। মনে হয়, আমরা প্রতিজ্ঞা হ'তে উত্তীর্ণ হ'য়েছি তা'ই মনে ক'রে দিতে এসেছেন।

(প্রকাশ্যে) * * * * *

রাজা। এখানে কে?

ভটের প্রবেশ

ভট। মহারাজের জয় হ'ক।

বিরাট। সারথিকে ডাক।

ভট। যে আজ্ঞা মহারাজ।

[প্রস্থান।

সারথির প্রবেশ

সারথি। মহারাজ দীর্ঘায়ু হ'ন। মহারাজের জয় হ'ক।

বিরাট। শীঘ্র আমার রথ আন। আজ রণের পূজনীয় অতিথি এসেছেন। শর দিয়ে আজ তাঁকে তুষ্ট করব। 'যুদ্ধে জয় ক'রে আসব' তাঁর এই আশা নিষ্ফল করব।

সারথি। যে আজ্ঞা আয়ুষ্মান। আয়ুষ্মন,

আপনি যে রথে চড়ে সৈন্য বিনাশ করেন, যে রথ আপনার পরিচিত, রথ চালাবার কৌশল দেখাবার জন্য সেই রথে চড়ে কুমার উত্তর যুদ্ধে গিয়েছেন।

বিরাট। কি! উত্তর যুদ্ধে গেছে!

ভগবান। মহারাজ! কুমারকে নিবারণ করুন—রণাগ্নির অনেক গুণ ও অনেক দোষ; আর রণাগ্নি বড় উগ্র। সামনে পেলে বালক ব'লে কাকেও ছেড়ে দেয় না। অথচ ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা যে কিছু দয়া করবে তাও নয়। মহারাজ, কুমারের পরাজয় আশঙ্কা করেই যুদ্ধের দোষ কীর্ত্তন কল্লুম, কিছু মনে করবেন না।

রাজা। তা'হ'লে শীঘ্র আর একখানা রথ সাজিয়ে আন।

সারথি। যে আজ্ঞা, আয়ুষ্মান।

রাজা। আচ্ছা, এদিকে এস।

সারথি। আয়ুষ্মান, এই যে আমি এসেছি।

* 'তেষামুৎসুকঃ'—দ্ব্যর্থক। (১) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের বিষয় (২) আমার ভাইদের বিষয়।

রাজা। তুমি কুমারের রথ চালাতে গেলে না কেন? কুমার কি তোমাকে বলেন নি? তুমিত রাজার সারথি!

সারথি। আয়ুষ্মন, প্রসন্ন হ'ন। রথ সাজিয়ে শিষ্টাচার দেখিয়ে আমি উপস্থিত হ'য়েছিলুম। সারথির শিষ্টাচারকে অগ্রাহ্য করবার জন্যই হ'ক, অথবা সারথ্যে আবার কি কৌশল আছে—এটা প্রমাণ করার জন্যই হ'ক আমাকে না ক'রে বৃহন্নলাকে কুমার সারথি করেছেন।

ভগবান। মহারাজ, আর রাগ করবেন না।

নিজের রথের চাকার ধূলিতে দুর্দ্দিন ক'রে যদি বৃহন্নলার সঙ্গে উত্তর যুদ্ধে গিয়ে থাকে তা'হ'লে মুহূর্ত্ত মধ্যে চাকার শব্দেই শত্রুদিগকে নিবারণ ক'রে বাণছাড়া রথই যুদ্ধ জয় করে আসবে।

রাজা। শীঘ্র অন্য রথ সাজিয়ে আন।

সারথি। যে আজ্ঞা আয়ুষ্মান।

[প্রস্থান।

ভটের প্রবেশ

ভট। কুমারের রথ ভেঙ্গে গিয়েছে।

রাজা। কুমারের রথ ভেঙ্গে গিয়েছে!

ভট। তবে শুনুন মহারাজ—

সমরকুশল বহু শত্রুসৈন্য দ্বারা অশ্বপথ বদ্ধ হ'য়েছিল। তখন বৃহন্নলা শ্মশানের দিকে রথ চালিয়ে দিল। শত্রুরা অশ্বের লোভে রথখানি ভেঙ্গে দিল। *

ভগবান। (স্বগত) আ! সেখানে গাণ্ডীব রয়েছে যে। (প্রকাশ্যে) মহারাজ, কিছু অমঙ্গল দেখা যাচ্ছে। রথ শ্মশানের দিকে গেল! যেখানে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা আছে সেখানে শ্মশান ত হবেই।

রাজা। ভগবান, অসময়ে গুরুতর বিষয় নিয়ে পরিহাস করলে রাগ হয়।

ভগবান। রাগ করবেন না। এযাবৎ একটি কথাও মিথ্যা বলি নি।

রাজা। হবে। যাও, আবার গিয়ে সংবাদ নিয়ে এস।

ভট। যে আজ্ঞা মহারাজ।

রাজা। একি! গর্জ্জনশীল স্রোত আবদ্ধ হ'লে যেমন সহসা একটা ভয়ঙ্কর শব্দ সমস্ত মেদিনী কম্পিত ক'রে আরও গভীর হ'য়ে উঠে, তেমনি একটা শব্দ শুনছি। কারণ জানতে হবে।

ভটের প্রবেশ

ভট। মহারাজের জয় হ'ক। শ্মশানে মুহূর্ত্ত মাত্র বিশ্রাম ক'রে রথ ও ঘোড়া নিয়ে—

ভগবান। (স্বগত) এব্যক্তি নিশ্চয়ই আমাকে মিথ্যাবাদী করবে না।

ভট। শত শত শর নিক্ষেপ ক'রে নীল হাতীগুলি কপিল বর্ণ ক'রে দিল। এমন একটি ঘোড়া বা যোদ্ধা নেই যার গায়ে অন্ততঃ একশ শর বসে নি। বড় বড় রথগুলি শর-প্রহারে স্তম্ভিত হ'য়ে আছে। শর দ্বারা সমস্ত পথ আচ্ছন্ন হ'য়ে গেছে। প্রচণ্ড ধনু শরের নদী বহাচ্ছে।*

(ক্রমশঃ)

শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

---

*"ভগ্নঃ বাহন-লোভেন শ্মশানাভিমুখো রথঃ"—রথখানি বাঁচাবার জন্য বাহনের অনুরোধে শ্মশানের দিকে পালিয়ে গেল—আর এক অর্থ। 'ভগ্নঃ' দ্ব্যর্থক।

* কৃতা নীলা নাগাঃ শরশতনিপাতেন কপিলা

*　　*　　*　　*

শরৈশ্ছন্না মার্গাঃ প্রবহতি ধনুরুগ্রাং শরনদীম্।

প্রথম পংক্তিতে শরশব্দের প্রয়োগের সৌন্দর্য্য দেখুন—নল্বনে শত শত নল ভেঙ্গে নীল নাগের উপর পড়লে যেমন হাতীকে কপিল বর্ণ দেখায় তেমনি।

চতুর্থ পংক্তিতে আবার দেখুন—খরস্রোতা নদীর বেগে নলরাশি তাড়িত হ'লে যেমন নদীবক্ষ নলে আচ্ছন্ন হ'য়ে যায় তেমনি।

কুমড়াদীর পাগল সাহেবের দরগা।

আজ যে প্রাতঃস্মরণীয় সিদ্ধ পুরুষের জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম; তিনি সাধনাবিষয়ে এতদ্দেশে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন। আজও হিন্দু মুসলমান সকলেই তাঁহার নাম শ্রবণে ভক্তিভরে মস্তক অবনত করিয়া থাকে। তাঁহার পবিত্র সমাধি-মন্দিরে দলে দলে হিন্দু-মুসলমান যাইয়া মানস আদায় করিয়া থাকে। তাঁহার উদ্দেশে মাথার চুল মানস করার প্রথা হিন্দুমুসলমান-নির্বিশেষে এতদ্দেশে বহুল পরিমাণে বিদ্যমান আছে। শিশুদের অনেকের চুল এই দরগায় যাইয়া কাটিয়া দেওয়া হয়! এদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের মুখেই এই একটী কথা শুনা যায়—"অমুকের মাথায় পাগলের চুল রহিয়াছে, সাবধান তাহার মাথায় যেন কাহারও পা না লাগে।

কুমড়াদীর সামান্য বিবরণ

ঢাকা জিলার অন্তঃপাতী নারায়ণগঞ্জ সবডিবিসনের অধীন রায়পুরা থানার অন্তর্গত কুমড়াদী একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। হাড়িধোয়া নদীর প্রায় তিন পোয়া মাইল পূর্ব্বে গ্রামটী অবস্থিত। নদীর পূর্ব্বতীরবর্ত্তী ভূমিভাগ দর্শন করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, কুমড়াদী গ্রামটী অতি পূর্ব্বে নদীর সন্নিকটে ছিল। ক্রমে ক্রমে নদী ক্ষীণা হইয়া বর্ত্তমানে গ্রাম হইতে এতদূরে সরিয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে এই গ্রামে বহু জঙ্গল ছিল। অদ্যাপি বড় বড় গাছ বিদ্যমান থাকিয়া তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে। পূর্ব্বে এই গ্রামে বহু ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। আজকাল ২।৩ বাড়ী ব্রাহ্মণ, ২।৩ বাড়ী কায়স্থ, কয়েক বাড়ী জুগী ও অধিক [illegible] মুসলমান গ্রামের অধিবাসী। এই গ্রামেই সাধকপ্রবর পাগল সাহেব সিদ্ধি লাভ করিয়া সমাধিস্থ হন। তাঁহার জন্মস্থান কোথায়, কোথা হইতে কোন্ সময় এই গ্রামে আসেন তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না।

পাগল সাহেবের আদিম নিবাসস্থান সম্বন্ধে প্রবাদ বচন ও তাঁহার সময় নির্ণয়

দরগার বর্ত্তমান খাদেমগণ (সেবাইতগণ) বলেন ৯।১০ পুরুষ যাবৎ তাঁহারা এইস্থানে বাস করিতেছেন। ৩ পুরুষে একশত বৎসর ধরিয়া লইলে; তিন শত বৎসরের অধিক কাল যাবৎ তাঁহারা এই দরগাতে অবস্থান করিতেছেন ইহাই প্রমাণিত হয়। পারসী ভাষায় লিখিত ২৫০ বৎসরের পূর্ব্বের দলিল পত্রাদি তাঁহাদের নিকট এখনও আছে। তাহাতে এই দরগার কথা উল্লিখিত আছে। "পাঁচ-দোনার দেওয়ান দর্পনারায়ণ" প্রবন্ধে দেওয়ানকে দুই শত বৎসরের পূর্ব্বের বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছি। তাঁহার প্রদত্ত দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, পীরাণ, ফকিরান্ অনেক ভূসম্পত্তির পরিচয় আমরা দিয়াছি। তিনি এই দরগার উদ্দেশে দক্ষিণ সাধারচর গ্রামে ৶১০ আড়াই কানি জমি দান করিয়া গিয়াছেন। এই সকল প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, তিনি তিনশত বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন।

তিনি কোথা হইতে কুমড়াদী গ্রামে আসিয়াছিলেন তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। তবে দেশপ্রচলিত প্রবাদ বচনকে যদি ইতিহাসের একটী অঙ্গ বলিয়া ধরা যায় তাহা হইলে দেশের ইতিহাস রক্ষার অনেকটা উপায় হয়।

বর্ত্তমান খাদেমগণ পুরুষপরম্পরায় আগত প্রবাদ বচ-নের বলে বলিয়া থাকেন যে, পাগল সাহেব সোনারগাঁ হইতে এখানে আসিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাদের কথা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, তিনশত বৎসর পূর্ব্বে মুসলমানগণ যখন সুবর্ণগ্রামে রাজত্ব করিতেন তখন নানাদিগদেশ হইতে আগত অনেক মুসলমান ফকির দরবেশ সেই স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। অদ্যাপি

সোনারগাঁতে বহু প্রাচীন মসজিদ সমাধি মন্দির বিদ্যমান আছে। ইহার অনেকগুলি যে এই ভাবের ফকির দরবেশের সমাধির উপর নির্ম্মিত সুবর্ণ গ্রামের ইতিহাস প্রণেতা শ্রীযুক্ত স্বরূপচন্দ্র রায় মহাশয় তাহা লিখিয়া গিয়াছেন।

সেই সময় সোনারগাঁতে এক সিদ্ধ তপস্বী পুরুষ বাস করিতেন। তাঁহার সেবা শুশ্রূষার জন্য দুই জন ধর্ম্ম পিপাসু মুসলমান সর্ব্বদা রত থাকিতেন। এই দুই ব্যক্তিই তাঁহার শিষ্য ছিলেন। ইহার মধ্যে একজন সম্ভ্রান্ত-বংশীয় দরিদ্র সন্তান—ইহার নাম মনসুর খাঁ, অন্যজন সাধারণবংশীয় ধনীর সন্তান। উক্ত মহাপুরুষ দ্বিতীয় শিষ্যকে অধিক স্নেহ করিতেন। সেইজন্য মনে মনে ধারণা করিয়াছিলেন, মৃত্যুর পূর্ব্ব সময় তাঁহাকে সাধক প্রবরের সাধনার গুহ্যতম ধন অর্পণ করিয়া যাইবেন। আসন্নকাল নিকট জানিয়া তপস্বী জল আনিবার ছলে ১ম শিষ্যকে দূরে পাঠাইয়া ২য় শিষ্যের নিকট গোপনে সকল তত্ত্ব প্রকাশ করিতে মনস্থ করিলেন। বিধির বিচিত্র বিধান। ঋষিপ্রবর ১ম শিষ্য ভ্রমে ২য় শিষ্যকে জল আনিতে আদেশ করিলেন। আদেশ মাত্র ২য় শিষ্য জল আনিতে প্রস্থান করিলেন। তখন প্রায় দ্বিতীয় প্রহর রজনী। রজনীর শান্তিময় ক্রোড়ে জীবগণ শান্তি-ভোগ করিতেছে। প্রকৃতি নিস্তব্ধ ভাব অবলম্বন করিয়াছেন। ইহাই প্রকৃষ্ট সময় ভাবিয়া তপস্বী পুরুষ ধীরে ধীরে সকল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন। ইত্যবসরে ২য় শিষ্য জল লইয়া আসিয়া গুরুদেবের পাদবন্দনা পূর্ব্বক বলিল, "গুরুদেব! দাস পানীয় জল আনিয়াছে। অধমের আনীত জল পান করিয়া দাসকে কৃতার্থ করুন।" মহাপুরুষের তখন চমক ভাঙ্গিল। তিনি নিজের ভ্রান্তি বুঝিতে পারিয়া মনে মনে অত্যন্ত দুঃখ ভোগ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তখন আর অন্য উপায় ছিল না। যেহেতু সেই সময় তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। সাধন তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিবার সময় তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন যে "কাল প্রভাতে তুমি উত্তরাভিমুখে রওয়ানা হইবে। যে স্থানে যাইয়া মুগ্রিমের নমাজের (সান্ধ্য উপাসনার) সময় হইবে সেই স্থানে স্বীয় আসা (যষ্টি) প্রোথিত করিয়া সাধনায় বসিবে। সেই স্থানেই তোমার সিদ্ধিলাভ ঘটিবে।" ক্রমে প্রভাত বায়ুর ধীর সংস্পর্শে জীবগণ যেন নূতন জীবন লাভ করিতে লাগিল; বিহগকুল নানারাগ ভরে জগৎবাসীকে প্রভাত সঙ্গীত শুনাইয়া মুগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল, বালারুণ রক্তিমচ্ছটায় দিক্ দিগন্ত আলোকিত করিয়া তুলিল। এমন সময় সেই মহাপুরুষের আত্মা তাঁহার সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিল। বলা বাহুল্য ১ম শিষ্য গমনের এই সুসময় মনে করিয়া ২য় শিষ্যকে শবের সৎকারের জন্য বলিয়া গুরু-নির্দ্দিষ্ট পথে রওয়ানা হইল। সমস্ত দিন উত্তরা-ভিমুখে গমন করিয়া। যখন সূর্য্যদেব অস্তাচলচূড়া অবলম্বন করিয়াছেন, সেই সময় মনসুর খাঁ * কুমড়াদী গ্রামের এক নিবিড় অরণ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গুরুর আদেশবাণী তখন তাঁহার স্মৃতিপটে উদিত হইল। তিনি সেই স্থানটি সাধনার উপযুক্ত মনে করিয়া হস্তস্থিত আসা মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া বসিলেন। সেই নির্জ্জন নিবিড়

---

* ঢাকার ইতিহাস প্রণেতা সুলেখক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন রায় মহাশয় কুমড়াদীর পাগল সাহেবের দরগার বিষয় তাঁহার ইতিহাসে যাহা লিখিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। কারণ সোনারগাঁর অধীন হবিবপুর গ্রামের দক্ষিণ দিকে যে পাগল সাহেবের দরগা আছে কুমড়া-দীর দরগা সেইটী হইতে স্বতন্ত্র। এই কুমড়াদী ও হবিবপুর গ্রামের দূরত্ব প্রায় ২৬।২৭ মাইল হইবে। তিনি দুইটী স্থানকে এক করিয়া লিখিয়াছেন। কুমড়াদীর নিকট মুণ্ডমালার খাল নামক কোনও খাল নাই। আশা করি পরবর্ত্তী সংস্করণে তিনি এই দুইটী দরগার বিষয় ভিন্নভাবে লিখিবেন।

বনে তিনি ধ্যান নিমগ্ন হইলেন। অপস্থার সময় তাঁহার বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইত, তখন তাঁহাতে উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পাইত। এই জন্যই তিনি সাধারণ্যে "পাগল সাহেব" বলিয়া পরিচিত। তিনি যে এই বনে আসিয়াছেন নিকটবর্ত্তী লোকজন তখনও তাহা জানিতে পারে নাই। একদিন জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণের একটী গাভী মারা যায়। তিনি মৃত গাভীটীকে নিকবর্ত্তী সেই বনের ধারে ফেলিয়া বাড়ী যাইয়া গাভীর জন্য শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পাগল সাহেব সেইটীকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া ছাড়িয়া দেন। অল্পক্ষণ পরেই গাভী যাইয়া ব্রাহ্মণের বাড়ীতে হাজির হইল। এই ঘটনা দৃষ্টে ব্রাহ্মণ প্রতিবেশীগণকে যাইয়া তাহার গাভীর বিবরণ বলিলেন। তচ্ছ্রবণে আপামর সর্ব্বসাধারণের আর বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। সকলেই ইহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া যেস্থানে মৃতগাভী ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল সেই স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। অনেক বাকবিতণ্ডার পর সকলে মিলিয়া সেই বনে প্রবেশ করিয়া জটাজুটধারী বাহ্যজ্ঞান শূন্য ধ্যাননিবিষ্ট সাধকশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ "পাগল সাহেবকে" দেখিতে পাইলেন। এই অলৌকিক ঘটনাটি তাঁহা দ্বারাই সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া সকলেরই ধারণা জন্মিল। অত্যাশ্চর্য্য ঘটনার পর হইতে চারিদিকে তাঁহার কথা প্রচারিত হইতে লাগিল। তখন তাঁহার নাম হয় "শাহ মনসুর খাঁ"। কিন্তু সাধারণ্যে পাগল সাহেব বলিয়াই তিনি পরিচিত হইলেন। তাঁহার সেবাকারিণী একটী স্ত্রীলোক মাত্র তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। কাহারও মতে তিনি পাগল সাহেবের বিবাহিতা ধর্ম্মপত্নী। দরগার বর্ত্তমান খাদেমগণ বলেন এই স্ত্রীলোকটী তাঁহাদের বংশীয়া এবং "পাগল সাহেবের বিবাহিতা"। পাগল সাহেবের সমাধির পার্শ্বে ইঁহার সমাধি দেখা যায়। ইহাতে এই অনুমিত হয় যে, তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার বিবাহিতা ধর্ম্মপত্নী ছিলেন। যেহেতু ধর্ম্মপত্নী না হইলে কস্মিন্ কালেও এই মহাপুরুষের সমাধি-পার্শ্বে এই স্ত্রীলোকটীর সমাধি হইত না।

কুমড়াদী গ্রামে আমরা ১টী মসজিদও ১টী সমাধি মন্দির দেখিতে পাই। মসজিদের পশ্চিম পার্শ্বে একটি পুকুর বিদ্যমান আছে। বর্ষাকাল ভিন্ন ইহার জল ব্যবহার করা যায় না। ক্ষুদ্র মন্দিরের দক্ষিণ দিকে ঘাট-বাঁধান আর একটী পুকুর আছে, প্রায় বার মাসই ইহার জল ব্যবহার করা যায়। এই পুকুরটীর পূর্ব্ব দিকে আর একটি পুকুর। এবং সমাধি-মন্দিরের উত্তর দিকে আর একটী পুকুর ছিল। বর্ত্তমান সময় এই দুইটী প্রায় ভরাট হইয়া গিয়াছে। যে সকল লোক মানস আদায় করিবার জন্য এখানে গিয়া থাকেন পানীয় জলের জন্য তাঁহাদিগকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয়। যদি কোনও ধর্ম্মপ্রাণ মহাপুরুষ ইহার একটী প্রাচীন পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করিয়া দিতেন তাহা হইলে সর্ব্ব সাধারণের বিশেষ উপকার হইত।

পাগল সাহেবের সমাধি-মন্দির ও মসজিদ এবং পুকুর ইত্যাদি

মন্দির ২টী, মসজিদটী এবং পুকুর ৪টী প্রাচীর-বেষ্টিত ছিল। এই প্রাচীরের ভিতরে অনুমান ১২।১৩ পাখি জমি ব্যাপিয়া এই বাড়ী অবস্থিত। পরে অনেক স্থানে প্রাচীর ভাঙ্গিয়া মৃত্তিকাসাৎ হইয়া গিয়াছে।

সমাধি মন্দিরটীর দৈর্ঘ্য ২৫.২৬ হাত, প্রস্থ ১২।১৩ হাত এবং উচ্চতা ৮।৯ হাত হইবে। ইহা সাদাও (সাথির বর্গা বিহীন) কাজ করা। মন্দিরের মধ্যস্থানে পাশাপাশি ভাবে ২টী সমাধি (একটী পাগল সাহেবের অন্যটী স্ত্রীর) বিদ্যমান। সমাধির উত্তরদিকে ১টী ও পশ্চিম দিকে ১টী কোঠা আছে। মন্দির-গাত্রে, হাতী, ঘোড়া হরিণ, বাঘ, উঁট, মাছ, হাঁস ও অন্যান্য পক্ষিমূর্ত্তি অঙ্কিত দেখিলাম। প্রাণিচিত্র মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রে নিষিদ্ধ। ইহাতে অনুমিত হয় যে, কোনও হিন্দু বড়লোক তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া এই সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

দরগার বর্ত্তমান খাদেমগণ বলেন ১০০।১২৫ বৎসর পূর্ব্বে এই সমাধি মন্দিরের জীর্ণ-সংস্কার করিবার সময় হিন্দু রাজমিস্ত্রীগণ এই সকল প্রাণিচিত্র অঙ্কিত করিয়াছিল। কাহারও মতে "পাগল সাহেব" জীবিতাবস্থায় তাঁহার সমাধি-মন্দির ও মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়া যান।

সমাধি মন্দিরের ৫।৭ হাত পশ্চিম দিকে ১ গুম্বজ বিশিষ্ট ১টী মসজিদ বিদ্যমান। মসজিদটীর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ প্রায় সমান—বার তের হাত হইবে। সমাধি-মন্দির অপেক্ষা মসজিদটী প্রাচীন বলিয়া অনুমিত হইল। ইহারও লাদাও কাজ করা।

সমাধি মন্দিরের ৪।৫ হাত দক্ষিণে আর একটী ক্ষুদ্র দালান অবস্থিত। অনেকের মতে এই দালানটী সাধুর বিশ্রামাগার ছিল। তিনি তপস্যা হইতে বিরত হইয়া এই স্থানে অবস্থান করিতেন এবং সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে ২।১ কথা যাহা বলিবার তাহা বলিতেন। এই দালানটীরও লাদাও কাজ। ইহার ভিতর দিকে পূর্ব্বদিকের দেওয়ালগাত্রে উপরের দুই কোণাতে দুইটী লোহার শিকল গ্রথিত দেখিলাম। খাদেমগণের মধ্যে যিনি প্রাচীন তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম ইহাতে ২টী বাঘ বাঁধিয়া রাখিতেন। কাহারও মতে তিনি চোরের নামধাম বলিয়া দিতে পারিতেন এবং চোর ধরিয়া তাহাদের মাথা কাটিয়া ঐ শিকলে ঝুলাইয়া রাখিতেন। প্রত্যেক দেশেই মহাপুরুষদের জীবনীর সহিত এই প্রকার বিচিত্র উপাখ্যান বিজড়িত।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, প্রাচীরের ভিতরে দরগা বাড়ীতে ১২।১৩ পাখি জমি আছে। প্রাচীরের বহির্দ্দেশে চতুর্দ্দিকে ৪।৫ পাখি জমিও এই দরগার খাদেমগণের দখলে আছে।

অনুমান এই ১৫।১৬ পাখি জমি, দরগার জন্য নিষ্কর বন্দোবস্ত আছে। এই সকল নিষ্কর জমি ৫১৯নং জমিদারীর অন্তর্গত। ৺ হৈয়দালী খাঁ জমিদার বাহাদুর এই ভূমি নি[illegible]র বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া যান। সমাধি মন্দিরের ভিতরে মৃত্তিকার নিম্নে ইষ্টক দ্বারা গ্রথিত একটী মট্‌কীর মত গর্ত্ত এখনও বিদ্যমান আছে। প্রবাদ যে এই মট্‌কীটী টাকা দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। উক্ত জমিদার সাহেব মফস্বল আসিয়া এই দরগা দেখিতে যান। তিনি মন্দিরের ভিতর যাইয়া এই গর্ত্তটীর মুখ অনাবৃত অবস্থায় পান। তখন ইহা কিসের গর্ত্ত ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিয়া ইহাতে টাকা আছে জানিতে পারেন। "এই টাকা আমার জমিদারীর অন্তর্গত কাজেই আমার প্রাপ্য" এই বলিয়া তিনি সমস্ত টাকা তাঁহার নৌকায় নিয়া যান। তৎপর জমিদার এই ধনসহ * হাড়িধোয়া নদী ভাটি

* এখানে উল্লেখ প্রয়োজন যে ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস প্রণেতা সুলেখক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয় তাহার ইতিহাসে হাড়িধোয়া নদীকে আইরলর্খ নদী হইতে উৎপন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা জানি নদীর গতি উৎপত্তি স্থান হইতে পতন স্থানের দিকে হইয়া থাকে। তাঁহার লেখা মতে নদীটী নিম্ন স্থান হইতে উচ্চস্থানের দিকে উজাইয়া যাইয়া ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হইয়াছে। আমরা হাড়িধোয়া নদীর উৎপত্তি স্থান ও পতন স্থান সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে নিতাইনদী নামক গ্রামের নিকট ব্রহ্মপুত্র হইতে হাড়িধোয়া বহির্গত হইয়া জৈয়াখালির উত্তর দিয়া পূর্ব্ববাহিনী হইয়া সেকেন্দরদী গ্রামকে মধ্যে রাখিয়া এই গ্রামের পশ্চিম দিক দিয়া উত্তর পূর্ব্ববাহিনী হইয়া পুনর্ব্বার সেকেন্দরদীর পূর্ব্ব পার্শ্ব দিয়া দক্ষিণ বাহিনী হইয়া চিনিশপুর ৺ কালীবাড়ীর পশ্চিমে চরনগরদীর নিকট পুনর্ব্বার ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই স্থান হইতে ব্রহ্মপুত্র দক্ষিণবাহী হইয়া পাঁচদোনা প্রভৃতি গ্রামের নিকট দিয়া নাঙ্গলবন্দে গিয়াছে। আর হাড়িধোয়া চিনিশপুরের উত্তর দিয়া পুটিয়ার প্রসিদ্ধ হাটের দক্ষিণ দিয়া পূর্ব্ববাহিনী হইয়া, তৎপর দক্ষিণবাহিনী হইয়া নরসিংদীর নিকট মেঘনাদে পতিত হইয়াছে। আশা করি ঢাকার ইতিহাসের ২য় সংস্করণে যতীন্দ্র বাবু এই বিষয়টীর প্রতি লক্ষ্য করিবেন। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় প্রকৃত কথা স্থান পায় ইহাই আমাদের ইচ্ছা।

বাহিয়া বাড়ী রওয়ানা হইলেন। সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদের সিদ্ধিপীঠ চিনিশপুর ৺ কালীবাড়ীর নিকট যাইয়া নৌকা ডুবিয়া যায়।

বহু কষ্টে জমিদার সাহেব রক্ষা পান। তাঁহার সঙ্গীয় লোকজন ও অর্থ সকল নষ্ট হইয়া যায়। তিনি প্রাণে প্রাণে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে সমর্থ হন। বাড়ী যাওয়ার পর তাঁহার জমিদারীতে ও বাড়ীতে নানা বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হইল। দরগার অর্থ-গ্রহণই ইহার কারণ জমিদার সাহেবের মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল। এই জন্য তিনি বিশেষ অনুতপ্ত হইতে লাগিলেন এবং উপস্থিত অনিষ্ট নিবারণের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। জমিদার সাহেব বহু চিন্তার পর পরিশেষে স্থির করিলেন, যে পরিমাণ টাকা আমি গ্রহণ করিয়াছিলাম, সেই পরিমাণ টাকা পাগল সাহেবের স্ত্রীকে দান করিব। পাগল সাহেবের স্ত্রীকে এই কথা জ্ঞাপন করিলে, তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। কিন্তু জমিদার সাহেব অত্যন্ত ভীতিবিহ্বল হইয়া পড়িলেন। কাজেই নিজের কৃত অন্যায় কর্ম্মের জন্য প্রতিমুহূর্ত্তেই অশান্তি-ভোগ করিতে লাগিলেন।

পরে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া ছিধুশা নামক জনৈক খাদেমকে এক সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ পত্র লিখিলেন। পত্র পাইয়া তিনি গিয়া জমিদার সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। জমিদার সাহেব ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বাধ্য হইয়া দরগার জন্য ১৫।১৬ পাখি জমি নিষ্কর দেন। বর্ত্তমান সময় উক্ত স্থান ঢাকার সুযোগ্য জমিদার খান বাহাদুর শ্রীযুক্ত কাজি আলাউদ্দিন বি, এ, মহাশয়ের জমিদারীর অন্তর্গত। এখনও দরগার জমিগুলি নিষ্করই আছে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, পাগল সাহেব সম্বন্ধে কোন প্রমাণপ্রয়োগ দিতে পারিলাম না। কিন্তু এতদ্দেশের হিন্দু-মুসলমান সকলের নিকটই যে সকল প্রবাদবচন শুনিতে পাওয়া যায় তাহাই লিখিতে বাধ্য হইলাম। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ দ্বারা যদি কোনও ঐতিহাসিক ইঁহার প্রকৃত বিবরণ লিখিতে যৎকিঞ্চিৎ সহায়তাও লাভ করেন তাহা হইলেই ক্ষুদ্র লেখকের সকল শ্রম সফল হইবে।

শ্রীমহিমচন্দ্র নন্দী।

বরেন্দ্র ভুমির কয়েকটি ধ্বংস প্রাপ্ত প্রাচীন জনপদ

২৯শে জানুয়ারী বেলা ১২টার পর আমরা ভোঁওর হইতে খাটীয়াবান্ধা রওনা হইলাম। পথে দিওর ও ছাতমা নামক গ্রাম দুইটী পড়িবে। এই সংবাদ আমরা পূর্ব্বেই পাইয়াছিলাম। দিওর ও ছাতমা অতি প্রাচীন গ্রাম ও বহু ধ্বংসাবশেষে পরিপূর্ণ, ইহাও শুনিয়াছিলাম। অপরাহ্নে যখন আমাদিগের গো-যান দিওরের নিকটবর্ত্তী হইল তখন আমি ও রামবাবু গো-যান হইতে নামিয়া পড়িলাম। গ্রামে প্রবেশ করিতেই কয়েক ঘর রাজবংশীর বাড়ী। তাহাদিগের নিকট গ্রামের "গম্ভীরার" সংবাদ লইব মনে করিয়া তাহাদিগের বাড়ীর নিকট যাইতেই শ্রীযুক্ত সীতানাথ বাবুর সহিত দেখা হইল। সীতানাথ বাবু দিনাজপুর কালেক্টরীর বাঁটোয়ারা সেরেস্তার পেস্কার। এই দিওর, ছাতমা প্রভৃতি গ্রাম পোরশার জমিদার মহাশয়দিগের জমিদারীর অন্তর্গত। তাহাদিগের সম্পত্তি বাঁটোয়ারা হইতেছে, বাঁটোয়ারা কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ জন্য সীতানাথবাবু এখানে আসিয়াছেন পাথর খুঁজিয়া দেখার চেষ্টা সীতানাথবাবুরও আছে। তিনি একবার আমাদিগের সহিত পাথর দেখিতে বাহির হইয়াছিলেন, সুতরাং আমাদিগকে দেখিয়া তিনি আমাদিগের উদ্দেশ্য কতক বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু তিনিও সেই দিনই এই গ্রামে আসিয়াছিলেন

সুতরাং গম্ভীরার সংবাদ বিশেষ কিছু দিতে পারিলেন না। রাজবংশীরাও প্রথমে আমাদিগের কথা শুনিয়া কোন উত্তর দিল না। "পষাণ" (এদিকে পাষাণ মূর্ত্তিগুলিকে "পষাণ" বলে) খুঁজিতে যে কোনও বাবু গ্রামে গ্রামে বেড়াইতে পারে ইহা এদেশীয় লোকেরা বিশ্বাস করিতে পারে না। এই ভগ্ন "পষাণ" গুলি যাহাতে "ভূত," কালী, "মাশনা," "শূর" প্রভৃতি দেবতারা খোষ মেজাজে বহাল তবিয়তে অক্ষের নিরাপত্তিতে স্মরণাতীত কাল হইতে বসত বাস করতঃ ভোগ দখল করিয়া আসিতেছেন তাহার সহিত এই "বাবু"দিগের কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে ইহা তাহারা মনেও করিতে পারে নাই। তাহারা ভয়ে এই সব "পষাণের" নিকট যায় না।

দূর হইতে সময় সময় দুই চারিটি শোলার ফুল নিকটস্থ গাছে ঝুলাইয়া দিয়া এবং "গম্ভীরা" পূজার সময় পুরোহিতের দ্বারায় একটু "ধুপসেন্দুর" ও "জলপুষ্প" দেওয়াইয়া তাহারা এই সব দেবতাদিগের প্রীতিবর্দ্ধন করিয়া থাকে, সুতরাং এই সম্বন্ধে ইহাদিগের নিকট কিছুই জানিবার উপায় নাই। আর যাহারা এই সব প্রাচীন মূর্ত্তি প্রভৃতির বা প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতির সম্বন্ধে কিছু খোঁজ জানে তাহারাও তাহা বলিতে চাহে না। কারণ এই "ভূত-কালী" প্রভৃতি অর্দ্ধ নিদ্রিত দেবতার উপর আর একটি জাগ্রত দেবতা আছেন যাহার ভয় ইহারা এই সব দেবতা হইতে বেশী করে। গল্পের কথা নহে। আমার জানিত এক ব্যক্তি অতি প্রাচীন কালের একটী মোহর পাইয়াছিল। সেই মোহরটীর জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই সেই মোহরটী দেখিতে পাইলাম না। অনেক চেষ্টায় সেই ব্যক্তি আমার নিকট মোহরটীর কথা স্বীকার করিল কিন্তু বলিল যে সে মক্কায় যাওয়ার সময় সেই মোহরটী চুরি গিয়াছে। পরে জানিতে পারিলাম মোহরটী বাহির করিলে কোন হাঙ্গামা হইবে ভয়ে সে আর মোহরটী বাহির করিবে না, কারণ তাহার বাড়ীর নিকট এক ব্যক্তি কয়েকটী প্রাচীন টাকা পাইয়া এক প্রকার সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিল।

যাক্, রাজবংশীদিগের নিকট বিশেষ কোন সংবাদ না পাইয়া আমরা গ্রামে প্রবেশ করিলাম। এই গ্রামটী অতি প্রাচীন গ্রাম। কোন সময় অতিশয় সমৃদ্ধিশালী ছিল। এখন গ্রামখানি ভগ্ন স্তূপে পরিণত। এই স্তূপগুলিকে এদেশীয় লোকেরা "ধাপ" বলিয়া থাকে। ইহাদিগের বিশ্বাস এই সব "ধাপে" অপরিমিত অর্থ রহিয়াছে ও এই সব "ধাপের" অর্থের রক্ষক একটি করিয়া 'যক' (যক্ষ) বা "শূর" আছে।

আমরা যে পথ ধরিয়া এই গ্রামে প্রবেশ করিলাম সেই পথটী প্রায় ৫।৬ হাত প্রশস্ত ও ইষ্টক দ্বারা বাঁধান। বহু পূর্ব্বে এদেশের গ্রাম্য পথগুলি ইষ্টক দ্বারা বাঁধান হইত ইহার প্রমাণ আমরা এদেশে প্রায় প্রতি প্রাচীন পল্লীতেই পাইয়াছি। ম্যাকাডাম তত্ত্ব প্রাচ্য দেশে নূতন, কিন্তু তাহা এদেশের পক্ষে নূতন নহে।

একটু দূরে যাইতেই একটি তমাল গাছের তলায় একখানি প্রকাণ্ড মনসা মূর্ত্তি ও নিকটেই উৎকৃষ্ট কষ্টি পাথরে চতুর্মুখী, অষ্টভুজার ও দশভুজার কয়েকখানি ভগ্ন অংশও দেখিতে পাইলাম। মনসা মূর্ত্তিখানি বালিপাথরের (Sand Stone) খোদিত কিন্তু কত কালের তাহা জানিবার উপায় নাই, চিহ্নগুলি প্রায়ই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বালিপাথরে খোদিত বহু মূর্ত্তি আমরা দেখিয়াছি। ভোঁওরের ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তিও বালিপাথরে খোদিত। নিশ্চিন্তায়, কুমারগঞ্জে ও অন্যান্য স্থানে বালিপাথরে খোদিত মূর্ত্তি দেখিয়াছি। এই মূর্ত্তিগুলিতে কারুকার্য্য দেখি নাই। এগুলি যে অতি প্রাচীন তাহা সহজেই অনুমান হয়। যে যুগে মূর্ত্তিতে কারুকার্য্য করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল না, বালিপাথরের মূর্ত্তিগুলি সেই যুগের বলিয়া বোধ হয়। তাহার পরবর্ত্তী যুগের কৃষ্ণপ্রস্তরে ও উৎকৃষ্ট কষ্টিপ্রস্তরে খোদিত কয়েক শ্রেণীর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে আবার কয়েক শ্রেণীর মূর্ত্তিতে সামান্য

কারুকার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যগুলি বিশেষতঃ যেগুলি কষ্টিপাথরে নির্ম্মিত সে গুলি অপরূপ কারুকার্য্যে পরিপূর্ণ। প্রস্তর শিল্পের ক্রম-বিকাশের নিদর্শন এই সব মূর্ত্তিতে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রস্তর-শিল্পের পূর্ণ-বিকাশ পালবংশীয় রাজাদিগের সময়ই হইয়াছিল। পাল বংশীয় দিগের রাজ-চিহ্নসম্বলিত প্রস্তর-মূর্ত্তিগুলিতে উৎকৃষ্ট কারুকার্য্য দেখা যায়। শুনিয়াছি পুরাকালে মূর্ত্তি প্রস্তুত সময় যে রাজা রাজত্ব করিতেন মূর্ত্তির শিরোদেশে সেই রাজার বা সেই রাজবংশের রাজ-চিহ্ন খোদিত করার প্রথা ছিল। আমি এপর্য্যন্ত তিন প্রকার চিহ্নযুক্ত মূর্ত্তি দেখিয়াছি। এই বালিপাথরে খোদিত মূর্ত্তিগুলির অধিকাংশ মূর্ত্তির শিরোদেশেই বৃন্ত সহিত একটি প্রস্ফুটিত-পদ্ম চিহ্ন দেখিয়াছি। এই পদ্মচিহ্ন আবার দুই প্রকার পাইয়াছি। কৃষ্ণ প্রস্তরের ও কষ্টিপ্রস্তরের মূর্ত্তিগুলির শিরোদেশে অধিকাংশ মূর্ত্তিতেই কৃত্তিমুখ চিহ্ন ও কয়েক খানিতে ছত্র চিহ্ন খোদিত দেখিয়াছি। এই ছত্র চিহ্ন কয়েক প্রকারের ও কৃত্তিমুখ চিহ্ন বহু প্রকারের দেখিয়াছি। যে সমস্ত মূর্ত্তি কৃত্তিমুখ চিহ্নে চিহ্নিত তাহা নানাবিধ কারুকার্য্যে পরিশোভিত, সুতরাং প্রস্তর শিল্পের এই ক্রম-বিকাশের পরিচয়ে কৃত্তিমুখ চিহ্নযুক্ত মূর্ত্তিগুলি অপেক্ষা কৃত পরবর্ত্তী সময়ের বলিয়াই অনুমান হয়। আবার ছত্র চিহ্নে চিহ্নিত ও কৃত্তিমুখ চিহ্নে চিহ্নিত মূর্ত্তিগুলির কারুকার্য্য প্রায় এক শ্রেণীর বলিয়া বোধ হয়। আমি কয়েকখানি সূর্য্য মূর্ত্তিতে ও একখানি শক্তি মূর্ত্তিতে এই ছত্রচিহ্ন খোদিত দেখিয়াছি।

অনধিকার চর্চ্চা করিতে করিতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এই মনসা মূর্ত্তির শিরোদেশে নাগছত্র। তদুপরি সাতটী নাগই ফণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। অষ্ট নাগটী বড়ই আদরের। এইজন্য দেবী তাহাকে আপন ক্রোড়ে স্থান দিয়াছেন। শুনিয়াছি মনসা দেবী না কি সর্ব্ব প্রথমে নাগমূর্ত্তিতেই পূজা গ্রহণ করিতেন এই প্রকার প্রস্তর নির্ম্মিত নাগমূর্ত্তিও আমি দুই একটী দেখিয়াছি। ক্রমে মূর্ত্তি-পূজার ক্রম-বিকাশে ও ভক্তের কল্পনায় দেবী বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছেন। এই অষ্টনাগশোভিতা দেবীকে দেখিয়া মনসা মঙ্গলের "অষ্টনাগের মা, জয় দেবী মনসা, সেবকের করহ কল্যাণ" মনে পড়িল। দিওরের মাঠের মাঝে গাছের তলায় থাকিয়া মা সেবকের কল্যাণ করিতে থাকুন, আমরা তথা হইতে ইষ্টক-নির্ম্মিত পথ দ্বারা দিওরের হাট-খোলায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পথের উভয় পার্শ্বে বহুতর পুষ্করিণী ও স্তূপ দেখিতে পাইলাম। হাটের উপরে একটী ভগ্ন মসজিদ আছে তাহা হিন্দু-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল এমত বুঝা গেল। হাটের দক্ষিণে একটি বৈরাগীর বাড়ী—এদেশে এখন "গৃহস্থ বৈরাগীর" সংখ্যাই বেশী। ইহাদিগের দ্বারাই হিন্দু সমাজের জাতির সংখ্যা ৩৬ হইতে ৩৭ সে আসিয়াছে। এই বৈরাগীরা সকল প্রকার ব্যবসাই করে। ইহাদিগের অধিকাংশ ব্যক্তিই সঙ্গতিপন্ন। ইহাদিগের মধ্যে এখন রীতিমত সমাজ ও সামাজিক নিয়ম সকলই হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে পণপ্রথা ও দলাদলিও পূর্ণমাত্রায় দেখা দিয়াছে। এই শ্রেণীর "গৃহস্থ বৈরাগী" পূর্ব্ববঙ্গে দেখি নাই। ইহাদিগকে "বৈরাগী" না বলিয়া "অনুরাগী" বলিলে ইহাদিগের প্রকৃত নামকরণ হয়। চৈতন্য দেবের প্রদর্শিত পথে সংসারে এত "অনুরাগ" আসিবে জানিলে এই পথ তিনি ভক্তকে দেখাইতেন কি না সন্দেহ। যাহা হউক এই বৈরাগীকে পাষাণের কথা জিজ্ঞাসা করায় সে কিছুই বলিল না। সৌভাগ্যক্রমে একটি বালকের নিকট এই গ্রামের "গম্ভীরার" সংবাদ পাইলাম। হাটের দক্ষিণপূর্ব্বকোণে একটী প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা। ইহার আয়তন প্রায় ১০০/ একশত বিঘা হইবে। দীর্ঘিকার নাম "ত্রিপুর দীঘি"। ত্রিপুরারির কোন্ ভক্ত এই দীর্ঘিকাটী খনন করাইয়া তাঁহার নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে পুরুষ-পরম্পরায় নামটী চলিয়া আসিতেছে বলিয়া মনে হয়।

দিওরের নিকটেই একটি গ্রাম "বাণদীঘি" বলিয়া আখ্যাত। এই গ্রামে "বাণদীঘি" নামে একটী প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা আছে। এই সকল স্থান "পুনর্ভবা" নদীর তীরস্থ "বাণগড়" বা "বাণনগর" হইতে ১৩।১৪ মাইলের মধ্যে। বাণরাজা অতিশয় শিবভক্ত ছিলেন বলিয়া এদেশে প্রবাদ আছে। সুতরাং তৎকালীন শৈব ধর্ম্মের প্রভাবে এই সব স্থান যে এক সময় অনুপ্রাণিত হইয়াছিল তাহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। এই দীঘিকার পূর্ব্বউত্তর কোণে কয়েকটি গাছের তলায় গ্রামের "গম্ভীরা" স্থাপিত আছে। এই স্থানটীর নিকটে একটি উচ্চস্থান পরিখায় বেষ্টিত দেখা যায়। বোধ হয় এখানে কোন বাড়ী কি মন্দির ছিল। এই "গম্ভীরায়" কয়েকটী শিবলিঙ্গ ও কষ্টিপাথরের নিৰ্ম্মিত কতকগুলি মূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাইলাল। ভগ্ন মূর্ত্তিগুলির অধিকাংশই বিষ্ণু ও সূর্য্য মূর্ত্তির অংশ। অষ্টভুজা ও দশ-ভুজার দুই চারিখানি ভগ্নাবশেষও ইহাতে দেখিতে পাইলাম। আর দেখিলাম একখানি বুদ্ধ মূর্ত্তির উপরের অংশ। এই ভগ্ন খণ্ডে পাঁচটী ধ্যানী বুদ্ধের তিনটি বসিয়া আছেন। মূর্ত্তি ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে অন্য দুইটি ও তনুত্যাগ করিয়াছেন। এই প্রকার পাঁচটি ধ্যানীবুদ্ধসংবলিত বুদ্ধ মূর্ত্তি আমি আরও দেখিয়াছি। নিকটে ইহার অন্য অংশ খুঁজিয়া পাইলাম না। ভগ্ন অংশখানি সংগ্রহ করিয়া লইলাম। বৌদ্ধ, বিষ্ণু, শৈব, শাক্ত, শৌর, দেবতার মিলনে এই মহাক্ষেত্র দিওরের গম্ভীরায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ এইদৃশ্য দেখিলাম। এই মহামিলনক্ষেত্র দেখিয়া মনে হইল যে ভারতের কোন মহাপুরুষ বা ধর্ম্মপ্রচারক যে কার্য্য সাধন করিয়া যাইতে পারেন নাই কতকগুলি অজ্ঞ ও নিরক্ষর লোক সেই কার্য্য সাধন করিতে পারিয়াছে।

এখান হইতে এই দীর্ঘিকার পশ্চিম প্রান্তে আসিয়া কয়েকটি স্থানীয় লোককে "পষাণ" সম্বন্ধে সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া আমরা কে আমরা কেন "পষাণের" খোঁজ করিতেছি ইত্যাদি তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়ায় তাহাদিগের নিকট আর একখানি মূর্ত্তির সংবাদ পাইলাম। ইহাদের একটি লোক আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া এই দীর্ঘিকার দক্ষিণ পাহাড়ে একটি প্রকাণ্ড পাথর দেখাইয়া দিল। পাথরখানি বালি-পাথর এখন কাপড় ধোয়া পাটে পরিণত হইয়াছে। পাথরখানি উল্টাইয়া দেখি ইহা একখানি সূর্য্যমূর্ত্তি, উপরটি একটু ভগ্ন। আমরা হিন্দু, জন্মান্তরবাদ মানিয়া থাকি, মার্ত্তণ্ডদেব কোন জন্মের কোন কোন কার্য্যের ফলে আজ ধোপার পাটে পরিণত হইয়াছিলেন জানিতে পারিলে সাবধান হওয়া যাইতে পারিত। একঘর রাজবংশী এই মূর্ত্তির উপর কাপড় কাঁচিয়া থাকে। মূর্ত্তিখানি দুইজন লোকেও তুলিতে পারিলনা, সুতরাং আমরা ইচ্ছা সত্ত্বেও এই মূর্ত্তিখানিকে সংগ্রহ করিতে পারিলাম না।

এখান হইতে আমরা পদব্রজেই ছাতমা গেলাম। ছাতমা দিওরের সংলগ্ন গ্রাম। এখাকার গম্ভীরায় আমরা অনেকগুলি ভগ্ন মূর্ত্তি ও বড় বড় কয়েকটি শিবলিঙ্গ দেখিতে পাইলাম। এই "গম্ভীরা" হইতে উৎকৃষ্ট কারুকার্য্য শোভিত একখানি ব্রহ্মার অভগ্ন মূর্ত্তি আমরা সংগ্রহ করিয়া লইলাম। শুনিলাম এখাকার একখানি পুকুরে এই মূর্ত্তিখানি পাওয়া গিয়াছিল। মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্বে শ্মশ্রু রাখারপ্রথা ছিল। কৃত্তিমুখ চিহ্ন যুক্ত এই ব্রহ্মা মূর্ত্তির বদনে দীর্ঘ শ্মশ্রু দেখিয়া তাহাই অনুমান করা যাইতে পারে কিনা প্রত্নতাত্ত্বিকগণ তাহার মীমাংসা করিবেন। এখানেই সন্ধ্যা হইল সুতরাং আমরা আর কিছু দেখিতে পারিলাম না। রাত্রিতে নিশ্চিন্তায় পৌছিলাম।

নিশ্চিন্তা হইতে ভোওরে প্রত্যাবর্ত্তন কালে বরুইল খরাইল, রামকৃষ্টপুর প্রভৃতি স্থান দেখিয়া ছাতমা ও দিওরের মধ্য দিয়া ভোঁওরে পৌঁছিব ইহা পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিলাম।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী রাত্রি দুইটার সময় আমরা নিশ্চিন্তা

হইতে রওয়ানা হইয়া ৫ই ফেব্রুয়ারী প্রত্যুষে বাওইল গ্রামের দীর্ঘিকার নিকট পৌঁছিলাম। এই দীর্ঘিকার আয়তন প্রায় ৬০/৭০/ বিঘা হইবে। ইহার দক্ষিণ পাহাড় দিয়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের Destrict Board এর রাস্তা গিয়াছে। উত্তর পাহাড়ের পূর্ব্ব কোণে একটা প্রকাণ্ড মসজিদের ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। নিকটেই অন্য একটি বড় পুকুর স্থানটী জঙ্গলাকীর্ণ। শুনিলাম যে ইহাতে একটি ব্যাঘ্র বাস করেন।

মস্‌জিদের দেওয়ালের গাথুনি ছোট বড় নানা প্রকার ইষ্টক দেখা যায় কোন প্রাচীন হর্ম্ম্যে ভগ্নাবশেষ দ্বারায় মসজিদটী যে প্রস্তুত হইয়াছিল ইহাই বোধ হইল। মশজিদে অনেকগুলি ছোট ছোট কুঠরি ছিল। গাঁথুনি কাঁচা ও পাকা। মসজিদটী কোন সময় নির্ম্মিত তাহার কোন প্রমাণ পাইলাম না, বা ইহার সম্বন্ধে কোন কিংবদন্তীও জানিতে পারিলাম না।

মসজিদ ছাড়াইয়া রামকৃষ্ণপুরে প্রবেশ করিলাম। রাস্তার উত্তরপার্শ্বে বহু ভগ্নাবশেষ, স্তূপ, বড় বড় দীর্ঘীকা ও লুপ্ত প্রায় পুষ্করিণী। নিকটেই একটী ছাটস্তূপের উপর অধুনা স্থাপিত "দরগায়" কোন হিন্দু মন্দিরের ভগ্নাবশেষ কয়েকখানি প্রস্তর ও কয়েকটী কৃষ্ণপ্রস্তরের স্তম্ভের পাদদেশ। ইহারা এইনুতন কলেবরে "পীরত্ব" প্রাপ্ত হইয়া সিন্নি পাইতেছেন।

বরেন্দ্র ভূমির এই সমস্ত প্রাচীন জনপদ বহুকাল পর্য্যন্ত ধ্বংসের সহিত অবিরাম যুদ্ধ করিয়া যুগযুগান্তরের অতীত সমৃদ্ধির লুপ্ত প্রায় চিহ্ন বকে লইয়া রণে হত সৈনিকের ন্যায় মহা নিদ্রায় নিদ্রিত। কোন্ সাধকের জীবনব্যাপী সাধনায় এই মহানিদ্রার অবসান হইবে তাহা কে বলিতে পারে?

রামকৃষ্ণপুরে বন্ধুপ্রবর গজেশচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা ভিন্নদেশ হইতে আসিয়া এখানে বাস করিতেছেন। অনেক চেষ্টায় তাহার ও শ্রীমান যোগেশচন্দ্রের হাত এড়াইয়া খরাইলে আসিলাম। রামকৃষ্ণপুরের উত্তরে খরাইল। এই গ্রামও বহুধ্বংসাবশেষে পরিপূর্ণ। কোন সময় এই স্থান এই প্রদেশের একটি প্রধান জনপদরূপে পরিগণিত ছিল। খরাইলের বহু ভগ্নস্তূপ, প্রাচীন দীর্ঘিকা, ও পুষ্করিণী, পরিখা-বেষ্টিত বহু প্রাচীন আবাসের চিহ্ন ও ইষ্টক নির্ম্মিত বহুদূরব্যাপী পথ ইহার অতীত সমৃদ্ধির পরিচয় প্রদান করিতেছে। খড়াইলে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এই বিরাটধ্বংসের চিহ্নগুলি দেখিলাম। মনে হইল যাহারা এই সব দীর্ঘিকা খনন করিয়া "যাবচ্চন্দ্র দিবাকর" জলদানের ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন, যাহারা প্রস্তর-ইষ্টকে সুদৃঢ় হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিয়া মনে করিয়াছিলেন যে ইহার আর ধ্বংস নাই, আজ তাঁহারা বা তাঁহাদিগের পরবর্ত্তী বংশীয়েরা কোথায়? তাঁহাদের প্রস্তর-ইষ্টক-নির্ম্মিত হর্ম্ম্যাদি বা কোথায়? এই জনপদ হয়ত একদিন বরেন্দ্রভূমির একটি শ্রেষ্ঠ জনপদ বলিয়া পরিচিত ছিল, আজ কিন্তু ইহার নাম জগতে বিলুপ্ত।

খরাইল হইয়া চন্দ্রপুর ছাড়াইয়া পুনরায় ছাতমায় আসিলাম। ছাতমায় আমাদিগের পূর্ব্ব পরিচিত শ্রীযুক্ত বিজয় বাবু শিক্ষকতা করেন। তাঁহার নিকট কয়েকখানি প্রস্তর মুর্ত্তির সংবাদ জানিয়া তাহাকে লইয়া দিওরের হাটের উত্তরে একটি স্তূপের নিকট আসিলাম। এই স্তূপটীর চতুর্দ্দিকে এখনও পরিখার পরিষ্কার চিহ্ন রহিয়াছে। উত্তরের পরিখায় এখনও জল আছে। বিজয়বাবু বলিলেন যে ৮।১০ বৎসর পূর্ব্বে কোনও ব্যক্তি অর্থলোভে এক রাত্রিতে এই স্তূপের উপরি ভাগ খনন করিয়াছিল। একহাত মাটির নীচ হইতে বড় বড় তিনখানি প্রস্তর বাহির হওয়াতে আর সে খুড়িতে না পারিয়া চলিয়া যায়। ইহার একখানি প্রস্তরের সংবাদ বিজয় বাবুর নিকট জানিতে পারিয়া একমাইল উত্তরে একজন মুসলমান গৃহস্থের খামারে উপস্থিত হইয়া সেই প্রস্তরখানি দেখিলাম।

ইহা কোন দালানের দরজার একখানি চৌকাঠ মাত্র।

এখান হইতে একক্রোশ উত্তরে "মূলগ্রাম"। এই থামারের লোকেরা বলিল যে, তথায় অনেক 'পাষাণ' আছে। আমরা এই সংবাদ পইয়া বিজয়বাবুকে বিদায় দিয়া মূলগ্রাম অভিমুখে রওনা হইলাম। যখন মূলগ্রামে পৌঁছিলাম তখন বেলা ১২টা। মূলগ্রামে পৌঁছিয়া আমারা আমার পূর্ব্বপরিচিত ভিকুরাম সরকারের বাড়ীতে গেলাম। এখানেও সেই পূর্ব্ব সম্বন্ধ। "বাবুরা" যে "পষাণের" খোঁজে এতদূরে আসিয়াছেন ইহা শ্রীকৃষ্ণরামের নূতন সংস্করণ ভিকুরাম দাস কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পরিলেন না। আমাদিগের সঙ্গে শ্রীযুক্ত জগৎচন্দ্র সিংহ রায় মহাশয় অনেক করিয়া তাহাকে এই কথা বুঝাইয়া দেওয়ার শেষে সে "পষাণ" দেখাইতে আমাদিগের সঙ্গে চলিল। এই গ্রামটীও প্রাচীন ধ্বংশাবশেষ পরিপূর্ণ—গ্রামের গণ্ডীরায় যাইয়া দেখি কতকগুলি মূর্ত্তির ভগ্নখণ্ড মাত্র রহিয়াছে। আর রহিয়াছে কালের প্রভাব ব্যর্থ করিয়া মহাকালের কয়েকটী লিঙ্গমূর্ত্তি। শুনিলাম. নিকটেই "বসন্ত ঠাকুরাণী" সশরীরে বিরাজিতা আছেন। এতদূর আসিয়া তাঁহাকে দর্শন না করা কর্ত্তব্য বোধ করিলাম না। কিন্তু যাইয়া দেখি শীতলা মা এখানে একখানি স্তম্ভের পাদদেশের আকার ধারণ করিয়া ভক্তের পূজা গ্রহণ করিয়াছেন। এই স্তম্ভটীও অতি ছোট ছিল না। নিকটেই কোন মন্দির ছিল বলিয়া অনুমান হইল। মূলগ্রামে এখনও একঘর ব্রাহ্মণ বসত করিতেছেন। ইহার একক্রোশ উত্তরে "ধাড়া" গ্রাম। শুনিলাম তথারও অনেক "পষাণ" আছে। কিন্তু এদিকে তখন আমাদিগের জঠরে অগ্নিদেবের যে প্রকার তাহাতে এমন দুই চারিখানি "পষাণ" ফেলিয়া দিলেও বোধহয় ভষ্ম হইয়া যাইত। সঙ্গের "গন্ডলিকাকেও" ভোরের বেলায় ত্যাগ করিয়া ভোঁওর যাইতে উপদেশ দিয়াছিলাম সুতরাং মূলগ্রাম হইতে ভোঁওর পদব্রজেই যাইতে হইবে বলিয়া আমরা আজকার মতন "পষাণ" দেখার লোভ ত্যাগ করিয়া ভোঁওরের দিকে চলিলাম।

ভোঁওর মিশ্চিন্তা, দেবগ্রাম, তাজেশ্বর পুর, ধর্ম্মপুর বেলহলী, ভিকাহার দাড়াল, সর্ব্ব মঙ্গলা, তপন চণ্ডীপুর প্রভৃতি বহু প্রাচীন জনপদ আমি দেখিয়াছি। এই প্রকার ধ্বংসাবশেষের অভাব নাই। যদি পারি সে কথা অন্য একদিন বলিতে চেষ্টা করিব। প্রস্তর মূর্ত্তির অন্বেষণে বরেন্দ্রভূমির এই অংশে আমি বহু স্থানে গিয়াছি। যে সব জনপদে পূর্ব্বে সমৃদ্ধির পরিচয় পাইয়াছি তাহাকে অভগ্নমূর্ত্তি একখানেও পাই নাই। তাহাতেই মনে হয় এইসব স্থানে অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছিল।

আর একটি কথা। আমরা পাটলিপুত্রের বা সারনাথের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া আশ্চর্য্য হই, কিন্তু এই বরেন্দ্রভূমির প্রতি পল্লীতে এত ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে, প্রাচীন ইতিহাসের এত উপকরণ পড়িয়া রহিয়াছে যে, তাহার ইয়ত্তা করা অসম্ভব। সারনাথে যে শ্রেণীর মূর্ত্তি মৃত্তিকা নির্ম্মিত ঘট ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে, এই বরেন্দ্রভূমির একটী ক্ষুদ্রপল্লীতে একটী পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার কালে প্রায় তজ্জাতীয় অনেকগুলি মূর্ত্তি ইত্যাদি আমরাও পাইয়াছিলাম। সারনাথে বিস্তৃত ভাবে এইকার্য্য হইতেছে। এখানে ৮।১০ কাঠার একটি পুষ্করিণীতে এইসব পাওয়া গিয়াছিল। এই বরেন্দ্রভূমিতে সারনাথের ও পাটলিপুত্রের ন্যায় স্থান নির্ব্বাচন করিয়া খনন করিলে পুরাতত্ত্বের অনেক নূতন তথ্যই আবিষ্কৃত হইতে পারে।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের যে বাশিভা বিহারের অনতিদূরে পুরাকালে ভগবান বুদ্ধদেব তিনমাস বাস করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, সে বাশিভা বিহারও এই বরেন্দ্র ভূমিতেই অবস্থিত। এই বিহারের অবস্থিতির স্থান অনুসন্ধান করতঃ নির্ণয় করিতে পারিলে তাহা যে

সারনাথের ন্যায় মহাতীর্থে পরিণত হইবে না তাহা কে বলিতে পারে? এই অনুসন্ধানে বহু অর্থের আবশ্যক। কিন্তু রতন টাটা বা কুমার শরৎ কুমারের ন্যায় নিষ্কাম ভাবে প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানে এত অর্থব্যয় আর কেহ করিতেছেন এমত শুনিয়াছি বলিয়া ত মনে হয় না। ইঁহাদিগের ন্যায় আরও ২। ৪ জন এই কার্য্যে অর্থ ব্যয় করিতে প্রস্তুত হইলে ইতিহাসের অনেক লুপ্ত উপকরণ আবিষ্কৃত হইয়া দেশের ইতিহাস নূতন কলেবর ধারণ করিবে। অক্ষয় কুমার তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনায় বরেন্দ্রভূমির প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানের পথে যে উজ্জ্বল আলো প্রজ্জ্বলিত করিয়াছেন, তাহাতে আশা হয় যে এই আলোকের জ্যোতিতে অনেক লক্ষ্মীর বরপুত্রই রতন তাতা ও কুমার শরৎকুমারের পথ অনুসরণ করিবেন।

শ্রীদেবেন্দ্রগতি রায়।

নব্য জার্ম্মাণির শিক্ষা পদ্ধতি

১৮৬৬ খৃঃ অব্দের পর হইতে বর্ত্তমান জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়। তৎপূর্ব্বে সমগ্র জার্ম্মাণি ক্ষুদ্র বৃহৎ কতকগুলি রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং উহাদের মধ্যে কোনও প্রকার ঐক্যবন্ধন ছিল না। কিন্তু ১৮৬৬ খৃঃ অব্দের পর হইতে এই সমস্ত রাজ্য বৃহত্তর প্রুশিয়ার নেতৃত্বাধীনে সম্মিলিত হইয়া বর্ত্তমান জর্ম্মাণ সাম্রাজ্য গঠিত করিয়াছে। প্রুশিয়ার রাজাই এই সম্মিলিত জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের কাইজার্ বা সম্রাট। কিন্তু সাম্রাজ্য রক্ষা ও বৈদেশিক জাতি সমূহের সহিত কার্য্যকলাপের সুবিধার জন্য জার্ম্মাণ সম্রাটের হস্তে কতকগুলি ক্ষমতা ও অধিকার অর্পিত হইলেও সম্মিলনান্তর্ভুক্ত রাজ্য সমূহ আভ্যন্তরীণ কাজকর্ম্মাদি প্রায়ই স্বাধীন ভাবে সম্পন্ন করিয়া থাকে। এই নিয়মানুসারে প্রত্যেক রাজ্য বা ষ্টেট্ (State) স্ব স্ব সুবিধা ও প্রয়োজনানুসারে স্ব স্ব রাজ্যের শিক্ষা পদ্ধতির পরিচালনা করিয়া থাকে; তবে যাহাতে সাম্রাজ্যান্তর্গত ষ্টেট সমূহের মধ্যে শিক্ষাব্যবস্থার সমতা ও সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়, তজ্জন্য সকলেই সমষ্টি ও ব্যষ্টিভাবে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া থাক।

ফ্রান্স, রুশিয় ও অষ্ট্রিয়ার তুলনায় জার্ম্মাণীতে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা অতি সামান্য। প্রতি বৎসর যত লোককে সৈন্যদলে ভর্ত্তি করা হয়, তন্মধ্যে নিরক্ষরের সংখ্যা ফ্রান্সে ৫০ অষ্ট্রিয়াতে ২১০ এবং রুশিয়াতে ৭০০ এরও অধিক; কিন্তু জর্ম্মনিতে হাজার করা তিনজনেরও কম। এতদ্বারা জর্ম্মাণিতে প্রাথমিক শিক্ষার বহুল বিস্তৃতিই প্রমাণিত হয়।

জর্ম্মাণিতে সমস্ত ষ্টেটেই অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন। প্রাথমিক শিক্ষার সাকুল্য ব্যয়ের এক তৃতীয়াংশ ষ্টেট্ হইতে দেওয়া হয়; অবশিষ্ট দুই তৃতীয়াংশ স্কুলের স্বত্বাধিকারী বা পরিচালকগণকে সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়। প্রুশিয়াতে জমীদারগণকেই আইনানুসারে এই ভার বহন করিতে হয়।

সর্ব্বত্রই ছয় হইতে চৌদ্দবৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রাইমারী স্কুলে পড়িবার নিয়ম। প্রথমে সহর ও মফস্বলে সর্ব্বত্রই একই প্রকার প্রাথমিক শিক্ষা পদ্ধতির প্রচলন ছিল। কিন্তু শীঘ্রই এই প্রথার একটা গুরুতর দোষ দেখা গেল। পল্লীগ্রামের প্রাথমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত বালকগণ স্ব স্ব পিতৃ ব্যবসায় ও পল্লীগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া চাকুরীর অন্বেষণে সহরে যাইতে লাগিল। ইহাতে কৃষি প্রভৃতির বিশেষ অনিষ্ট হওয়ায় প্রুসিয়ার জমীদারদের চেষ্টায় সম্প্রতি পল্লীগ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চশ্রেণীতে কৃষি প্রভৃতি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। একদিকে পল্লীগ্রামের ছেলেরা সহরের দিকে বড় একটা যাইতে

চাহে না। জার্ম্মাণির অন্যান্য ষ্টেটেও প্রুশিয়ার এই দৃষ্টান্ত অনুসৃত হইয়াছে।

রুগ্ন ও দুর্ব্বল বালক বালিকাগণের জন্য সহরের বাহিরে মুক্ত বায়ুতে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা প্রথমে প্রুসিয়াতেই আরম্ভ হয়। অন্ধ, মূক ও বধিরদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপনেও প্রুশিয়া প্রথম অগ্রণী। এই সমুদয় বিদ্যালয় সাধারণতঃ মিউনিসিপালিটীর ব্যয়ে ও তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইয়া থাকে। প্রাইমেরি স্কুলের নিম্নতম শ্রেণীতে সপ্তাহে কুড়ি ঘণ্টা ও উচ্চ শ্রেণীতে ত্রিশ ঘণ্টা অধ্যাপনা হয়; তন্মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ছয় ঘণ্টা এবং ব্যায়াম ও ব্যবহারিক শিল্প শিক্ষার জন্য দুই ঘণ্টা ব্যয়িত হয়। প্রত্যেক স্কুলেই ধর্ম্মশিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আছে; ইহাই জর্ম্মাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান বিশেষত্ব। স্থানীয় ধর্ম্মযাজকগণ কর্ত্তৃকই এই ধর্ম্মশিক্ষা প্রদত্ত হয়। যে স্কুলে একাধিক মতাবলম্বী ছাত্র থাকে, সেখানে রোমান্ ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বী পাদরী পর্য্যায়ক্রমে ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া থাকেন। সাধারণতঃ সপ্তাহে ৪।৫ ঘণ্টার বেশী ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হয় না।

মোটামুটী চৌদ্দবৎসর বয়সে প্রাথমিক শিক্ষার সমাপ্তি হয়। সাধারণতঃ দেখা যায় যে প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষা শেষ হইলেই অভিভাবকগণ ছাত্রদের দ্বারা কিছু রোজগার করাইবার জন্য অতি মাত্র ব্যগ্র হন। কিন্তু যেরূপ দিন কাল পড়িয়াছে, তাহাতে শুধু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রদের পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষেত্রে জয়লাভ করা অধিকাংশ স্থলেই সম্ভবপর ও সহজসাধ্য নহে। এইজন্য স্যাক্সনি (Saxony) প্রভৃতি কয়েকটী ষ্টেটে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পরেও আরও কিছুদিন উন্নততর বিষয়ে শিক্ষালাভের জন্য ছাত্রগণকে বাধ্য করা হয়। সম্প্রতি প্রুশিয়াতেও এই নিয়ম প্রচলিত করা হইয়াছে। এই শেষোক্ত ষ্টেটে এই পরবর্ত্তী শিক্ষা ব্যবস্থার ভার শিক্ষা সচিবের হস্তে না রাখিয়া বাণিজ্য সচিবের হস্তে প্রদান করা হইয়াছে। জর্ম্মণভাষা, গণিত অঙ্ক শাস্ত্র, জ্যামিতি ও রেখাঙ্কন বিদ্যা (Drawing) সাধারণতঃ এই কয়েকটী বিষয়েই এখানে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে এবং প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকেরাই এই কাজ করেন। স্কুলে অনুপস্থিত হইলে স্থানীয় শাসনকর্ত্তার শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা আছে। স্যাক্সনি, ওয়ার্টেম বার্গ (Warttemburg), বাদেন্ (Baden) প্রভৃতি ষ্টেটে এইরূপ শিক্ষার সঙ্গে কৃষি ও ব্যবসা বিষয়ক শিক্ষা প্রদানেরও ব্যবস্থা আছে। প্রুশিয়াতে এতৎসঙ্গে বালকগণকে ২।১টী ব্যবহারিক শিল্পকার্য্য ও বালিকাগণকে গৃহ কর্ম্ম পদ্ধতি শেখান হয়।

প্রাইমারী স্কুল ছাড়াও আর এক রকমের স্কুল আছে,—তাহার নাম "মধ্যবিদ্যালয়" (middle schools) প্রাথমিক বিদ্যালয় অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর শিক্ষা প্রদানই এই সমস্ত স্কুলের প্রধান উদ্দেশ্য। এই স্কুলে সাধারণতঃ পাঁচটী শ্রেণী আছে; প্রত্যেক শ্রেণীতে পঞ্চাশ জনের অধিক ছাত্র লইবার নিয়ম নাই। মধ্যবিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে অন্ততঃ একটী বৈদেশিক ভাষা শিক্ষা করিতে হয়; এবং সুবিধা হইলে. কৃষি খনিজ বিদ্যা, জাহাজ নির্ম্মাণ. ব্যবসাবাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়েও মোটামুটী শিক্ষা দেওয়া হয়। যাঁহারা মধ্যবিদ্যালয়ের শিক্ষকতা কার্য্য করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগকে একটী বিশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়। প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকদের অপেক্ষা ইঁহাদের বেতনও কিছু বেশী। এই সমস্ত স্কুলের ছাত্র খুব অল্প এবং মেধাবী ছাত্রগণ বৃত্তিলাভ করিয়া বিনাবেতনে উচ্চ বিদ্যালয়ে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িবার অধিকার প্রাপ্ত হয়।

জার্ম্মাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের একটী প্রধান দোষ এই যে এখানে ছাত্রদের ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতা বিকাশের কোন ব্যবস্থাই নাই। আদেশ পালন ও নিয়মানুবর্ত্তিতা—এই দুইটীই জার্ম্মাণ স্কুলের প্রধান বিশেষত্ব।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর "উচ্চ বিদ্যালয়ের" (High schools) শিক্ষারম্ভ হয়। প্রাইমারী স্কুলগুলি যেমন স্থানীয় লোকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়, উচ্চ বিদ্যালয় সম্বন্ধে সেরূপ ব্যবস্থা নাই। সাধারণতঃ গবর্ণমেণ্টের অর্থসাহায্যে ও সরকারী শিক্ষাবিভাগের তত্ত্বাবধানে এই সমস্ত স্কুল পরিচালিত হইয়া থাকে। শিক্ষার্থীগণকে স্কুল সংশ্লিষ্ট ছাত্রাবাসে থাকিবার জন্য বাধ্য করা হয় না।

সাধারণতঃ তিন প্রকারের উচ্চবিদ্যালয় দেখিতে পাওয়া যায়। (১) প্রথম প্রকারের বিদ্যালয়ে অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক ও লাটিন্ ভাষা শিক্ষা করিতে হয়; (২) দ্বিতীয় প্রকারের স্কুলে শুধু লাটিন শিখিলেই চলে এবং (৩) তৃতীয় প্রকারের স্কুলে কেবল মাত্র আধুনিক বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, অর্থাৎ এখানে গ্রীক ও লাটিন্ শিখাইবার নিয়ম নাই। প্রত্যেক প্রকার স্কুলেই সাধারণতঃ নয় বৎসর পড়িতে হয়; তবে যাহারা এত দীর্ঘ সময় পড়িতে পারে না, তাহাদের জন্য ছয় বৎসরে পাঠ সমাপ্তির ব্যবস্থাও আছে।

প্রথম প্রকারের উচ্চবিদ্যালয়ে ধর্ম, জর্ম্মাণ ভাষা ও জর্ম্মাণ ইতিহাস, লাটিন্, গ্রীক, ফরাসী ভাষা, সাধারণ ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, বিজ্ঞান, হস্তাক্ষর ও রচনা এবং রেখাঙ্কন বিদ্যা,—সাধারণতঃ এই কয় বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। দ্বিতীয় প্রকারের স্কুলে গ্রীক ভাষা বাদে আর সমস্তই শিখান হয়। এবং তৃতীয় প্রকারের স্কুলে গ্রীক ও লাটিনের পরিবর্ত্তে ইংরাজী ও ফ্রিহ্যাণ্ড ড্রইং (Free hand Drawing) শিক্ষা দেওয়া হয়। নিম্নতম শ্রেণীতে সপ্তাহে পঁচিশ ঘণ্টা ও উচ্চ শ্রেণীতে ত্রিশ ঘণ্টা অধ্যাপনা হয়। এতদ্ব্যতীত ছাত্রগণকে বাড়ীতে শিখিবার জন্য সপ্তাহে দুই তিন ঘণ্টার উপযোগী কাজ দেওয়া হইয়া থাকে।

গবর্ণমেণ্ট পরিচালিত উচ্চ বিদ্যালয় ব্যতীত স্থানে স্থানে বেসরকারী বিদ্যালয়ও আছে; কিন্তু এতদুভয়ে শিক্ষণীয় বিষয়ের কিছুমাত্র তারতম্য নাই; তবে অনেক বেসরকারী স্কুলে বিশেষ বিশেষ ধর্মমত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে।

সমগ্র জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যে এইরূপ প্রায় দ্বাদশশত বিদ্যালয় আছে এবং তৎসমুদয়ের পরিচালনের জন্য ষ্টেট্ সমূহের বার্ষিক প্রায় নয়কোটী টাকা খরচ হয়।

উপরে শিক্ষণীয় বিষয়ের যে তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই অনুমিত হইবে যে উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে অত্যন্ত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতে হয়। নানা কারণে ছাত্রগণকে বাধ্য হইয়া এইরূপ পরিশ্রম করিতে হয়। উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের নিকট হইতে উপযুক্ততার নিদর্শন পত্র (certificate) না পাইলে কাহাকেও বিশ্ববিদ্যালয়ে বা উচ্চ টেক্‌নিকাল্ স্কুলে ভর্ত্তি করা হয় না। সরকারী ও বে সরকারী যাবতীয় চাকুরীই বিশ্ব বিদ্যালয়ের বা উচ্চ টেক্‌নিকাল্ স্কুলের গ্রাজুয়েট বা উপাধিধারি গণের এক চেটিয়া। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার লাভের জন্য ছাত্রগণকে প্রাণপাত পরিশ্রম করিতে হয়। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক জার্ম্মাণকেই দুই তিন বৎসর সামরিক যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতে হয়। ইহাই জর্ম্মাণ সাম্রাজ্যের আইন। কিন্তু যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয় বা টেক্‌নিক্যাল্ স্কুলের উপাধিধারী সমর বিভাগে তাঁহাদিগকে এক বৎসর কম থাকিলেই চলে। এই সমস্ত উচ্চশিক্ষিত ভলাণ্টিয়ারগণের সামাজিক পদ ও সরকারী সম্মান খুব বেশী। ইহাদিগকে সাধারণ সৈনিকের ন্যায় কাজ করিতে হয় না; এক বারেই রিজার্ভ সৈন্যদলের অফিসারের পদ ও লেপ্টেনাণ্ট আখ্যা প্রাপ্ত হন। জন সাধারণের চক্ষে এই উপাধির মর্য্যাদা খুব বেশী। জার্ম্মাণদের কাছে এক জন সামরিক উপাধি বিহীন উচ্চশিক্ষিত লোকের অপেক্ষা সামান্য একজন লেপ্টেনাণ্টের সম্মান ও আদর খুব বেশী। এই সমস্ত অবশ্য প্রয়োজনীয়

অধিকার ও সম্মান লাভের জন্যই জর্ম্মাণ ছাত্রগণ এত অধিক খাটিয়া থাকে।

এইরূপ শিক্ষা ব্যবস্থার ফল যে খুব ভাল হইয়াছে তাহা বলা যায় না। শতকরা প্রায় ৭০ জন ছাত্রেরই দৃষ্টিশক্তি অতি ক্ষীণ (Short Sighted)। শতকরা প্রায় ৪০ জন স্বাস্থ্য ভঙ্গের জন্য সামরিক বিভাগে প্রবেশ করিতেই পারে না। ইহার ফলে জর্ম্মাণ ছাত্রদের মধ্যে আত্মহত্যাকারীর সংখ্যাও সম্প্রতি খুব বাড়িয়া গিয়াছে। বার্লিনের সংবাদ পত্রে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই পড়ে অন্ততঃ একজন ছাত্রের আত্মহত্যার সংবাদ প্রকাশিত হয়। অনুসন্ধান দ্বারা জানা গিয়াছে যে সাধারণতঃ পরীক্ষায় অকৃতকার্য্যতাই এই সমস্ত আত্মহত্যার প্রধান কারণ।

বালিকাদের জন্য উচ্চশিক্ষা পদ্ধতি তত শৃঙ্খলাবদ্ধ নহে। গবর্ণমেণ্ট ও মিউনিসিপালিটী পরিচালিত উচ্চ বালিকাবিদ্যালয় আছে বটে, কিন্তু উহাদের সংখ্যা তত বেশী নহে। বেসরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যাই বেশী। সাধারণতঃ বালকদের শিক্ষার অনুকরণেই এই সমস্ত বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রদান করা হয়। সম্প্রতি বার্লিন, লাইপজিগ (Leipzig) প্রভৃতি কয়েকটী স্থানে বালিকাদের প্রয়োজনীয় বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য কয়েকটী বিশেষ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই সমস্ত স্কুলে সাধারণতঃ ৩.৪ বৎসর পড়িতে হয়।

সমগ্র জার্ম্মাণিতে প্রায় ৩০।৪০ হাজার শিক্ষয়িত্রী আছে। ইহাদের অধিকাংশই প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকতা করিয়া থাকে। সম্প্রতি স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে জর্ম্মণির ষ্টেট সমূহ একটী বিশেষ নীতির অনুসরণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পরেই বালিকাগণ যাহাতে জীবিকার্জ্জনের জন্য কলকারখানায় প্রবেশ না করে, তজ্জন্য সর্ব্বত্রই গৃহকার্য্য, সন্তান পালন প্রভৃতি বিষয়ে আরও কিছুদিন শিক্ষালাভ করিতে তাহাদিগকে বাধ্য করা হয়।

উচ্চবিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকার জন্মে। বর্ত্তমান সময়ে সমগ্র জার্ম্মাণিতে ২৫টী বিশ্ববিদ্যালয় আছে তন্মধ্যে একটীতে সামরিক শিক্ষা প্রদত্ত হয়।

১৯১২ সালের শিক্ষা বিবরণ পাঠে জানা যায় যে ঐ বৎসরে জর্ম্মণির বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে ধর্ম্ম শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১৮৫২। এগার হাজারেরও অধিক ছাত্র আইন অধ্যয়ন করিত। আইন বিভাগ এত অধিক ছাত্র হইবার বিশেষ কারণ আছে। প্রধানতঃ আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্য হইতেই উকীল, বিচারক, শাসনকর্ত্তা ও "রাষ্ট্রীয় দূত" প্রভৃতি সংগৃহীত হইয়া থাকে। আইন বিভাগে সাধারণতঃ সাড়ে তিন বৎসর পড়িলেই যথেষ্ট হয়। তবে যাঁহারা সরকারী চাকুরী গ্রহণে অভিলাষী তাঁহাদিগকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরেও কিছুদিন অবৈতনিক ভাবে শিক্ষানবিশী করিতে হয়।

চিকিৎসা বিভাগে প্রায় চৌদ্দ হাজার ছাত্র অধ্যয়ন করে, তন্মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অন্যূন ৬০০, জার্ম্মনিতে ডাক্তারী শিক্ষার খরচ খুব বেশী; আইন বিভাগের অপেক্ষা ডাক্তারী বিভাগের ছাত্রবেতন প্রায় দ্বিগুণ। জীবাঙ্গবিদ্যা (anatomy), শারীর বিদ্যা, উদ্ভিদতত্ত্ব রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান এবং প্রাণীতত্ত্ব (zoology) সাধারণতঃ এই কয়েকটী বিদ্যা বিষয়ে শিক্ষাপ্রদত্ত হয়। প্রাথমিক ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ছাত্রগণকে প্রায় পাঁচবৎসর হাসপাতালে হাতে কলমে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে হয়। এই পরীক্ষা অত্যন্ত কঠিন। সাধারণতঃ দুইমাস হইতে আরম্ভ করিয়া নয়মাস পর্য্যন্ত এই পরীক্ষা চলে। এই দ্বিতীয় পরীক্ষার কিছুদিন পরে শেষ পরীক্ষা হয়। ইহাতে উত্তীর্ণ হইলে ছাত্রগণকে বিনা বেতনে একবৎসর হাসপাতালে কাজ করিতে হয়। তদনন্তর সে স্বাধীন ভাবে ব্যবসা করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হয়।

যাঁহারা ভবিষ্যৎ জীবনে শিক্ষকতা করিতে অভিলাষী তাঁহাদিগকে ভাষাবিভাগে (Philological course) প্রায় পাঁচ বৎসর অধ্যয়ন করিতে হয়। ১৯১২ সালে এই বিভাগে প্রায় ১৩,০০০ হাজার ছাত্র ছিল। এতদ্ব্যতীত এই বিভাগে ছাত্রগণকে ইচ্ছামত বিশেষ বিশেষ বিষয় পড়িবারও অধিকার দেওয়া হইয়া থাকে।

এস্থলে ইহা বলিয়া রাখা উচিত যে জর্ম্মণ বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু বাস্তবতা বিহীন কাল্পনিক মতেরই (theory) অধ্যাপনা হয় না; পরন্তু আবশ্যক মত বিশেষজ্ঞের অধীনে হাতে কলমে কাজ শিখাইবারও যথেষ্ট বন্দোবস্ত আছে। ইহাই জর্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব এবং এই বিশেষত্ব সাধারণতঃ অন্যদেশে এত অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায় না। জ্ঞান ও তাহার যথাযথ প্রয়োগ এতদুভয়ের সম্পূর্ণ সমন্বয় সাধনেই জর্ম্মাণ জাতির শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব এবং এই শিক্ষার প্রভাবেই জর্ম্মাণ জাতি আজি এত উন্নত। কেহ কোনও আবশ্যকীয় নূতন তথ্যের বা যন্ত্রের আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করিলে সাদরে তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রেণী ভুক্ত করিয়া লইয়া ছাত্রদের মধ্যে তাঁহার জ্ঞানের প্রচার করা হয়। এতদ্ব্যতীত এক এক বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎকৃষ্ট অধ্যাপকগণের দ্বারা অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে সময়ে সময়ে বক্তৃতাদি প্রদানের ব্যবস্থাও যথেষ্ট প্রচলিত আছে।

গরীব ছাত্রদের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন অনেক সময়েই সম্ভবপর না হইলেও মেধাবী ছাত্রদের অবৈতনিক ভাবে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থাও আছে।

জর্ম্মাণির অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়েই স্ত্রীলোকের অধ্যয়নের অধিকার থাকিলেও কোন কোন অধ্যাপক ছাত্র ও ছাত্রীগণকে এক সঙ্গে পড়াইতে স্বীকৃত হন না।

আমরা এক্ষণে জর্ম্মণির শিক্ষা বিভাগের আর এক দিকের,—উচ্চ শ্রেণীর টেকনিক্যাল স্কুলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিব। এবিষয়ে জার্ম্মানীই সর্ব্বপ্রথম পথপ্রদর্শক ও এখনও সকলের আদর্শ স্থানীয়। এই বিভাগে জার্ম্মাণ বিশেষত্ব ও কৃতিত্ব অতি সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে; এবং আজ পর্য্যন্ত অন্য কোনও জাতি এ বিষয়ে জর্ম্মাণির সমকক্ষতা লাভে সমর্থ হয় নাই। এই উচ্চশ্রেণীর টেকনিকাল স্কুলের শিক্ষার বলে জর্ম্মানি আজ শিল্প, বাণিজ্য ও ও বিজ্ঞানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিতে পারিয়াছে। আজকাল এই সমস্ত টেক্‌নিকাল স্কুলের সম্মান ও পদবী বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান ও পদবীরই অনুরূপ। উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে উপাধি প্রদানের ক্ষমতা ইহাদেরও আছে। সাধারণতঃ এই সমস্ত টেকনিকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে নিম্ন লিখিত কয়েকটী বিষয়ের অধ্যাপনা হইয়া থাকে;— (১) স্থাপত্য ও বাস্তুবিদ্যা (Architecture) (২) পূর্ত্তবিদ্যা (Civil engineering) (৩) জাহাজ নির্ম্মানাদি ও যন্ত্রবিদ্যা (Machinery) (৪) রসায়ন ও খনিজবিদ্যা এবং (৫) বিজ্ঞান ও গণিত। এতদ্ব্যতীত খনিজ বিদ্যা, কৃষি, পশুচিকিৎসা, চিত্রাঙ্কন ও গৃহনির্ম্মাণাদি বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা দিবার জন্য ভিন্ন ২ স্কুলও আছে।

সম্প্রতি বাণিজ্য বিষয়ক শিক্ষার প্রতিও জার্ম্মণির দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। এবং এজন্য অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়েরও প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এইসমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পশ্চাতে একটী বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি থাকিলে বাণিজ্য জগতে অনেক সুবিধা হয়। অথচ এজন্য যদি যুবকগণকে ব্যবসা বাণিজ্যের সহিত সর্ব্বপ্রকার সংস্রব শূন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩।৪ বৎসর পড়িতে হয়, তবে লাভ অপেক্ষা ক্ষতি হইবারই অধিক সম্ভাবনা। এই অভাব ও অসুবিধা দূরীকরণের জন্যই বাণিজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। সাধারণতঃ বণিক সম্প্রদায়ের (Merchants' Guilds) তত্ত্বাবধানেই এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হইয়া থাকে। লাইপজিগের বাণিজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈদেশিক ছাত্রের সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় সম্প্রতি তাহাদের নিকট হইতে দ্বিগুণ বেতন গ্রহণের নিয়ম করা হইয়াছে।

এখানে সাধারণতঃ তিন বৎসর পড়িতে হয়। প্রথম বৎসরে হিসাবপত্র ও জমাখরচ রাখিবার নিয়ম (পুথিগত ভাবে ও হাতে কলমে), ব্যবসা বাণিজ্যের রীতি প্রকৃতি ও নিয়ম কানুন, ও বাণিজ্য বিষয়ক গণিত শাস্ত্র প্রভৃতির শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। সপ্তাহে অন্ততঃ চারিঘণ্টা কোনও একটা বৈদেশিক ভাষা শিখিতে হয়। এতদ্ব্যতীত ছাত্রগণ ইচ্ছা করিলে জাতীয় অর্থনীতি, ব্যবহারিক পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতি অতিরিক্ত ১।১টী বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা লাভ করিতে পারে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে সপ্তাহে অন্ততঃ পাঁচ ঘণ্টা বৈদেশিক ভাষা শিক্ষা করিতে হয়। এতদ্ব্যতীত অন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্য ও তৎসংক্রান্ত আইন কানুন, ও ঔপনিবেশিক ব্যবসা পদ্ধতি (বিশেষতঃ ইংরাজ উপনিবেশ সমূহের সহিত) সম্বন্ধে রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়। শেষ দুইবৎসরে ব্যবসা বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদানে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়।

এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণতঃ চারি শ্রেণীর ছাত্র ভর্ত্তি হইয়া থাকে। (১) যাহারা প্রথম প্রকারের উচ্চ বিদ্যালয়ে পূর্ণ ৯ বৎসর পড়িয়া পাশ হইয়াছে; (২) মধ্যশ্রেণীর বাণিজ্য বিষয়ক স্কুল হইতে উত্তীর্ণ ছাত্র (৩) যে সমস্ত শিক্ষক সরকারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং (৪) যাহারা প্রথম প্রকারের উচ্চ বিদ্যালয়ে ছয় বৎসর পাঠান্তে সামরিক বিভাগে অন্ততঃ একবৎসর কাজ করিয়া সার্টিফিকেট গ্রহনান্তর কোন ব্যবসায়ে অন্ততঃ তিন বৎসর শিক্ষানবিশী করিয়াছে। এই শেষোক্ত শ্রেণীর ছাত্রের জন্য বিশেষ প্রকার অধ্যয়নের ব্যবস্থা করা হয় এবং ইচ্ছা করিলে ইহারা মাত্র এক বৎসর পড়িয়াই পরীক্ষা দিতে পারে।

এক্ষণে উচ্চ ও নিম্ন বিদ্যালয়ে অনুসৃত শিক্ষা পদ্ধতির ফলাফল সম্বন্ধে সংক্ষেপে ২।৪টী কথা বলিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। জর্ম্মানির প্রাথমিক শিক্ষা পদ্ধতির দোষগুণ যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে যে যে দোষ দেখান হইয়াছে উচ্চ শিক্ষা সম্বন্ধে ও তাহা সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। মানুষ তৈয়ারীর প্রতি, চরিত্র গঠনের প্রতি জর্ম্মণ শিক্ষকের তাদৃশ লক্ষ্য নাই। সকলকেই একই ভাবে একই সাঁচে ঢালিয়া গড়িয়া তোলা হয়। (The German system levels all to an average, almost to a uniformity.) জর্ম্মাণির শিক্ষা পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বিকাশের সুবিধা ও সম্ভাবনা নাই।

এরূপ হওয়া আশ্চর্য্য নহে যেখানে শুধু গবর্ণমেণ্টই শিক্ষাবিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা ও গবর্ণমেণ্ট রূপ যন্ত্রের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নির্ম্মাণই যে শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য, সেখানে এতদপেক্ষা অধিক আর কিছুরই আশা করা যাইতে পারে না।

যেন তেন প্রকারেণ অর্থোপার্জ্জনই জর্ম্মণদের জীবনের একমাত্র মূল মন্ত্র। তাহারা মানুষকে অর্থোৎপাদনকারী প্রাণী মাত্র বিবেচনা করে (Man is a productive animal)। সুতরাং সেই ভাবেই তাহাদের জীবন গঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই শিক্ষা ব্যবস্থার আর যে দোষই থাকুকনা কেন, একমাত্র ইহারই প্রভাবে জর্ম্মাণি আজি শিল্পবাণিজ্য ও বিজ্ঞানে জগতের শীর্ষ স্থান লাভে সমর্থ হইয়াছে।

শ্রীমন্মথনাথ মজুমদার।

— —

আমরা ও আমাদের ভাষা *

জগতের প্রথম সুপ্রভাতে যাঁহাদের হৃদয় তন্ত্রীর ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে "একমেবাদ্বিতীয়ম্," "ওঁ তৎসৎ" ও "সোঽহম্" রাগিণী বিশ্বময় বাজিয়া উঠিয়াছিল; যাঁহাদের তীক্ষ্ণদর্শন

* উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনে পঠিত বলিয়া গৃহীত।

মোহিনী প্রকৃতির মায়াজালের ভিতর দিয়া তাঁহার নিগূঢ় অন্তরাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিল; যাঁহাদের সমাধি-লব্ধ বেদ, বেদান্ত,উপনিষদের অন্তর্নিহিত অতুল রত্ন, যুগ যুগান্তর পরেও, একই উজ্জল প্রভায় সত্যের রাজ্য উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছে; যাঁহাদের যোগবাশিষ্ঠ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদির অমৃত-ধারা মরণশীল মানুষকে মৃত্যুঞ্জয় করিয়াছে, পৃথিবী সুলভ রোগ শোক তাপের জ্বালার উপর শান্তির স্নিগ্ধ শীতল ধারা ঢালিয়া দিয়াছে; তরুতলবাসী, ভিক্ষোপজীবী কিম্বা ফলমূলাহারী হইয়াও যাঁহারা ভূ ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ নৃপতি হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য পর্ণকুটীরবাসী পর্য্যন্ত সকলেরই নিকট সমানভাবে পূজিত হইয়াছেন— আমরা তাঁহাদেরই বংশধর!

—কিন্তু আজ আমরা কি?—আমাদের অতীতের গৌরব, জাতীয় জীবনের বিশেষত্ব, আমাদের অতুল আধ্যাত্মিক সম্পদ্, সকলই আমরা বিস্মৃত হইয়াছি। আজ আমরা স্রোতের সেহালার মত ভাসিয়া বেড়াইতেছি—কোথাও স্থির হইয়া দাঁড়াইবার শক্তি আমাদের নাই; আজ আমরা পরের চক্ষুতে চক্ষুষ্মান হইয়া আমাদের অতীতকে দেখিয়া থাকি; উত্তরাধিকার সূত্রে যে অতুল আধ্যাত্মিক সম্পদের আমরা অধিকারী, পরের অচিরস্থায়ী ঐশ্বর্য্যের মোহে আচ্ছন্ন হইয়া সেই অতুল সম্পদ্ পায়ে ঠেলিয়া, আজ আমরা পরের ক্ষণস্থায়ী সম্পদের লোভ করিতেছি! আমাদের স্বাধীন চিন্তা নাই—জাতীয় ও ব্যক্তিগত বিশেষত্ব উপলব্ধি করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার শক্তি নাই; নিজের প্রকৃত মঙ্গল বুঝিতে পারি না—অপরে যাহা ভাল দেখে, ভাল বলে, করিতে চাহে, অন্ধভাবে আমরাও তাহাই ভাল দেখি, ভাল বলি ও করিতে চাই। তাহাদের পুরুষানুক্রমিক অভ্যাস, তাহারা পিতৃপিতামহের পদানুসরণ করিয়া চলে, তাই তাহারা কৃতকার্য্য হয়; কিন্তু যে দিকে আমাদের রক্তের গতি, তাহার বিরুদ্ধ দিকে চলিতে যাইয়া পদে পদে আমরা বিপদ্গ্রস্ত হই, এবং কখনও যদি বা সফলতা লাভ করি, তাহাতেও শান্তি হয় না, কারণ তাহা পূর্ণ কিংবা স্থায়ী হয় না। আজ আমরা প্রকৃতপক্ষে পরাধীন—আপনার অবস্থা, আপনার সুখস্বচ্ছন্দতার দিকে লক্ষ্য না করিয়া আমরা পরের তৃপ্তি সাধনের জন্য লালায়িত! পরের চক্ষু ভাল দেখিবে বলিয়া আমরা বেশ ভূষা করি—পরের চক্ষুর তৃপ্তির জন্য আমরা তাহার ইচ্ছামত আমাদের নিজেদের গৃহিণীকে সাজাইয়া থাকি! ফলে কি হয়?—দারিদ্র্য বৃদ্ধি এবং অশান্তির সৃষ্টি আর গৃহিণীর ভোগ-বাসনার প্রসার! যিনি একদিন শান্তির প্রতিমূর্ত্তিরূপে হিন্দুর ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেন, স্বামীতে আপনাকে বিলোপ করিয়া দিয়া জগতে অমৃতধারা বর্ষণ করিতেন, সেই তিনি আজ স্বামী-বলদের পৃষ্ঠারূঢ় চিনির ভাণ্ডটিতে পরিণত! স্বামী তাঁহার মিষ্টতা উপলব্ধি করিতে পারেন না—শুধু ভারেই ক্লিষ্ট! কিন্তু এজন্য দায়ী কে? স্বামী নিজেই। আপনার ও সহধর্ম্মিণীর মধ্যে বিলাস-বাসনার যে ব্যবধান তিনি সৃষ্টি করিয়া তোলেন, সহধর্ম্মিণী সেই ব্যবধানের মধ্য দিয়া আর তাঁহাকে স্পষ্ট দেখিতে পায় না—স্বামী দেবতা গহনা-পত্রের অন্তরালে পড়িয়া থাকেন। আহার বিষয়েও আমাদের সেই অবস্থা। শরীর ধারণের জন্য যাহা উপযোগী, অধিকাংশ স্থলেই তাহাতে আমাদের রুচি হয় না—রসনার তৃপ্তি সাধনই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। কর্ম্ম-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে যাইয়াও আমরা নিজের শক্তি সামর্থ্য অনুসারে পন্থা নির্ব্বাচন করি না— ফলে লাভ হয়, অর্দ্ধভোজন ও মনস্তাপ। সাহিত্য চর্চায় ও আশানুরূপ ফল লাভ হয় না। হয়, মনের বিশৃঙ্খল ভাবগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিতে পারি না, নয়ত ভাবগুলিকে ব্যক্ত করিবার ভাষা খুঁজিয়া পাই না, অথবা ভাষা পাইলেও সেই ভাষা পাঠকের হৃদয়ে ঝঙ্কার তুলিতে সমর্থ হয় না। ভাবগুলিও অধিকাংশ স্থলেই

আমাদের নিজস্ব নয়—আমাদের দেশের আব হাওয়ায় সে ভাব জন্মে না, জন্মিলেও পুষ্টিকর উৎসাহ-খাদ্যের অভাবে তেমন সবল ও পুষ্ট হইয়া উঠিতে পারে না। এই জন্যই আজ পাশ্চাত্য স্বীকার পত্র না পাইলে আর আমাদের দেশের সাহিত্যিক সাহিত্যিক বলিয়া স্বীকৃত হন না; এবং যখন তাঁহার মহিমা পাশ্চাত্য ভেরীর অনুকরণে দেশীয় ঢাকে বাজিতে আরম্ভ করে, তখনও প্রকৃত পক্ষে সমগ্র দেশটাই তাঁহার অস্তিত্ব বিষয়ে অনভিজ্ঞ রহিয়া যায়, এবং যাঁহারা তাঁহার সুখ্যাতি না করাটাকে আপনাদের পক্ষে অগৌরব জনক বলিয়া আশঙ্কা করেন এবং সেইজন্য সুখ্যাতি করেন তাঁহাদের হৃদয়েও বড় একটা স্পন্দন লক্ষিত হয় না। কিন্তু এমন দিন গিয়াছে যখন আমাদের কবির বীণা ঝঙ্কারে রাজ অট্টালিকা ও দরিদ্রের কুটীরে সমান প্রতিধ্বনি উঠিয়াছে, এবং এখনও সেই ঝঙ্কারে আমাদের প্রাণ পুলকে শিহরিয়া উঠে। তখন কেন কাব্যের ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে দেশহৃদয়ের উপর কবির প্রতিষ্ঠা হইত আর এখন কেন কবির আগে আগে ভেরী বাজাইয়া তাঁহার আগমন ঘোষণা করিতে হয়!

—কেমন করিয়া আমাদের এই শোচনীয় অবস্থা হইল? * মানবীয় চিন্তা ও ভাব রাজ্যের অতুল সম্পদ আহরণ করিয়া যাঁহারা সমগ্র বিশ্বে জ্ঞানের জ্যোতিঃ বিস্তার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সমাহৃত সম্পদের অধিকারী হইয়া, বিশেষতঃ ধমনীতে ধমনীতে তাঁহারই ধ্যান-ধারণা, চিন্তা ও ভাবের প্রবাহ ধারণ করিয়া, চিন্তা ও ভাব রাজ্যে আজ কেমন করিয়া আমরা এত দীন হীন হইয়া পড়িয়াছি? আজ কেমন করিয়া আমরা নিঃসঙ্কোচে, সুধু তাহাই নহে, সগৌরবে পরের ভাব, পরের ভক্তি ও পরের বিশ্বাসের পশরা লইয়া দেশের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি? আর কেমন করিয়াই বা আবার আমাদের হৃদয়ে স্বাধীন চিন্তা ও

* কারণ ছাড়া কার্য্য হয় না। কেন আমাদের এই "শোচনীয়" অবস্থা হইয়াছে, লেখক তাহার কারণগুলি তলাইয়া দেখিতে চেষ্টা করিলে ভাল হইত। দেশের হৃদয়ে ও মনে এখনকার চেয়ে প্রাচীনকালে কবি ও কাব্যের প্রতিষ্ঠা দ্রুততর ও বিস্তৃততর হইত তাহার অনেক কারণের মধ্যে নিম্নলিখিত কারণগুলি প্রধান বলিয়া মনে হইতেছে। (১) পূর্ব্বে কাব্যের এক মস্ত সহায় ছিল সঙ্গীত,—একখানা কাব্য রচিত হওয়া মাত্র দল বাঁধিয়া লোকে সারা দেশময় তাহা গাইয়া বেড়াইত; এইরূপে কাব্যের এক এক খণ্ড সংগ্রহ না করিয়াও হাজার হাজার লোক যুগপৎ তাহার রসাস্বাদন করিতে পারিত। (২) পূর্ব্বে মানব হৃদয়ের স্থূল স্থূল ভাবগুলি, সাধারণ গৃহস্থের ঘরকন্না সুখ দুঃখের কথা লইয়াই প্রধানতঃ কাব্য রচিত হইত, এবং সেই কাব্য সর্ব্বসাধারণে সমান ভাবে উপভোগ করিতে পারিত। এখন বাঙ্গালা কাব্য দ্রুতবেগে সূক্ষ্ম ও উচ্চ অনুভূতিময় হইয়া পড়িতেছে, এমন সব ভাবানুভূতি তাহার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতেছে, জনসাধারণে যাহা ক্বচিৎ অনুভব করে। কাজেই জনসাধারণের হৃদয় এই গুলি হইতে বিমুখ হইয়া ফিরিয়া যায়। কিন্তু সেই জন্য এই সকল কাব্যকে গালি পাড়িয়া বিশেষ কিছুই লাভ নাই। উপনিষদ সর্ব্ব সাধারণের পাঠ্য নহে বলিয়া তাহার উপর রাগ করা চলেনা। (৩) বর্ত্তমানে কাব্য প্রচারের পন্থা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। ১০০০ হয়ত ছাপা হয়, ১০বৎসরে হয়ত মাত্র পাঁচশত বিক্রয় হইল। কাজেই দশ বৎশরে মাত্র পাঁচশত লোকে সেই কাব্যের পরিচয় পাইল। সাধারণ ভদ্রলোক, যিনি বেশ খাইয়া পড়িয়া আছেন, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবেন দেখি তিনি মাসে কয়খানা নূতন পুস্তক কিনেন? বৎসরে কয়খানা কিনেন? দেশের জন সাধারণের কাব্যের প্রতি এই ঔদাসীন্য হেতুই কাব্য-প্রচার এত ধীরগতি। পূর্ব্বে সঙ্গীত সহায়ে যাহা ছয় মাসে দেশময় প্রচারিত হইয়া পড়িত এখন উক্ত কারণে ছাপাখানার মত মস্ত সহায় পাইয়াও তাহা কোনকালে তেমন প্রচারিত হইতে পারে না।

ভাব জাগ্রত হইবে, এবং আমাদের ভাষা দেশের ভাষা হইবে?—ইহাই আমাদিগের বর্ত্তমান জাতীয় ও সাহিত্যিক সমস্যা।

—উত্তরাধিকার-সূত্রে সন্তান যেমন পূর্ব্বপুরুষের বিষয়সম্পত্তির অধিকারী হইয়া থাকে, উত্তরাধিকার-সূত্রে তেমন সে তাঁহার ভাষারও অধিকারী হইয়া থাকে। এবং এই ভাষার অভ্যন্তর দিয়াই জাতীয় ভাবের প্রবাহ, জাতীয় জীবনের ধারা, তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাহাকে জাতীয় ভাবে স্পন্দিত ও জাতীয় জীবনে সঞ্জীবিত করিয়া থাকে। পূর্ব্বপুরুষাগত অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে পারিলে সে সুখে দিন কাটাইতে পারে, আর করিতে না পারিলে দুরবস্থায় পড়িতে পারে; কিন্তু পূর্ব্বপুরুষের চিন্তার প্রণালী, ভাবের প্রবাহ, কর্ম্মের ধারা হইতে ভ্রষ্ট হইলে, তাহার ভিতর জাতীয় জীবনের স্পন্দন লক্ষিত হয় না—মাতৃহীন শিশুর মত সে সকল জাতির দ্বারে মাতৃস্নেহ খুঁজিয়া বেড়ায়, কিন্তু কোথাও মায়ের কোল, মায়ের স্নেহ লাভ করিতে পারে না। সমগ্র জাতিটাই যখন এই ভাবে আপনার যুগ-যুগ সংগৃহীত বিশেষত্ব—আপনার বিশেষ জাতীয় সম্পদ—হারাইয়া ফেলে, তখন আর তাহার দুর্দ্দশার সীমা থাকে না।

প্রত্যেক জাতিরই যুগযুগান্তরের সাধনার ফলে একটা বিশেষ সম্পদ—চিন্তা, ভাব ও কর্ম্মের একটা বিশেষ ধারা—লাভ হইয়া থাকে। সাহিত্য যখন এই বিশেষ সম্পদের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া এই বিশেষ সম্পদকেই জাতীয় চক্ষুর সম্মুখে ধরিয়া রাখিতে সমর্থ হয়, তখনই সাহিত্যজীবন ও পুষ্টিলাভ করিয়া সার্থক হইয়া থাকে এবং জাতির প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিতে পারে। হিন্দু জাতির প্রবর্ত্তক পুরুষগণ প্রথম হইতেই পার্থিব ভোগের ক্ষণিকত্ব উপলব্ধি করিয়া আধ্যাত্মিক চিন্তা, আধ্যাত্মিক ভাব ও আধ্যাত্মিক কর্ম্মকেই জাতীয় মঙ্গলরূপে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন; এবং তাঁহাদের শিক্ষার ফলে ও দৃষ্টান্তের বলে তখনকার সমাজের জীবন-স্রোত আধ্যাত্মিকতার খাতেই প্রবাহিত হইয়াছিল, রক্তের গুণে, সামাজিক আব হাওয়ার প্রভাবে, এবং শিক্ষাদীক্ষার ফলে তাঁহাদের অধস্তন বংশধরগণও জাতীয় জীবনের এই বিশেষত্বকেই বিশিষ্ট করিয়া তোলেন। তখন দেশে দেব-ভাষা সংস্কৃত প্রচলিত; শিক্ষকের শিক্ষার গুণে এবং ব্যক্তিগত অনন্ত আধ্যাত্মিকতার প্রভাবে সমাজ তখন আধ্যাত্মিক ভাবেই গঠিত। বিশেষজ্ঞ তখনকার সাহিত্যের প্রতিছত্রেই—সে কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, কি বৈজ্ঞানিক, কি দার্শনিক, কি আধিভৌতিক কি আধ্যাত্মিক—এই বিশেষ সম্পদটিকে লোকচক্ষুর সম্মুখে ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিত। যুগের পর যুগ হিন্দুসমাজ এইরূপ শিক্ষাই লাভ করিয়াছিল। তাই এইরূপ চিন্তা, এইরূপ ভাবনাই সমাজের প্রতিস্তরে প্রবেশ করিয়া আপামর সর্ব্বসাধারণকে আধ্যাত্মিক কথা, আধ্যাত্মিক গল্প, আধ্যাত্মিক উপদেশ শুনিবার জন্য ব্যগ্র করিয়া তুলিয়াছিল, তাই কঠোর বৈদান্তিক উপদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ধর্ম্মবিষয়ক মোটাকথাগুলি পর্য্যন্ত মোটামুটিভাবে সর্ব্বসাধারণের আয়ত্ত হইয়া পড়িয়াছিল, বিশেষতঃ অক্ষয় অমৃতের পূর্ণভাণ্ডার রামায়ণ ও মহাভারতের স্নিগ্ধ মধুর ধারা এবং পৌরাণিক কাহিনীগুলির সঞ্চিত রসের স্রোত ভারতের পল্লীতে পল্লীতে প্রবেশ করিয়া এই ধর্ম্মপ্রাণতাটাকে অধিকতর সজীব ও সরস করিয়া তুলিয়াছিল। কঠোর দার্শনিক সত্য ও বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি গল্পে ও নাটকে, সমাজ-তত্ত্বে ও ইতিহাসে, পৌরাণিক আখ্যানে ও পণ্ডিত মহাশয়ের কি সন্ন্যাসীঠাকুরের উদ্ধৃত শ্লোকে স্থান পাইয়া ধর্ম্মভাবটাকে বড়ই মনোরম ভাবে সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি করিয়া ফেলিয়াছিল, সাহিত্যের নবরসের ভিতর দিয়াই এই আধ্যাত্মিকতার স্বাদ গৃহীত হইত এবং রসগুলিতে সংযত করিয়া রাখিত।

এই ভাবে, প্রকৃত জাতীয় কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, সমাজের প্রতি স্তরের ভিতর দিয়া ও তাহা প্লাবিত করিয়া, একটা ধর্ম্মকর্ম্মময় জাতীয় জীবনের প্রবল স্রোত প্রবাহিত করা হইয়াছিল; এবং প্রত্যেক যুগের দেশ-পতি, সমাজ-পতি এবং সাহিত্যসেবিগণের প্রযত্নে

জনসাধারণের হৃদয় ও চিন্তা এবং কবির হৃদয় ও চিন্তার মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। সঙ্গীতের সহায়তা গ্রহণ না করিলে তাহা বাড়িতেই থাকিবে। প্রঃ সঃ।

ও স্মার্ত্ত পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থায় সেই স্রোত ক্রমশঃই সকল কর্ম্ম, সকল চিন্তা ও সকল ইচ্ছার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে। হিন্দুর এমন ধর্ম্ম, এমন কর্ম্ম, এমন চিন্তা, এমন ভাবনা ছিল না যাহা তাহাকে পার্থিব ভোগের ক্ষণিকত্ব ও আধ্যাত্মিক জীবনের অমরত্ব স্মরণ করাইয়া না দিত।

এইরূপ বহুযুগের সাধনার ফলে যে আধ্যাত্মিক জীবনের গঠন হইয়াছে, তাহাই আমাদিগকে বর্ত্তমানের প্রলোভনের যুগে ও জীবন-সংগ্রামের দিনে এখনও জীবিত রাখিয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সঙ্গে আমাদের জীবন তুলনা করিলেই ইহা প্রমাণিত হইবে। বৈদেশিক পরিব্রাজকগণ যখন আমাদের দেশে পদার্পণ করিতে আরম্ভ করেন, রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন বশতঃ তখনই উচ্চস্তরে প্রবাহিত আধ্যাত্মিকতার স্রোত অনেকটা ক্ষীণ ও মলিন হইয়া আসিয়াছে; বৈদেশিক আদর্শ, বিজাতীয় আচার-ব্যবহার, বৈদেশিক বিলাস-বাসনার মোহ এবং ভোগের প্রণালী তখনই অজ্ঞাতসারে আমাদের চিত্ত কলুষিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তথাপি এই পরিব্রাজকেরা আমাদের সরলতা, আমাদের ধর্ম্মবিশ্বাস, আমাদের পাপের প্রতি বিরক্তি ও আমাদের আতিথেয়তার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। অন্য দেশে সমাজ-শাসন, ধর্ম্মের শাসন, রাজার শাসন, বিবেক-শাসনও যে সকল পাপের স্রোত রুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় নাই, আমাদের দেশের নিরক্ষর লোকেরাও, রামায়ণ প্রভৃতির মধুর ঝঙ্কার কাণে মাত্র শুনিয়া, ধর্ম্মের ভয়ে, যমদণ্ডের ভয়ে, পরকালের ভয়ে, সে সকল কর্ম্ম ত দূরের কথা, কর্ম্মের চিন্তা হইতেও দূরে রহিতে সমর্থ হইয়াছে। আজ যে সকল নূতন পাপের স্রোত আমাদের সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছে তাহাদের অধিকাংশই ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় আদর্শের সহিত সংঘর্ষণের ফল—প্রবলের অনুকরণে ও প্রবলের বিরক্তি বর্জ্জনের প্রয়াসে উদ্ভূত। জীবন-সংগ্রামেও এই আধ্যাত্মিক সম্পদই আমাদের দরিদ্র কুটীরে আশার প্রদীপ প্রজ্বলিত রাখিয়া আমাদের দুর্ব্বল দেহে দৈববল সঞ্চারিত করিয়া আমাদিগকে এখনও হিন্দুজাতিরূপে জীবিত রাখিয়াছে। এমন অতুল আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারী জগতের আর কোন জাতিই হইতে পারে নাই। পৃথিবীর সকল বিজিত দেশের আদিম অধিবাসিদিগের পরিণাম আলোচনা করিলেই ইহা প্রমাণিত হইবে। তাহাদের তেমন ধর্ম্মবল ছিলনা; বিলাস-বাসনার মোহ ও পার্থিব ঐশ্বর্য্যের আকর্ষণ বিতাড়িত করিতে পরলোকে যে দৃঢ় বিশ্বাসের আবশ্যকতা, তাহাও তাহাদের ছিল না; তাই তাহারা ক্রমে ক্রমে জীবন-সংগ্রামে পার্থিব বলে সর্ব্ব-প্রকারে শ্রেষ্ঠ দেশ-বিজেতার নিকট জীবন-যাত্রার পথে বিজিত হইতে একেবারেই সবংশে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; অথবা বিজেতার পার্থিব সম্পদের নিকট আত্মবলি দিতে দিতে একেবারেই তাহার সঙ্গে সংমিশ্রিত হইয়া বর্ণ-সঙ্করে পরিণত হইয়াছে। হিন্দুই শুধু, মুসলমান এবং ইংরাজ অধিকারের পরেও হিন্দু রহিয়াছে। এইত' সে দিনকার কথা। ইংরাজ-অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে যখন পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহময় ঔজ্জ্বল্য আসিয়া আমাদিগকে অন্ধ করিয়া ফেলিতেছিল, যখন দলে দলে দেশের মাতব্বরগণ খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখনও এই ধর্ম্মই আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছিল। জাতীয় জীবনের অন্তর্দর্শী যুগপ্রবর্ত্তক মহাত্মা রামমোহন তখন অমর সত্যের শঙ্খনাদ শুনাইয়াই আমাদিগের চৈতন্য সঞ্চার করিয়াছিলেন।

অতএব দেখা যাইতেছে, আমরা ইহার প্রভাব অনুভব করিতে পারি আর নাই পারি, আধ্যাত্মিক সম্পদই আমাদের জাতীয় জীবনের বিশেষত্ব। এই সম্পদের সদ্ব্যবহার করিতে পারিলেই আমাদের পুনরুত্থান সম্ভবপর। কিন্তু সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গ দিয়া এই সম্পদের জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত করিতে না পারিলে; ধনীর অট্টালিকায় ও দরিদ্রের কুটীরে, বড় লোকের মজলিসে ও পল্লী কৃষকের আঙ্গিনায় ইহার প্রভাব পুনঃ বিস্তার করিতে না পারিলে, কিছুই হইবেনা। যতই বৈদেশিক ধারণা ও বৈদেশিক জ্ঞানের অঙ্কুর সমাহৃত করিয়া আমাদের ভাষাকে সজ্জিত ও সাহিত্যকে পুষ্ট করিতে চেষ্টা করি না কেন, আধ্যাত্মিক সম্পদের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে, তাহা কখনই দেশের ভাষা হইবেনা, এবং সাহিত্য ও কখনও নিজে সার্থক হইয়া দেশের কল্যাণ সাধনে সমর্থ হইবে না। কত গ্রন্থ প্রচার হইতেছে; কত নূতন ভাব ও নূতন ধারণার আমদানী হইয়াছে ও হইতেছে; কত গল্প, নাটক উপন্যাস চিত্তরঞ্জনের চেষ্টা করিতেছে—তথাপি কিন্তু পাঠকের বংশবৃদ্ধি হইতেছেনা! আজকাল পাঠিকা সংগ্রহ করিতে না পারিলে উপন্যাস ও নবন্যাস চলেনা; আবার, যে দুই চারি জন পাঠিকার প্রসন্ন দৃষ্টি লাভ করা যায়, তাঁহারা ও বিলাতী মেম

সাহেবের কপালে সিন্দুরের টিপ অথবা বাঙ্গালী কুললক্ষ্মীর হৃদয়ে ইংরাজ ললনার স্পন্দন দেখিতে না পাইলে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া যান্। চিত্রশিল্পের নৈপুণ্যের উপর শিশু-সাহিত্যের আদর অনাদর নির্ভর করে—কিন্তু সে চিত্রও আবার অধিকাংশ স্থলেই ভাবক সমালোচকের মোলায়েম তুলিকা স্পর্শ না পাইলে আপনার গৌরবে আপনি গুমরিয়া মরে! বিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকা ভুক্ত না হইলে নীরস সাহিত্য দপ্তরির কি প্রকাশকের গুদামেই পচিতে থাকে, এবং বিয়োগ কাতর বৃদ্ধ না পাইলে আর কাহাকেই তত্ত্ব কথা শুনাইতে পারা যায় না। ইহার কারণ কি শুধুই পাঠকের সাহিত্যানুরাগের অভাব? কখনই নহে। জাতীয় প্রাণ আপনার অজ্ঞাতসারে যাহা চাহে, জাতীয় ভাব সমুদ্রে যাহাতে লহর উঠিতে পারে, জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষার যাহাতে তৃপ্তি হইতে পারে, সাহিত্য যতদিন না তাহা দান করিবে, ততদিন কখনই সেই সাহিত্য সমাদৃত হইবে না—হইতে পারে না। পাশ্চাত্য আদর্শের সংঘর্ষে আসিয়া "শিক্ষিত" আমরা জাতীয় জীবনের স্রোত হইতে বহু দূরে সরিয়া পড়িয়াছি, আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু, আমাদের অনুকরণে ও প্রভাবে অনেকটা মলিন এবং ক্ষীণ হইয়া থাকিলেও সেই স্রোতের ধারা এখনও পল্লীবাসী স্ত্রীপুরুষের হৃদয়ের উপর দিয়াই প্রবাহিত। যে ভাষা তাহাদের হৃদয়ের দ্বারে আঘাত করিতে সমর্থ হইবে যে সাহিত্য তাহাদিগকে আধ্যাত্মিক সম্পদের দিকে আকৃষ্ট করিতে ও তাহাদের আধ্যাত্মিক আশা আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি সাধনে সহায়তা করিয়া জ্ঞান বিজ্ঞান রাজ্যের সমস্ত রত্ন তাহাদের দ্বারে আনিয়া উপস্থাপিত করিতে পারিবে; সেই ভাষা, সেই সাহিত্যই দেশের ভাষা, দেশের সাহিত্য হইবে; এবং তাহারই সাহায্যে আবার জাতীয় জীবন দৃঢ় ও বলবান্ হইয়া উঠিবে। আজকাল কবির বীণায় কত মধুর ঝঙ্কার বাজিতেছে; কবির গানে কত নূতন ছন্দ, কত নূতন তালের সমাবেশ; কবির ভাষায় কত লালিত্য; কবির চিত্রে কত 'ধারি ধরি ধরিতে না পারি' মাধুর্য্য তথাপি কিন্তু কবির নামে দেশের হৃদয় নাচিয়া উঠে না। আর এমনও দিন গিয়াছে, সে আর কত দিনেরই কথা, যখন রাম প্রসাদের ভাবের তরঙ্গে ও সুরের ঝঙ্কারে, কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের অমৃত ধারায়, জয়দেব ও কবিকঙ্কণ, চণ্ডীদাস ও দাশরথির উন্মাদনায়; এবং কৃষ্ণকমলের 'রাই উন্মাদিনীর' বিলাপে দেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, সমান ভাবে বালবৃদ্ধযুবকের ধনী ও নির্ধনের, ভদ্র ও অভদ্রের হৃদয়ের অন্তস্তল দিয়া একটা তীব্র সজীবতার সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। এখনও যদি কখনও দেশের বক্ষে স্পন্দনের ক্ষীণ তরঙ্গ দেখা যায়, সে ইহাদেরই বংশী ধ্বনিতে; ইহাদেরই জীর্ণ সেতারের ক্ষীণ আলাপনে। নাটকে উপন্যাসে কত প্রেমের চিত্র, কত প্রেমের ভাষা, কত মিলনের আবেগ, কত বিরহের বিলাপ প্রচারিত হইয়া আমাদিগের মুখে 'বুলি' ফুটাইতেছে, কিন্তু সীতার, সতীর, সাবিত্রীর, রাধার প্রেমের যে প্রভাব এখনও দেশের হৃদয়ের উপর বিরাজিত, তাহার সঙ্গে কাহারও তুলনা হয় কি? কীর্ত্তনের সুর যেরূপ 'কাণের ভিতর দিয়া মরমে যাইয়া পশে,' রাধার বিরহ ব্যাকুলতায় শ্রোতা ও পাঠকের চক্ষু যেরূপ জলে ভরিয়া আইসে, বর্ত্তমানের অলঙ্কৃত সাহিত্য-ভাণ্ডারে তাহার সমকক্ষ কিছু মিলে কি?

অধঃপতনের যুগেও যে দেশের লোক ধর্ম্মের দোহাই দিয়া অধর্ম্ম করে, শত্রুনিপাতের জন্য শিবের মস্তকে বিল্বপত্র স্থাপন করে; গেরুয়া পরিয়া, তুলসীর মালা গলায় দিয়া, জয়-রাধে চৈতন্য' বলিয়া গৃহস্থের বহু কষ্টার্জ্জিত অর্থ অনায়াসে বঞ্চনা করিয়া লয়; যে দেশের লোক খৃষ্টান পাদরিকে কীর্ত্তনের সুরে গাইতে, মুক্তি ফৌজকে গেরুয়া-বসনে ও নগ্নপদে ভ্রমণ করিতে বাধ্য করিয়াছে—সে দেশের ভাষায় যদি মহেশ্বরের মহিমা না গীত হয়, সে দেশের সাহিত্য যদি পার্থিব সম্পদের সার্থক পরিণতি আধ্যাত্মিক সম্পদে পর্য্যবসিত করিতে না পারে, আবার যদি সে দেশের সাহিত্য গল্প ও আখ্যানে, ইতিহাসে ও সমাজ-তত্ত্বে, অর্থ-নীতি ও রাজনৈতিক বক্তৃতায়, ঠাকুরদাদার চুটকি ও ঠাকুরমার গল্পে, ভাটের ছড়ায় ও কবির টপ্পায় রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতির ঝঙ্কার বাজাইয়া তুলিতে না পারে, তবে সে সাহিত্য কখনই পূর্ণতা লাভ করিবেনা, তাহাতে কখনই প্রাণের সঞ্চার হইবে না।

শ্রীকুমুদিনী কান্ত গঙ্গোপাধ্যায়।

মোক্ষদ্বার পাইয়া চোর পশিল ভাণ্ডারে।
হরিল সকল ধন কিছু নাহি ঘরে ॥
সর্ব্বধন হারাইলা কি করিলা কাজ।
অনন্ত সিদ্ধার বেসে তুমি থুইলা লাজ ॥
জ্ঞান হারাইয়া পাইলা নারীর উনমত্তা। (১)
আগে মিষ্ট লাগে নারি পাছে লাগে তিতা ॥
কামে পিড়ীত হইয়া ধন কৈলা ভশ। (২)
সকল বিনাস কৈলা জীবন কসাকস ॥ (৩)
আখিতে যে লোট গলে কণ্ঠে গলে পুইজ।
ভাঙ্গি গেল মেরুদাড়া হইয়া গেল গুজ ॥
পাকিল মাথার কেশ বগুলার পাখি। (৪)
ঘোরবরণ গুরু হৈল দুই আখি ॥
মাড়লি খাইল ঘুনে খসি পড়ে পালা।
ভাঙ্গা ঘরখানি গুরু পুনি নহে ভালা ॥
গোর্ক্ষের শুনিয়া গুরু এমত বচন।
ভালহি কহিলা গোর্ক্ষ লএ মোর মন ॥
করিলাম গ্রিহবাস হইলাম রাজ্যেশ্বর।
মাথায় ধরিল আমি ধবল ছত্তর ॥
ষোলশত রমণী সেবীতে আছে নির্ত্ত।
এ হইতে সুখ কিবা আছে প্রিথিবিত ॥
জন্মিলে মরণ আছে মরিলে জনম।
পুনঃ পুনঃ গতাগতি কিবা বেসকম ॥
মাগিয়া খাইতে মোর গাএ নাহি বল।
ঠেকিল কদলি ভোলে হৈল রথান্তর ॥ (৫)
মোরগুরু মোহাদেব জগত বিদিত।
গঙ্গা গৈরী দুই নারী তাহার সহিত ॥

(১) নারীর জন্য উন্মত্ততা।
(২) পরবশ।
(৩) প্রাণে কিনা থাকে ?
(৪) বকপাখী।
(৫) অর্থান্তর, পরিবর্ত্তিত।

এহি দুই নারী লৈয়া প্রভু সুরেশ্বর।
আনন্দে করএ কেলি দেব মহেশ্বর ॥
তান আছে গ্রিহবাস আমি কোন হৈই।
তান মোর এক গতি মুনরে গোর্ক্ষ াই ॥
এমত কইল জদি ইশ্বর মিনাই।
গোর্ক্ষনাথে বোলে গুরু তোমাকে বুঝাই ॥
হর মনিস নহে অনাদি নিধন।
ভাবিয়া দেখহ গুরু তুম্মি কোন জন ॥

দির্গছন্দ পটমঞ্জরি রাগ

ভাবি চাহ নিজমনে জ্ঞান পাইল হর স্থানে।
তোমাগুরু মোহাদেব হএ ॥
এক ভুকি নহে হর (১) অনাদি যে মহেশ্বর
ভাঙ্গ ধুতুরা নিতি খাএ ॥
নারি লৈয়া করে কেলি তর্ত্তেত না যায় ভুলি
বিস্বরণ নাহিক তাহার।
একমুর্ত্তি নহে হর সর্ব্বমুর্ত্তি নিরান্তর
নানারূপে করএ আহার ॥
সরিরেত চারি চন্দ্র (২) ব্যাপিত যে ছন্দবন্দ
তাহারে জানিয়া আছে হর।
আদি চন্দ্র গরল চন্দ্র উন্মর্ত্ত চন্দ্র নিজ চন্দ্র
এহি চারি শরীরের সার ॥

(১) একভুকি এ কভুকি বলিয়াও পাঠ করা যায় কিন্তু তাহাতে অর্থ সঙ্গতি হয় না। মহেশ্বরের অনন্ত শক্তি, অনন্ত তৃষ্ণা, একবার খাইয়াই তাঁহার ক্ষুধা ও তৃষ্ণার অবসান হয় না, এই অর্থেই বোধহয় এক ভুকি শব্দটির প্রয়োগ হইয়াছে। মহাদেব যে মরণশীল মনুষ্যের মত ক্ষীণজীবি নহেন ইহাই বুঝান উদ্দেশ্য। পরবর্ত্তী ছত্রে এই অর্থ আরও পরিষ্কার। মহাদেব নারী লইয়া কেলি করেন বটে, কিন্তু তিনি মহাজ্ঞান কখনও বিস্মৃত হন না।

(২) যোগ তত্ত্ব বিষয়ক এই সকল গুহ্য ইঙ্গিতের ব্যাখ্যা দেওয়া কঠিন।

আদি চন্দ্রে করি স্থিতি নিজ চন্দ্রে সমহিতি
উমর্ত্তেরে করিহ সন্দান।
এহি তিন সম্বরিয়া খেপা হরে মন দিয়া
গড়ল চন্দ্র যদি করে পান ॥
নিজ চন্দ্র সম্বরিয়া আপনা জে জানিয়া
তবে সে সকল রক্ষা পায়।
আর গুরু চলিবার সক্তি নাহি তোমার
জীবনের না দেখি উপায় ॥
আমি কহি তর্ত্ত বানি চাহ তুমি মনে ঘুনি
যদি থাকে জিবনের আশ। (১)
সুন গুরু কহি আইস উলটিয়া জোগে বৈস
সার তর্ত্ত দিছে মহেশ্বর ॥
উঠ ভাব আপনা ত্রিপীনিতে দেয় থানা
খাল জোড় হইতে পসর। (২)
গোর্ক্ষের বচন শুনি মিননাথে কহে পুনি
সুন বাপু মএ গোর্ক্ষরায় ॥
হৈল মুহি বিধল গাএত নাহিক বল
কহ বাপু না দেখি উপাএ।
বিধি হইল বিরাগ কেমতে সাধিব জোগ
একুলে সেকুলে কেহ নাহি ॥
চল বাপু গোর্ক্ষাই কহত সিবের ঠাহি
সংবাদ জে কহিহ বুজাই।
তোমারে দেখীয়া বাপু পাটা হৈল বুক।
মির্ত্তু কালে না দেখিল পাভুর সির্দ্ধার মুখ ॥

(১) পরবর্ত্তী একলাইন লিপিকার প্রমাদে পড়িয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

(২) উঠ, জাগ, আত্মতত্ত্ব চিন্তা কর, ত্রিপীনিতে যাইয়া আশ্রয় লও, প্রসন্ত হইবার পূর্ব্বেই খাল বুজাইয়া ফেল। ত্রিপীনি শব্দের অর্থ বুঝা গেল না।

ঝুলিখাতা নেহ বাপু আর লাউয়া লাঠি। (১)
তোমার হস্তে বাপু মুষ্টেক দিহ মাটি ॥
মাউগা জুগি বলি বাপু না দিও জে খোটা।
অনন্ত সির্দ্ধারে বাপু তুমি কর ঝুটা ॥ (২)
সুনিয়া বলিল তবে জতি গোর্ক্ষাই।
এমত ভরসা দিল ঠাকুর মিনাই ॥
জাহারে দিয়াছ ধন সেই হইল ধনি।
প্রাণ লৈয়া বাপু তোমার হৈল টানাটানি ॥
পরেরে দিয়াছি ধন আপনে হইলা টাগা।
জিবন বদলে প্রাণ কেবা হৈব লাগা ॥ (৩)
জোয়ার বহিয়া গঙ্গা পড়িয়া গেল ভাটা।
শিয়ালে কাটাল খায় বোবের মুখে আঠা ॥ (৪)
পরিশ্রম করিতে গুরু নাহি পাও স্মান (৫)।
পাথাল করিয়া দেয় নাই য়বসান (৬) ॥
শোলস কদলি বাপু জোঙ্কা থাকে বেড়ি।
মরা গরু যতনে না যাএ বেন ছাড়ি ॥
বড় কর্ম্ম কৈলা গুরু কদলিতে আসি।
মরণ বাঞ্ছিলা তুমি জীবন বিনাসি ॥

(১) সন্ন্যাসী ও বৈরাগী গণের হাতে ভিক্ষার চাউল সংগ্রহ করিবার জন্য এক একটি ঝুলাইয়া রাখিবার দড়ী সংযুক্ত লাউএর খোল থাকে; তাহাই বোধ হয় লাউয়া বলিয়া এখানে উক্ত হইয়াছে।

(২) আমি কোন ছাড়, অনন্ত সিদ্ধ মণ্ডলী ও তোমার কাছে দাঁড়াইতে পারে না।

(৩) টাগা মানে কি? এই দুই ছত্রের অর্থ স্পষ্ট নহে।

(৪) বোব একরকম জন্তু হইতে পারে।

(৫) বল, তৃপ্তি, বা সাহস অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

(৬) শেষ হইতে না হইতেই অবসাদগ্রস্থ ও বিকল করিয়া দেয়।

ভাল কর্ম্ম কৈলা গুরু তুমি মচন্দ্রর (১)।
কামিনীর কোল তুমি জুড়িছ বিস্তর ॥
কদলিতে মর যদি ঈশ্বর মিনাই।
ষোল শত কান্দিবেক তোমারে বিনাই ॥
কদলিতে হইব গুরু তোমার মরণ।
কেমনে এড়িয়া যাইব হইলা যচিন ॥
কামিনীর কোল এড়ি তুমি না যাইবা।
আপনার দোষে গুরু আপনি মরিবা ॥
যুখাইল বালুচর খালে নাহি পানি।
নৌকাখানি ডুবাইল যুখুনাতে আনি ॥
দাড়ি মাঝি পলাইল নৌকা হৈল খালি।
আপনি ডুবাইলা নৌকা কি দোষ কাণ্ডারি ॥
বিঘাটে চাপাইলা নৌকা করি পরিপাটি।
খাল নাল শুখাইল পড়িয়া গেল ভাটি ॥
ধরিতে (তুমি) যে গেলা চন্দ্র আর যুরুজ।
আবুজারে ধন দিলা করিলানা বুজ ॥
তিন তিহড়িত (২) গুরু নাহিক জননি।
প্রদিপ নিবিলে গুরু অন্ধকার জানি ॥
ঠগের হাতেতে গুরু সপিলা ভাণ্ডার।
ঢাঙ্গাতির হাতে ভরা সপীলা তোমার ॥
মাছের প্রহরী দিলা দারুণ জে উদ।
বিড়াল প্রহরী দিলা ঘন আউটা দুধ ॥
মহাতেজ কুড়ালেত সমর্পীলা তরু।
ব্যাঘ্রের সমুখে তুমি সমর্পীলা গরু ॥
দরিদ্রেত থুইলা তুমি অমূল্ল রত্তন।
কাষ্ঠের উপরে জেন অগ্নির স্থাবন।
ধান্যের ভাণ্ডারে যেন উন্দুর পসরি।
শ্রীকালের হাতে হেন হংস দিলা ধরি ॥
হিমানেত সমর্পীলা বিমল কমল।
জলের প্রহর যেন দিয়াছ আনল ॥

(১) মৎস্যেন্দ্র।
(২) তিন ভুবন।

যুকরের মুখে গুরু রাখিয়াছে গেন্দা।
মানকচু প্রহর হেন রাখিয়াছ সেন্দা ॥
সর্পের মুখেত গুরু ভেক সমর্পীলা।
শিশু হাতে সমর্পীয়া আছ পাকা কলা।
যে কিছু আনিছ ধন বাণিজ্জ করিতে।
সকলি হারাইলা গুরু গেল নানাভিতে ॥
খালি হৈল ভরা গুরু দেসে পড়িল সাড়া।
ঠগ মগ লইয়া গুরু করিয়াছ পাড়া ॥
কাণ্ডারি নাহিক গুরু পাতোয়ান (১) খসে।
নিতি নিতি ডাকা চুরি রাজার নাহি বৈসে ॥
দোল ভাঙ্গিয়া গেলে খসিয়া পড়ে চুড়া।
টলিল সকল দেহা হৈয়া গেল বুড়া ॥
নানা ভেস করিয়া বাগীনি আইসে সাজি।
হরিব সকল ধন করি হার্ষ (২) বাজি ॥
সিতল বচনে গুরু ভেদিলেক অঙ্গ।
পৃথিবি ছেদিয়া গুরু রহিলেক পঙ্ক ॥
যুখাইল সরোবর মৎস্য নিল চিলে।
নিচিন্তে হারাইলা ধন কামিনীর কোলে ॥
হারাইলা গুরু তোমার যত ব্যেভহার।
দিনে দিনে খিন দেহা না চিন্তিলা সার ॥
এক গুরু দাতা তুমি অনেক জাচক।
তোমার ভাণ্ডারে ধন যাছএ কতেক ॥
মেখলা (৩) এড়িয়া পাইলা লেপনেহালি (৪)।

(১) নৌকার তক্তা গুলিকে জোড়া দিবার জন্য এক রকম পাতলা চেপ্টা সূক্ষ্মাগ্র লৌহ খণ্ড।

(২) হাস্য।

(৩) কৌপীন অর্থে বোধ হয় ব্যবহৃত হইয়াছে।

(৪) যোগেশ বাবুর শব্দকোষে নিহাল শব্দ ফারসী হইতে আগত এবং ধনবান অর্থে প্রযুক্ত বলিয়া লিখিত। নিহাল ও নেহাল একই শব্দ বলিয়া বোধ হয়। নেহালি তাহা হইতে বিশেষ্য—অর্থ, ধন দৌলত।

ধারি এড়ি পাইলা উয়ারি মেহারি ॥ (১)
গুধুড়ি (২) এড়িয়া পাইলা খাসা মানিকমণি।
ধুক্ ধুককি এড়িয়া পাইলা হেম কুলমণি ॥
হৈর্ত্তকি এড়িয়া খাও কর্পূর তাম্বুল।
চিড়া খাথা এড়ি পাইলা কামিনীর কোল ॥
ছত্র এড়িয়া পাইলা এ তির কামান।
ভস্ম এড়িয়া পাইলা আগুর চন্দন ॥
সোণার পাইলা দণ্ড ভাঙ্গা লাঠি এড়ি।
রর্ত্তন কুণ্ডল পাইলা এড়ি সপ্ত কড়ি ॥
ভাঙ্গা পাত্র এড়ি পাইলা যুবন্তের থালা।
রুদ্রাক্ষ এড়িয়া পাইলা রর্ত্তনের মালা ॥
হস্তী ঘোড়া পাইলা গুরু আর রার্জ্জ পাট।
গুরুর বচন ছাড়ি কৈলা নারীর ঠাট ॥
কদলির রার্জ্জ পাইয়া কর রার্জ্জ ভোগ।
কামিনীর কোল পাইলা পাসরিলা জোগ ॥
গুরুর বচন খানি না যুনিয়া বাপ।
জ্ঞান হারাইয়া হৈলা বাবিয়ার সাপ ॥
সকল জানাইলাম গুরু স্থির কর মন।
পাইবা তুর্ল্লব কায়া কৈলে নারায়ন ॥
সির্দ্ধা সবে যুনিয়া বাপু মোরে দিব গালি।
গুরুদেব মৈলে মোর মুখে চুন কালি ॥
সির্দ্ধা স (বে) কি বলিয়া প্রবোধ দিব আমি।
পড়িলাম সঙ্কটে গুরু রক্ষা কর তুমি ॥

(১) উয়ারি উদয়দ্বার বলিয়া পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মোহাড়া বা মাহাড়া অর্থ সম্মুখ ভাগ। তাই উয়ারির নিকটবর্ত্তী মেহারি শব্দ সম্মুখ দ্বার অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। সম্মুখ দ্বারে সাধারণতঃ ভাল হাওয়ায় বসিবার স্থান থাকে, তাই বসিবার সামান্য আসন ধারি বা চাটাইর সহিত উয়ারি ও মেহারি উপমিত হইয়াছে। বঙ্গদেশের পূর্ব্ব-প্রান্ত-স্থিত মেহার নামক সিদ্ধিস্থান সকলেরই পরিচিত। মেহার মানে কি?

(২) গুধুড়ি কোন সামান্য অলঙ্কার হইবে।

তোমার মরণে গুরু মোর নাহি ঠাই।
সির্ষ পুত্র রাখ বাপু ইশ্বর মিনাই ॥
চরনে পড়য় বাপু কর রবধান।
সির্ষ পুত্র রাখ বাপু দিয়া মায় দান ॥
আমার বচন রাখ তোমার নাই মন।
অর্দ্ধতের কাছে যেন করয়ে সর্পন ॥
কণ্টকে পাট ভাঙ্গি সব গেল এড়ি।
সাধু সাঙ্গু গুরুদেব ফিরিবা বাহুড়ি ॥
কায়া সাধ গুরু তুমি আমি পুত্রে বলি।
বিজয় নগরে যাই তুমি আমি চলি ॥
কহে সেন শ্যাম দাসে প্রভুকে ভাবিয়া।
কহেন যে গোর্ক্ষনাথে স্থিরতা করিয়া ॥
কেনে অহিত হৈয়া কৈলা অথান্তর।
ভালমন্দ জ্ঞান নাহি যমের নাহি ডর ॥

যুই রাগ

গোর্ক্ষের বচন যুনি ইশ্বর মিনাই।
সম্বুদিয়া সির্ষ পুত্র কহেন বুজাই ॥
চলিতে না পারি বাপু গাএ নাহি বল।
কেমতে জানিব আমি ইজোগ সকল ॥
মাগীয়া খাইতে নারি য়ার ঘরে ঘরে।
কদলির রাজা মুহি কহিল তোমারে ॥
বির্দ্ধ কালে চলিবার আর নাহি দিন।
মাগীয়া খাইতে মোর মনে লাগে ঘিন ॥
পাকিল মাথার কেস টলিলেক বল।
এমত কালেত মোর টুটিল সাহস ॥
মিনের বচন যুনি কহিলা সির্দ্ধাই।
বুঝাইলে না বুজ তুজি ইশ্বর মিনাই ॥
ভাল কহ গুরু তুমি কিবা কহ কাজ।
অনন্ত সির্দ্ধার মেলে তুমি খুইলা লাজ ॥
বুঝিলাম রএ গুরু নিজ মনে বাসি।
যোগের হইলা ঠুগ কদলিতে আসি ॥

প্রতিভা



৫ম বর্ষ জ্যৈষ্ঠ ১৩২২ ২য় সংখ্যা

অল্ বা দারুহরিদ্রা

অধুনা ব্যবহৃত প্রায় সমস্ত রঞ্জন-উপকরণই কৃত্রিম উপায়ে ও জার্ম্মাণীতে প্রস্তুত। বিগত শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্য্যন্তও বৃক্ষলতাদির ফল, মূল বন্ধল প্রভৃতি, অর্থাৎ একমাত্র প্রাকৃতিক উপাদান সমূহই রঞ্জন কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হইত। কিন্তু অনুসন্ধিৎসু পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের উদ্যম ও অধ্যবসায়ের ফলে মানব-কল্পিত অগণিত বর্ণের সহস্র সহস্র রং কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হইয়া এই অল্পকাল মধ্যেই প্রাকৃতিক রঞ্জন-উপকরণের স্থান সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে। প্রতি বৎসর গড়ে ৩০ কোটি টাকা মূল্যের রং কৃত্রিম উপায়ে উৎপন্ন হইতেছে। বাৎসরিক কোটি টাকারও অধিক মূল্যের কৃত্রিম রং জার্ম্মাণী ও ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে আমদানী হইয়া থাকে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের ফলে জার্ম্মাণীর বহির্বাণিজ্য সম্পূর্ণ বিলুপ্ত, সামরিক বিধান অনুসারে ইংলণ্ড হইতে কোনও কৃত্রিম রং বিদেশে প্রেরিত হইতেছে না, ভারতবর্ষে কৃত্রিম উপায়ে রং আদৌ প্রস্তুত হয় না।

দেশীয় রঞ্জন-শিল্পের পুনরুদ্ধার

এমত অবস্থায় রং অভাবে ভারতীয় রঞ্জন-শিল্পীদিগকে যে অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কাজেই যদি এতদ্দেশীয় কোনও প্রাকৃতিক রঞ্জন-উপকরণের পুনঃ প্রচলনের চেষ্টা করিতে হয় বর্ত্তমানে তাহার উৎকৃষ্ট সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে এ দেশে যে সকল প্রাকৃতিক রঞ্জন-উপকরণ ব্যবহৃত হইত তাহাদের সমস্তগুলির বা যে কোনওটির পুনঃ প্রচলনের চেষ্টা করা বৃথা, কারণ আধুনিক প্রণালী অবলম্বনে পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, উহাদের অধিকাংশই অস্থায়ী রং প্রদান করে *। কাজেই যে সমস্ত প্রাকৃতিক রং স্থায়িত্ব বিষয়ে প্রতি-

* Dr. E. R. Watson.—Memoirs of the Asiatic Society of Bengal. Vol II. No 7. Pages 155—168.

যোগিতায় কৃত্রিম রং সমূহের সমকক্ষ কেবলমাত্র তাহাদের পুনঃ প্রচলনের চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য।

অল্ প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম রং সমূহের সমবেত তালিকায় 'নীল' ও 'অ্যালিজেরিণের' স্থান সর্ব্বোচ্চ। প্রাকৃতিক নীলের ব্যবহার পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস হইয়া থাকিলেও সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই। "অ্যালিজেরিণ" ইউরোপীয় ম্যাডার (Madder) এবং ভারতবর্ষীয় মঞ্জিষ্ঠা বা মঞ্জিৎ-মূলজাত রঞ্জন-উপকরণ। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে পারকিন্, গ্রাবা ও লিবারম্যান কর্ত্তৃক কৃত্রিম উপায়ে অ্যালিজেরিণ প্রস্তুত প্রণালী আবিষ্কারের পর রঞ্জন কার্য্যের জন্য পূর্ব্বোক্ত প্রাকৃতিক উপাদান দ্বয়ের ব্যবহার অনেকটা কমিয়া থাকিলেও এখনও অল্পাধিক পরিমাণে ম্যাডার ও মঞ্জিষ্ঠা উৎপন্ন ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এ স্থলে স্থায়িত্ব হিসাবে অতি উৎকৃষ্ট আরও একটি প্রাকৃতিক রঞ্জন-উপকরণের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। উহা এতদ্দেশীয় 'অল্'। 'অল্'-মধ্যে অ্যালিজেরিণ বর্ত্তমান থাকায় উহা মঞ্জিষ্ঠার ন্যায় অতি উৎকৃষ্ট রঞ্জন-উপকরণ। অল্ সম্বন্ধে যথাযোগ্য আলোচনা করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

অল্ নাম মধ্যপ্রদেশ ও বিহারে প্রচলিত, এবং ইহা বৃক্ষবিশেষের মূল। অলের নাম ছোট নাগপুরে "আচ বা আইচ", ময়মনসিংহে 'আউচ', উড়িষ্যায় 'আছু', লোহারডগা, মানভূম ও সিংহভূমে এবং সাওতালদের মধ্যে 'চালি', দার্জ্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার এবং দিনাজপুরে, 'দারু হরিদ্রা', বাখরগঞ্জে 'মালঙ্ক', পার্ব্বত্য ত্রিপুরায় 'রনুয়', দেশীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে 'সুরঙ্গী', এবং কখনও কখনও কাষ্ঠ-মল্লিকা

অলের পরিচয় নামে পরিচিত। অল্ বৃক্ষের বৈজ্ঞানিক নাম সম্বন্ধে উদ্ভিদতত্ত্ববিদগণের মধ্যে মতদ্বৈধ লক্ষিত হয়। †

Sir George Watt * বহু গবেষণা ও পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা এতদ্বিষয়ে প্রকৃত সত্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, এবং দেখাইয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত বৃক্ষদ্বয়ে প্রকৃত পক্ষে বৈজ্ঞানিকভাবে কোনও প্রভেদ নাই। উহারা একই বৃক্ষের বিভিন্ন অবস্থা মাত্র। প্রথমটি কৃষিজাত ও দ্বিতীয়টি আরণ্য বৃক্ষ, এবং উহাদের মূল ব্যবসায়ীদের মধ্যে যথাক্রমে 'ছোট অল্' ও 'মতি অল্' নামে পরিচিত।

পরপৃষ্ঠায় ছোট অল্ ও মতিঅল্ বৃক্ষের প্রভেদ প্রদর্শিত হইল—

---

† কাহারও কাহারও মতে অল্ বৃক্ষ Morinda Citrifolia, অপর পক্ষের মতে উহা Morinda Tinctoria.

* Agricultural Ledger. No. 9.—1895.

ছোট অল্	মতি অল্
১। অর্দ্ধ হইতে দুই ফুট উচ্চ একবর্ষী বা দ্বিবর্ষী ক্ষুদ্র বৃক্ষ।	১। ৪০-৫০ ফুট উচ্চ বহুবর্ষী বৃক্ষ।
২। জ্যৈষ্ঠ হইতে পৌষমাস পর্য্যন্ত পুষ্পোদ্গম হয়।	২। জ্যৈষ্ঠ মাসে পুষ্পোদ্গম হইয়া থাকে।
৩। বীজ-বপনের চতুর্দ্দশ হইতে বিংশ মাস মধ্যে মূলের রং উৎপন্ন হইয়া থাকে।	৩। বপনের তৃতীয় হইতে পঞ্চম বৎসর পর্য্যন্ত মূল হইতে রং সংগ্রহ করা যায়।
৪। মূল ৬ হইতে ৮ ফুট দীর্ঘ, প্রায় দারুশূন্য, এবং মূলবল্কল অতি পুরু।	৪। মূল ৩ হইতে ৪ ফুট দীর্ঘ ও দারুময়, এবং মূলবল্কল অত্যন্ত পাতলা।
৫। মূলবল্কল উৎকৃষ্ট রঞ্জন-উপকরণ।	৫। মূলবল্কলে রঙ্গের পরিমাণ অতি সামান্য।

অতএব দেখা যায় যে, মতি অল্ অপেক্ষা ছোট অল্ রঞ্জন কার্য্যের জন্য অধিকতর উপযোগী, এবং অলের ব্যবহার পুনঃ প্রচলন করিতে হইলে প্রকৃত ছোট অল উৎপন্ন করিতে হইবে। এ দেশে কাষ্ঠ-মল্লিকা প্রভৃতি নামে পরিচিত যে সমস্ত বহুবর্ষী অল্ বৃক্ষ দৃষ্ট হয় তাহা মতি অল, এবং উহাদের প্রচলনের চেষ্টায় কোন ফল পাওয়া যাইবে না। প্রকৃত পক্ষে মতি অল বৃক্ষই অবস্থাভেদে রূপান্তরিত বা পরিবর্ত্তিত হইয়া ছোট অল বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। কোনও মতি অল বৃক্ষের বীজ বপন করিলে মতি অল বৃক্ষই উৎপন্ন হইবে, এবং কম হইলে তৃতীয় এবং বেশী হইলে পঞ্চম বৎসর হইতে উহার পুষ্পোদ্গম হইবে। কিন্তু যদি শেষোক্ত বৃক্ষের প্রথম ফসলের ফল হইতে সংগৃহীত বীজ বপন করা যায়, তাহা হইলে উহা হইতে ছোট অল বৃক্ষ জন্মিবে। এই প্রকার মতি অল বৃক্ষ হইতে সর্ব্বপ্রথমে ছোট অল বৃক্ষের উৎপত্তি হইয়াছে। অবশ্য পরে ছোট অল বৃক্ষের বীজ হইতেই উহার চাষ হইয়াছে।

অল্ ভারতবর্ষের নিজস্ব। ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেও অল্ এদেশে অতি উচ্চ শ্রেণীর রঞ্জন-উপকরণ রূপে পরিগণিত এবং প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে ম্যাকেন কর্ত্তৃক লিখিত Dyes and Tans of Bengal গ্রন্থ পাঠে জানা যায় 'অলের' অতীত গৌরব যে, পূর্ব্বে একমাত্র বাখরগঞ্জ জিলায় ১০,০০০—১২,০০০ বিঘা জমিতে অলের চাষ হইত, এবং উক্ত স্থান হইতে বাৎসরিক গড়ে ১২,০০০—১৫,০০০ মণ অল উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও পাঞ্জাবে রপ্তানি হইত। কিন্তু মধ্য-প্রদেশ ও বেরারেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও উৎকৃষ্ট অল্ উৎপন্ন হইত। অনেক জিলার মোট কর্ষিত ভূমির দ্বাদশ বা দশমাংশে অল্ চাষ হইত এবং বলা বাহুল্য যে, সহস্র সহস্র লোক অল্-সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। অলের চাষ ও ব্যবসায় অতি বিস্তৃত ও উন্নত, এবং অল্-উৎপাদনশীল জিলা সমূহ বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। ১৮৮২ খৃঃ অব্দে বালেশ্বরের কালেক্টর সাহেব মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, তৎকালে কোনও তন্তুবায় দুই তিন বিঘা জমিতে অল চাষ করিয়া অনায়াসে সংসারের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারিত।

বর্ত্তমান সময়ে অলের চাষ ও ব্যবহার সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এরূপ হওয়ার তিনটি কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, যথা—(১) কৃত্রিম রং সমূহের

প্রচলন ; (২) অল দ্বারা রঞ্জন-প্রণালীর জটিলতা ; (৩) অল ব্যবসায়িগণের অপরিণামদর্শিতা। কৃত্রিম রং সমূহ সংগ্রহ করা অতি সহজ, এবং উহাদের দ্বারা

বর্ত্তমান সময়ে অলের ব্যবহার

বস্ত্রাদি রঞ্জন প্রণালীও রং-প্রস্তুত-কারক-গণ কর্ত্তৃক বিনা মূল্যে বিতরিত পুস্তকাদি হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়। পক্ষান্তরে অনেক সময়ে প্রকৃত অল সংগ্রহ করা কঠিন এবং অল সাহায্যে কি প্রণালী অবলম্বনে বস্ত্র প্রভৃতি রং করিতে হয় তাহাও সাধারণের পক্ষে জানা এক প্রকার অসম্ভব, কারণ এবিষয়ে কোনও পুস্তকাদি ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, অল দ্বারা পূর্ব্বে যে প্রণালীতে বস্ত্রাদি রং করা হইত তাহা অতি জটিল এবং সময় ও ব্যয়সাপেক্ষ। অথচ কৃত্রিম রং সমূহের দ্বারা অল্প ব্যয়ে এবং অল্প সময়েই রঞ্জন কার্য্য সম্পন্ন করা যায়। তৃতীয়তঃ, অল্ জাতীয় সকল বৃক্ষ-মূলেই অল্পাধিক পরিমাণে অ্যালিজেরিণ বর্ত্তমান থাকিলেও তাহাদের অধিকাংশগুলিই রঞ্জন-উপকরণাখ্যা পাইবার উপযুক্ত নহে। কেবলমাত্র ছোট অলই উৎকৃষ্ট রঞ্জন-উপকরণ, এবং সর্ব্বতোভাবে ইউরোপীয় ম্যাডারের সমকক্ষ। কিন্তু অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত অল্ ব্যবসায়িগণ সাময়িক লাভের আশায় পূর্ব্বোক্ত যে কোনও বৃক্ষ-মূলকেই অল নামে পরিচিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছে, এবং পরোক্ষভাবে অল্‌শিল্পের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া উহাকে ধ্বংসের পথে টানিয়া আনিয়াছে। কারণ, পুনঃ পুনঃ নকল বা ভেজাল মিশ্রিত অল ব্যবহার হেতু শিল্পিগণের মধ্যে রঞ্জন-উপকরণরূপে অলের উপযোগিতা সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে। এমতাবস্থায় অলের ব্যবহার যে উঠিয়া যাইবে তাহা মোটেই আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। ধ্বংসোন্মুখ অল্-শিল্পের দুর্দ্দশা দর্শনে সার জর্জ ওয়াট ১৮৯৫ খৃঃ অব্দে যে মন্তব্য করিয়াছিলেন পাদ টীকায় তাহা উদ্ধৃত হইল। *

পাশ্চাত্য রঞ্জন-শিল্পে অল্ অপেক্ষা নিম্নতর স্তরের বহু রঞ্জন-উপকরণ উচ্চ স্থান পাইয়া থাকিলেও উহা এ পর্য্যন্ত অবহেলায় উপেক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। অল্ হইতে লাল রং বহিষ্করণ-পন্থা সম্বন্ধে ইয়ুরোপে অজ্ঞানতাবই এরূপ হওয়ার প্রধান কারণ। ১৭০০ খৃঃ অব্দে অল সর্ব্বপ্রথমে ইয়ুরোপে পরিচিত হয়। পরে বহু বৈজ্ঞানিক

পাশ্চাত্য রঞ্জন-শিল্পে অল

পণ্ডিত অল্ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু কেহই অল দ্বারা সুন্দররূপে বস্ত্রাদি রং করিতে সমর্থ হন নাই ; কাজেই পাশ্চাত্য রঞ্জন-শিল্পে অল্ প্রচলনের চেষ্টা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইয়াছে। রঞ্জন কার্য্যের জন্য অলের উপযোগিতা সম্বন্ধে ইয়ুরোপীয় শিল্পিগণের মধ্যে কিরূপ একটা ভুল ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল একটি মাত্র দৃষ্টান্ত হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। রঞ্জন-বিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিতপ্রবর ওয়ার্ডল (Wardle) তাঁহার নিকট প্রেরিত অসংখ্য অলের নমুনার মধ্যে

* "The 'Al' industry of the Central Provinces and of the Berar is in a state of rapid decline. Some few years ago the 'Al' cultivation was not only one of the most popular but most profitable of undertakings. Many large towns might be mentioned as having derived their entire wealth from some part of the trade. These are rapidly falling into ruin and the distress experienced is of course being felt more keenly by the labourers than by the better class members of the community. The introduction of aniline dyes (which have entirely superseded 'Al') may in perfect fairness be described as little short of calamity. It has reduced to the verge of starvation the inhabitants of large tracts of country and destroyed the artistic instincts of the people over a still wider area."—Agricultural Ledger No 5. 1895.

একটির দ্বারাও বস্ত্রাদি রং করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহার অন্ধ বিশ্বাস ছিল যে, ভারতবর্ষে সর্ব্বত্রই মঞ্জিষ্ঠা সহযোগে অল ব্যবহৃত হয়, এবং কাজেই তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, অল্ রঞ্জন-উপকরণ আখ্যা পাইতে পারে না, উহা মঞ্জিষ্ঠার সহিত ভেজালরূপে ব্যবহার করা যায় মাত্র। কিন্তু কয়েক বৎসর পর যখন ওয়ার্ডল ভারতবর্ষে আসিয়া শিল্পিদিগকে অল্ সাহায্যে অতি সুন্দর লালবর্ণে বস্ত্রাদি রং করিতে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন তখন তাঁহার ভ্রান্তি বিদূরিত হয়। পরে নিজেই পরীক্ষা করিয়া স্বীয় পূর্ব্বভ্রম সংশোধিত করেন, এবং ভেজালশূন্য অল্ অতি উৎকৃষ্ট-রঞ্জন উপকরণ বলিয়া স্বীকার করেন।

পূর্ব্বে বঙ্গদেশে যে যে প্রণালীতে অলের চাষ হইত তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা নিষ্প্রয়োজন। কারণ, নানাদিকে বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, পূর্ব্বে বঙ্গদেশে যে অল্ উৎপন্ন হইত তাহার সমস্তই মতি অল। অলের পুনঃ প্রচলন করিতে হইলে আমাদিগকে ছোট অল্ উৎপন্ন করিতে হইবে, এবং সাবধানতার সহিত মতি অল্ পরিত্যাগ করিতে হইবে। প্রকৃত বীজ সংগ্রহ করিতে পারিলে ছোট অলের চাষ অতি সহজ। উত্তমরূপে কর্ষিত বালুকাময় ভূমিতে কার্পাস বা জোয়ার-বীজ যে ভাবে বপন করিতে হয় ঠিক সেই রূপে ৪ ইঞ্চি ব্যবধান করিয়া পূর্ব্ববৎসরের সংগৃহীত বীজ বপন করিতে হয়। প্রতি বিঘায় ৭ সের বীজের প্রয়োজন। একমাস মধ্যে বীজ হইতে চারা অঙ্কুরিত হইয়া থাকে, এবং এক বৎসর বয়ঃক্রম হইবার পূর্ব্বেই উহার পুষ্পোদ্গম হয়। বীজ বপনের চতুর্দ্দশ হইতে বিংশ মাস মধ্যে মূল সমূহ সংগ্রহ করিতে হয়; কারণ, তৎপরে অল্ বৃক্ষের বয়ঃক্রম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তন্মূলস্থিত অ্যালিজেরিণের পরিমাণ হ্রাস পাইতে থাকে, এবং দশ পনর বৎসরের পুরাতন অলবৃক্ষমূলে মোটেই কোনও রং পাওয়া যায় না। সরল মূলগুলিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং জটিমূল সমূহ নিকৃষ্ট। সংগৃহীত মূল সমূহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে কাটিয়া আট দশ দিন পর্য্যন্ত রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলেই ব্যবহারোপযুক্ত হইল। ম্যাকেন * অল্ সম্বন্ধে যে সমস্ত হিসাব দিয়াছেন তাহা হইতে দেখা যায় যে, (১) অল্ চাষ করিতে প্রতি বিঘায় ৫০-১০০৲ টাকার প্রয়োজন। (২) প্রতি বিঘায় গড়ে ১০-৬৫ মণ পর্য্যন্ত অল উৎপন্ন হয়। (৩) পূর্ব্বে গুণানুসারে অল প্রতিমণ ১-১৮৲ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইত। (৪) অলের চাষে প্রতি বিঘায় গড়ে ৮৫-১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত লাভ থাকে। অতএব অলের ব্যবহার পুনঃ প্রচলিত হইলে উহার চাষ যে একটি বিশেষ লাভজনক ব্যবসায় বলিয়া পরিগণিত হইবে তৎবিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

অলের চাষ

অল-বীজ সংগ্রহ প্রণালী সম্বন্ধেও দুই একটি কথা এস্থলে বলা প্রয়োজন। চার পাঁচ দিন পর্য্যন্ত ফলগুলিকে স্তূপীকৃত করিয়া রাখিয়া পরে যাঁতার দ্বারা ভাঙ্গিয়া পুনরায় ১৪-১৫ দিন পর্য্যন্ত ফেলিয়া রাখিতে হয়। তখন উহাদিগকে জলে উত্তমরূপে ধৌত করিলেই খোসাভাগ পৃথক হইয়া যায়। অবশ্য পূর্ব্বোক্ত উপায়ে সংগৃহীত বীজ রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া রাখিতে হয়।

অল-বীজ

পূর্ব্বে এদেশে যে সমস্ত জটিল ও দীর্ঘ প্রণালী অনুসরণে অল দ্বারা রঞ্জন কার্য্য সম্পাদিত হইত তাহার মাত্র একটির বিবরণ নিম্নে প্রদান করা গেল। † এস্থলে রঞ্জনীয় বস্ত্রখানা দুই হাত প্রশস্ত ও ২৬ হাত দীর্ঘ অনুমান করিয়া তদনুসারে হিসাব ধরা হইয়াছে, এবং যাহাতে প্রণালীটি সহজে বুঝা যায় তজ্জন্য উহাকে ৪ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

অল দ্বারা দেশীয় রঞ্জন প্রণালী

* M'cann. "Dyes and Tans of Bengal."

† Hunter. "Asiatic Researches" 1794. Vol. IV.

১। **রঞ্জনীয় বস্ত্র প্রস্তুত প্রণালী** (প্রথম প্রক্রিয়া)—প্রস্তরীভূত ক্ষার ও তিলতৈল সংমিশ্রণে ‡ সদ্য প্রস্তুত সাবান দ্বারা বস্ত্রখানা উত্তমরূপে পরিষ্কৃত এবং ধৌত করিয়া ৮ তোলা বৃহৎ হরিতকী চূর্ণ মিশ্রিত ২ সের জলে উহাকে সমানভাবে ডুবাইয়া রাখিতে হয়, যেন হরিতকীর কষ তন্মধ্যে সকল অংশেই সমভাবে শোষিত হয়। তৎপর বস্ত্রখানা নিংড়াইয়া ও ৪৮ মিনিট পর্য্যন্ত রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ৫-৬দিন কাল তুলিয়া রাখিতে হয়।

২। **রঞ্জনীয় বস্ত্র প্রস্তুত প্রণালী** (দ্বিতীয় প্রক্রিয়া)—এক সের জলে ৫ তোলা ফিটকারী দ্রব করিয়া তন্মধ্যে প্রথমোক্ত প্রণালীতে প্রস্তুত বস্ত্রখানা কিছুক্ষণ ডুবাইয়া রাখিয়া পরে সামান্য নিংড়াইয়া ও রৌদ্রে উত্তমরূপে শুষ্ক করিয়া চারিদিন পর্য্যন্ত তুলিয়া রাখিতে হয়। তদনন্তর উহাকে পুনরায় ঠাণ্ডা জল দ্বারা ধৌত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হয়। শিল্পিদিগের মতে শেষোক্ত প্রক্রিয়ায় বিশেষ সতকর্ত্তা ও নিপুণতার প্রয়োজন, কারণ বস্ত্রখানি উপযুক্তরূপে ধৌত না হইলে উহাকে অল দ্বারা সুন্দররূপে রং করা অসম্ভব।

৩। **রং প্রস্তুত প্রণালী**—প্রকার ভেদে এক হইতে দুই সের অল চূর্ণের সহিত প্রতিসেরে একতোলা তিল তৈল মর্দন করিয়া পরে তৎসঙ্গে অর্দ্ধপোয়া ধৈইপুষ্প মিশ্রিত করিতে হয়।

৪। **বস্ত্র-রঞ্জন-প্রণালী**—একটি আবরণশূন্য তাম্র পাত্রে চৌদ্দ সের জল ঈষৎ উত্তপ্ত করিয়া তন্মধ্যে পূর্ব্বে বর্ণিত উপায়ে প্রস্তুত বস্ত্রখণ্ড ও রং প্রবিষ্ট করাইয়া দিতে হয়। ক্রমে তাপের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ৩ ঘণ্টা পর্য্যন্ত বস্ত্রখানাকে সিদ্ধ করিতে হয়, এবং শেষ সময় অবাধিত তাপ প্রয়োগে জলটাকে উত্তমরূপে ফুটাইতে হয়। পরীক্ষা করিয়া জলের রং লাল বোধ হইলে রঞ্জন কার্য্য অসম্পূর্ণ রহিয়াছে ধরিতে হইবে. এবং এমতাবস্থায় আরও কিছু ধৈইপুষ্প মিশ্রিত করিয়া দেওয়াই এক মাত্র প্রতিকার। জলের রং মেটে-বাদামী হইলে রঞ্জন কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে মনে করিতে হইবে। তৎপর বস্ত্রখানা নিংড়াইয়া এবং শুষ্ক করিয়া নদীজলে ধৌত করিয়া লইলেই স্থায়ী লাল রঙ্গে রঞ্জিত হইল। রং বন্ধকারী (Mordant) রূপে ফিটকারীর স্থানে হীরাকষ গ্রহণ করিলে বস্ত্র কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত প্রকারের জটিল প্রণালীতে অল্‌দ্বারা একখণ্ড বস্ত্র রং-করিতে অনেক সময়ে একমাস সময় লাগিত।

১৮৯৪ খৃঃ অব্দে অধ্যাপক হামেল ও পার্কীন বহু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিয়া অল্‌দ্বারা এক অতি সহজ রঞ্জন-প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রণালীটি এই—৫ ছটাক অলচূর্ণ ৩ সের জলে মিশ্রিত করিয়া ২ঘণ্টা পর্য্যন্ত রাখিয়া দিতে হইবে। তদনন্তর মূলগুলা ছাঁকিয়া পুনরায় ২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ৩ সের জলে ডুবাইয়া রাখিবে। পুনরায় ছাঁকিয়া ৩ সের জলে ২১ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রাখিতে হইবে,

অল দ্বারা সহজ রঞ্জন-প্রণালী

অর্থাৎ ২৫ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে ৯ সের জল দ্বারা অল্‌-চূর্ণকে ধৌত করিতে হইবে। তদনন্তর মূল সমূহ শুষ্ক করিয়া লইলেই তদ্দ্বারা অতি সহজে বিভিন্ন রং বন্ধকারী সহযোগে বিভিন্ন উজ্জ্বল বর্ণে বস্ত্রাদি রং করা যায়। মঞ্জিষ্ঠা বা অ্যালিজেরিণ দ্বারা রং করিতে হইলে যে ভাবে প্রস্তুত করিতে হয় ঠিক সেইরূপে বস্ত্রখানা প্রস্তুত করিয়া একটি তাম্র পাত্রে নির্দ্দিষ্ট পরিমিত জল ঈষৎ উত্তপ্ত করিয়া তন্মধ্যে পূর্ব্ব বর্ণিত উপায়ে ধৌত অল্‌-মূল ও বস্ত্রখণ্ড নিমজ্জিত করিয়া ২।৩ ঘণ্টা কাল সিদ্ধ করিলেই অতি সুন্দর বর্ণে রঞ্জিত হইয়া থাকে। অ্যালিজেরিণ এবং অল্‌দ্বারা রঞ্জন প্রণালীতে এইমাত্র

‡ প্রস্তরীভূত ক্ষারের পরিবর্ত্তে গোময়, ও তিল তৈলের পরিবর্ত্তে রেড়ীর তৈলও ব্যবহার করা যায়।

প্রভেদ, যে রঞ্জন কালে অলের সহিত ১ ভাগ সোডা বা ১২ ভাগ খড়িমাটি মিশাইয়া লইতে হয়। অল্ হইতে প্রাপ্ত রং স্থায়িত্ব এবং বর্ণোজ্জ্বলতায় ম্যাডার বা মঞ্জিষ্ঠা-জাত রং অপেক্ষা কোনও অংশে হীন নহে। অল্ দ্বারা (১) এলুমিনা (Alumina) সহযোগে কার্পাস লোহিত, ও রেশম পিঙ্গল-লোহিত বর্ণে, (২) ক্রেমিয়ম (Chromium) সহযোগে কার্পাস কপিশ, ও রেশম কপিশ-পিঙ্গল বর্ণে, এবং (৩) লৌহ সহযোগে কার্পাস ও রেশম কৃষ্ণবর্ণে রং করা যায়।

পূর্ব্বে অলমূলকে ২৫ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ধৌত করার বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। অবশ্য, ২৫ ঘণ্টার স্থলে ৫০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ধৌত করা যায় এবং উহাতে কোনও ক্ষতি হয় না। কিন্তু ৫০ ঘণ্টার অধিক ধৌত করা কোনও মতেই বিধেয় নহে। পূর্ব্বোক্তরূপে ধৌত করায় অলের ওজন অনেকটা হ্রাস পাইয়া থাকে, অর্থাৎ অল-মধ্যস্থ অব্যবহার্য্য এবং অল্পপ্রয়োজনীয় অংশ জলে দ্রব হইয়া চলিয়া যায়। পার্কিন দেখাইয়াছেন যে, অলের মধ্যে অ্যালিজেরিণ একটি শর্করা-সংযোগে যৌগিক পদার্থরূপে বর্ত্তমান থাকে। উক্ত যৌগিক পদার্থ জলে সম্পূর্ণ অদ্রবনীয়, সুতরাং মূলের সঙ্গেই থাকিয়া যায়। কিন্তু পুনঃ পুনঃ ধৌত করা সত্বেও অলমধ্যে একটি অম্লগুণ বিশিষ্ট পদার্থও থাকিয়া যায়, এবং উহার অম্লত্ব নাশ করার জন্যই অলদ্বারা রঞ্জনকালে সোডা বা খড়িমাটি মিশ্রিত করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু উহাদের কোনওটিই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হওয়া উচিত নহে। অলস্থিত যৌগিক পদার্থটিকে মৃদু অম্ল-সাহায্যে বিশ্লেষিত করিয়া অ্যালিজেরিণ পৃথক করা যায়। অল দ্বারা বস্ত্রাদি রঞ্জন করিতে হইলে উক্তরূপ বিশ্লেষণের কোনও প্রয়োজন নাই, কারণ রঞ্জনীয় বস্ত্রমধ্যস্থ রং-বন্ধকারী (Mordant) পদার্থটিই ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াথাকে।

অলের প্রকৃতি পরিচয়

পূর্ব্বে যাহা আলোচনা করা গিয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায় যে, অল উৎপন্ন করা অতি সহজ এবং অল সাহায্যে পার্কিন-নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে সহজেই কার্পাশ ও রেশম বিবিধ স্থায়ী ও উজ্জ্বল বর্ণে রং করা যায়। অর্থাৎ অল, মঞ্জিষ্ঠা বা অ্যালিজেরিণের ন্যায় অতি উৎকৃষ্ট রঞ্জন উপকরণ। ভারতবর্ষে বাৎসরিক গড়ে ৮০,০০০৲ টাকা মূল্যের কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত অ্যালিজেরিণ আমদানী হইয়া থাকে। অতএব দেখা যায় যে, রঞ্জন-শিল্পে অল্ পুনঃ প্রচলিত হইলে ভারতবর্ষেই উহার ব্যবহারের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। এস্থলে বলা আবশ্যক যে স্থায়ী ভাবে অলের প্রচলন করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে—(১) যাহাতে ভবিষ্যতে ব্যবসায়িগণ প্রকৃত অলের সঙ্গে নিকৃষ্ট অল্ বা ভেজাল মিশ্রিত করিতে না পারে। (২) যাহাতে ভূমির অবস্থা, মাল সরবরাহ করার সুবিধা প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত স্থানে অলের চাষ হয়। (৩) যাহাতে কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে অধিক পরিমাণে অথচ উৎকৃষ্ট অল্ উৎপন্ন করা যায় (৪) যাহাতে বৈদেশিক রঞ্জন শিল্পে অল্ ব্যবহৃত হয়।

অলের ভবিষ্যৎ

ভবিষ্যতে ইউরোপে অলের ব্যবহার সম্বন্ধে ওয়াট্ এর (Watt) মত পাদটিকায় উদ্ধৃত করা গেল।*

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সরকার

---

* Sir George Watt. Agricultural Ledger No 9, 1895—"Were it possible to organise a foreign trade an incalculable boon would be conferred upon a class of cultivators, who through the extension of the use of aniline dyes may be said to have been ruined. Prof. Hummel and Mr. Perkin have placed within the reach of Indian dyers an inexpensive process of simplifying the use of 'Al' dye, while they have afforded the key to the produdtion of a dye-material that might be readily exported and which would appear to have a fair chance, if landed in Evrope at a cheap rate, of finding an immediate demand."

মধু-মাধব

(১)

হর্ষে কেন অবসাদ? আমারি কি ভুল?
গাছে গাছে ডাকে পাখী ডালে ডালে ফুল!
কেঁদে কেঁদে আঁখি রাঙা জবা-কুবলয়
হায়! হায়! করি ধায় পাগল মলয়!
ফুকারে পাপিয়া একা "পিয়া-পিয়া-পিয়া"
দিকে দিকে ডাকে পিক দিল দরদিয়া!
শ্যাম নাম লিখা গাত্র চৈত্র কেঁদে বলে—
"জ্বাল সখি চিতা মোর বৈশাখী অনলে।"

(২)

এস সখা রুদ্র চণ্ড! আর্দ্র অভিরাম!
এসহে ঋত্বিক্ ঋষি! নব ঘন শ্যাম!
হে বৈশাখ-বৈখানস! ঋত্বিক-প্রবর
দিকে দিকে দাও জেলে যজ্ঞ-বৈশ্বানর
ফুকারে কপোত, ক্লান্ত তৃষিত ধরণী,
শমী সম জলে চিত্তে শোকের অরণি!
স্নিগ্ধ সান্দ্র মেঘমন্ত্র স্বরা কর পাঠ
পূর্ণ হ'ক্ শস্যরসে শুষ্ক, শীর্ণ মাঠ।
নামাও মঙ্গল ধারা পুণ্য সুশীতল
ধন্য করে' দাও ধরা ঢেলে শান্তি-জল!

শ্রীকুঞ্জচন্দ্র দে

সাহিত্যে স্বপ্নের প্রভাব

(ঢাকা সাহিত্য পরিষদে পঠিত)

অতীত কাল হইতে স্বপ্ন মানুষের হৃদয়ে বিশ্বাসের সিংহাসন পাতিয়া আসিয়াছে। তাই মানবীয় কাব্য-সাহিত্যে পুরাণ-ইতিহাসে সর্ব্বত্র স্বপ্নের উল্লেখ আছে। বিরহী রাজপুত্র রাজবালা মধুমালার সুন্দরোজ্জ্বল মুখখানা স্বপ্নে দেখিয়া পাগল। শতবর্ষ ব্যাপী শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-যাতনায় যখন জননী যশোদা মুমূর্ষু তখন তিনি স্বপ্নযোগে গোপালকে দর্শন করিয়া জাগিয়া দেখেন গোপাল নাই। যশোদা তখন গোপরাজ নন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"শুন, ব্রজরাজ স্বপনেতে আজ
দেখা দিয়ে গোপাল কোথা লুকাল।"

নন্দ কত প্রকারে স্বপ্নের অলীকত্ব সমর্থন করিলেন কিন্তু মমতারূপিণী যশোদা তাহাতে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। স্বপ্ন তাঁহার হৃদয়কে মথিত করিয়া যুগ যুগান্তের স্মৃতি জাগাইয়া তুলিল।

অতীতের আর একদিনে রাখাল বালকগণ যখন তাহাদের প্রিয়সঙ্গী কানাইকে আপনাদের গোষ্ঠ-যাত্রার সঙ্গী করিবার জন্য যশোদার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিল, তখন যশোদা পূর্ব্ব রজনীর দুঃস্বপ্নের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি গত রজনীতে স্বপ্ন দেখিয়াছি তোমরা সকলে গোষ্ঠে আছ, কিন্তু আমার গোপাল তোমাদের সঙ্গে নাই। সে জলে ডুবিয়া মরিয়াছে, তাহার ধড়া-চূড়া জলে ভাসিতেছে। এই স্বপ্ন দেখিয়া আমার মন ব্যাকুল, আমি গোপালকে তোমাদের সঙ্গে যাইতে দিব না। রাখাল বালকগণ জননীকে স্তোক বাক্যে আশ্বস্ত করিয়া গোপালকে নিজদের গোষ্ঠসঙ্গী করিয়াছিল বটে, কিন্তু কালীয় হ্রদে রাখালবালকগণের যে দুর্গতি ঘটিয়াছিল তাহাতে যশোদার স্বপ্ন আংশিক সত্য হইয়াছিল।

কালীদহের দুর্ঘটনা শ্রুতি গোচর হইতে না হইতেই

"যথার্থ হইল বুঝি স্বপন নিশার।
কালীদহে ডুবি মরে গোপাল আমার॥"

এই বলিয়া যশোদা মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন। এখানে দেখা যায় যশোদার স্বপ্নে কত দৃঢ় বিশ্বাস। রামায়ণে উল্লিখিত আছে মহারাজ দশরথ প্রিয়পুত্র রামচন্দ্রকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার কথা যে দিন সর্ব্বসমক্ষে প্রচার করেন তাহার পূর্ব্ব রজনীতে তিনি কুস্বপ্ন দেখিয়া

ছিলেন। সেই স্বপ্নান্তে তিনি রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন—

"আজি কুস্বপন দেখেছি উৎপাত।
আকাশ হইতে ভূমে পড়ে উল্কাপাত॥
পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রাস শাস্ত্রের বিহিত।
দেখি অমাবস্যায়, একি বিপরীত॥
ইত্যাদি জঞ্জাল আমি দেখিনু স্বপনে।
গর্দ্দভের পৃষ্ঠে চরি গেলাম দক্ষিণে॥
কুস্বপ্ন দেখিনু আজি নিকট মরণ।
তুমি রাজা হও তবে সফল জীবন॥"

মহারাজ দশরথ বুঝিয়াছিলেন তাহার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। কারণ স্বপ্নে গর্দ্দভারোহণে দক্ষিণে গমন মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ। বলা বাহুল্য, মহারাজের স্বপ্ন সত্য হইয়াছিল।

দেখা যায় অতীত কাল হইতে নানা জাতি স্বপ্ন বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে। এজন্য সর্ব্ব দেশের কবি-সমাজই স্বপ্নকে কাব্যে স্থান দিয়াছেন। স্বপ্ন বাঙ্গালী-জীবনে এমন সহজ ধারণায় পরিণত হইয়াছে যে, দেবতাগণ পর্য্যন্ত সময় সময় মানুষকে স্বপ্নযোগে দেখা দিয়া তৃপ্ত করেন। মনসা, মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি দেবতাগণ তাহাদের ভাগ্যবান সেবককে স্বপ্নে দেখা দিয়াছিলেন। এই শ্রেণীর স্বপ্নের দোহাইতে সমাজে অনেক লৌকিক দেবতার পূজা প্রচলিত হইয়াছে। কবিকঙ্কন চণ্ডী, রায় মঙ্গল (ব্যাঘ্রের দেবতা), অন্নদামঙ্গল, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থোৎপত্তি সম্বন্ধে প্রত্যেক কবিই স্বপ্নযোগে দেবাদেশ প্রাপ্তির দোহাই দিয়াছেন। স্বপ্নাদেশগুলির কল্যাণে দৈব-সম্বল মানুষের হৃদয়ে কাব্যের প্রতি স্বতঃই ভয়মিশ্রিত ভক্তির উদয় হয়। বঙ্গীয় কবিগণের মধ্যে অনেকেই উঠিতে বসিতে সকল সময়েই যেন দেবাদেশ প্রাপ্ত হইতেন। ইহা, সৌভাগ্যের পরিচায়ক বটে কিন্তু তাহাদের সকলের স্বপ্ন যে অকৃত্রিম, তাহা মনে হয় না।

স্বপ্ন অনেক সময় মানসিক ভাবের অনুযায়ী হয়। শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পূর্ব্বে দেবকী স্বপ্নে বিভিন্ন স্বপ্ন দেখিতেন শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী এক বিরাট পুরুষ তাঁহার উদরে প্রবেশ করিয়াছেন। ধর্ম্মরাজ্যের সম্রাট বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্ব্বে তাঁহার জননী মহামায়া এক বিচিত্র স্বপ্ন দর্শন করিয়াছিলেন। তখন কপিলবাস্তু নগরী চিরপ্রচলিত বসন্তোৎসবে মগ্ন। উৎসবের সপ্তম দিবসে রাণী নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি হিমালয় প্রদেশে এক সরোবর তীরস্থ শালবনে নীত হইয়াছেন; সুর-নারীগণ তাঁহাকে সেই সরোবরে স্নান করাইয়া সন্নিহিত সুবর্ণ প্রাসাদে লইয়া গেলেন এবং তথায় তিনি নক্ষত্র-খচিত মনোহর পরিচ্ছদে পরিশোভিত হইয়া পুষ্পশয্যায় শয়ন করিলেন। অতঃপর এক তুষারধবল মাতঙ্গ তাঁহাকে তিনবার প্রণামান্তর তদীয় দক্ষিণ পার্শ্ব বিদীর্ণ করিয়া গর্ভে প্রবেশ করিল। এই আশ্চর্য্য স্বপ্ন দর্শনান্তে মায়াদেবীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। রাজাজ্ঞায় জ্যোতিষী স্বপ্ন বিচার করিয়া জাতকের ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে রহস্যময় কাহিনী মহারাজের নিকট প্রকাশ করিলেন।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের জন্মের পূর্ব্বে জগন্নাথ মিশ্র ও শচীমাতা নানাবিধ অলৌকিক স্বপ্ন দেখিতেন। বিখ্যাত কবিরাজ গোস্বামী সেই স্বপ্ন বর্ণনায় লিখিয়াছেন—

"শচী কহে মুঞি দেখে আকাশ উপরে।
দিব্যমূর্ত্তি লোক সব স্তুতি যেন করে॥
জগন্নাথ মিশ্র কহে স্বপ্ন যে দেখিল।
জ্যোতির্ম্ময় ধাম মোর হৃদয়ে পশিল॥
আমার হৃদয় হৈতে গেলা তোমার হৃদয়ে।
হেন বুঝি জন্মিলেন কোন মহাশয়ে॥"

এই প্রকার শঙ্করাচার্য্য, রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব প্রভৃতি মহাপুরুষদের জন্মের পূর্ব্বে তাঁহাদের জননীগণ ভবিষ্যৎ-শুভজ্ঞাপক স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। পৌরাণিক উপাখ্যান-ভাগে স্বপ্নের বহুল উল্লেখ আছে। আমরা একটি দৃষ্টান্ত

দ্বারা দেখাইব কাব্যগুলিতে কেমন সুন্দর ভাবে এই শ্রেণীর-স্বপ্নের অবতারণা হইয়াছে।

বিখ্যাত সংস্কৃত কাব্য কাদম্বরীতে উল্লেখ আছে, চন্দ্রাপীড়ের জন্মের পূর্ব্বে তদীয় জনক একদিন স্বপ্ন দেখেন রাণী বিলাসবতী সৌধ-শিখরে নিদ্রিত আছেন, চন্দ্রদেব তাঁহার মুখ-বিবরে প্রবিষ্ট হইতেছেন। শাস্ত্রকারেরা বলেন, "স্বপ্ন শুভ ঘটনের সূচনা। রাত্রির শেষার্দ্ধে স্বপ্ন দেখিলে উহা বিফল হয় না।" রাজার স্বপ্ন ফলদান করিয়াছিল। রাজমহিষী বিলাসবতী পুত্ররত্ন প্রসব করিয়াছিলেন।

বিখ্যাত আফগানবীর শেরসাহের জন্মের পূর্ব্বে তাঁহার জননীও স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, "চন্দ্রদেব তাঁহার উদরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন।"

মহারাষ্ট্র রাজ্যের খ্যাতনামা বীর শিবাজীর জন্মের পূর্ব্বে জীজাবাই স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন দেবাদিদেব মহাদেব তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন "জীজা, আমি তোমার সেবায় তুষ্ট হইয়াছি। আমি তোমার গর্ভে প্রবেশ করিয়া অনেক অলৌকিক কার্য্য সম্পাদন করিব। তুমি আমাকে দ্বাদশ বৎসর সাবধানে রক্ষা করিও। তৎপর আমার যথা ইচ্ছা তথায় গমন করিব।" এই বলিয়া দেবতা অন্তর্হিত হইলেন। জাতীয় ইতিহাসে যাঁহাদের নাম উজ্জ্বল ভাবে অঙ্কিত আছে তাঁহাদের অনেকের জন্ম-বিবরণ ঈদৃশ স্বপ্ন-জড়িত।

গজনীর অধিপতি সুলতান মামুদের জন্ম-রজনীতে তাঁহার পিতা স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাঁহার গৃহমধ্যস্থ অগ্নিকুণ্ড হইতে এক বৃহৎ বৃক্ষ উত্থিত হইয়া তাহার শাখাপ্রশাখা দ্বারা পৃথিবী ছাইয়া ফেলিয়াছে। এই সমস্ত কাহিনী সত্য কি চরিতাধ্যায়কগণের কল্পিত সে বিষয়ের বিচার আমরা এস্থলে করিব না। আমাদের লক্ষ্যের বিষয় এই যে, এই সকল স্বপ্নমূলক ঘটনা প্রাচীন সাহিত্য ও ইতিহাসে সত্য বলিয়া দৃঢ়স্থান লাভ করিয়াছে, এবং মানব মনের উপরও প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিয়াছে।

যে যাঁহাকে ভালবাসেন তিনি স্বপ্নেও তাঁহাকে নিকটস্থ দেখেন। যাহাতে তাঁহাদের প্রণয়ে নৈরাশ্য ও মিলনে বিচ্ছেদ না ঘটে সেই চিন্তা হইতে এই স্বপ্ন উদ্ভূত। ইহাতে প্রেমচিত্র উজ্জ্বল হয়।

শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মের আহ্বানে শতবর্ষের জন্য ব্রজপুর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্রজধাম ত্যাগের প্রাক্কালে শ্রীমতী রাধিকা নানাবিধ কুস্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। ঐ স্বপ্নের মধ্য দিয়া ভবিষ্যৎ-বিচ্ছেদের ছায়া তাঁহার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। তজ্জন্য তিনি নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট স্বপ্নের কথা বলিয়াছিলেন। এই শঙ্কা-কাতরতা রাধিকা-চরিত্রকে প্রেম-জগতে আদর্শ করিয়াছে। স্বপ্ন দর্শনের পর হইতে প্রেম-পাগলিনী রাধিকা মনে করিতে লাগিলেন বুঝি কৃষ্ণচন্দ্র রাহুগ্রস্ত হইয়া তাঁহার ভাগ্যাকাশকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিবে। তাই তিনি দীন-নয়নে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টি করিয়া গদ্ গদ্ ভাবে বলিতে লাগিলেন, "গুণমণি, নিশ্চয় তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিবে, নচেৎ আমি এমন স্বপ্ন দেখিব কেন?" শ্রীকৃষ্ণ শতপ্রকারে আশ্বাস দিলেন, শ্রীমতীর হৃদয় আশ্বস্ত হইল না।

ভালবাসার জটিল নীতিতে বাধ্য হইয়া স্বপ্নের মধ্য দিয়াও প্রিয়জনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইতে হয়; নচেৎ ভালবাসার স্ফূর্ত্তি কোথায়? এই নীতিতে বাধ্য হইয়া বুদ্ধদেবের সংসার ত্যাগের পূর্ব্বে তদীয় গুণানুরক্তা পত্নী গোপা স্বপ্নে দেখিতেছেন—

"... ... কাঁপিতেছে ধরা—
বহিছে প্রলয় ঝড় করি বৃক্ষ-রাজি
উৎক্ষেপিত, ভূপতিত; আকাশে নিষ্প্রভ
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহরাজি; পড়িছে খসিয়া
বরিষার ফোঁটা সম নক্ষত্র সকল।
গোপার মুকুট ভগ্ন, ছিন্ন কেশ জাল,
ছিন্ন মুক্তাহার; গোপা ভগ্ন শয্যাতলে
কাঙ্গালিনী আত্মহারা পড়িয়া ধরায়।"

স্বপ্ন অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তোলে। স্বপ্নের প্রভাবে আমরা সপ্ত সমুদ্রের ব্যবধানস্থিত বন্ধুর সহিত অক্লেশে সাক্ষাৎ, এমন কি আলাপ পর্য্যন্ত করিতে পারি। নিজ ভাবী জীবনের শুভাশুভ ঘটনা আমরা স্বপ্নযোগে জ্ঞাত হইতে পারি। স্বপ্নে এই অসম্ভব সম্ভব ও ভবিষ্যদ্দর্শন ক্ষমতা থাকায় কাব্য উপন্যাসে উহার ষোল আনা প্রভাব। বৈদ্যক শাস্ত্রে স্বপ্নকে মানসিক ব্যাধি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, কিন্তু এই স্বপ্নব্যাধি কাব্যদেহের বৈরূপ্য সম্পাদন করিবে দূরে থাকুক বরং উহার স্বাভাবিকত্ব বৃদ্ধি করিয়াছে। স্বপ্নের স্বাভাবিকত্ব লক্ষ্য করিয়াও অনেক লেখক স্বপ্নের মধ্য দিয়া কাব্য, উপাখ্যান প্রভৃতি বর্ণনা করিয়াছেন। প্রতিভাবান লেখক অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় তদীয় স্বপ্ন-দর্শন শীর্ষক প্রবন্ধত্রয়ের কল্যাণে সাহিত্য-সমাজে অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধগুলি পড়িলে ভাবে মুগ্ধ হইয়া যাইতে হয়। স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনাটি আমাদের মনে যথাযথরূপে অঙ্কিত থাকে, কারণ জাগ্রৎ অবস্থায় ইন্দ্রিয়গ্রাম সর্ব্বদা বাহ্য জগতের ভাবরাশি মনের নিকট উপস্থিত করে। তাহাতে মন কোন বিষয়েই সম্পূর্ণ নিবিষ্ট হইতে পারে না। কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় বাহ্য জগতের অন্য ভাব মনের নিকট পৌঁছে না, সুতরাং স্বপ্নের ভাব অবাধে মনের কেন্দ্রাভিমুখে গমন করিতে পারে। অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের "স্বপ্ন দর্শন" পাঠ করিবার সময় পাঠক যেন জাগ্রৎ অবস্থায় স্বপ্ন দর্শন করেন। তিনি বিষয় পাঠ করিতেছেন, কি ঘটনা দর্শন করিতেছেন একথা বিস্মৃত হন। ইহাই লেখকের কৃতিত্ব; ইহারই নাম স্বপ্নদর্শন।

স্বপ্নের অলৌকিক শক্তি ৷ ভবিষ্যদ্দর্শন

কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও স্বপ্নস্থলে রূপক কাব্য লিখিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার আশা-কানন কাব্য স্বপ্নের মধ্য দিয়া পরিসমাপ্ত। দামোদর-তীর ঐ স্বপ্ন দর্শনের স্থান। কবি প্রাতভ্রমণ উপলক্ষে দামোদর তীরে উপস্থিত হইয়া প্রকৃতির মনোহর শোভা দেখিতে দেখিতে তন্ময় ভাবে এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। পর্য্যটন শ্রমে অগৌণে তিনি নিদ্রাভিভূত হইলেন। নিদ্রাভিভূত সংসারক্লিষ্ট কবি স্বপ্নযোগে এক মনোহর প্রদেশে প্রবেশ করিলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি তৎপ্রদেশস্থ এক রম্য কাননে উপস্থিত হইলে আশাদেবীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। আশার মোহিনী শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া কবি সংসারের মনোহর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতেছেন এমন সময় বিবেকরূপী ঋষির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। বিবেক-সাক্ষাতের সঙ্গে সঙ্গে আশা অন্তর্হিত হইল। বিবেক কবিকে কুহকিনী আশার পরিচয় জানাইয়া পরে সংসার-কর্ম্মক্ষেত্রে জীবের পরিণতি দেখাইলেন। অতঃপর হঠাৎ বিবেক অন্তর্হিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে দামোদরের সলিলকণবাহী শীতল সমীরণ-স্পর্শে কবির নিদ্রা ভঙ্গ হইল। জাগিয়া দেখেন তিনি দামোদর তীরে সেই তরুতলে। এই একটি স্বপ্নের মধ্য দিয়া আশাকানন কাব্য পরিসমাপ্ত। বাঙ্গালায় ঈদৃশ স্বপ্নকাব্য বিরল।

পাঠকের চিত্তকে ভবিষ্যতের দিকে আকর্ষণ ক্ষমতা দ্বারা কাব্য উপন্যাসের গৌরব প্রকাশ পায়। স্বপ্ন-বর্ণনা দ্বারা এই আকর্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তজ্জন্য প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রথমাংশে স্বপ্ন অতি অল্পকাল দৃষ্ট হয়। অন্ধকারময় পথচারী পথিক যেমন সৌদামিনীর চঞ্চলালোকে তাড়াতাড়ি সম্মুখে পথ দেখিয়া সানন্দে অগ্রসর হয়, কাব্য উপন্যাসের পাঠক তদ্রূপ ভবিষ্যৎ-অন্ধকার ঘটনাবলীর উপর স্বপ্নের আলোকরেখা দেখিতে দেখিতে ভবিষ্যতের প্রতি আগ্রহান্বিত হন। বিষবৃক্ষে পিতৃশব-পার্শ্বে শয়িতা কুন্দনন্দিনীর স্বপ্ন ইহার একটি দৃষ্টান্তস্থল। বহুকাল-মৃতা জননী কুন্দকে উপদেশ দিলেন, নগেন্দ্রনাথ

কাব্য উপন্যাসে স্বপ্ন-বর্ণনার লাভ

তাহার বিপদের কারণ। হীরা তাহার ভাগ্যাকাশে ধূমকেতু। এই স্বপ্নমূলক আখ্যান বিষবৃক্ষের কাণ্ড; ইহাতে শাখা প্রশাখা উদ্গত হইয়া বিষবৃক্ষকে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে শোভিত করিয়াছে। এই স্বপ্নটির-মোহিনী শক্তিতে বিষবৃক্ষের পাঠক ভয়ে ভবিষ্যতের দিকে গমন করেন।

পাপের পরিণাম প্রদর্শন জন্য অনেক সময় স্বপ্নের অবতারণা দৃষ্ট হয়। স্বপ্নের উপর দৈবের হাত আছে মানুষ একথা মনে করে। তজ্জন্য স্বপ্নে কুদর্শন মানুষের হৃদয়ে অমঙ্গলের করাল ছায়া বিস্তার করে। এইরূপে পূর্ব্বদৃষ্ট স্বপ্ন ভবিষ্যৎ অধঃপাতে যাইবার পথে বাধা জন্মায়। চন্দ্রশেখরে শৈবলিনীর স্বপ্ন ইহার দৃষ্টান্তস্থল। শৈবলিনীর চিত্তের গতি ফিরিল। স্বপ্ন শৈবলিনীর জীবনের গতিপথ পরিবর্ত্তিত করিয়া দিল। স্বপ্নজাত বিভীষিকা শৈবলিনীর চিত্ত শুদ্ধ করিল। রামানন্দ স্বামীর শতবর্ষব্যাপী উপদেশে যে কার্য্য না হইত, সপ্তাহ কালের স্বপ্নে তাহা সংঘটিত হইল।

তৃতীয়তঃ, স্বপ্ন দ্বারা অনুরাগের চিত্র উজ্জ্বল হয়। যাঁহাদের মধ্যে গাঢ় অনুরাগ জন্মে, স্বপ্ন-যোগেও তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। ভালবাসার এই নীতিতে অর্দ্ধজলমগ্না রজনী শচীন্দ্রনাথের নিকট আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। উহাতে তুচ্ছ রূপজমোহের আধিপত্য ছিল না।

অস্ত্রাঘাত-পীড়িত শত্রু কারারুদ্ধ। মুমূর্ষু জগৎসিংহ দেবকন্যারূপিণী নবাবনন্দিনী আয়েসাকে স্বপ্নে দেখিয়া জাগিয়াই তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সেই দয়াময়ী দেবকন্যা তুমি না তিলোত্তমা? মৃত্যু শয্যায়ও তিলোত্তমার স্মৃতি জগৎসিংহের হৃদয়ে জাগ্রত। এতদপেক্ষা উজ্জ্বল অনুরাগের নিদর্শন কি হইতে পারে? প্রণয়বিধুরা, উপেক্ষিতা মৃণালিনী হেমচন্দ্রকে স্বপ্নে সর্ব্বসমরবিজয়ী দর্শন করিয়া আশ্বস্ত হইয়াছিলেন।

চতুর্থতঃ, বিপদের প্রাক্কালে যে স্বপ্নদর্শন ঘটে তাহা মানুষকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করিয়া দেয়। কাব্য-উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা তাঁহাদের বিপদ সংঘটনের পূর্ব্বে কুস্বপ্ন দর্শন করেন। আবাল্য বন-ভ্রমণাভ্যস্তা কপালকুণ্ডলার স্বপ্ন ইহার দৃষ্টান্তস্থল।

এই প্রকারে দেখা যায় স্বপ্ন সাহিত্যের অঙ্গে অঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। সাহিত্য সমাজ-চিত্র। প্রকৃত সাহিত্য-মুকুরে মানব-মন ও সমাজের ভাবরাশি প্রতিবিম্বিত হয়। সমাজবাসী স্বপ্ন বিশ্বাস করেন তাই সাহিত্যেও স্বপ্ন চিত্রিত হইয়াছে। মানব কল্পনাবলে দেব-সমাজেও স্বপ্নকে প্রেরণ করিয়াছে। দেবতারাও যেন স্বপ্ন দেখিয়া সুখে দুঃখে অভিভূত হন। সাধক রামপ্রসাদ গাইয়াছেন—

গিরি, গৌরী আমার এসেছিল,
স্বপ্নে দেখা দিয়ে চৈতন্য করিয়ে,
চৈতন্যরূপিণী কোথা লুকাল।

সর্ব্বশেষে স্বপ্ন সম্বন্ধে কবিবর রবীন্দ্রনাথের একটি মত উল্লেখ করিয়া আমরা প্রবন্ধ পরিসমাপ্ত করিব। তিনি বলেন, "অনেক দার্শনিক পণ্ডিত প্রত্যক্ষ জগৎটাকে স্বপ্ন (অলীক) বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন, কিন্তু সেই পণ্ডিতগণ স্বপ্নকে উড়াইতে পারেন নাই। সুতীক্ষ্ণবুদ্ধি পণ্ডিতেরও সাধ্য নাই স্বপ্নাবস্থায় স্বপ্নকে অবিশ্বাস করেন। বিশ্বাসজননতা নামক যে গুণটি সত্যের প্রধান গুণ হওয়া উচিত সেটা যেমন স্বপ্নে আছে তেমন আর কিছুতেই নাই।"

শ্রীচিন্তাহরণ দে

বিধাতার ভুল

তুমি কেন নাহি হ'লে উষা নিরমল ?
নিতি ল'য়ে ফুলরাশি, দুয়ারে দাঁড়াতে আসি ;
ভেঙ্গে দিতে ঘুম-ঘোর দোলায়ে আঁচল !
প্রথমে নয়ন মেলি' হেরিতাম কুতূহলি,
তব ওই অপরূপ রূপ-শতদল !
তুমি কেন নাহি হ'লে উষা নিরমল ?

তুমি কেন নাহি হলে বিহগ উষার ?
তুলিয়া ললিত তান, আমারে শুনাতে গান,
ভুলাতে সকল জ্বালা আকুল হিয়ার !
আমার মরম-বীণ, রহিত না হেন দীন,
মিলায়ে তোমারি সুরে সুর আপনার !
তুমি কেন নাহি হ'লে বিহগ উষার ?

তুমি কেন নাহি হলে কুসুম সুন্দর ?
আমার বাগানখানি, সাজায়ে রাখিতে রাণি,
শোভায়, সুধায় আর বাসে মনোহর !
কখন যতনে তুলে, পরিতাম মালা গলে,
কভু পূজিতাম দেবে পুলক-অন্তর !
তুমি কেন নাহি হ'লে কুসুম সুন্দর ?

তুমি কেন নাহি হলে শীতল সমীর ?
জগতের কত কথা, কত শত আকুলতা,
নীরবে শোনায়ে যেতে জুড়ায়ে শরীর !
মধুর পরশে তব, পেতাম চেতনা নব,
দিতাম খুলিয়া ডোর আশা-তরণীর !
তুমি কেন নাহি হলে শীতল সমীর ?

তুমি কেন নাহি হ'লে তরুণ তপন ?
আমার নির্জন ঘরে, সারাটি দিবস ধরে,
ঢালিতে আঁধার নাশি সোনার কিরণ !
আমার সকল কাজে, স্বাজিতে বুকের মাঝে,
নবীন শকতি-সাধ করি বিতরণ !
তুমি কেন নাহি হ'লে তরুণ তপন ?

তুমি কেন নাহি হ'লে নব জলধর ?
এ হৃদি গহন মাঝ, বিকাইতে শ্যাম-সাজ,
ঢালিয়া জীবনী-ধারা সুধার আকর !
পরাণ চাতক মোর, মিটাতো পিপাসা ঘোর,
লভিয়া তোমারি কণা সুখে নিরন্তর !
তুমি কেন নাহি হ'লে নব জলধর ?

তুমি কেন নাহি হলে মাধবী ধরার ?
আমার চোখের পাশে, এনে দিতে অনায়াসে,
অমরার যত শোভা, হাসি-পারাবার !
এ দীন ভকতে তবে, ফিরিতে হত না ভবে,
তাহারি ভিখারী হয়ে দ্বারে দ্বারে আর !
তুমি কেন নাহি হ'লে মাধবী ধরার ?

তুমি কেন নাহি হলে ছায়া সুমধুর ?
কুটীর আঙিন মম, ঢেকে রতে নিরুপম
বিস্তৃচিয়া মায়া-ঘেরা রম মধুপুর !
আসিতাম তব পাশে, বিমল সান্ত্বনা আশে,
যখন দহিত মোরে জগত নিঠুর !
তুমি কেন নাহি হলে ছায়া সুমধুর ?

তুমি কেন নাহি হ'লে শরতের চাঁদ?
অমিয় প্রবাহ তব, মোর কাছে অভিনব,
সাজাইত একখানি স্বপনের ফাঁদ!
আমার মানস-সরে, উথলিত চিরতরে
কনক-লহর-মালা না মানিয়া বাঁধ!
তুমি কেন নাহি হলে শরতের চাঁদ?

তুমি কেন নাহি হলে নিশীথের তারা?
ঘুমাত সকল দিশি, তুমি শুধু একা বসি'
ঢালিতে আমার শিরে আলোকের ধারা!
কোন্ দূরে সুর-দেশে, মন মোর যেত ভেসে,
হইয়ে আকুল সুখে আপনারে হারা!
তুমি কেন নাহি হলে নিশীথের তারা?

তুমি কেন নাহি হলে প্রেয়সী আমার?
মোর সব সুখে দুঃখে, মিশে যেতে বুকে বুকে,
মুছাইয়ে দিতে মোর নয়ন-আসার!
আমি তোমা প্রেমভরে, বাঁধি চির-প্রেম-ডোরে,
হেরিতাম তব মাঝে পীঠ দেবতার!
তুমি কেন নাহি হলে প্রেয়সী আমার?

ভুল বিধাতার সখি, বিধাতার ভুল!
তোমাতে সকলি আছে, হিয়া তব অতি কাছে,
নিয়ত বেড়িয়া মোরে প্রণয়ে অতুল!
তবু তুমি কিছু নও, তবু কত দূরে রও,
আমারে করিয়া সদা উদাস আকুল!
ভুল বিধাতার সখি, বিধাতার ভুল!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত

চীন দেশের শিক্ষা ও সভ্যতা

চীনাদের মত বিদ্যানুরাগী জাতি পৃথিবীতে খুব কম। লেখা পড়ার প্রতি তাহাদের অসীম ভক্তি। যুদ্ধবিগ্রহাদি তাহারা আদৌ পছন্দ করে না। সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক ব্যবস্থাপক ও ধর্ম্মপ্রচারক মেন্‌সিয়াস (৩৭২-২৮৯ খ্রীঃ পূঃ) বলেন যে, যুদ্ধ বিগ্রহের সহিত প্রকৃত ধর্ম্মের কোনও প্রকার সংস্রব থাকিতে পারে না।* কিন্তু তাই বলিয়া চীনাদের মধ্যে যে সৈনিক পুরুষের একেবারেই অস্তিত্ব নাই, তাহা নহে। প্রত্যুত, প্রাচীন ও আধুনিক সময়ের অনেক বীরপুরুষেরই অক্ষয় কীর্ত্তি-কাহিনী চৈনিক ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে। চীনাদের মতে বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য সৈন্যসামন্তের প্রয়োজন হইলেও, সিভিল কর্ম্মচারী ব্যতীত দেশের শান্তি-সংরক্ষণ ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইতে পারে না। বস্তুতঃ সমগ্র জাতি হিসাবে চীনারা যে অত্যন্ত নিরীহ ও শান্তিপ্রিয়, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

কোনও চৈনিক অভিভাবক কখনও ইচ্ছা করিয়া সন্তানকে সামরিক শিক্ষা প্রদান করেন না। সকলেরই একমাত্র ইচ্ছা যে, তাহাদের সন্তান সন্ততিগণ গ্রাম্য বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপনান্তে "প্রাদেশিক প্রতিযোগী পরীক্ষায়" উত্তীর্ণ হইয়া রাজকার্য্য গ্রহণ পূর্ব্বক বংশের ও দেশের মুখোজ্জ্বল করে।

চীনাদের এই "প্রাদেশিক প্রতিযোগী পরীক্ষা"-গ্রহণ প্রণালী অতীব কঠোর ও বিচিত্র। প্রতি তিন বৎসর অন্তর এক এক প্রদেশে এই পরীক্ষা গৃহীত হয়। কন্‌ফুসিয়াস্ ও মেন্‌সিয়াস্ প্রবর্ত্তিত নীতি ও ধর্ম্ম-

* There is no such thing as a righteous war; we can only assert that some wars are better than others.

ব্যবস্থা, দেশের প্রাচীন সাহিত্য ও ইতিহাস এবং রচনা ও কবিতা লিখন, প্রধানতঃ এই কয়টী বিষয়েই পরীক্ষা গৃহীত হইয়া থাকে।

চীনাগণ শিক্ষা বিভাগকে অতি পবিত্র জ্ঞান করে; রাষ্ট্রীয় অন্যান্য বিভাগে অসাধুতার দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল না হইলেও, চৈনিক শিক্ষাবিভাগ একেবারে সন্দেহ-মুক্ত। শিক্ষাবিভাগসংক্রান্ত কেহ কোনও অসাধু উপায় অবলম্বনের চেষ্টা করিয়া ধরা পড়িলে, মৃত্যুদণ্ডই তাহার একমাত্র শাস্তি।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, প্রতি তিন বৎসর অন্তর এক এক প্রদেশে প্রাদেশিক পরীক্ষা গৃহীত হয়। পরীক্ষা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই রাজধানী পিকিন সহর হইতে একজন প্রধান পরীক্ষক (Grand Examiner) নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হন। পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কাহারও, এমন কি নিতান্ত নিকট আত্মীয় স্বজনেরও প্রধান পরীক্ষকের সহিত দেখা করিবার নিয়ম নাই। তিনি যে বাড়ীতে অবস্থান করেন, সর্ব্বদা সেখানে কড়া পাহাড়ার বন্দোবস্ত রাখা হয়। পরীক্ষার্থিদের বয়সের কোনও নির্দ্দিষ্ট সীমা নাই, এবং উত্তীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত একই ব্যক্তি যতবার ইচ্ছা পরীক্ষা দিতে পারে। কথিত আছে যে, একবার একব্যক্তি ৭২ বৎসর বয়সে পরীক্ষায় পাশ হইয়া উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট দিনে সকাল বেলায়ই পরীক্ষার্থিগণ পরীক্ষা-মন্দিরের নিকটে সমবেত হয়। তখন শিক্ষা বিভাগীয় কর্ম্মচারিগণ প্রত্যেক পরীক্ষার্থির নাম ডাকিয়া তাহাকে রোল, নম্বর প্রভৃতি প্রদান করেন। সমস্ত পরীক্ষার্থী নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলে প্রধান পরীক্ষক মহাশয় পরীক্ষা মন্দিরের দ্বারদেশে ধূপধুনা প্রজ্জলিত করিয়া মহাসমারোহে আরতি করেন। তদনন্তর পরীক্ষা মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

এক এক বিষয়ে তিন দিন যাবৎ পরীক্ষা গৃহীত হয়। এই তিন দিনের মধ্যে কাহাকেও পরীক্ষা মন্দিরের বাহিরে আসিতে বা ভিতরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। লিখিবার কাগজ কলম ও এই তিন দিনের উপযোগী আহার্য্য দ্রব্য পরীক্ষার্থিগণকে প্রথম দিনেই সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে হয়। মন্দিরাভ্যন্তরে নীত হইবার পূর্ব্বেই এগুলি তন্ন তন্ন করিয়া দেখা হইয়া থাকে।

প্রাদেশিক পরীক্ষায় অন্যূন ১০।১২ হাজার ছাত্রের সমাগম হয়। এমতাবস্থায় এই তিন দিনের মধ্যে কাহারও ব্যারাম, এমন কি সময়ে সময়ে দুই এক জনের মৃত্যু হওয়াও আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু পরীক্ষা-মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ কোনও পরীক্ষার্থীর, এমন কি স্বয়ং প্রধান পরীক্ষক মহাশয়েরও, মৃতদেহ দরজা খুলিয়া বাহিরে আনিবার নিয়ম নাই—মৃতদেহ প্রাচীরের উপর দিয়া বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া হয়।

এইরূপ অবরুদ্ধ স্থানে দিবসত্রয়ব্যাপী ঘোরতর মানসিক পরিশ্রমে কাহারও কাহারও মস্তিষ্ক-বিকৃতি হওয়াও নিতান্ত অসম্ভব নহে। বস্তুতঃ প্রায়ই এরূপ দেখা যায় যে, পরীক্ষা যতই অগ্রসর হইতে থাকে, ততই অধিকসংখ্যক ছাত্র সম্পূর্ণ "সাদা" উত্তর-পত্র প্রদান করে। একদা একজন পরীক্ষার্থী শেষ দিনের উত্তরপত্রে নিজের একখানা উইল লিখিয়া দিয়াছিল! আর একবার স্বয়ং প্রধান পরীক্ষকেরই মাথা বিগড়াইয়া যাওয়ায় তিনি অনেক উত্তর পত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। তখন বাধ্য হইয়া পরীক্ষার শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে হইয়াছিল। ইউরোপের তুলনায় চীনদেশে উন্মাদরোগগ্রস্ত লোকের সংখ্যা খুব কম এবং এই অল্প সংখ্যারও অধিকাংশই আবার এইরূপ কঠোর পরীক্ষা-প্রণালীর অবশ্যম্ভাবী ফল।

কেহ অসাধু উপায় অবলম্বন করিয়া পাশ হইতে না পারে, তজ্জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বিত হয়। পরীক্ষকগণের নিকট কখনও পরিক্ষার্থিদের স্বহস্ত-

লিখিত মূল উত্তরপত্র পরীক্ষার্থ প্রেরণ করা হয় না। প্রত্যেক উত্তরপত্রের এক এক খণ্ড নকল প্রস্তুত করিয়া পরীক্ষার্থ সেই নকল উত্তরপত্র প্রেরিত হয়।

চীনাদের এই অসাধারণ বিদ্যানুরাগ যে আধুনিক, তাহা নহে। ইউরোপের বর্ত্তমান সুসভ্য জাতিসমূহের পূর্ব্বপুরুষগণ যখন নিতান্ত উলঙ্গ অবস্থায় বনে জঙ্গলে পরিভ্রমণ এবং স্বচ্ছন্দ বনজাত ফলমূলে ও মৃগয়ালব্ধ অর্দ্ধদগ্ধ মাংস ভক্ষণে উদর পূর্ণ করিত, তখনও চৈনিকদের এই বিদ্যানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়—তখনও তাহাদিগকে সভ্যতার উচ্চতর সোপানে অধিরূঢ় দেখিতে পাই।

চীন ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় যে, চীনারাই মুদ্রাযন্ত্রের সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কারক। শুধু মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াই তাহাদের উদ্ভাবনী শক্তি ক্ষান্ত হয় নাই। জল যন্ত্রও (Water wheel) তাহাদেরই উদ্ভাবিত। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ট্যাক্সি গাড়ীর ন্যায় (taxi cab—দূরত্ব পরিমাপক যন্ত্র সম্বলিত যান বিশেষ) এক প্রকার গাড়ীর প্রচলন ছিল বলিয়া জানা যায়। টিপ সই (Finger prints) প্রথাও যে সর্ব্ব প্রথম চীন দেশেই উদ্ভাবিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেকে বলেন চীনারাই দিক্‌দর্শন যন্ত্রেরও সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কারক; কিন্তু এ সম্বন্ধে সমস্ত সন্দেহ এখনও সম্পূর্ণ নিরাকৃত হয় নাই। কোন্ জাতি সর্ব্বপ্রথম বারুদের আবিষ্কারক তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট মতদ্বৈধ থাকিলেও খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীনাদের বারুদের ন্যায় এক প্রকার দহমান পদার্থের বহুল ব্যবহার প্রচলিত ছিল। তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, পঞ্চদশ শতাব্দীতে মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধে চীনারা একপ্রকার কামান ব্যবহার করিয়াছিল। খ্রীষ্টের জন্মের অন্ততঃ ছয় সাত শত বৎসর পূর্ব্বেও ব্রোন্‌জ্‌ ধাতুর ঢালাই কার্য্যে চীনারা বিশেষ পটুত্বলাভ করিয়াছিল, এবং খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দীতে তাহারা রেশম-শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিল। কত দিন হইতে চীনদেশে চা'র আবাদের প্রচলন হইয়াছে নিশ্চয়তা সহকারে বলা যায় না, এবং অন্ততঃ ষোল শত বৎসর পূর্ব্বেও চীনামাটির কার্য্যে তাহারা যে কৃতিত্ব দেখাইতে পারিয়াছিল, বিজ্ঞান-গর্ব্বিত বর্ত্তমান ইউরোপীয় জাতি সমূহ বিংশ শতাব্দীতেও সেরূপ পারদর্শিতার্জ্জনে সক্ষম হয় নাই। দশম শতাব্দীর চৈনিক সাহিত্যে লৌহ-নির্ম্মিত জাহাজের বহু উল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু চীনারাই লৌহ-নির্ম্মিত জাহাজের প্রথম নির্ম্মাতা কি না, এখনও সে সম্বন্ধে কোনও স্থির মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায় নাই। চীন দেশেই যে সর্ব্বপ্রথম কাগজের প্রচলন হয় এরূপ ভাবিবার অনেক কারণ আছে।

বর্ত্তমান ইউরোপীয় চিত্রশিল্পিগণের পূর্ব্বপুরুষগণ যখন তুলি ধরিতেও শিখে নাই, তখনও চীনাগণকে চিত্রশিল্পে বিশেষ উন্নত দেখিতে পাই। এ সম্বন্ধে জনৈক ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞ বলেন যে, চীনাদের প্রাকৃতিক দৃশ্যাঙ্কন ক্ষমতা পৃথিবীর ইতিহাসে অতুলনীয়।*

প্রাচীন চীনে সুকুমার শিল্প, সাহিত্যের অত্যাবশ্যক অঙ্গস্বরূপ বিবেচিত হইত। চিত্রাঙ্কন বিদ্যা বা অন্য কোনও প্রকার সুকুমার শিল্পে বিশেষ পারিদর্শিতা অর্জ্জন করিতে না পারিলে, কাহারও শিক্ষা সম্পূর্ণ হইত না। চীনাদের ন্যায় সৌন্দর্য্যপ্রিয় জাতি আর নাই বলিলেই হয়। স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে চীনারা ফুলের বড় ভক্ত। এক বাদাম-ফুল উপলক্ষ করিয়া চৈনিক সাহিত্যে যত কবিতা লিখিত

* The Landscape art thus founded in the tenth and eleventh centuries, and continued by the Japanese in the fifteenth century, must rank as the greatest school of landscape which the world has ever seen.

হইয়াছে, সংগ্রহ করিতে পারিলে তদ্দ্বারা একটী প্রকাণ্ড লাইব্রেরী হইতে পারে। চীনারা বলে ফুলের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে হইলে, প্রত্যেকটী ফুল স্বতন্ত্র ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করা দরকার, কারণ একসঙ্গে বহু ফুলের সৌন্দর্য্য গ্রহণ মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নহে।

প্রাচীন চৈনিক চিত্রশিল্পিদের সম্বন্ধে নানা প্রকার অতিপ্রাকৃত গল্পের প্রচলন আছে। কথিত আছে, একজন সুদক্ষ চিত্রকরের অঙ্কিত উত্তর ও দক্ষিণ বায়ুর চিত্র দর্শনে দর্শকগণ শীতে রোমাঞ্চিত ও গ্রীষ্মাতিশয্যে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইত। এইরূপ আরও অনেক গল্পের প্রচলন আছে। এই সমস্ত গল্প অতিরঞ্জিত হইলেও ইহাতে প্রাচীন চৈনিক চিত্র-শিল্পের আদর্শের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়, এবং চীনাগণ যে অতি প্রাচীন কালেই চিত্রশিল্পে বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিল এতদ্দ্বারা তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, অতি প্রাচীনকাল হইতেই চীনদেশে মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। ঠিক কোন্ সময়ে মুদ্রাযন্ত্রের প্রথম উদ্ভাবন হয়, নিশ্চয়রূপে বলা যায় না। অতি প্রাচীন কালেই আমরা চীনদেশে "শীলমোহর" প্রস্তুত ও তাহার ব্যবহার দেখিতে পাই। সম্ভবতঃ ইহা হইতেই উত্তর কালে মুদ্রাযন্ত্রের উদ্ভাবন হইয়া থাকিবে। ১৭০ খৃঃ অব্দে কনফুসিয়াসের প্রচারিত ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ক ব্যবস্থাবলী প্রস্তর-ফলকে খোদিত হইয়াছিল বলিয়া জানা গিয়াছে। খ্রীঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে কাষ্ঠফলক হইতে কাগজে প্রতিলিপি গ্রহণের ব্যবস্থা দেখা যায়। প্রথম প্রথম কেবলমাত্র ধর্ম্ম-পুস্তকই এইরূপ মুদ্রিত করা হইত। ৯৬০ খৃঃ অব্দের পর হইতে সকল প্রকার পুস্তকেরই মুদ্রাঙ্কন ব্যবস্থা হয়।

অনেকের ধারণা যে চীনাদের ন্যায় রক্ষণশীল জাতি আর নাই। চীনদেশের চতুঃসীমার বাহিরে তাহাদের শিক্ষণীয় ও গ্রহণীয় কোনও বিষয় থাকিতে পারে, চীনারা এরূপ বিশ্বাস করে না। এই ধারণা নিতান্ত অমূলক। চীনারা অত্যন্ত রক্ষণশীল তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই, বিশেষ পরীক্ষা না করিয়া সহসা কোনও নূতন জিনিস গ্রহণ করিতে তাহারা আদৌ রাজী নহে। কিন্তু যদি কোনও জিনিষের উপকারিতা তাহারা একবার ভাল করিয়া বুঝিতে পারে, তবে তাহা হাজার নূতন হইলেও বিশেষ আগ্রহ ও ক্ষিপ্রতা সহকারে গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। টেলিগ্রাম প্রথার প্রবর্ত্তনের জন্য একসময়ে কর্ত্তৃপক্ষকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। জনসাধারণ ইহার উপকারিতা বুঝিতে না পারিয়া প্রথম প্রথম ইহার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন উপস্থিত করে। কিন্তু একটী সামান্য ঘটনা হইতে এই আপত্তি তাসের ঘরের ন্যায় ধূলিসাৎ হয়। সে বৎসর পিকিনে প্রাদেশিক প্রতিযোগী পরীক্ষা গৃহীত হয়। পিকিন হইতে ক্যাণ্টন সহরে লোক মারফত সংবাদ আসিতে বহুদিনের দরকার। কিন্তু ক্যাণ্টন্ সহরের একজন চতুর চীনা টেলিগ্রামের সাহায্যে এই প্রতিযোগী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট তিন জন ছাত্রের নাম জানিতে পারে। সে ক্যাণ্টনের আর কাহাকেও এই সংবাদ না দিয়া এই পরীক্ষা সম্বন্ধে লটারী বা চিঠি খেলিয়া বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করিয়াছিল। পরে যখন ক্যাণ্টনবাসিগণ সমুদায় বিবরণ অবগত হইল, টেলিগ্রাফ প্রথার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তখন আর কাহারও কিছুমাত্র সন্দেহ বা আপত্তি থাকিল না, এবং অবিলম্বে সমগ্র দেশে টেলিগ্রাম প্রথার প্রবর্ত্তন হইল।

১০৪৩ খৃঃ অব্দের লিখিত ইতিহাস পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, তখন নরম মাটিতে (soft clay) অক্ষর অঙ্কিত করিয়া তাহা আগুনে পোড়াইয়া হরফ প্রস্তুত করা হইত। ক্রমে কাষ্ঠ ও অবশেষে তামা ও সীসা হইতে হরফ প্রস্তুত প্রণালী উদ্‌ভাবিত হয়।

এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, পিকিন হইতে প্রকাশিত সুপ্রসিদ্ধ "পিকিন গেজেটই" পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন সংবাদ পত্র।

অতি প্রাচীন কালেই চীনাগণ চিকিৎসা বিদ্যাতেও বিশেষ উন্নতি লাভে সমর্থ হইয়াছিল। খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীর অনেক চৈনিক চিকিৎসকের সম্বন্ধে এরূপ লিখিত আছে যে, তিনি এরূপ এক যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছিলেন যদ্দ্বারা শরীরের সমস্ত অভ্যন্তর ভাগ সুস্পষ্টরূপে দেখা যাইত। খ্রীঃ দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে চীনদেশে অস্ত্রবিদ্যার (Surgery) যথেষ্ট প্রচলন ছিল। অস্ত্র-প্রয়োগে সুবিধার জন্য "সংজ্ঞাহারক" (anaesthetic) ঔষধের প্রথম আবিষ্কার চীনদেশেই হইয়াছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর লিখিত পুস্তক হইতে আমরা ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাই।

লেখাপড়া শিখিয়া যাহাতে সকলেই স্ব স্ব অবস্থার উন্নতি করিতে পারে, তজ্জন্য প্রত্যেককেই যথাসম্ভব সুযোগ ও সুবিধা প্রদান করা হয়। অসহায় ও দরিদ্র ছাত্রদের জন্য দেশের সর্ব্বত্রই যথেষ্ট অবৈতনিক বিদ্যালয় আছে। প্রত্যেক ছাত্রেরই বিদ্যানুরাগ ও বুদ্ধিমত্তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়, এবং কেহ কোনও বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিলে, ভবিষ্যতে সেই বিষয়ে উচ্চতর জ্ঞানার্জ্জনে যাহাতে তাহার বিশেষ অন্তরায় উপস্থিত না হয়, যত্নসহকারে তাহার বিধান করা হইয়া থাকে। অবস্থাপন্ন বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিগণ শিক্ষা-বিস্তার-কল্পে সর্ব্বদাই মুক্তহস্ত। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক জেলাতেই এক একটী শিক্ষা কমিটী আছে। অর্থসংগ্রহ দ্বারা শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা করাই এই সমস্ত শিক্ষা কমিটীর প্রধান উদ্দেশ্য।

চৈনিক সাহিত্যের সকল প্রকার বিশেষত্ব সম্বন্ধে সামান্য মাত্র আভাস-প্রদানও এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের পক্ষে সম্ভবপর নহে। এখানে মাত্র একটী বিশেষত্বের বিষয় উল্লিখিত হইবে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, চীনাদের কাছে শিক্ষা ও সাহিত্য অতি পবিত্র জিনিস। সেই জন্য সমগ্র চৈনিক সাহিত্য তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলেও উহাতে একটীও হীনভাবব্যঞ্জক শব্দ বা কথা পাওয়া যাইবে না। ইহাই চৈনিক সাহিত্যের সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব; এবং এই জন্যই আজ পর্য্যন্তও চীনদেশে উপন্যাসের আদর নাই এবং কোনও শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক নভেল লেখিয়া কলঙ্ক অর্জ্জন করিতে সাহসী হন নাই। ইহা হইতে চীনাদের নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

চীনদেশে স্ত্রীশিক্ষার যথেষ্ট প্রচলন না থাকিলেও প্রাচীন ও আধুনিক চীন সাহিত্যে অনেক বিদুষী রমণীর নামোল্লেখ দেখা যায়।

উন্নত চীন সাহিত্যে এমন কতকগুলি শব্দ ও বাক্যের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় যাহার অর্থ একমাত্র বিশেষজ্ঞগণ ব্যতীত আর কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই। নিম্নে কতিপয় উদাহরণ প্রদর্শিত হইল।

ক্ষীণকটী = বোল্‌তা।
শতছিদ্র = মৌচাক
দুশ্চিন্তাপহারক = মদ
সুবর্ণ গোলক = কমলালেবু
পরীর ছত্র = ব্যাঙের ছাতা (mushroom)
কড়ি কাষ্ঠোপবিষ্ট ভদ্রলোক = চোর। *

শ্রীমন্মথনাথ মজুমদার

---

* একদা এক চোর গৃহস্বামী কর্তৃক তাড়িত হইয়া কড়ি কাষ্ঠের উপর লুকাইয়া বসিয়াছিল। এই ঘটনা হইতে এই নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

পঞ্চরাত্র

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ভগবান। (স্বগত) অর্জ্জুনের অক্ষয় তূণীত্বই ইহার কারণ। এই অক্ষয়তূণীদ্বয়ের জন্যই খাণ্ডবদাহন কালে যতক্ষণ বাসব বৃষ্টিধারা বর্ষণ করেছিলেন অর্জ্জুনও ততক্ষণ শরবর্ষণ করেছিলেন।

রাজা। শত্রুর সংবাদ কি ?

ভট। আমি স্বয়ং শত্রুর কোন সংবাদ জানি না, তবে দূতের মুখে শুনেছি দ্রোণ ধনুষ্টঙ্কার শুনেই বুঝেছেন এ তাঁরই ধনুর টঙ্কার. সুতরাং যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ ক'রে প্রস্থান করেছেন। পায়ের পাশে শর পড়েছে দেখেই যথেষ্ট মনে ক'রে ভীষ্ম আর তীর ছোঁড়েন নি। শরপ্রহার সহ্য কত্তে না পেরে কর্ণ পালিয়েছেন। অন্য রাজাদের ত কথাই নেই। কেবল বালক অভিমন্যু বিপদ দেখেও ভীত হয় নি।

ভগবান। কি! অভিমন্যুও যুদ্ধে এসেছে! মহারাজ, কুরু ও পাণ্ডব বংশের উজ্জ্বল জ্বালাময় অগ্নিতুল্য অভিমন্যু যদি যুদ্ধে এসে থাকে, তা'হ'লে অন্য সারথি পাঠিয়ে দিন। বৃহন্নলা অভিমন্যুর সঙ্গে যুদ্ধে একেবারেই অক্ষম।

রাজা। ভগবন, বলেন কি ?

পরশুরাম শরপ্রহারে ভীষ্মের কবচ ভেদ কত্তে পারেন নি, দ্রোণাচার্য্য সমস্ত শর মন্ত্রপূত ক'রে নিক্ষেপ ক'রে থাকেন। তাঁরা দু'জনই যুদ্ধে বিমুখ হ'য়ে প্রস্থান করেছেন। কর্ণ ও জয়দ্রথ পরাজিত হ'য়েছেন. অন্যান্য নৃপতিবৃন্দও রণস্থল পরিত্যাগ করেছেন। পিতার পরাক্রমের ভয়ে ভীত হ'য়ে কি কুমার (উত্তর) অভিমন্যুকে ছেড়ে দেবেন ? তবে একটা কথা আছে। অভিমন্যু আমাদের আত্মীয়, আর উভয়েরই তুল্যরূপ ও তুল্যবয়স। এতে যদি অভিমন্যু রক্ষা পায় !

ভট। মহারাজ, —

অশ্বরশ্মি শিথিল হ'লেই কুমারের রথ প্রবল বেগে ছুটে অভিমন্যুর সমুখ থেকে চলে যায়, নিকটে পেয়েও (কুমার) অভিমন্যুকে প্রহার করেন না, অভিমন্যুর কোনও অপকার করেন না। অভিমন্যুর নিকটে নিকটে রথখানি ঘুরে বেড়ায়, মনে হয় যেন ইচ্ছে ক'রে এরূপ কচ্ছে।

রাজা। আবার গিয়ে শত্রুর সংবাদ নিয়ে এস।

ভট। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ

মহারাজের জয় হ'ক। বিরাট-রাজের জয় হ'ক। সুসংবাদ আছে। যারা গোরু চুরি কত্তে এসেছিল তারা পরাজিত হ'য়েছে। ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেদিগকে তাড়িয়ে দেওয়া হ'য়েছে।

ভগবান। মহারাজের সৌভাগ্য লাভ হ'য়েছে শুনে প্রীত হলুম।

রাজা। না, এ আমার সৌভাগ্য নয়। ভগবানের অনুগ্রহ। কুমার কোথায় ?

ভট। শত্রুপক্ষের যে সকল বীরপুরুষ রণক্ষেত্রে যুদ্ধ-কৌশল প্রদর্শন করেছেন তাঁদের বীরত্ব-কাহিনী লিপিবদ্ধ কচ্ছেন।

রাজা। কুমারের এই কার্য্য বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। পরাজিত শত্রুর গুণ কীর্ত্তন ক'রে সম্মান দেখালে তা'দের মনোবেদনার লাঘব হবে। বৃহন্নলা কোথায় ?

ভট। সুসংবাদ নিয়ে অন্তঃপুরে গেছেন।

রাজা। বৃহন্নলাকে ডেকে আন।

ভট। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

বৃহন্নলার প্রবেশ

বৃহ। (চারিদিকে তাকাইয়া সবিষাদে)

গাণ্ডীবে গুণ চড়িয়ে যোদ্ধাদের সঙ্গে অল্পকাল মাত্র যুদ্ধ কত্তে হ'য়েছে। শর-পরিবর্ত্তনে শিথিল মুষ্টি সংহতও হয় নি। অঙ্গুলিত্র পরা অঙ্গুলিরও বিশেষ কোন কৌশল দেখাতে হয় নি। এখানে যে বীরত্ব দেখাবার

বেশি প্রয়োজন হয় নি তা ভালই হ'য়েছে। স্ত্রী-বেশ ধারণ করেছি বলে দেহ অনেকটা শিথিল হ'য়েছে। গাণ্ডীব হাতে ছিল বলেই আমার মনে হ'য়েছে যে আমিই সেই অর্জ্জুন।

আমি স্ত্রী-বেশ ধারণ ক'রে লজ্জিত হ'য়েই ধনু আকর্ষণ ক'রে রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি। এই যুদ্ধ যে শীঘ্র শীঘ্র শেষ হ'য়ে গিয়েছে তা ভালই হ'য়েছে।

গোধন উদ্ধার করেছি, শত্রুকে পরাজিত করেছি, তবু আমার মনে আনন্দ হচ্ছে না। সৈন্য-শ্রেণীর সম্মুখ-ভাগে দুষ্ট দুঃশাসনকে শর-প্রহারে বিকল ক'রে বিরাট-রাজের রাজধানীতে বেঁধে নিয়ে আসতে পাল্লুম না!

উত্তরা আদর ক'রে যে সকল অলঙ্কার দিয়েছিল সেগুলি প'রে রাজার সামনে যেতে আমার লজ্জা বোধ হচ্ছে। যাক্, যাই দেখা ক'রে আসি। এই যে! আর্য্য যুধিষ্ঠিরও যে এখানে!

তিনি এখন যুবক হ'য়েও সন্ন্যাসী, ক্ষত্রিয় হ'য়েও ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মাবলম্বী, রাজ্যলক্ষ্মীর অনুগ্রহ ভাজন (রাজা) তবু রাজ্যহীন। তিনি এখন সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেছেন সুতরাং বিচারকার্য্যের ভার পরিত্যাগ করেছেন।†

(নিকটে আসিয়া) ভগবন, প্রণাম গ্রহণ করুন।

ভগবান। স্বস্তি।

বৃহ। প্রভুর জয় হ'ক।

রাজা। রূপের বা বংশের কোনও বিশেষত্ব নেই। নীচ ব্যক্তি ভাল কাজ কল্লেই মহৎ হয়। বৃহন্নলার এই স্ত্রীরূপ ঘৃণ্য, কিন্তু এখন এই স্ত্রীরূপই সম্মান পাওয়ার যোগ্য হ'য়েছে। বৃহন্নলে, তুমি পরিশ্রান্ত হ'য়েছ, কিন্তু তোমাকে আরও পরিশ্রান্ত করব। যুদ্ধের সংবাদ সমস্ত খুলে বল।

বৃহন্নলা। মহারাজ, শুনুন।

রাজা। বীরের কাজ বর্ণন ক'চ্ছ, প্রাকৃতে না ব'লে সংস্কৃতে বল।

বৃহন্নলা। শুনুন, মহারাজ।

ভটের প্রবেশ

ভট। মহারাজের জয় হ'ক।

রাজা। তোমাকে অত্যন্ত প্রসন্ন দেখছি। তোমার এত হর্ষের কারণ কি?

ভট। এমন সুসংবাদ আছে যা সহজে বিশ্বাস হবে না। অভিমন্যু বন্দী হ'য়েছে।

বৃহ। কিরূপে বন্দী হ'ল?

(আত্মগত) আজ আমি সমস্ত সৈন্যের বল পরীক্ষা করেছি। অভিমন্যুর বলও পরীক্ষিত হতে দেখেছি। কীচক নিহত হয়েছে। বিরাট সৈন্যের মধ্যে অভিমন্যুকে বন্দী কত্তে পারে এমন ত কাউকে দেখ্‌ছি না!

ভগবান। বৃহন্নলে, কি শুনছি?

বৃহ। ভগবন্,

অভিমন্যু বলবান ও যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ, কে তাকে বন্দী করেছে জানি না। পিতার ভাগ্য-দোষেই আজ তার পরাজয় হ'ল।

রাজা। বন্দী হ'ল কিরূপে?

ভট। রথে আরোহণ ক'রে নির্ভয়ে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে রথ থেকে নামিয়ে এনেছে।

রাজা। কে?

ভট। মহারাজ যার উপর পাকশালার ভার দিয়েছেন তিনি।

বৃহ। (জনান্তিকে) আর্য্য ভীম তাকে আলিঙ্গন করেছেন, বন্দী করেন নি।

---

* 'শীঘ্রং নিয়ঃ কলুষশ্চ রেণুঃ'—'কলুষ রেণু' দ্ব্যর্থক—

(১) স্ত্রীজনোচিত ভাব (২) উত্থিত ধূলিরাশি।

(১)—আমার স্ত্রীবেশ যে বেশিক্ষণ দেখাতে হয় নি সেটা ভালই হ'য়েছে।

(২)—উত্থিত ধূলিরাশি যে পুনরায় ভূপৃষ্ঠে পড়ে আকাশ শীঘ্র পরিষ্কার ক'রে দিয়েছে সেটা ভালই হয়েছে।

† "ত্রিদণ্ডধারী ন চ দণ্ডধারকঃ।"

আমি দূরে থেকে দেখেই সন্তুষ্ট হ'য়েছি, এই কাজ ক'রে তিনি পুত্রস্নেহ সম্পূর্ণ-রূপে উপভোগ করেছেন।

রাজা। শিষ্টাচারের সহিত অভিমন্যুকে সভায় নিয়ে এস।

ভগবান। মহারাজ, অভিমন্যু কৃষ্ণ ও পাণ্ডব বংশের গৌরব। ইহাকে সম্মান কল্লে লোকে বলবে রাজা বিরাট ভয় পেয়েছেন। সুতরাং তার অপমান করাই উচিত।

রাজা। যদুবংশের তনয় অপমানের যোগ্য নহে। অভিমন্যু যুধিষ্ঠিরের পুত্র, কুমার উত্তরের সমবয়স্ক; দ্রুপদের সহিত আমাদের কুলগত সম্বন্ধ আছে, সুতরাং অভিমন্যু আমার পৌত্র। বিশেষতঃ অতিথি পূজার্হ. এবং পাণ্ডবেরা আমার প্রিয়।

ভগবান। হাঁ, ঠিক কথা। আমি যা বলেছিলুম তা আমার বলা উচিত হয় নি।

রাজা। তা' হ'লে অভিমন্যুকে কে সভায় নিয়ে আসবে?

ভগ। বৃহন্নলাই তাকে নিয়ে আসুক।

রাজা। বৃহন্নলে, অভিমন্যুকে রাজ-সভায় নিয়ে এস।

বৃহ। যে আজ্ঞা, মহারাজ। (আত্মগত) যা এতক্ষণ চাচ্ছিলুম তাই এখন কত্তে পেয়েছি।

ভগবান। (আত্মগত)

আমার সাক্ষাতে পুত্রকে দেখে অর্জ্জুন লজ্জায় কিছু বলতে পারবে না। এখন উভয়ের দেখা হবে. নির্জন স্থানে দেখা হ'লে বৃহন্নলা পুত্রকে আলিঙ্গনও কত্তে পারবে। অর্জ্জুনের চক্ষু হ'তে আনন্দাশ্রু নির্গত হ'লেও আর কেহ দেখবে না।

রাজা। ভগবন্, কুমার উত্তরের বীরত্বের কাহিনী শুনুন—

ভীষ্ম প্রভৃতি রাজগণ বিতাড়িত হয়েছেন. অভিমন্যু বন্দী হয়েছেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে উত্তর আজ সমস্ত পৃথিবী জয় করেছে।

ভীমসেনের প্রবেশ

ভীম। (স্বগত) জতুগৃহে যখন অগ্নি লাগে তখন মাতা কুন্তী ও ভাইদিগকে বাহুতে তুলে নিয়ে পালিয়েছিলুম। কিন্তু এক বালক অভিমন্যুকে বাহু দিয়ে তুলে রথ থেকে নামিয়ে আজই প্রথম ঠিক তেমন শ্রম অনুভব করেছি।

কুমার, এদিকে।

অভিমন্যুর প্রবেশ

অভি। এ কে?

ইহার বক্ষোদেশ বিশাল, উদর তনিমাযুক্ত, অংসদেশ উন্নত, উরু মহান্, কটীদেশ কৃশ। এরূপ বলশালী লোক এক হাত দিয়ে জোরে ধরে আমাকে রথ থেকে নামিয়ে নিয়ে এল, অথচ আমার শরীরে একটুও ব্যথা দিল না।

বৃহ। কুমার, এদিকে।

অভি। ইনি আবার কে?

হস্তিনীর রূপ যেমন গজের শরীরে শোভা পায় না, রমণীর রূপও তেমন ইহার শরীরে শোভা পাচ্ছে না। ইহার পরাক্রম মহান, কিন্তু বেশ হীন, সুতরাং ইহাঁকে উমারূপধারী মহেশ্বরের মত দেখাচ্ছে।

বৃহ। (জনান্তিকে) আর্য্য ভীম অভিমন্যুকে এখানে এনে বড় অন্যায় করেছেন!

পরাজিত হয়েছে বলে অভিমন্যুর মনে একটা গ্লানি আসবে। স্বামী-পুত্র-বিহীনা সুভদ্রা শোকার্ত্তা হবেন। অভিমন্যু পরাজিত হ'য়েছে মনে করে কৃষ্ণও রুষ্ট হবেন। কি আর বলব, এই কার্য্যে বাহুবল দূষিত হ'য়েছে।

ভীম। অর্জ্জুন!

বৃহ। হাঁ—হাঁ—অর্জ্জুন-পুত্রই বটে।

ভীম। (জনান্তিকে)

অভিমন্যুর নিগ্রহে যে এ সকল দোষ ঘটেছে তা আমি বুঝেছি। বিশেষতঃ শত্রু-হস্তে পুত্রের পরাজয় কেহই আকাঙ্ক্ষা করে না। কিন্তু দ্রৌপদী অভিমন্যুকে না

দেখে দারুণ দুঃখ ভোগ কচ্ছিল। এজন্যই অভিমন্যুকে ধরে এনেছি।

বৃহ। (জনান্তিকে) আর্য্য, অভিমন্যুর সঙ্গে কথা বলবার আমার বড় আকাঙ্ক্ষা হয়েছে। তাকে রাগিয়ে দিন ত, যেন খুব কথা বলে।

ভীম। ওহে অভিমন্যো!

অভি। কি! অভিমন্যু!

ভীম। (জনান্তিকে) বালক আমার উপর রেগে গিয়েছে। তুমি ডেকে জিজ্ঞাসা কর।

বৃহ। অভিমন্যো!

অভি। কেন? কেন? হাঁ—সকলেই জানে আমার নাম অভিমন্যু। যারা নীচ তারাই আমাদের মত ক্ষত্রিয়কে নাম ধরে ডাকে। আমাকে এরূপ ভাবে বন্দী করায় তোমাদের পূর্ব্বেই যথেষ্ট শিষ্টাচার লঙ্ঘিত হয়েছিল! এখন নাম ধরে ডেকে সেই শিষ্টাচারকেও অতিক্রম করেছ!

বৃহ। অভিমন্যো, তোমার জননী ভাল আছেন?

অভি। কি! কি! জননী!

তোমরা কি আমার নিকট যুধিষ্ঠির, না ভীমসেন, না ধনঞ্জয়, যে পিতা যেমন পুত্রকে প্রশ্ন করে তোমরাও আমাকে ঠিক তেমনি জননীর কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছ।

বৃহ। অভিমন্যো! দেবকী-তনয় কেশবের কুশল ত?

অভি। কি! তাঁকেও নাম ধরে! হাঁ—হাঁ—তোমাদের মত লোকের সঙ্গে সংসৃষ্ট হ'য়ে কেশব কুশলেই আছেন!

অভি। কি! আমার দিকে অবজ্ঞার সহিত চেয়ে চেয়ে আবার হাসচ!

বৃহ। না, হাসব কেন?

যার পিতা পার্থ, মাতুল জনার্দ্দন, যে তরুণবয়স্ক ও অস্ত্র-বিদ্যায় নিপুণ তার যুদ্ধে পরাজয় উপযুক্তই বটে!

অভি। নিজের গুণ কীর্ত্তন ক'রে ফল নেই। আমাদের বংশে কেউ তা করে না। মৃতের উপর অস্ত্রাঘাত ক'রে কিছু লাভ নেই।

বৃহ। (আত্মগত) কুমার ঠিক বলেছে।

রথ, তুরঙ্গ ও মত্তহস্তী-সঙ্কুল এই যুদ্ধক্ষেত্রে শরনিপুণ কোন যোদ্ধাই অভিমন্যুর শরে আহত না হ'য়ে যেতে পারেন নি। যদি আমিও রথ ফিরিয়ে না দিতুম তা' হ'লে আমিও শরাহত হতুম।

(প্রকাশ্যে) বাঃ! কথায় ত তুমি বেশ নিপুণ! পদাতির হাতে বন্দী হ'লে কেন?

অভি। শস্ত্র গ্রহণ না ক'রে আমার রথে এসেছিল বলেই আমি বন্দী হয়েছি। অর্জ্জুন যার পিতা সে কখনও নিরস্ত্র ব্যক্তিকে আঘাত করে না।

ভীম। অর্জ্জুনই ধন্য! দু'জনের কথাই সাক্ষাতে শুনতে পেয়েছি। পিতা অপেক্ষাও সংগ্রামে পুত্রের বীরত্ব সমধিক প্রশংসনীয়।

রাজা। অভিমন্যুকে শীঘ্র শীঘ্র সভায় নিয়ে এস।

বৃহ। কুমার, এদিকে! এদিকে! ইনিই মহারাজ, কুমার এস।

অভি। কার মহারাজ?

বৃহ। না, না। মহারাজ ব্রাহ্মণের সঙ্গে উপবিষ্ট আছেন।

অভিমন্যু। কি! ব্রাহ্মণের সঙ্গে! ভগবন, অভিবাদন কচ্ছি।

ভগবান। বৎস, এস।

বাক্‌পটুতা, ধৃতি, বিনয়, আশ্রিতবাৎসল্য, মধুরভাষিতা, পরাক্রম ও বিজয়—পিতার এই সমস্ত গুণ যুগপৎ লাভ কর। তারপর অবশিষ্ট চার পাণ্ডবের আর যে যে গুণ তোমার লাভ কত্তে ইচ্ছে হয় সেই সব গুণ লাভ করো।

রাজা। পুত্র, এস। আমাকে অভিবাদন কচ্ছ না যে! বটে! এই ক্ষত্রিয় বালক গর্ব্বিত হয়েছে! আমি এর দর্প চূর্ণ করব। কে তোমাকে বন্দী করেছে?

ভীম। মহারাজ, আমি।

অভি। আপনি নিরস্ত্র ছিলেন একথা ব'লে দিন।

ভীম। (স্বগত) এই পাপকথা আর শুনে কাজ নেই।

(প্রকাশ্যে) উন্নত এবং মাংসল, স্কন্ধসংলগ্ন, সহজাত ভুজদুটিই আমার অস্ত্র। এই অস্ত্র দিয়েই আমি যুদ্ধ করি। যারা দুর্ব্বল তারাই ধনু গ্রহণ ক'রে থাকে।

অভি। মশায়, এরূপ কথা বলবেন না—

যাঁহার বাহুবল অক্ষৌহিনী সেনার তুল্য, যাঁহার পরাক্রমে ছলনা নেই আপনি কি আমার সেই মধ্যম তাত। আপনি যে তাঁর মত কথা বলছেন !

ভগবান্। পুত্র, তোমার সেই মধ্যম তাত কি করেছেন ?

অভি। শুনুন। না, আমি ব্রাহ্মণের কথার উত্তর দিই না। আর কেউ জিজ্ঞাসা করুক।

রাজা। পুত্র, আমি জিজ্ঞাসা কচ্ছি—তোমার মধ্যম তাত কি করেছেন ?

অভি। শুনুন,

কণ্ঠদেশে বাহুবদ্ধ ক'রে জরাসন্ধকে শূন্যে তুলে তিনি তাঁর প্রাণ সংহার করেছেন। কৃষ্ণ যা কত্তে পারেন নি, তিনি তাই করেছেন।

রাজা। তোমার নিন্দা শুনে আমি রাগ করব না। তোমার ক্রোধ দেখে আমার আহ্লাদ হয়। আর বেশি ব'লে কি লাভ ! আমার কোন অপরাধ নেই। তুমি এখানে থেকে আর কি করবে, যাও। তোমাকে মুক্তি দেওয়া গেল।

অভি। যদি অনুগ্রহই দেখাবেন, তা'হ'লে আমার পায়ের কাছে পড়ে নিগ্রহের অনুরূপ শিষ্টাচার দেখাতে হবে। ভীম (?) বাহু দিয়ে ধ'রে বুকে ক'রে এনেছেন, তাঁকে আবার এরূপ ভাবেই আমাকে নিয়ে যেতে হবে।

উত্তরের প্রবেশ

উত্তর। যারা মিথ্যা প্রশংসা লাভ করে, তারা মনে বড় কষ্ট পায়। যুদ্ধ-বিষয়ে আমার সম্বন্ধে যে কথা হচ্ছে তাতে আমি বড় লজ্জিত হচ্ছি।

(অগ্রসর হইয়া)

ভগবন, অভিবাদন কচ্ছি।

ভগবান। স্বস্তি।

উত্তর। তাত, অভিবাদন কচ্ছি।

রাজা। পুত্র, এস। দীর্ঘায়ু হও। পুত্র, যে সকল যোদ্ধা বীরত্ব দেখিয়েছেন তাঁদের সম্মান করা হ'য়েছে ?

উত্তর। হাঁ, হয়েছে। কিন্তু যিনি শ্রেষ্ঠ পূজার পাত্র তাঁর পূজা আপনাকে কত্তে হবে।

রাজা। পুত্র, ইনি কে ?

উত্তর। ইনি পূজনীয় ধনঞ্জয়।

রাজা। কি ! ধনঞ্জয় !

উত্তর। হাঁ, পূজনীয় ধনঞ্জয় শ্মশানতরু থেকে ধনু, অক্ষয় তূণীর ও শর গ্রহণ ক'রে ভীষ্মাদি রাজগণকে পরাজিত করছেন, এবং আমাদিগকেও রক্ষা করছেন।

বৃহ। মহারাজ, প্রসন্ন হ'ন, প্রসন্ন হ'ন।

উত্তর বালক, ভীত হ'য়েছিল ব'লে যা করেছে, তা মনে নেই। নিজে সমস্ত ক'রে মনে কচ্ছে অন্য ব্যক্তি সব করেছে।

উত্তর। আচ্ছা, আপনি আমাদের শঙ্কা দূর করুন— আমার এই প্রশ্নটির উত্তর দিন—

মণিবন্ধে গাণ্ডীবের জ্যাঘাতাঙ্ক আপনার পরিহিত অলঙ্কারে ঢাকা রয়েছে। বার বৎসর পরেও ত সেই দাগ আপনার শরীরের স্বাভাবিক বর্ণ প্রাপ্ত হয় না!

বৃহ। অলঙ্কারের ঘর্ষণেই এ সকল দাগ পড়েছে। অলঙ্কারে সর্ব্বদা ঢাকা থাকে বলেই এসকল দাগ জ্যাঘাতাঙ্কের মত দেখা যাচ্ছে।

রাজা। বুঝলুম।

বৃহ। আমিই যদি রুদ্রের শর-প্রহারে ক্ষতদেহ কুরুবংশজাত অর্জ্জুন হ'য়ে থাকি তা'হ'লে এতদিন

যিনি ছদ্মবেশে কাটিয়েছেন, ইনিই সেই ভীমসেন, আর ইনিই রাজা যুধিষ্ঠির।

রাজা। ধর্ম্মরাজ, বৃকোদর, ধনঞ্জয় আমাকে আপনারা বিশ্বাস কচ্ছেন না কেন? আচ্ছা উপযুক্ত সময়ে বিশ্বাস হবে। বৃহন্নলে, তুমি অন্তঃপুরে যাও।

বৃহ। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

ভগ। অন্তঃপুরে যাওয়ার আর প্রয়োজন নেই। আমরা প্রতিজ্ঞা হ'তে উত্তীর্ণ হয়েছি।

অর্জ্জুন। যে আজ্ঞা, আর্য্য।

রাজা। যাঁরা সত্যবাদী, যাঁরা শর দ্বারা প্রতিজ্ঞা পালন করছেন এমন পাণ্ডবগণ আমার গৃহে বাস করেছেন বলে আমার বংশ নিষ্পাপ হ'ল।

অভি। ইহারাই আমার আরাধ্য পিতা, তাই—

আমি রুষ্ট হ'লেও তাঁরা রুষ্ট হন নি, হেসে হেসে আমার ক্রোধ বাড়িয়ে দিয়েছেন। গোধন-গ্রহণ-ব্যাপার আমার পক্ষে সৌভাগ্যের প্রসূতি হ'ল। গোধন গ্রহণ কত্তে এসেছিম বলেই পিতৃচরণ দর্শন কত্তে পেরেছি।

(ভীমসেনের প্রতি)

তাত, চিনতে পারি নি ব'লে প্রথমে আপনাকে অভিবাদন করি নি। পুত্রের অপরাধ ক্ষমা করুন।

ভীম। পুত্র, এস। পিতার ন্যায় পরাক্রমশালী হও। পুত্র, পিতাকে অভিবাদন কর।

অভি। তাত, অভিবাদন কচ্ছি।

অর্জ্জুন। পুত্র, এস—

দ্বাদশ বর্ষান্তে বনবাসের পর পুত্রের সহিত এই অপ্রত্যাশিত মিলনে আমার হৃদয়ে অসীম আনন্দ হয়েছে।

পুত্র, বিরাট-রাজকে অভিবাদন কর।

অভি। মহারাজ, অভিবাদন কচ্ছি।

রাজা। বৎস, এস।

যুধিষ্ঠিরের ধৈর্য্য, ভীমের বল, অর্জ্জুনের নৈপুণ্য, নকুলসহদেবের দেহশ্রী এবং জগৎপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তি লাভ কর। (আত্মগত) উত্তরার এখনও বিবাহ হ'ল না। এই কথা মনে হ'লে আমি অস্থির হই। কি করব। আচ্ছা ইহাই করা যাক্। এখানে কে?

ভটের প্রবেশ

ভট। মহারাজের জয় হ'ক।

রাজা। জল নিয়ে এস।

ভট। যে আজ্ঞা মহারাজ।

[প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ।

এই জল এনেছি।

রাজা। অর্জ্জুন, গোধন-রক্ষার মূল্য স্বরূপ উত্তরাকে গ্রহণ করুন।

ভগ। এবার অর্জ্জুনের মাথা হেট্ হ'ল

অর্জ্জুন। রাজা কি আমার চরিত্র পরীক্ষা কচ্ছেন? মহারাজ,

আপনার অন্তঃপুরের রমণীবর্গ সকলেই আমার প্রীতির পাত্র ও মাতৃস্বরূপিণী। আপনার প্রদত্ত উত্তরাকে আমার পুত্রের জন্য গ্রহণ কল্লুম।

ভগ। এবার মস্তক উন্নত হ'ল।

রাজা। এখন পিতামহের নিকট উত্তরকে পাঠাব। ধর্ম্মরাজ, বৃকোদর, ধনঞ্জয় এদিকে আসুন।

[সকলের প্রস্থান।

[আগামী বারে সমাপ্য]

শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

কাম্বোজ প্রদেশ

ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহাসিক বিবরণ সকল অত্যাপি সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার লাভ করে নাই; উহার উপকরণ সকল প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থ প্রভৃতি দ্বারা চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। ঐ সকল গ্রন্থাদি হইতে সংগ্রহ করিয়া অনেকেই এক একটি বিশেষ বিশেষ ইতিহাস সঙ্কলন করিতে পারেন। তবে ঐ সকল বিষয়ের বিবরণ সকল এত জটিল এবং বিবিধ মত দ্বারা দুর্ব্বোধ্য হইয়া রহিয়াছে যে, তাহা হইতে প্রকৃত সত্য উদ্ধার করিয়া ইতিহাস রচনা করা অভিজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের পক্ষে সম্ভবপর নহে।

আমাদের দেশের অধিকাংশ প্রাচীন গ্রন্থই ছন্দ-নিবন্ধে রচিত। কবিগণ কোন ঐতিহাসিক বিষয়ের রচনা করিবার সময় কাব্য রচনার যশঃ-প্রাপ্তির আশা হইতে বঞ্চিত হইতে ইচ্ছুক হন নাই। তদ্দ্বারা এই দোষ হইয়াছে যে, তাঁহারা অলীক কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অতি ক্ষুদ্র বিষয়কেও এত বড় করিয়া ফেলিয়াছেন, যে ঐ সকল উপকরণ হইতে সত্য অনুসন্ধান করা প্রকৃতপক্ষে বড়ই কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে।

আমাদের বর্ত্তমান সময়ের ইতিহাস চর্চ্চার প্রধান উপকরণ শিলা-লিপি ও তাম্র-লিপি পর্য্যন্ত ঐ সকল দোষ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত নহে। তবে উক্ত প্রাচীন লিপি সকলের পদ্যাংশ অপেক্ষা গদ্যাংশ সমধিক বিশ্বাস-যোগ্য।

প্রাচীন রাজ্য, জনপদ, গ্রাম ও নদী প্রভৃতির তাৎকালিক নাম এবং ভৌগোলিক সংস্থান বিষয়ে ভ্রমশূন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট মানচিত্র প্রভৃতির অভাবে ইতিহাস-চর্চ্চার বিষয়ে বিশেষরূপে অন্তরায় উপস্থিত হইতেছে। আমাদের বিশ্বাস, যতদিন পর্য্যন্ত এই সকল বিষয় আমাদের দেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের মনোযোগ আকর্ষণ না করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত প্রাচীন ইতিহাস-চর্চ্চার বিষয়ে একটি আবশ্যক বিশেষ উপকরণের অভাব থাকিয়া যাইবে। সেই কারণে ঐতিহাসিকগণ স্থানে স্থানে ভ্রম করিতে থাকিবেন। প্রাচীন ঐতিহাসিক শ্রদ্ধাস্পদ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এবং আরও কয়েকজন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিত ভারতবর্ষীয় প্রাচীন প্রদেশ সমূহের ভৌগোলিক সংস্থান সম্বলিত কয়েকখানি মানচিত্র অঙ্কিত করিয়া ঐতিহাসিকগণের আংশিক অভাব পূরণ করিলেও তদ্দ্বারা সম্পূর্ণ অভাব পূরণ হয় নাই। তাহা অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন।

বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় কাম্বোজ দেশের সংস্থান কোথায় ছিল। এই বিষয়ে গৌড়রাজমালার লেখক মহাশয় তিব্বত দেশ অথবা তৎপার্শ্ববর্ত্তী কোন প্রদেশকে কাম্বোজ দেশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

উক্ত গ্রন্থকার মহাশয় এই বিষয়ে স্বাধীনভাবে কোন অনুসন্ধান করেন নাই। তিনি কেবল ফরাসী পণ্ডিত ফুসের অভিমত মাত্র অবলম্বন করিয়া গৌড়-রাজমালায় কাম্বোজ দেশের সংস্থান সম্বন্ধে ঐরূপ মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন। উক্ত ফরাসী পণ্ডিত ফুসে ঐ মত সমর্থন জন্য এমন কোন উৎকৃষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারেন নাই যদ্দ্বারা তিব্বত অথবা তৎপার্শ্ববর্ত্তী দেশকেই কাম্বোজ দেশ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। তিনি মাত্র নেপাল দেশের প্রচলিত কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। (১)

জনশ্রুতিই যদি ঐতিহাসিকগণের প্রামাণ্য উপকরণ বলিয়া গ্রহণযোগ্য হইত তবে ইতিহাসচর্চ্চা অতি সহজ হইয়া যাইত সন্দেহ নাই। (২) শ্রদ্ধাস্পদ প্রবীণ ঐতিহাসিক

(১) গৌড়রাজমালা ৩৭ পৃষ্ঠা।

(২) V. A. Smith's Early History of India 2nd, Ed. P. 173.

গৌড় রাজমালা, ৩৭ পৃষ্ঠা।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় গৌড়রাজমালার ভূমিকায় এইরূপ জনশ্রুতিকেই ইতিহাসের প্রামাণ্য উপকরণরূপে গ্রহণ করিতে আপত্তি করিয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গলা দেশের যে কয়েকখানি ইতিহাস প্রণীত হইয়াছে তন্মধ্যে সামান্য সামান্য দোষ থাকিলেও গৌড়রাজমালাকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লিপিবদ্ধ প্রথম ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। গ্রন্থকার মহাশয়ের এই উদ্যম সর্ব্বথা প্রশংসাযোগ্য বলিতে হইবে। আশা করা যায় তাঁহার ন্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা ভবিষ্যতে আমাদের দেশের আরও অনেক প্রাচীন তথ্যের উদ্ধার সাধিত হইবে। এইরূপ একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থের সামান্য সামান্য দোষ থাকিলেও তদ্বিষয়ে সন্দেহ ভঞ্জন হওয়া আবশ্যক। উক্ত গ্রন্থে কোনরূপ ভ্রম না থাকিতে পারে তদ্বিষয়ে সাধারণের দৃষ্টি থাকাও আবশ্যক। গৌড়রাজমালার গ্রন্থকার মহাশয় সর্ব্বপ্রথমে কাম্বোজান্বয়জ গৌড়পতির আগমন বার্ত্তা ও তাঁহার সম্বন্ধ সর্ব্বসাধারণের নিকট সুপরিচিত করিয়াছেন, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন সন্দেহ নাই। (৩)

শ্রদ্ধাস্পদ প্রাচ্য বিদ্যার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার প্রণীত 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' নামক গ্রন্থে গৌড়রাজমালার কথিত কাম্বোজদেশের সংস্থান সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মত স্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন, কাম্বোজান্বয়জ গৌড়পতির জাতি ও বাসস্থান সম্বন্ধে বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণের নানারূপ মতভেদ চলিতেছে।

তৎসম্বন্ধে কোন ঐতিহাসিকের কিরূপ মত তাহা তিনি উল্লেখ করেন নাই; অতএব উক্ত বিষয়ের কোন প্রকার সমালোচনা হইতে পারে না। (৪)

তিনি উক্ত কাম্বোজান্বয়জ গৌড়পতির প্রতিষ্ঠিত শিল্পের ভাস্কর্য্যের আদর্শ আলোচনা করিয়া, উহা তিব্বতদেশীয় শিল্পের আদর্শ মনে না করিয়া গৌড়ীয় অথবা দাক্ষিণাত্য শিল্পের আদর্শ মনে করিয়াছেন। তদ্দ্বারা কাম্বোজ দেশকে দাক্ষিণাত্যস্থিত কোন প্রদেশ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু এই প্রমাণ দ্বারাও কোন বিশেষ মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায় না। (৫)

তৎপর প্রাচ্য বিদ্যার্ণব মহাশয় প্রথমতঃ দুইটি কাম্বোজ দেশের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তৎসম্বন্ধে আমাদের বিশেষ মতভেদ আছে। তিনি বলিতেছেন, ঐতিহাসিকগণের নিকট দুইটি কাম্বোজ প্রসিদ্ধ। উক্ত দুইটি কাম্বোজদেশ কোন কোন ঐতিহাসিকগণের মতে প্রসিদ্ধ, তৎসম্বন্ধে তিনি কোন প্রমাণ উপস্থিত করেন নাই। ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে কাশ্মীরের নিকট পুরাণপ্রসিদ্ধ কাম্বোজদেশকেই তিনি প্রকৃত কাম্বোজ বলিতে চান; (৬) কিন্তু কোন পুরাণ অবলম্বন করিয়া তাঁহার এই মত সমর্থন করিতে চান তাহা উল্লেখ করেন নাই। প্রাচ্য বিদ্যার্ণব মহাশয়ের সঙ্কলিত প্রাচীন ভারতবর্ষের মানচিত্রে কাশ্মীরের পশ্চিম প্রান্তে কাম্বোজদেশের সংস্থান লিপিবদ্ধ করা আছে। তথাপি তাঁহার প্রথমোক্ত কাম্বোজ আমরা কাম্বোজ দেশ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারিলাম না।

তিনি 'কাম্বোডিয়া' নামে প্রসিদ্ধ স্থানকে দ্বিতীয় কাম্বোজ দেশ বলিতে চান (৭)। কিন্তু তৎসম্বন্ধে কোনও পুরাণের অথবা কোনও ঐতিহাসিকগণের মতের উল্লেখ করেন নাই। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে 'কাম্বোজের' সহিত 'কাম্বোডিয়ার' আংশিক নামের সাদৃশ্য আছে। এইরূপ সামান্য প্রমাণ অবলম্বন করিয়া গৌড়রাজমালার লেখক মহাশয়ের মতের

(৩) গৌড়রাজমালা (ভূমিকা) ।০ পৃষ্ঠা।

(৪) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্য কাণ্ড, ১৭১—১৭২ পৃঃ।

(৫), (৬), (৭) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্য কাণ্ড, ১৭১—১৭২ পৃঃ।

বিরুদ্ধে কোন বিশেষ মত স্থাপন করা যায় না। উপরোক্ত কারণে বিশেষ প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত না হইলে, আমরা উপরোক্ত স্থান দ্বয়কে কাম্বোজদেশ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।

যদি এরূপ সামান্য প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া উপরোক্ত দুইটি স্থানকে কাম্বোজদেশ বলিয়া স্বীকার করিয়া নেওয়া সমীচীন হয় তাহা হইলে গৌড়রাজমালার লেখক মহাশয়ের অনুকূলে আরও প্রমাণ উপস্থিত করা যাইতে পারে। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্মিথ সাহেবের (V. A. Smith) সঙ্কলিত মানচিত্রে (৮) তিব্বতকেই কাম্বোজদেশ বলিয়া লিপিবদ্ধ করা আছে। মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে তিব্বতদেশের উত্তর প্রান্তস্থিত 'কম্বু' প্রদেশকে (৯) কাম্বোজদেশ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে কোন আপত্তির কারণ থাকে না। বিশেষ কম্বুর সহিত কাম্বোজের আংশিক নাম-সাদৃশ্যও আছে।

সম্ভবতঃ উক্ত 'কম্বু' দেশকে কাম্বোজদেশ বলিয়া ভ্রম করিয়া সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্মিথ সাহেব (V. A. Smith) তাঁহার প্রণীত "Early History of India" নামক গ্রন্থসন্নিবিষ্ট ভারতবর্ষের প্রাচীন মানচিত্রে কাম্বোজের সংস্থান-স্থলে সন্দেহজনক চিহ্ন (১০) দিয়াছেন। কম্বুদেশের সহিত কাম্বোজের আংশিক নাম-সাদৃশ্য থাকিলেও আমরা তিব্বত অথবা তৎপার্শ্ববর্ত্তী দেশকে কাম্বোজদেশ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারিলাম না।

উক্ত কাম্বোজ দেশ দ্বয়ের নরপতিগণের গৌড় আক্রমণের সংবাদ তাৎকালিক কোন শিলালিপি তাম্রলিপি বা সাময়িক গ্রন্থ দ্বারা প্রমাণিত হয় নাই বলিয়া তাঁহাদের দ্বারা গৌড় অধিকার হইয়াছিল না বলিয়াই প্রাচ্য বিদ্যার্ণব মহাশয় মনে করেন। (১১)

তৎপরে প্রাচ্য বিদ্যার্ণব মহাশয় দাক্ষিণাত্যে গুজরাট প্রদেশে আর একটি কাম্বোজ দেশের অনুসন্ধান প্রাপ্ত হন। এতদ্বিষয়ে তিনি তৎপ্রণীত "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন—

"উক্ত দুইটি কাম্বোজ ছাড়া পুরাণ হইতে আমরা আর একটি কাম্বোজের সন্ধান পাইতেছি—

পুলিন্দাশ্মক জীমূত—নর রাষ্ট্রনিবাসিনঃ।
কর্ণাটাঃ কাম্বোজা ঘণ্টা দক্ষিণাপথবাসিনঃ॥
অম্বষ্ঠা দ্রাবিড়া লাটাঃ কাম্বোজাঃ স্ত্রীমুখাঃ শকাঃ।
আনর্ত্তাথিনশ্চৈব জ্ঞেয়া দক্ষিণ পশ্চিমে॥

গরুড় পুরাণ ৫৫।১৪—১৫

গরুড় পুরাণের উদ্ধৃত শ্লোক হইতেও বুঝা যাইতেছে যে, দক্ষিণ পশ্চিম ভারতের লাটের পার্শ্বে কাম্বোজগণের বাস হেতু সেই স্থান কাম্বোজ জনপদ বলিয়াই প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। উক্ত শ্লোকে শক জাতিরও উল্লেখ আছে। ইহাতে মনে হয়, যে সময়ে দক্ষিণভারতে শকাধিপত্য ছিল, গরুড় পুরাণের উক্ত অংশ সেই সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১ম ও ২য় শতাব্দীতে সঙ্কলিত হইয়াছিল। এইরূপ স্থলে খৃষ্টীয় ১ম ও ২য় শতাব্দীতে লাট বা গুজরাটের নিকট কাম্বোজ জাতি ও কাম্বোজ জনপদ ছিল স্বীকার করিতে হইবে। (১২)"

(৮) V. A. Smith's Early History of India P. 142.

(৯) "তিব্বতের উত্তর প্রান্ত কম্বুদেশ নামে খ্যাত ছিল। তাহা হইতে ১৮৭ খৃষ্টাব্দে একজন শ্রমণ ভারতে আগমন করিয়া কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ করেন।" "প্রাচীন ভারতে ধর্ম্ম প্রচারকগণ" নামক প্রবন্ধ—ভারতী, আষাঢ়, ১৩০৮ সন।

(১০) (?) Note of interrogation.

(১১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, ১৭১—১৭২ পৃঃ।

(১২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস। রাজন্য কাণ্ড ১৭১—১৭২ পৃঃ।

প্রাচ্য বিদ্যার্ণব মহাশয়ের এই উক্তি দ্বারা এস্থানই যে আবহমান কাল প্রকৃত কাম্বোজ প্রদেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, তাহা পরিষ্কার রূপে বুঝা যায় না। তাহা হইলে কাম্বোজ প্রদেশ কোথায়?

এই কাম্বোজ সম্বন্ধে প্রাচ্য বিদ্যার্ণব মহাশয় শিলালিপি বা তাম্রলিপি কিম্বা তৎসাময়িক গ্রন্থের কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন কি না তাহা উল্লেখ করেন নাই। ইহা পুরাণ-প্রসিদ্ধ কাম্বোজ দেশ বটে। কাম্বোজ প্রদেশের সংস্থান সম্বন্ধে তিনি যে তাঁহার প্রণীত গ্রন্থে নানারূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমরা একমত হইতে পারিলাম না।

গৌড়রাজমালার গ্রন্থকার মহাশয় "কাম্বোজান্বয়জ গৌড়পতির" সময় হইতে মোঙ্গলীয় আকারের জাতির বরেন্দ্র দেশে আগমন সম্বন্ধে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন. এবং করতোয়ার পূর্ব্বদিকবাসী কোচ ও রাজবংশীর সহিত বরেন্দ্রবাসী কোচ ও পলিয়া এবং রাজবংশীগণের পরস্পর সম্বন্ধ থাকার কোন প্রমাণ পান নাই বলিয়া মনে করেন। উক্ত প্রমাণ সকল আমরা যুক্তিপূর্ণ বলিয়া মনে করি না। (১৩)

এতদ্বিষয়ে গৌড়রাজ মালার লেখক মহাশয় স্থানান্তরে ভিন্নরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন

"পশ্চিম কামরূপে প্রাচীন অধিবাসিগণের মধ্যে খেন ও রাজবংশী, এই দুই জাতি প্রধান। খেন জাতি আকারে, আচারে ও ভাষায় বাঙ্গালী। রাজবংশী জাতি ভাষায় বাঙ্গালী, আচারেও অনেকটা বাঙ্গালী; আকারে কিঞ্চিৎ ভুটিয়া—সম্ভবতঃ মেচ-বাঙ্গালীর মিশ্রণজাত। পশ্চিম কামরূপের অধিকাংশ ভাগ এখন বাঙ্গালার অন্তর্গত, এবং উত্তর বঙ্গের অংশরূপে গণ্য।" (১৪)

বরেন্দ্র দেশের সীমান্ত সন্নিহিত হিমালয়স্থ পার্ব্বত্য প্রদেশ এবং কামরূপ প্রভৃতি প্রদেশ হইতে বরেন্দ্রে মোঙ্গলীয় আকারের জাতির আগমন হওয়া সম্ভপর বটে। তৎপর পুনঃ পুনঃ ঐ সকল জাতির আগমনে এবং সংমিশ্রণে উক্ত জাতির অস্তিত্ব থাকিয়া যাইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা একবার দিনাজপুর ঠাকুরগাঁও অঞ্চলে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। তথাকার অধিবাসীবর্গের মধ্যে কতক লোকের মোঙ্গলীয় আকারের গঠন প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা উক্ত বিষয়ের কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই।

---

(১৩) "এবং বরেন্দ্র দেশের অনেক স্থানে যে কতক পরিমাণে তিব্বতীয় বা মোঙ্গলীয় আকারের কোচ, পলিয়া, রাজবংশী প্রভৃতি জাতি দেখা যায়, ইহারা তিব্বতীয় বা ভুটিয়া আক্রমণকারিগণের অর্থাৎ কাম্বোজবংশজ গৌড়পতির অনুচরগণের বংশধর বলিয়াই মনে হয়। এরূপ অনুমান করিবার কারণ, কাম্বোজবংশজ গৌড়পতির সঙ্গে ভিন্ন বহুসংখ্যক মোঙ্গলীয় উপনিবেশিকের বরেন্দ্র, অর্থাৎ করতোয়ার পশ্চিম তীরবর্ত্তী ভূভাগে, প্রবেশের আর কোন অবসর দেখিতে পাওয়া যায় না। করতোয়ার পূর্ব্বদিকবাসী, কামরূপী ব্রাহ্মণগণের যজমান, কোচ এবং রাজবংশিগণের সহিত বরেন্দ্রবাসী ব্রাহ্মণগণের যজমান কোচ, পলিয়া এবং রাজবংশিগণের কোনরূপ সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যায় না।"

গৌড়রাজমালা ৩৭ পৃঃ।

(১৪) সাহিত্য, শ্রাবণ ১৩২০ সন—"ত্রয়োদশ শতাব্দে পশ্চিম কামরূপ।" প্রবন্ধ

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ।

তাহার ফলে উপরোক্ত কারণের জন্য উত্তর বঙ্গে মোঙ্গলীয় আকারের জাতির অস্তিত্ব থাকার প্রধান কারণ বলিয়া মনে হইল। এই বিষয়ে গৌড়রাজমালার লেখক মহাশয় কষ্ট কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রাচ্য বিদ্যার্ণব মহাশয়ও উত্তরবঙ্গবাসী মোঙ্গলীয় আকারের কোচ, মেচ, ও পলিয়া বংশীয় অধিবাসী-বর্গকে উক্ত কাম্বোজ বংশের নিদর্শন বলিয়া মনে করেন না।

আমরা অনুমান করি, গৌড়রাজমালার লেখক মহাশয় সম্ভবতঃ উক্ত উত্তর বঙ্গবাসী মোঙ্গলীয় আকারের কোচ, মেচ, পলিয়াগণ মধ্যে কেহ কেহ তাহাদিগকে রাজবংশী এবং কেহ কেহ তাহাদিগকে ক্ষত্রিয়জাতি বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। এই কারণে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। (১৫)

বরেন্দ্র দেশের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, কামরূপ ও হিমালয় প্রভৃতি স্থান হইতে উত্তরবঙ্গের একাধিক বার মোঙ্গলীয় আকারের জাতির আক্রমণ হইয়াছে। ইহার বহুতর নিদর্শন পাওয়া যাইতে পারে।

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রদ্ধাস্পদ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বলিয়াছেন, "অতি পুরাতন কাল হইতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যের সুখৈশ্বর্য্যের কথা ভারতবর্ষে সুপরিচিত ছিল। পদ্মাবতীর তীরবর্ত্তী উত্তরবঙ্গের উর্ব্বরক্ষেত্র ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ বলিয়া পার্ব্বত্য অসভ্য জাতির উপদ্রবের অভাব ছিল না। তাহারা সময়ে উত্তর ও পূর্ব্বাঞ্চল হইতে সহসা আপতিত হইয়া দেশ লুণ্ঠন করিয়া পলায়ন করিত। এই উপদ্রব নিবারণের জন্য উত্তরবঙ্গের অধিপতিকে নিয়ত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিতে হইত। উত্তর-বঙ্গের পূর্ব্বাংশে সেকালের কামরূপ রাজ্য করতোয়া নদীর পূর্ব্বতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কামরূপের সহিত পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যের যুদ্ধবিগ্রহের অভাব ছিল না। এই সকল বিপ্লবে নিয়ত বিপর্য্যস্ত হইয়া উত্তরবঙ্গ দীর্ঘকাল শান্তিসুখে বঞ্চিত থাকিয়া গৌড়ীয় হিন্দু সাম্রাজ্যের অধিকার ভুক্ত হয়।" ঐ প্রবন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ মৈত্রেয় মহাশয় আরও বলেন, "উত্তর ও পূর্ব্বাঞ্চল হইতে বিবিধ পার্ব্বত্য দস্যুগণ নিয়ত বরেন্দ্র ভূমির উর্ব্বর ক্ষেত্রে আপতিত হইত। তাহাদের আগমন নিবারণ জন্য করতোয়া-তটে নানাস্থানে প্রান্ত-দুর্গ বর্ত্তমান ছিল। অদ্যাবধি বর্দ্ধন-কোট ও মহাস্থান নামক পুরাতন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ করতোয়া তটে দেখিতে পাওয়া যায়।" (১৬)

তিনি আরও বলেন, "উত্তরবঙ্গ চিরবিপ্লবের নিকেতন বলিয়া প্রসিদ্ধ। একসময়ে পার্ব্বত্য হূন জাতি উত্তরবঙ্গের উপর আপতিত হইয়া অনেক অনর্থ উৎপন্ন করিত।" (১৭)

সেই সময় হইতেই বরেন্দ্রদেশে মোঙ্গলীয় আকারের জাতি তাহাদের উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। রাজসাহী জেলা ব্যতীত অন্যত্র বরেন্দ্র দেশের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা ইহাদিগের সংখ্যা অনেক বেশী দেখা যায়। উহারা আপনাদিগকে রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতি বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া আসিতেছে।

ভারতবর্ষে এইরূপ ক্ষত্রিয় জাতির কোন কালেও অভাব ছিল না। যখন যিনি অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, অথবা রাজ্যপালন করিয়াছেন, সেই সময় হইতে তাঁহারা ক্ষত্রিয় জাতির ভাণ করিয়া ক্ষত্রিয় জাতির

(১৫) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—রাজন্য কাণ্ড ১৬৯—১৭০ পৃঃ।

(১৬) "বঙ্গদর্শন" অগ্রহায়ণ ১৩১০, বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গ-বিজয়। শ্রীঅক্ষয় কুমার মৈত্রেয়।

(১৭) "প্রবাসী"—"উত্তরবঙ্গে পুরাতন সংগ্রহ" কার্ত্তিক, অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়। ১৩১৫ সন।

মধ্যে পরিগণিত হইয়া গিয়াছেন। উক্ত রাজবংশী দিগের সহিত প্রকৃত ক্ষত্রিয়জাতির সমতা ও সাদৃশ্য আছে কি না পাঠকগণ বিচার করিবেন।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে কেবলমাত্র কাম্বোজ প্রদেশের সংস্থান কোথায় হওয়া সম্ভব তাহা উল্লেখ করিলাম। পরবর্ত্তী প্রবন্ধে উক্ত কাম্বোজ প্রদেশের প্রকৃত সংস্থান কোথায় থাকা সম্ভব তৎবিষয়ের সমর্থন করার জন্য প্রমাণ সকল উপস্থিত করিবার ইচ্ছা রহিল। (১৮)

শ্রীধরণীমোহন সেন গুপ্ত

চন্দ্রকান্ত প্রসঙ্গ

(৯)

কলিকাতা গমন

প্রথম যাত্রা

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের রচিত গ্রন্থাবলীর অনেকগুলিই সেরপুরে রচিত হইয়াছিল, ইহা আমরা বলিয়াছি। কিন্তু যে গ্রন্থরচনার সূত্রটী তাঁহাকে তখনকার দিনের অতি দুরবর্ত্তী কলিকাতা নগরে আকৃষ্ট করিয়া লইয়া যায় সেই গ্রন্থের নাম "গোভিলীয় গৃহ্যসূত্রভাষ্য"। সে কথা পরে বলিতেছি। ময়মনসিংহ সুসঙ্গ পরগণার অন্তর্গত শঙ্করপুর কান্দাপাড়া নিবাসী পণ্ডিত রঘুনাথ সার্ব্বভৌম মহাশয় তখন নবদ্বীপে ন্যায় এবং স্মৃতিশাস্ত্র পাঠ করেন। উক্ত সার্ব্বভৌম মহাশয় ইতঃপূর্ব্বে সেরপুরে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত দুর্গাসুন্দর কৃতিরত্ন মহাশয়ের পিতার নিকট ব্যাকরণ ও স্মৃতিশাস্ত্র পড়িয়া বিশিষ্ট জ্ঞান লাভের জন্য নবদ্বীপ গিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার যথেষ্ট সুখ্যাতি হয়। তর্কালঙ্কার মহাশয়ও সার্ব্বভৌম মহাশয়ের শাস্ত্রজ্ঞানের যথেষ্ট প্রশংসা করিতেন। উক্ত সার্ব্বভৌম মহাশয় নবদ্বীপ হইতে একদিন কোনও কারণে কলিকাতা যান, এবং মাননীয় প্রতাপ বাবুর সহিত এসিয়াটিক সোসাইটি গৃহে সাক্ষাৎ করেন। সে সময়ে 'চল সংক্রান্তির ব্যবস্থা' লইয়া কলিকাতা, ভাটপাড়া ও নবদ্বীপ সমাজে বড় গোলমাল চলিতেছিল। প্রতাপবাবু সার্ব্বভৌম মহাশয়কে উক্ত ব্যবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করেন। সার্ব্বভৌম মহাশয় যথাশক্তি মীমাংসা করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু মীমাংসার অর্দ্ধ পথে প্রতাপ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এ সম্বন্ধে সুমীমাংসা করিতে পারেন এমন স্মার্ত্ত আপনাদের দেশে কেহ আছেন কি? সার্ব্বভৌম মহাশয় দু'চার জনের নাম করিলেন, এবং ঐ সঙ্গে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নামও উল্লেখ করিলেন। প্রতাপ বাবু সেই সময়েই আমূল ব্যবস্থার বিষয়টী লিখিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট উহার মীমাংসা চাহিয়া পাঠাইলেন। সেই পত্রই প্রতাপ বাবুর প্রথম পত্র। কি শুভক্ষণেই সেই পত্রখানা লিখিত হইয়াছিল! যথাসময়ে তর্কালঙ্কার মহাশয় বহু গবেষণা পূর্ব্বক "চল সংক্রান্তি নির্ণয়" নামক একটী সন্দর্ভ রচনা করিয়া এসিয়াটিক সোসাইটিতে পাঠাইয়া দেন। প্রতাপ বাবু পণ্ডিত ব্যক্তি, তিনি উহা পাঠ করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইলেন, এবং ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়কে উক্ত সন্দর্ভ পাঠ করিয়া শুনাইলে। তাঁহারাও তর্কালঙ্কার মহাশয়ের শাস্ত্র-মীমাংসা-নৈপুণ্য দর্শনে নিতান্ত প্রীত হইলেন। গুণের সহিত গুণের যে অটুট সম্বন্ধ উহা মাথা তুলিয়া উঠিল। বন্ধুত্রয় অজ্ঞাত, অদৃষ্টপূর্ব্ব তর্কালঙ্কার মহাশয়ের গুণে একান্ত মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা তখন এসিয়াটিক সোসাইটীর পুস্তক সংগ্রহ কার্য্যে তন্ময় ছিলেন। তাঁহারা যেমন গ্রন্থ সংগ্রহের জন্য ব্যাকুল ছিলেন তেমনি সংগৃহীত গ্রন্থসমূহের সংস্কার

---

(১৮) পাঠকগণের নিকট সবিনয় অনুরোধ পরবর্ত্তী প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের লিখিত বিষয়ের সমালোচনা করিবেন।

ও অসম্পূর্ণ অংশের পরিপূর্ত্তির জন্যও অভিজ্ঞতর বিদ্বান-দিগের অনুসন্ধানেও ব্যাপৃত ছিলেন।

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সন্ধান পাইয়া তাঁহারা অনেকটা আশ্বস্ত, আনন্দিত ও উৎসাহিত হইলেন। ঐ সময়ে 'গোভিল গৃহ্যসূত্র' মাত্র সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার উপযুক্ত টীকা বা ভাষ্য না থাকায় তাহা সাধারণের কোন কার্য্যেই লাগিতেছিল না, অথচ সামদিগের ইহাই গৃহশাস্ত্র। এই গোভিলের অঙ্গুলি সঙ্কেতে সমস্ত সামগ ব্রাহ্মণ পরিচালিত। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় 'গোভিল গৃহ' সংগৃহীত হইয়াও কাজে আসিতেছে না! তাঁহারা মনে করিলেন, "এই গুরুতর কার্য্যের ভার তর্কালঙ্কার মহাশয়কে দিলে হয় না?" আবার মনে করিলেন, "আচ্ছা একটু পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক্।" বন্ধুত্রয় এবার একচ্ছত্র কার্য্যভার না দিয়া তাঁহাকে এইভাবে লিখিলেন—আমরা এসিয়াটিক সোসাইটীর পক্ষ হইতে 'গোভিল গৃহ্যসূত্রে'র একখানা ভাষ্য, অথবা অসম্ভব পক্ষে একটী টীকা ছাপাইতে চাই। উক্ত ভাষ্য বা টীকা প্রণয়নের ভার গ্রহণে আপনার সম্মতি থাকিলে অবিলম্বে জানাইবেন। এই কার্য্যের গুরুত্ব আপনার অবিদিত নহে" ইত্যাদি।

বুদ্ধিমান্ তর্কালঙ্কার মহাশয় বিষয়টা বুঝিলেন, এবং অতি বিনয় ও তেজস্বিতার সহিত পত্রের উত্তরে কার্য্যভার গ্রহণে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া একেবারে ভাষ্য প্রণয়নের ইচ্ছাই প্রকাশ করিলেন। লোক-চরিত্রাভিজ্ঞ বন্ধুত্রয় বুঝিলেন, 'গোভিলে'র ভাষ্য-রচনা তর্কালঙ্কার মহাশয়েরই কার্য্য।

তাঁহারা অবিলম্বে পুস্তকাদি পাঠাইয়া দিলেন, ও ভাষ্য-রচনা-কার্য্যে তাঁহাকে নিয়োগ-পত্র প্রদান করিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় তাঁহার সমগ্র প্রতিভার সাহায্যে ভাষ্যখানি রচনা করিলেন। সে কি একাগ্রতা! কি পরিশ্রম! আর কত অনুসন্ধান! এবং কত সুদীর্ঘ যামিনীর অনিদ্রা অতিবাহন! যাঁহারা সে সময়কার ছাত্র তাঁহারা সেই ভাষ্য-রচনার ইতিহাসটী জীবনে ভুলিতে পারেন নাই। ভাষ্য রচিত হইয়া এসিয়াটিক সোসাইটীতে প্রেরিত হইল, এবং মুদ্রিত হইয়া দেশে বিদেশে, সুদূর ইউরোপখণ্ডে পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিল। 'গোভিলের' ভাষ্যখানি উৎকৃষ্ট স্মৃতি নিবন্ধের আকার প্রাপ্ত হইল। ইহাতে এতসব স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যাখ্যা ও মীমাংসা করা হইয়াছে যে, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার টীকা মিতাক্ষরার ন্যায় ইহাতে যথেষ্ট বিশিষ্টতা প্রদর্শিত হইয়াছে। তর্কালঙ্কার মহাশয় স্মৃতি-গুরু রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের মতের প্রতি উক্ত ভাষ্যে একাধিক স্থানে কটাক্ষপাত করিয়াছেন। এসকল কথা আমরা সময়ান্তরে আলোচনা করিতে চেষ্টা পাইব। ভাষ্যকারের প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যে ভাষ্যরচনার পদ্ধতি বৈশদ্যে দেশের ও বিদেশের পণ্ডিত-সমাজ মুগ্ধ হইলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রশংসা আর লোকের মুখে ধরে না! বন্ধুত্রয়—গুণগ্রাহী বন্ধুত্রয়, পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ বন্ধুত্রয়—তখনকার দিনের শিক্ষিত সমাজের, বিশেষতঃ কলিকাতাবাসীর মুখপাত্র বন্ধুত্রয় স্থির করিলেন, যেমন করিয়াই হউক তর্কালঙ্কার মহাশয়কে কলিকাতা আনিতে হইবে, আপাততঃ তাঁহাকে একবার দেখিতে হইবে। তর্কালঙ্কার মহাশয় অনুরুদ্ধ হইয়া কলিকাতা গেলেন। বিদ্বৎসমাজের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়, সৌজন্য সৌহার্দ্য সমস্তই হইল। আর বন্ধুত্রয়ের সহিত এতদতিরিক্ত হইল অনুরাগ, প্রণয় ও ভালবাসা। যাহা কেবল গুণমাত্রানুষঙ্গী ছিল তাহা এক্ষণে সাক্ষাৎ পরিচয় প্রসঙ্গে হৃদয়ের ভাব বিনিময়ে আকার প্রাপ্ত হইল, সজীব হইল। বন্ধুত্রয় তর্কালঙ্কার মহাশয়কে অতি যত্নের সহিত বাহিরে ও ভিতরে বরণ করিয়া লইলেন। কিছুকাল সুখ সন্তোষের সহিত কলিকাতা অবস্থান করিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয় আবার দেশে আসিলেন, আবার তাঁহার প্রাণাধিক ছাত্রগণের বিদ্যাচর্চ্চার সাহায্য করিতে লাগিলেন, এবং

এসিয়াটিক সোসাইটীর কতিপয় গ্রন্থ সঙ্কলন, নূতন টীকা ও মৌলিক গ্রন্থ রচনাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। আশা ও উৎসাহ তাঁহাকে নূতন জগতের নূতন মানুষ করিয়া তুলিল। দিবা-রাত্রি অক্লান্ত শ্রম সহকারে তিনি কেবল শাস্ত্র-চর্চ্চা, গ্রন্থ-রচনা ও অধ্যাপনা কার্য্য করিতে লাগিলেন। এদিকে বন্ধুত্রয় তাঁহাকে কলিকাতা স্থায়ী করিবার জন্য শুভ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। যিনি প্রতাপ বাবুর কাছে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পাণ্ডিত্যের পরিচয় সর্ব্বপ্রথম দিয়াছিলেন আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য বশতঃ আমাদের পাঠকবর্গের প্রায় অনেকের সহিতই তাঁহার পরিচয়ের বর্ত্তমান সময়ে কিছুমাত্র সুবিধা নাই। দেশে কত পণ্ডিত কত প্রতিভাশালী জন্মিয়া মরিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের খ্যাত অখ্যাত কত শত কীর্ত্তি কালের ধ্বংস-কারিণী শক্তির কবলে বিলীন হইতেছে তাহার নির্ণয় করাও দুঃসাধ্য। রঘুনাথ সার্ব্বভৌম মহাশয় তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সমসাময়িক পণ্ডিত, কিন্তু তাঁহার পাঠ-সমাপ্ত হইয়াছিল তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কিছু পরে। সার্ব্বভৌম মহাশয় নবদ্বীপের পাঠ সমাপ্ত করিয়া 'সার্ব্বভৌম' উপাধি গ্রহণ করেন, এবং দেশে আসিয়া টোল করেন। তাঁহার প্রতিভা বিশেষ প্রশংসনীয় ছিল। তিনি ন্যায় দর্শনবিষয়ে তত্ত্বোপস্কার নামক একখানা সংগ্রহ পুস্তক প্রণয়ন করেন। 'বিশ্ববিজ্ঞান' ও 'শক্তি' নামক তাঁহার আরও দু'খানা গ্রন্থ দেখা যায়। 'বিশ্ববিজ্ঞান' মুদ্রিত; অধুনা বিলুপ্ত প্রায়। 'শক্তি' অমুদ্রিত। এই দু'খানি গ্রন্থও সংস্কৃত ভাষায় রচিত। বিশ্ববিজ্ঞানে পৌরাণিক ভূগোল ও খগোল বর্ণিত হইয়াছে। সেই সকল প্রাচীন ভূভাগের বর্ত্তমান নাম ও বিবরণ যুক্তি প্রমাণের সহিত আলোচিত হইয়াছে। সার্ব্বভৌম মহাশয় দারিদ্র্য নিবন্ধন স্বকৃত গ্রন্থের সকলগুলি ছাপাইতে পারেন নাই। এবং আমাদের মনে হয় দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে তাঁহার প্রথম জীবনের আশা ও উদ্যম চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, নতুবা তাঁহাকে আরও গ্রন্থের রচয়িতা রূপে আমরা দেখিতে পাইতাম। তিনি জীবনের শেষভাগ ৮ কাশীধামে অতিবাহিত করিয়া ৫৫ হইতে ৬০ বৎসর বয়সে সর্ব্বদুঃখহারী বিশ্বনাথের কোলে দেহ রক্ষা করেন।

তর্কালঙ্কার মহাশয়কে যে দেশের মাটী গড়িয়াছিল তেমন সহায় ও সুবিধা থাকিলে সেদেশের মাটী আরও 'তর্কালঙ্কার' গড়িয়া তুলিতে পারিত। যাক্ সার্ব্বভৌম মহাশয় সম্বন্ধে আমরা অল্প এই পর্য্যন্তই বলিলাম।

দ্বিতীয় যাত্রা

এইবার বন্ধুত্রয়ের সুযোগ মিলিল। সংস্কৃত কলেজে একটী কার্য্য খালি হইল। তাঁহার তৎকালের সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, সি. আই. ই. মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয়কে সংবাদ দিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় আবার কলিকাতা গেলেন। বাসা হইল অন্যতম বন্ধু প্রতাপবাবুর বাড়ীতে। প্রতাপবাবু তাঁহাকে সংস্কৃত কলেজে লইয়া গেলেন। 'ন্যায়রত্ন' মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ হইল। তিনি কাজ দিতে স্বীকৃত হইলেন বটে কিন্তু (তর্কালঙ্কার মহাশয় নিজে বলিয়াছেন) ন্যায়রত্নমহাশয় কিছুদিন (অবশ্য দুই এক দিন তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া লইতে ছাড়িলেন না। তিনি নানারকম 'ছুতা' করিয়া কঠিন কঠিন বই বা স্থান সকল ছাত্রদিগকে একটু বুঝাইয়া দিবার অনুরোধ করিয়া সরিয়া পড়িতেন এবং আড়ালে থাকিয়া শুনিতেন, তর্কালঙ্কার মহাশয় কেমন পড়ান। 'কাব্যপ্রকাশ', 'তত্ত্বকৌমুদী', 'নৈষধ', 'সাহিত্যদর্পণ' প্রভৃতি গ্রন্থের কঠিন কঠিন স্থানগুলি বাছিয়া বাছিয়া বাহির করিয়া বলিতেন, "তর্কালঙ্কার মহাশয়, এই জায়গাটা একটু ছেলেদের বুঝাইয়া দিন্ এই আমি আসচি"। বলা বাহুল্য তর্কালঙ্কার মহাশয় এসকল চতুরতা বেশ বুঝিতেন।

তিনিও অসাধারণ প্রতিভাবলে আলোচিত অনালোচিত স্থানগুলি অবলীলাক্রমে বুঝাইয়া যাইতেন। ছাত্রগণ বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেন। 'ক্লাসে' একদিন 'নৈষধ' পড়াইবার জন্য ন্যায়রত্ন মহাশয় 'ছুতা' ধরিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় পুথির পাতার উপর এমনি চঞ্চল দৃষ্টিপাত সহকারে টীকার মর্ম্মটী আয়ত্ত করিয়া লইয়া 'ক্লাসে' পড়াইলেন যে, ছাত্রগণ একান্ত মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন, শুধু তাহাই নহে তিনি টীকার উপরেও অতিরিক্ত দু'চার কথা বলিয়া ছাত্রগণের মনোরঞ্জন করিলেন। ছাত্রগণ তাঁহাকে চাহিয়া বসিলেন। 'ন্যায়রত্ন' মহাশয়কে এইবার তর্কালঙ্কার মহাশয় বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহার পরীক্ষা ছলনা তিনি পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছেন। এরূপ পরীক্ষা কার্য্য প্রত্যক্ষতঃ হইলে তিনি কখনই উহাতে সম্মত হইতেন না। নিজের অযোগ্যতা প্রতিপন্ন হইবার আশঙ্কাতেই এবং প্রিয়বন্ধু প্রতাপবাবুর নির্ব্বন্ধেই তিনি এ অপমানটুকু সহ্য করিয়াছেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় ইঙ্গিতেই এসকল কথা বলিলেন। ইঙ্গিতজ্ঞ ন্যায়রত্ন মহাশয়ও ইঙ্গিতেই বুঝিলেন। তিনি গুণগ্রাহী ছিলেন তর্কালঙ্কার মহাশয়কে কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তর্কালঙ্কার মহাশয় সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। সংস্কৃত কলেজে তাঁহার কর্ম্মকাল চতুর্দ্দশ বর্ষ। এই চতুর্দ্দশবর্ষ তিনি পরম যত্ন ও মনোযোগের সহিত অধ্যাপনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিয়োগের সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। তাঁহার স্নেহ-বাৎসল্য ও অধ্যাপনায় একান্ত মুগ্ধ ও ভক্তিমান ছাত্রগণের অনেকেই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা চলিয়া আসিলেন।

তর্কালঙ্কার মহাশয় অতি সামান্য বেতনেই সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। এই টাকায় তাঁহার সপরিবার ও সচ্ছাত্র কলিকাতা-বাসের সম্ভাবনা মোটেই ছিল না। কিন্তু এদিকে প্রতাপবাবুর দৃষ্টি পড়িল। তিনি তাঁহার বাসার অতি কাছে মুক্তারামবাবুর ষ্ট্রীটের সাহাজ লেনে অবস্থিত ১০৯নং বাড়ীটী (যাহার বর্ত্তমান নম্বর ৯) তর্কালঙ্কার মহাশয়কে বিনা ভাড়ায় সর্ব্বদা বাসের জন্য ছাড়িয়া দিলেন। তাছাড়া তিনি সদাসর্ব্বদা যে কোনও রকমে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সাহায্য করিতেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় ১০৯ নম্বর বাড়ীটী দখল করিয়া ছাত্র ও পরিবার বর্গের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। বাড়ীটী নাকি প্রথম একতালা ছিল, কিন্তু তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ঐ বাড়ীটীতে পোষায় না বলিয়া সহৃদয় প্রতাপ উহা দোতালা করিয়া দেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় চিরকাল ঐ বাড়ীটীতেই বাস করিয়া গিয়াছেন। সাহাজ লেন খুব পরিষ্কার গলি নহে, গাড়ী ঘোড়া চলিবারও উপযুক্ত রাস্তা নহে। তবু সেই মহাপুরুষের আশ্রম স্থান বলিয়া কত রাজা, মহারাজা, সাহেব, বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, মারহাট্টা উৎকলী, কত দেশ বিদেশের পণ্ডিত, গুণী, জ্ঞানী, ধনী সেই সাহাজ লেনে যাতায়াত করিয়াছেন, সেই ছোট একটী দোতালা বড়ীতে কত মহাজনের পদধূলি পড়িয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ছাত্রসংখ্যা যখন বাড়িয়া উঠিল তখন আর দোতালা বাড়ীতেও স্থান কুলাইয়া উঠে না। অগত্যা তর্কালঙ্কার মহাশয় ছাত্রদের জন্য নিজ ব্যয়ে একটী বাসা ভাড়া করিলেন। ছাত্রগণ তাঁহাতে থাকিতেন, এবং ১০৯নং বাড়ীতে আহার ও অধ্যয়ন করিয়া যাইতেন। ক্রমে কলিকাতা সহরে তাঁহার নিমন্ত্রণ হইতে লাগিল। কলিকাতা সহরের নিমন্ত্রণে বিদায় বেশী না থাকিলেও নিমন্ত্রণের সংখ্যাবাহুল্য ছিল, সুতরাং তাহারও আয় মন্দ হইত না। তা ছাড়া তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পৈতৃক সংস্থানও বিলক্ষণই ছিল, তদ্দ্বারা তাঁহার বাড়ীর খরচ পত্র দুর্গোৎসব আদি নিত্য ক্রিয়া সুন্দর রূপেই সম্পন্ন হইয়া যাইত। তাঁহারা কলিকাতার উপার্জ্জন সেখানেই বিসর্জ্জিত (?) হইত। তখনকার দিনে আমাদের এদেশের লোক কলিকাতা অতি অল্পই ছিলেন, সুতরাং এ দেশ হইতে সামাজিক

পরিচিত লোক যাঁহারা তীর্থযাত্রা বা কার্য্যান্তরে কলিকাতা যাইতেন তাঁহারাও প্রায় অনেকেই তর্কালঙ্কার মহাশয়ের অতিথি হইতেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় অতি যত্ন ও আদরের সহিত অতিথি-সৎকার করিতেন। মোটকথা নানারূপে তাঁহার উপার্জ্জিত অর্থ ব্যয় হইয়া যাইত। বড় একটা থাকিত না। অর্থাভাব তাঁহাকে কখনও পীড়ন করে নাই, বা অর্থের জন্য কখনও তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। অর্থের দিকে কখন ঝুঁকিয়া পড়েন নাই, এতটুকু নীচু হয়েন নাই। সংস্কৃত কলেজে চাকুরী লইয়া তিনি দেশীয় পণ্ডিত সমাজে কিছু নিন্দিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার উন্নতি-দর্শনে ও সহৃদয় ব্যবহারে দেশের ও বিদেশের সকলে তাঁহার একান্ত পক্ষপাতী হইয়া উঠেন, সুতরাং সেই গ্লানি তাঁহাকে অধিক দিন ভুগিতে হয় নাই। তর্কালঙ্কার মহাশয় বুঝিতে পারিয়া ছিলেন দেশে থাকিয়া কখনও তেমন উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন না। কলিকাতার ক্ষেত্রই তাঁহার প্রতিভার উপযুক্ত। তা ছাড়া তিনি একান্ত রাজভক্ত ছিলেন, রাজকীয় বৃত্তির প্রতি তাঁহার একান্ত শ্রদ্ধা ও গৌরব বুদ্ধি ছিল। এই চাকুরীকে তিনি ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন বলিয়া আমরা অবগত নই। তিনি যাহা অধর্ম্ম বলিয়া মনে বুঝিতেন তাহা পরিত্যাগ করিতেন, লোকের ধারণা মাত্রের উপর নির্ভর করিয়া তিনি কোনও কাজ করিতেন না। সুতরাং সংস্কৃত কলেজের চাকুরী তিনি স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করিয়া ছিলেন। সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিয়া তাঁহার আর একটা বিশেষ এই হইল যে, তিনি যখন ইচ্ছা তখনই কলেজলাইব্রেরীর যে কোনও পুস্তক কলেজে বসিয়া বা বাসায় আনিয়া দেখিতে পারিতেন। সংস্কৃত কলেজের প্রকাণ্ড লাইব্রেরীর গ্রন্থসমুদ্রে তর্কালঙ্কার মহাশয় দিবা-রাত্রি ডুবিয়া থাকিতেন।

তা ছাড়া প্রিয়সুহৃদ প্রতাপবাবুর বাড়ীর 'গৃহ লাইব্রেরী' হইতেও সর্ব্বদা পুস্তকাদি আনাইয়া পাঠ করিতেন। আমরা তাঁহার শেষ বয়সে নিজের যে প্রকাণ্ড লাইব্রেরী দেখিয়াছি তাহা যে কোনও দেশের পক্ষে প্রশংসার যোগ্য বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে। তর্কালঙ্কার মহাশয় যেখানে যে পুস্তক পাইয়াছেন তাহাই সংগ্রহ করিয়াছেন। হাতের লিখা বইও তাঁহার লাইব্রেরীতে অল্প ছিল না। যাহা হউক প্রতাপবাবুর লাইব্রেরীটী সংস্কৃত, ইংরাজী ও বাঙ্গলা প্রভৃতি গ্রন্থরাশিতে পরিপূর্ণ ছিল। তর্কালঙ্কার মহাশয় দেশে যেমন ধন-জন-গুণ-গ্রাম ও উৎসাহ-উদ্যমের আশ্রয়—পরম সুহৃৎ ভূম্যধিকারী হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়কে পাইয়া সকল প্রকারে সহায় সম্পন্ন হইয়াছিলেন, কলিকাতা আসিয়াও তেমনি দ্বিতীয় হরচন্দ্র চৌধুরী প্রতাপবাবুকে পাইয়া তাঁহার সকল প্রকার সুবিধা ও সদাশ্রয় লাভ হইয়াছিল। প্রতাপবাবুকে জীবনের অকৃত্রিম বন্ধুরূপে না পাইলে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রতিভা কতটুকু সার্থকতা লাভ করিতে পারিত তাহা নির্ণয় করিবার উপায় না থাকিলেও একথা স্বীকার না করিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে যে, প্রতাপবাবু দ্বারা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের যথেষ্ট উপকার ও উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীকৃষ্ণ সিদ্ধান্ত শাস্ত্রী।

চিকিৎসার্ণবের কবি
গোবিন্দরাম *

গোবিন্দরাম কাছাড়রাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ঔরসজাত সন্তান, কিন্তু তিনি পাটরাণীর গর্ভজাত সন্তান ছিলেন না। সুতরাং কৃষ্ণচন্দ্রের পরে গোবিন্দরামের খুল্লতাত গোবিন্দনারায়ণ সিংহাসনে আরোহণ করেন। বাল্যকাল

* ঢাকা সাহিত্য পরিষদে পঠিত

হইতে গোবিন্দরাম, আনন্দরাম নামক জনৈক রাজ-অমাত্য কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হন। এই হেতু তিনি আনন্দরামের পুত্ররূপেও পরিচিত। গোবিন্দরামের পুত্র ৺ গোলক কুওর; পৌত্র শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র কুওর এখনও জীবিত আছেন।

গোবিন্দরাম কাছাড় রাজপরিবারের সন্তান। এই রাজগণের মাতৃভাষা কাছাড়ী বা হিড়িম্বি ভাষা। বাঙ্গলাভাষার সহিত এই ভাষার কোনও সংস্রব নাই। সুতরাং গোবিন্দরামের বিষয় আলোচনার পূর্ব্বে তিনি সংস্কৃত এবং বঙ্গভাষা আয়ত্ত করিয়া সুললিত পয়ার ছন্দে সংস্কৃত গ্রন্থ সমূহ বাঙ্গলা কবিতায় কিরূপে অনুবাদ করিতে সমর্থ হইতে পারেন, এ বিষয়ে বুঝা আবশ্যক। তাই কাছাড় রাজ-পরিবারে সংস্কৃত এবং বঙ্গ সাহিত্য চর্চ্চা সম্বন্ধে মুখবন্ধ স্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে হইল।

বহুপূর্ব্ব হইতেই কাছাড় রাজগণ বঙ্গ সাহিত্যের পৃষ্ঠ পোষকতা করিয়া আসিতেছিলেন। রাজা সুরদর্পের সময়ে সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ কাছাড়বাসীর দুর্ব্বোধ্য বলিয়া প্রজাবর্গের উপকার হেতু "ভাষায়" অনুদিত হয়। কাছাড়ী কবি চন্দ্রমোহনের কবিতা হইতে নরবলির নিমিত্ত ধৃত ভুবনেশ্বর বাচস্পতি কর্ত্তৃক নারদীয় পুরাণ "ষোলশত বায়ন্ন" শকে, বাঙ্গালা পয়ারে কিরূপে অনুদিত হয় তাহার পরিচয় মৎপ্রণীত কাছাড়ের ইতিবৃত্ত গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে।

কৃষ্ণচন্দ্র এবং গোবিন্দচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী কাছাড়-রাজগণ বাঙ্গালা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক রূপে বহু সংস্কৃত গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় অনুদিত করিলেও, একটি দুইটি গীত ভিন্ন তাঁহাদের স্বরচিত গ্রন্থাদি বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। এই বিষয়ে আমাদিগের কাছাড়ের শেষ দুই নৃপতি প্রধান অবলম্বন গোবিন্দরাম ইহাদের একের পুত্র এবং অপরের ভ্রাতুষ্পুত্র। তাঁহার সাহিত্যানুরাগ ইঁহাদের আদর্শেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। নৃপতিদ্বয় উভয়েই আজীবন সংস্কৃত সাহিত্য এবং বৈষ্ণব পদাবলী আলোচনায় অতিবাহিত করেন। ইঁহাদের গ্রন্থাবলী সাধারণ্যে প্রচারিত হইলে উভয়ই সুলেখকরূপে পরবর্ত্তী কালে কীর্ত্তিত হইবেন। প্রাদেশিক সাহিত্যের এই অধ্যায়ের আলোচনা এপর্য্যন্ত হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। সুতরাং এই অধ্যায় আপনাদের নিকট উপেক্ষনীয় হইবে না।

গোবিন্দরামের পিতা কৃষ্ণচন্দ্র রাজ্য লাভের পরেও দীর্ঘকাল নবদ্বীপ, কাশী এবং প্রয়াগধামে, তীর্থবাস উপলক্ষে শাস্ত্রালোচনায় অতিবাহিত করেন। তৎপ্রণীত "বসন্ত বিহার" ও সংস্কৃত-বাঙ্গলা মিশ্রিত কবিতাগুলি তাহার রচনা কৌশলের পরিচয় প্রদান করে। নিম্নে একটী সংস্কৃত কবিতা উদ্ধৃত হইল—

জয়তি শ্রীচরণ চণ্ডিকাং॥ ধু॥
ব্রহ্মা হরিহর সুরাসুরবর সেব্য পদনখচন্দ্রিক ং।
ভবেশ ভামিনী দুস্কৃতি ভঞ্জনী চপলানন জগদম্বিকাং॥
মন্দর বাসিনী বিশ্বনিকেতনী জননমরণপ্রতিপালিকাং।
নৃপ কৃষ্ণচন্দ্রং তই ভবতন্দ্রং কুরু কৃপাময়ী ভবসাগরপারং।
সুখদং শুভদং ঈপ্সিত জলদং শ্রীপদবাঞ্ছিত পুরং॥

কৃষ্ণচন্দ্রের ভাবপ্রবণতা ও ধর্ম্মনিষ্ঠার দৃষ্টান্তস্বরূপ তাহার রাজত্বের প্রারম্ভে মুসলমান ফকির ফেরুচুপীর আক্রমণ কালে তিনি উত্তর কাছাড়ে পলাতক অবস্থায় যেসকল কবিতা রচনা করেন তন্মধ্যে একটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

মরে বলিয়া দেওমা কাতর সেবকের কি হইবে
উপায়॥ ধু॥
আমি ডাকি মাও মাও মাও মায়ে বাচ ভিন।
মায়েরে কি দোষ দিমু আপনার কুদিন॥
মেড়া হংস মহিষ বলি মাও তাহে নাহি দায়।
তবে যদি কর দয়া ভজি রাজা পায়॥
আমি তোমার তুমি আমার মাও সর্ব্বলোকে জানে।
গলায় পলিতা যেন না ছাড়ে ব্রাহ্মণে॥

চৌদিকে অরণ্যের মধ্যে যাও তোমার নামটি জাগে।
কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজে তোমার চরণ মাগে॥

কৃষ্ণচন্দ্রের অনুজ গোবিন্দনারায়ণ ১৮১৩ হইতে ১৮৩০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনিও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। প্রাচীন পদাবলী পাঠে তিনি তন্ময় হইয়া যাইতেন। তিনি যে লিপিকৌশলের সহিত সংস্কৃত গ্রন্থ বাঙ্গলা পয়ারে অনুদিত করিতেন তাহার নিদর্শন স্বরূপ নিম্নে রাসপঞ্চাধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ হইতে যৎসামান্য উদ্ধৃত হইল :—

(১) শারদ পার্ব্বণ নিশি স্নিগ্ধময় দশ দিশি
চলে গোপী বৃন্দাবন প্রতি।
সেই রসে বঞ্চিত অনুগ্রহে আকাঙ্খিত
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র নরপতি॥

(২) ভয়ঙ্কর তমসিনী ঘোরজন্তু নিসেবিনী
ইহ অনুচিত অবস্থান।
মধ্যক্ষীণা সুগোপিনী নববন বিহারিনী
ব্রজপতি করহ প্রয়াণ॥

(৩) আমরা গোপিনী বিরহে তাপিনী।
বিদায় দিও না শ্যাম নিদয় হ'ওনা॥
ছাড়িয়া বন্ধুগণ লইলাম শরণ।
স্নেহ শূন্য বাক্য বলিও না॥

এইরূপ অবস্থায় গোবিন্দরামের পক্ষে সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ বিস্ময়ের বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইবে না। তাঁহার বহুগীতি তাঁহার এইরূপ কবিত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

গোবিন্দরাম চিকিৎসার্ণব নামক সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থের অনুবাদকরূপে কাছাড়ে সমধিক খ্যাতি লাভ করিয়া আসিতেছেন। আমরা এক্ষণে এই গ্রন্থের ভূমিকা এবং উপসংহার ভাগ হইতে যৎকিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি।* ভাষার লালিত্য এবং রচনা—কৌশল অনুবাদের মধ্যেও প্রতিভাত হইবে।

গুরু পদে রাখি মতি
বন্দো দেব গণপতি
তুষ্টা হন ভগবতী
তবে অতি শীঘ্রগতি
পুরে অভিলাষ।

জগত জননী যারে
তুষ্টা হন এ সংসারে
সে জন সকল পারে
অনায়াসে করিতে প্রকাশ॥

চিকিৎসার্ণব নাম
গ্রন্থ অতি গুণধাম
চিন্তা করো অভিরাম
দেখি চিত্ত হবে চমকিৎ।

তাহার কোমল মিষ্টি
গ্রন্থ যে নূতন সৃষ্টি
কিছু দিন করি দৃষ্টি
মূর্খ বৈদ্য হইবে পণ্ডিত॥

নাড়ি প্রকাশানুসারে
যদি নাড়ি বোধ করে
চিকিৎসা করিতে পারে
একারণে নাড়ি জ্ঞান
আছে নিরুপিৎ।

* অধ্যায়—১। নাড়ী পরীক্ষা
২। জ্বর নিরূপণ
৩। পাচন প্রকরণ
৪। মুষ্টি যোগ
৫। পাচনাদির ওজন নিরূপণ

না থাকিলে নাড়ীবোধ
হবে কেন রোগ বোধ
মূর্খ বৈদ্য করে ক্রোধ
বিষ বড়ি দিয়া করে
হিতে বিপরিৎ ॥

ব্যাধিতে পীড়িত লোক
নানা মতে পায় শোক
তার কিছু করি যোগ
লোক উপকার কারণ ॥

বৈদ্যকের শাশ্র মত
পাচনাদি আছে কতো।
তার মধ্যে শার যত
এই গ্রন্থে করি নিরুপন ॥

যে অড়ে যে অধিকার
বিস্তারিয়া কব তার।
সভাকার উপকার
হবে অতিশয় ॥

ঔষদাধি নানা মত
বিস্তারিয়া কব কত
অল্পে ধরে গুণ শত
শাস্ত্র মত করিলে নির্ণয় ॥

নিদানাদি নানা মত শাস্ত্রের প্রমাণ।
সাধু ভাষা তাথে পয়ার আসে জান ॥
গ্রন্থে কোন থাকে ভুল শুন বুধ গণ।
দোষ সাড়াইতে পারি খেমিবা আপন ॥
এই গ্রন্থে শোধনের আছে প্রকরণ।
দেখিয়া শোধন কর জার প্রয়জন ॥ ইত্যাদি।

অথ পাচনাদির ওজন নিরূপণ। *

অশীতি রত্তিতে তোলা সাস্ত্রে নিরূপণ।
দুতোল তার দ্রব্যে করিবে পাচন ॥
একশত যাটি রত্তিতে দুতোলা হইবে।
যতদ্রব্য রত্তির প্রতি ভাগ করি লবে ॥

অথ শোধন প্রকরণং।

অথ জল শোধনং।

অশীতি রত্তিতে তোলা শাস্ত্র পরিমিত।
বাহাত্র তোয়ে সের শাস্ত্রেতে কথিত ॥
একসের জল যদি সোধন হইবে।
বায়ু প্রধানে জল পদেহীন (?) করিবে ॥
পিত্তাধিক্যে জল কর দ্বিপাদ সোধন।
কফেতে ত্রিপাদহীন কহে মুনিগণ
যেদিন সোধিত জল সেই দিন খাবে।
দিনান্ত হইলে জল গুণ না করিবে ॥
অতঃপর কহি শুন শুদ্ধি প্রকরণ।
যেরূপে সকল দ্রব্য করিবে শোধন ॥

অথ গোদন্তীশোধন।

গোদন্তী গোমুত্রে স্বর্ধাপক্ক কর তাকে।
এক প্রহর জবনা পরে শুদ্ধি শাস্ত্রে লেখে।

অথ শিমুলসার শোধন।

কাচা দুগ্ধে একদণ্ড জবনা করিবে।
স্বর্ধ্যপক্ক সিমুলসার শোধিত হইবে ॥

অথ স্বর্ণমাক্ষি শোধন।

স্বর্ণ-মাক্ষি শোধন হয় পাঁতি লেবু রসে।
একদণ্ড জবনা জানিবে সবিশেষে ॥

অথ আফিঙ্গ শোধন।

ছাগী দুগ্ধে এক প্রহর জবনা করিলে।
আফিঙ্গ শোধন হয় শাস্ত্রেতে কহিলে ॥

* পুথির ৬৮ পৃঃ § ৩৮ হইতে।

অথ হিঙ্গুল শোধন।

পাতি লেবুর রস দিয়া হিঙ্গুল শোধিবে।
এক প্রহর জবনা পরে অতি শুদ্ধ হবে॥

অথ হরিতাল শোধন।

এক পক্ষ হরিতাল করিবে জবনা।
আকন্দের আঠা তাতে করিয়া যোজনা॥
তৎপরে চূণের জলে মর্দ্দন করিবে।
তবে যেন হরিতাল অতি শুদ্ধ হবে॥

অথ মনছাল শোধন।

পাতি লেবুর রসে যদি করয়ে মর্দ্দন।
নিশ্চয় হইলে হয় মনছাল শোধন॥

অথ লৌহ শোধন।

কান্ত লৌহ চূর্ণ করি এক ছটাক লও।
শাল্মলির পত্র * তাহে এক পোয়া দাও॥
দাড়িম্বের পত্র দাও অর্দ্ধসের নিয়া।
সকল একত্রে খাড় নিশ্চয় করিয়া॥
শরার উপরে রাখি ঢাক শরা দিয়া।
গজপুটে পাক কর শাস্ত্র মত নিয়া॥
আর এক মত শুন কহি লৌহ জারা।
পূর্ব্বাপর আছে এই শাস্ত্র মত ধারা॥
যার মত অভিমত কান্ত লৌহ নিয়া॥
মূষিক মৃত্তিকা মধ্যে দুমাস রাখিয়া॥
ঐ লৌহ সপ্তবার করি প্রজ্বলিৎ।
সপ্তবার গোমূত্রেতে নিক্ষেপ উচিৎ॥
গজপুটে দগ্ধ পরে কর এই মত।
খালি কার † রস তাতে কর অনুগত॥

* শীমলের পাত
† খাচিয়া

তার পর দাত তাতে বটমূল সয়।
জবনা করহ পরে সপ্ত দিবস॥
দুই মত কহিলাম এই লৌহ জারা।
অবধুত মতে আর আছে নানাধারা॥

অথ অভ্র শোধন।

অগ্নিতে করিয়া দগ্ধ দুগ্ধে কিম্বা জলে।
নিক্ষেপ করিবে অভ্র শাস্ত্রে এই বলে॥
ধান্য মধ্যে রাখ পরে করিয়া যতন।
ভেরেণ্ডার রসে অভ্র করহ মর্দ্দন॥
চাকতি করিয়া পুনরায় ঐ রসে।
সাতবার গজপুট করহ বিশেষে॥

অথ হিঙ্গ শোধন।

হিঙ্গকে সুশুদ্ধি কর ঘৃতেতে ভাজিয়া।
পোড়াইয়া ভস্ম কর গজপুটে দিয়া॥

অথ বঙ্গ শোধন।

বঙ্গ অর্দ্ধ পোয়া তৈল এক পোয়া নিয়ে।
একত্রেতে জাল দাও অগ্নি যোগে থুয়ে॥
জিরা আর হরিদ্রাচূর্ণ দধি জলে দাও।
চুণের জল এক পোয়া তাহাতে খাওয়াও॥
যখন তাবৎ জল শুষ্ক হইয়া যাবে।
তখন যানিবে বঙ্গ অতি শুদ্ধ হবে॥

অথ নাভিসংখ শোধন।

নাভিসংখ এই মত করিবে শোধন।
কুলের ছালের রসে ফুট দিয়া গুণিগণ॥
পশ্চাৎ জম্বীর রসে পুটে পুড়াইবা।
বাকষের রসে পরে নিক্ষেপ করিবা॥
দিনান্তে হইবে শুদ্ধ কহিলেন মুনি।
যথাবিধি লিখিলাম শাস্ত্রমত জানি॥

অথ ভেলা শোধন।

ভেলা যদি দুধের সহিত সিদ্ধ করে।
তবে ভেলা শুদ্ধ হয় কহে মুনিবরে।

অথ পারা শোধন।

রশুনের সঙ্গে পারা করিবে মর্দ্দন।
চতুর্থ প্রহর পরে হইবে শোধন।

অথ গন্ধক শোধন।

ঘৃত দিয়া অগ্নিযোগে গন্ধক গলাবে
সুন্দর গলিলে কাচা দুগ্ধেতে ফেলিবে॥
পারা আর গন্ধক সমভাগ করি লবে।
নিশ্চয় মর্দ্দনেতে কজ্জলি হইবে॥

অথ জয়পাল বীজ শোধন।

জয়পাল বীজ যদি দুগ্ধে সিদ্ধ করে।
দুর করি দোষ ভাগ শুদ্ধগুণ ধরে॥

অথ সোহাগা শোধন।

সোহাগা শোধন শুন শাস্ত্রমতে কই।
অগ্নি যোগে যখন হবে কেবল যেন খই॥

অথ মতান্তর ভেলা শোধন।

গোমূত্রেতে যদি বাড়ে লাফে সিদ্ধ করে।
দোষ ছাড়ি গুণ ধরে কহে মুনিবরে॥

অথ উপবিষ শোধন।

ধুতুরার মূল বীজ লাঙ্গুলি কুচিলা।
সিজু ক্ষির গুঞ্জা আদি কৌরবির মুলা॥
এই সব দ্রব্য যদি দুগ্ধে সিদ্ধ করে।
দুরে যায় দোষ ভাগ শুদ্ধ গুণ ধরে॥

অথ ঔষধ সেবন।

১৩	১৫	১০	১৯	৫	৮	১৮
হস্তা	স্বাতী	মঘা	মুলা	মৃগশিরা	পুষ্যা	জেষ্ঠা
২৪	১৪	২৭	১	২২	১৭	
শতভিষা	চিত্রা	রেবতি	অশ্বিনী	শ্রবণা	অনুরাধা	

এই কয়েক নক্ষত্রে কন্যা মিথুন লগ্নে শুক্র
৫ ২
বৃহস্পতি সম এই কত্রক বারে ঔষধ সেবন করা।

ইতি শকাব্দ।

বামা গতি অঙ্ক পাতি দেখ বুধ জন।
অষ্টাব্দ সৈলেন্দু দিয়া করহ পুরণ॥
তুলাতে গমন মৈত্র শষ্ঠ দিন গতা।
কৃপাত্মজ গোবিন্দরামে লেখিলেন পুথি॥

৺ শ্রীহরি।

ডে প্রাংয়া জু প্রাংয়া সেলেঙ্গা মাভাইচা।

আপনারা উদ্ধৃত অংশগুলি পাঠ করিয়া যেরূপ বিস্ময়ে আপ্লুত হইয়াছেন একদিন আমারও তদ্রূপ হইয়াছিল। তাই গোবিন্দরামের ভণিতাযুক্ত পুথিখানা আমি সাদরে রক্ষা করিতাম। দুর্ভাগ্যবশতঃ অতঃপর, কুক্ষণে, অপর একখানা প্রাচীন চিকিৎসার্ণব পুথি আমার হস্তগত হয়। শেষোক্ত পুথির কয়েক পংক্তি আপনাদের নিকট উপস্থিত করিয়াই এই কাহিনী হইতে বিরত হইব।

সুরধণী তিরে ধাম ধন্য সে বহারা গ্রাম
গঙ্গা কিশোর নাম দ্বিজ দীন অতি॥
চন্দ্রতেজে করি চুর তেজচন্দ্র বাহাদুর
ভুবনে দ্বিতীয় শুর তার অধিকারে বসতি॥
গ্রন্থে কোন থাকে ভুল গুনিগণ দিবে কুল
দোষ ছাড়া নাহি মূল সাধুজন আছয়ে প্রকাশ॥
অল্প দোষে সুধাকরে কি করিতে পারে তারে
গঙ্গাধর ধরে শীরে. অন্ধকারে ঘোরতরে
অনায়াসে করয়ে বিনাশ॥

গোবিন্দরাম তবে কি চিকিৎসার্ণবের প্রকৃত গ্রন্থকার নহেন? আপনারা এই বিষয়ের সত্য নির্দ্ধারণ করিবেন। হয়ত ইহা বড় মানুষের সখ। তারাচাঁদ লোকের সাহায্যে যশ লাভ করিবার একটি খেয়ালমাত্র। এদেশেও কি

এইরূপ একান্ত বিরল? যাহা হইক স্বদেশে উপেক্ষিত হইলেও দরিদ্র ব্রাহ্মণ কবি সম্ভবতঃ কাছাড় রাজ-পরিবারের আশ্রয়েই কবিযশ অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গঙ্গাকিশোরের ভণিতাযুক্ত পুথিখানা ৺শম্ভুনাথ দেশমুখ্যের সংগৃহীত। গোবিন্দরামের ভণিতা যুক্ত পুথি কাছাড়ে সুপরিচিত। উহার একখণ্ডও ৺শম্ভুনাথের পুস্তকাগারে রক্ষিত হইতেছে।

শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র গুহ।

পুস্তক সমালোচনা

সোহ্‌রাব-বধ কাব্য—শ্রীআবুল-মা-আলী মহম্মদ হামিদ আলী প্রণীত। ভূমিকায় কবি নিজেই কাব্যের বর্ণনীয় সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন—"অমর কবি ফেরদৌসী রচিত শাহ্‌নামা কাব্যের উত্তমাংশ রুস্তম তহ্‌মিনার পরিণয়-কাহিনী, সোহ্‌রাবের জন্ম—রুস্তমের সহিত তাঁহার অপরিচিত ভাবে যুদ্ধ সংঘটন, তাহাতে তাঁহার প্রাণ-বিয়োগ। পিতাকর্ত্তৃক অজ্ঞাত ভাবে পুত্রের বিনাশ।" বাঙ্গলা ভাষায় সোহ্‌রাব রুস্তম্ কাহিনীর এই প্রথম প্রচার নহে। ইতঃপূর্ব্বে কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল এবিষয়ে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। মাতৃমন্দির সাজাইতে হইলে পৃথিবীর যাবতীয় উদ্যান হইতে সুগন্ধ কুসুম সংগ্রহ করিতে হইবে। 'সোহ্‌রাব কাব্য' রচয়িতা পারস্যোদ্যান হইতে একটী কুসুম সংগ্রহ করিয়াছেন। এজন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। বঙ্গভাষার প্রতি এই মুসলমান কবির অনুরাগ দর্শনে আমরা পরম প্রীত ও আশান্বিত হইয়াছি, এবং ভরসা করি, তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া তাঁহার স্বধর্ম্মাবলম্বিগণ মাতৃভাষা-চর্চ্চায় মনযোগী হইবেন।

এই কাব্যের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, গ্রন্থকার মুসলমান হইলেও গ্রন্থের সর্ব্বত্রই খাঁটী সংস্কৃতমূলক শব্দ ও উপমাদির ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা মুসলমান কবির পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয়, সন্দেহ নাই। তাঁহার ভাষায় বেশ লালিত্য ও বর্ণনায় মাধুর্য্য আছে—কাব্যের অনেক স্থলেই কবিত্বের উচ্ছ্বাসও পরিলক্ষিত হয়। নৈসর্গিক দৃশ্যের বর্ণনায় কবির বেশ দক্ষতা আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা প্রথম সর্গ, ৪র্থ সর্গ ও ৬ষ্ঠ সর্গের (৮১—৮২ পৃ) বর্ণনার উল্লেখ করিতে পারি। সমগ্র ৮ম সর্গটী করুণ ও বীর রসের সমাবেশে বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহারে কবির যথেষ্ট ক্ষমতা থাকিলেও অনেক স্থানে পদচ্যুতি দোষ ঘটিয়াছে ও স্থানে স্থানে 'ক'বুলা (১৯ পৃ), 'পা'তাম' (৩০ পৃ) 'ফ্যাল ফ্যাল' (৮৩ পৃ) প্রভৃতি প্রাদেশিকতাদুষ্ট শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে এই সমস্ত দোষ সংশোধিত হইবে। "কোথায় কেবা যমেরে বিমুখে" (৬৫ পৃ)—কবির এই উক্তির তাৎপর্য্য গ্রহণে আমরা নিতান্ত অশক্ত হইয়াছি।

বৈদিক সমস্যা—শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র কাব্যতীর্থ সাখ্যার্ণব প্রণীত—মূল্য চারি আনা। বৈদিক সমস্যায় হিন্দুর বেদচতুষ্টয়ের নাম গন্ধও নাই। কাছাড় হইতে প্রকাশিত "বৈদিক সংবাদিনী," "বৈদিক পুরাবৃত্ত" ও "বৈদিক নির্ণয়" গ্রন্থের ঐতিহাসিক ভিত্তিহীনতা প্রমাণ করিয়া ঐতিহাসিকগণ যে সমস্ত মন্তব্য ব্যক্ত করিয়াছেন, কাব্যতীর্থ মহাশয় তৎসমুদয় সংগ্রহ করিয়া নিজ মন্তব্য সহ আলোচ্য গ্রন্থে প্রকাশিত করিয়াছেন।

সরযু (কবিতায় উপন্যাস)—শ্রীবসন্তকুমার সেন গুপ্ত প্রণীত ও প্রকাশিত। গ্রন্থের প্রারম্ভেই একটী প্রকাণ্ড শুদ্ধিপত্র দেওয়া হইয়াছে। গল্পের প্লটটী যেমন সরস ও সুন্দর, বর্ণনা ও রচনাও তেমনি মনোরম ও সহজবোধ্য হইয়াছে। গ্রন্থকার অতি সহজ ও সরল ভাষায় নিজ বক্তব্য ব্যক্ত করিয়াছেন—কোথায়ও ভাষার আড়ষ্টতা, ভাবের কাঠিন্য নাই। ইহাই এই পুস্তকখানির প্রধান বিশেষত্ব। এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

৪৭১। ঠ্যাঁটের ঠ্যাটা জগৎ শেঠ।

৪৭২। যে যার বহর, তার পায় পড়ে কহর।

৪৭৩। বেটী বড় চুমারী, আচাকলা পাকানী।

৪৭৪। কিদিম্ ছুতা কিদিম্ জুতা,
বাহরে মারছে গালে গুঁতা।
কিদিম—কি দিব।
বাহরে—তাঁদুরে।

৪৭৫। যে যায় পানায়, সে ফিরে না আনায়।

৪৭৬। বসতে পাইলেই শুইতে জাগা।

৪৭৭। চাপা ফুলের গন্ধে জামাই আছে আনন্দে।
আছে—আসে।

৪৭৮। পরেরটা পরে খায়।
লবণ দিয়া পাড়াইয়া খায়।

৪৭৯। দক্ষিণে ঢেঁকি, উত্তরে বেল,
লক্ষ্মী ডাকিয়া কয় এই ত বাড়ী গেল॥
দক্ষিণে—দক্ষিণের ভিটিতে।
উত্তরে বেল—চতুঃসীমার মধ্যে উত্তর দিকে বেলগাছ।

৪৮০। * * * যখন তখন, প্রস্রাবে দূর।
ছেপ কাশাইবে আরও দূর।

৪৮১। শেষ ভাল যার, সব ভাল তার।

৪৮২। কথার মত কথা কয়, এক কথায়ই জয় হয়।

৪৮৩। সারা রাজ্যি ভাইজ্যা খাইলাম,
চাইলতা * *

৪৮৪। বড় বাড়ীর বিড়ালটা যে,
সেও বড় লোক।

৪৮৫। লেখাপড়ায় ঘোড়ার ডিম,
গল্প করতে সারাদিন।

৪৮৬। ভাত খাইতে ভাত পড়েই।

৪৮৭। দিল্লির লাড্ডু,
যে খায় সেও কন্দায়।
যে না খায় সেও কন্দায়॥

৪৮৮। একটা ভাত টিপ্পাই বোঝে,
সবগুলি আর টিপে না।
টিপ্পা—টিপিয়া।

৪৮৯। বাঙ্গালের মাইর।
দুনিয়ার বাইর॥
দুনিয়া—পৃথিবী।
বাইর—বাহির।

৪৯০। বাড়ীর নামে বাঙ্গাল খায়।

৪৯১। বেলাও আছে,
বাড়ীও কাছে।
যেতে চান যান,
না হয় থাকেন॥

৪৯২। এক গাছের বাকল।
আর গাছে লাগে না॥

৪৯৩। পাগলের গোবধে আনন্দ।

৪৯৪। আম্মকের * * তিনখানে লাগে।

৪৯৫। যত গর্জে,
তত বর্ষে না।

৪৯৬। উলুর পাক জালায়,
জালায় পুইয়া মরতে।
জালায়—জন্মে।

৪৯৭। সকালে বাচ্ত,
ধুইয়া খা।

৪৯৮। চোরের রাত্রিবাসও ভাল।

৪৯৯। পথে পাইলাম টাকাটা,
চৌদ্দ আনাও লাভ।

৫০০। যত খাট—
তত মটা।

৫০১। অপে গেলাম বউ দেখতে,
বউ চায় আমারে ধইরা খাইতে।
অপে—গুজব শুনিয়া।
ধইরা—ধরিয়া।

৫০২। না কর ক্যান-এত দেখি।
দিমুনা তব গরজে না কি॥

৫০৩। যতক্ষণ খাস,
ততক্ষণ আস॥

৫০৪। দেখা-শুনা যতক্ষণ।
ভালবাসা ততক্ষণ॥

৫০৫। আছিলাম বালুচরে
উঠলাম নাও।
বাজাইলাম খটুখটি;
যা করে খোদায়॥

৫০৬। ফুটা ত ফুটা
বাইর বাড়ী পা ফুটা।
বাইর—বাহির।
পা—পিয়া।

৫০৭। মা আছি বাওন,
মাও দিবা দক্ষিণা।
মারতে কইল কে?
বাওন—ব্রাহ্মণ।

৫০৮। বিদেশের কুই,
দেশের পুটী।

৫০৯। কিনাই দিয়া খাইতে খাইতে,
রাজায় গেয়াও হেয়ায়।

৫১০। টিটিপক্ষী চায় গাঙ শুকাইতে।

৫১১। কিসের বাদল কিসের বৃষ্টি?
আজ্ঞা যদি পাই,
সাতভুপুরে গাঙ সাতইরা খশুর বাড়ী যাই॥
সাতাইরা—সাঁতারিয়া।

৫১২। মাঘের শীত
বাঘের গায়েও লাগে।

৫১৩। পায়ের তলে যেন সৌরষা
ছ'মাসের পথ দুই দিনেই ফরসা।

৫১৪। জেগে যে ঘুমায়,
তারে তোলন বড় দায়।
তোলন—জাগান।

৫১৫। মুখের চোটে কত কয়
আকাশের চান হাতে দেয়॥

৫১৬। খায় না, ন্যায়।
ন্যায়—লেহন করে।

৫১৭। পান্ না
আবার খান্ না।

৫১৮। হাতের পাঁচটা আঙ্গুল
আর সমান হয় না।

৫১৯। মুখ দিছে যে,
আহার দিব সে।

৫২০। সুখপায় ত, * * *

৫২১। আমি যদি আমায় আমার
তিনি আবার আমার নিবান আগুন
উসকায়॥

৫২২। ছিল ঢেঁকি হ'ল শূল,
কাটতে কাটতে একেবারে নির্মূল।

৫২৩। এক কাঠি বাজে না।

৫২৪। ফল পাকলে হয় মিঠা
মানুষ পাকে ত হয় তিতা॥

৫২৫। শক্তের ভক্ত,
নরমের যম।

৫২৬। মাগাইরা পুরুষে না মাপালে
তার কপালে না আহার মিলে।

৫২৭। মাগী, আলায় যে সংসারে।
সে সংসার যায় ছারেখারে॥

৫২৮। এক জন্মে দিলে
আর জন্মে মিলে॥

৫২৯। কি কর বে ভাই নাতি?
এই যে দাদা, কিষ্টার বেগার খাটি।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এক আদেশ প্রচার করিলেন যে, ঠিক সন্ধ্যার সময় সকলকেই কর্মত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের নাম করিতে হইবে; যে ইহার অন্যথাচরণ করিবে তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। প্রথম প্রথম কয়েকদিন মন্দ লাগিল না; কিন্তু অনেক সময় কাজটী শেষ হয় না অথচ কি এক যন্ত্রণা, ঈশ্বরের নাম লইতেই হইবে। কাজেই ভগবানের নাম লওয়াটা এখন কিষ্টার বেগারে দাঁড়াইল।

৫৩০। গুড় খাব না খাব কি?
গুড়ের চেয়ে মিঠা কি?

৫৩১। কপাল যায় লগে লগে
কপালের বাড়া দিব কে?

৫৩২। কচু কাটতে কাটতেই ডাকাইত।

৫৩৩। ভাগ্যবানের কপালে,
গাই বিয়ায় আতালে।
আতাল—গরু থাকিবার স্থান।

৫৩৪। পথে * * কুড়া খায়।
তারমুখী ধুয়া যায়॥

৫৩৫। উচিত কথা কইতে গেলে
তেলে বেগুণে উঠে জলে॥

৫৩৬। যেমন হাতীতে খায়,
তেমন হাতীতে আদে॥

৫৩৭। কইতে কইতে মুখ আসে,
দিতে দিতে হাত আসে॥

৫৩৮। সাপের মাথায় ধুলাপড়া।

৫৩৯। সিদ্ধি খাইলে বুদ্ধি বাড়ে।

৫৪০। মাইয়ের শেষ জুতার বাড়ি।
আর চাকরীর শেষ চৌকিদারী।

৫৪১। জামাইর লাগি বানাইলাম পিঠা,
পুত্রার মরা মইল।

৫৪২। বিয়া নাহয় না-ই কর্‌ছি
লগে ও ত গেছি॥

৫৪৩। আসে আর যায়,
মাইন্‌কা বলে সায়াস্।

৫৪৪। কেউ যায় বিয়া করতে,
আর কেউ যায় লগে।

৫৪৫। গায় মানে না,
আপ্‌নি মোড়ল।

৫৪৬। আচিনা পথ আর জঙ্গল সমান।

৫৪৭। সুখ করিলি লো পুতের বৌ
তরে আল্লায় দিছে।
আমি যে কর্‌মু সুখ
তারে আল্লায় নিছে॥
বৌ—বধূ, বউ।
পুতের—পুত্রের।
কর্‌মু—করিব।

৫৪৮। অল্পজলে পুটী মাছ
ছরছরাণী সার।

৫৪৯। অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী।

৫৫০। বার হাত পুকুর
১৩ হাত মাছটা।
কইছে কোন্ **রে?
কইছে তোর বাপে রে।
তবে কোণাকোণী হইয়া থাক্‌তে পারে॥

৫৫১। পয়সা মণি না দিলে ত
স্থুর মণি আর চলে না।

৫৫২। পেটে খেলে পিঠে সয়।

৫৫৩। ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ।

৫৫৪। নাতি সুখে নিদ্রা।

৫৫৫। জাতির শত্রু জাতি।

৫৫৬। মাইয়ার মা'র মত
কথা বার্ত্তা যত॥

৫৫৭। কষ্ট নইলে কি কিষ্ট মিলে।
কিষ্ট—কৃষ্ণ।

৫৫৮। ক্ষুদ খাইয়া পুঁজি করে
দুই পুরুষ ভইরা খরচ করে॥
ভইরা—ভরিয়া।

৫৫৯। ভায় পেট না ভরলে কি
ফাপ্প পেট ভরে?
ভায়—দরে।
ফাপ্প—কিছু বেশী দেওয়া দ্রব্য।

৫৬০। পোলা মাইয়া পুষ্টি
এন্ত যমের কুষি॥
পুষ্টি—পরিজন। কুষ্টি—কুষি।

৫৬১। জন বল বড় বল।
জনের কাছে কি ধনের বল?

৫৭২। ছয় চোকে ক্ষয়।

৫৬৩। আঙ্গুল ফুইলা কলাগাছ।

৫৬৪। স স
তিন স।

৫৬৫। গুয়া লোয়া পাজা করলেই
অনেক দেখা যায়।
লোয়া—লোহা।

৫৬৬। বিশ্বাসে পাইবে মুক্তি
তর্কে বহুদূর।

৫৬৭। জলে তেলে খাপ খায় না।
খাপ খায়না—মিশে না।

অখনে য়াসিয়া জমে অখনে টাণিব ॥
সেখানেত গাভুয়ালি আপনে জানিব ॥
পড়িব তোমার কায়া না ফিরিব য়ার ।
তবে সে মুছিয়া যাইব জর্ত্তম তোমার ॥
আন্ধেরে দর্পণ দিলে নাহি কোন ফল ।
তেন মত জোগ ধর্ম্ম কহিএ সকল ॥
ধেন্দের সাক্ষাতে যেন গাইন গায় গীত ।
তেন মত কহি আমি তোমার বিধিত ॥
মুর্খেরে অক্ষর দেখাইলে যেন মত।
তোমার সাক্ষাৎ জ্ঞান কহি তেন মত ॥
বুঝাইলে না বুন তুমি পশুর সমান।
অমৃত তেজিয়া কর গরল ভৈক্ষন ॥
মিন নাথে বলে বাপু কহিএ তোমারে।
বিধির নিবন্ধ কেবা খণ্ডাইতে পারে ॥
জদিবা টুটএ হস্তি অঙ্কুসে না মানে ।
প্রেমের ছিকল দিয়া বাগিনিএ টানে ॥
সোতেতে এড়িলে গাও যথাএ গীয়া ঠেকে ।
মুক ভোগ ভাল মন্দ তারে কেবা দেখে ॥
হরের বচন মোর কিছু নাহি মনে ।
সকল হারাইল আমি কামিনির স্থানে ॥
মিনের বচন হেন যুনিয়া নির্ঘাত ।
নিশ্বাস ছাড়িয়া তবে বলে গোর্ক্ষনাথ ॥
নিশ্বাস ছাড়িয়া গোর্ক্ষে বলে ধিরে ধিরে ।
সকল হারাইলা গুরু বাঘিনির ঘরে ॥
বাঘিনি তোমার গুরু তুমি তাইর সির্ষ ।
জ্ঞানকথা যুনিতে তোমার লাগে বিষ ॥
গুরু গুরু বলি ডাকি নাহি কর মন ।
য়ামার বচন গুরু না কর লঙ্গন ॥
অখনেহ কর বাপু জোগ দরসন ।
মিলিবেক শ্রীমন্দিরে গুরু বচন ॥
য়াপনা নাসিলা গুরু করিয়া গেলা হেলা ।
ছাড়ি গেল জুতি রস ছাড়ি গেল কলা ॥
জানিয়া গুরুর মন জতি গোর্ক্ষাই ।
বসিলা য়াসন করি গুরুকে বিদাই ॥
বসিল য়াসন করি মিনের সমুখে ।
জোগ দরসন কর দেখহ কৌতুকে ॥
বুজ বুজ য়এ বাপু কায়ার জে ভেদ ।
য়াপনি কহিছ কথা কভু নহে ছেদ ॥
হাত নাড়ি কহে কথা আখি দিয়া ঠার ।
একমনে যুণে মিনে সিন্দু জে য়পার ॥
ক্ষেণেকে বালক ক্ষেণে বির্দ্ধ জতিনাথ ।
ক্ষেণেকে জুবক হএ মিনের সাক্ষাত ॥
মারিয়া যে হাত তাল গুরুকে বুজাএ (১) ।
মনপক্ষি মিনাথে নাসিকা বাজাএ ॥
বাসাতে নাহিক ডিম্ব ছাও কেনে উড়ে ।
পথরিতে পানি নাহি পাড় কেনে বুড়ে (২) ।
নগরে মনির্ষ নাই ঘর চালে চালে ।
অন্দনে দোকান দেএ খরিদ করে কানে ॥
হেন ভ্রম দুর হউক চেতন হউক মিন ।
ঝাপ দিয়া তরিতে চাহি সাগর গহিন ॥
মুখ খানি য়ানল জান জিহ্বা খানি কাল ।
অমৃত পাটনে যার গরল নেহাল ॥
উচ নিচ ভুমি খান তাতে হংস হএ ।
জবা হএ গৃহবাসী সে ভুমি চসয় ॥

শ্রীরাগ

য়াহারে গুরুর নাম করহ স্মরণ ॥ (ধ্রু)

প্রথম প্রহর রাত্রি আলিস্য জে বড় ।
যাহার কারণে নিদ্রা হইয়া জাএ দড় ॥

(১) এই ছত্র হইতে কঠিন যোগ তত্ত্বের ব্যাখ্যা আরম্ভ হইয়াছে। এই সকল রহস্যময় ইঙ্গিত অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য,অনধিকারীর পক্ষে ইহা হেয়ালির মত বোধ হয় ।

(২) ডুবে ।

ইঙ্গুলা পিঙ্গুলা দুই উজানে বান্ধিয়া।
সানন্দে সুনহ ধ্বনি নির্ধ্যানে বসিয়া॥
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি কাল নিদ্রাএ ভোর।
উজানের সেরে ঝাপি লৈয়া যায় চোর॥
উজান ভাঙ্গিয়া কর অমনা গমনা।
তবে সে রহিব গুরু অমুল্ল রর্ত্তনা।
ত্রিতীয় প্রহর রাত্রি নিদ্রা অতিশয়।
কিছু নিদ্রা না গেলে বিরোগ হএ কাএ॥
যেই নিদ্রা সেহি কাল জানিহ নিশ্চয়।
সিদ্ধিগুরু ভজিলে হএ আপ্ত পরিচয়॥
চতুর্থ প্রহর রাত্রি নিসি য়বসেস।
ব্রহ্ম জোগে কর্ম্ম চিন্ত বসি নিজ দেশ॥
জ্ঞাননাথে কহে জোগ এ চারি প্রহর।
বান্ধিয়া দশমি (১) দ্বার জোগে কর ভর॥
তর্ত্ত জানিয়া জোগ না করিয় হেলা।
পাকিছে মাথার চুল হইয়া জাইব কালা॥
চতুর্ত্ত প্রহর রাত্রি কহিলাম জ্ঞান।
দিন ভেদ কথা কহি কর অবধান॥

পয়ার ছন্দ।

সুক্রবারে বহে বারি সুসমনা জান।
গঙ্গা জমুনা জল ধরএ উজান॥
ইঙ্গুলা পীঙ্গুলা দুই সমসর জারা (২)।
মুল কমল চাপি বন্দি কর চোরা॥
সনিবারে বহে বারি সুস্থে করে স্থিতি।
পুর্ব্বে উলে (৩ ভানু পশ্চিমে জাএ অতি (৪)॥

রাজ্জিতে (৫) কর ভর হইব দরসন।
তরিবা সমন জালা জোগে দেহ মন॥
আদির্ত্য বারে বহে বারি লৈয়া আর্দ্য মুল।
মন স্থির করি ধর ত্রিপীণির (৬) কুল॥
যাপে য়াপনা লৈয়া রাখ সম করি।
নিবাইলে আনল গুরু রহিয়া জাইব ছাড়ি॥
সমবারে বহে বারি সহ সসম্বিত।
শ্রীগোল্লার হাটের (৭) বাদ্য বাজে সুললিত॥
ঝমকে ঝমকে বাদ্য বাঝে নানা ধনি।
ইন্দ্রের ভোবনে জেন নাচএ নাচনি॥
মোঙ্গল বারে বহে বারি জুড়িয়া মঙ্গল।
ক্ষেমাইরে অঙ্কুস দিয়া বাজে ইসকল (৮)॥
ত্রিপীণিতে থানা দেয় করে দেয় তালি।
উজানে বন্ধ খেলে জেন নহি কালি (৯)॥
নাপিতের সিঙ্গাএ জেন রক্ত আনে টানি (১০)।
ইন্দ্রনালে (১১) তুলে গুরু আচাবুআ (১২) পানি॥

---

(১) দশ।

(২) যাহারা সরোবরের মত স্থির-জল,—বোধ হয় এই ই অর্থ।

(৩) উদিত হয়। (৪) অস্ত।

(৫) বুঝা গেল না।

(৬) পূর্ব্বেও ত্রিপীণি শব্দটি পাওয়া গিয়াছে। ত্রিপীটক ও ত্রিপীণি শব্দ দুইটির ধ্বনিতে মিল আছে। দুইটি শব্দ সমানার্থবোধক নহে ত?

(৭) বুঝা গেল না।

(৮) অর্থ স্পষ্ট নহে।

(৯) কিছুই অর্থ বোধ হয় না।

(১০) পূর্ব্বকালে অস্ত্র চিকিৎসায় নাপিতের একাধিপত্য ছিল, তাহার প্রমাণ। ইংরেজ সার্জ্জন গণের আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্তও নাপিতের প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। পল্লীগ্রামে এখনও নাপিতজাতীয় চিকিৎসকের সংখ্যা কম নহে।

(১১) জল স্তম্ভ?

(১২) আশ্চর্য্য।

সারিহ ঝারিহ গুরু না করিহ ভএ।
সরির সুন্দর হৈব জৌবন অর্ক্কএ॥
এথাতে কহিয়া গুরু কিছু নাহি ভাল।
কায়া সাধন কৈলে ফিরে জমকাল॥
এড় ছাড় অএ গুরু অমৃতের ভাণ্ড।
ক্ষেমাইরে অঙ্কুশ দিয়া হস্তিআর মুণ্ড॥
য়াপনারে স্থির কর বাউ ভর করি।
তিলেক না টুটিব তোমার আবুরালি॥
কহিতে কহিতে নাতে হাতে মারে তালি।
বিচলিত মি(ন)নাথে করে হলা স্থলি॥
উচাট উচাট করি বোলে কর্ন্নে লাগী ১)।
সুনিয়া যে মহামন্ত্র ভ্রম গেল ভাঙ্গি॥
সুক ভোগ মিননাথের কিছু নাহি মন।
বুজিয়া পাইবা জত হরের বচন॥
স্ত্রি সব মায়া ছাড় ভাব কর সাজি।
মুকুনাতে নৌকা বাহ হইয়া সাধু মাজি॥
আলাপে বিভোল হএ কামে হএ মত্ত।
কামকোট হিতাহিত নাহিক সমস্ত॥

রাগ য়াইর

সুনি সবে সাজি আইল কদলির জুবতি।
নানা ভেস করি আইল মিনের আউতি (২)॥
কাকে করি মহাদ্যেবী বিন্দুনাথেরে।
সকলে সাজিয়া আইসে মিনের গোচরে॥
সোলস কদলি মিলি করিয়া সমাজ।
চারিদিগে বসিল মিনেরে করি মাজ॥
সোলস কদলি মিনে দেখি একাত্তর।
হাসিয়া বলিল তবে ভোলা মচন্দর॥
জুগীপুত্র গোর্ক্ষনাথে জ্ঞান দিল মোরে।
মনে লএ তার সঙ্গে যাইব সর্ত্তরে॥
হস্ত জোড় করি কএ সুন একমনে।
অকারণে আসিয়াছ য়ামা দরসনে॥
দেখিয়া আমারে সবে চলি যাও ঘরে।
জুগীপুত্র গোর্ক্ষনাথে জ্ঞান দিল মোরে॥
জ্ঞান পাইয়া আমার স্থির নহে মন।
ছাড়িয়া কদলি রাজ্জ জাইমু অখন॥
জতেক আছিল ধন সব নিলা হরি।
কেনে মায়া কর সবে এবে দেয় ছাড়ি॥
কাল বহিয়া গেল জরা হইল উপস্থিত।
সক্তিহীন হৈল মোর দেখহ বিদিত॥
প্রাণ সে রাখিল মোর গোর্ক্ষ য়বধৌতে।
তিনদিনে বান্ধি নিত সমনের দুতে॥
বড় রর্ক্ষা কৈল মোরে গোর্ক্ষে করি সন্দি।
রাখিতে না পারে য়ার আমা করি বন্দি॥
পুত্র গোর্ক্ষনাথে মোরে কহে বারে বারে।
এতেক চিন্তিল আসি মনের ভিতরে॥

(১) কানে লাগিয়া, অর্থাৎ কানের একেবারে নিকটে আসিয়া। 'বিশেষরূপে চেষ্টা কর' (উৎচেষ্ট) ইত্যর্থক ধ্বনি করিয়া মন্ত্র বলে।

(২) নিকট অর্থবোধক বলিয়া মনে হয়। ইহার অনুরূপ সংস্কৃত শব্দ আহুতি বা আকুতি। আকুতি মানে অব্যক্ত ভাব। কাজেই আকুতি বা আহুতি, কোনটিতেই অর্থ সঙ্গতি হয় না।

সির্ব পুত্র গোর্ক্ষনাথে দেখাইল তর্ত্ত।
আর না রহিব আমি তোমরা সাক্ষ্যাতে ॥
মোজলা কমলা দুই মুর্ক্ষ পাটেশ্বরি।
সোল সত সখি লইআ জায় নিজপুরি ॥
সমুদ্র বুসিয়া তোরা করিলা মুকুনা।
আর কিবা আছে মোর দিতে চাহ হানা ॥
বুজিল তোমাগ মায়া চলি জাও ঘরে।
তোমরারে দেখি মন সাত পাচ করে ॥
মালঞ্চতে পুষ্প নাহি কিদিব পোসার। (১)
মুখাইল জান্নবি জোয়ার নাহি আর ॥
জতি গোর্ক্ষনাথে মোরে দেখাইল তর্ত্ত।
মুকুনা গাছেত মোর হইয়া গেল সর্ত্ত ॥
কাম ক্রোধ লোভ মহ বন্দি কৈল নাথে।
অখনে চলিয়া জাইমু গোর্ক্ষনাথের সাথে।
কমলাএ বোলে মুন কদলি ইশ্বর।
মুনিয়া তোমার কথা লাগএ ফাফর ॥
কোন দুর্ক্ষে জাইবা তুমি গোর্ক্ষের বচনে।
পাগল করিল গোর্ক্ষে সৈর্ন লাগে মনে ॥
হেন মুখ ভোগ প্রভু প্রিথিবীতে নাহি।
কোন দুর্ক্ষে জাইবা তুমি জুগীর ভেস হই ॥

মিননাথে বোলে প্রিয়া না বোলিয় আর।
পাইবা গোর্ক্ষের সাপ হইবা ছারখার ॥
কমলাএ বোলে মোর প্রাণের ভয় নাই।
প্রাণ জাউক মোর মুনহ গোসাই ॥
লৈক্ষে লৈক্ষে হস্তি ঘোড়া তার অন্ত নাহি।
ইসকল এড়িয়া যাইবা কোন ঠাহি ॥
কারে রার্জ্জ দিয়া তুমি যাইবা দেশান্তরি।
সমপীবা কার ঠাই উআরি মেহারি ॥
মুবর্নের ঘর সব রর্ত্তনের পালা।
মাণিক্য ভূসিস্ত সব দেখিতে লাগে ভালা ॥
হিরামণি মাণিক্য জড়িত খাট পাট।
চতুর্দ্দিগে সেত নেত চামরের ঠাট।
লেপ নেহালি যত তুমি দেয় গায়।
সেত নেত চামরে কদলিএ করে বাও ॥
সিরের উপরে নবদণ্ড ছত্র ধরে।
কুটী কুটী লোকে নির্ত্ত তোমার সেবা করে ॥
আমি সব কারে দিয়া জায় জুগী হইয়া।
রাজ্জ খণ্ড কারে দিবা নিঠুর হইয়া ॥
মুনি মুক্তা আদি জত রর্ত্তন ভাণ্ডার।
কাহাতে সপীবা প্রভু বিন্দুর কুমার ॥
আমি দুই তোমার জে মুর্ক্ষ পাটেশ্বরী।
না হএ আমার সম গঙ্গা য়ার গৌরি ॥
মোর রূপে জিনিতে পারি এতিন ভোবন,
আমাতে (২) অধিকরূপ আছে কোন জন ॥

(১) উপহার বা দান অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। পোসার শব্দটির মূল বোধ হয় প্রসার, কিন্তু প্রসার কখনও দানার্থক নহে। 'প্রসাদ' হইতেও আসিতে পারে।

(২) অপাদানে এই রূপ লক্ষ্যের যোগ্য।

প্রতিভা

৫ম বর্ষ | আষাঢ় ১৩২২ | ৩য় সংখ্যা

ভারতীয় প্রত্ন-তত্ত্ব

১। কণিষ্ক (২)

গত এপ্রিল মাসের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় মার্শাল সাহেব কণিষ্কের কাল সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি এক্ষণে প্রাচীন তক্ষশিলা নগরীর ধ্বংসাবশেষ খনন করিতেছেন। 'চিরস্তূপ' নামে একটি মাটির ঢিপি খনন করিয়া তিনি পর পর চারিটি বিভিন্ন স্তরে চারিটি প্রাচীন নগরীর চিহ্ন আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহার সর্ব্বোপরি স্তরে বাসুদেব এবং পরবর্ত্তী কুশানগণের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় স্তরে কণিষ্ক ও হুবিষ্কের, তৃতীয় স্তরে প্রথম ও দ্বিতীয় কডফিসের, ও চতুর্থ স্তরে শক ও পহ্লবগণের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা হইতে জানা যায় যে, প্রথমে শক পহ্লব, পরে প্রথম ও দ্বিতীয় কডফিস, এবং তৎপরে কণিষ্ক, হুবিষ্ক প্রভৃতি রাজত্ব করেন। প্রাচীন মুদ্রাতত্ত্ববিদগণ পূর্ব্বেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। মার্শাল সাহেবের আবিষ্কার দ্বারা এই সিদ্ধান্ত আরও সুদৃঢ় হইয়াছে।

সুতরাং কণিষ্ক শকাধিকারের পরবর্ত্তীকালে ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছিলেন, ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই শকাধিকারের কাল এখনও নির্ণীত হয় নাই। নারায়ণ পত্রিকার গত 'পৌষ' সংখ্যায় আমি এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছি তাহাতে নানা প্রমাণের সাহায্যে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, এই শকাধিকার কাল খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী। উক্ত প্রবন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছি, তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রোজন, কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধের সঙ্গতি রক্ষার্থ দুই একটি বিষয়ের সবিশেষ আলোচনা প্রয়োজন।

শকাব্দ নামক একটি সুপরিচিত অব্দ এখনও এদেশে প্রচলিত আছে। খৃষ্টীয় ৭৮ অব্দে ইহার প্রতিষ্ঠা হয়। কে ইহার প্রতিষ্ঠা করেন তাহার কোন সন্তোষজনক প্রমাণ নাই। ইহার সম্বন্ধে দুইটি কথা সুনিশ্চিতরূপে জানিতে পারা যায়।

(১) এক পরাক্রান্ত শক রাজবংশ (রাজ প্রতি-

নিধি বংশ?) উক্ত অব্দের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করেন। *

(২) পাঁচশত শকাব্দে উৎকীর্ণ বাদামী গুহা শিলালিপিতে, এই অব্দকে 'শকনৃপরাজ্যাভিষেকাব্দ' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

শকাব্দ প্রতিষ্ঠার পাঁচশত বৎসর পরে যাঁহারা শিলালিপি উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন তাঁহারা শকাব্দ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সম্যকরূপে অবগত ছিলেন কি না এরূপ তর্ক উঠিতে পারে। কিন্তু আজ প্রায় দুই হাজার বৎসর পরে যাঁহারা এ বিষয়ে বাদানুবাদ করিতেছেন, তাঁহারাও এ বিষয়ে কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রমাণের অধিকারী নহেন, অনুমানই তাঁহাদের একমাত্র সম্বল, আর সে অনুমানও কোন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। সুতরাং এ অবস্থায় পূর্ব্বোক্ত শিলালিপিকারগণের কথাই মানিয়া নেওয়া উচিত,—অন্ততঃ যতদিন ইহার বিরুদ্ধ প্রমাণ না পাওয়া যায়। আর আমাদের অপর সুনিশ্চিত কথাটি দ্বারাও এই শিলালিপির উক্তি সমর্থিত হয়।

সুতরাং আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, **কোন শক রাজার রাজ্যাভিষেক কাল হইতেই শকাব্দের গণনা আরম্ভ হয়।** ইহা হইতে দুইটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়—

(১) ভারতবর্ষের শকাধিকার কাল খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী।

(২) কণিষ্ক শকাব্দপ্রবর্ত্তক নহেন। কারণ তিনি শক জাতীয় নহেন, শকগণের পরম শত্রু ইয়ু-চি জাতীয়।

এই শেষোক্ত কথাটির একটু বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিতে হইবে। আজকাল কণিষ্ক সম্বন্ধে যাঁহারা আলোচনা করেন তাঁহাদের অনেকেরই মত যে, কণিষ্ক শকাব্দপ্রবর্ত্তক। ফারগুসন সাহেব সর্ব্ব প্রথমে এই মত প্রচার করেন (১)। ইহা যে কোন যুক্তি প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, পরন্তু অনুমানমাত্র, তাহা প্রবন্ধটি পড়িলেই বুঝা যায়। তাঁহার অনুবর্ত্তী গার্ডনার ইহা স্বীকার করিয়াছেন। কারণ উক্ত মতকে তিনি "Brilliant Conjecture" বলিয়া উল্লিখিত করিয়াছেন (২)। বলা বাহুল্য, যতই 'Brilliant' হউক, Conjecture অনুমান মাত্র, সুপ্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত নহে। ১৮৮১ সালে ওলডেন বার্গ এই মত গ্রহণ করেন (৩)। তিনি যে সমস্ত প্রমাণের সাহায্য লইয়াছিলেন তাহার অধিকাংশই পরবর্ত্তীকালে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যদিও ফাগুসন বা ওলডেনবার্গ কেহই তেমন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর এই মত প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই, তথাপি কানিংহাম, গার্ডনার, র‍্যাপসন, ভিন্সেণ্ট স্মিথ প্রভৃতি সকলেই ইহা গ্রহণ করিলেন, এবং অচিরেই ইহা একটি প্রমাণিত সিদ্ধান্ত বলিয়া গৃহীত হইল (৪)। পরে যখন চীন গ্রন্থের সাহায্যে কুশানদের ইতিহাস পরিস্ফুট হইল, এবং জানা গেল যে, কণিষ্ক শক নহে, কুশান, তখন এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইল। এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্. এ. মহাশয় এই সম্বন্ধে গবেষণামূলক এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন (৫)। এই প্রবন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য

* "শকক্ষত্রপ চষ্টন" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য (প্রতিভা ১৩২০, ২৩৮ পৃঃ)। সম্প্রতি ভিনসেণ্ট স্মিথ (V. Smith) তাঁহার ইতিহাসের যে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন তাহাতেও উক্ত মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

(১) Journal of the Royal Asiatic Society, 1880.

(২) Catalogue of the Greek and Scythic coins in the British museum.

(৩) Indian Antiquary—vol. X.

(৪) Indian Antiquary, 1908.

(৫) উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে, পরলোকগত ব্লক (Bloch) সাহেব এই মতকে ফাগুসন সাহেবের "Phantastical Conclusion" এই নামে অভিহিত করিয়া সূক্ষ্ম বিচার শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। (J. A. S. B. LXVII. Part. I.)

তথ্য আছে। কিন্তু কণিষ্কের তারিখ সম্বন্ধে রাখাল বাবু মোটামুটি এই কথাটি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, কণিষ্ক ৭৮ খৃঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। বস্তুতঃ নবাবিষ্কৃত চীন গ্রন্থের প্রমাণাদি এই সিদ্ধান্তের বিরোধী নহে। কিন্তু উক্ত সিদ্ধান্তের সপক্ষে তিনি বিশেষ কোন যুক্তি দেখাইতে পারিয়াছেন, বলিয়া মনে হয় না। অপর পক্ষে তিনি ইহা স্পষ্টতঃ স্বীকার করিয়াছেন যে, ওলডেনবার্গ বা ফার্গুসন কেহই উক্ত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সন্তোষজনক প্রমাণ দেখাইতে পারেন নাই। এইখানে বলা আবশ্যক যে, ওলডেনবার্গ তাঁহার পূর্ব্ব মত পরিত্যাগ করিয়াছেন। অপর পক্ষে ভিনসেণ্ট স্মিথ, মার্শাল (Marshall), প্রভৃতি এই মত সমর্থন করিতেছেন।

এই দলের সিদ্ধান্তের পক্ষে প্রধান যুক্তি এই যে, আমরা নিঃসন্দেহরূপে জানি যে, কণিষ্ক একটি অব্দের প্রবর্ত্তনা করিয়াছিলেন, অন্ততঃ তাঁহার রাজ্যারম্ভকাল হইতে একটি অব্দগণনা আরম্ভ হয়। সুতরাং অসম্ভব নহে যে, ইহাই সেই সুপরিচিত শকাব্দ। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে প্রথম ও প্রধান যুক্তি এই যে, কণিষ্ক শকজাতীয় ছিলেন না, অথচ বাদামী গুহালিপি অনুসারে কোন শক রাজার অভিষেক কাল হইতে এই অব্দের প্রতিষ্ঠা হয়। ইহার উত্তরে ওলডেনবার্গ, রাখাল বাবু প্রভৃতি বলেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষের লোকেরা শক ইয়ু-চি প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির প্রভেদ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল; সুতরাং যত বিভিন্ন অসভ্য জাতি ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্ত আক্রমণ করিয়াছিল সকলকেই তাহারা শক এই সাধারণ নামে অভিহিত করিত। সৌভাগ্যের বিষয়, পুরাণাদি পাঠ করিলে দেখা যায় যে, এ বিষয়ে প্রাচীন ভারতবাসীকে আমরা যতটা অজ্ঞ মনে করি, তাঁহারা বস্তুতঃ ততটা অজ্ঞ ছিলেন না। পুরাণের যে অংশে ভবিষ্যৎ রাজবংশীয়ের বর্ণনা আছে সেখানে শক, যবন, তুষার, হূণ প্রভৃতির পৃথক নাম স্পষ্ট দেখিতে পাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মৎস্য বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

"সপ্ত গর্দ্দভিনশ্চাপি
শকাশ্চাষ্টাদশৈবতু।
যবনাষ্টৌ ভবিষ্যন্তি
তুষারাস্তু চতুর্দ্দশ।
ত্রয়োদশ মুরুণ্ডাশ্চ
হূণা হোকোনবিংশতি।"

বলা বাহুল্য, উপরোক্ত শ্লোকগুলি ঈষৎ পরিবর্ত্তিত আকারে বিষ্ণু ও ভাগবৎ পুরাণেও আছে। এখানে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শক ও তুষারকে পৃথক করা হইয়াছে। কণিষ্কের বংশের অপর নাম ছিল 'টোচারি'। তাহা হইতেই তুষার ও তুরুষ্ক শব্দের উৎপত্তি। পুরাণকারগণের সময়ের বহু পরে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতেও যে ভারতবাসীরা কণিষ্ককে তুষারজাতীয় বলিয়াই জানিত তাহার প্রমাণ আলবেরুণীর গ্রন্থে পাওয়া যায়। আলবেরুণী ভারতবর্ষ বিষয়ক যে গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহাতে কণিষ্ককে তুরুষ্ক জাতীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, আলবেরুণীর ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় সমস্ত জ্ঞানই ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতগণের নিকট হইতে লব্ধ।

এই সমস্ত প্রমাণ প্রয়োগের পর একথা বলা কঠিন যে, ভারতবাসীরা কণিষ্ককে শকজাতীয় বলিয়া জানিত। সুতরাং বাদামী গুহালিপির কথা যদি প্রামাণ্য বলিয়া ধরা যায়, তবে কণিষ্ককে কখনই শকাব্দপ্রবর্ত্তক বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

কণিষ্কের তারিখ সম্বন্ধে আর একটি মত আছে। এই মতের প্রবর্ত্তক ফ্লীট সাহেবের (Fleet) মতে কণিষ্ক খৃঃ পূঃ ৫৮ অব্দে রাজ্যলাভ করেন, এবং এই উপলক্ষেই সুপ্রসিদ্ধ বিক্রম সংবতের প্রতিষ্ঠা হয়। ফ্লীটের বহু পূর্ব্বে কানিংহাম (Cunningham) এই মতাবলম্বী ছিলেন, পরে তিনি উক্ত মত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান কালে কেনেডি, ফ্রাঙ্ক প্রভৃতি এই মতের পৃষ্ঠপোষক। এই দলের মতে

প্রথম ও দ্বিতীয় কডফিস এবং উত্তরক্ষত্রপেরা (Northern Satraps) কণিষ্কের পরবর্ত্তী। কিন্তু প্রাচীন মুদ্রা শিলালিপি প্রভৃতি হইতে এই সময়ের ইতিহাস যতটুকু জানা যায়, তাহাতে কণিষ্ক ইহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী না হইয়া পরবর্ত্তী ছিলেন ইহাই অধিকতর সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। মার্শাল সাহেব তক্ষশিলার ধ্বংসাবশেষ খনন করিয়া যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন তাহাও যে এই সিদ্ধান্তের অনুকূল তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমি প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, প্রথম কডফিস্ ২৪ খৃঃ অব্দের পরে বর্ত্তমান ছিলেন [প্রতিভা বৈশাখ ১৩২২] সুতরাং তাঁহার পরবর্ত্তী কণিষ্ক ৫৭ খৃঃ পূঃ অব্দে রাজত্ব করিতে পারেন না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি কণিষ্কের তারিখ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। উপরে দুইটি মতের সমালোচনা করা হইল। এ বিষয়ে আমার একটি নিজস্ব মত আছে অতঃপর তাহারই উল্লেখ করিব।

শ্রীরমেশ চন্দ্র মজুমদার।

চীন দেশের ধর্ম্মমত ও বিশ্বাস

চীনদেশে যুগপৎ তিনটী ধর্ম্মের প্রচলন দেখা যায় বৌদ্ধ, কনফুসিয় ও তাও (Taoism)। শেষের দুইটীকে প্রকৃত রূপে ধর্ম্ম আখ্যা না দিলেও চলে: কারণ এই দুই মতে ঈশ্বর বা পরকাল সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই আলোচনা নাই। সামাজিক রীতিনীতি ও আচার ব্যবহারই ইহাদের মতের প্রধান লক্ষ্যস্থল।

খ্রীষ্টের জন্মের বহু পূর্ব্বে (কেহ কেহ বলেন, সহস্র বৎসর পূর্ব্বে) "তাও" ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা সুপ্রসিদ্ধ "লাও-জা" (Lao Tzu) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর অনেক পরে তৎপ্রচারিত মতসমূহ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। লাও-জা সাধারণতঃ আদর্শবাদী ছিলেন। সেই জন্যই অনেক সময়েই তৎপ্রচারিত মতের সহিত বাস্তব জীবনের সাদৃশ্য ও সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হয় না। তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার শাসন-তন্ত্রের বিরোধী বা আনার্কিষ্টও বলা যাইতে পারে। কারণ লাও-জা বলিতেন যে, দেশে কোনও রূপ গবর্ণমেণ্ট বা শাসন ব্যবস্থা না থাকিলে দেশের অধিক মঙ্গল হয়, কারণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট রাজার অধীনেও অত্যাচার অবিচারের প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইতে দেখা যায়। তাঁহার মতে লোকের বেশী লেখাপড়া শিক্ষা করা উচিত নহে; কারণ সাধারণতঃ দেখা যায় যে, শিক্ষিত ব্যক্তিরাই নিত্য নূতন চৌর্য্য-প্রণালীর উদ্ভাবক। লাও-জার মতে আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। এ সম্বন্ধে একটী সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে। একদা পথিমধ্যে তাও ধর্ম্মাবলম্বী দুইজন বন্ধুর সাক্ষাৎ হইলে একজন অপরকে বলেন যে, তিনি সম্প্রতি একটী ভীষণ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি যুদ্ধের কথা শুনিয়া অতীব বিস্মিত হইলেন এবং যুদ্ধের সবিশেষ বিবরণ জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তখন প্রথম ব্যক্তি উত্তর করিলেন, "যতকাল অনন্যচিত্ত হইয়া কেবল পাঠাভ্যাসেই নিরত ছিলাম, ততদিন এক মাত্র ধর্ম্মকেই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ বিবেচনা করিতাম; কিন্তু শিক্ষাবসানে যখন বহির্জগতে আসিলাম, তখন পার্থিব ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতা আমার চিত্তকে নিতান্ত মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। ফলে পরস্পর বিরোধী এই দুইটী মনোভাবের ঘাতপ্রতিঘাতে আমি নিতান্তই অবসন্ন হইয়া পড়িলাম, এবং আমার শরীর দিন দিনই কৃশ হইতে লাগিল। কিন্তু সম্প্রতি আমার ধর্ম্মানুরাগ পার্থিব সুখৈশ্বর্য্য লাভেচ্ছার উপর বিজয়লাভে সমর্থ হইয়াছে এবং আমার শারীরিক স্বাস্থ্যও পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছি।"

লাও-জার প্রচারিত নীতি-সমষ্টির নাম তাও

বা টাও (Tao—পন্থা)। অর্থাৎ লোকে কিরূপে সাধু জীবন যাপন করিতে পারে এতদ্দারা সেই পথ প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে টাও ধর্ম্মের প্রসার-প্রতিপত্তি কমিতে থাকে। অবশেষে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য টাওধর্ম্মবাদিগণ বৌদ্ধ ধর্ম্মের অনেক রীতিনীতি, পৌরোহিত্য-প্রথা প্রভৃতি গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। বর্ত্তমান সময়ে এই দুই ধর্ম্ম এতই মিশিয়া গিয়াছে যে, সাধারণ লোকের পক্ষে সহসা এতদুভয়ের পার্থক্য উপলব্ধি করা অত্যন্ত কঠিন।

টাও ধর্ম্মবাদিগণ বলে যে, প্রাণায়াম, যোগাসন, ধ্যান ও প্রতি দুই ঘণ্টায় তিনবার থু থু গলাধঃকরণ প্রভৃতি নিয়ম প্রতিপালন দ্বারা মানুষ দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারে।

কনফুসিয়াস খ্রীঃ পূর্ব্ব ৫৫১ হইতে ৪৭৯ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন। এই সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসরে চীনদেশে বহুসংখ্যক ধর্ম্মমতের উত্থান ও পতন হইলেও কনফুসিয়াস প্রবর্ত্তিত নৈতিক মত এ যাবৎ একাধিপত্য করিয়া আসিতেছে। জীবিতাবস্থায় কনফুসিয়াস "অনভিষিক্ত মুকুটবিহীন নৃপতি" (uncrowned king) নামে অভিহিত হইতেন এবং মৃত্যুর পরে দেবতারূপে পূজা প্রাপ্ত হইতেছেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে, কনফুসিয়াসের ধর্ম্মে ঈশ্বর বা পরলোক সম্বন্ধে কোনও আলোচনা নাই। সমাজ-বদ্ধ মানুষের পক্ষে কিরূপ রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার আবশ্যক তৎপ্রবর্ত্তিত মতে তাহারই বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তাঁহার মতে রাজভক্তিই জাতীয় উন্নতির মূল প্রস্রবণ, এবং পিতৃমাতৃভক্তি ব্যতীত পৃথিবীতে সুখ ও শান্তিলাভ নিতান্ত অসম্ভব। কনফুসিয়াস নিষ্কাম ধর্ম্মের উপাসক ছিলেন। তিনি মনুষ্যজীবনের সীমাবদ্ধতার বিষয় সম্যক অবগত ছিলেন এবং কখনও কাহাকেও কোনও প্রকার "অমানুষিক" উপদেশ প্রদান করেন নাই। খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর জনৈক চৈনিক ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, "পৃথিবীতে গণনাতীত রাজা ও ধর্ম্ম প্রচারক ক্ষণকালের জন্য নৈশ গগনে বিদ্যুচ্ছটার মত আলোক বিস্তার করিয়া আবার চিরান্ধকারে মিশিয়া গিয়াছে, কিন্তু কনফুসিয়াস চিরকাল সমভাবে আলোক বিকীরণ করিয়া আসিতেছেন।"

কনফুসিয়াসের মতে ঈশ্বর স্বর্গ নরক প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় পদার্থের আলোচনায় বৃথা সময় ও শক্তির অপব্যয় ব্যতীত কোনই লাভ হয় না। একদা তাঁহার জনৈক বন্ধুর মৃত্যু হইলে মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনকে সান্ত্বনা দিবার জন্য তিনি একজন শিষ্য প্রেরণ করেন। শিষ্যটী যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইল যে, মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজন শবের চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট হইয়া মহানন্দে গানবাজনা করিতেছে; কারণ তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, এই সংসার নিতান্ত দুঃখময় এবং মানুষ মৃত্যুর পর স্বর্গে গমন করে। শিষ্যের নিকট কনফুসিয়াস এই বিবরণ শুনিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন যে, এই লোকগুলি পার্থিব নিয়মের অধীনস্থ হইয়া চলে না। এই খানেই উহাদের সহিত আমার পার্থক্য। ইহারা জীবনকে নিতান্ত দুঃসহ ও দুঃখময় ভার জ্ঞান করে, কিন্তু এই পৃথিবীতে জন্মলাভের পূর্ব্বেই বা তাহাদের কিরূপ অবস্থা ছিল, এবং মৃত্যুর পরেই বা কিরূপ হইবে, তাহা কিছুমাত্র ইহারা অবগত নহে। অথচ না জানিয়া শুনিয়া মানব সাধারণ প্রবৃত্তি-নিচয়ের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকে। এরূপ লোকের পক্ষে এ সংসারে বাঁচিয়া থাকা নিতান্ত বিড়ম্বনা মাত্র।

শাক্য সিংহের প্রবর্ত্তিত বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত চীনদেশের বর্ত্তমান বৌদ্ধধর্ম্মের সাদৃশ্য অতি কম। চীনাগণ এখনও বুদ্ধদেবকে পরিত্রাতা এবং বৌদ্ধ পুরোহিতগণকে মুক্তি প্রদানে সমর্থ বিবেচনা করিলেও তাহাদের ভক্তির

উৎস আজকাল অনেকটা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। ক্রমে ক্রমে চৈনিক বৌদ্ধধর্ম্মে নানা প্রকার দেবদেবী পূজার প্রচলন হইয়াছে. এবং চীনাগণ সাধারণতঃ কোনও রূপ বিপদে পতিত না হইলে এই সমস্ত দেবদেবীর বড় একটা ধার ধারে না। চীনাগণ বৌদ্ধ শ্রমণ ও ভিক্ষুগণকে আর তাদৃশ ভক্তি ও শ্রদ্ধার চক্ষে অবলোকন করে না। এমন কি অনেক সময় মুণ্ডিত মস্তক উপলক্ষ করিয়া নানারূপ বিদ্রূপ-বাক্য বর্ষণ করিতেও কুণ্ঠা বোধ করে না। বলা বাহুল্য. বর্ত্তমান শ্রমণ ও ভিক্ষুগণও অনেকেই আদর্শভ্রষ্ট ও চরিত্রহীন হইয়া পড়িয়াছে।

পুরোহিত শ্রেণীতে প্রবেশ-প্রণালীও অতীব কঠোর ও ভয়ঙ্কর। প্রবেশার্থীকে প্রথমতঃ দীর্ঘকাল শিক্ষানবিশী করিতে হয়। অবশেষে অভিষেকের নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইলে তাহার মুণ্ডিত মস্তকোপরি তিন বা নয় খণ্ড লৌহশলাকা রাখিয়া তদুপরি অগ্নি প্রজ্বলিত করা হয়। শলাকাগুলি অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হইয়া মস্তকের চর্ম্ম ভেদ করিয়া স্থায়ী চিহ্ন অঙ্কিত করে. শিক্ষার্থীর যাহাতে ধৈর্য্যচ্যুতি না হয়. তজ্জন্য যাজকগণ তাহাকে ঘিরিয়া নানারূপ উপেক্ষা প্রদানে উৎসাহিত করিতে থাকে। এই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে যাজকের নিদর্শন স্বরূপ তাহাকে একখানা ডিপ্লোমা বা নিদর্শন পত্র প্রদত্ত হয়। এই নিদর্শন-পত্রের বলে যাজকগণ সুবিস্তৃত চীন সাম্রাজ্যের সীমান্তর্গত যে কোনও ধর্ম্ম-মন্দিরে এক অহোরাত্র বাস ও বিনাব্যয়ে আহারের দাবী করিতে পারে।

চীনাগণ নানারকম ভূতপ্রেত ও দৈত্যদানবে বিশ্বাস করিয়া থাকে। তাহাদের ধারণা যে, এই সমস্ত অশরীরী প্রাণী নিভৃত ও অন্ধকারময় স্থানে বাস করে এবং সুবিধা পাইলেই পথিকদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে। কেহ কাহারও প্রতি অত্যাচার করিলে অত্যাচারিত ব্যক্তির আত্মা মৃত্যুর পর ভূতযোনি প্রাপ্ত হইয়া অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য চেষ্টা করে। এই বিশ্বাস হইতে চীনদেশে এক অত্যদ্ভুত প্রথার প্রচলন হইয়াছে। অন্যায় অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণে অসমর্থ ব্যক্তিগণ অত্যাচারীর বাড়ীর সম্মুখে বিষপানে বা অন্য উপায়ে আত্মহত্যা করিয়া থাকে। কেন না তাহা হইলে অত্যাচারীর প্রতি রাজপুরুষের দৃষ্টি পতিত হইবে। ইহাতেও যদি তাহার কোনও শাস্তি না হয়, তবে মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মা অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে। এই কুসংস্কার হইতে অনেক পরিবারে অত্যাচার-প্রপীড়িতা পুত্রবধূগণও আত্মহত্যা করিয়া থাকে। এইরূপ ঘটনায় মৃতব্যক্তির আত্মীয় স্বজনের সহিত অত্যাচারীর পরিবারবর্গের অনেক সময় নানারূপ বিবাদ উপস্থিত হইয়া থাকে এবং অনেক স্থলেই অর্থ প্রদান করিয়া মৃতব্যক্তির আত্মীয় স্বজনকে পরিতৃপ্ত করিতে হয়। এই ভূতের উৎপাতে পতিত হইবার ভয়ে সবল ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করিতে সাহস করে না।

অদৃষ্ট-গণকের প্রতি চীনদেশের জনসাধারণের অটল বিশ্বাস। প্রায় প্রত্যেক রাস্তার মোড়ে ও বাজারে বহুসংখ্যক গণক দেখিতে পাওয়া যায়। সামান্য দুইচারি পয়সা লইয়াই ইহারা লোকের অদৃষ্ট গণনা করিয়া দিয়া থাকে। ইহাদের প্রতি জনসাধারণের এত বিশ্বাস যে, ফলাফল না গণাইয়া ইহারা কোনও সামান্য কাজেও হাত দেয় না। এমন কি বৌদ্ধ ধর্ম্ম-মন্দিরেও এইরূপ অদৃষ্টগণনার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে অনেক মন্দিরেই দুইখণ্ড কাষ্ঠ দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের একদিক সমতল ও অপরদিক অর্দ্ধবৃত্তাকার। কাহারও শুভাশুভ গণিবার প্রয়োজন হইলে মন্দিরস্থ বেদীর সম্মুখে কাষ্ঠখণ্ডদ্বয় ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া দেওয়া হয়। ভূমিতে পতিত হইলে দুইখানি কাষ্ঠেরই সমতল পৃষ্ঠ যদি উপরের দিকে থাকে তবে অভীষ্ট কার্য্যের ফল অশুভ জানিতে হইবে। একখণ্ডের সমতল ও অপরখণ্ডের গোলাকার ভাগ উপরে থাকিলে

কার্য্যফল অতীব শুভ, এবং দুই গোলাকার পৃষ্ঠই উপরে থাকিলে কার্য্যফল শুভও নহে, অশুভও নহে, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

চীনাদের মতে বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতের আকৃতি, জলাশয়ের অবস্থান বা অভাব, গৃহের উচ্চতা প্রভৃতিও মানুষের অদৃষ্টের উপর শুভাশুভ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। এইজন্য তাহারা বিশেষ সতর্কতা সহকারে বাসস্থান বা সমাধিস্থান নির্ব্বাচন করিয়া থাকে। চীনদেশের কোনও রাস্তাতে পাশা-পাশি সমোচ্চ বাড়ী বা গৃহ দেখিতে পাওয়া যায় না। কারণ তাহাদের বিশ্বাস ইহাতে বিপৎ-পাতের সমূহ সম্ভাবনা। চীনদেশের কোনও গৃহে ঠিক সরল পথে প্রবেশ করিবার উপায় নাই। দরজার পরেই গৃহের অভ্যন্তরে একখানি পরদা টানাইয়া দেওয়া হয়। চীনাদের বিশ্বাস ভূত প্রেতাদি কেবল সোজা পথেই চলাফেরা করিতে পারে। সুতরাং এই পরদা দ্বারা গৃহে প্রবেশের ঋজুপথ অবরুদ্ধ রাখিলে ভূত প্রেতাদি গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না।

প্রত্যেক বাড়ীর সহিত একটা গোরস্থানের ব্যবস্থা আছে। আবহমান কাল হইতে চীনাগণ পিতৃপুরুষের পূজা করিয়া আসিতেছে। তাহাদের বিশ্বাস পরিবারস্থ কাহারও মৃত্যু হইলে তাহার দেহমুক্ত আত্মা বাড়ীর চতুঃপার্শ্বেই অবস্থান করে এবং আগ্রহ সহকারে পরিবারের উন্নতি ও অবনতি লক্ষ্য করিয়া থাকে। পিতৃপুরুষের প্রেতাত্মার প্রীত্যর্থে চৈনিকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে শ্রাদ্ধ তর্পনাদি করিয়া থাকে ও সাংসারিক উন্নতির জন্য তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

চীনাদের মতে প্রত্যেক মানুষের দুই প্রকার (কাহারও কাহারও মতে তিন প্রকার) আত্মা আছে। এক প্রকার আত্মা শরীরের ধ্বংসের সহিতই বিনষ্ট হয়, কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার আত্মা ইচ্ছামত দেহ হইতে নির্গত হইয়া যথোচিত স্থানে গমনাগমন করিতে পারে এবং অন্য শরীর ধারণ করিতে পারে। এ সম্বন্ধে একটী গল্প প্রচলিত আছে।

একদা এক ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। বধ্যভূমিতে নীত হইলে তাহার দ্বিতীয় প্রকার আত্মা শরীর হইতে বহির্গত হইয়া নিকটবর্ত্তী একটী গৃহ-চুড়ায় ঐ দণ্ডিত ব্যক্তির শরীর ধারণ করিয়া বসিয়া সোৎসুক-নেত্রে দণ্ডিত ব্যক্তির দিকে চাহিতে লাগিল। ইতিমধ্যে রাজদরবার হইতে ঐ ব্যক্তির প্রাণদণ্ড মহকুপের আদেশ আসিল। তখন ঐ আত্মা পুনরায় ঐ ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করিল।

চীনদেশের কোন কোন অংশে "প্ল্যান্‌চেট" (Planchette) প্রথা দ্বারা ভবিষ্যৎ গণনার বহুল প্রচলন দেখা যায়। কতকগুলি ব্যবসাদারী লোক এই উপায়ে জীবিকার্জ্জন করিয়া থাকে। একখণ্ড কাগজে প্রশ্ন লিখিয়া অন্য কাহাকেও তাহা দেখিতে না দিয়া বেদীর সম্মুখে তাহা আগুনে পোড়াইয়া ফেলা হয়। নিকটেই বালিপূর্ণ একখানি থালা থাকে। যাহারা ঐ প্রশ্ন সম্বন্ধে কিছুই অবগত নহে এমন দুই জন লোক দ্বারা ঐ বালির উপর উত্তর লিখিত হয়। এক একটী অক্ষর লিখিত হইলে তাহা মুছিয়া ফেলিয়া পুনরায় অন্য অক্ষর লিখিত হয়।

হিপ নোটিজম্ (Hypnotism) বা সম্মোহন বিদ্যার দ্বারাও অনেক সময়ে প্রেতাত্মার নিকট হইতে অভীপ্সিত কার্য্যের ফলাফল জানিয়া লওয়া যায়। এই প্রথা অনেক কাল হইতেই চীনদেশে প্রচলিত আছে। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও আমরা ইহার উল্লেখ দেখিতে পাই।

চীনবাসিগণ সকল প্রকার গুপ্তসমিতিই নিতান্ত অপছন্দ ও ঘৃণা করে। তাহাদের ধারণা দেশের বর্ত্তমান রীতিনীতির উচ্ছেদ সাধনই যাবতীয় গুপ্ত সমিতির একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য এবং এইরূপ আকস্মিক

পরিবর্ত্তনকে চীনাগণ নিতান্ত ভয়াবহ ও অমঙ্গলজনক বিবেচনা করে। তথাপি চীনদেশে অনেক গুপ্ত সমিতির প্রচলন আছে। এইরূপ এক সমিতির নাম "স্বর্গ-মর্ত্ত্য সমিতি" (Heaven and Earth Society). ইহার কার্য্যকলাপ অনেকাংশে ইউরোপীয় ফ্রি মেছনদের (Free mason) ন্যায়। এইরূপ আর একটী সমিতির নাম গোল্ডেন অর্কিড সোসাইটি (Golden Orchid Society)। এই সমিতির স্ত্রী সদস্যগণ কখনও বিবাহপাশে আবদ্ধ হয় না। এক সময়ে এই সমিতি এতই ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছিল যে, অবশেষে আইন পাশ করিয়া বিশেষ কঠোরতা সহকারে উহা দমন করিতে হইয়াছিল। "নিরামিষাশী" (Vegeterians) নামে আর একটী সমিতি আছে। ইহার সদস্যগণ কখনও মৎস্য মাংস ও মদ্য ব্যবহার করে না, এমন কি ধূম্রপানও ইহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ১৯০০ খৃঃ অব্দের বক্সার্ (Boxers) বিদ্রোহী বা মুষ্টি যোদ্ধার অধিকাংশই এই দলভুক্ত ছিল।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, পিতৃপুরুষের পূজা চীনাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের প্রধান বিশেষত্ব। পিতামাতার প্রতি ইহাদের অটলভক্তি। তাঁহাদের প্রীতিবিধানার্থ ইহারা প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। একখানি শিশুপাঠ্য পুস্তকে পিতৃমাতৃ ভক্তির নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে।

একটী বালক তাহার গায়ে মশা পড়িলে কখনও তাহা তাড়াইত না, পাছে ঐ মশা উড়িয়া গিয়া তাহার পিতামাতাকে দংশন করে। আর একটী বালক তাহার মাতার জন্য বহু অনুসন্ধানেও একটীও বাঁশের কুঁড়ি সংগ্রহ করিতে না পারিয়া এতই দুঃখিত হইয়াছিল যে, দেবতাগণ তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহার জন্য একটী বাঁশের কুঁড়ি সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল। তৃতীয় একটী বালক তাহার পিতামাতাকে হাসাইবার জন্য জলপূর্ণ কলসী লইয়া যাইতে যাইতে ইচ্ছাপূর্ব্বক পা পিছলাইয়া পড়িয়া যাইত। চৈনিক সাহিত্যে পিতৃমাতৃভক্তির এরূপ বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ আছে। চীনাদের জাতীয় জীবনের সহিত এই ভক্তি নিতান্ত ওতোপ্রতো ভাবে মিশিয়া গিয়াছে। একটী হইতে অপরটীকে বিচ্ছিন্ন করিতে চেষ্টা করিলে উভয়েরই বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। পিতামাতার কোন রূপ পীড়া উপস্থিত হইলে চীনা বালক বালিকাগণ নিকটবর্ত্তী দেবমন্দিরে যাইয়া প্রার্থনা করে যে দেবতাগণ প্রসন্ন হইয়া তাহাদের জীবন-কালের কিয়দংশ পিতামাতাকে প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে অবিলম্বে নিরাময় করুন।

এইরূপ ধর্ম্মবিশ্বাস ও রীতিনীতি চীনাদের দৈনন্দিন জীবনে কিরূপ প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হইয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা বোধ হয় এস্থলে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

চীনাদের পরিশ্রমশীলতা, মিতাচার ও মিতব্যয়িতা বিশ্ববিশ্রুত। দুই চারি জন অদূরদর্শী ইউরোপীয় পর্য্যটক অনেক সময়ে চীনাদের চরিত্রে নানারূপ কলঙ্ক আরোপ করিয়া থাকেন। ইঁহারা সাধারণতঃ হংকং প্রভৃতি স্থানের নিতান্ত অসচ্চরিত্র চীনাদের সংস্পর্শে আসিয়া যাহা দেখেন তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন। কিন্তু জাতি হিসাবে ইহাদের চরিত্র অতীব বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল। চীনাদের মত সততা-প্রিয় জাতি আজিও পৃথিবীতে নিতান্ত দুর্লভ। ইউরোপীয় বণিক মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, চীনা মহাজনদের শুধু মুখের কথা অনেক সময়েই দলিল পত্রের চেয়েও অনেক অধিক মূল্যবান্। নুন খাইয়া নুণ হারামী করা তাহাদের মতে মহাপাপ। এই জন্যই অনেক সদাশয় ইউরোপীয় বণিক চীন দেশে দীর্ঘকাল কাজকর্ম্ম করিয়া স্বদেশে যাইবার সময় পুরাতন চীনা ভৃত্যের জন্য কিছু কিছু মাসিক বৃত্তি প্রদানের বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। চীন দেশীয় ভৃত্যের গুণ অনেক। সে কোনও রূপ বাজে কথা

না বলিয়া যত্ন সহকারে ও সুন্দর রূপে মুনিবের কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। সে অনেক রাত্রি জাগিয়া কাজ করে, অথচ অতি প্রত্যুষেই উঠিতে পারে। সে কখনও মুনিবের বাড়ী ছাড়িয়া যায় না।—সেখানেই বাহিরের ঘরে থাকিতে ভাল বাসে। ছুটী না লইয়া কখনও অনুপস্থিত হয় না। কিন্তু ঠিক নিয়মিত সময়ে তাহার মাহিনা দেওয়া দরকার। ইহাদের মধ্যে আর একটী প্রথা আছে। ইহারা মুনিবের বাজার খরচ হইতে কিছু কিছু কমিশন গ্রহণ করিয়া থাকে। যাহার আয় যত বেশী তাহার নিকট তত অধিক কমিশন আদায় করিয়া থাকে। অনেক ইউরোপীয় বণিক মাহিনা বেশী করিয়া দিয়া এই জাতীয় প্রথার উচ্ছেদ সাধনে চেষ্টা করিয়াছেন. কিন্তু কেহই সফলকাম হন নাই।

চীনাভৃত্যদের স্বভাবের আর একটী প্রধান বিশেষত্ব আছে। তাহারা অম্লানবদনে মুনিবকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে—কিন্তু মুনিবের নিকট হইতেও তাহারা মানুষোচিত ব্যবহার পাইবার প্রত্যাশা করে। তাহারা প্রাণান্তেও মুনিবের উদ্ধত ব্যবহার সহ্য করিতে পারে না। অম্লানবদনে লাভজনক চাকুরী ছাড়িয়া দিবে, তথাপি যেখানে আত্মসম্মান হানির কিছুমাত্রও আশঙ্কা আছে, কিছুতেই সেখানে থাকিবে না। যে চীন চাকর এইরূপ ব্যবহার সহ্য করিয়াও থাকিতে চায়, বুঝিতে হইবে সে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ও অবিশ্বাসী। কনফুসিয়াস বলিয়াছেন, "যাহাকে বিশ্বাস করিতে পার না, তাহাকে চাকর রাখিও না, এবং যাহাকে চাকর রাখিবে, তাহাকে অবিশ্বাস করিও না।" *

এই উপদেশ বাক্য স্মরণ রাখিয়া চলিলে চীনা চাকর-বাকর লইয়া প্রায়ই কোন গোলমালে পড়িতে হয় না।

শ্রীমন্মথ নাথ মজুমদার।

---

* If you mistrust a man, do not employ him; if you employ a man, do not mistrust him."

পঞ্চরাত্র

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তৃতীয় অঙ্ক

ভটের প্রবেশ

ভট। অভিমন্যুকে রথ থেকে নামিয়ে নিয়ে গেল সশস্ত্র কৌরবেরা তাকে রক্ষা কত্তে পাল্লে না। বড় লজ্জার কথা! নারায়ণচক্রের ভয়েও তারা ভীত হয় নি! বালক অভিমন্যু বহুদিন ধরে আত্মীয় স্বজন হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে আছে একথাও তারা একবার ভাবে নি!— ওহে সারথি, ক্ষত্রিয়গণের সঙ্গে উপবিষ্ট সশিষ্য গুরুদ্রোণকে একথা নিবেদন কর।

ভীষ্ম ও দ্রোণের প্রবেশ

দ্রোণ। সারথি, কোন ব্যক্তি আমার শিষ্য-পুত্রকে রণক্ষেত্র হ'তে নিয়ে গেল? কে আমার মন্ত্রাভিষিক্ত বিখ্যাত শর দ্বারা আহত হ'য়ে যুদ্ধ কত্তে ইচ্ছুক হয়েছে? প্রবল দূতরূপে উৎকৃষ্ট যোদ্ধা ও অস্ত্র তাহার বিরুদ্ধে প্রেরণ কত্তে হবে।

ভীষ্ম। বালক বলে অভিমন্যু এখনও যুদ্ধাদি ব্যাপারে অনভিজ্ঞ। যখন সকল যোদ্ধা পালিয়ে যাচ্ছিল তখন অভিমন্যু পালায় নি, এজন্যই সে শত্রু-হস্তে বন্দী হয়েছে। হস্তি-যূথ পালিয়ে গেলে যেমন হস্তিগ্রহণেচ্ছু ব্যক্তি কর্ত্তৃক হস্তিশাবক ধৃত হয় সেরূপ সমস্ত সৈন্য পালিয়ে গেলে বালক অভিমন্যু শত্রুহস্তে বন্দী হয়েছে।

দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনির প্রবেশ

দুর্য্যো। সারথি, অভিমন্যুকে কে বন্দী করে নিয়ে গেল? আমিই তাকে মুক্ত করব।

অভিমন্যুর পিতার সঙ্গেই আমার বিবাদ। লোকে যখন শুনবে যে অভিমন্যু বন্দী হয়েছে তখন সকলেই আমাকে দোষী মনে করবে। অভিমন্যু এখন আমারই পুত্র। পাণ্ডবগণের পুত্র হলেও সেটা এখন গৌণ সম্পর্ক। জ্ঞাতি-বিরোধে বালকেরা নিরপরাধ।

কর্ণ। আপনার কথা স্নেহপূর্ণ ও আপনার অনুরূপই বটে।

অভিমন্যু আপনার সম্পর্কিত একথা এস্থলে প্রধান বিচার্য্য নহে। আপনার এখন মনে কত্তে হবে যে, আপনারই হিতের জন্য বালক অভিমন্যু সমরশীর্ষে বিপন্ন ও অবমানিত হয়েছে। আমরা তাকে রক্ষা কত্তে পারি নি। সুতরাং ধনু ছেড়ে এখন আমাদের বল্কল ধারণ করা উচিত।

শকুনি। অভিমন্যুর সাহায্যকারীর অভাব নেই। সে মুক্ত হয়ে আছে ধরে নিন।

রাজা বিরাট যখন শুনবেন অভিমন্যু অর্জ্জুনের পুত্র তখন তিনি স্বয়ংই তাকে মুক্ত করে দেবেন। দামোদরের কথা মনে করেই রণক্ষেত্রে বন্দী অভিমন্যুকে বিরাট-রাজ মুক্ত করবেন। অথবা ক্রোধভরে হলাঘাতে যিনি প্রলম্বাসুরকে বিনাশ করেছিলেন, সেই বলভদ্রের ভয়েই বিরাট অভিমন্যুকে ছেড়ে দেবেন। বলশালী ভীমও বলদর্পিত শত্রুকে নিহত করে অভিমন্যুকে হস্তিনাপুরে নিয়ে আসতে পারে।

দ্রোণ। সারথি, অভিমন্যু কিরূপে বন্দী হ'ল? অভিমন্যুর রথ কি ভেঙ্গে গিয়েছিল? তার রথের ঘোড়া কি হত হয়েছিল? তার রথের চাকা কি মাটিতে বসে গিয়েছিল? তাঁর দুটি তূণীরই কি শরশূন্য হয়েছিল? তোমার সঙ্গে কি অভিমন্যু ঝগড়া করেছিল? তার ধনুর গুণটি কি ছিন্ন হ'য়ে গিয়েছিল? রথিগণের যুদ্ধে এসকল দৈবকৃত বিপদ ঘটে থাকে। অভিমন্যুও যুদ্ধ-বিদ্যায় বড় নিপুণ। তাকে কি শত্রুরা শর দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্র হতে তাড়িয়ে নিয়ে গেল?

সূত। আয়ুষ্মন, ধনুর্ব্বিদ্যা যে নিতান্ত সহজ নহে তাহা আপনিও স্বয়ং জ্ঞাত আছেন।

আপনি যে যে কারণের উল্লেখ করেছেন তার একটির জন্যও অভিমন্যু বন্দী হন নি। তাঁর তূণীর সর্ব্বদাই শরপূর্ণ ছিল, তিনি স্বয়ং মহারথ। আর আমার রথটি অলাতচক্রের ন্যায় * যুদ্ধক্ষেত্রে ঘুরে বেড়িয়েছে। একজন পদাতির হস্তে অভিমন্যু বন্দী হয়েছেন।

সকলে। কি! পদাতির হস্তে অভিমন্যু বন্দী হয়েছে! সে ব্যক্তি কেমন পদাতি?

সূত। তার রূপ বর্ণন করব, কি গুণ বর্ণন করব?

ভীষ্ম। স্ত্রীলোকের রূপ বর্ণন কত্তে হয়। পুরুষের পরাক্রম বর্ণন কত্তে হয়। তার পরাক্রমই বর্ণন কর।

সূত। আয়ুষ্মন—

দুর্য্যো। আপনি গর্ব্বিত ভাষায় কি জন্য কার প্রসংসা কচ্ছেন? বেগে যদি সে ব্যক্তি পবনতুল্যও হয় তথাপি আমি ভীত হব না।

সূত। মহারাজ শুনুন—

সেই পদাতি বেগে রথের অশ্বগুলিকে অতিক্রম করে রথটা ধরে ফেল্লে। ঘাড় বাড়িয়েও ঘোড়াগুলি আর চলতে পাল্লে না। রথটা নিশ্চল হয়ে রৈল।

ভীষ্ম। তা হ'লে সে অস্ত্র পরিত্যাগ করেছিল?

সকলে। কেন?

ভীষ্ম। রথ যদি এরূপে নিশ্চল হয়ে থাকে তা হ'লে মনে কত্তে হবে অভিমন্যু বৃকোদরের অঙ্কগত হয়েছে। দ্বৈতবনে দ্রৌপদীহরণে অকৃতকার্য্য জয়দ্রথও পদাতির হস্তে পরাজিত হয়েছিলেন।

দ্রোণ। গাঙ্গেয় ঠিক কথা বলেছেন। বাল্যকাল থেকে আমি তাকে শিক্ষা দিয়েছি আমি তার বেগ জানি।

পরীক্ষা-রঙ্গে কর্ণপর্য্যন্ত আকৃষ্ট গুণ হ'তে শরটি মুক্ত হলেও যদি আমি বলেছি তোমার মাথা কেঁপেছে অমনি সেও শরের ন্যায় ছুটে লক্ষ্য বিদ্ধ হওয়ার পূর্ব্বেই শরটি ধরে ফেলেছে।

শকুনি। আপনার কথা শুনে হাসি পায়।

---

* "অবাতচক্রপ্রতিমস্ত যে রথঃ"—অবাত (নিবাত প্রদেশ) দেশে চক্রমিব। চক্র—উইও-কক্। সুতরাং -এইরূপ পাঠে "নিশ্চল" অর্থ হইবে।

পৃথিবীতে এরূপ আর কোন বলবান লোক নেই! সব কথাই কেবল প্রিয় পাণ্ডবগণের প্রশংসার জন্য আপনারা বলে থাকেন। আপনারা কি পৃথিবীময় কেবল পাণ্ডবই দেখছেন!

ভীষ্ম। গান্ধাররাজ. সকল কথাই অনুমান করে বলা হচ্ছে।

আমরা শস্ত্র ও চাপ গ্রহণ করে রথারূঢ় হয়ে যুদ্ধে গমন করি। হলায়ুধ এবং বৃকোদরই মাত্র বাহুদুটি অবলম্বন করে যুদ্ধে গিয়ে থাকে।

শকুনি। আমরা একটু অবিমৃষ্যকারী, এজন্য একজন যোদ্ধা আমাদিগকে তাড়িয়ে দিয়েছে। সে উত্তর। আর আপনারা বলছেন ফাল্গুনী আমাদিগকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

দ্রোণ। গান্ধার-রাজ, এবিষয়ে এখনও আপনার সন্দেহ আছে?

পরিষ্কার দিনে বজ্রনির্ঘোষের মত টঙ্কার দিয়ে কি উত্তর ধনু আকর্ষণ কত্তে পারে? শরবর্ষণ করে হৃতাতপ দিবাকরকে কি উত্তর মুহূর্ত্তকালের জন্য অস্তগমনোন্মুখ কত্তে পারে?

ভীষ্ম। গান্ধারীমাতঃ, আমি স্পষ্ট করে বলছি আপনি জানেন পার্থ ধনু আকর্ষণ করে বাণপুঙ্খরূপ বাক্য জ্যারূপ জিহ্বা দ্বারা উচ্চারণ করেছে. কিন্তু আপনি সে কথা শুনবেন না।

সারথির প্রবেশ

সারথি। আয়ুষ্মানের জয় হ'ক। শান্তিকর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন।

ভীষ্ম। কেন?

সারথি। এবিষয়টি প্রথমে আপনার অনুধাবনের যোগ্য। এই বাণটি ধ্বজে লগ্ন হয়েছিল পুঙ্খে ক্ষেপন-কর্ত্তার নাম অঙ্কিত আছে।

ভীষ্ম। নিয়ে এস দেখি।

(সারথির বাণ প্রদান)

ভীষ্ম। (বাণগ্রহণ ও নিরীক্ষণ করিয়া) বৎস গান্ধাররাজ, জরায় আমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়েছে। এই শরের অক্ষরগুলি পাঠ কর।

শকুনি। (বাণগ্রহণ ও পাঠ করিয়া) অর্জ্জুনের এই শর। (এই বলিয়া বাণটি নিক্ষেপ করিল ও বাণটি দ্রোণের পদতলে পড়িল)।

দ্রোণ। (শর গ্রহণ করিয়া) বৎস, এস। গাঙ্গেয়কে বন্দনা করার জন্য আমার শিষ্য-নিক্ষিপ্ত এই শর পরে আমাকে বন্দনা করার জন্য আমার পাদমূলে পতিত হ'ল।

শকুনি। স্পষ্ট করে বলুন না কেন যে অর্জ্জুন যোদ্ধা, অর্জ্জুনই শর ছুঁড়েছে আর উত্তর নাম লিখেছে।

দুর্য্যো। পাণ্ডবদের রাজ্য দেওয়ার জন্য যদি ভীষ্মাদি এরূপ কথা বলে থাকেন তাহ'লে আমিও বলছি যুধিষ্ঠিরকে দেখলেই আমি রাজ্যার্দ্ধ পাণ্ডবদিগকে প্রদান করব।

ভটের প্রবেশ

ভট। মহারাজের জয়। বিরাটনগর থেকে দূত এসেছে।

দুর্য্যোধন। নিয়ে এস।

ভট। যে আজ্ঞা। (প্রস্থান)

ভটের প্রবেশ

উত্তর। অল্প পথ আসতেও আমার অনেক সময় লেগেছে। কৌন্তেয়-বাণ-হত হস্তিসমূহ চতুর্দ্দিকে পতিত রয়েছে। ভূমিভাগ তজ্জন্য নতোন্নত হয়েছে। এবং দ্রুতগামী অশ্বের বেগও তজ্জন্য মন্দীভূত হয়েছে।

(কৃতাঞ্জলি পুটে)

আচার্য্য, পিতামহের সহিত উপবিষ্ট সমগ্র রাজ-মণ্ডলকে অভিবাদন কচ্ছি।

সকলে। আয়ুষ্মান হও।

দ্রোণ। বিরাটেশ্বর কি বলেছেন।

উত্তর। বিরাটেশ্বর আমাকে পাঠান নি।

দ্রোণ। কে তোমাকে পাঠিয়েছে?

উত্তর। রাজা যুধিষ্ঠির।

দ্রোণ। ধর্ম্মরাজ কি বলেছেন?

উত্তর। শুনুন—

তিনি বলেছেন, "আমি উত্তরাকে পুত্রবধূ রূপে লাভ করেছি। রাজগণ শীঘ্রই সমাগত হবেন। শুভবিবাহ কোথায় সম্পন্ন হবে? সেখানে, কি এখানে?"

শকুনি। সেখানে, সেখানে।

দ্রোণ। এজন্যই আমরা সেখানে গিয়েছিলুম। পঞ্চরাত্র এখনও অতীত হয় নি। মহারাজ, আমার ধর্ম্মভিক্ষা ধর্ম্মানুরোধে প্রদান করুন।

দুর্য্যো। আমাদের রাজ্যের অর্দ্ধাংশ আমি প্রদান করলুম। মৃত্যু হলেও লোকে চিরস্থায়ী সত্য লঙ্ঘন করে না।

দ্রোণ। আমাদের প্রসরণশীল বংশের আমরা সকলেই প্রসন্ন হলুম। আমাদের রাজসিংহ এই সমগ্র মেদিনীমণ্ডল শাসন করুন।

[সকলের প্রস্থান।

শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য

সম্পূর্ণ।

কাম্বোজ প্রদেশ

দ্বিতীয় প্রবন্ধ

বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণের মধ্যে গৌড়রাজমালার লেখক মহাশয় তিব্বত বা তৎপার্শ্ববর্ত্তী দেশকে কাম্বোজ প্রদেশ বলিতে চান। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্মিথ (V. A. Smith) সাহেব তিব্বতের নামান্তর কাম্বোজ প্রদেশ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু তিনি নিঃসন্দিগ্ধ রূপে এই স্থানকে কাম্বোজ প্রদেশ বলিয়া মনে করেন নাই। তাঁহার অঙ্কিত ভারতবর্ষের মানচিত্রে সন্দেহ জনক চিহ্ন লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রদ্ধাস্পদ প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় চীন সাগরের উপকূলস্থিত কাম্বোডিয়া নামক স্থান ও ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে কাশ্মীরের নিকটবর্ত্তী স্থান এবং বর্ত্তমান গুজরাট প্রদেশান্তর্গত কাম্বে নামক স্থানত্রয়কেই কাম্বোজ প্রদেশ বলিতে চান। এতদ্ব্যতীত সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার রচিত 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' নামক গ্রন্থে কাবুল দেশকে কাম্বোজ প্রদেশ বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। তিনি মনে করেন এস্থান হইতে কাম্বোজ জাতি ভারতবর্ষে আগমন করিয়া কোন কোন স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার এই অনুমান সমীচীন না হইলেও ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তে কোন স্থানে কাম্বোজ প্রদেশ ছিল, তাহা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন এইরূপ বুঝা যায়। পূর্ব্বোক্ত সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকগণের বিভিন্নরূপ মত সকল আলোচনা করিলে কাম্বোজ প্রদেশের প্রকৃত সংস্থান কোথায় ছিল, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়। পূর্ব্বে প্রকাশিত "কাম্বোজ প্রদেশ" নামক প্রবন্ধে, কাম্বোজ প্রদেশ সম্বন্ধে আংশিক ভাবে আলোচনা করা হইলেও উহার সংস্থান সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয় নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধেও তৎসম্বন্ধে সামান্য কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করা হইবে। কারণ, কোন দেশের সংস্থান সম্বন্ধে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিতে হইলে, সেই দেশের বিশেষ বিশেষ জীব, রীতিনীতি, শিক্ষা এবং বেশবিন্যাস, খনিজ দ্রব্য, শিল্প সামগ্রী প্রভৃতির বিষয় আংশিক ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে সেই দেশের সংস্থান সম্বন্ধে কতক আভাস পাওয়া যায়। আমাদের এমন কোন প্রাচীন ভৌগোলিক গ্রন্থ নাই যদ্দ্বারা অতি সহজে কোন প্রদেশের ভৌগোলিক সংস্থান নির্দ্দেশ করা যাইতে

পারে। যিনি যে বিষয়েরই আলোচনা করুন না কেন, তৎবিষয়ে একটু না একটু সন্দেহ থাকিয়া যায়। তাহা যথা সম্ভব প্রমাণ সকলের দ্বারা সমর্থিত হওয়া আবশ্যক। ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তস্থিত প্রদেশ সকল বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় না হইলেও তৎসম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা আবশ্যক হইয়া পড়িবে।

এখন দেখা যাক কাম্বোজ প্রদেশ ভারতবর্ষের মধ্যে কি কারণে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে এবং প্রাচীন লিপি সকলে দেখা যায় কাম্বোজ প্রদেশ উৎকৃষ্ট অশ্বের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। নেপাল, ভুটান, তিব্বত প্রভৃতি প্রদেশে পার্ব্বত্য অশ্ব আছে বটে, কিন্তু তাহা অশ্ব জাতির মধ্যে সর্ব্বাধিক শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিতে পারে নাই। উক্ত পার্ব্বত্য অশ্ব মধ্যে ভুটিয়া অশ্বই বিশেষ প্রসিদ্ধ। তিব্বত দেশীয় অশ্ব কোন কারণে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল এইরূপ শুনা যায় না। পার্ব্বত্য অশ্ব তৎপ্রদেশ-সুলভ অসমতল দেশের যুদ্ধ বিগ্রহ পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইতে পারে। সমতলস্থ রাজগণের ঐ সকল অশ্ব যুদ্ধ ব্যপদেশে ব্যবহার করা স্বাভাবিক নহে, এবং সমতল ভূমির ব্যবহার পক্ষে তাহা উপযোগীও নহে।

প্রাচীন ও আধুনিক কালে সকল সময়েই বিদেশস্থ কোন রাজা বা প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে উপঢৌকন দিবার জন্য স্বদেশোৎপন্ন উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি দিবার রীতি আবহমান কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। কোন সময়ে কেকয়রাজ যুধাজিৎ নিজ গুরু গার্গ ঋষির দ্বারা দশরথ-পুত্র রামচন্দ্রকে দশ সহস্র অশ্ব উপঢৌকন প্রেরণ করিয়াছিলেন।

কস্য চিত্ত্বথ কালস্য যুধাজিৎ কেকয়ো নৃপঃ।
স্বগুরুং প্রেষয়ামাস রাঘবায় মহাত্মনে॥
গার্গ্যমাঙ্গিরসঃ পুত্রং ব্রহ্মর্ষিমমিতপ্রভম্।
দশচাশ্ব সহস্রানি প্রীতিদানমনুত্তমম্॥ (১)

তদ্দ্বারা কেকয় রাজ্য অশ্ব জনক ভূমি বলিয়া অনুমান হয়। এই কেকয়রাজ্য ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তস্থিত দেশ।

কালিদাস রঘুবংশ নামক কাব্যে, রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তস্থিত কয়েকটি দেশের উল্লেখ করিয়াছেন।

পারসিকাংস্ততো জেতুং প্রতস্থে স্থলবর্ত্মনা।
ইন্দ্রিয়াখ্যানিব রিপুংস্তত্ত্বজ্ঞানেন সংযমী॥
যবনী মুখপদ্মানাং সেহে মধুমদং ন সঃ।
বালাতপমিবাব্জানামকাল জলদোদয়ঃ॥
সংগ্রামস্তুমুলস্তস্য পাশ্চাত্যৈরশ্বসাধনৈঃ।
শার্ঙ্গকুজিত বিজ্ঞেয় প্রতিযোধেরজস্যভূৎ॥ (২)

উক্ত বর্ণণায়, রঘু অশ্বজনক ভূমি পারসিক ও যবন রাজগণের অশ্বারোহী সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা পারসিক ও যবন প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশ সকল অশ্বজনক ভূমি বলিয়া অনুমান হয়: এবং ঐ সকল দেশ ভারতবর্ষের পশ্চিম দিকস্থ দেশ বটে।

এতদ্ব্যতীত রঘুর উক্ত দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে কাম্বোজ প্রদেশ জয় করার বিষয়ও উল্লেখ আছে—

কাম্বোজাঃ সমরে সোঢ়ুং তস্য বীর্য্যমনীশ্বরা।
গজালান পরিক্লিষ্টৈঃ রক্ষোটৈঃ সার্দ্ধমানতাঃ॥
তেষাং সদশ্বভূয়িষ্ঠা স্তুঙ্গ দ্রবিণরাশয়।
উপদা বিবিশুঃ শশ্বন্নোৎসেকাঃ কোশলেশ্বরং॥ (৩)

ইহাতেও উল্লেখ আছে, কাম্বোজের রাজগণ রঘুকে অশ্ব ও অর্থ উপঢৌকন দিয়াছিলেন। এতদ্দ্বারাও কাম্বোজ প্রদেশকে অশ্বজনক ভূমি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

এখন দেখা যাক, ভারতীয় অশ্ব সকলের মধ্যে কোন

(১) রামায়ণ উত্তর কাণ্ড ১১৩ অধ্যায় ১—২ শ্লোক।

(২) রঘুবংশ, চতুর্থ সর্গ।

(৩) রঘুবংশ চতুর্থ সর্গ।

কোন গ্রন্থে অশ্বজাতির সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। অমরকোষে দৃষ্ট হয়।

ঘোটকে প্রীত-তুরগ-তুরঙ্গ-অশ্ব-তুরঙ্গমাঃ।
বাজি বাহ্যা অর্ব্ব গন্ধর্ব্ব হয় সৈন্ধব সপ্তয়ঃ।
"বনায়ুজাঃ পারসীকাঃ কাম্বোজা বাহ্লিকা হয়াঃ।"
"জবনস্তু (যবন) জবাধিকঃ।" (৪)

উক্ত অশ্ব জাতির মধ্যে, গন্ধর্ব্ব, সৈন্ধব, বনায়ুজ, পারসিক, কাম্বোজ, বাহ্লিক, জবন, (যবন) দেশীয় অশ্ব সকলের বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়। উহা দ্বারা তদ্দেশীয় অশ্ব সকল প্রসিদ্ধ ছিল বলিয়া অনুমান হয়; এবং ঐ সকল দেশ অশ্বজনক ভূমি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ঐ সকল প্রদেশ ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তবর্ত্তী।

ইহা ব্যতীত পালবংশীয় বঙ্গাধিপ ধর্ম্মপালদেবের পুত্র দেবপালদেবের তাম্রলিপি হইতে জানা যায়, তাঁহার যুদ্ধাশ্ব সকল কাম্বোজ দেশে উপনীত হইয়া, বহুকাল পরে আত্মীয় দর্শনে আনন্দধ্বনি করিতেছিল।

ভ্রাম্যদ্ভি বিজয় ক্রমেণ করিভিঃ স্বামেব বিন্ধ্যাটবী
মুদ্দাম প্লবমান বাষ্পপয়সো দৃষ্টাঃ পুনর্ব্বান্ধবাঃ। (৫)
কাম্বোজেষু চ যস্য বাজি যুবভি ধ্বস্তান্য রাজৌজসো
হেষামিশ্রিতহারিহেষিতরবাঃ কান্তাশ্চিরং বীক্ষিতাঃ॥

ইহা দ্বারা বুঝা যায়, দেবপাল দেব কাম্বোজ প্রভৃতি প্রদেশ হইতে অশ্ব সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধ ব্যপদেশে ব্যবহার করিতেন। ঐ সকল অশ্ব উৎকৃষ্ট বলিয়াই যুদ্ধে ব্যবহার হইত; এবং কাম্বোজ দেশীয় অশ্ব বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল।

মুসলমান ঐতিহাসিক আবুলফজল আলামী প্রণীত আইন আকবরী নামক গ্রন্থে অশ্বজাতির বিষয় উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে আরব, ইরাকী, মোজেনেস, তুরক যবু, তাজী, জঙ্গেলী, কাবুল ও কান্দাহার জাতীর বিষয় উল্লেখ আছে।

(৪) অমরকোষ ক্ষত্রিয় বর্গ।

(৫) মুঙ্গের লিপি ১৩ শ্লোক গৌড় লেখমালা ৩৭ পৃষ্ঠা।

আরব জাতীয় অশ্ব আরব দেশে জন্মিত। সম্ভবতঃ আরব দেশীয় অশ্বই সংস্কৃত গ্রন্থে 'অর্ব্ব' নামে পরিচিত। ইরাক জাতীয় অশ্ব ইরাক দেশে জন্মিত। উক্ত গ্রন্থে উল্লিখিত 'ইরাক প্রদেশ' তৎকালে পারস্য দেশের অন্তর্গত বলিয়া উল্লেখ হইলেও বর্ত্তমান সময়ের মানচিত্রে উহা আরব দেশের অন্তর্গত দেখা যায়।

সম্ভবতঃ ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতগণ এই স্থানকে 'ইরাণ' দেশ বলিতেন। মোজনেস্ জাতীয় অশ্ব তুর্কী এবং ইরাকী জাতীয় অশ্ব হইতে উৎপন্ন।

তুর্কী জাতীয় অশ্ব তুরুষ্ক বা তুরান দেশে জন্মিত। সম্ভবতঃ তুর্কী জাতীয় অশ্বই সংস্কৃত গ্রন্থে 'তুরগ' বা তুরঙ্গ নামে পরিচিত। উক্ত তুরস্ক বা তুরাণ দেশের অন্তর্গত 'যবু' নামক প্রদেশে যবু জাতীয় অশ্ব জন্মিত। সম্ভবতঃ ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতগণ এই স্থানকে ও 'তুরাণ' বা 'যবন' দেশ বলিতেন। জবন (যবন) শব্দে অশ্বজাতিকেও বুঝায়। তাজী ও জঙ্গলী জাতীয় অশ্ব সাধারণতঃ ভারতবর্ষের নানাস্থানে জন্মিত। (৬)

(৬) "Arab, Irakee, Mojinness, Turkey, Yabu, Tazee and Jungelh" : * * *.

"1st. The Arab, which is a very fine horse, bred in different parts of Arabia." * * *.

"2nd. The Irakee, which is bred in the Persian Irak, is a beautiful animal, and equally powerful with the Arab." * * *.

"3rd. The Mojinness, resembles the Irakee, and is a mixture of the Turkee and the Irakee". * * *.

"4th. The Turkey is bred in Turan: although he is very strong and of a good height yet he is inferior to the Mojinness". * * *

"5th. Yabu, is also a native of Turan, but less powerful and smaller than Turkey." * * *

"6th. 7th. are the Tazee, and the Jungelh. Those are mostly bred in Hindustan The best is called Tazee, and middling kind

উক্ত আইন আকবরী গ্রন্থে আর একস্থানে বিদেশী অশ্ব সকলের উপর যে শুল্ক নির্দ্ধারিত ছিল, তৎবিবরণীতে কান্দাহার তাজী এবং কাবুল দেশীয় অশ্বের বিষয় উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ উক্ত কান্দাহার দেশীয় অশ্বই সংস্কৃত গ্রন্থে "গন্ধর্ব্ব" নামে পরিচিত। গন্ধর্ব শব্দ অশ্ব জাতিকেও বুঝায়। (৭)

সংস্কৃত সাহিত্য, প্রাচীন লিপি, অভিধানও আইন আকবরী নামক গ্রন্থ প্রভৃতি সমালোচনা করিয়া দেখিলে মনে হয়, আরব সাগরের উত্তর এবং পারস্যোপসাগরের উপকূলস্থিত প্রদেশ সকলে উৎকৃষ্ট জাতীয় অশ্ব সকল জন্মিত। বর্ত্তমান গুজরাট প্রদেশ ও আরব সাগরের উত্তর উপকূলস্থিত প্রদেশ বটে; এবং তথায় উৎকৃষ্ট জাতীয় অশ্ব উৎপন্ন হওয়া সম্ভবপর। বর্ত্তমান কালেও গুজরাট প্রদেশর অন্তর্গত উৎকৃষ্ট জাতীয় অশ্ব সকলের নাম তৎপ্রদেশে "কাঠ্যাওয়ারী ঘোড়া" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ঐসকল অশ্ব বিদেশী বণিকগণ ক্রয় করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত পাঞ্জাব ও সিন্ধু নদের উত্তর পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ সকলে উৎকৃষ্ট জাতীয় অশ্ব জন্মিত, তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়।

বণিক সোলেমান লিখিত বিবরণী হইতেও গুজরাট প্রদেশের অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যায়।

"বণিক সোলেমান লিখিয়াছেন, গুজরাটের সৈন্য-সংখ্যা অগণ্য। ভারতবর্ষের রাজন্যগণের তাদৃশ উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী সৈন্য নাই। ভারতীয় রাজন্যবৃন্দ মধ্যে গুজরাটাধিপতি সাতিশয় সম্পদশালী। তাঁহার উষ্ট্র ও অশ্বের সংখ্যা অপরিমিত, গুজরাটের বিনিময়ের জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্য কণিকা সকল ব্যবহৃত হইত; ঐ দেশে স্বর্ণ ও রৌপ্যের খনি আছে বলিয়া লোকশ্রুতি বিদ্যমান রহিয়াছে।" (৮)

বণিক সোলেমানের লিখিত বিবরণ হইতেও গুজরাট প্রদেশে উৎকৃষ্ট অশ্ব এবং অশ্বারোহী থাকার বিবরণ পাওয়া যায়। উক্ত গুজরাট প্রদেশ অশ্বজনক ভূমি ছিল বলিয়াই ঐ স্থানে অপরিমিত অশ্ব ও অশ্বারোহী ছিল; ইহা অনুমান করিলে অন্যায় হইবে না।

তৎবিবরণ হইতে আমরা আরও জানিতে পারি যে তৎপ্রদেশে বিনিময়ের জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্য কণিকা সকল ব্যবহৃত হইত। ঐ প্রদেশে স্বর্ণ ও রৌপ্যের খনি ছিল বলিয়া তৎকালে জনশ্রুতিও ছিল। যদি স্বর্ণ ও রৌপ্যের খনি না থাকিত, তাহা হইলে দ্রব্যাদির বিনিময়ে উহার কণিকা সকল ব্যবহৃত হইত কেন? অতএব গুজরাট প্রদেশে স্বর্ণ ও রৌপ্যের খনি থাকা সম্বন্ধে অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

পাশ্চাত্য গ্রীক ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থে ও দরদ প্রদেশে সুবর্ণের খনি ছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। ঐ প্রদেশের এক প্রকার জীবের নাম স্বর্ণপ্রসূ পিপীলিকা তাঁহাদের কল্পনা প্রসূত কোন জীব হইবে; নতুবা ঐ জীবের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের কাহারও মতে উক্ত দরদ প্রদেশ কাশ্মীরের উত্তর পশ্চিম কোণস্থিত প্রদেশ। কাহারও মতে সিন্ধুনদ-তীরবর্ত্তী প্রদেশ; এবং কাহারও মতে পূর্ব্বাকালে দরিদাই জাতি বাস করে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিত ষ্ট্রাবো খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার গ্রন্থে 'দারদাই' জাতির

Jungolh, and the worst Tattoo. Tanghens are greatly improved by being crossed with Tazees. * * *. Ayeen Akbery, translated by Francis Gladwin, Part II. Pages 156—157.

(৭) "Duties collected from Horses bought from the Dealers. Each Horse.

A foreign Mojinness...............3 Rs.

A Turkey, or a Kandahar Tazee...2½"

A Kabul, or Hindustan Tazee......2 "

"Ayeen Akbery, translated by Francis Gladwin. Part I. Page 142.

(৮) প্রবাসী কার্ত্তিক ১৩১৫ সন। "ভারতীয় ইতিহাস প্রসঙ্গ"

বিষয় উল্লেখ করেন। এই "দারদাই নামক এক জাতি পূর্ব্বাকালে বাস করে।" (৯) পাশ্চাত্য পণ্ডিত ডাইওনিসিয়াস্, খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন; তাহার গ্রন্থে উল্লেখ আছে, "দারদেনিয়ানগণ সিন্ধুনদ তীরবর্ত্তী দেশে বাস করেন।" (১০) তদ্ব্যতীত তদ্দেশীয় অন্যান্য ঐতিহাসিকদিগের মতে কাশ্মীরের উত্তর পশ্চিমাংস স্থিত দাদগণ দরদাই জাতির বংশধর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে দরদ প্রদেশের সংস্থান সম্বন্ধে কোন স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়না। তবে এই প্রদেশ ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমান্তস্থিত কোন প্রদেশ হইবে তাহা সিদ্ধান্ত করা যায়।

কালিদাস তৎপ্রণীত রঘুবংশ নামক কাব্যে, রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে, দর্দ্দর নামক এক পর্ব্বতের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

সনির্ব্বিশ্য যথাকামং তটেষ্বালিন চন্দনৌ।
স্তনাবিব দিশস্তস্যাঃ শৈলৌ মলয় দার্দ্দুরৌ ॥ ৫১
অসহ্য বিক্রমঃ সহ্যং দূরান মুদক্ত মুবতা।
নিতম্বমিব মেদিন্যাঃ প্রস্তাং শুকমলঙ্ঘয়ৎ ॥ ৫২ (১১)

আমরা দুইটি কারণে রঘুবংশোক্ত দর্দ্দর প্রদেশকে দরদ প্রদেশ বলিয়া অনুমান করিতে পারি।

প্রথম কারণ, দরদ প্রদেশ যদি সন্ধু নদতীরবর্ত্তী প্রদেশ হইত; তবে উহা অশ্বজনক ভূমী বলিয়া প্রাচীন গ্রন্থাদিতে উল্লেখ দেখা যাইত।

দ্বিতীয় কারণ, পাশ্চাত্য গ্রীক পণ্ডিতগণ দরদ প্রদেশকে অশ্বজনক ভূমী না বলিয়া স্বর্ণপ্রসূ প্রদেশ বলিয়া তাঁহাদের গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। কালিদাস যে স্থানকে দর্দ্দর পর্ব্বত বলিয়া রঘুবংশে উল্লেখ করিয়াছেন; ঐ স্থান ভারতবর্ষের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে অবস্থিত; এবং পাশ্চত্য গ্রীক ঐতিহাসিক উল্লিখিত পূর্ব্ব দিকে ও বটে, এবং বর্ত্তমান স্বর্ণপ্রসূ মহীশূর রাজ্যের সংলগ্ন, ও পূর্ব্বোল্লিখিত স্বর্ণপ্রসূ গুজরাট ভূদেশ হইতে বহুদূরবর্ত্তী স্থান নহে।

যদি দর্দ্দর পর্ব্বতের সংলগ্ন ভূমিকেই দরদ প্রদেশ বলিয়া অনুমান করিয়া লওয়া যায়; তবে পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতদিগের মতের সামঞ্জস্য রক্ষা করা যাইতে পারে। এই স্থান সিন্ধুপ্রদেশ ও নদ হইতে বহুরবর্ত্তী স্থানে নহে। বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় কাম্বোজ প্রদেশ; দরদ প্রদেশ নহে, তথাপি আবশ্যক বোধে এতৎ বিষয়ের আলোচনা করা হইল।

মহাভারত গ্রন্থে ও দরদ এবং কাম্বোজ প্রদেশের সান্নিধ্যের বিষয় উল্লেখ আছে।

ততঃ পরম বিক্রান্তো বাহ্লীকান্ পাকশাসনিঃ।
মহতা পরিমর্দ্দেন বশে চক্রে দুরাসদাম্ ॥ ২২
গৃহীত্বা তু বলং সারং ফাল্গুনঃ পাণ্ডুনন্দনঃ।
দরদান্ সহ কাম্বোজৈরজয়ৎ পাকশাসনিঃ ॥ ২৩ (১২)

পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন দিগ্বিজয় কালে, অন্যান্য প্রদেশ সকল পরাজয় করিয়া; বাহ্লীক ও দরদ সহ কাম্বোজ প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন। এতদ্বারা দরদ ও কাম্বোজ প্রদেশ বহুদূরবর্ত্তী স্থান নহে বলিয়া অনুমান হয়। পূর্ব্বোক্ত দরদা প্রদেশকে যখন ভারতবর্ষের পশ্চিম দক্ষিণ অনুমান করা হইয়াছে, তখন কাম্বোজ প্রদেশ ও তৎ সমীপবর্ত্তী কোন প্রদেশ হইবে; মনে করা যাইতে পারে।

তদ্ব্যতীত হরিবংশ নামক গ্রন্থে কাম্বোজ প্রদেশের বিষয় উল্লেখ আছে।

সগরস্তাং প্রতিজ্ঞাঞ্চ গুরোর্ব্বাক্যং নিশম্য চ।
ধর্ম্মং জঘান তেষাং বৈ বেশান্যত্বাং চকার হ ॥
অর্দ্ধং শকানাং শিরসো মুণ্ডয়িত্বা ব্যসর্জ্জয়ৎ।
যবনানাং শিরঃ সর্ব্বং কাম্বোজানাং তথৈব চ ॥

(৯) প্রাচীন ভারত, প্রথম খণ্ড। ৬৮ পৃঃ
(১০) প্রাচীন ভারত প্রথম খণ্ড। ১৮০ পৃঃ
(১১) রঘুবংশ, চতুর্থ সর্গ।
(১২) মহাভারত, সভাপর্ব্ব ২৭ অধ্যায়।

পারদাঃ মুক্তকেশাশ্চ পহ্নবা শ্মশ্রুধারিণঃ।
নিঃস্বাধ্যায় বষটকারাঃ কৃতাস্তেন মহাত্মনা॥ (১৩)

সগর রাজা তাঁহার পিতৃবৈরী, শক (১৪), যবন, কাম্বোজ, পারদ (১৫), পহ্নব (১৬), প্রভৃতি জনপদের নরপতিগণকে হত্যা করিবার মানস করায় উক্ত ম্লেচ্ছরাজগণ বশিষ্ঠ দেবের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন।

সগর নিজগুরু বশিষ্ঠদেবের অনুরোধে, উক্ত ম্লেচ্ছ রাজগণকে হত্যা করেন নাই। বশিষ্ঠদেবের উপদেশ অনুসারে তাহাদিগকে স্বধর্ম্মচ্যুত করিবার অভিলাষে, শকদিগের অর্দ্ধ মস্তক মুণ্ডন, যবন ও কাম্বোজ দিগের সম্পূর্ণ মস্তক মুণ্ডন, পারদ দিগের মুক্ত কেশ, এবং পহ্নব দিগকে শ্মশ্রুধারী প্রভৃতি করাইয়া, উহাদিগকে নানা ভাবে স্বধর্ম্মচ্যুত করিয়াছিলেন।

এই সকল বিষয়ের যথার্থতা সুপ্রমাণিত না হইলেও উক্ত ম্লেচ্ছরাজগণের প্রতি যে সকল ব্যবস্থা হইয়াছিল, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিলে ঐ সকল ম্লেচ্ছরাজগণের পরস্পর সান্নিধ্য উপলব্ধি হয়। যবন ও কাম্বোজদিগর সম্পূর্ণ মস্তক মুণ্ডন করাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল বলিয়া উক্ত প্রদেশদ্বয়কে পরস্পর সমীপবর্ত্তী বলিয়া মনে হয়।

সাধারণতঃ আমরা অধিকাংশ স্থলে আমাদের দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশ গুলির নাম, তদ্দেশীয় নরপতিগণের নামানুযায়ী দেখিতে পাই, যথা—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কুরু, ভরত, বিরাট প্রভৃতি। অনেক স্থলে রাজনন্দিনীদিগের নাম তাঁহাদের জনক অথবা তাঁহাদিগের অধিকারভুক্ত রাজ্যের নামে অভিহিত হইয়া থাকে, যথা—দ্রৌপদী, কৈকেয়ী, কৌশল্যা, মাদ্রী, গান্ধারী, প্রভৃতি নাম সকল।

কতকগুলি প্রদেশবাসী জনসাধারণকে তাঁহাদের নিবাস স্থলের পরিচয়ে অভিহিত করা হইয়া থাকে, যথা বাঙ্গালী, উড়িয়া, আসামী, মহারাষ্ট্রী, তৈলঙ্গী, গুজরাটী, কচ্ছী, পাঞ্জাবী, মৈথিলী প্রভৃতি জাতিসকল। পশুদিগের মধ্যে দেশ পরিচয়ে পৃথক পৃথক নামের সংজ্ঞা দিবার রীতি পূর্ব্বে ছিল না। কিন্তু পূর্ব্বকালেও বিভিন্ন প্রদেশে উৎপন্ন অশ্বজাতির নামের পরিচয়ের পার্থক্য উপলব্ধি হয়, যথা গন্ধর্ব্ব, যবন, পারসক, সৈন্ধব, প্রভৃতি। সঙ্গীত শাস্ত্রের প্রধান অঙ্গরাগ ও রাগিণীকে নানা প্রদেশের নামে অভিহিত হইতে দেখিয়া থাকি। তাহার উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সঙ্গীত শাস্ত্র সম্বন্ধে যাঁহারা আলোচনা করিয়া থাকেন তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই ভারতবর্ষীয় রাগ এবং রাগিণীর সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হইবেন সন্দেহ নাই। সরোজ, রেখাব, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিখাদ, এই সপ্তস্বরের মধ্যে নিখাদ নিঃসন্তান। অবশিষ্ট ছয় স্বর হইতে ছয় রাগের উৎপত্তি হইয়াছে। সঙ্গীত শাস্ত্রে রাগগুলিকে পুরুষ বা কর্ত্তা অথবা মূলরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। রাগিণী প্রভৃতিকে উক্ত রাগের পত্নী, অথবা তৎসম্পর্কিত সুর রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। আরও কতকগুলি সুরকে উক্ত রাগের পুত্র ও পুত্রবধূ কল্পনা করা হইয়াছে। অতএব, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বে সপ্তস্বর পরে রাগ এবং তৎপরে রাগিণী তৎপর পুত্র ও পুত্রবধূ সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই প্রায় সঙ্গীত শাস্ত্রের আলোচনা হইত। রাগিণীগুলির নামের প্রতি লক্ষ্য করিলে আমাদের সঙ্গত মনে হয়, সম্ভবতঃ পূর্ব্বকালে এক সময়ে পাঞ্জাবে, দাক্ষিণাত্যে এবং সিন্ধুনদের সমীপস্থ প্রদেশে সঙ্গীত শাস্ত্রের বিশেষরূপ চর্চ্চা ছিল।

(১৩) হরিবংশ ১৪ অধ্যায়।

(১৪) শক—উদীচ্য দেশ, শক প্রদেশের গরুড় পুরাণ ৫৫ অধ্যায়।

"অম্বষ্ঠা দ্রাবিড়া লাটাঃ কাম্বোজাঃ স্ত্রীমুখাঃ শকাঃ।
আনর্ত্তবাসিনশ্চৈব জ্ঞেয়া দক্ষিণ পশ্চিমে॥ ১৫

সংস্থান সম্বন্ধে বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ আছে।

(১৫) পারদ—উদীচ্য দেশ।

(১৬) পহ্নব—উদীচ্য দেশ।

তৎকালীন যে যে স্থানে সঙ্গীতচর্চ্চা হইত তৎ-প্রদেশস্থ সঙ্গীত শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ কর্ত্তৃক মূল রাগ অবলম্বনে এক একটি রাগিণী সৃষ্টি হইয়াছে। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদিগের উদ্ভাবিত নূতন নূতন রাগিণীর নামও তাহাদের বাসস্থান বা প্রদেশগুলির নামে অভিহিত হইয়াছিল।

এখনও আমাদের দেশের অনেক প্রদেশের এবং অনেক জাতির নিজস্ব সুর আছে, যাহার সহিত মূল রাগ বা রাগিণীর খুব অল্পই সম্বন্ধ আছে। ঐ সকল সুর সাধারণতঃ 'দেশজ সুর' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান সময়ের প্রচলিত রাগিণী প্রভৃতির মধ্যে কয়েকটি, অর্থাৎ ভূপালী কর্ণাটী, মালবী, সৈন্ধবী, গুর্জ্জরী, মল্লারী, সৌরাটী, গান্ধারী, আভিরী, বৈরাটী এই কয়টি রাগিণী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। গান্ধার, খাম্বাজ, সিন্ধু, মারু, মোবাড়, কুন্তল কলিঙ্গ আভীর কার্ণাট, তৈলঙ্গ, আন্ধ্র, কোকাণ, বৈরাট, পুলিন্দ, মুলতান, এই কয়েকটি রাগের পুত্ররূপে কল্পনা করা হইয়াছে। আভিরী দীপক রাগের পুত্রবধূরূপে কল্পনা করা হইয়াছে।

উক্ত সুরগুলি ভূপাল (১৭), কার্ণাট (১৮), মালব (১৯), সিন্ধু (২০), গুর্জ্জর (২১), মল্ল (২২), সৌরাষ্ট্র (২৩), গান্ধার (২৪), আভীর (২৫), বিরাট (২৬), খাম্বাজ (২৭), মরু (২৮), মোবাড় (২৯), কুন্তল (৩০),

(১৭) ভূপাল—ইন্দোরের উত্তর পূর্ব্ব কোণস্থিত দেশ।

(১৮) কর্ণাট—

রামনাথং সমারভ্য শ্রীরঙ্গান্তং বিলেশ্বরী।
কর্ণাট দেশো দেবেশি সাম্রাজ্য ভোগদায়কঃ॥
শক্তিসঙ্গমতন্ত্রী পটল।

(১৯) সিন্ধু-উদীচ্যদেশ, বিন্ধ্য পর্ব্বতস্থ দেশ বিশেষ।

"অবন্তীতঃ পূর্ব্বভাগে গোদাবর্য্যান্তথোত্তরে।
মালবাখ্যো মহাদেশো ধনধান্য পরায়ণঃ॥
শক্তিসঙ্গমতন্ত্রী পটল।

(২০) সিন্ধু উদীচ্য দেশ. "লঙ্কাপ্রদেশ মারভ্য মক্কান্তং পরমেশ্বরী
সৈন্ধবাখ্যো মহাদেশঃ পর্ব্বতে তিষ্ঠতি প্রিয়ে॥"
শক্তিসঙ্গম তন্ত্র—৭ম পটল।

(২১) গুর্জ্জর—গুজরাট প্রদেশ।

(২২) মল্ল,

(২৩) সৌরাষ্ট্র—দাক্ষিণাপথ দেশ,

"কোঙ্কনাৎ পশ্চিমং তীর্থং সমুদ্র প্রান্ত গোচরম্।
হিঙ্গুলাজন্তকো দেবি দশ যোজন দেশতঃ॥"
শক্তিসঙ্গম তন্ত্র—৭ম পটল।

(২৪) গান্ধার—উদীচ্য দেশ, বর্ত্তমান কান্দাহার।

(২৫) আভীর উদীচ্যদেশ,

"শ্রীকোঙ্কনাদধোভাগে তাপীতঃ পশ্চিমে পরে।
আভীরো দেশো দেবেশি বিন্ধ্য শৈলে ব্যবস্থিতঃ॥"

(২৬) বিরাট—"বৈদর্ভ দেশাদূর্দ্ধঞ্চ ইন্দ্রপ্রস্থাচ্চ দক্ষিণে।
মরুদেশাৎ পূর্ব্বভাগে বৈরাটঃপরিকীর্ত্তিতঃ।"
শক্তি সঙ্গম তন্ত্র—৭ম পটল।

(২৭) খাম্বাজ—কাম্বোজ প্রদেশ।

(২৮) মরু—

"গুর্জ্জরাৎ পূর্ব্বভাগে তু দ্বারকাতো হি দক্ষিণে।
মরুদেশো মহেশানি উষ্ট্রোৎপত্তি পরায়ণঃ॥"
শক্তিসঙ্গম তন্ত্র—৭ম পটল।

(২৯) মোবাড়—

(৩০) কুন্তল—কামগিরে সমারভ্য দ্বারাকান্তং মহেশ্বরি।
শ্রীকুন্তলাভিধো দেশো তুণং শৃণু মহেশ্বরি॥"
শক্তিসঙ্গম তন্ত্র—৭ম পটল।

কলিঙ্গ (৩১), তৈলঙ্গ (৩২), অন্ধ (৩৩), কোকন (৩৪), পুলিন্দ (৩৫), মুলতান (৩৬), প্রভৃতি দেশোৎপন্ন সুরবিশেষ।

উপর্যোক্ত রাগিণী সকল ব্যতীত, গৌড় বাঙ্গালী, প্রভৃতি কয়েকটি অন্য প্রদেশোৎপন্ন রাগিণী প্রভৃতি দেখা যায়।

ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তস্থিত ও দাক্ষিণাত্যপ্রদেশ সকলের নামীয় সুর সকলের মধ্যে, খাম্বাজ নামে একটি রাগ দেখা যায়। এই খাম্বাজ রাগ কাম্বোজ দেশোৎপন্ন রাগ বিশেষ হইবে। বর্ত্তমান 'কাম্বে' প্রদেশ এখন কোন কোন গ্রন্থে খাম্বাজ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

(৩১) কলিঙ্গ—দক্ষিণাপথ দেশ,

"জগন্নাথং পূর্ব্বভাগাৎ কৃষ্ণতীরান্তকং শিবে।
কলিঙ্গ দেশঃ সংপ্রোক্তো বামমার্গপরায়ণঃ॥"

শক্তি সঙ্গম তন্ত্র—৭ম পটল।

(৩২)—"শ্রীশৈলান্ত সমারভ্যঃ চোলেশান্মধ্যভাগতঃ।
তৈলাঙ্গ দেশো দেবেশ ধ্যানাধ্যায়নতৎপরঃ॥"

শক্তিসঙ্গম তন্ত্র—৭ম পটল।

(৩৩) অন্ধ—জগন্নাথাদূর্দ্ধভাগ মর্ব্বাক্ শ্রীভ্রমরাত্মিকাৎ।
তাবদন্ধাভিধো দেশঃ সৌরাষ্ট্রং শৃণু সাদরম্॥"

শক্তিসঙ্গম তন্ত্র—৭ম পটল।

(৩৪) কোকন—কঙ্কন

"অথাভ্যঙ্গং সমারভ্য কোটিদেশাদ্য মৃধ্যগে।
সমুদ্র-প্রান্ত দেশোহি কঙ্কনঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥"

শক্তিসঙ্গম তন্ত্র—৭ম পটল।

(৩৫) পুলিন্দ—উদীচ্য দেশ,

"পুলিন্দাশ্মক জীমূত নয়রাষ্ট্র নিবাসিনঃ।
কর্ণাটাঃ কম্বোজা ঘণ্টা দক্ষিণাপথ বাসিনঃ॥" ১৪

গরুড়পুরাণ, ৫৫ অধ্যায়।

(৩৬) মুলতান—

করতোয়াং সমারভ্য হিঙ্গুলাজান্তকং শিবে।
মুলতান দেশো দেবেশ মহাম্লেচ্ছ পরায়ণঃ॥"

শক্তিসঙ্গম তন্ত্র—৭ম পটল।

পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ সকল বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া দেখিলে এবং পাঞ্জাব, সিন্ধুনদের পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ সকল ও আরব সাগরের উত্তর উপকূলস্থিত প্রদেশ সকল এবং পারস্যোপসাগরের উপকূলস্থিত প্রদেশ সকলকে অশ্বজনক ভূমি স্থান বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান আলোচ্য কাম্বোজ প্রদেশও উপর্যোক্ত কোন স্থানের সান্নিধ্যে হওয়াই সম্ভব বলিয়া মনে করি। উৎকৃষ্ট অশ্বের জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ ছিল। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সামান্য ভাবে এতৎ বিষয়ের আলোচনা করা হইল। অতঃপর অন্য প্রবন্ধে কাম্বোজ প্রদেশের সংস্থান সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়া বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয়ের উপসংহার করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীধরণীমোহন সেন।

মৃত্যু-মাধুরী

১

সব কাজ হল সমাপন!
এস এবে সাধের মরণ!
দিনে দিনে পলে পলে
দহি সদা তুষানলে
করিয়াছি কুসুম চয়ন!
তোমা শুধু করিতে বরণ!

২

যেই দিন লভিনু জনম
দেখেছিনু তোমা প্রিয়তম!
মায়ের হাসির মাঝে
তোমারি মাধুরী রাজে
কি কোমল কিবা নিরুপম!
উথালল পুলকাশ্রু মম!

৩

সেইদিন সবাকার আগে
দিনু ধরা তব অনুরাগে !
মোর যত সাধ আশা
বুক ভরা ভালবাসা
কি অতুল আদরে সোহাগে
তোমা শুধু পূজিবারে জাগে !

৪

তারপর নিমেষে নিমেষে
হেরিয়াছি তোমা কত বেশে !
ও অধর লালিমায়
ফাগ্ খেলে উষা হায় !
পাখী গায়—প্রাণে যায় ভেসে।
কি কহিছ তুমি সখা এসে !

৫

কুসুমের বিকচ শোভায়
তুমি হাস আমারি হিয়ায় !
সুরভিত সমীরণ
বহে তব পরশন
করে মোরে কি উদাস হায় !
পলকেতে ভুলি আপনায় !

৬

দেখা দেয় তরুণ তপন
তব রূপে হয়ে বিমোহন !
তা'রি ঢেউ বারে বারে
উথলে গো চারি ধারে
করি বিশ্বে বিমল শোভন !
বুঝি মোরে করে অন্বেষণ !

৭

সুনিঝুম মধ্যাহ্নে সন্ধ্যায়
ডুবি আমি তব স্তব্ধতায় !
হাসে শশী-তারাচয়
ভাবি এলে লীলাময় !
কি নিবিড় মিলন নিশায় !
আঁধারে অথবা জ্যোছনায় !

৮

অসীম আকাশ-পারাবার
দেয় মোরে তব সমাচার !
মেঘদলে বীচিদলে
তোমারি আসন ঝলে !—
বজ্ররবে ঝটিকায় আর
বাণী তব বাজে চমৎকার !

৯

এমনি—এমনি প্রেমময় !
তব প্রেমে ভরা এ হৃদয় !
ভুবন ভুলিবে যবে
তুমিতো আমারি রবে
শুধু এক শরণ নিলয়
ঘুচাইতে দুখ ব্যথা ভয় !

১০

পথ চেয়ে বসে আছি নাথ,
কর আজি কৃপা-আঁখি পাত !
নবীন সফলতম
হবে এ জীবন মম
যোবে চির-অমিয়-প্রভাত
তোমারি মিলনে অকস্মাৎ !

শ্রীজীবেন্দ্র

হরিদ্বারে কুম্ভ মেলা

প্রতি বৎসরই অশোক অষ্টমী তিথিতে কালীঘাটে মহানির্ব্বাণ মঠে (২৯ নং মনোহরপুকুর রোডস্থিত বাগানবাড়ীতে) আরাধ্যতম শ্রীশ্রীমৎ অবধূত ৺জ্ঞানানন্দ দেবের আবির্ভাব উপলক্ষে মহোৎসব হইয়া থাকে। এ বৎসর, বাং ১৩২১, ১০ চৈত্র বুধবার অশোকাষ্টমী দিবস, পুণ্যভূমি কালীঘাট মহানির্ব্বাণ মঠে উপনীত হইয়া মহোৎসব দর্শনে নয়ন সার্থক করিলাম। উক্ত মঠে শ্রীশ্রী৺অবধূত মহারাজের দেহ সমাহিত করা হইয়াছে এবং সমাধিস্থানের উপর এক প্রকাণ্ড মন্দির নির্ম্মিত হইতেছে। শ্রীশ্রী দেবের সন্ন্যাসী শিষ্যগণ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া সহস্র সহস্র মুদ্রাব্যয়সঙ্কুল যে বিরাট কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহা ভাবিয়া অবাক্ হইলাম। মন্দিরের কার্য্য তাঁহাদের আরাধ্যতম দেবতা শ্রীশ্রী৺জ্ঞানানন্দ দেবই সমাধান করিবেন এরূপ স্থির নির্ভর রাখিয়া মাত্র কয়েক সহস্র সংগৃহীত মুদ্রা হাতে লইয়া প্রথমতঃ কার্য্য আরম্ভ করেন। গুরুপদে এরূপ অবিচলিত নির্ভরতা সংসারী জীবের পক্ষে শিক্ষনীয় বটে।

উৎসব সমাহিত হইল। দেখিলাম তাহার কয়েক দিন পরে ৺অবধূত মহারাজের কতিপয় সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ শিষ্য কুম্ভ মেলা উপলক্ষে হরিদ্বার গমনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। আশ্রম-মাহাত্ম্যে ও সাধুসঙ্গের ফলে আমিও তাঁহাদের অনুগামী হইব স্থির করিলাম। ১৭ই চৈত্র বুধবার—হাবড়া ষ্টেশনের জনসঙ্ঘ ভেদ করিয়া লক্ষ্ণৌ এক্স্প্রেসে (Lucknow Expressএ) হরিদ্বার অভিমুখে রওয়ানা হইলাম। আমার মত দুস্থ পরিবারস্থ যুবক এ কার্য্যে প্রণোদিত হইয়া যে শুধু সংসারানভিজ্ঞতারই পরিচয় প্রদান করিয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। সে যাহা হউক পরদিন আমরা কাশী ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া তথা হইতে জনৈক জমিদার মহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। প্রাগুক্ত আশ্রম হইতে আর কয়েকজন ভক্তের হরিদ্বারে আসার কথা স্থিরীকৃত ছিল। আমরা তাঁহাদের অপেক্ষায় কাশী অবস্থান করিতে লাগিলাম। ২০ চৈত্র আমাদের বন্ধুগণ আসিয়া আমাদের সঙ্গে মিলিত হইলেন। আমরা কাশী থাকিয়া অন্নপূর্ণা, বিশ্বেশ্বর, কেদারনাথ, বীরেশ্বর, তিলভাণ্ডেশ্বর, সঙ্কটা, বিশালাক্ষী, দুর্গাদেবী প্রভৃতি দেবতা এবং কেদারঘাট, দশাশ্বমেধ ঘাট, অসিসঙ্গম, মণিকর্ণিকা ঘাট প্রভৃতি দর্শন করিলাম। বারাণসীর বিবরণ বিবৃত করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয় এ জন্য আমরা কোন কথার উল্লেখ করিব না।

২২শে চৈত্র দিবা ১১টার গাড়ীতে আমরা কাশী হইতে রওয়ানা হইলাম। ষ্টেশনে শুনিতে হইলাম ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষগণ লাকসার জংশনে সশস্ত্র সৈন্যের সমাবেশ করিয়া যাত্রীগণের হরিদ্বার গমনে বাধা প্রদান করিতেছেন। আমরা এরূপ অর্থশূন্য জনরবে আস্থা স্থাপন করিতে পারিলাম না। কারণ রাজপুরুষগণ যে কুম্ভমেলা বন্ধ করিবেন না ইহা আমাদের সকলেরই মনে দৃঢ়বিশ্বাস ছিল। বিগত বাং ১৩১৮ কার্ত্তিক মাসে সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে কুরুক্ষেত্রের সম্মিলিত মেলায় যোগদান করিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম যে, গবর্ণমেণ্ট অগণিত যাত্রীগণের সুবিধা কল্পে কি সুন্দর ব্যবস্থাই করিয়াছেন। সুতরাং হরিদ্বারের যাত্রীগণের অবস্থানের ব্যবস্থা না করিয়া যে, কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহাদের গতিরোধ করিবেন ইহা আমার কিছুতেই ধারণা হইল না। গাড়ীতে বসিয়া আমরা চতুঃপার্শ্বস্থ স্থানসমূহ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। আম্রকানন, পলাশবন, তৃণগুল্মবর্জ্জিত বিস্তৃত নীরস ক্ষেত্রসকল আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল। অনন্তর অপরাহ্ন ৩ ঘটিকার সময় আমরা অযোধ্যায় উপনীত হইলাম। অযোধ্যায় একদিন মাত্র থাকিয়া দেবমন্দির প্রভৃতি দর্শন করিয়া প্রাণে যে এক অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম তাঁহার স্মৃতি চিরজাগরূক রহিবে। প্রসঙ্গতঃ অযোধ্যার কিঞ্চিৎ বিবরণ বিবৃত করিব।

আমরা তপস্বী রামজীর ছাউনীতে (মঠে) উপনীত হইয়া তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। যাহারা স্ত্রীলোক সহ আইসেন তাঁহাদের পক্ষে পাণ্ডার বাড়ীতে কিংবা ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লওয়াই সঙ্গত। এখানে আমরা একজন ভক্ত বাবাজীর সঙ্গ প্রাপ্ত হইলাম। তিনি বিনয়ী ও মধুরভাষী। তাঁহার উপদেশ মতে আমরা একটুকু বিশ্রাম করিয়া দেবমন্দির ও দর্শনীয় স্থান-সমূহ দর্শন করিতে রওয়ানা হইলাম। তিনি আমাদিগকে প্রথমতঃ হনুমানজীর মন্দিরে লইয়া গেলেন। এই মন্দির সমধিক প্রসিদ্ধ। এখানে আসিয়া প্রথমতঃ রামসেবক হনুমানজীর মন্দিরই দর্শন করিতে হয়। মন্দিরের সম্মুখে নাটমন্দির। তাহাতে রামায়ণ পাঠ হইয়া থাকে। মন্দিরের সন্নিহিত এক অত্যুচ্চ অট্টালিকার ছাদে উঠিয়া আমরা অযোধ্যার দৃশ্য নয়ন ভরিয়া দেখিয়া লইলাম। পুণ্যতোয়া সরযু নদী অযোধ্যার তিন দিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। দক্ষিণে সুরম্যমনি পর্ব্বত গম্ভীর ভাবে অবস্থিত আছে। এবং তন্মধ্যে রমণীয় বন উপবনে পরিশোভিতা অযোধ্যানগরীকে ধনাঢ্যের হর্ম্ম্যমালায় ও রাজন্যবর্গের প্রতিষ্ঠিত মন্দির সমূহে বিজড়িত দেখিয়া প্রকৃতই সমৃদ্ধিশালিনী মনে হইল। হনুমানজীর মন্দির দর্শন করিলাম। তৎপর রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্নের জন্মস্থান নিরীক্ষণ করিলাম। এ সকল স্থান এক একটি অনুচ্চ টীলায় পরিণত রহিয়াছে। তাহাতে মাত্র কতিপয় তরু বিরাজমান থাকিয়া ভারতের স্মরণাতীত কালের কথা হৃদয়ে জাগাইয়া তুলিতেছে। তৎসান্নিধ্যে কৌশল্যাগার, কৈকেয়ীভবন ও কৌশল্যাঘাট দর্শন করিলাম। অযোধ্যার পশ্চিমপ্রান্ত বিধৌত করিয়া যে সরযু নদী প্রবাহিত হইয়াছে তাহারই তীরে কৌশল্যাঘাট। এখানে আসিয়া সান্ধ্য সমীরণে দিবসের সমস্ত ক্লান্তি দূর করিলাম। অঞ্জলিপূর্ণ স্বচ্ছবারি পান করিয়া জীবন ধন্য করিলাম। অতঃপর আমরা নদীপ্রান্ত পশ্চাতে রাখিয়া নগরে প্রবেশ করতঃ দশরথতনয়গণের বাল্য-ক্রীড়ার স্থান, রামচন্দ্রের রাজপাট, কনকভবন ও মধুকুঞ্জ প্রভৃতি স্থান দর্শন করিলাম এবং রজনীর প্রথমভাগে ছাউনীতে ফিরিয়া আসিলাম। পরদিন আমরা পূতসলিলা সরযুনীরে স্নান করিলাম। এই স্থান রাম ঘাট নামে প্রসিদ্ধ। মধ্যাহ্নে আমরা মঠে প্রসাদ পাইলাম। তৎপর বিশ্রামান্তে অপরাহ্ন ৩ টার গাড়ীতে অযোধ্যাকে পশ্চাতে রাখিয়া অগ্রসর হইলাম।

রজনী ৭টার সময় লক্ষ্ণৌ ষ্টেশনে গাড়ী পরিবর্ত্তন করতঃ অন্য এক গাড়ীতে বসিয়া রহিলাম। ৩।৪ ঘণ্টার পর রাত্রি ১১টার সময় ঐ গাড়ী হরিদ্বার অভিমুখে যাত্রা করিল। তখন যাত্রীগণের উচ্চারিত "জয় গঙ্গা মাইকী জয়" প্রভৃতি ধ্বনি দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিল। পরদিন দিবা ২ ঘটিকার সময় গাড়ী লাক্‌সার জংসনে * আসিয়া পৌঁছিলে পর দেখিলাম হরিদ্বার যাওয়ার জন্য কতকগুলি মালগাড়ী দ্বারা একটী অতিরিক্ত ট্রেণ প্রস্তুত রহিয়াছে। আমরা তাড়াতাড়ি একটা মাল-গাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িলাম। এই ষ্টেশনে বহুলোকের সমাগম দেখিয়া প্রাণে কেমন এক আনন্দ অনুভব করিলাম। তখন আমরা হরিদ্বারে পৌঁছিবার অবশিষ্ট সময়টুকুর জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলাম। দেখিতে দেখিতে গাড়ীও বেলা ৪টার সময় হরিদ্বার আসিয়া উপনীত হইল। আর যাত্রীগণের সঙ্গে আমরাও ফটক পার হইয়া নগরের দ্বারদেশে প্রবেশ করিলাম। সেখানে পদার্পণ করিয়াই দেখিতে পাইলাম কেবল লোকের পর লোক, তারপর লোক। এই দৃশ্য দেখিয়া আমার প্রাণ নাচিয়া উঠিল। আমি ভক্তিভরে পুণ্য-ভূমি হরিদ্বারের রাজপথস্থিত ধূলিকণা মস্তকে ধারণ করিলাম।

* লাকসারকে এতদঞ্চলের অধিবাসীগণ লুকসার বলিয়া থাকে। ইংরেজীতে এইস্থান লাক্‌সার নামে অনূদিত হইয়াছে।

আমরা নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ না করিয়া পাঞ্জাবী সাধুগণের শিবিরে চলিয়া গেলাম। ইঁহারা নানকপন্থী নির্ম্মলা সম্প্রদায় ভুক্ত। ইঁহাদের সৌজন্য ব্যবহার ও প্রণয় সম্ভাষণ অতি চমৎকার। যেস্থানে তাঁহারা ছাউনী করিয়াছিলেন উহা রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট ও শৈবালিক পর্ব্বতের পাদমূলে অবস্থিত। স্থানটি অতি মনোরম, অতি বিস্তীর্ণ ও আম্রকাননে শোভিত। এখানে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মিত হইয়াছে। একজন পাঞ্জাবী সাধু আমাদের জন্য একটী কুটীর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। যে কুটীরে প্রবেশ করেন তাহাতেই সাধু সন্ন্যাসীর সমাবেশ দেখিতে পান। অবশেষে ভাগ্যক্রমে একটী শূন্য কুটীর প্রাপ্ত হইলেন। আমরা কাল বিলম্ব না করিয়া স্ব স্ব আসবাব সহ সেই কুটীরে যাইয়া শয্যা রচনা করিয়া ফেলিলাম। যে সম্প্রদায়ের কথা বলিতেছি তাঁহাদের কনখলে প্রকাণ্ড আশ্রম রহিয়াছে। হরিদ্বারের মেলার জন্য তাঁহারা এই স্থানে ছাউনী করিয়াছেন। এস্থানটী তাঁহাদেরই আশ্রমের সম্পত্তি। বহু সাধু সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী ও পাঞ্জাবী গৃহী নরনারী এই ছাউনীতে আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। কুম্ভমেলা উপলক্ষে এই ছাউনীর মত বিভিন্ন মঠের মহান্ত কর্ত্তৃক আরো কতক-গুলি ছাউনী সংস্থাপিত হইয়াছে। নানা সম্প্রদায়ের সাধু সজ্জন সেই সকল স্থানে আশ্রয় ও আহার্য্য প্রাপ্ত হইয়া পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছেন। আমরা প্রথমোক্ত নির্ম্মলা ছাউনীর কার্য্য বিবরণী সংক্ষেপতঃ লিপি করিব। পাঠক ইহা হইতেই অন্যান্য ছাউনীর কার্য্য কল্পনা করিয়া লইতে সক্ষম হইবেন।

যে সুবিস্তৃত ময়দানে নির্ম্মলা সম্প্রদায়গণ ছাউনী করিয়াছেন সেই স্থানে প্রবেশ করিয়াই দেখিতে পাইলাম একটি সুদীর্ঘ দণ্ডের শিরোভাগে তাঁহাদের গৈরিক ধ্বজা উড়িতেছে। তৎপার্শ্বে একটী চন্দ্রা-তপের নিম্নে সুসজ্জিত চতুর্দ্দোলায় গ্রন্থসাহেব রক্ষিত আছেন, এবং সম্মুখে শতরঞ্চের উপরে বহু পাঞ্জাবী মিলিত হইয়া ভজন করিতেছেন। প্রত্যহ প্রাতে এই চতুর্দ্দোলা প্রাঙ্গনে আনা হয়। এবং সমস্ত দিন ভজন সঙ্গীতাদিতে সময় অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যারতির পর পুনরায় গ্রন্থ সাহেবকে মন্দিরে লইয়া যাওয়া হয়। ছাউনী-প্রাঙ্গনের মধ্যভাগে এক ধারে পাকশালা নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহাতে সহস্র সহস্র লোকের ভোজনের রন্ধন কার্য্য চলিতেছে। মধ্যাহ্নে 'বিগল' শাঙ্গিতে আরম্ভ হইল, অমনি দলে দলে কুটীরস্থ লোক আসিয়া 'পুঙ্গ' করিয়া বসিয়া গেলেন। রমণীগণের জন্য অদূরে এক স্থান নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। তাহাতে বেড়া দেওয়া আছে। সকলে বসিয়া গেলে এক একটী শালপত্র দেওয়া হইল। এবং প্রত্যেকের জলপাত্র, ইন্দারা হইতে আনীত সুপেয় জলে পূর্ণ হইল। এই সম্প্রদায়ের পরিবেশন প্রণালী দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। প্রচুর পরিমাণে রুটী, অন্ন, শাক, ডাউল পরিবেশকগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইতেছে। কাহারো মুখে কথা নাই। নীরবে সব কার্য্য সমাহিত হইতেছে। কয়েকজন তত্ত্বাবধায়ক কাহারো কোন দ্রব্যের অভাব দেখিতে পাইলে পরিবেশককে ইঙ্গিত করেন। পরিবেশক নীরবে তাহাকে ঈপ্সিত দ্রব্য দিয়া যান। দেখিলাম কাহাকেও কোন দ্রব্য চাহিয়া লইতে হয় না। চাহিবার পূর্ব্বেই যে পরিমাণে আহার্য্য প্রদত্ত হয় তাহা আহার করিয়া শেষ করা যায় না। আশ্রিতগণের যাহাতে কোন বিষয়ে কষ্ট না হয় তৎপ্রতি ছাউনীর কর্ত্তৃপক্ষগণ দৃষ্টি রাখিতেন। সুগভীর ইন্দারা হইতে অনবরত জল উঠাইতেছেন, আশ্রিত যাত্রীগণ স্বস্ব আবশ্যকীয় জল লইয়া যাইতেছেন। একমাস কাল যাবৎ যাঁহারা সহস্রাধিক লোকের আহার বিহারের ব্যবস্থা করিলেন তাঁহারা যে কিরূপ মহৎ অন্তঃকরণের

* এ অঞ্চলে নিরামিষ তরকারীকে শাক বলে। তরকারী বলিলে মাংস ইত্যাদি বুঝায়।

তাহা সহজেই অনুমেয়। ইহাদের সেবাপ্রণালী দেখিয়া আমরা বিমোহিত হইয়াছি। বস্তুতঃ সাধু সন্ন্যাসীর প্রতি যে কিরূপ শিষ্টাচার করিতে হয় কিরূপ সেবা করিতে হয় তাহা ইঁহাদিগেরই আচরণে বুঝিতে পারিলাম।

আমরা হরিদ্বারে যে সকল দর্শনীয় স্থান দর্শন করিলাম তাহার বর্ণনা একে একে করিতেছি। আমরা প্রথমতঃ গঙ্গা-দর্শনে চলিলাম। প্রেমবিনোদিনী গঙ্গাদর্শনেই নয়ন শীতল হইল। নদীর উভয় তীরে বহুলোকের সমাগম আমরা ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিতে গেলাম। ব্রহ্মকুণ্ড নাম শুনিয়া কেহ মনে করিবেন না যে ইহা একটী কুণ্ডবিশেষ. গঙ্গার যে স্থান ব্রহ্মাবর্ত্ত ঘাট নামে অভিহিত সেই স্থানই ব্রহ্মকুণ্ড বলিয়া জানিবেন। এই ঘাটে স্নানের বিশেষত্ব আছে। হরিদ্বারে কুম্ভ মেলায় যে সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম হয় তাঁহারা ব্রহ্মকুণ্ডেই স্নান করিয়া থাকেন। এখানে গঙ্গার জল খুব শীতল। নদীর স্রোত প্রবলতর।

হরিদ্বারের অনতিদূরে কনখল সহর বিদ্যমান। বলিতে গেলে হরিদ্বার ও কনখল একই ক্ষেত্র। কনখল প্রজাপতি দক্ষের বাসভবন ছিল। সেখানে গিয়া আমরা দক্ষ প্রজাতির যজ্ঞ ক্ষেত্র, দক্ষেশ্বর শিব ও সতীকুণ্ড দর্শন করিলাম। যে স্থানে সতী পতির নিন্দা শ্রবণে দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন তাহাই এক্ষণ সতীকুণ্ড নামে অভিহিত। তৎপর আমরা নাগা সন্ন্যাসীগণের ছাউনী দর্শন করিতে গেলাম। এখানে জটাজুটধারী ভস্মাচ্ছাদিত নগ্ন সন্ন্যাসী দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। তাহাদের বিরাট মূর্ত্তি স্নিগ্ধ চাহনি দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম এক একটী মূর্ত্তি যেন গাম্ভীর্য্যের প্রতি-মূর্ত্তি। এইস্থানে আসিয়া মনে হইল যেন আমরা আর এক নূতন জগতে প্রবেশ করিয়াছি। কনখল হইতে কুটীরে প্রত্যাবর্ত্তন কালে পথিপার্শ্বে একস্থানে অবধুত আশ্রম বা চেতন মঠ দর্শন করিলাম। আর একস্থানে দেখিলাম বৃহৎ প্রাঙ্গনের মধ্যস্থলে নিশান উড়িতেছে এবং চারিদিকে সন্ন্যাসীগণ বসিয়া রহিয়াছে। কনখলে যে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম রহিয়াছে তাহাও দেখিতে পাইলাম।

হরিদ্বারে ব্রহ্মকুণ্ডের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এখন অন্যান্য স্থানের কাহিনী বলিব। ব্রহ্মকুণ্ডের অর্দ্ধক্রোশ উত্তরে ভীমগড়া হৃষিকেশ যাওয়ার পথে অবস্থিত। এখানে পঞ্চপাণ্ডবের মূর্ত্তি রহিয়াছে। ভীমগড়াসম্বন্ধে প্রবাদ এই যে যখন পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদী সহ স্বর্গে যাত্রা করেন তখন এস্থলে ভীমসেনের অশ্বের ক্ষুরাঘাতে এই কুণ্ডের সৃষ্টি হয়। ভীম গড়ায় যাত্রীগণ স্নান করিয়া থাকেন। কুণ্ডের তীরে ভীমেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত।

হরিদ্বারে গঙ্গার সপ্তধারা, বিল্বকেশ্বর শিবলিঙ্গ চণ্ডী পাহারস্থিত চণ্ডীদেবী প্রভৃতি স্থান দর্শন যোগ্য গঙ্গার সপ্তধারা সম্পর্কে পৌরাণিক ইতিহাস এই— ভগীরথ তপস্যা করিয়া গঙ্গাকে ভূতলে আনয়ন করেন। গঙ্গা বহু যোজন অতিক্রম করিয়া অবশেষে এই স্থানে উপনীত হইলেন। এই স্থানে মরীচি প্রভৃতি সপ্তঋষি তপস্যা করিতেছিলেন। ভগীরথের শঙ্খধ্বনি শুনিয়া গঙ্গা আনন্দে উচ্ছলিত হইয়া নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হন শঙ্খধ্বনিতে মায়ের আনন্দ দেখিয়া সপ্তর্ষিগণ একস্থানে সপ্ত শঙ্খের ধ্বনি করিয়া উঠিলে। গঙ্গা তখনই আনন্দে সপ্তধারায় বিভক্ত হইয়া সপ্তদিকে প্রবাহিত হইলেন। শৈবালিক পর্ব্বতের একটি শৃঙ্গদেশে বিল্বকেশ্বর মন্দির অবস্থিত। এখানে বিল্ব, আমলকি ও নিম্ব বৃক্ষ আছে। স্থানটী অতি নির্জ্জন ও মনোরম। জাহ্নবীর অপর কূলে চণ্ডী পাহাড়ের শৃঙ্গ প্রদেশে চণ্ডী মন্দির বিনির্ম্মিত। এই পর্ব্বতে মনসা দেবী, অন্নপূর্ণা মাতা এবং অঞ্জনা দেবীও বিরাজিতা! হরিদ্বারে আসিয়া প্রত্যেকেই

কুশাবর্ত্ত ঘাটে স্নান করিয়া থাকেন। ইহাতে তর্পণ ও পিতৃপুরুষের পিণ্ডদানের বিশেষ মাহাত্ম্য আছে।

পূর্ব্বে দুই একটী ছাউনীর কথা বলিয়াছি। এখন আবার কয়েকটী ছাউনীর উল্লেখ মাত্র করিব। হরিদ্বারে গঙ্গাতীরে শ্রীমদ্ ভোলাগিরিরাজার আশ্রম। তিনি বঙ্গদেশে অনেক বাঙ্গালী নরনারীকে দীক্ষা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দুইটী ধর্ম্মশালা আছে। স্বামিজী ধর্ম্মশালায় দাতব্য চিকিৎসালয় খুলিয়াছেন। তিনি বহুতর খড়ের কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। তন্মধ্যে বহু যাত্রী আশ্রয় পাইয়াছেন।

গোরক্ষপুরের শ্রীশ্রী ৺গোরক্ষ বাবার মন্দিরের মহান্ত সিদ্ধযোগী শ্রীশ্রী গম্ভীরানাথ বাবা এখানে আসিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাকে দেখিতে যাই। তাঁহার স্থির ও গম্ভীর মূর্ত্তি ভুলিতে পারিব না। এই মহাপুরুষ নাথ সম্প্রদায়ের যোগী। গম্ভীরা নাথ বাবা অনেক বাঙ্গালীকে কৃপা করিয়াছেন। ইনি অতি গোপনে ছিলেন। প্রভুপাদ ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ই তাঁহাকে লোক সমাজে বিদিত করেন।

আলেক সম্প্রদায়ের নাগা ভিক্ষুকগণ ভৈরব আখরায় নাগা সন্ন্যাসীগণের সঙ্গে আছেন। কুমিল্লায় আলেক সম্প্রদায়ের একজন সন্ন্যাসী বাস করিতেন। তাঁহার নাম মোহনগীর আলেক বাবা। একদিন হরিদ্বারে গঙ্গাতীরে একাকী ভ্রমণ করিতেছি এমন সময় তাঁহার দর্শন পাইলাম। তিনি আমাকে দেখিয়াই আনন্দে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং পরদিন ভৈরব আখরায় যাইয়া তাঁহার সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন। প্রথমতঃ নাগা সন্ন্যাসীগণের রুদ্র মূর্ত্তিদর্শনে অন্তঃকরণে ভীতির সঞ্চার হয়। কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে মিশিয়া তাঁহাদের প্রেমপ্রবণ হৃদয় দেখিয়া আমাদের কঠিন হৃদয়ও ক্ষণকালের তরে দ্রব হয়।

৩০শে চৈত্র মঙ্গলবার সংক্রান্তি ও অমাবস্যা তিথি। অদ্য কুম্ভ মেলার স্নান। অদ্যকার দিন বিশেষ সমারোহের দিন। এই দিনে ব্রহ্মকুণ্ডে সাধুসন্ন্যাসী স্নান করিয়া থাকেন। ২৯শে চৈত্র রাত্রি ৩ ঘটীকার সময় হইতে ৩০শে চৈত্র বেলা ১০টা পর্য্যন্ত গৃহীদের স্নানের সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। অতঃপর সন্ন্যাসীদের স্নান। * *

ব্রহ্মকুণ্ড হইতে ১ মাইল দূরবর্ত্তী স্থান পর্য্যন্ত প্রধান রাস্তা অদ্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। স্নানার্থীগণের জন্য গঙ্গার পুল পার হইয়া পূর্ব্বপাড় দিয়া যাইয়া পরে গঙ্গার দুইটী ধারার পুল পার হইয়া পশ্চিম পাড়ে ব্রহ্মঘাটে আসিবার এবং তথায় স্নান করিয়া গঙ্গার পশ্চিমপাড় দিয়া দক্ষিণ দিকে যাওয়ার বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

গৃহস্থদের স্নান শেষ হওয়ার পর সন্ন্যাসীদের স্নান আরম্ভ হইল। সর্ব্বপ্রথমে নাগা সন্ন্যাসীগণ স্নান করিলেন। অতঃপর নিয়ম মত এক এক সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীগণ আসিয়া স্নান করিতে লাগিলেন। এই দৃশ্য যে কি সুন্দর, মনোহর ও প্রাণস্পর্শী তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীগণ দলবদ্ধ হইয়া শোভাযাত্রা করতঃ স্নানার্থ গিয়াছিলেন। বহুমূল্য পরিচ্ছদে সজ্জিত হস্তী ও মূল্যবান বস্ত্রাদি দ্বারা সজ্জিত পালকী ইত্যাদি যাত্রায় শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিল। স্নানের ঘাটে যাইবার পথ সন্ন্যাসীদলে পরিপূর্ণ। চারিদিকে অগণিত দর্শক শ্রেণী। দর্শকগণ যে যে স্থানে সুবিধা পাইতেছেন সেই স্থানে আসিয়া দেখিতেছেন। কেহ অনাবৃত স্থানে কেহ দালানের ছাদের উপর কেহ গাছের উপর কেহ পর্ব্বতোপরি থাকিয়া এই মহান দৃশ্য দর্শন করিয়াছিল। সন্ন্যাসীদের মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে বাদ্য হইতেছিল। এক এক দল স্নান করিয়া যান আবার অন্যদল আসিতে থাকেন। এই ভাবে সমস্তদিন স্নান চলিল। নাগা সন্ন্যাসী দলের মিছিল, নির্ব্বাণী সম্প্রদায়ের মিছিল ও নানক পন্থী সম্প্রদায়ের মিছিল অতি সুন্দর হইয়াছিল। নানক পন্থী সম্প্রদায়ের মিছিলে ১৬টী হাতী এবং অনেকগুলি শিবিকা ছিল। হাতী ও শিবিকা বহুমূল্য

বস্ত্রাদি দ্বারা সজ্জিত হইয়াছিল। এই সম্প্রদায়ের মিছিলে ব্যাণ্ড বাদ্য ছিল। মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে বাদ্য সহকারে ভজন সঙ্গীত হইতেছিল। এই মিছিল অপরাহ্ন ৩টা কি ৩॥০টার সময় বাহির হইয়াছিল এবং সন্ধ্যায় সময় ব্রহ্মকুণ্ডে পৌঁছিয়াছিল। নির্ব্বাণী সম্প্রদায়ের মিছিলেও ১৬টী হাতী ছিল। অদ্যকার দিন অবিচ্ছিন্ন আনন্দ উৎসবের দিন। আজ নরনারী পুণ্য ভূমি হরিদ্বারে সমবেত হইয়া পুণ্যসলিলা জাহ্নবী তীরে যে কি অসীম আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ভারতভূমি ধন্য যে এই পুণ্য-ভূমিতে এমন পুণ্য উৎসব আছে। হরিদ্বার ধন্য যে এই পুণ্য তীর্থে কুম্ভ মেলা হয়। কুম্ভমেলা ধন্য যে এই উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ বিষয়বিমুক্ত মহাপুরুষ ও সাধকমণ্ডলী একত্রিত হইয়া বিশ্বের কল্যাণ সাধন করেন। এহেন ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন শুদ্ধ প্রেমিক ও জীবন্মুক্ত সন্ন্যাসীগণ যে স্থানে সমবেত হন তাহা অপেক্ষা পুণ্যক্ষেত্র আর কি আছে? যে শুভক্ষণে শুভযোগে এই মহাপুরুষগণ মিলিত হন তাহা অপেক্ষা শুভক্ষণ ও শুভযোগ আর কি আছে? এই মহাপুরুষদের পবিত্র নিশ্বাসপ্রশ্বাসে এই পুণ্যক্ষেত্র পবিত্র হইয়া উঠে—ইঁহাদের পাদস্পর্শে ধূলি পবিত্র হয়। ইঁহাদের সাধনায় শক্তিতে ত্রিভুবন শক্তিশালী হয়।

পুণ্য ক্ষেত্র হরিদ্বারের প্রাকৃতিক শোভা অতুলনীয়। পুণ্যতোয়া জাহ্নবী-তীরে দাঁড়াইয়া একদিকে তাঁহার চিত্তবিনোদিনী বীচিমালা ও অপর দিকে তরঙ্গায়িত ভূধর-শোভা নিরীক্ষণ করিলে অন্তঃকরণে এক মহান ভাবের উদয় হয়। তখন আনন্দ-নয়নে এক বিরাট মহাপুরুষের চিত্র উদ্ভাসিত হয়।

হরিদ্বার যে অতীব প্রাচীন স্থান তাহাতে কোন সংশয় নাই। কাশীখণ্ড মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন পৌরাণিক গ্রন্থেও ইহার প্রাচীনত্বের নিদর্শন রহিয়াছে। বিভিন্ন গ্রন্থে হরিদ্বারের বিভিন্ন নাম দৃষ্ট হয়। উহাকে হরিদ্বার, গঙ্গাদ্বার, মায়াপুর প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

পূর্ব্বে যে ভৈরবী আখরার উল্লেখ করা হইয়াছে সেইস্থানে "মায়াদেবী" অধিষ্ঠিত আছেন। দেবীর নাম অনুসারে হরিদ্বারের নাম মায়াপুর হওয়া বিচিত্র নহে। হরিদ্বারের স্নানের যে বিশেষ মাহাত্ম্য আছে তৎসম্বন্ধে মহাভারতগ্রন্থ যাহা বলিতেছে আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণের নিকট বিদায় লইব। মহাভারতে লিখিত আছে—

"গঙ্গাদ্বারে কুশাবর্ত্তে বিল্বকে নীলপর্ব্বতে।
তথা কনখলে স্নাত্বা ধূতপাপ্মা দিবং ব্রজেৎ॥
"ততঃ কনখলে স্নাত্বা ত্রিরাত্রোপোষিতোনরঃ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি স্বর্গলোকঞ্চ বিন্দতি॥"

শ্রীমণীন্দ্রকিশোর সেন।

বর্ষারাণী

সুনীল বসনা—কে গো বরষার রাণী?—
তপোবনে অবিরল
ঢালিতেছ শান্তিজল
সঙ্গে ও কে—"প্রিয়ম্বদা?"—কি আশার বাণী!

কাঁকালে কলসী কাল—জলদ-ভৃঙ্গার!
নয়নে বিজলী জ্বলে
কদম্বের মালা গলে
কানে কুন্দ: কেতকীর কাঁকণ শৃঙ্গার!

উটজবাসিনী! ওগো কুটজকুন্তলে!
কণ্ঠে কাকলী গীতা
অলকে অপরাজিতা
তুমি কি কণ্বের কন্যা——"হলা শকুন্তলে?"

শ্রীকুলচন্দ্র দে।

খাড়া সুমতি ব্রত

ব্রতের নিয়ম ঃ—প্রত্যুষে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ব্রতিনীগণ নিদ্রা হইতে উঠিয়া পূজার বাড়ীতে মিলিত হন। তৎপর পূজোপকরণগুলি সজ্জিত করিয়া একটী শিলনোড়ার (পুতার) সম্মুখে স্থাপন করেন। নোড়াটিতে সিন্দুর দিয়া ৫টী কিম্বা ৭টী ফোটা দিতে হয়। সকল ব্রতিনীই দণ্ডায়মান হইয়া থাকেন। একজন ব্রতিনীকে কুলায় পান সুপারী রাখিয়া সেই কুলাটী মাথায় করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। যিনি ব্রতের কথা বলিবেন. তাঁহাকে দূর্ব্বা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়াই কথা বলিতে হয়। পূজোপকরণ পান, সুপারী, খয়ের, চুণ, সাদা (তামাকপাতা), তৈল, সিন্দুর, চিনিবাতাসা। ব্রতের কথা বলা শেষ হইলে, তৈল, সিন্দুর, পান প্রভৃতি পূজার প্রসাদ রূপে গ্রহণ করা হয়। সকল মাসে এবং সকল বারেই এই পূজা করা যায়।

ব্রতের কথা ঃ—এক দেশে এক গোপদম্পতি বাস করিত। তাহাদের একটী পুত্র ছিল। পুত্রটী বিবাহিত তাহারও একটী পুত্র জন্মিয়াছিল। একদিন গোপ-পত্নী আত্মীয়-বাড়ীতে বেড়াইতে যাইবার সময় পুত্রবধূকে বলিয়া গেল যে "আমি কুটুমবাড়ী যাই। তুমি কাইল বিহানে উইঠ্যা আসিবাসি ছাইরা খোল মাখন টান দিও, বন্দুলাগ লাইগা ভাত রাইন্ধ" (১) গোপপত্নী এই কথা বলিয়া আত্মীয়বাড়ী চলিয়া গেল। তৎপর দিন বধূ সকালে উঠিয়া দেখে যে, খাড়া সুমতি ঠাকুরাণী তাহাদের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং তাহাকে বলিতেছেন যে, "তুই আমারে এট্টু পান হাদা দে। আমি খাইয়া যাই।" (২) ইহা শুনিয়া বধূ কহিল—"আমি হপায় ঘুমে থেইকা উঠ্‌ছি তোমার লাইগা পান হাদা লইয়া বাইরইছি না অখন দিতে পারুম না।" (৩) এই কথা শুনিয়া সুমতি ঠাকুরাণী অভিশাপ দিয়া চলিয়া গেলেন। বধূ ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারে নাই। কিয়ৎক্ষণ পর বধূ সাংসারিক কাজকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া ঘরে গিয়া দেখে যে তাহার পুত্রটী বিছানায় মরিয়া রহিয়াছে। ঘোলমাখনের পাত্রসকল চূর্ণবিচূর্ণ হইয়াছে, পাত্রস্থিত সকল ঘোলমাখন মাটীতে পড়িয়া কিস্তৃত কিমাকার হইয়াছে। গোশালায় গাভীবৎস সকল মরিয়া রহিয়াছে এবং কপাট বন্ধ হইয়া রহিয়াছে। এতদ্দর্শনে বধূ ভূলুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। কতক্ষণ পরে কিছু প্রকৃতিস্থ হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "বিহানে ঐ যে বুড়া ঠাইকরাইন্ আইয়া আমার কাছে পান হাদা চাইছিল, তারে পান হাদা না দেওনে আমার উপর রাগ কইরা শাপ দিয়া গেছে।" (৪) বধূ তখন শোকে অস্থির হইয়া, আলুলায়িত কেশেই সেই ঠাকুরাণীর উদ্দেশে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "ঠাইকরাইন্ গ (গো) তুমি আমার মুখী (প্রতি) একবার ফিরা চাও। আমি তোমার লাইগা পান হাদা আনছি।" সুমতি ঠাকুরাণী বধূর এই প্রকার কাতর বিলাপোক্তি শ্রবণ করিয়া বলিলেন ? "আমি আর তর মুখী ফিরা চামু না। তয় যদি তুই নগর থেইকা কড়ার চুণ কড়ার পান সুপারী, চিনি বাতাসা, তেল সিন্দুর আইনা পাড়া পড়শী ডাইকা আইনা আমার পূজা করস্, তা অইলে তর যা যা নষ্ট অইছে সব হুনা অইব। তর পোলা বাইচা উঠব। গরুগুলা বাইচা উঠব। বাইট ঘরের দরজা

(১) কাইল—আগামীকল্য। বিহানে—প্রাতঃকালে উইঠ্যা—উঠিয়া। আসিবাসি—স্ত্রীলোকদের প্রাতঃকালীন গৃহকার্য্য। ছাইরা—শেষ করিয়া। টান দিও—মন্থন করিও। বন্দুলা—যাহারা দাসত্ববৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে। লাইগা—জন্য। রাইন্ধ—রন্ধন করিও।

(২) এট্টু—একটু। হাদা—তামাক পাতা।

(৩) হপায়—এখন মাত্র। থেইকা—হইতে। বাইরইছি না—বাহির হই নাই। পারুম—পারিব।

(৪) ঠাইকরাইন—ঠাকুরাণী। আইয়া—আসিয়া। চাইছিল—চাহিয়াছিল। দেওনে—দেওয়াতে। কইরা—করিয়া।

খুলবে।" (৫) এই কথা শুনিয়া বধূ অতি তাড়াতাড়ি চিনি বাতাসা প্রভৃতি পূজোপকরণ সংগ্রহ করিয়া প্রতিবেশী দিগকে ডাকিয়া আনিয়া সুমতি ঠাকুরাণীর পূজা করিল। তৎপর দেখিতে দেখিতে নষ্টদ্রব্য সকল পুনর্ব্বার দ্বিগুণ হইয়া যথাস্থানে গিয়া রহিল, পুত্রটীও পুনর্জীবিত হইল। ইহা দেখিয়া বধূ আহ্লাদে আটখানা হইয়া দাসদিগের জন্য পাক করিয়া তাহাদিগকে খাইবার জন্য ডাক দিল কিন্তু তাহারা যাইয়া খাইল না। সমস্ত দিন উপবাসীই রহিল। সন্ধ্যাকালে বধূর শাশুরী বাড়ীতে আসিয়া বধূকে জিজ্ঞাসা করিল, "ঘোল মাখন্‌ নি টান দিছ" বধূ কহিল, "দিছি" শাশুরী কহিল "বন্দুলারা নি খাইছে" বধূ কহিল "না"। (৬) তখন বধূর শাশুরী দাসদিগের নিকট গিয়া তাহাদিগকে বলিল "আমার বউ রাইন্ধা বাইরা তোমাগ খাইবার কইছে তোম্‌রা খাও নাই ক্যা।" তাহারা বলিল "তোমার বউ বিহানে জানি ক্যা কান্‌ছে, বুঝি তোমার বাড়ী কোন অমঙ্গল অইছে। তুমি তোমার বউর কাছে জাইনা আইয়া গা কিয়ের লাইগা কান্‌ছে?" ইহা শুনিয়া শাশুরী বাড়ীতে যাইয়া বধূর কাঁদিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি বিহানে কিয়ের লাইগা কান্‌ছিলা।" (৭) বধূ আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ শাশুরীর নিকট বর্ণনা করিল। শাশুরী দাসদিগের নিকট যাইয়া সব কথা আনুপূর্ব্বিক বলিল। এতচ্ছ্রবণে দাসগণ বলিতে লাগিল, "আম্‌রা একযুগ বারবছর ধইরা এই রাজার বাড়ী বন্দুলা খাট্‌বার লাগছি। সুমতি ঠাইক্‌রাইণ যদি আমাগ এই থেইকা ছাইড়া দেয়, তয় আম্‌রাও এই ঠাইক্‌রাইণের পূজা করুম্‌ (৮) তাহাদিগের ভক্তি বিশ্বাস জানিতে পারিয়া সুমতি দেবী সেই দিন রাত্রিতেই রাজবাড়ী যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং রাজাকে চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন:—"তুই যদি কাইল বিহানে বন্দুলাগ ছাইড়া না দেস্‌, তয় তর রাজ্য ছারখার অইব।" রাজা প্রভাতে উঠিয়াই ব্যস্তসমস্ত হইয়া দাসদিগকে বলিলেন, "তরা আমার রাজ্য থেইকা চইলা যা।" তাহারা মনে মনে ভাবিল:—একযুগ বার বছর ধইরা রাজবাড়ী বন্দুলা খাট্‌বার লইছি, রাজা মশয় (মহাশয়) এতদিন কিছু কয় না (কহেন না)। আইজ ক্যা কয় রাজ্য ছাইড়া বাড়ী যা।" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সুমতি দেবীর কথা তাহাদের মনে পড়িল। তখন তাহারা এই রাজার রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া দেশে চলিল। যাইবার সময়ই বাজার হইতে পান সুপারী ইত্যাদি পূজোপকরণ লইয়া পথে এক স্থানে পূজা করিতে আরম্ভ করিল। এমন সময় ৺মহাদেবের সঙ্গে নারদমুনি রথারোহণে শূন্য পথে কৈলাসে যাইতেছিলেন। এই পূজা দেখিয়া মুনিবর ৺দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, "মামা, এত সকালবেলা কোন্‌ দেবতার পূজা অয়, আমি তা দেইখা আমু।" এই বলিয়া মুনিবর রথ হইতে অবতরণ করিয়া পূজার স্থানে উপস্থিত হইয়া, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, তোম্‌রা এত সকালে কোন্‌ দেবতার পূজা করবার লইছ (করিতেছ)। এই পূজার ফল কি?" (৯) তাহারা

(৫) তর—তোর। চামু—চাহিব। তয়—তবে। কড়ার—কড়ির; পূর্ব্বে এতদ্দেশে কড়ির প্রচলন ছিল। আইনা—আনিয়া। পাড়াপরশী—প্রতিবেশী। ডাইকা—ডাকিয়া। অইলে—হইলে। অইছে—হইয়াছে। দুনা—দ্বিগুণ। বাইটঘর—গোশালা।

(৬) নি—কিনা; প্রশ্নবোধক। দিছ—দিয়াছ।

(৭) রাইন্ধা—রাঁধিয়া। বাইরা—পরিবেশন করিয়া। তোমাগ—তোমাদিগকে। কইছে—কহিয়াছে। কানছে—কাঁদিয়াছে। অইছে—হইয়াছে। জাইনা—জানিয়া। আইয়া গা—আস গিয়া। কিয়ের—কিসের।

(৮) ধইরা—ধরিয়া। খাটবার লাগছি—খাটিতেছি। আমাগ—আমাদিগকে। ছাইড়া দেয়—মুক্তি দেন। করুম—করিব।

(৯) অয়—হয়। দেইখা—দেখিয়া। আমু—আসিব।

কিহল, "সুমতি ঠাইকুরাইণের পূজা কর্‌বার লইছি। এই পূজা কর্‌লে নির্ধইনার (নির্ধনের) ধন অয় নিপুত্রার (অপুত্রকের) পুত্র অয়, যে যা বাঞ্ছা করে তার তাই অয়।' ইহা শুনিয়া নারদ বলিলেন :— "হেঁ (হাঁ) এই দেব্‌তার এই বর। আমার মামী দুর্গা যদি মামা মহাদেবকে দেইখ্যা আইল ভাইল (ওজর আপত্তি, মিথ্যা ছলনা) না করে, সোনার সিঙ্গাসন দিয়া মামাকে বইরা (বরণ করিয়া) নেয় তাইলে (তাহা হইলে) আমি এই পূজা করুম।" মানস করিয়া মুনিবর কিছু অগ্রসর হইয়াই দেখেন, ৺ দুর্গা সত্য সত্যই সোনার সিংহাসন মাথায় নিয়া সোনার গাড়ু হাতে নিয়া ৺ মহাদেবের নিকট আসিতেছেন। এতদ্দর্শনে মুনিবর কিঞ্চিৎ মৃদু হাসি হাসিলেন। নারদের হাসি দেখিয়া ৺ দুর্গা নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—"ক্যা ভাইগ্‌না (ভাগিনেয়) তুমি হাস্‌লা (হাসিলে) যে।" নারদ বলিলেন, "আমার এক দেব্‌তার কথা মনে উঠ্‌ল (উঠিল) তাই হাস্‌লাম। এই দেব্‌তার বড় গুণ। তার কাছে যে বাঞ্ছা কইরা মানস করে তার সেই ফলে। আমি মানস কর্‌ছিলাম যে যদি আমার মামী মামাকে দেইখ্যা আইল ভাইল না করে তাইলে আমি এই দেবতার পূজা করুম্। অখন দেখি আমার মানস ফল্‌ছে।" তখন নারদ পান সুপারি প্রভৃতি পূজোপকরণ দ্বারা নিয়ম মত পূজা করিলেন। নারদকে পূজা করিতে দেখিয়া ও তাঁহার নিকট দেবীর মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া ৺ দুর্গা বলিলেন, "যে যদি আমার কার্ত্তিক গণেশ দেশে ফিরা আসে তাইলে আমি এই পূজা করুম।" এদিকে ৺ দুর্গার মানসের বিষয় সুমতি ঠাকুরাণী জানিতে পারিয়া কার্ত্তিকের ও গণেশের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন :—"তরা এক যুগ বার বছর ধইরা তর মাকে ছাইড়া সমুদ্রের এই পার আইয়া রইছস্ (রহিয়াছিস্) এখন তগর (তোদের) মার কাছে যা।" কার্ত্তিকেয় ও গণেশ কহিলেন, "আম্‌রা সমুদ্র পার হৈতে ডড়াই (ভয় পাই)।" তখন সুমতি ঠাকুরাণী কুকুরের বেশ ধরিয়া সমুদ্র পার হইলেন। ইহা দেখিয়া তাঁহারা সুমতি ঠাকুরাণীর সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র পার হইয়া বাড়ী আসিয়া দুর্গাকে "মা" বলিয়া ডাক দিলেন। অনেকদিন পর দুর্গা পুত্রমুখে "মা" শব্দ শুনিয়া তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া তাঁহাদিগকে কোলে লইয়া কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসার পর, কেমনে আসিয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। কার্ত্তিকেয় ও গণেশ কহিলেন, "মা গ, এক বুড়ী আমাগ সমুদ্র পার কইরা দিছে।" দুর্গা সেই দেবতা "কে" তাহা বুঝিতে পারিলেন। পরদিন অতি প্রত্যুষে কড়ার চুণ, কড়ার পান ইত্যাদি পূজোপকরণ দ্বারা সুমতি ঠাকুরাণীর পূজা করিলেন। তদবধি "নরলোকে" এই পূজা প্রচলিত হইল।

শ্রীমহিমচন্দ্র নন্দী।

"বাঙ্গালার ইতিহাস" *

সুপণ্ডিত, সুলেখক বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বঙ্গদেশে সুপরিচিত। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার 'পাষাণের কথা' ও 'শশাঙ্ক' প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থগুলি মনোরম হইলেও আমাদের আশা চরিতার্থ করিতে পারে নাই। তাঁহার মত পণ্ডিতের নিকট হইতে আমরা বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে লিখিত বাঙ্গালার একখানি ধারাবাহিক ইতিহাস প্রত্যাশা করিতেছিলাম। সম্প্রতি আমাদের এই আশা

* বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথমভাগ, শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ২॥০ টাকা।

কিয়ৎ পরিমাণে সফল হইয়াছে। দশ বৎসর পরিশ্রম করিয়া রাখালবাবু বাঙ্গালার হিন্দুরাজগণের একখানি ধারাবাহিক ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা বর্ত্তমান কালের বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে লিখিত, এবং বহু প্রাচীন মুদ্রা, শিলালিপি, ধাতুমূর্ত্তি, এবং পুঁথিপত্র প্রভৃতির প্রতিকৃতি সম্বলিত।

বাঙ্গালা সাহিত্যে এই শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে ইহা অদ্বিতীয় না হইলেও দ্বিতীয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।* এক "গৌড় রাজমালা" ব্যতীত আর এই শ্রেণীর গ্রন্থ বিদ্যমান আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই।

আজকাল বাংলা দেশে ইতিহাসের অভাব নাই। প্রায় প্রতি জেলারই ইতিহাস বাহির হইতেছে। ঢাকা, যশোহর, বিক্রমপুর, ফরিদপুর প্রভৃতির ইতিহাস লিখিত হইয়াছে এবং সকলগুলিরই যথেষ্ট মূল্য আছে। কিন্তু এই ইতিহাস ও উপরোক্ত দুইখানি ইতিহাসের মধ্যে শ্রেণীগত প্রভেদ বর্ত্তমান। শেষোক্তগুলি Traditional বা জনশ্রুতিমূলক ইতিহাস, আর প্রথম দুইখানি বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে লিখিত ইতিহাস।

রাখাল বাবু গ্রন্থের নাম দিয়াছেন বাঙ্গালার ইতিহাস। কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাস বলিতে আমরা যাহা বুঝি, বা যাহা আমাদের বুঝা উচিত তাহার এক অংশ মাত্র রাখাল বাবু আলোচনা করিয়াছেন। বাংলার ইতিহাসের অর্থ বাংলার রাজবংশের ইতিহাস, বাঙ্গালীর সমাজের ইতিহাস, বাঙ্গালীর ধর্ম্মের ইতিহাস বাঙ্গালীর ব্যবসা বাণিজ্য ও ঐহিক সম্পদের ইতিহাস। এ কথা সত্য যে এই সমুদয় ইতিহাস এখনও অনেকাংশে অজ্ঞাত। কিন্তু তথাপি যে গ্রন্থে এই সমুদয়ের ইতিহাস আলোচিত না হয়, তাহাকে বাংলার ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। এ বিষয়ে গৌড়রাজমালা নামটি গ্রন্থকারের অধিকতর সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচায়ক বলিয়া মনে করি। আমাদের মতে রাখাল বাবুও তাঁহার গ্রন্থের নাম বাংলার ইতিহাস না রাখিয়া বাংলার রাজবংশের ইতিহাস বা ঐরূপ কিছু রাখিলে ভাল করিতেন। কারণ বস্তুতঃ তাঁহার গ্রন্থে তিনি প্রধানতঃ রাজবংশেরই আলোচনা করিয়াছেন অন্য যাহা কিছু লিখিয়াছেন তাহা আনুসঙ্গিক বর্ণনা মাত্র। কেবলমাত্র গ্রন্থের প্রথম দুই পরিচ্ছেদে ইহার অন্যথা দৃষ্ট হয়।

প্রথম পরিচ্ছেদে বাংলার প্রাগৈতিহাসিক যুগ আলোচিত হইয়াছে। আমাদের মতে এই পরিচ্ছেদটি একেবারে বাদ দিলে গ্রন্থের সঙ্গতি রক্ষা হইত এবং সৌকর্য্য বৃদ্ধি পাইত। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন "ভূবিদ্যাবিদ শ্রীযুক্ত ক্যাগিন ব্রাউন ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্রদাস-গুপ্ত সুহৃদদ্বয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অসাধারণ অধ্যবসায়ের ফলস্বরূপ বাংলা দেশের প্রাগৈতিহাসিক যুগের ইতিহাস সঙ্কলিত হইল।" যদি গ্রন্থকার বাংলাদেশের একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখিতেন তাহা হইলে এই যুগের ইতিহাস লেখা প্রয়োজনীয় মনে করিয়া তিনি অন্যের নিকট হইতে এইরূপ সাহায্য গ্রহণ করিলে তাহা স্বাভাবিক হইত। কিন্তু তিনি যে গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহা বাংলার রাজবংশের গ্রন্থ। তাহার মধ্যে প্রাগৈতিহাসিক যুগ নামক অধ্যায়ের কোন স্থান নাই। যে গ্রন্থে বাংলার সমাজ, ধর্ম্ম, ব্যবসা, বাণিজ্য প্রভৃতি কোন বিষয় আলোচিত হয় নাই সে গ্রন্থে ধার করা প্রাগৈতিহাসিক যুগের আলোচনা থাকিলে স্বভাবতঃই মনে হয় যে গ্রন্থকারের মতে বাংলার ইতিহাসের পক্ষে পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলি অপেক্ষা এই জিনিষটি অধিকতর মূল্যবান। ইতিহাসের দিক হইতে এ কথা স্বীকার করা কঠিন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 'বাঙ্গালার আদিম অধিবাসী

---

* গৌড়রাজমালার তুলনায় এই গ্রন্থ উৎকৃষ্ট কি অপকৃষ্ট তাহা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে লিখিত বাঙ্গালার ইতিহাসের মধ্যে গৌড় রাজমালাই প্রথম প্রকাশিত হয় ইহাই আমাদের বক্তব্য।

ও আর্য্যবিজয় সম্বন্ধে কয়েকটি মত ব্যক্ত করা হইয়াছে। বিষয়টি মূল্যবান সন্দেহ নাই। কিন্তু যে প্রণালীতে গ্রন্থকার পুস্তকখানি আগাগোড়া লিখিয়াছেন এই বিষয়টি সেই প্রণালীতে লিখিত হইবার যোগ্য এখনও হয় নাই। এ কথা গ্রন্থকার স্বয়ংই ভূমিকায় স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং এই অধ্যায়ের অনেক সিদ্ধান্ত এখন পর্য্যন্ত ব্যক্তিগত মত মাত্র। এ স্থলে ইহার সুবিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে যাহা ব্যক্তিগত মত মাত্র, তাহা যদি লেখার প্রণালীতে সর্ব্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্ত বলিয়া বোধ হয় তবে তাহা লেখকের দোষ বলিয়াই মনে হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি।

(১) "খৃষ্টের জন্মের সার্দ্ধসহস্র বা দ্বিসহস্র বর্ষ পূর্ব্বে প্রাচীন আর্য্যজাতি এসিয়াখণ্ডের মধ্যভাগে অবস্থিত মরুময় পুরাতন আবাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করেন। (১৪ পৃঃ)

* * * * *

"এই আর্য্য জাতির এক শাখা ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পর্ব্বতশ্রেণী অতিক্রম করিয়া পঞ্চনদ প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। ইঁহারা ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকে স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন, এবং দুই তিন শতাব্দীর মধ্যে উত্তরাপথের অধিকাংশ হস্তগত করিয়াছিলেন।" (১৭ পৃঃ)

উদ্ধৃত উক্তিগুলি হইতে স্বতঃই মনে হয় যে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত দুইটি সর্ব্ববাদী সম্মত।

(ক) আর্য্যগণ ২০০০ খৃঃ পূঃ এর পরবর্ত্তী কোন সময়ে পাঞ্জাবে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন।

(খ) ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকে অধিকার বিস্তার করিয়া দুই তিন শতাব্দীর মধ্যে উত্তরাপথের অধিকাংশ হস্তগত করিয়াছিলেন।

প্রথম সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, রাখাল বাবুর মতটি সর্ব্ববাদীসম্মত তো নহেই, বরং খুব অভিনব বলিয়াই বোধ হয়। ঋগ্বেদের তারিখ লইয়া অনেক আলোচনা হইয়াছে। যাঁহারা ইহাকে নিতান্ত আধুনিক প্রতিপন্ন করিতে চান তাঁহারাও খৃঃ পূঃ ২০০০ হইতে খৃঃ পূঃ ১৫০০ বর্ষ ইহার রচনা কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আর্য্যগণের পঞ্চনদে উপনিবেশ ও ঋগ্বেদের রচনাকাল এ উভয়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধান নিশ্চয়ই ছিল, যদিও তাহা সঠিক নিরূপণ করার উপায় নাই। এমতাবস্থায় খৃষ্টের জন্মের সার্দ্ধসহস্র (!) বা দ্বিসহস্র বর্ষ পূর্ব্বে প্রাচীন আর্য্যজাতি এশিয়া হইতে দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন এরূপ দৃঢ় উক্তি যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, আর্য্যগণের উত্তরাপথ অধিকার কেবল যে পঞ্চনদ হইতে পূর্ব্বদিকে বিস্তারেরই ফল তাহা নহে। কাহারও কাহারও মতে আর্য্যগণ পঞ্চনদ হইতে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ এ উভয় দিকই অগ্রসর হইতে থাকেন। আর এই অধিকার দুই তিন শতাব্দীর মধ্যে হইয়াছিল বা তাহাতে তদধিক সময় লাগিয়াছিল, তাহা সঠিক করিয়া বলা যাইতে পারে, এরূপ প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই।

(২) "ঐতরেয় আরণ্যক রচনা কালে বঙ্গ, মগধ ও চের দেশবাসিগণকে আর্য্যগণ পক্ষিবৎ জ্ঞান করিতেন।" (১৮ পৃঃ)

হয়ত করিতেন, কিন্তু তাহা ঠিক জানিবার উপায় নাই। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ঐতরেয় আরণ্যকের একটি অংশের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন ("নারায়ণ" চৈত্র ৪০৮ পৃঃ)। সায়নাচার্য্য কিন্তু ঐ অংশের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাও শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। শাস্ত্রী মহাশয় অবশ্য বলিয়াছেন, "সায়নের কথা ধরি না," আমরা কিন্তু একেবারে সায়নকে উপেক্ষা করিতে পারি না; এমত স্থলে কেবলমাত্র

উল্লিখিত 'উক্তিটি' লিপিবদ্ধ করিয়া, রাখাল বাবু প্রকৃত ঐতিহাসিকের কার্য্য করেন নাই। সায়ন যে ইহার অন্যরূপ ব্যাখ্যা করেন, এবং উদ্ধৃত অর্থ যে কেবলমাত্র শাস্ত্রী মহাশয়ের মত তাহার উল্লেখ অবশ্য কর্ত্তব্য মনে করি। ("ক") পরিশিষ্টে তিনি শাস্ত্রী মহাশয়ের যে উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতেই তাঁহার দায়িত্ব শেষ হইয়াছে, আমরা এইরূপ মনে করি না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে মৌর্য্য ও শকাধিকারের ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে। এই পরিচ্ছেদটি এত অসাবধানতার সহিত লিখিত এবং ভ্রমপরিপূর্ণ যে রাখাল বাবুর মত লোকের লেখা বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

(ক) "···শিশুনাগ বংশীয় মহানন্দের শূদ্রাপত্নীর গর্ভজাত পুত্র ভারতের সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করিয় একচ্ছত্র সম্রাট হইয়াছিলেন। এই সময় হইতে গুপ্তরাজবংশের অধঃপতন পর্য্যন্ত মগধরাজ উত্তরাপথে একচ্ছত্র সম্রাটরূপে পূজিত হইতেন, এবং পাটলিপুত্রই সাম্রাজ্যের একমাত্র রাজধানী ছিল।" (২৯ পৃঃ)।

কেবলমাত্র পুরাণের উক্তির উপর নির্ভর করিয়া মহাপদ্মকে "ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট" বলা বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীর অনুমোদিত নহে। সমস্ত ক্ষত্রিয়-কুল নির্ম্মূল সম্বন্ধেও এই আপত্তি প্রযোজ্য। লেখকের দ্বিতীয় উক্তিটি সম্পূর্ণ ভুল। যখন সেকেন্দর ভারতবর্ষে আসেন তখন মগধরাজ উত্তরাপথের একচ্ছত্র সম্রাট থাকিলে, তাঁহার সহিত যুদ্ধ না করিয়া বিপাশা-তীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর নহে। সুঙ্গরাজগণ সকলেই যে উত্তরাপথের একচ্ছত্র সম্রাটরূপে পূজিত হইতেন, তাহার প্রমাণাভাব। কাণ্বগণ যে এইরূপ পূজিত হইতেন না, গ্রন্থকার অন্যত্র তাহা এক প্রকার স্বীকার করিয়াছেন—"কাণ্ববংশীয় রাজগণের সময়ে সাম্রাজ্য মগধের সীমা মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়াই বোধ হয়" (৩৩ পৃঃ)। কুশান রাজগণ যে মগধরাজকে "উত্তরাপথের একচ্ছত্র সম্রাট" রূপে পূজা করিতেন ইহা অসম্ভব। অন্ধ্রগণ যে এক কালে মগধ অধিকার করিয়াছিল ইহা পুরাণে উক্ত আছে। কনকসভাই পিলাই "১৮০০ বৎসর পূর্ব্বে তামিলগণ" ("Tamils 1800 years ago") নামক গ্রন্থে তামিল সাহিত্য হইতে ইহার সমর্থক প্রমাণাবলী উদ্ধৃত করিয়াছেন। নবাবিষ্কৃত ভীটা নামক প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ হইতেও এই উক্তি সমর্থিত হয়। অন্ধ্র-গণের অধিকারের পরও কি 'মগধরাজ' উত্তরাপথের একচ্ছত্র সম্রাট বলিয়া পরিগণিত হইতেন? প্রাচীন লিপি ও মুদ্রা হইতে প্রমাণিত হয় যে পাঞ্চাল (অহিচ্ছত্র), কোশল, মথুরা, কোশাম্বী প্রভৃতি স্থানে অনেক স্বাধীন রাজা রাজত্ব করিতেন এবং অন্যান্য অনেক স্থানে স্বাধীন-গণতন্ত্রশাসিত প্রদেশ বর্ত্তমান ছিল। ইহাদের সময় ঠিক নিরূপিত না হইলেও ইহারা যে মৌর্য্য ও গুপ্ত এই দুই রাজবংশের মধ্যবর্ত্তী কালের সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই সমুদয় রাজ্য স্বাধীন ছিল, অথচ মগধরাজ উত্তরাপথের একচ্ছত্র সম্রাটরূপে পূজিত হইতেছেন, ইহা একটি দুঃসাধ্য প্রহেলিকা। এ বিষয়ে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

(খ) "শুঙ্গবংশীয়গণের একখানি মাত্র খোদিত লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে।" (৩৪ পৃঃ)

বস্তুতঃ এইরূপ দুইখানি লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে।*

(গ) "মহারাজ প্রিয়দর্শী যখন বৃদ্ধ, তখন রাজ্য-লোলুপ গ্রীকরাজগণ, শকুনির ন্যায় তাঁহার মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এবং তাঁহার দেহাবসানের অব্যবহিত পরে কপিশা, গান্ধার ও পঞ্চনদ তাঁহাদিগের হস্তগত হইয়াছিল।" (৩২ পৃঃ)

এটি সম্পূর্ণ ভুল। প্রিয়দর্শী আনুমানিক খৃঃ পূঃ ২৭২

* Luders List Nos. 687, 688 Ep. Ind. Vol X. Appendix. p. 65.

বর্ষে রাজত্ব আরম্ভ করেন, আনুমানিক খৃঃ পূঃ ২৩২ বর্ষে তাহার মৃত্যু হয়। খৃঃ পূঃ ২০৬ বর্ষে সিরিয়ার রাজা আন্তিয়োকাস্ হিন্দুকুশ পর্ব্বত পার হইয়া কাবুলে উপস্থিত হন এবং সেখানে শুভাগ সেন (?) নামক হিন্দু রাজাকে হস্তী ও ধন প্রদানে স্বীকৃত করাইয়া তিনি কান্দাহারের মধ্য দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। আনুমানিক খৃঃ পূঃ ১৯০ বর্ষে ডিমেট্রিয়াস্ সম্ভবতঃ পঞ্চনদ ও অন্যান্য স্থান অধিকার করেন। অশোকের মৃত্যুকালে সিলিউকস্ ক্যালিনিকস্ (Seleucus Kallinikos) ও দ্বিতীয় ডাইওডোটস) (কাহারও মতে প্রথম ও দ্বিতীয় ডাইওডোটস্ অভিন্ন) যথাক্রমে সিরিয়া ও বক্ত্রিয়ার রাজা ছিলেন। ইহাদের কেহই ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন এরূপ প্রমাণ নাই। অথচ গ্রন্থকারের মতে ইহারা "শকুনির ন্যায় তাঁহার মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার দেহাবসানের অব্যবহিত পরে" ইত্যাদি। আন্তিয়োকাসের অভিযান বিজয়-যাত্রা মাত্র। তাহাতে পঞ্চনদ তো দূরের কথা, কপি. ও গান্ধারও গ্রীকগণের হস্তগত হয় নাই। প্রকৃত পক্ষে ডিমেট্রিয়াসই প্রথমে ঐ সমুদয় হস্তগত করিয়াছিলেন। ইহা অশোকের মৃত্যুর ৪০ বৎসর পরের কথা, অথচ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন "তাঁহার দেহাবসানের অব্যবহিত পরেই" ইত্যাদি।

(ঘ) "শকদ্বীপে যে সকল শকজাতি বাস করিতেছিল তাহারা নবাগত শকজাতি কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া বাহ্লীক ও কপিশার যবন বা গ্রীক রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল। যবনগণ পরাজিত হইয়া, উত্তরাপথ আক্রমণ করিয়া বহু নূতন রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। তখন মৌর্য্য সাম্রাজ্যের শেষ দশা;" (৩৩ পৃঃ)

এটি আর একটি মারাত্মক ভ্রম। ইউক্র্যাটাইডিসের পুত্র হেলিওক্লিসের সময়েই বহ্লিকে গ্রীকরাজত্ব শকগণের দ্বারা বিধ্বস্ত হয়। ডিমেট্রিয়াস আনুমানিক খৃঃ পূঃ ১৯০ বর্ষে ভারতে অভিযান করেন। ইহার কিছুকাল পরে ইউক্র্যাটাইডিস রাজা হন। তাঁহার কয়েকবৎসর রাজত্বের পরে শকগণ বহ্লীক অধিকার করে। সুতরাং এই ঘটনা আনুমানিক খৃঃ পূঃ ১৫০-১৪০ বর্ষের পূর্ব্বে হইতে পারে না এরূপ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে; এবং ইহাই পণ্ডিতগণের মত। (ভিন্সেণ্ট স্মিথের মতে এই ঘটনার সময় খৃঃ পূঃ ১৪০-১২০ বর্ষে)। আনুমানিক খৃঃ পূঃ ১৮৪ বর্ষে মৌর্য্যবংশ ধ্বংস হয়। সুতরাং যখন বাহ্লীক হইতে বিতাড়িত হইয়া যবনগণ উত্তরাপথে রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার বহুপূর্ব্বে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অবসান হইয়াছে অথচ গ্রন্থকারের মতে তখন মৌর্য্য সাম্রাজ্যের শেষ দশা।

(ঙ) "শকগণ ধীরে ধীরে মধ্য এশিয়া হইতে অগ্রসর হইয়া কপিশা, গান্ধার ও পঞ্চনদের যবন রাজগণের অধিকার লোপ করিয়া নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন।" (৩৫ পৃঃ)

মধ্য এশিয়ার শকগণ কপিশা-গান্ধারের পথে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল ইহার প্রমাণাভাব। কানিংহাম্, টমাস প্রভৃতির মতে ইহারা বাহ্লীক হইতে শকস্থানের (বর্ত্তমান সিস্তান্) মধ্য দিয়া আসিয়া পঞ্চনদের দক্ষিণে সিন্ধুনদী পার হইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। কাহারও মতে কাশ্মীরের মধ্যদিয়া আসে। কপিশা ও গান্ধার দিয়া আসে নাই তাহার কারণ, ঐ সমুদয় স্থানে যবন রাজগণ রাজত্ব করিতেছিলেন। গ্রন্থকারের মতে শকগণ কর্ত্তৃক ঐ সমুদয় স্থানে যবনগণের অধিকার বিলুপ্ত হয় কিন্তু এটি ভুল। শকগণের বহু পরে যখন ইয়ুচিগণ কপিশা অধিকার করেন তখনই শেষ গ্রীকরাজা হারমিউসের সঙ্গে সঙ্গে কপিশার যবন রাজ্য বিলুপ্ত হয়। অবশ্য অন্য স্থানের কোন কোন শক রাজা কিছুকালের জন্য কপিশা আক্রমণ ও অধিকার করিয়া থাকিতে পারেন কিন্তু সে স্বতন্ত্র কথা।

(চ) "মোগ বা মোঅ, অয়, স্পলহোর, স্পলগদম প্রভৃতি শকজাতীয় রাজগণ গান্ধার, কপিশা এবং পঞ্চনদে রাজত্ব করিতেন।" (৩৫পৃঃ)

(১) মোগ আর মোয় অভিন্ন ইহা সম্ভব বটে কিন্তু অবিসংবাদিত সত্য নহে। ফ্লীটের মতে ইহারা পৃথক ব্যক্তি। র‍্যাপসনের মতে সম্ভবতঃ অভিন্ন। ভিন্‌সেণ্ট স্মিথের মতে খুব সম্ভবতঃ অভিন্ন (almost certainly).

(২) স্পলহোর ও স্পলগদম গান্ধার ও পঞ্চনদে রাজত্ব করিতেন ইহার প্রমাণ কি? স্মিথ, র‍্যাপসন প্রভৃতি সকলেই ইহাদিগকে কান্দাহারের রাজা বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন, কারণ ইঁহাদের মুদ্রা কান্দাহারেই পাওয়া যায় *। কাবুল সম্ভবতঃ কিছুকাল ইহাদের অধীনে ছিল এরূপ প্রমাণের আভাস আছে। গান্ধারা ও কান্দাহার এক নহে; সুতরাং গান্ধারে ও পঞ্চনদে ইহার রাজত্ব করিতেন, এরূপ উক্তির মূলে কি প্রমাণ আছে তাহা জানিতে ইচ্ছা হয়।

(৩) মোস বা মোঅ, অয়, স্পলহোর, স্পলগদম প্রভৃতি যে শকজাতীয় ছিলেন তাহার প্রমাণাভাব। মোগ এবং অয় শকজাতীয় ছিলেন ইহা অনেকে অনুমা করেন এ কথা সত্য; কিন্তু স্পলহোর ও স্পগদম শক ছিলেন, ইহা বিশেষ সন্দেহজনক। ইহারা 'পার্থিয়ান' ছিলেন ইহাই অধিকতর সম্ভবপর, এবং স্মিথ ও র‍্যাপসন এই মতই গ্রহণ করিয়াছেন। *

(ছ) "ইউচিগণ বাহ্লীক পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ উত্তরাপথের দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করেন। অবশেষে ইউচি জাতির পাঁচটি প্রধান বিভাগ, কুশান বংশ কর্তৃক একত্র হয়।"

(১) ইউচিগণ যখন উত্তরাপথের দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করেন তখন তাহারা বাহ্লীক পরিত্যাগ করেন নাই। কজুলকদফিস ও বিমকদফিস উভয়েই বাহ্লীকে ছিলেন। বিমকদফিস স্বয়ং বাহ্লীকে থাকিয়া প্রতিনিধি দ্বারা ভারতবর্ষ শাসন করাইতেন।

* Rapson—Indian Coins P. 8.

V. Smith—Catalogue of Coins in the Indian Museum P. 37.

(২) ইউ-চিগণ উত্তরাপথের দিকে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে ইউ'চি জাতির পাঁচটি প্রধান বিভাগ কুশানবংশীয় কর্তৃক একত্র হয়, ইহা অধিকতর সম্ভব। অথচ গ্রন্থকার বলিতেছেন "অবশেষে ইউ-চি জাতির পাঁচটি প্রধান বিভাগ ইত্যাদি।"

(জ) "তাঁহার পরে বিমকদফিস বারাণসীপর্য্যন্ত অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন।" (৩৫ পৃঃ)।

ইহা সম্ভব বটে কিন্তু সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য নহে।

(ঝ) "শকাব্দের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম কণিষ্কের সময়ে কুশাণ সাম্রাজ্য পূর্ব্বে প্রাচীন চীন সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমা হইতে পশ্চিমে রোমক সাম্রাজ্যের পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত; এবং উত্তরে সাইবিরিয়া হইতে দক্ষিণে নর্ম্মদাতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল" (৩৫ পৃঃ)।

(১) কণিষ্ক শকাব্দের প্রতিষ্ঠাতা কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এ বিষয়ে বাদানুবাদ সম্ভবপর নহে। তবে এ বিষয়ে যে মতভেদ আছে তাহার উল্লেখ করা উচিত ছিল।

(২) "রোমক সাম্রাজ্যের পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত" কণিষ্কের রাজ্য বিস্তৃত ছিল এই অভিনব সিদ্ধান্তের প্রমাণ জানিতে ইচ্ছা করি; যে পার্থিয়ান সাম্রাজ্য রোম সাম্রাজ্যের সহিত সমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া সগর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত ছিল, রাখাল বাবু কি তাহাদের কথা একেবারে বিস্মৃত হইলেন? খৃঃ পূঃ ৫৩ বর্ষে রোম সেনাপতি ক্রাসস্ মেসোপটেমিয়া আক্রমণ করিতে গিয়া পার্থিয়ানদের নিকট পরাস্ত হন। খৃঃ পূঃ ৪০—৩৮ বর্ষের মধ্যে পার্থিয়ানেরা সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইন দখল করে। ১১৫—১১৭ খৃঃ অব্দে ট্র্যাজান পার্থিয়ানদের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া কিয়ৎকালের জন্য মেসোপটেমিয়া দখল করেন। সুতরাং শকাব্দ প্রতিষ্ঠাতা (?) কণিষ্কের কালে, কুশাণ ও রোম সাম্রাজ্য এ উভয়ের মধ্যে বিশাল পার্থিয়া সাম্রাজ্য অবস্থিত ছিল। একটি জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে পার্থিয়ার রাজা কণিষ্ককে আক্রমণ করেন এবং যুদ্ধে

কণিষ্কের জয় লাভ হয়। কিন্তু তাহাতে পার্থিয়ার বিশাল সাম্রাজ্য তো দূরের কথা, তাহার কোন অংশ যে কণিষ্কের হস্তগত হইয়াছিল এমন কথা কেহই বলেন নাই।

(৩) কণিষ্ক (সম্ভবতঃ) কাশগড় ইয়ারকন্দ ও খোটেন অধিকার করেন। ইহার সহিত গ্রন্থকারের "সাইবিরিয়া" হইতে এই উক্তির কতদূর সামঞ্জস্য পাঠকগণ বিচার করিতে পারেন।

(৪) "মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মালবদেশে প্রাচীন দশপুরের (বর্ত্তমান মন্দশোর) ধ্বংসাবশেষ-মধ্যে একখানি শিলালিপি আবিষ্কার করিয়াছেন"। (৪০ পৃঃ)

কথাটি সত্য নহে। উক্ত শিলালিপির আবিষ্কর্ত্তা বাবু জয়শঙ্কর মান্দাসোরের একজন উকীল। তাঁহার ভৃত্যগণ তাঁহার জমি চাষ করিতে করিতে ইহা প্রাপ্ত হয়।

১৯১৩ সনের জুন মাসের ইণ্ডিয়ান এন্টিকোয়ারীতে শ্রীদেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডার কর এই লিপির মর্ম্মার্থ সাধারণের গোচর করেন। ১৯১৩ সনের জুলাই মাসে শ্রীযুত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর এই লিপি আলোচনা করেন। শাস্ত্রী মহাশয় বাবু জয়শঙ্কর ও ভাণ্ডারকরের প্রদত্ত প্রতিলিপির সাহায্যে ১৯১৩ সনের আগষ্ট মাসের ইণ্ডিয়ান এন্টিকোয়ারীতে ইহার মর্ম্মার্থ প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করেন। * মান্দাসোরের ধ্বংসাবশেষ (!) মধ্য হইতে শিলালিপি আবিষ্কারের গৌরব শাস্ত্রী মহাশয়ের কতটুকু প্রাপ্য পাঠকগণ বিচার করিবেন।

৩৩ পৃঃ পাদটীকায় লেখক বলিয়াছেন যে 'শকাধিকার কাল ও কণিষ্ক' সম্বন্ধে তাঁহার মতামত ভিন্সেন্ট স্মিথ, টমাস প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিদগণ গ্রহণ করিয়াছেন। এই কথায় অনেকের মনে ধারণা হইতে পারে যে এই পরিচ্ছেদে যবন, শক, কুশান সম্বন্ধে রাখাল বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা সমস্তই উক্ত প্রত্নতত্ত্ববিদগণের অনুমোদিত; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। টমাসের মতের † সহিত রাখাল বাবুর উক্তির কতদূর সামঞ্জস্য আমরা তাহা দেখাইতেছি।

"Under the third and fourth in the line, Demetrius and Eucratides, it [Graeco-Bactrian Kingdom] crossed the Paropanisus and occupied the territory of Kabul and Afganistan, and even at that perod (Sic. period ?) the western Panjab... (Ibid P. 628).

"Either before or during the time of Menander, * the first serious breach was made in the Greek dominions. Bactria being occupied by two successive inroads of barbarian invaders, Sakaae, or Scythians, and Tochari from beyond the Jaxartes and from Chinese Turkesten. Subsequently, about the end of the Century, *the Scythian tribes settled in Sakastan, or Sistan, advanced to Arachosia and the Indus*, and, overthrowing the Greek power, established *east and west of the river* a dynasty distinguished in coinage and nomenclature, having satrapies as far east as Mathura on the Ganges. *The Greeks of Kabul maintained*

* Indian Antiquary 1913, P. 161, 199 and P. 218.

† J. R. A. S. 1913—P. 627 ff.

* এই অংশ সর্ব্ববাদীসম্মত নহে, তবে ইহা রাখাল বাবুর মতের অনুকূল নহে, তাহাই দেখাইবার জন্য উদ্ধৃত হইল—ইটালিক আমাদের নিজস্ব।

their independence (Ibid P. 628.). ইহার সহিত "গ" "ঘ" ও "ঙ" শীর্ষক উদ্ধৃত অংশ তুলনীয়)

"Wima Kadphises...was the conqueror of India and founder of the great Kushan Empire extending at least as far east as Mathura. (Ibid P. 630.) (ইহার সহিত "ক" তুলনীয়)

"We have no absolute certainty that they (Kaniska, Huviska and Vasudeva) retained the dominions north of the Paropanisus. ("Ibid." P. 630) (ইহার সহিত 'ক' তুলনীয়)

অতঃপর ভিনসেণ্ট স্মিথের মতের সহিত লেখকের উক্তির তুলনা করিতেছি।

"For almost a hundred years after the failure of Seleukos Nikator no Greek sovereign presumed to attack India. Then Antiochos the Great (C. 206 B. C.) marched through the hills of the country now called Afganistan and went home by Kandahar and Sistan. * *

The Subsequent invasions of Demetrios, Eukratides, and Menander...extended with intervals over a period of about half a century (C 193—154 B. C.)" (V. A. Smith—Early History of India, 3rd Edition P. 239). ইহার সহিত "গ" তুলনীয়।

"The flood of barbarian (Saka) invasion spread also to the west, and burst upon the Parthian Kingdom and Bactria in the period between 140 and 120 B. C.

The last Graeco-Bactrian King was Heliokles, with whom Greek rule to the *North of the Hindu Kush* disappeared for ever." * (Ibid P. 326). ইহার সহিত "ঘ" তুলনীয়।

"The earliest of these *Indo Parthian Kings* apparently was Moga or Maues. (Ibid. P. 228.)

"Vonones *a Parthian* * became king of *Arachosia and Sistan*...Those territories were administered by him and his relatives [স্পলহর, স্পলগদম] for a brief period. (Ibid P. 229.) ইহার সহিত "চ" তুলনীয়।

"Kadphises I Succeeded in imposing his authority on his colleagues and establishing himself as the sole monarch of the Yuchi-nation.

He made himself master of kipin (? Kashmir ? Kafiristan) as well as of the Kabul territory, and in the course of a long reign, *consolidated his power in Bactria*. *" (Ibid P. 251.) ইহার সহিত "ছ" তুলনীয়

There is reason to believe * that he [Kadphises II] conquered the Panjab and a considerable part of the Gangetic plain, *probably as far as* * Benares. (Ibid P. 252) ইহার সহিত "জ" তুলনীয়

"Kaniska came to the throne ..*most probably* in A. D. 78." (Ibid. P. 256)

"Tradition and the monuments and inscriptions of his time prove that his [Kanishka's] sway expended all over North-Western India, *probably* * as far South as the Vindhyas, as well as over the remote regions beyond the Pamir passes". (Ibid P. 259)

* ইটালিকস্ গুলি আমাদের নিজস্ব।

* ইটালিকস্গুলি আমাদের নিজস্ব।

"The *temporary* * annexation of Mesopotamia between the Euphrates and Tigris in A. D. 116 by Trajan *brought* the Roman frontier *within 600 miles of the western limits of the Yueh-chi Empire.*" (Ibid P. 259) এই সমুদয়ের সহিত "ঋ" তুলনীয়।

রাখাল বাবুর মতে "খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভারতে খরোষ্টিলিপির ব্যবহার লোপ হইয়াছিল।" রাখাল বাবু নিজেই খরোষ্টি তকৃতি বাহাই লিপিকে ১৮১ খৃঃ অব্দে লিখিত বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। উক্ত লিপির ১৯ বৎসরের মধ্যেই খরোষ্টি লোপ পাইল ইহা সম্ভবপর নহে এবং ইহার প্রমাণাভাব। ষ্টাইন (A. Stein) লিখিয়াছেন যে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর পরে ভারতে খরোষ্টি লিপির ব্যবহার ছিল এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। (Arch. Survey Report. 1911-12. p. 110) সুতরাং গ্রন্থকারের দৃঢ় উক্তি কতদূর সঙ্গত পাঠকগণ বিচার করিতে পারেন। অন্যান্য কথা বারান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।*

(ক্রমশঃ)

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার।

---

* রাখাল বাবুর গ্রন্থের সমালোচনা অনেক শ্রম ও সময় সাপেক্ষ। দুর্ভাগ্যক্রমে বর্ত্তমানে নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকাতে, প্রতিমাসে নিয়মিত ভাবে গ্রন্থের অবশিষ্ট অংশ সমালোচনা করিতে সমর্থ হইব কিনা বলিতে পারিনা। ত্রুটি হইলে পাঠকগণ মার্জ্জনা করিবেন।

আর একটি কথা—তৃতীয় পরিচ্ছেদে যে সকল ভুল ত্রুটি দেখাইয়াছি তাহা হইতে যেন কেহ মনে না করেন যে আগাগোড়া গ্রন্থখানিই এইরূপ। গ্রন্থের অনেক স্থল অধ্যবসায়ের সহিত লিখিত এবং পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক আমি ক্রমে তাহা দেখাইব। এরূপ গ্রন্থ নির্দ্দোষ দেখিতে ইচ্ছা হয় এই জন্য ভুল ত্রুটি বিস্তারিত ভাবে দেখাইলাম।

ভাটীয়াল গান *

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(১০)

গুরু ! তোমার চরণ পাব বলে
বড় আশা ছিল।
আশা পাণীর কূলে বসে
আমার আশায় জনম গেল ॥
(অ) আশা না পূরিল ॥
আমার মনের আশা.
মনে রইল।
(অ) আশা না পূরিল ॥
আশাবৃক্ষ রোপণ কইরে,
আমি বইসে রইলাম বৃক্ষতলে,
(অ) ফল ফল্‌বে বইলে ;
ফল না ফলিতে বৃক্ষে,
বৃক্ষের ডাল ভাইঙ্গা গেল।
(অ) আশা না পূরিল ॥
চাতক রইল মেঘের আশে.
মেঘ বইরে যায় অন্য দেশে,
(অ) চাতক বাঁচে কিসে ?

---

* চৈত্র মাসের সংখ্যায় ভাটীয়াল গানের ৮ম সংখ্যক গানটির ১ম ভাগের নিম্নোক্ত অংশ ভুলে ছাপা হয় নাই।
"গুরু ভজ রে আমার মন,
গুরু ভজ রে।
গুরু যে গৌরাঙ্গ বটে,
শুইনাছি রে সাধুর মুখে.
তত্ত্ব জেনে মত্ত হ'য়ে,
সাধন কর রে।
আমার মন গুরু ভজ রে।"
ইহার পরে হইবে—"আত্মতত্ত্ব পরম তত্ত্ব......ইত্যাদি।

জল বিনে চাতকী মইল,
আমার তো ক্র দশা হইল।
(অ) আশা না পুরিল ॥
বইরে—বর্ষিয়া।
কইরে—করিয়া।
মইল—মরিল।

গুরুরূপী ভগবানের শ্রীচরণলাভাকাঙ্ক্ষী ভগ্নমনোরথ ভক্তের অন্তর্নিহিত করুণ ভাবের কি মর্ম্মস্পর্শী অভিব্যক্তি।

(১৪)

গুরু গো, সুজন নাইয়া,
ভবপারে নেও আমারে বাইয়া।
আমার জীর্ণ তরী, নাই কাণ্ডারী,
হা রে, তরী কে নিবে আউগাইয়া ॥
ভবনদীর অকূল পাথার,
আমি ত জানি না সাতার,
ওগো, আমায় যেয়ো না চুবাইয়া।
তোমার নামেতে কলঙ্ক হবে,
—গুরু গো, ভবপারের বন্ধু,
যদি মরি হাবুডুবু খাইয়া ॥
ভবনদীর দুরন্ত ধার,
(আমার) দাড়াতে টান্তে চায় না দাড়.
ষোল আনা খাইয়া।
ওগো, মনমাঝি বড় পাজি,
—গুরু গো, ভবপারের বন্ধু,—
আমায় যাইতে চায় ফালাইয়া ॥
পাপে তরী হ'ল বোঝাই,
আমার পুণ্যের সঞ্চয় কিছু ত নাই,
তরী যায় বুঝি তলাইয়া।
তুমি বিপদভঞ্জন মধুসূদন,
—গুরু গো, ভবপারের বন্ধু,—
আছি তোমার চরণপানে চাহিয়া ॥
—আমায় পার কর হে দয়াল গুরু—
আছি তোমার চরণপানে চাইয়া ॥
অধীন জলধর বলে,
আমি বইসে রইলাম নদীর কূলে,
দীনের দীন হইয়া।
তুমি আমার পারের কর্ত্তা,
—গুরু গো, ভবপারের বন্ধু,—
হা রে, তরী নেও না কেন বাইয়া ॥
গুরু গো, সুজন নাইয়া,
ভবপারে নেও আমারে বাইয়া ॥
নাইয়া—নৌকার মাঝি।
বাইয়া—বাহিয়া।
চাইয়া—চাহিয়া।
বইসে—বসিয়া।

জীবন সায়াহ্নে সামর্থ্য ও সম্বলহীন আমি খরস্রোতা অকূল ভবনদীর তীরে সমাসীন। কুচক্রী ষড়রিপু ও অসংযত মনের সাহচর্য্যে আজ আমাকে পাড়ি কাটিতে হইতেছে। তাহারা যে আমাকে ফেলিয়া যাইতে চায়, এবার আমাকে হাবুডুবু খাইয়া মরিতে হইবে। তাই ডাকি হে দেব, হে পারের কর্ত্তা, তুমি আমাকে পার করিয়া নেও।

(১৫)

ডুব্‌ল সাধের মানব তরী
ভব সাগরের পাকে পড়ে।
এমন বান্ধব কে আছে আর,
কে তুলবে কেশে ধরে ?
মানব তরীর মাল্লা ছয় জনা,
ছয় দিকে ছয় জনে টানে
কেউ ত শোনে না ;
গুণ ছাড়িয়া রে মন!
গুণ ছাড়িয়া সব পলাইল,
একলা মাঝি রলেম পড়ে ॥

এসেছিলাম ভবের (ই) হাটে,
শঠে মোরে লাগুর পেয়ে
সব নিল লুটে;
কর্ম্মদোষে রে মন!
কর্ম্মদোষে সব হারাইলাম,
এই দোষ আমি দিব কারে?
ভবনদীর তরঙ্গ ভারি,
যে দিকে চাই সে দিকে নাই
পারের কাণ্ডারী;
গুরু বিনে রে মন!
গুরু বিনে আর লক্ষ্য নাই,
ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে॥

(১৬)

প্রাণসখি বৃন্দে গো,
প্রাণবল্লভ রইল কই—গো!
না হেরিয়ে কালরূপ
কিসে বাঁচে প্রাণ সই—গো!
সাজায়ে বাসর শয্যা,
তা'তে পেলেম বড় লজ্জা গো,
বনফুলের মালা গেঁথে
দিলাম শ্যামের গলে কই—গো
সারানিশি যায় বিফলে,
আমি ভাস্‌লাম কেবল
নয়নজলে গো;
(ও গো) আমি বিনা জলে চন্দন ঘ'ষে,
দিলাম শ্যামের পদে কই—গো?

(১৭)

(আর) কয় দিনের বা বাদ্‌সাগিরি
ভেবে বাঁচি না।
(হা রে) ঘৃণায় তোরে
কেউ ছোবে না॥
মেজ,ভাইচা, কোচ ইত্যাদি,
এ সকল বা কোথা রবে
তাই আমি ভাবি;
তোরে জন্মের মত করবে ফকির,
'এস' বলে কেউ ডাক্‌বে না॥
আতর গোলাপ যত মাখ গায়,
এ সোণার অঙ্গ জোকে পোকে
কত জানি খায়;
আরে এখন কত চাকর নফর,
(আর) সে বেলায় তোর—
কেউ রবে না॥

(১৮)

মাইয়ার চরণ ভজ সবে ভাই
জীবের আর গতি নাই।
জলে মাইয়া, স্থলে মাইয়া,
অনলে অনিলে মাইয়া,
বসুমতী মাইয়া;
(হা রে) ব্রহ্মাণ্ড উদারি মাইয়া
দেখি সর্ব্ব ঠাই॥
মাইয়ার চরণ ভইজে হরে,
গঙ্গা রাখলেন জটায় ভ'রে,
কালী বক্ষোপরে;
কৃষ্ণ ভজে চরণ ধরে
আমায় ত্রাণ কর গো রাই॥

(১৯)

হারে, মন তুমি কার, কে বা তোমার,
মন তুই একা একা।
আইছ একা যাইবা একা,
ভবে কারো সঙ্গে নাই দেখা।
মন তুই একা একা॥
যে সুখে রইয়াছ ভবে,
চিরদিন কি এমি যাবে,
ভাবের অভাব হবে;

তখন চোকের জলে বুক ভাসিবে,
শেষে পথ যাবে না দেখা।
মন তুই একা একা ॥
আদরের রমণী যিনি,
নরকে ডুবাবেন তিনি,
যাইয়া সোহাগিনী :
তোরে বিনা মায়নায় চাকর পেয়ে
কত খাটাইয়াছে বোকা।
মন তুই একা একা ॥
সহজ মাইনুষের সঙ্গ ধরে,
বইসে থাক্‌গে রূপ নেহারে.
যদি পা'বা তারে ;
চণ্ডী বলে কলিকালে—
জীবন আর যাবে না রাখা।
মন তুই একা একা ॥

(২০)

কি অভাবে কাঙ্গাল হইলাম রে
আরে শ্রীদাম দাদা।
আমার ধরাচূড়া মোহনবাঁশী রে
সব নিয়েছে রাধা॥
অষ্ট সখি নিয়ে সাথে, (১)
দাসখত লেখলাম আপন হাতে
সেই দেনায় ঋণ হই তাতে,
তিন কিস্তিতে ঋণ শোধিব, (২)
আমায় মুক্ত দেয় না রাধা ॥
রাধার প্রেমে ঋণী হইয়ে,
পীত ধরা ত্যজ্য করে.
দাসখত দিলাম লেখে,
দাসখত লিখে দিয়ে ভাই রে,
আর ভুল্‌তে নারি রাধা ॥

(২১)

গুরু বন্ধু গো. তুমি বিনে ভবপাবে
আমার কেহ নাই।
সংসার সাগর মাঝে
কত বিপদ পদে পদে গো,—
গুরু বন্ধু গো, তুমি বিনে ভবপারে,
পারের সম্বল নাই ॥
আশা পথ চেয়ে থাকি,
আমি চাতক তুমি বারি গো,—
গুরুবন্ধু গো. আমার হৃদয় মাঝে
বিরাজ সদাই ॥
সপিয়ে তোমায় হিয়ে,
কলঙ্কিনী জগৎ ভইরে গো,—
গুরু বন্ধু গো, সেও ভাল
তোমায় যদি পাই ॥

শ্রীগোপীমোহন দত্ত।

---

(১) অষ্ট সখি—ললিতা, বিশাখা, চিত্রলেখা, চম্পকলতিকা, রঙ্গদেবী, সুদেবী, তুঙ্গবিদ্যা ও ইন্দুরেখা নাম্নী শ্রীরাধার আটজন পরিচারিকা।

(২) তিন কিস্তি—সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগ। এই তিন যুগে ঋণ পরিশোধ না হওয়াতে ভগবান কলিযুগে স্বীয় শ্যামবর্ণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীরাধিকার গৌরবর্ণ পরিগ্রহণ করিয়া গৌরাঙ্গ রূপে উক্ত ঋণ পরিশোধ করিয়াছেন।

৫৬৮। বউর গায়ই হাত উঠায় ?
লোক দেখাইতে বালিশ কিলায়।

৫৬৯। তোমাগ ন আদা আছে ?
আর, আমরাই মরি পেটের বিষে।

৫৭০। যত হাসি তত কান্না,
বলে গেল রাম শর্ম্মা।

৫৭১। দশের কথায় মরণও ভাল।

৫৭২। অল্প আগুণে তামাক খাওন,
আর ছোটলোকের খোষামোদ করণ।

৫৭৩। পাঁচজন যেই খানে
ভগবান সেইখানে।

৫৭৪। ভাল গরুটারে একটা বাড়ি
ভাল মানুষটারে একটা কথা।

৫৭৫। খ্যাতা ভইরা হাগ্‌লেও যমে ছাড়ে না।
খ্যাতা—কন্থা।

৫৭৬। দা' হারায় কান্দে,
কল্কী হারায় ডুবায়।
কাচি হারায় নাচে,
আর গামছা হারায় ত গেছে।

৫৭৭। ঢাকের বাওয়া।

৫৭৮। কোন খানের জল
কোন খানে গড়ায়।

৫৭৯। সভা বুইঝা কীর্ত্তন।

৫৮০। অতি চতুরের গলায় দড়ী।

৫৮১। আপনাটা চাই ষোল আনা,
পরেরটা কিছুই না।

৫৮২। শ্মশান পর্য্যন্ত চিকিৎসা।

৫৮৩। জ্বর না ডর ?
কাপে থর থর ?

৫৮৪। গুরু মিলে লাখে লাখ।
শিষ্য নাহি মিলে এক।

৫৮৫। রাইং পাতিলের আকাল কি ?
টোকায় টিক্‌লে হয়।

৫৮৬। যে খানে বাঘের ভয়,
সেই খানেই রাইত হয়।

৫৮৭। দিবার বেলা মোটেই নাই
নিবার কালে পুরা ষোল আনা চাই।

৫৮৮। কুমারের পুইনে কত কি পোড়ায়,
কোনটা ভাল থাকে, কোনটা ফাইট্টা যায়।

৫৮৯। নাইদেশে এরণ্ড বৃক্ষ।

৫৯০। এক দেশের বুলি
আর দেশের গালি।

৫৯১। খোস খবরের ঝুটাও ভাল।

৫৯২। গনার গরু বাঘে খায় না।

৫৯৩। ঘর থাকিতে বাঐ ভিজে।
বাঐ—বাবুই।

৫৯৪। মাথার উকুনেই মাথা খায়।

৫৯৫। হাটে হাড়ি ভাঙ্গল।

৫৯৬। লোলা দিয়া পোলা ভুলায়।
লোলা—খেলানা বিশেষ।

৫৯৭। ঠেকিল নায়ের বাইছ্‌ নাই।

৫৯৮। যে এট্টু আগে যায়,
তার লাগুর কি পাওয়া যায়।
এট্টু—একটুকু।

৫৯৯। রাগের চোটে,
বউক্‌না ফাটে।
বউক্‌না—পাকপাত্রবিশেষ।

৬০০। প্রথম বরে ভাতারের মাউগ
কমলালেবুর খোসা
দোয়াজবরে ভাতারের মাগ
নিত্য করে গোসা।
তেজবরে ভাতারের মাগ
সাথে বসি খায়।
চা'র বরে ভাতারের মাগ
কান্ধে চইড়া যায়।

৬০১। আমার ধান কইতরে খায়,
আমার রাম বাণিজ্যে যায়।
কইতরে—কবুতরে।

৬০২। হল্‌দি খাইলে আর রাঙ্গা পোলা হয় না।

৬০৩। খাল কাইটা কুমৈর আনা।

৬০৪। নিবার বেলা পরিপাটী
দিবার বেলা ফাটাফাটি।

৬০৫। একে ত হনুমান
তায় আবার রামের আজ্ঞা।

৬০৬। তোমাদের কুড়ালটা এট্টু দিবা নি ?
বাড়ীতেই নাই, দিব কি ?
ঐ ত বুঝি আছাড় দেখি।
দিব না, তবু তোমার গরজে নাকি ?

৬০৭। সেলামে সেলাম,
কপাল খাউজানে কপাল খাউজান।
খাউজান—চুলকান।

৬০৮। অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।

৬০৯। বাঘে মইষে যুদ্ধ করে
নল খাগড়ার আপাইল।
মইষে—মহিষে।
আপাইল—বিপদ।

৬১০। খালি থুইয়া সারা বাড়ী
সীমার গোড়ে পাড়াপাড়ী।

৬১১। মানুষ গা বড় সহজ নয়
উইড়্যা যাইতে পৈকের ফৈর গৈন্না কয়।
পৈকের—পাখীর।
গৈন্না—গণিয়া।

৬১২। ঝাকে ঝাকে টিয়া পড়ে
যার যার আধার সে সে করে।

৬১৩। ভু করে ছুইট্টা আসে,
গুমর করেন ঘরে বইসে।

৬১৪। তুমি ত কোন্ ছার
উচিত কথা কইতে ডর রাখি কার ?
উচিত কথা বাপেরেই কই একশত বার।

৬১৫। রাজা থাক্‌তে কোতালের দোহাই !

৬১৬। এমন কথার কপালে ছাই
আমি কি কারো মাথা তামাক খাই ?

৬১৭। কাইন্দ্যা মান,
যাইচা সোহাগ।
কাইন্দ্যা—কাঁদিয়া।
যাইচা—যাচ্ঞা করিয়া।

৬১৮। গিরস্তে বলে পরাণে মইলাম
ছাগলে বলে আলুনি খাইলাম।

৬১৯। যত দেখ ভুইয়া,
পথে পড়ে শুইয়া।
ভুইয়া—ভুইঞা।

৬২০। খাইতে খাইতে হাস্ হাস্
দিতে দিতে ত সর্ব্বনাশ।

৬২১। সাদামনে কাদা নাই।

৬২২। চালের ছন্‌ও থাউক
বৌদ্ধের মনও পাউক।
ছন—উলু খড়।

৬২৩। ধরাখান,
সরা জ্ঞান।

৬২৪। সাচ্চা গুর আঁধার রাইতেও মিঠা।

৬২৫। আহ্লাদের মাউগ তুমি
কাইন্দও না।
চিড়া খাইয়া হুইয়া থাকুম
রাইন্দও না।
হুইয়া—শুইয়া।
রাইন্দও—রাঁধিও।

৬২৬। যত মুস্কিল, তত আসান।

৬২৭। কাউয়ার বাসায় কুইলের ছাও
জাত আনুমান করে রাও।
কুইলের—কুকিলের।
রাও—রব।

৬২৮। বাঁশবনে ডোম কাণা।

৬২৯। বাধা মানে না গাধায়।
বাধা—হাঁচি।

৬৩০। হাড়াবাত্যার দাতে বিষ
কাঁচাকলা ভাতে দিস্।

৬৩১। দিশা নাই কি করছ
বুঝি সাপলা ক্ষেতে পড়ছ।

৬৩২। যত আছিল হেইজ মুতনী
বেবাকই হইল নিমন্তন্ন রান্ধনী।
হেইজ—শয্যায় বিছানায়।
মুতনী—প্রস্রাব কারিণী।
বেবাক—সকলেই।

৬৩৩। উইঠ্যা ধান খুইট্যা খায় না।

৬৩৪। কাটা যদি ঠেকে গলায়
বিড়ালেরও ধরে পায়।

৬৩৫। হরিঠাকুর! পায় ঠেক্।

৬৩৬। পরের পায়খানায় বাহ্য করলে,
আপনা পায়খানায়ও পরে বাহ্য করব।

৬৩৭। পেটে গু থাকলে
জিলাপির প্যাচেও আগন যায়।

৬৩৮। বুইড়া শালিকের ঘাড়ে লোম।

৬৩৯। বাইর সুন্দর ভিতরে মাখাল।

৬৪০। আকাঠা নায়ের সাজই বেশী।

৬৪১। বাপের বইন্ পিসি,
ভাত কাপড়ে পুষি।
মা'র বইন্ মাসী
কাদায় ফালাইয়া ঠাসি।

৬৪২। কাটা কান চুল দিয়া ঢাকা।

৬৪৩। পোয়াতী বিনে পোলার দরদ বোঝে কে?
পোলা—পুত্র।

৬৪৪। বউ আরটু খাও
ঠাইরাইন, পেটে কি আর জাগা আছে!

৬৪৫। চাচা আপন চাচী পর
চাচার মাইয়া বিয়া কর।

৬৪৬। খানকীর আবার জাতের বিচার!

৬৪৭। বৈষ্ণবী ল টং টং
কাউট্টা খাইতে বড় রঙ্।

৬৪৮। চোরের বাড়ী কবে দালান ওঠে।

৬৪৯। বীরের কর্ত্তা বীরেশ্বর
বড় মাথাটা ডাব নাইকল।
নাইকল—নারিকেল।

৬৫০। চাচী গো, মিঠাকোমরটা বস্ত না,
চাচার দিকে চাইও।

৬৫১। ধর্ম্মের ঢোল আপনি বাজে।

৬৫২। বইতে জান্‌লে লড়ে না
খাইতে জান্‌লে মরে না।
বইতে—বসিতে।

৬৫৩। মাইয়ারে আবার ছোট কয়
যার পেটে ছাও হয়।
ছাও—সন্তান।

৬৫৪। চাতক রইল মেঘের আশে
মেঘ বরিল অন্য দেশে।
বরিল—বর্ষিল।

৬৫৫। যদি হয় সুজন,
এক পিড়িতে বসে নয়জন।।
যদি হয় কুজন,
নয় পিঁড়িতেও বসে না নয়জন।

৬৫৬। অপে মারে ঢপের ঝি
মইষ মারা গুষ্ঠী।।

৬৫৭। এক আকালে তিন রান্ধনী
পুইড়া মরে ফেন গালনী ॥

৬৫৮। দেড় বুড়ী মানুষ না
তিন বুড়ী তার কথা ॥

৬৫৯। হাটে বিকায় না ঘাটে বিকায় না যে লাউ
তারে আন্‌ছে নন্দা সাউ ॥
বিকায়—বিক্রয় হয়।

৬৬০। দাদায় থাক্‌লে রান্ধাবাড়ী
দাদায় না থাক্‌লে শুধা বাড়ী ॥

৬৬১। পরের ভাত যে খায় সে বড় ডোর
পরের ঘরে যে থাকে সে বড় চোর ॥
ডোর—পেটুক।

৬৬২। আমি বা কই কি ?
ভুইয়ায় বা ন্যাহে কি ?
ভুইয়া—ভৌমিক।
ন্যাহে—লেখে।

৬৬৩। বিবাদী না বিবাদ করে
মান্দার গাছে * ঘহে ॥
ঘহে—ঘসে ॥

৬৬৪। বলে ছলে বামনে খায়
পরকালের কাম হয় ॥

৬৬৫। দেড় বুড়ী মাইন্‌ষের তিন বুড়ী কথা
শুন্‌তে লাগে মাথা ব্যাথা ॥

৬৬৬। দেই নেই ডিঙ্গা।

৬৬৭। ফুল ফুটলে ভরিয়া।

৬৬৮। নিয়তির চোক কাণা।

৬৬৯। আম ঘাটাই আম মূল।

৬৭০। সারা ঘর লেইপ্যা দুয়ারে আছার।
লেইপ্যা—লেপিয়া।

৬৭১। মুখের জহুতে হেঁচা গুঁতা।
জহুতে—দরুণ।

৬৭২। খুড়ীং খুড়ীং খুড়াং গেছেং কইং ? *

৬৭৩। যা'ব না যা'ব—যা'ব না।
খা'ব না খা'ব—খা'ব না ॥
না'ব না না'ব—না'ব না।
হাগি না হাগি—হাগব ॥

৬৭৪। মামার শালা পিসার ভাই
সে শালাগ সঙ্গে কোন সম্পর্কই নাই ॥

৬৭৫। রোগী হইল যখন তখন
ঔষধ ছ'মাসের পথ ॥

৬৭৬। ভস্ম মাখলেই যদি সন্ন্যাসী হয়,
চাউল কুম্‌ড়া ক্ষেত কুম্‌ড়া
ক্যান্ তবে বাকী রয় ?

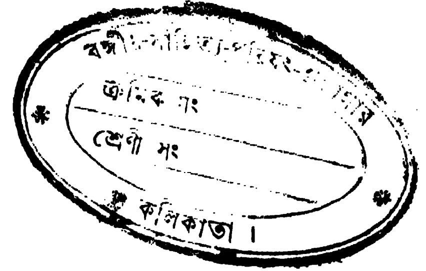
৬৭৭। খাইতে আহ্লাদ,
শিন্ধ্‌তে আহ্লাদ,
বেন্নাদবিতে কিসের আহ্লাদ।

---

* পিতৃমাতৃহীন বালক এতদিন খুড়ার আশ্রেই প্রতিপালিত হইয়া আসিতে ছিল। খুড়া সংস্কৃত শিক্ষার নিমিত্ত দূরে এক বিজ্ঞ অধ্যাপকের নিকট ভ্রাতুষ্পুত্রকে রাখিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। এদিকে শ্রীমান্‌ত লেখাপড়ায় একেবারেই অমনোযোগী। কাজেই গুরু আর তাহাকে কতকাল অনর্থক খাওয়াইবে? সুতরাং শ্রীমান্ স্বীয় খুল্লতাতকে জানাইল যে আমার লেখাপড়া হইয়া গিয়াছে, আমি শীঘ্রই বাটী পোঁছিতেছি। শ্রীমানের আগমনের বৃত্তান্ত শুনিয়া নিরক্ষর খুড়ার মনে ভারি ভয় জন্মিল যে সে কেমন করিয়া এত বড় বিজ্ঞ ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত আলাপ করিবে। তাই ভয়ে ২ খাটের নীচে আশ্রয় লইল। এদিকে খুড়ীমা শ্রীমানের সংস্কৃতে অনুস্বারের ছড়াছড়ি দেখিয়া বলিয়া উঠিল—

অনুস্বার দিলেই যদি
সংস্কৃত হয়।
তবে কেন তোমার খুড়ায়
খাটের তলে রয়।

প্রতিভা



৫ম বর্ষ | শ্রাবণ ১৩২২ | ৪র্থ সংখ্যা

কাগজ। *

কাগজ পারস্থ শব্দ হইলেও এই শ্রেণীর আরও বহু শব্দের ন্যায় বাঙ্গলা ভাষায় স্থায়ীভাবে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় কাগজের প্রতিশব্দ 'পত্র'; কিন্তু কাগজ বলিতে আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি, সংস্কৃত 'পত্র' শব্দে যেন ঠিক সেরূপ ভাব প্রকাশ পায় না। ইংরাজি 'পেপার' (Paper) জার্ম্মান 'পেপিয়ার' (Papier) প্রভৃতি ইউরোপে প্রচলিত কাগজের পারিভাষিক শব্দ-সমূহ মিশরী পেপিরাস (Papyrus) শব্দ হইতে সম্পন্ন। 'পেপিরস' ভারতবর্ষীয় 'নলের' ন্যায় মিশর দেশীয় একপ্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ। এখনও 'নীল' নদের উভয় পার্শ্বস্থ নিম্নভূমিতে অসংখ্য আরণ্য পেপিরাস জন্মিয়া থাকে। প্রাচীনকালে মিশরবাসিগণ পেপিরাসের পাতে লিখিতেন। ক্রমে পেপিরাসের ব্যবহার ইউরোপে প্রচলিত এবং সঙ্গে সঙ্গে পেপার প্রভৃতি শব্দের উৎপত্তি হয়।

স্মরণীয় বিষয় বা ঘটনার বিবরণ স্থায়ী করিয়া রাখার ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি অতি স্বাভাবিক। অতি প্রাচীন কালে মানবজাতি প্রস্তর-গাত্রে বা পরিস্কৃত ছাগ অথবা মেষ চর্ম্মোপরি তাহাদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। ক্রমে প্রস্তর ও চর্ম্মের পরিবর্ত্তে নানা প্রকার বৃক্ষবল্কল ও কাষ্ঠফলক ব্যবহৃত হইতে থাকে। আধুনিক কাগজের স্থলে প্রাচীনকালে চীন ও জাপানে বংশ ফলক, মিশরে পেপিরাসের পাত, উত্তর ইউরোপে 'বিচ' (Beech) নামক বৃক্ষকাষ্ঠের ফলক, ভারতবর্ষে ভূর্জ্জপত্র ও কখনও কখনও তালপত্র, এবং আসামের আদিম জাতি-সমূহের মধ্যে অগুরু বৃক্ষের অন্তর্বল্কল ব্যবহৃত হইত। কথিত আছে, চীনদেশের অতি পুরাতন কালের ইতিহাস বংশ-ফলকে লিখিত বা খোদিত ছিল; কোনও এক পারিবারিক সংগ্রামে উক্ত অমূল্য গ্রন্থ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। মিশর হইতে পাঁচসহস্র বৎসর পূর্ব্বের লিখিত পেপিরাসের পাত

* বর্দ্ধমান অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত।

আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু লিখিবার উপাদানরূপে পেপিরাস অপেক্ষা বংশফলকের ব্যবহার যে প্রাচীনতর তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। 'বিচ' শব্দ হইতে Bece, Boc, Bucho. Book, প্রভৃতি পুস্তকার্থবাচক পাশ্চাত্য শব্দ সমূহের উৎপত্তি হইয়াছে। বায়ুর আর্দ্রতা নিবন্ধন ভারতবর্ষের মত দেশে ভূর্জ্জপত্র উর্দ্ধ সংখ্যায় ৩০০ শত বৎসরের অধিক স্থায়ী হইতে পারে না; কালক্রমে স্বতঃই বিনষ্ট হইয়া যায়। কাজেই ভূর্জ্জপত্রের লিখিত যে সমস্ত অতি প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ, লিপি, অনুশাসন প্রভৃতি আমাদের দেশে দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা মূল হইতে বহুবার পুনর্লিখিত অনুলিপিমাত্র। কাশ্মীরে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে লিখিত ভূর্জ্জপত্র ও নেপালে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে লিখিত তালপাতার পুথি পাওয়া গিয়াছে; এদেশীয় হস্তলিখিত মূলগ্রন্থের ইহাই বোধ হয় প্রাচীনতম নিদর্শন।

চীনদেশের নাম শুনিলেই অনেকে অবজ্ঞাভরে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহারা হয় ত শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে শিক্ষা ও জ্ঞানগৌরবে চীনদেশ এককালে সমগ্র জগতের আদর্শ ছিল, এবং জগতের কল্যাণকর বহু আবিষ্কারই প্রাচীনকালে চৈনিক বৈজ্ঞানিকগণ কর্তৃক সাধিত হইয়াছে। চীনদেশেই সর্ব্বপ্রথমে কাগজ প্রস্তুত ও ব্যবহৃত হয়। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইউরোপে প্রথম কাগজ প্রস্তুত হয়। কিন্তু তাহার প্রায় দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে চৈনিক বৈজ্ঞানিকগণ কাগজ প্রস্তুতের উৎকৃষ্ট প্রণালীসমূহ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। খৃষ্টের জন্মের ৩৬০ বৎসর পূর্ব্বেও যে চীনদেশে শণ ও বাঁশের আঁস হইতে কাগজ প্রস্তুত হইত, এবং খৃঃ পূঃ ২০৫ অব্দে ছিয়ালুন (Tsia lun) নামক জনৈক পণ্ডিত যে পুরাতন রেশম ও কার্পাস বস্ত্রাদি হইতে কাগজ প্রস্তুত প্রণালী শিল্পিদিগকে শিক্ষা দিতেন, তাহার বহু অকাট্য ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। চীনদেশীয় ভাষায় কাগজের প্রতিশব্দ 'কায়গত'। দাক্ষিণাত্যে এখনও কাগজের স্থলে 'কাগত্' শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বোধ হয় 'কায়গত' হইতেই বিশুদ্ধ পারস্য কাখজ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে এবং 'কাগত' ও 'কাখজ' এই দুইটি শব্দ পরিবর্ত্তিত ও একত্রিত হইয়া প্রচলিত 'কাগজ' শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে।

কাগজ প্রস্তুত প্রণালীর জন্য সমগ্র জগৎ চীনদেশের নিকট ঋণী। চীন হইতে কাগজের ব্যবহার ক্রমে জাপান, তিব্বত, খোটান, সমরখণ্ড, নেপাল ও কাশ্মীরে প্রবর্ত্তিত হয়। ইউরোপে কাগজ প্রচলিত হইবার বহু শতাব্দী পূর্ব্বেও যে পারস্য, মধ্য এশিয়া, চীন ও তিব্বতে উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত হইত, 'ষ্টাইন' (Stein) কর্তৃক খোটান হইতে আবিষ্কৃত প্রাচীন লিপি প্রভৃতি হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ষ্টাইন্ সংগৃহীত কাগজ সমূহের মধ্যে ৭৯০ খৃঃ অঃ পারস্য হইতে জনৈক ইহুদি ব্যবসায়ী কর্তৃক লিখিত একখণ্ড পত্র, পশ্চিম চীন রাজবংশের সংস্থাপক সম্রাট উ. তি (Wu Ti) কর্তৃক ২৬৫ খৃঃ অঃ লিখিত একখানা লিপি ও অষ্টমভাগে তিব্বত হইতে লিখিত একখণ্ড লিপির বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা প্রাচীনকালের কাগজ সম্বন্ধে বহু নূতন ও জ্ঞাতব্য তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। অধ্যাপক 'ভিস্নার (Wiesner) শেষোক্ত কাগজের রাসায়নিক ও আনুবীক্ষণিক পরীক্ষা করিয়া উহা নেপালে সেট-বরুয়া সেট-বরোয়া, সাত-পুরা (বৈজ্ঞানিক নাম Daphne) প্রভৃতি নামে পরিচিত গুল্মবিশেষের আঁশ দ্বারা তিব্বতে প্রস্তুত বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন; অধিকন্তু উহা হইতে জানা গিয়াছে যে তিব্বতীয়গণ ভাতের মাড় বা চাউলের জল দ্বারা কাগজ মসৃণ করার প্রণালী পর্য্যন্ত জ্ঞাত ছিলেন। অতএব দেখা যায় যে, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে তিব্বতে বৃক্ষাদির আঁস বা তন্তু হইতে কাগজ প্রস্তুত হইত। অবশ্য ইহার বহু পূর্ব্বেই চীনে এবং খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দীতে

জাপানে কাগজ প্রস্তুতের জন্য উক্তরূপ উপাদান ব্যবহৃত হইত। প্রাচীন কালে যে সমস্ত বৃক্ষতন্তু কাগজ প্রস্তুতের জন্য আদৃত হইত তন্মধ্যে জাপানী 'কদুজ' (Broussonotia Papyrifera) সেট বরুয়া, রাম ও শণের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। অধ্যাপক 'গাইল্‌স্' (Giles) এর মতে পেন-ত্‌-সোয়া-কাং-মু (Pen-Tsoa-kang-mu) নামক গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, পূর্ব্বে চীনদেশে 'সুচুয়ান' প্রদেশে শণ, 'ফুকিয়াং' প্রদেশে বংশ, কিয়াংসু প্রদেশে বেত্র, চাহকিয়াং প্রদেশে ধান্য গোধূমাদির খোসা, উত্তরাংশে তুঁত বৃক্ষের বল্কল, সমুদ্রোপকুলবর্ত্তী প্রদেশ সমূহে গাছ সেওলা (Lichen), মধ্য প্রদেশে রেশম ও হুপে প্রদেশে কদুজ বৃক্ষের আঁস হইতে সাধারণতঃ কাগজ প্রস্তুত হইত। ঐতিহাসিক গিবনের (Gibbon) মতে পুরাতন বস্ত্রাদি হইতে কাগজ প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে জ্ঞান সমরখণ্ড হইতে চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়। আরবগণ সমরখণ্ড জয়ের পর কাগজের ব্যবহার ও কাগজ প্রস্তুত প্রণালী জ্ঞাত হয় এবং তাহারাই পরবর্ত্তী সময়ে স্পেনে (Spain) উহা প্রচলিত করে। খৃষ্টীয় ৭১০ অঃ মক্কা নগরে প্রথম কাগজ প্রস্তুত হয়।

১২১০ খৃঃ অঃ কুব্‌লাই খান পেকিনে (Pekin) মুদ্রার পরিবর্ত্তে আধুনিক নোটের ন্যায় রাজকীয় মোহরাঙ্কিত কাগজ প্রবর্ত্তিত করেন। পরিব্রাজক মার্কো পলো (Marco Polo) ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চীন দেশে মুদ্রার পরিবর্ত্তে কাগজের ব্যবহার সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন অতএব দেখা যায় যে নোট বা হুণ্ডি ইউরোপে প্রবর্ত্তিত হইবার বহু পূর্ব্বেই চীনদেশে প্রচলিত ছিল।

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইউরোপীয় শিল্পিগণ চৈনিকদের নিকট হইতেই কাগজপ্রস্তুতপ্রণালী শিক্ষা করেন। খৃষ্টীয় ১১৯০ সনে জার্ম্মাণীতে, ১২৫০ সনে ফ্রান্সে, ১২৭৫ সনে ইটালীতে এবং ১৪৩০ সনে সুইজরলণ্ডে প্রথম কাগজ প্রচলিত হয়। ১২৭০ সনে জার্ম্মানীতে এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে স্পেনে কাগজ প্রস্তুত হয়। ১৫৮৮ খৃঃ অঃ জন্ স্পিল্‌ম্যান্ (John Speilman) নামক জনৈক জার্ম্মান জহুরী 'কেণ্ট' প্রদেশে 'ড্রাড্‌ফোর্ড' নামক স্থানে ইংলণ্ডে সর্ব্বপ্রথম কাগজ প্রস্তুত আরম্ভ করেন; সাম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ উক্ত জহুরীকে উচ্চ নাইট (Knight) উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৬৯০ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে নিকৃষ্ট এবং বাদামী রঙের কাগজ মাত্র প্রস্তুত হইত; উৎকৃষ্ট এবং সাদা কাগজ ওলন্দাজ ও ফরাসীদের নিকট হইতে ক্রীত হইত। ঐ সময়ে ফরাসীদেশজাত কাগজের শুল্ক অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়াতে ইংরেজশিল্পিগণ উৎকৃষ্ট ও সাদা কাগজ প্রস্তুত করিতে বদ্ধপরিকর হন এবং অল্পকাল মধ্যেই এ বিষয়ে আশাতীত সফলতা লাভ করেন।

১৮০০ খৃঃ অব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যন্ত্রাদির সাহায্য ব্যতিরেকে হাতে কাগজ প্রস্তুত হইত। উক্ত সনে কাগজ সম্বন্ধীয় শিল্পে যন্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত হয় এবং ১৮২৫ সনে সর্ব্ব প্রথমে কলে কাগজ প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়। তৎকালে যন্ত্রাদির সাহায্যে প্রতি মিনিটে দুইহাত প্রশস্ত আট হস্ত দীর্ঘ কাগজ প্রস্তুত হইত। উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক আবর্ত্তনে কাগজ প্রস্তুত প্রণালীর প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং প্রতি বৎসরই উন্নততর প্রণালীসমূহ আবিষ্কৃত ও অবলম্বিত হইতেছে। বলা বাহুল্য বর্ত্তমান সময়ে কাগজের কলসমূহে প্রায় সমস্ত প্রক্রিয়াই যন্ত্র সাহায্যে সম্পন্ন হয়। আধুনিক বৃহদাকার যন্ত্রসমূহে প্রতি মিনিটে ৮ হাত প্রশস্ত ৩৩০ হস্ত পরিমিত দীর্ঘ কাগজ প্রস্তুত হইতেছে এবং অনেক কলে দৈনিক ২৭০০ মণ হইতে ৬৮০০ মণ পর্য্যন্ত কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

এক সময়ে কাশ্মীর কাগজের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল এবং প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণে

কাশ্মীরি কাগজ ভারতবর্ষে প্রেরিত হইত। 'Valley of Cashmere' নামক গ্রন্থ প্রণেতা 'লরেন্সের' (Lawrence) মতে সমরখণ্ড হইতে কাশ্মীরে কাগজ প্রস্তুত প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু চীন বা তিব্বত হইতেই কাশ্মীরী ও নেপালী শিল্পিগণ উক্ত শিল্প শিক্ষা করিয়াছিলেন, ইহাই অধিকতর সম্ভবপর। কাশ্মীর ও নেপালে বহু পূর্ব্বেই কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকিলেও প্রকৃত (?) ভারতবর্ষে ঠিক কোন্ সময় হইতে কাগজ ব্যবহৃত বা প্রস্তুত হইতেছে তৎসম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ-গণের মধ্যেও মতদ্বৈধ লক্ষিত হয়। চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও বিশ্বাসযোগ্য লেখক ভারতবর্ষের কাগজের ব্যবহার সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করেন নাই। কেবল পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পরিব্রাজক 'নিকলো-কোণ্টি' (Nicholo Conti) ভারত-ভ্রমণ করিয়া তৎকালে কেম্বে প্রদেশে কাগজ এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশে বৃক্ষপত্র লিখিবার উপাদানরূপে ব্যবহৃত হইত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। দৌত্যকার্য্যের নিমিত্ত আবদার রজ্জাক নামক জনৈক রাজদূত ১৪৪২ খৃঃ অঃ পারস্য হইতে বিজয়নগরে আগমন করেন। উক্ত স্থানের অধিবাসিগণ তৎকালে কাগজের ব্যবহার জানিতেন না এবং তালপত্রে লিখিতেন বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। সাধারণ গৃহীত মত অনুসারে ষোড়শ শতাব্দীতে সম্রাট আকবরের সময় কাশ্মীর হইতে ভারতবর্ষে কাগজ প্রস্তুত প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়। পক্ষান্তরে ৬২৫ বৎসর পূর্ব্বেও যে শিয়ালকোট নগরে কাগজ প্রস্তুত হইত তাহার বহু প্রমাণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। এক দিকে নিকলো-কোণ্টি প্রমুখ বৈদেশিক পরিব্রাজকদিগের লেখা হইতে প্রমাণিত হয় যে সম্রাট আকবরের শতাধিক বৎসরের পূর্ব্বেও ভারতবর্ষে কাগজ প্রস্তুত না হইলেও স্থলে উহার ব্যবহার প্রচলিত ছিল; অপর দিকে পরিব্রাজক 'পিয়াট্রো-ডেললা-ভেইল' (Pietro-Della-Valla) ১৬২৩ খৃঃ অঃ এবং 'থেভনট' (Thevonot) ১৬৮৭ খৃঃ অঃ ভারতভ্রমণ করিয়া যথাক্রমে ম্যাঙ্গালোর ও মালবরে লিখিবার উপাদান রূপে মাত্র তালপত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, কাগজ সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। এমত অবস্থায় এদেশে কখন কাগজ প্রথম প্রচলিত বা প্রস্তুত হইয়াছে তাহার সঠিক নির্দ্ধারণ করা এক প্রকার অসম্ভব। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে যে ভারতবর্ষে কাগজ প্রস্তুত ও ব্যবহৃত হইত তৎবিষয়ে সন্দেহের কিছুমাত্র কারণ নাই। ১৬৭৯ খৃঃ অঃ 'ওভিংটন্' (Ovington) দশফুট দীর্ঘ ও দুই ফুট প্রশস্ত তৎসাময়িক 'মহাজনি" খাতার, অতি মনোরম বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। 'আইরণ সাইড্' (Iron Side) ১৭৭৪ খৃঃ অঃ ভারতবর্ষে প্রচলিত কাগজ প্রস্তুত প্রণালীর বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বহু লেখক ভারতবর্ষীয় কাগজ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া থাকিলেও তাহাদের লেখা হইতে ঐ সময়ে এদেশের কাগজশিল্পের অবস্থা কতদূর উন্নত ছিল, তৎসম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যে উক্ত শিল্পের বিশেষ উন্নতি ছিল না তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কারণ ১৮৪০ খৃঃ অব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রতিবৎসর চীনদেশ হইতে বহুটাকা মূল্যের কাগজ ভারতবর্ষে প্রেরিত হইত। ঐ সময়ে কাগজের প্রতি দেশীয় শিল্পিদিগের মনোযোগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয় এবং ভারতের প্রায় সকল প্রদেশেই অল্পাধিক পরিমাণে কাগজ কোনও প্রকার যন্ত্রাদির সাহায্য ব্যতিরেকে হাতে প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করে। কিন্তু 'সার চারলস্ উড' (Sir Charles Wood) যখন ভারতবর্ষের প্রধান কার্য্যসচিবের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন তিনি বিধান করেন যে এদেশে সরকারী কার্য্যের জন্য ব্যবহার্য্য সমস্ত দ্রব্যই ইংলণ্ডে ক্রয় করিতে হইবে। উত্থানশীল শিশু শিল্পটি অপ্রত্যাশিত ভাবে এইরূপে বাধা প্রাপ্ত হওয়াতে অচিরেই পুনরায়

অবনত হইয়া পড়ে। বর্ত্তমান সময়ে এদেশে আর হাতে কাগজ প্রস্তুত হয় না। কোন্ সময়ে ভারতবর্ষে কাগজের কল প্রথম স্থাপিত হয় তাহাও সঠিক বলা যায় না। বোধ হয় শ্রীরামপুরই এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক; কারণ ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে যে শ্রীরামপুরে একটি ছোট রকমের কাগজের কল ছিল, তদ্বিষয়ে স্থানীয় বৃদ্ধদিগের মধ্যে অনেকেই বোধহয় সাক্ষ্য প্রদান করিবেন। কিন্তু এদেশে 'শ্রীরামপুরি কাগজ' নামে যে কাগজ প্রচলিত, তাহার সঙ্গে প্রকৃত পক্ষে শ্রীরামপুরের কোনও সম্পর্ক নাই। উহা ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত হাতে প্রস্তুত দেশীয় একপ্রকার সাদা কাগজ মাত্র। হয় ত ঐ প্রকার কাগজ শ্রীরামপুরেই প্রথম প্রস্তুত হইয়াছিল বা পূর্ব্বে প্রস্তুত হইত, এবং তাহা হইতেই 'শ্রীরামপুরি কাগজ' নামের সৃষ্টি হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ বৈদেশিক মূলধনে পরিচালিত আটটি কাগজের কল বিদ্যমান থাকিলেও দেশে যত কাগজের প্রয়োজন উক্ত কল সমূহে তত কাগজ উৎপন্ন হয় না। কাজেই বাধ্য হইয়া সামান্য কাগজের জন্যও আমাদিগকে কতকটা ইউরোপের উপর নির্ভর করিতে হয়। বাৎসরিক গড়ে প্রায় এক কোটি টাকা মূল্যের কাগজ ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে প্রেরিত হইয়া থাকে। ১৯০৬-৭ সনে ইংলণ্ড হইতে ৪৪,০৬,৩১২ টাকা, জার্ম্মাণী হইতে ১৫,৮২,৪৪৫ টাকা, অষ্ট্রীয়া হইতে ৭০,৪৫২৫ টাকা, বেলজিয়ম হইতে ৬, ৬৬, ৬০৮ টাকা, মোট ৮০, ১১, ১০৫ টাকা মূল্যের কাগজ ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছিল।

কাগজ "সেলুলোজ (cellulose) বা জৈব আঁশ" বিশেষের জমাট গাঁথুনিমাত্র। প্রায়শঃই গুরুত্ববৃদ্ধি, রন্ধ্র নিবারণ ও মসৃণ করার জন্য কাগজের সঙ্গে কতকটা ধাতব পদার্থ মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। বর্ত্তমান সময়ে পুরাতন বা জীর্ণ বস্ত্রাদি, পুরাতন কাগজ, নানা প্রকার বৃক্ষ কাষ্ঠ, স্পেন ও উত্তর আফ্রিকাজাত এস্পরটো নামক ঘাস, খড়, শণ, বাঁশ ও পাট হইতে কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এতন্মধ্যে পুরাতন বস্ত্র ও কাষ্ঠের নামই সর্ব্বপ্রথম ও বিশেষভাবে উল্লেখনীয়, কারণ উক্ত উপাদানদ্বয়ই অধিক ব্যবহৃত হয়। আদি উপাদান সামগ্রীটিকে সূক্ষ্মতম আঁস বিশিষ্ট মণ্ডে পরিণত করাই কাগজ প্রস্তুতের মূলসূত্র। কাষ্ঠ ও তৃণ হইতে প্রস্তুত উক্তরূপ মণ্ড যথাক্রমে 'কাষ্ঠমণ্ড' (wood pulp) ও 'তৃণ-মণ্ড' (straw pulp) নামে পরিচিত। পূর্ব্বতালিকান্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন উপাদান হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন শ্রেণীর কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে। পুরাতন কার্পাস বা ক্ষৌম বস্ত্র হইতে যে প্রকার উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত হয়, কাষ্ঠাদির মণ্ড হইতে সেরূপ কাগজ তৈয়ার করা যায় না। সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য বিভিন্ন প্রকার কাগজ সমূহ যে যে উপাদান হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে, নিম্নে তাহার একটি মোটামুটি বিবরণ দেওয়া গেল।

কাগজের নাম	মূল উপাদানের নাম
১। ছাপিবার কাগজ অর্থাৎ সাধারণ কাগজ (Printing paper)	কাষ্ঠ মণ্ড খড়, পাট, শণ, পুরাতন দড়ি ইত্যাদি।
২। মোড়ক বাঁধিবার কাগজ (Wrapping paper).	পুরাতন কার্পাস বস্ত্র।
৩। লিখিবার অর্থাৎ উৎকৃষ্ট কাগজ (Writing paper).	

আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির সাহায্যে কাগজ প্রস্তুত প্রণালীর পুঙ্খানুপুঙ্খ সবিস্তার বর্ণনা জটিলতা-নিবন্ধন সাধারণের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা ততটা সহজ হইবে না মনে করিয়া পুরাতন বস্ত্র হইতে কি উপায়ে কাগজ তৈয়ারী হইয়া থাকে তাহারই একটা মোটামুটি ধারণা দিয়ে দেওয়া গেল ঃ—ছিন্নবস্ত্রসমূহকে প্রথমতঃ প্রকারভেদে ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত করা হয়। এই প্রক্রিয়ার উপর কি শ্রেণীর কাগজ প্রস্তুত হইবে তাহা সম্পূর্ণ নির্ভর করে; কাজেই এ স্থলে বিশেষ পারদর্শী নির্ব্বাচকের আবশ্যক। তৎপর কোনও এক ভাগ গ্রহণ করতঃ তন্মধ্যস্থ ধূলিকণাসমূহ উত্তমরূপে ঝাড়িয়া ফেলিয়া বস্ত্রগুলাকে জল দ্বারা সিক্ত করা হয়, এবং বাষ্প ও ক্ষার সাহায্যে কোনও প্রকার সংলগ্ন রং, শ্বেতসার, চর্ব্বি বা আঠা থাকিলে তাহা ধৌত করিয়া ফেলা হয়। উক্তরূপ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সূত্রগুলি অত্যন্ত নরম হইয়া পড়ে। তখন নরম সূত্রস্তূপকে অল্প জল সংযোগে উত্তমরূপে পিশিয়া অতিসূক্ষ্ম আঁশ-সমান্বিত মণ্ডে পরিণত করা হয়। কাগজের রং ঈষৎ নীলাভ এবং উহা রন্ধ্রশূন্য করার জন্য সাধারণতঃ এ স্থলে পূর্ব্বোক্ত মণ্ডের সহিত অল্প পরিমাণ নীল বর্ণের কোনও কৃত্রিম রং ও ইচ্ছানুরূপ কোনও ধাতব পদার্থ মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। তদনন্তর প্রয়োজনানুযায়ী জল মিশ্রিত করিয়া মণ্ডটাকে কতকটা পাতলা করা হয়। বলা বাহুল্য যে, মণ্ডমধ্যস্থ অতিসূক্ষ্ম জৈব আঁস বা তন্তুসমূহ জলে সম্পূর্ণ অদ্রবণীয়। তৎপর উক্ত পাতলা মণ্ড একখণ্ড তাম্রনির্ম্মিত অতিসূক্ষ্ম চালনীর উপরে অতি পাতলা আস্তরণরূপে পড়িয়া থাকে। তখন ঐ আস্তরণের তলদেশ ও উপরিভাগে চাপ প্রয়োগ করিলে আঁসসমূহ সকল দিকে সমভাবে বিস্তৃত এবং জড়িত বা গ্রথিত হইয়া পড়ে। পূর্ব্ব কথিত উপায়ে প্রস্তুত জমাট পাতলা আস্তরণটীকে উত্তাপ ও চাপ সাহায্যে শুষ্ক এবং মসৃণ করিয়া লইলেই কাগজ প্রস্তুত হইল।

বৈজ্ঞানিকদিগের মতে কোনও বস্তুর ধ্বংস নাই। সাধারণ লোকে যাহাকে ধ্বংস বা বিনাশ বলিয়া থাকে তাহা পদার্থনিচয়ের রূপান্তর মাত্র। অনেক সময়ে যে সমস্ত বস্তু অপ্রয়োজনীয় বিবেচনায় অবহেলায় পরিত্যক্ত হইয়া থাকে, বৈজ্ঞানিকের যাদুদণ্ড সংস্পর্শে হয় ত তাহাই পুনরায় নবকলেবর ধারণপূর্ব্বক অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যরূপে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। পুরাতন বস্ত্রাদি হইতে কাগজ প্রস্তুত ইহার অন্যতম উদাহরণ। পাশ্চাত্য দেশসমূহে প্রতি বৎসর কোটি কোটি টাকা মূল্যের পুরাতন বস্ত্র কাগজ প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। ১৯০৯ সনে ২৭০০,০০০ টাকা মূল্যের ৪,৭৯,৯৭৯ মণ পুরাতন বস্ত্র ইংলণ্ডে আমদানী হইয়াছিল। অবশ্য ইংলণ্ড হইতে সংগৃহীত পুরাতন বস্ত্রের পরিমাণ ইহার চতুর্গুণ বা তাহারও অধিক। অতএব দেখা যাইতেছে যে, একমাত্র ইংলণ্ডেই প্রতিবৎসর এককোটি টাকারও অধিক মূল্যের পুরাতন বস্ত্র কাগজ প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইটালী হইতে ১৯০৫ সনে ১৮০০,০০০ মণ পুরাতন বস্ত্র সংগৃহীত হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত ২টী দৃষ্টান্ত হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে পুরাতন বস্ত্রকে আমরা যতটা অবহেলা করিয়া থাকি, প্রকৃত পক্ষে উহা ততটা অবহেলার বস্তু নয়। কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও এদেশীয় একশ্রেণীর লোককে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া পুরাতন বস্ত্র সংগ্রহ করিতে দেখা যাইত। বলা বাহুল্য উহার সমস্তটাই কাগজ প্রস্তুতের জন্য কলিকাতার সন্নিকটে অবস্থিত কলসমূহে প্রেরিত হইত। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আর ওরূপে পুরাতন বস্ত্র সংগৃহীত হয় না। কাগজ প্রস্তুতের অন্যান্য প্রকার উপাদানের প্রাচুর্য্যই বোধহয় ইহার কারণ।

বিভিন্ন উন্নত দেশসমূহের কাগজ ও তৎসংশ্লিষ্ট শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল।

আমেরিকার যুক্ত রাজ্য সমূহ, ১৯০৪ খৃঃ অঃ—

মোট কারখানার সংখ্যা ১২০০
মূলধন ... ... ৬০০,০০০,০০০ টাকা
প্রস্তুত কাগজের পরিমাণ... ১০৮,০০০,০০০ মণ।
" " মূল্য ... ৪৬৩,০০০,০০০ টাকা
কাষ্ঠমণ্ড প্রস্তুতের কারখানার সংখ্যা ২৫৩
" " জন্য ব্যবহৃত কাষ্ঠের মূল্য...১০৪,০০০,০০০টাকা
বিদেশে রপ্তানিকৃত কাগজের মূল্য...৬০,০০০,০০০ টাকা

জার্ম্মানী ১৯০৪ সন—

মোট কারখানার সংখ্যা ১৬০০
কাগজশিল্প সংশ্লিষ্ট শ্রমজীবির সংখ্যা .. ৬৫০০০
প্রস্তুত কাগজের পরিমাণ ... ৩৫,৫০০,০০৯ মণ
কাষ্ঠমণ্ড প্রস্তুত কারখানার সংখ্যা ... ৬০০
বিদেশে প্রেরিত পণ্যের পরিমাণ (1) কাগজ ৬৭৫০,০০০মণ
(2) কাষ্ঠমণ্ড ২১৬০০০"
(3) সেলুলোজ ১৭২৮০০০"

নরওয়ে—১৯১০ সন

মোট কারখানার সংখ্যা ২৭
শ্রমজীবির সংখ্যা ৮০০০
প্রস্তুত কাগজের পরিমাণ ... ৪০৫০,০০০ মণ
" মূল্য ... ২২,৫০০,০০০, টাকা
বিদেশে প্রেরিত কাগজের মূল্য ১৮,৭১০,০০০ টাকা

সুইডেন—১৯০৪ সন

মোট কারখানার সংখ্যা ৪০
প্রস্তুত কাগজের পরিমাণ ... ৬০৭৫০০০ মণ
প্রস্তুত কাগজের মূল্য ... ৩৮০০০০০০ টাকা

ফ্রান্স—১৯০৪ সন

শ্রমজীবির সংখ্যা ৬০০০
প্রস্তুত কাগজের পরিমাণ ... ১২,১৫০,০০০ মণ

রুশিয়া—১৯০৬ সন

প্রস্তুত কাগজের পরিমাণ ... ৫৫,৩৫,০০০ মণ
" " মূল্য ... ১৪ ০০০ ০০০ টাকা

অষ্ট্রীয়া—১৯০৪ সন

প্রস্তুত কাগজের পরিমাণ ... ৯,৪৫০ ০০০ মণ

ইংলণ্ড—১৯০৪ সন

শিল্পের অবস্থা—অনেকটা জার্ম্মাণ শিল্পের অনুরূপ।
বিদেশ হইতে আমদানী কৃত কাগজ প্রস্তুতের উপাদানের মূল্য } ৫২,২০০,০০০টাকা

স্পেন—১৯০৬ সন

প্রস্তুত কাগজের পরিমাণ ... ৯,৪১,০০০ মণ

ইটালি—১৯০৯ সন

প্রস্তুত কাগজের পরিমাণ ... ৫৪,০০,০০০ মণ

ভারতবর্ষ ১৯১১ সন

মোট কারখানার সংখ্যা ৮
মূলধন ... ... ৬৭,৩৩,০০০ টাকা
শ্রমজীবির সংখ্যা ৪২৬৬
প্রস্তুত কাগজের পরিমাণ ... ৫,৬২৫০০ মণ
" " মূল্য ... ৬১,৪৯,৯৪৬ টাকা

এদেশীয় কাগজের কল সমূহের মধ্যে ৩টী বোম্বাই অঞ্চলে, ৪টী কলিকাতার সন্নিকটে এবং একটি লক্ষ্ণৌতে অবস্থিত। কলিকাতার সন্নিকটে প্রতিষ্ঠিত ৪টী কলে প্রতি সপ্তাহে ৯৭২০ মণ অর্থাৎ প্রতিকলে দৈনিক ৩৫০ মণ কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

কাগজ আমাদের দৈনন্দিন সুখস্বচ্ছন্দতার সহিত বিশেষভাবে জড়িত। ছাপা ও লেখা ব্যতিরেকে নানা প্রকার বিক্রেয় বস্তু মুড়িবার জন্য, গৃহসজ্জার নিমিত্ত, বিভিন্ন কার্য্যে পেষ্টবোর্ড (Paste board) রূপে, এবং অন্যান্য বহুপ্রকারে আমরা সর্ব্বদা কাগজ ব্যবহার করিয়া থাকি। অবশ্য মুদ্রাঙ্কনের জন্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ কাগজ ব্যবহৃত হয়। সমগ্র পৃথিবীতে প্রতিবৎসর গড়ে ৭৫০০০ খানা নূতন পুস্তক প্রকাশিত হইয়া থাকে এবং তজ্জন্য কেবল কাষ্ঠমণ্ডই ৬৭৫০০০

মণের প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত প্রায় ৩০,০০০ সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতেছে; উহাদের ১১০,০০,০০০ খণ্ড নিয়মিতরূপে প্রচারিত হইয়া থাকে। এই সংবাদপত্র সমূহের জন্য কতটা কাগজ ব্যয়িত হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। বলা বাহুল্য, এস্থলে অপেক্ষাকৃত উন্নত দেশ সমূহের হিসাবমাত্র ধরা হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে সমগ্র পৃথিবীতে বাৎসরিক মোট প্রায় ২৮০,০০০,০০০ মণ কাগজ প্রস্তুত ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কোন্ প্রকার কাগজ কি পরিমাণ প্রস্তুত হয়, নিম্নে তাহার একটা খসরা হিসাব দেওয়া গেল :—

সাধারণ ছাপিবার কাগজ	৩২ ভাগ
উৎকৃষ্ট ছাপিবার কাগজ	৬·৩ ভাগ
সাধারণ অন্যান্য কাগজ	২৯ ঐ
পত্রাদি লিখিবার কাগজ	১০ ঐ
বাদামী ও মোটা কাগজ	১০ ঐ
নিকৃষ্ট কাগজ ও পেষ্টবোর্ড	৫ ঐ
বিজ্ঞাপন দিবার কাগজ	৩ ঐ
রঙ্গীন কাগজ ...	৩ ঐ
চিত্রাদি অঙ্কনের কাগজ	০.৬ ঐ
কৃত্রিম পুষ্প, সিগারেটের আবরণ প্রভৃতির জন্য অতি পাতলা কাগজ ...	০.৫ ঐ
শোষ কাগজ (Blotting paper) ...	০.৪ ঐ
অন্যান্য কাগজ	০.২ ঐ
মোট	১০০ ভাগ।

বিগত কয়েক বৎসর মধ্যে কাগজের ব্যবহার অতি দ্রুতভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। পণ্ডিতগণের মতে কাগজের ব্যবহার সভ্যতা ও উন্নতির পরিচায়ক; অর্থাৎ যে দেশে যত অধিক পরিমাণ কাগজ ব্যবহৃত হয় সে দেশে ততটা উন্নত। বিভিন্ন দেশে লোক সংখ্যানুপাতে গড়ে প্রতি জনে কি পরিমাণ কাগজ ব্যবহার করিয়া থাকে তাহার একটা হিসাব এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল।

দেশের নাম	গড়ে প্রতিলোক হিসাবে ব্যবহৃত কাগজের পরিমাণ	
আমেরিকার যুক্ত প্রদেশসমূহ ...	২০	৬০
ইংলণ্ড	১৮	৪০
জার্ম্মাণী	১৫	৪
ফ্রান্স	১২	২৯
অষ্ট্রীয়া	১০	১৭
ইটালী	৮	৫
রুশিয়া	২	৪৮
সার্ভিয়া	×	৫২
চীন	×	৫২
ভারতবর্ষ	×	১১

বর্ত্তমান সময়ে প্রতিবৎসর ৮০০০,০০০ টন (২১৬, ০০০, ০০০ মণ) ছাপিবার কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এক টন কাগজ প্রস্তুত করিতে ১½ কর্ড (নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ কাষ্ঠের স্তূপ) কাষ্ঠের প্রয়োজন। উক্ত হিসাবে বাৎসরিক ১২০০০, ০০০ কর্ড বা দৈনিক ৪০, ০০০ কর্ড কাষ্ঠ কাগজ প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। প্রতি 'একর' আরণ্য ভূমি হইতে গড়ে দশ কর্ড কাষ্ঠ সংগ্রহ করা যায়। কাজেই দেখা যায় যে কাগজ প্রস্তুতের উপাদান সরবরাহ করার জন্য দৈনিক ৪০০০ একর বা ১২০০০ বিঘা অরণ্যানী বৃক্ষশূন্য প্রান্তরে পরিণত হইতেছে। এ স্থলে হয় ত অনেকে মনে করিতে পারেন যে কাগজ প্রস্তুতকারকগণ যেরূপ পূর্ণ উদ্যমে অরণ্যসমূহের ধ্বংস সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহাতে হয় ত অতি নিকট ভবিষ্যতেই পৃথিবীটা অরণ্যানীশূন্য হইয়া পড়িবে এবং কাগজ প্রস্তুতের উপাদানাভাব হইবে। কিন্তু এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। একমাত্র কেনাডা রাজ্যে যে বিস্তৃত মহারণ্য পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার কাষ্ঠ হইতে সমগ্র পৃথিবীতে ৮০০ শত বৎসরে যতটা কাগজের প্রয়োজন হইবে ততটা কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কি পরিমাণে নিবিড় বৃক্ষরাজি পরিপূর্ণ

অনবেক্ষিত অরণ্যানী রহিয়াছে নিম্নে তাহার একটা ধারণা দেওয়া গেল।

দেশের নাম	আরণ্য ভূমির পরিমাণ
কেনেডা	২৪১৫০০০,০০০বিঘা।
আমেরিকার যুক্ত রাজ্য	৭৫০০, ০০০, ০০০ বিঘা
ইউরোপীয় রুশিয়া	১, ৩৮০, ০০০, ০০০ ঐ
কুইন্‌স্ ল্যাণ্ড	৬৪৫, ০০০,০০০ ঐ
সাইবেরিয়া	২৮৫, ০০০,০০০ ঐ
আব্রহ্ম ভারত	১২৫, ০০০,০০০ ঐ
ফিন্‌ল্যাণ্ড	১৫০, ০০০,০০০ ঐ
সুইডেন	১৫০, ০০০,০০০ ঐ
জাপান	১৫০, ০০০,০০০ ঐ
জার্ম্মাণী	১২৮, ০০০,০০০ ঐ
অষ্ট্রীয়া	৭৫, ০০০,০০০ ঐ
ফ্রান্স	৭৫, ০০০,০০০ ঐ
হাঙ্গারী	৬৮, ০০০,০০০ ঐ
স্যাভোনিয়া	৭৮, ০০০.০০০ ঐ
নিউজিল্যাণ্ড	৬০, ০০০,০০০ ঐ
তুরস্ক	৫২. ০০০,০০০ ঐ
নরওয়ে	৪৫, ০০০,০০০ ঐ
ইটালি	[illegible]৪, ৫০০,০০০ ঐ

এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মদেশে শতাধিক যোজন বিস্তৃত বাঁশ-বন উপেক্ষিত ভাবে পড়িয়া আছে। প্রয়োজন হইলে ভবিষ্যতে ঐ বাঁশ হইতেও কাগজ প্রস্তুত হইতে পারিবে। কাজেই অদূর ভবিষ্যতের কথা দূরে থাকুক, বহু সহস্র বৎসর পরেও যে কখনও কাগজ প্রস্তুতের উপাদানের অভাব হইবে এরূপ আশঙ্কার কোনও কারণ নাই।

শ্রীঅনুকূল চন্দ্র সরকার।

চন্দ্রকান্ত প্রসঙ্গ

(১০)

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ব্যবহার

আমরা গতবারে সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় মহেশ চন্দ্র ন্যায়রত্ন সি, আই, ই, মহাশয়ের নাম উল্লেখ করিয়াছি। ন্যায়রত্ন মহাশয় ক্ষণ-জন্মা পুরুষ ছিলেন। তাঁহার সময়ে সংস্কৃত কলেজের বহুবিধ সংস্কার ও উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ন্যায়রত্ন মহাশয় সংস্কৃত বিদ্যার উন্নতির মূল 'রাজদৃষ্টি' তৎপ্রতি আকৃষ্ট করিবার জন্য সংস্কৃত শাস্ত্রে বর্ত্তমান পরীক্ষা প্রণালীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এবং নিজে যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়া সমগ্র বঙ্গদেশে সংস্কৃত টোল পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক কর্ত্তৃপক্ষের নিকট একটি মূল্যবান 'রিপোর্ট' প্রদান করিয়াছিলেন। যদিও সেই রিপোর্টের কোন কোন স্থানে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ভ্রমপ্রমাদ পরিলক্ষিত হয়, তথাপি মনে করিতে হইবে তাদৃশ গুরুতর কার্য্যে প্রথমবারেই যতটুকু সফলতা অর্জ্জিত হইয়াছে তাহা কেবল কর্ম্মবীর ন্যায়রত্ন মহাশয়েরই সম্ভব। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সংস্কৃত বিদ্যাবিষয়ক রিপোর্টের আলোচনা করিবার এ স্থান নহে। আমরা প্রসঙ্গান্তরে সে সকল কথার আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। যাহাহৌক সংস্কৃত পরীক্ষা সৃষ্টির পরে ন্যায়রত্ন মহাশয় ছাত্র ও অধ্যাপকের পরীক্ষাফলানু-সারে রাজকীয় বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। উহার পরিমাণ সামান্য হইলেও উক্ত ব্যবস্থার মূলে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। সংস্কৃত ব্যবসায়িদিগের সমস্যাপূর্ণ জীবন যাত্রার সুব্যবস্থা কল্পে সংস্কৃত পণ্ডিতদিগকে যোগ্যতানুসারে ওকালতি ও মোক্তারী পরীক্ষা দিবার অধিকার প্রদান করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিয়াছিলেন; নানাকারণে সে সময় ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রস্তাব গৃহীত হইতে পারে নাই।

সংস্কৃত বিদ্যার হিতৈষিদিগের মধ্যে আজিও অনেকেই ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রস্তাবের উপযোগিতা অনুভব করিয়া থাকেন। যাহা হউক আমরা গতবারে দেখাইয়াছি ন্যায়রত্ন মহাশয় তর্কালঙ্কার মহাশয়কে সংস্কৃত কলেজে নিযুক্ত করিয়াও কিছুকাল তাঁহার কার্য্যাবলীর পরীক্ষা করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, তর্কালঙ্কার মহাশয় সে পরীক্ষায় ন্যায়রত্ন মহাশয়কে বিশেষরূপেই সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়েরও গুণগ্রাহিতা ছিল। শোনা যায় কোন কোন অধ্যাপক এমন কি তাঁহাকে "পিতৃ" সম্বোধন করিয়াও যতটুকু স্নেহ না পাইয়াছেন তর্কালঙ্কার মহাশয় নিজের আত্মসম্মান-বোধ, স্পষ্টবাদিতা ও দক্ষতাগুণে গুণগ্রাহী ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ততোধিক স্নেহ ও শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন। সংসারের যত বড় প্রলোভনই হউক না কেন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের আত্মসম্মান বোধের সহিত বিরোধ করিয়া তাহাকে কখনও জয়লাভ করিতে দেখা যায় নাই। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের তেজস্বিতা ও আত্মনির্ভরশীলতা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। তর্কালঙ্কার মহাশয় বিনয় ও সৌজন্যের অবতারস্বরূপ ছিলেন বটে, কিন্তু নিজের যোগ্যতার প্রতি তাঁহাকে কখনও বিশ্বাস বা শ্রদ্ধাশূন্য হইতে দেখা যায় নাই। তর্কালঙ্কার মহাশয় সংস্কৃত কলেজের এম, এ ক্লাস পর্য্যন্ত পড়াইতেন। তখনকার দিনের এক একটী "হীরার টুকরা" শ্রীযুত হীরেন্দ্র বাবু, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুত আশুতোষ শাস্ত্রী, হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকীল শ্রীযুত ব্রজলাল চক্রবর্ত্তী ও বৈদ্যাবতংস শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন মহাশয় প্রভৃতি তাঁহার কাছে পড়িয়াছেন। ইঁহাদের মেধাবুদ্ধি কাহারও অবিদিত নহে। অধ্যাপনায়, এমন কি অনধীত গ্রন্থের অধ্যাপনায়ও তর্কালঙ্কার মহাশয় ইঁহাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। সেদিন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় আবেগের সহিত বলিয়াছিলেন যে "প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয় নৈষধের টীকা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তর্কালঙ্কার মহাশয় নৈষধ যাহা পড়াইয়াছেন তাহা এ জীবনে বিস্মৃত হইতে পারিব না"। ন্যায়রত্ন মহাশয় তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বেতনবৃদ্ধি সম্বন্ধে তখনকার ডিরেক্টর বাহাদুর "ক্রফ্‌ট" সাহেবের নিকট যে আবেদন করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের গুণবত্তা ও নিজের গুণগ্রাহিতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা এখানে সেই আবেদনপত্রখানার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

No. 162.

From

The Offg. Principal, Sanskrit College

To

A. W. Croft Esqr. M. A.
Director of Public Instruction.

Fort William, April 28th 1884.

Sir,

I have the honour to submit for your favourable consideration the following proposal to increase the pay of Professor Candra Kanta Tarkalankar, Professor of Literature and Grammar of the College. He is a most distinguished Sanskrit Scholar, the like of whom cannot easily be met with in the country. He is moreover a most successful teacher. His private pupils have passed the Sanskrit Title Examinations in various subjects and won the first rank from time to time. The students of the College also highly value his lectures and I am entirely satisfied with him in every respect. He is also a general referee on difficult points connected with Sanskrit Literature, He has written a Bhasya or commentary on the Grihya Sutras, (Aphorism of Gobhila), a work of rare merit, which the Asiatic Society of Bengal have published at their own expense. He has also published various highly meritorious works in Sanskrit and Bengali. He has

been a great acquisition to the College and the vast reputation which he enjoys for learning and erudition has naturally reflected upon it. It may also be mentioned that the private pupils of the Professor have followed him here from Mymensing. Their number ranges from 10 to 20, whom he not only teaches but also supports according to the traditions of the *Tola* system. The salary which he receives from the College, Rs 80 a month, is therefore wholly inadequate to meet his expenses. Under the circumstances I beg earnestly to propose that etc.

I have &c.
(Sd) Mahesh Chandra Nyayaratna.
Offg. Principal, Sanskrit College.

এই পত্রের সংক্ষিপ্ত মর্ম্মানুবাদ এইরূপ,

"মহাশয়, আপনার সানুগ্রহ বিবেচনার জন্য আমি অতি সম্মানের সহিত এই কলেজের সাহিত্য ও ব্যাকরণের অধ্যাপক চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের বেতনবৃদ্ধির জন্য এই প্রস্তাব মহাশয়ের নিকট উপস্থিত করিতেছি। ইনি একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। ইঁহার সমকক্ষ পণ্ডিত এদেশে পাওয়া দুষ্কর। শিক্ষক হিসাবেও ইনি একজন কৃতকার্য্য ব্যক্তি। ইঁহার প্রাইভেট ছাত্রগণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে উপাধি পরীক্ষা পাশ করিয়া উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। কলেজের ছাত্রগণও তাঁহার অধ্যাপনাকে অত্যন্ত মূল্যবতী মনে করে। এবং আমি সর্ব্বতোভাবে ইঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি। সংস্কৃত সাহিত্যসম্বন্ধীয় যে কোন কূটতর্কে সাধারণতঃ ইহাকেই মীমাংসক মনে করা হয়। ইনি গোভীলীয় গৃহ্য সূত্রের একটী ভাষ্য করিয়াছেন। ইহা একখানি অদ্বিতীয় গুণসম্পন্ন গ্রন্থ হইয়াছে, এবং 'এসিয়াটীক্ সোসাইটী' আপন ব্যয়ে এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ইনি সংস্কৃতে ও বাঙ্গালায় আরও বহু মূল্যবান্ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। কালেজের পক্ষে ইঁহাকে পাওয়া একটি মহান্ লাভ হইয়াছে এবং বিদ্যা ও জ্ঞানের জন্য যে বিশাল সুখ্যাতি ইনি ভোগ করিতেছেন, তাহা এখন এই কালেজেতে প্রতিফলিত হইতেছে। ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ময়মনসিংহ হইতে ইঁহার যে সকল ছাত্র সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে তাহাদের সংখ্যা ১০ হইতে ২০। ইহাদিগকে যে ইনি কেবল পড়ান, তাহা নহে; টোলের প্রাচীন রীতি অনুসারে ইহাদের ভরণপোষণও তাঁহাকেই করিতে হয়। সুতরাং কলেজ হইতে যে উনি মাসিক ৮০ টাকা বেতন পান, তদ্দ্বারা তাঁহার ব্যয় চলিতে পারে না। অত্রাবস্থায় আমি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতে চাই * * *

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সম্বন্ধে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ধারণা এই ক্ষুদ্র আবেদনপত্রের প্রতি অক্ষরে দেদীপ্যমান। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের চেষ্টার ফলেই হউক্ বা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের স্বাভাবিক অনুরাগবশতঃই হউক সংস্কৃত কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ কালে তর্কালঙ্কার মহাশয়কে পেন্‌সন্ ও অতিরিক্ত বৃত্তি এই দু'য়ে মিলাইয়া মাসিক ৪৯ টাকা হিসাবে কর্ত্তৃপক্ষ একটী বিশেষ বৃত্তি প্রদান করিয়াছিলেন, এই বৃত্তি তিনি চিরজীবন উপভোগ করিয়া যান। তর্কালঙ্কার মহাশয় চৌদ্দ বৎসর মাত্র সংস্কৃত কলেজে কাজ করিয়াছিলেন। সুতরাং 'পেন্‌সন্' পাওয়ার অধিকার তাঁহার ছিল না। কর্ত্তৃপক্ষ নিতান্ত অনুগ্রহবশতঃ তাঁহার গুণের পুরস্কার স্বরূপ এই টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন ঐ টাকা তাঁহার টোলের সাহায্য নামেও অভিহিত হইতে শুনিয়াছি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীকৃষ্ণ সিদ্ধান্তশাস্ত্রী।

কাম্বোজ প্রদেশের সংস্থান

তৃতীয় প্রবন্ধ।

পূর্ব্বে প্রকাশিত 'কাম্বোজ প্রদেশ' নামক প্রবন্ধে কাম্বোজ প্রদেশের সংস্থান সম্বন্ধে সামান্য ভাবে আলোচনা

করা হইয়াছিল। তৎপর 'কাম্বোজ কেন প্রসিদ্ধ' নামক প্রবন্ধে কাম্বোজ প্রদেশোৎপন্ন কতকগুলি বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছিল। বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়, কাম্বোজ প্রদেশের সংস্থান কোথায় ছিল।

ব্রাহ্মণ অদর্শন হেতু কতকগুলি দেশের ক্ষত্রিয় জাতি বৃষলত্ব (পাতিত্য) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মনুসংহিতা গ্রন্থে এই বিষয়ের উল্লেখ আছে।

"শনৈকস্তু ক্রিয়ালোপা দিমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ। ৪৩
পৌণ্ড্রকা শ্চোড্রদ্রাবিড়াঃ কাম্বোজাঃ যবনাঃ শকাঃ।
পারদাঃ পহ্লবা শ্চীনাঃ কিরাতাঃ দরদাঃ খসাঃ॥"৪ (৫১)

উক্ত পৌণ্ড্র, উড্র দেশ ভারতবর্ষের পূর্ব্বদিকে; দ্রাবিড় প্রদেশ, দক্ষিণ দিকে; কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, দরদ প্রদেশ পশ্চিম দিকে; এবং খস (২) কিরাত (৩) প্রদেশ বিন্ধ্যপর্ব্বতস্থিত প্রদেশ, এবং ঐ সকল প্রদেশ ভারতবর্ষের প্রান্তবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত। এতন্মধ্যে দ্রাবিড় ও যবন প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী স্থানে কাম্বোজ প্রদেশের উল্লেখ হওয়ায়, ঐরূপ স্থানে কাম্বোজ প্রদেশের সংস্থান অনুমান হয়।

রামায়ণে কাম্বোজ প্রদেশের উল্লেখ আছে।

তত্র ম্লেচ্ছান্ পুলিন্দাংশ্চ শূর সেনাং স্তথৈবচ।
প্রস্থলান্ ভরতাংশ্চৈব কুরুংশ্চ সহ মদ্রকৈঃ॥ ১১
কাম্বোজা যবনা শ্চৈব শকানাং পত্তনানি চ।
অন্বীক্ষ বরদাং শ্চৈব হিমবন্তং বিচিন্বথ॥ ১২" (৪)

সুগ্রীব সীতার অন্বেষণের জন্য কপিগণকে উত্তর দিকে, ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, শূরসেন, (৫) প্রস্থল (৬), ভরত, কুরু (৭) মদ্র (৮) কাম্বোজ ও বরদ, এবং অবশেষে 'হিমালয়' প্রভৃতি প্রদেশ সকল অনুসন্ধান করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। মদ্র ও বরদ প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী স্থলে কাম্বোজ প্রদেশের নাম উল্লেখ হওয়ায়, এই তিনটি প্রদেশ পরস্পর সংলগ্ন বলিয়া অনুমান হয়।

অবশেষে সুগ্রীব কপিগণকে হিমালয়পর্ব্বতস্থিত প্রদেশ সকলে সীতার অন্বেষণ করিবার জন্য আদেশ দিয়াছিলেন। পূর্ব্বে সমতলস্থিত স্থান অর্থাৎ কাম্বোজ প্রভৃতি প্রদেশ সকল অনুসন্ধান করিয়া, পরে হিমালয়স্থিত পার্ব্বত্য প্রদেশ সকলে যাইয়া সীতার অন্বেষণ করিবার বিষয় উল্লেখ করায়, কাম্বোজ প্রদেশ যে পার্ব্বত্য প্রদেশ নহে ইহা পরিষ্কার বুঝা যায়।

পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুনের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে তৎকর্ত্তৃক বহ্লীক (১০) এবং দরদ সহ কাম্বোজ প্রদেশের নৃপতিগণকে পরাজয় করিবার বিষয় মহাভারত গ্রন্থে উল্লেখ আছে।

---

(১) মনুসংহিতা ১০ম অধ্যায়।

(২) খস—পর্ব্বতাশ্রয়ি দেশ, "যে চান্যে বিন্ধ্যনিলয়াঃ বর্ব্বরা স্তবরাঃখসাঃ। অধম'রু চয়শ্চাপি সংভূত বেণকন্যবাৎ।" ১২৪—বায়ুপুরাণ, ৬২ অধ্যায়॥

(৩) কিরাত—মধ্যদেশ, "তপ্তকুণ্ডংসমারভ্য রাম ক্ষেত্রান্তকং শিবে। কিরাত দেশো দেবেশি বিন্ধ্যশৈলে হৃব তিষ্ঠতি (')—শক্তিসঙ্গম তন্ত্র, ৭ম পটল।

(৪) রামায়ণ, কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড।

(৫) শূরসেন—মধ্যদেশ, মথুরা প্রদেশ।

(৬) প্রস্থল—উদীচ্য দেশ।

(৭) কুরু—মধ্যদেশ, "হস্তিনাপুরমারভ্য কুরুক্ষেত্রাচ্চ দক্ষিণে। পাঞ্চাল পূর্ব্বভাগে তু কুরুদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ" শক্তিসঙ্গমতন্ত্র, ৭ম পটল।

(৮) মদ্র—উদীচ্য দেশ, "বৈরাট পাণ্ড্যয়োর্মধ্যে পূর্ব্বদক্ষক্রমেণ তু। মদ্রদেশঃ সমাখ্যাতো মাদ্রীহা তত্র তিষ্ঠতি। শক্তিসঙ্গমতন্ত্র, ৭ম পটল।

(৯) বরদ—বর্ত্তমান বরদা রাজ্য।

(১০) বহ্লীক—উদীচ্য দেশ, "কাম্বোজদেশ মারভ্য মহাম্লেচ্ছাৎ তু পূর্ব্বকে। বাহ্লীক দেশো দেবেশি অশ্বোৎপত্তি পরায়ণঃ। শক্তিসঙ্গমতন্ত্র ৭ম পটল।

"ততঃ পরমবিক্রান্তো বাহ্লীকান্ পাকশাসনিঃ।
মহতা পরিমর্দ্দেন বশে চক্রে দুরাসদান্॥ ২২
গৃহীত্বা তু বলং সারং ফাল্গুনঃ পাণ্ডুনন্দনঃ।
দরদান্ সহ কাম্বোজৈ রজয়ৎ পাকশাসনিঃ।
প্রাগুত্তরাং দিশং যে চ বসন্ত্যাশ্রিত্য দস্যবঃ।
নিবসন্তি বনে যে চ তান্ সর্ব্বানজয়ৎ প্রভুঃ॥ ২৪ (১১)

এতদ্দ্বারা দরদ ও কাম্বোজ প্রদেশ, বহুদূরবর্ত্তী প্রদেশ নহে, তাহা অনুমান হয়। 'ফাল্গুনি' পূর্ব্বে সমতলস্থিত প্রদেশ সকল জয় করিয়াছিলেন। তৎপর তিনি উত্তর দিকস্থ প্রদেশ এবং হিমালয় পর্ব্বতস্থিত দুর্গম রাজ্যসকল অধিকার করিয়াছিলেন। উক্ত পার্ব্বত্য প্রদেশ সকলের সহিত কাম্বোজ প্রদেশের নামের উল্লেখ হয় নাই।

মহাভারতের অনেক স্থানেই কাম্বোজ প্রদেশের বিষয় উল্লেখ আছে। (১২) উক্ত গ্রন্থে ভারতবর্ষের পশ্চিম ও পশ্চিমদক্ষিণপ্রান্তস্থিত দেশ-সকলের সহিত কাম্বোজ প্রদেশের নাম উল্লেখ থাকায় ঐ স্থানেই কাম্বোজ প্রদেশের প্রকৃত সংস্থান বলিয়া মনে হয়।

হরিবংশ গ্রন্থে সগর রাজার প্রসঙ্গে কাম্বোজপ্রদেশের উল্লেখ আছে। সগর রাজার পিতা বাহুস্ত রাজা, অত্যন্ত অধার্ম্মিক হইয়া উঠিলে, শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ, পহ্লব, হৈহয়, তালজঙ্ঘ প্রভৃতি ম্লেচ্ছরাজগণ একত্র মিলিত হইয়া তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিল। (১৩)। ঐ সকল ম্লেচ্ছরাজগণ একত্র মিলিত হওয়ায় উক্ত ম্লেচ্ছপ্রদেশসকল সমীপবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়। বিশেষ যবন ও কাম্বোজের একস্থানে উল্লেখ হওয়ায় কাম্বোজ প্রদেশকে হিমালয়স্থিত কোন প্রদেশ না মনে করিয়া, বরঞ্চ যবন রাজ্যের সমীপস্থ কোন প্রদেশ বলিয়া মনে করাই যুক্তিসঙ্গত।

সম্রাট অশোকের পঞ্চম আদেশ হইতেও কাম্বোজ প্রদেশের সংস্থান উপলব্ধি হয়।

"আমি এই সকল ধর্ম্মমহামাত্রদিগকে নিযুক্ত করিলাম। তাঁহারা যোন (১৪), কাম্বোজ, গান্ধার, রাষ্ট্রিক, পেতনিক (১৫) প্রভৃতি দেশমধ্যে এবং অসভ্য জাতিদিগের দেশের এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়া সকল শ্রেণীর লোকদিগের হিতসাধন করিবেন।" (১৬)

সম্রাট অশোক যোন (যবন), কাম্বোজ, গান্ধার, রাষ্ট্রিক, পেতনিক, প্রভৃতি দেশমধ্যে ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন। এখানেও যবন এবং কাম্বোজ প্রদেশের নাম একস্থানে উল্লেখ হওয়ায়, পরস্পর সমীপবর্ত্তী দেশ বলিয়া অনুমান হয়।

অতঃপর কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাসরচিত রঘুবংশ কাব্যের বিষয় বলিব। তদ্দ্বারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ গুলির সংস্থান উপলব্ধি করা যায়।

অযোধ্যাপতি মহাবীর রঘু, সেনাসমূহ লইয়া, পূর্ব্বসাগর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পূর্ব্বসাগরের তালবন দ্বারা শ্যামবর্ণ উপকণ্ঠে উপস্থিত হইলেন। (১৭)

---

(১১) মহাভারত, সভাপর্ব্ব, ২৭ অধ্যায়।

(১২) মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ১৮৮ অধ্যায় ১৫—১৬ শ্লোক; ভীষ্মপর্ব্ব ৯ম অধ্যায় ৫৬ শ্লোক; সভাপর্ব্ব, চতুর্থ অধ্যায়, ২০—২৪ শ্লোক; কর্ণপর্ব্ব, ৮ম অধ্যায়; উদ্যোগ পর্ব্ব ১৬৫ অধ্যায়, ১—৪ শ্লোক;

(১৩) হরিবংশ ত্রয়োদশ অধ্যায়।

(১৪) যোন—যবন (উদীচ্য দেশ)।

(১৫) পেতনিক "—and Pitennikas dwelling among the hills of the Vindhya range and Western Ghats;" * * * "Pitennikas, probably at Paithan on upper Godavari;" * * *— V. A. Smith's Early History of India. 2nd edition P. 173.

(১৬) "অশোকচরিত" শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী সেন প্রণীত, ১১৭ পৃষ্ঠা।

(১৭) রঘুবংশ, চতুর্থ সর্গ, ৩৪ শ্লোক, শ্যাম দেশ কি?

তৎপর যথাক্রমে সুহ্ম, (১৮) বঙ্গ, উৎকল, কলিঙ্গ, প্রভৃতি প্রদেশের রাজগণকে পরাজয় করিলেন। অতঃপর সাগরতীর দিয়া, অগস্ত্যপূত দক্ষিণদিকে গমন করিতে লাগিলেন। (২০) তথায় যথাক্রমে পাণ্ড্য, মলয়, সহ্য প্রদেশস্থ পার্ব্বত্য ও সমতল রাজ্যের রাজগণকে পরাজয় করিলেন। (২১) পরে তাঁহার সৈন্যসকল পাশ্চাত্য প্রদেশ জয় করিবার বাসনায় সহ্য শৈলের সন্নিহিত সাগরাংশভূত প্রদেশ সকলের রাজগণকে পরাজয় করিলেন। (২২) অনন্তর তিনি ত্রিকূট পর্ব্বত (২৩) সন্নিহিত প্রদেশ সকল পরাজয় পূর্ব্বক (২৪) স্থলপথে পারসিক ও যবন রাজাগণের অশ্বারোহী সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিলেন। (২৫)

উপরোক্ত 'স্থলপথ' কথার তাৎপর্য্য এই যে রঘু সহ্য-শৈলের সন্নিহিত সাগরাংশভূত প্রদেশসকল প্রথমে অধিকার করেন; তৎপরে তিনি ত্রিকূট পর্ব্বত সন্নিহিত মালবার প্রদেশ জয় করিয়া জলপথে পারসিক দেশে উপনীত হইয়াছিলেন।

অতঃপর রঘু উত্তরদিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলেন। (২৬) তিনি সিন্ধুনদের তীরভূমি দিয়া হুণ (২৭) ও সিন্ধুনদের তীরস্থ প্রদেশের রাজা, এবং কাম্বোজ প্রভৃতি দেশস্থ নৃপতিবৃন্দকে পরাজয় করিলেন।

কাম্বোজ প্রদেশের নৃপতিগণ রঘুকে অশ্ব ও অর্থ উপঢৌকন দিয়াছিলেন; রঘুবংশকাব্যে তাহার উল্লেখ আছে;—

"কাম্বোজাঃ সমরে সোঢ়ুং তস্য বীর্য্যমনীশ্বরাঃ।
গজালান পরিক্লিষ্টৈ রক্ষোটৈঃ সার্দ্ধমানতাঃ॥ ৬৯
তেষাং সদশ্ব ভূয়িষ্ঠা স্তুঙ্গাদ্রবিণ রাশয়ঃ।
উপদা বিবিশুঃ শশ্বন্নোৎ সেকাঃ কোশলেশ্বরাং॥"৭০(২৮)

রঘুর এই দিগ্বিজয়ের বিবরণ হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে কাম্বোজ প্রদেশ সিন্ধুনদ ও হুন রাজ্যের সমীপস্থ কোন প্রদেশ হইবে। বিশেষ পারসিক ও যবন প্রভৃতি রাজগণের অশ্বারোহীসৈন্যের বিষয়ের উল্লেখ থাকায় এ স্থান অশ্বজনক ভূমি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তৎপর কাম্বোজ প্রদেশের 'সদশ্ব' কথা উল্লেখ থাকায় কাম্বোজ প্রদেশে উৎকৃষ্ট অশ্ব জন্মিত এইরূপ মনে করা অযৌক্তিক নহে। উপরোক্ত কয়েকটি স্থান ব্যতীত রঘুবংশের অন্য কোন প্রদেশের বিবরণ প্রসঙ্গে 'অশ্বারোহী' কিম্বা 'সদশ্ব' থাকার বিষয় উল্লেখ হয় নাই। এই সকল কারণে আমরা পারসিক যবন, কাম্বোজ প্রদেশকে, অশ্বজনক ভূমি বলিয়া মনে করিতে পারি। অপিচ উপরোক্ত পারসিক, যবন, সিন্ধু, হুন, কাম্বোজ প্রভৃতি প্রদেশগুলিকে পরস্পর সংলগ্ন প্রদেশ বলিয়া মনে করি।

অতঃপর রঘু হিমালয় পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন।

---

(১৮) সুহ্ম—প্রাচ্য দেশ, কাহারও মতে চট্টগ্রাম প্রভৃতি দেশ, কাহারও মতে রাঢ় দেশ।

(১৯) রঘুবংশ চতুর্থ সর্গ, ৩২—৪৩ শ্লোক।

(২০) রঘুবংশ, চতুর্থ সর্গ, ৪৪ শ্লোক।

(২১) রঘুবংশ, চতুর্থ সর্গ, ৪৯—৫২ শ্লোক।

(২২) রঘুবংশ, চতুর্থ সর্গ, ৫৩ শ্লোক।

(২৩) ত্রিকূট পর্ব্বত—কেরল দেশীয় পর্ব্বত বিশেষ।

(২৪) রঘুবংশ, চতুর্থ সর্গ, ৫৯ শ্লোক।

(২৫) রঘুবংশ, চতুর্থ সর্গ, ৬০—৬৪ শ্লোক।

(২৬) রঘুবংশ, চতুর্থ সর্গ, ৬৬—৬৮ শ্লোক।

(২৭) হুণ,—
কামগিরের্দক্ষভাগে মরুদেশাৎ তথোত্তরে।
হুণদেশঃ সমাখ্যাতঃ শূরাস্তত্র বসন্তি চ॥"
শক্তি সঙ্গম তন্ত্র ৭ম পটল।

* হুণ দেশের সংস্থান সম্বন্ধে বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণের মতভেদ আছে।

(২৮) রঘুবংশ, চতুর্থ সর্গ, ৭১ শ্লোক।

(২৯) রঘুবংশ, চতুর্থ সর্গ, ৬৯—৭০ শ্লোক।

(৩০) রঘুবংশ, চতুর্থ সর্গ, ৭৬—৭৯ শ্লোক।

ক্রমশঃ তত্রস্থ সাতটি প্রদেশ জয় করিলেন। (৩০) তৎপরে তিনি হিমালয় পর্ব্বত হইতে অবতীর্ণ হইয়া, ব্রহ্মপুত্র নদ উত্তীর্ণ হইয়া, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজাকে পরাজয় করিলেন। কামরূপের অধিপতি রঘুকে হস্তী উপঢৌকন দিয়াছিলেন। (৩১)

এইরূপে রঘু ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকস্থ সীমান্তবর্ত্তী প্রদেশ সকলের নৃপতিবৃন্দকে পরাজয় করিয়া তাঁহার দিগ্বিজয়ব্যপার সম্পন্ন করিয়াছিলেন। রঘু যখন সিন্ধু ও হূণ প্রদেশসমীপস্থ কাম্বোজ প্রদেশ অধিকার করিয়া হিমালয় পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন, তাহাতে ইহা পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়, কাম্বোজ প্রদেশ, তিব্বত অথবা তৎসমীপস্থ কোন পার্ব্বত্য প্রদেশ নহে; বিশেষতঃ যখন রঘু হিমালয়স্থ সাতটি প্রদেশ অধিকার করেন, তন্মধ্যে কাম্বোজ প্রদেশের নাম উল্লেখ হয় নাই: কামরূপ প্রদেশ হস্তীজনক ভূমি বলিয়া কামরূপাধিপতি রঘুকে হস্তী উপঢৌকন দিয়াছিলেন।

মুদ্রারাক্ষস গ্রন্থেও কাম্বোজ প্রদেশের বিষয় উল্লেখ আছে।

"বিরা। এষ কথয়ামি। অস্তি তাবৎ শক যবন কিরাত কাম্বোজ পারসীক বাহ্লীক প্রভৃতিভিঃ চাণক্যমতি পরিগৃহীতৈঃ চন্দ্রগুপ্ত পর্ব্বতেশ্বর বলৈঃ উদধিভিঃ ইব, প্রলয়কালচলিত সলিলসঙ্কৈরৈ, সমন্তাৎ উপরুদ্ধং কুসুমপুরম্।" (৩২)

শক, যবন, কিরাত, কাম্বোজ, পারসীক, বাহ্লীক প্রভৃতি যোদ্ধৃবর্গ কর্ত্তৃক চন্দ্রগুপ্তের অধিকৃত কুসুমপুর (পাটলিপুত্র) নগর অবরুদ্ধ হইয়াছিল। উপরোক্ত প্রদেশ সকলের যোদ্ধৃগণের বিষয় একস্থানে উল্লেখ হওয়ায় এবং তাহাদিগের একত্র সমবেত হইবার বিষয় কথিত হওয়ায় ঐ সকল স্থান পরস্পর সমীপবর্ত্তী দেশ বলিয়া মনে হয়।

মার্কণ্ডেয় পুরাণেও কাম্বোজ প্রদেশের নামের উল্লেখ আছে।

কাম্বোজাঃ দরদাশ্চৈব বর্ব্বরাঃ হর্ষবর্দ্ধনাঃ। ৩৮
চীনাশ্চৈব তুখারাশ্চ বহুলাঃ বাহ্যতো নরাঃ (৩৩)

কাম্বোজ, দরদ, বর্ব্বর (৩৪) হর্ষবর্দ্ধন, চীন, তুখার, প্রভৃতি প্রদেশ সকল 'বহির্দ্দেশ' বলিয়া এই পুরাণে কথিত হয়াছে। এখানেও বিন্ধ্য পর্ব্বতস্থ বর্বর প্রদেশের সহিত কাম্বোজ এবং দরদ প্রদেশের নাম উল্লেখ হওয়ায় এই তিনটি প্রদেশ পরস্পর সংলগ্ন বলিয়া বোধ হয়।

গরুড়পুরাণেও কাম্বোজ প্রদেশের বিষয় উল্লেখ আছে।

"পুলিন্দাশ্মক জীমূত নয়রাষ্ট্র নিবাসিনঃ॥
কর্ণাটাঃ কাম্বোজ ঘণ্টা দক্ষিণাপথবাসিনঃ॥ ১৪
অম্বষ্ঠা দ্রাবিড়া লাটাঃ কাম্বোজা স্ত্রীমুখা শকাঃ।
আনর্ত্ত বাসিনশ্চৈব জ্ঞেয়া দক্ষিণ পশ্চিমে॥" ১৫ (৩৫)

পুলিন্দ, অশ্মক, জীমূত, নয়রাষ্ট্র, কর্ণাট, কাম্বোজ, ঘণ্টা, এই কয়টি দাক্ষিণাত্যস্থিত প্রদেশ, এবং অম্বষ্ঠ, দ্রাবিড়, লাট, কাম্বোজ, স্ত্রীমুখ, শক, আনর্ত্ত এই কয়টি প্রদেশ ভারতবর্ষের পশ্চিমদক্ষিণকোণে অবস্থিত, গরুড়পুরাণের এই উক্তি দ্বারা কাম্বোজ প্রদেশকে

(৩১) রঘুবংশ, চতুর্থ সর্গ, ৮০—৮৩ শ্লোক।

(৩২) মুদ্রারাক্ষস, দ্বিতীয় অঙ্ক, বৃদ্ধ রাক্ষসগৃহ বিরাধগুপ্তের উক্তি।

(৩৩) মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ৫৭ অধ্যায়।

(৩৪) বর্বর—মায়াপুরং সমারভ্য সপ্ত শৃঙ্গাৎ তথোত্তরে।
বর্বরাখ্যো মহাদেশঃ সৈন্ধবং শৃণু সাদরম্॥"
শক্তিসঙ্গমতন্ত্র ৭ম পটল।
"যে চান্যে বিন্ধ্য নিলয়াঃ বর্বরা স্তবরাঃ খসাঃ।
অধর্মরুচয়শ্চাপি সংভূতা যেন কল্মষাৎ॥ ১২৪"
বায়ুপুরাণ ৬২ অধ্যায়।

(৩৫) গরুড়পুরাণ ৫৫ অধ্যায়।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ অথবা দক্ষিণ পশ্চিমস্থ কোন প্রদেশ বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে।

চীনপরিব্রাজক হুয়েন সাং এর লিখিত বিবরণ হইতে কাম্বোজ প্রদেশের সংস্থান উপলব্ধি হয়;—

"হুয়েন সাং ৬৩৮ খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্দ্ধনের রাজধানী কান্যকুব্জ নগরে পদার্পণ করিয়াছিলেন। ইনি হর্ষবর্দ্ধনকে কাম্বোজ হইতে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্য্যন্ত তাবৎ ভূভাগের সম্রাট পদে অভিষিক্ত দেখেন।" (৩৬)

হুয়েন সাং খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে আগমন করেন। তিনি তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্যের বিস্তৃতি লৌহিত্য হইতে কাম্বোজ পর্য্যন্ত উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রহ্মপুত্রনদ ভারতবর্ষের পূর্ব্বসীমান্তবর্ত্তী, এবং তথা হইতে আরম্ভ করিয়া করিয়া ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমান্তবর্ত্তী কাম্বোজ প্রদেশ হওয়াই সম্ভব। কোন রাজ্যের বিস্তৃতি বিষয়ে দুই স্থানের নাম উল্লেখ থাকিলে স্বভাবতঃই তাহা পরস্পর বিপরীত দিকে অবস্থিত বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। এতদ্দ্বারা ইহা বুঝাইবে না যে লৌহিত্য হইতে তিব্বত পর্য্যন্ত এই স্বল্পপরিসর পার্ব্বত্য প্রদেশ সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের অধিকার ভুক্ত ছিল; এমন কি কান্যকুব্জও তাঁহার রাজধানী ছিল না।

পালবংশীয় বঙ্গাধিপ দেবপাল দেবের মন্ত্রী ভট্ট গুরব মিশ্র কর্ত্তৃক গরুড় স্তম্ভলিপিতে দেবপাল দেবের রাজ্যের বিস্তৃতির বিষয় এইরূপ উল্লেখ আছে;

"আরেবা-জনকান্মতঙ্গজ-মদ-স্তিম্য-চ্ছিলা-সংহতে
রাগৌরী-পিতু-রীশ্বরেন্দু-কিরণৈঃ পুষ্যৎ সিতিম্না-গিরেঃ।
মার্ত্তণ্ডাস্তময়োদয়ারুণ-জলাদাবারিরাশিদ্বয়াৎ,
নীত্যা যস্য ভুবং চকার করদাং শ্রীদেবপালো নৃপঃ॥"৫ (৩৭)

রেবানদীর উৎপত্তি স্থান বিন্ধ্য পর্ব্বত হইতে আরম্ভ করিয়া (দক্ষিণ সীমা) হিমালয়ের গৌরী পর্ব্বত পর্য্যন্ত, (উত্তর সীমা) এবং পূর্ব্ব সমুদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া (পূর্ব্বসীমা) পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত (পশ্চিম সীমা) প্রদেশ সকলের রাজন্যবর্গকে দেবপালদেব কর প্রদান করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন।

উক্ত স্তম্ভলিপিতে অন্যস্থলে এইরূপ আছে;—

"উৎকীলিতোৎকলকুলং হৃত হূণগর্ব্বং।
খর্ব্বীকৃতদ্রবিড়গুর্জ্জরনাথদর্পং।
ভূপীঠমব্ধিরশনাভরণম্বুভোজ,
গৌড়েশ্বরশ্চিরমুপাস্য ধিয়ং যদীয়াং।। ১৩" (৩৮)

দেবপাল দেব উৎকল, হূণ, দ্রাবিড়, গুর্জ্জর, প্রভৃতি প্রদেশের রাজাগণকেও পরাজিত করিয়াছিলেন।

দেবপাল দেবের তাম্রলিপি হইতেও তাঁহার অধিকার-ভুক্ত রাজ্যের বিষয় কতক আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"ভ্রাম্যদ্ভির্ব্বিজয়ক্রমেণ করিভিঃ স্বামেব বিন্ধ্যাটবী
মুদ্দামপ্লবমানবাষ্পপয়সো দৃষ্টাঃ পুনর্ব্বান্ধবাঃ।
কাম্বোজেষু চ যস্য বাজিযুবভির্ধ্বস্তান্য রাজৌজসো
হেষামিশ্রিতহারি হেষিতরবা কান্তাশ্চিরং বীক্ষিতাঃ ।১৩"

(৩৯) সম্রাট দেবপাল দেবের বিজয়বাহিনী বিজয় (৪০) বিন্ধ্যপর্ব্বতে উপনীত হইয়াছিল। তাঁহার রণহস্তী-সকল বান্ধব দর্শন করিয়া তথায় বিহার করিয়াছিল। তদ্রূপ তাঁহার বিজয়বাহিনীর অশ্বসকল কাম্বোজ প্রদেশে উপনীত হইয়া আনন্দধ্বনি প্রকাশ করিতেছিল।

উপরোক্ত তাম্রলিপিদ্বয় বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, অনুমান হয় যে সম্রাট দেবপাল দেব, কখনও দুরতিক্রম্য তিব্বত দেশ অথবা তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ সকল অধিকার করেন নাই। তিনি হূণ, দ্রাবিড়, গুর্জ্জর

(৩৬) ঢাকার ইতিহাস, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায় প্রণীত; ১৩৮ পৃষ্ঠা।

(৩৭) গৌড়লেখমালা, গরুড়স্তম্ভলিপি ৭২ পৃষ্ঠা।

(৩৮) গৌড়লেখমালা, গরুড়স্তম্ভলিপি ৭৪ পৃষ্ঠা।

(৩৯) গৌড়লেখমালা ৩৭ পৃষ্ঠা।

(৪০) ক্রম—অনুক্রম বা যথাক্রম। "ক্রমশ্চানুক্রমে শক্তৌ কল্পে চাক্রমনে ইপিচ।" ইতি মেদিনী।

প্রদেশসকল জয় করিয়াছিলেন। এই সকল কারণে গুর্জ্জর বা তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশসকলকে যদি আমরা কাম্বোজ প্রদেশ বলিয়া অনুমান করি তাহা হইলে দেবপাল-কর্ত্তৃক কাম্বোজপ্রদেশ অধিকৃত হওয়া অসম্ভব হয় না।

দেবপাল দেবের রাজধানী মুঙ্গেরে ছিল। (৪১) মুঙ্গের রাজধানী হইতে, প্রথমতঃ তাঁহার বিজয়বাহিনী বাহির হওয়াই সম্ভব। সেখান হইতে বহির্গত হইয়া, দেবপাল দেব বিজয়ক্রমে বিন্ধ্যপর্ব্বতে উপনীত হইলেন। দেবপালদেবের মুঙ্গের রাজধানী হইতে পশ্চিম দিকে বিন্ধ্য পর্ব্বতে এবং সেখান হইতে পশ্চিম দিকে বর্ত্তমান গুজরাট প্রদেশে বিজয়বাহিনী উপনীত হওয়াই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়।

প্রাচ্যপণ্ডিতদিগের মতে হিমালয়পর্ব্বতস্থিত কোন প্রদেশে অথবা তিব্বত কিম্বা তৎসন্নিহিত কোন স্থানে কাম্বোজ প্রদেশের সংস্থান ছিল এইরূপ অনুমান হয় না। অথবা ভারতবর্ষের পূর্ব্বদক্ষিণদিকে চীনসমুদ্রের উপকূলস্থিত কাম্বোডিয়া নামক স্থানে আলোচ্য কাম্বোজ প্রদেশের সংস্থান ছিল বলিয়াও মনে হয় না। তদ্ব্যতীত ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমকোণস্থিত কাশ্মীর প্রদেশের উত্তরাংশে কোন স্থলে কাম্বোজ প্রদেশের সংস্থান ছিল এইরূপও বোধ হয় না। তবে উপরোক্ত প্রমাণ সকলের দ্বারা যতদূর অনুমান হয় তাহাতে ভারতবর্ষের পশ্চিমপ্রান্তস্থিত গুজরাট প্রদেশের সন্নিহিত কোন স্থানে কাম্বোজ প্রদেশের প্রকৃত সংস্থান ছিল বলিয়াই অনুমান হয়।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে অলইস্তখ্রি ও ইব্‌ন্‌ হোকল নামক দুইজন মুসলমান ঐতিহাসিক তাঁহাদের গ্রন্থে 'বলহরা' রাজ্যের (৪২) উত্তরসীমান্তবর্ত্তীস্থলে 'কম্বায়' (কম্বাজ) নামক স্থানের বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। 'কম্বায়' প্রদেশও বর্ত্তমান গুজরাট প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। (৪৩)

উপরোক্ত মুসলমান ঐতিহাসিক ব্যতীত, সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান ঐতিহাসিক আবুলফজল আলামী তৎপ্রণীত 'আইন আকবরী' নামক গ্রন্থে গুজরাট প্রদেশান্তর্গত উপরোক্ত স্থানকে 'কাম্বায়েৎ' (Cambayet) নামে অভিহিত করিয়াছেন। (৪৪)

উপরোক্ত মুসলমান ঐতিহাসিকগণ কম্বায়, কম্বায়ৎ অথবা খাম্বায়েৎ প্রভৃতি যে নামেরই উল্লেখ করুন না কেন, উহা যে প্রকৃত কাম্বোজ নামেরই অপভ্রংশ তাহাতে সন্দেহ নাই। পাঠকগণ, বর্ত্তমান প্রবন্ধের শেষভাগে উপরোক্ত কম্বায় প্রভৃতির নামের আরও বহুতর নামান্তর হইয়াছে দেখিতে পাইবেন।

মোগলসম্রাট আরঙ্গজেবের চিকিৎসক ফরাসী পরিব্রাজক ফ্রনসয় বার্নিয়ে (Francois Bernier) খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতবর্ষে অবস্থান করিয়া তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে কাম্বোজ উপসাগরের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্যপ্রদেশের সন্নিহিত স্থলে কাম্বোজ উপসাগরের সংস্থান দর্শন করিয়াছেন।

তাঁহার লিখিত বিবরণে এইরূপ লেখা আছে :—"All this great peninsule (৪৬) of Industan (৪৭) cutting it from the Bay of Combaja (কাম্বজ)

(৪১) "শ্রীমুদ্গগিরিসমাবাসিতশ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ"। গৌড়লেখমালা, মুঙ্গেরলিপি ৩৮ পৃষ্ঠা।

(৪২) বলহরা রাজ্য—রাষ্ট্রকূট রাজ্য।

(৪৩) Sir. H. M. Elliot's History of India vol 1; p 27, and p 34.

(৪৪) Ayeen Akbery, Translated by Francis Gladwin, part 1, p 351.

(৪৫) Ayeen Akbery, Translated by Fracis Gladwin, part II, p. 516.

(৪৬) Peninsula.

(৪৭) Hindustan.

into that of Bengale, (৪৮) near Jagarate, (৪৯) and passing thence to cape Comori (৫০) was scarce two hundred years since entirely (some mountainous parts excepted) under the dominion of one only prince, who consequently was very great and very potent Monarch: but now it is divided among many different sovereigns, that are also different religions. (৫১)

উপরোক্ত বিবরণ হইতেও আমরা 'কাম্বজ' নামক উপসাগরের নাম প্রাপ্ত হই; এবং ঐ স্থানের সংস্থান পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারি। যদি উপরোক্ত 'কাম্বজ' উপসাগরের নাম দ্বারা 'কাম্বোজ' প্রদেশের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন পাঠক সন্দিহান হন, তাহা হইলে নিম্নলিখিত আরও একটী ফরাসীদেশীয় পরিব্রাজকের লিখিত বিবরণী সেই সন্দেহ দূর করিয়া দিবে।

জিয়ন্ বেপ্‌টিষ্ট টাভার্নিয়ে (Jean Baptiste Tavernier) নামক আর একটী ফরাসী পরিব্রাজক খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতবর্ষ পর্য্যটন করেন। তাঁহার লিখিত বিবরণ হইতেও কাম্বোজ প্রদেশের সংস্থান উপলব্ধি হয়;—

"From Surat to Broache., costes 22. (?) All the country between these two cities is full of corn, rice, millet, and sugercanes. Before you enter into Broache, you must ferry over the river which runs to cambaya (কাম্বজ) and falls into the gulf that carries the same name" (৫২)

বারবোসা (Barbosa) নামে একজন বিদেশী পর্য্যটক খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে ভারতবর্ষের বহুস্থান পর্য্যটন করেন। তিনি বঙ্গদেশে আসিয়া দেখিয়াছিলেন যে বিদেশী বণিকগণ সে স্থান হইতে বাণিজ্যের দ্রব্য লইয়া করমণ্ডল, মালবার, 'কম্বজ', 'তারণেশ্বরী' সুমাত্রা, জিলাম প্রভৃতি দেশে যাইয়া পণ্য দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় করিতেন।

* * * "and all are great merchants, who possess large ships made of Mecca, and some like those of China, called guinchi, which are very large, and carry large cargoes, and with those they navigate towards Coromondal, Malabar, Cambaia, (কাম্বয়) Taranasseri, Sumatra, Zeilum, and Malacca, and they trade with all kinds of merchandize from one to the other" (৫৩)

'কাম্বয়' শব্দ পরবর্ত্তী সময়ে ইউরোপীয়পর্য্যটকগণের ভ্রমণবৃত্তান্তে 'কাম্বয়' অথবা 'কম্বয়' শব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল দেখা যায়। টাভার্নিয়ে ও বারবোসা-নামক বিদেশী পর্য্যটকদ্বয়ের ভ্রমণবৃত্তান্তে কাম্বোজের 'জ' স্থানে 'য় রূপে উল্লেখ হইয়াছে। ইংরেজী বর্ণমালার উচ্চারণানুসারে, "Ya" এবং 'Ia'র উচ্চারণ ইয় হইবে; ঐ ইয়র উচ্চারণ আমাদের দেশে বাংলা 'য়' এর ন্যায়। পূর্ব্বোক্ত 'কাম্বয়' শব্দকে আমরা 'কাম্বোজ' বলিয়া মনে করিয়া লইলে অন্যায় হইবে না। কারণ বিদেশী পর্য্যটকদিগের দ্বারা এইরূপ সামান্য উচ্চারণপ্রভেদ হওয়া অসম্ভব নহে।

পূর্ব্বোক্ত পরিব্রাজকগণের লিখিত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতেও আমরা কাম্বোজ প্রদেশ ও কাম্বোজ উপসাগরের প্রকৃত সংস্থান কোথায় ছিল তাহা অবগত হইতে পারি।

(৪৮) Bay of Bengal,

(৪৯) Jagarnath.

(৫০) Comorin.

(৫১) Bernier's Travels in Hindustan, translated by Henry Oldenburgh, Page, 172.

(৫২) Tavernier's Travels in India, Chapter V, Page 52.

(৫৩) Ramusis Vol. 1. P. 350. as translated in Bodger. The travels of Ludovico di Verthema Introd pp. cxiv, cxv.

শক্তিসঙ্গমতন্ত্রনামক গ্রন্থে কাম্বোজ প্রদেশের বিষয়ের উল্লেখ আছে।

"পাঞ্চালদেশমারভ্য ম্লেচ্ছাদ্দক্ষিণপূর্ব্বতঃ।
কাম্বোজদেশো দেবেশি বাজিরাশিপরায়ণঃ (৫৪)

পাঞ্চাল দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ম্লেচ্ছদেশের দক্ষিণপূর্ব্বকোণস্থিত প্রদেশ কাম্বোজ নামে আখ্যাত; উহা অশ্ববহুল স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ।

পাণ্ড্যপ্রদেশের সংস্থান সম্বন্ধে যেরূপ উল্লেখ উক্ত গ্রন্থে আছে তাহাতেও কাম্বোজ প্রদেশের সংস্থান উপলব্ধি হয়।

"কাম্বোজাদ্দক্ষভাগে তু ইন্দ্রপ্রস্থাচ্চ পশ্চিমে।
পাণ্ড্যদেশো মহেশানি মহাশূরত্বকারকঃ" (৫৫)

কাম্বোজ প্রদেশের দক্ষিণদিকে এবং ইন্দ্রপ্রস্থ) প্রদেশের পশ্চিম (৫৬) দিকস্থ প্রদেশ পাণ্ড্য নামে (৫৭ পরিচিত।

বাহ্লীক দেশের সংস্থান সম্বন্ধে উক্ত তন্ত্রে যেরূপ উক্তি আছে তাহাতেও কাম্বোজ প্রদেশের সংস্থান উপলব্ধি হয়।

"কাম্বোজদেশমারভ্য মহাম্লেচ্ছাৎ তু পূর্ব্বকে।
বাহ্লীক দেশো দেবেশি অশ্বোৎপত্তিপরায়ণঃ"॥ (৫৮)

কাম্বোজ প্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া, মহাম্লেচ্ছ-দেশের পূর্ব্বদিকে অশ্বজনকভূমি বাহ্লীক দেশ অবস্থিত।

পাঞ্চাল প্রদেশের দক্ষিণ, ম্লেচ্ছদেশের দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে, দাক্ষিণাত্যস্থিত পাণ্ড্যদেশের উত্তরদিকবর্ত্তী প্রদেশ কাম্বোজ নামে খ্যাত ছিল। উক্ত কাম্বোজ প্রদেশ অশ্বপ্রধান স্থান বলিয়া খ্যাত ছিল। উপরোক্ত ফরাসী পরিব্রাজকদিগের মতে এবং তন্ত্রোক্ত প্রমাণ দ্বারা কাম্বোজ প্রদেশের সংস্থান নিশ্চিতরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে বলিয়া আমরা বিবেচনা করি।

বর্ত্তমান কালের মানচিত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলে বরোদা রাজ্যের পশ্চিমদিকে কাম্বে নামে একটী উপসাগর দেখিতে পাইবেন। (৫৯) তাহার উত্তর উপকূলস্থিত প্রদেশ কাম্বে (৬০) নামে বর্ত্তমান কালে সর্ব্বসাধারণের নিকট পরিচিত হইতেছে। শ্রদ্ধাস্পদ প্রাচ্যবিদ্যার্ণব শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ও এই স্থানকে কাম্বোজপ্রদেশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (৬১) কিন্তু তিনি বলিতে চান ইহা পূর্ব্বে কাম্বোজ প্রদেশ নামে খ্যাত ছিল না; অনুমান প্রায় দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রকৃত কাম্বোজ প্রদেশ হইতে কাম্বোজজাতি এই স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করা হেতু পরবর্ত্তী কালে এই স্থানই কাম্বোজ প্রদেশ বলিয়া খ্যাত হইয়াছিল। কিন্তু এই স্থান যে পূর্ব্বে কাম্বোজ প্রদেশ নামে খ্যাত ছিল না, এই কথা জোর করিয়া অস্বীকার করেন নাই।

আমরা পূর্ব্বোল্লিখিত যাবতীয় কারণে কাম্বোজ প্রদেশের পরিধি নিশ্চিতরূপে নির্দ্দেশ করিতে না পারিলেও এই স্থানকেই কাম্বোজ প্রদেশ বলিয়া মনে করি; এবং আবহমানকাল হইতেই এই স্থান উক্ত নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

আমরা ১৮৬৬ খৃঃ অব্দে মুদ্রিত এক খানি বাঙ্গালা ভূগোল পুস্তকে (৬২) কাম্বে উপসাগরকে "খাম্বাজ" উপসাগর নামে অভিহিত হইতে দেখিয়াছি।

(৫৪) শক্তিসঙ্গমতন্ত্র ৭ম পটল।
(৫৫) শক্তিসঙ্গমতন্ত্র ৭ম পটল।
(৫৬) ইন্দ্রপ্রস্থ প্রদেশের ঠিক পশ্চিমদিকে পাণ্ড্যদেশ নহে।
(৫৭) দক্ষিণাপথ দেখ।
(৫৮) শক্তিসঙ্গমতন্ত্র ৭ম পটল।
(৫৯) Gulf of Cambay.
(৬০) Cambay.
(৬১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, ১৭১—১৭২ পৃষ্ঠা।
(৬২) ভূগোল বিবরণ, ৩৬ পৃষ্ঠা, তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

তদ্ব্যতীত বর্ত্তমান সময়ের বম্বে ও গুজরাট প্রদেশের প্রচলিত ভাষায় লিখিত ভূগোল পুস্তকে কাম্বে প্রদেশকেই খাম্বায়ত নামে অভিহিত হইতে দেখিতেছি ; এবং কাম্বে উপসাগর, 'খাম্বায়ত' বে আখাত বলিয়া অভিহিত হইতেছে।

কাম্বোজ প্রদেশকে প্রাচ্যদেশীয় পণ্ডিতগণ কাম্বোজ নামে অভিহিত করিলেও পরবর্ত্তী মুসলমান ঐতিহাসিকগণ উহাকে 'কম্বায়' 'কম্বায়েৎ' ও 'খাম্বায়িৎ' প্রভৃতি এবং ফরাসী ঐতিহাসিকগণ কামৃজ নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে উহা খাম্বাজ, খাম্বায়ৎ ও কাম্বে প্রভৃতি নামে পরিচিত হইতেছে।

কাম্বোজ প্রদেশের, প্রকৃত সংস্থান চীনসাগরের উপকূলস্থিত কাম্বোডিয়া নামক স্থানে অথবা তিব্বত বা তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশে, বা ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম প্রান্তস্থিত কাশ্মীরের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে কিংবা কাবুল প্রদেশের অন্তর্গত কোন স্থানে হওয়া অসম্ভব।

উক্ত কাম্বোজ, কম্বায়, কাম্বয়েৎ, খাম্বায়েৎ, কাম্বজ খাম্বাজ, খাম্বায়ত, কাম্বে প্রভৃতি যে কাম্বোজেরই নামান্তর তাহাতে কোন সন্দেহের কারণ নাই। এক্ষণে এই কাম্বে বা কাম্বোজ গুজরাট প্রদেশের অন্তর্গত।

কাম্বোজ প্রদেশের সংস্থান সম্বন্ধে আমরা যথাসাধ্য আলোচনা করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের লিখিত বিষয়ের উপসংহার করিলাম। ইহা ব্যতীত আরও প্রমাণ উপস্থিত করা যাইতে পারে, বাহুল্যভয়ে তাহা উল্লেখ করিলাম না ; অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ এই বিষয়ের বিচার করিয়া দেখিবেন।

শ্রীধরণীমোহন সেন।

ভাটিয়াল গান

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(২২)

মন রে হরিনামের তরী
ভবের ঘাটে লেগেছে।
তরা কে যাবি রে ভবপারে,
আর কি পারের ভয় আছে ॥
দেখে কলি ঘোর অন্ধকার,
ভবনদী করিতে পার,
হইয়ে কর্ণধার ;
সে যে ব্রজ হইতে নন্দের কুমার
নদেপুরে এসেছে ॥
তরীর মাঝে চৈতন্য চান,
পেতেছে প্রেম পীরিতের ফান,
নিশান গাইড়াছে ;
ঐ দেখ হরিদাস দুই বাহু তুলে,
আয়, আয়, বইলে ডাকতেছে ॥
হরি বৈলে নামের নৌকায়,
কে যাবি রে আয় তরা আয়,
সময় বৈয়ে যায় ;
কতদুঃখী তাপী বিনামূলে
ভবপার হইতেছে ।

চান—চাঁদ।
ফান—ফাঁদ।

(২৩)

আমার গোলমালে দিন গেল।
যার জন্য হইলাম পাগল,
আমার সে নিগমে রইল ॥
মনের মানুষ বলিয়া রে,
ঘর থুইয়ে বাইর তালাস করে,
মন রে,—

গুরুর তত্ত্ব জেনে মত্ত হইয়ে
রসিক জনা ডুইবে রইল॥
ডুব দিয়ে চুপ করে থাক,
মনের কথা মর্মে রাখ.
মন রে,—
এবার গোপনেতে সাধন সিদ্ধি,
গুরু গোসাই বইলাছিল॥
বইলা—বলিয়া।
বাইর—বাহির।

সাধন করবে 'বনে বনে, নয় কোণে,' অর্থাৎ অতি নির্জ্জনে।

(২৪)

আর কতদিন রবি রে মন বৈদেশে
হরি বৈলে মনানন্দে
চল রে গউর-দেশে॥
যে দেশে নাই গউর-গন্ধ,
সে দেশে তোর কি সম্বন্ধ,
রবি এই দেশে;
বিদেশিনীর সঙ্গে প্রেম কইরে,
মিছামিছি মরবি ঘুইরে,
হারাবি দিশে।
সে যাবে তার আপন দেশে
তুই রবি এই দেশে॥

(২৫)

তারে আমি পর ভাবি গো সই, কেমনে।
সে ত আমার পরাণের পরাণ সখি রে,—
জীবন যৌবন সকলি করেছি অর্পণ,
আমার বন্ধুর যুগল চরণে॥
তারে আমি পর ভাবি গো সই, কেমনে॥

(২৬)

মন, মানুষের সঙ্গ ধর, করণ কর,
বরণ হবে কাঁচা সোনা।
ঘটে ঘটে আছে রে মানুষ
কেহ নয় রে একা,
কোন ঘটে বিকসিত,
কোন ঘটে কলি চালা,॥
আছে রে এক বেহাল মানুষ
নবদ্বীপে করছে খেলা;
তারে ব্রহ্মায় না পায় ধ্যান করিয়ে
জীবে কি বুঝিবে লীলা॥
[বেহাল—বিলাসিতাবিবর্জ্জিত,
কাঙ্গাল।

(২৭)

মাধা ভাই, একবার জেনে আয়,—
সুরধনীর তীরে ধ্বনি
ধ্বনি কি মধুর শুনা যায়।
মাধা ভাই রে, কাল শুনেছি এই হরিনাম,
নামেতে কর্ণ ফেটে যায়;
আজ কেন রে এ ভাব হইল,
নামে কি ধ্বনি শুনা যায়।
সুরধনীর.................শুনা যায়॥

কত যোগী ঋষি ব্রহ্মচারী,
পুরুষ নারী মেরেছি সবায়।
কইরাছি ভাই দস্যুবৃত্তি;
কারো প্রতি মায়া রাখি নাই;
ভক্তিবসন গলে দিয়া রে, মাধা ভাই,
ধরগা নিতাইর পায়॥
সুরধনীর.................যায়॥

কা'ল্‌কা মোরা মনদুঃখে দুঃখী হইয়ে,
কান্দা ফেলে মেরেছি সবায়;
কান্দার চোটে মাথা ফেটে
রুধিরে অঙ্গ ভেসে যায়;

নিত্যধামে নিত্য বস্ত রে, মাধা ভাই,
নবদ্বীপে হইয়াছে উদয় ॥
সুরধনীর......................যায় ॥

জন্মাবধি পাপের বোঝা
আমরা দু ভাই লয়েছি মাথায় ;
চল দেখি রে, মাধা ভাই রে,
ঢেলে দেই দয়াল নিতাইর পায় ;
তাতে যদি না হয় রত,
মন প্রাণ সপিয়া দিব
জনমের মত,
তুই না গেলে আমি যাব রে,
মাধা ভাই,
গৃহে থাক্‌ব কোন্ আশায় ॥

ভগবানের নামমাহাত্ম্যে তেমন যে পাষণ্ড জগা, তা'র কি অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তন।

(২৮)

আমি ঠেকলাম রূপের ফান্দে,—
গো সই, শ্যামচান্দের।
মদনেরি পঞ্চবাণে
পঞ্চশর বিন্দে ;
ধইরয না মানে চিত্তে
যার লাগি কান্দে,—
গো সই, শ্যামচান্দের ॥

রাধা রাধা বৈলেগো বাশী
বাজায় আমার বৌন্ধে ;
কৃষ্ণকলঙ্কিনী বৈলে
লোটায় আমার নন্দে,—
গো সই, শ্যামচান্দের।

পীরিতের উলটা গো রীতি
মন প্রাণ কান্দে ;
অভয় বলে মনোমোহিনী,
রূপের লাগি কান্দে,—
গো সুই, শ্যামচান্দের ॥
বৌন্ধে—বধূ।
নন্দে—ননদিনী।

শ্রীরাধিকা উভয় সঙ্কটে। এক দিকে কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী, অন্যদিকে ননদিনীর গঞ্জনায় উৎপীড়িতা।

(২৯)

মানুষ, তারে চিন্না নে।
নবরঙ্গ দেহের মাঝে বিরাজ করে যে ;
যখন ছিলা রে মানুষ
পিতার মস্তকে,
কোন্ সন্ধানে আইলা মানুষ
জননী জঠরে।—
মানুষ তারে চিন্না নে ॥

ছোট ছোট ঘরখানি,
খোপে খোপে বেড়া,
তাহার মধ্যে বিরাজ করে
নবীন কিশোরা রে।—
মানুষ তারে চিন্না নে ॥

বৃন্দাবনে তিনটী পুষ্প,
এক পুষ্প সাদা,
একটী পুষ্প ঠাকুর কৃষ্ণ
আরেক পুষ্প রাধা রে।—
মানুষ তারে চিন্না নে ॥
চিন্না—চিনিয়া।

একটী পুষ্প সাদা—বলরামকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে কি ?

(৩০)

কি অপরূপ দেখ্‌লাম সই গো,
সুরধনীর কূলে।

অ সে কি জানি কি ভাবে সই গো,
হরি হরি বলে।—
সুরধনীর কূলে॥

ভাবের মূরতিখানি,
রসিকের শিরোমণি,—
এলো সুরধনী;
সে যে রমণীমোহন মণি
আমায় কটাক্ষে ভুলালে।—
সুরধনীর কূলে॥

কি জানি কি করে মনে,
চেয়েছিল আমার পানে,
করিয়ে সন্ধানে;
সে যে হানিল কুসুম বাণে,
আমার হৃদয়কমলে।—
সুরধনীর কূলে॥

বিষে অঙ্গ জড় হইল
মজুমন ঢইলে পইল,
প্রাণ আকুল হইল;
তোরা জানিস যদি মহৌষধি,
আমায় এনে দে সকালে।—
সুরধনীর কূলে॥

গোসাই গোপীনাথে বলে,
প্রসন্ন তোর কর্ম্ম ফলে
পেয়ে হারাইলে;
এবার প্রাণ যদি যায় গৌর বৈলে,
ও রে তবে গৌর মিলে।—
সুরধনীর কূলে॥

মজু—মুগ্ধ, মোহবিশিষ্ট।
পইল—পড়িল।

(৩১)

হরিনাম যে দিন শুইনাছি,
সেই দিন হইতে ভাই রে মাধা,
আমি কি আমাতে আছি।
কুলমান লজ্জা সরম
সুরধনীতে ভাসায়ে দিয়াছি।
সুমধুর হরিনামে,
মনপ্রাণ সহিতে টানে,
বল্‌তে চায় বলে না প্রাণে
তা' নইলে কেমনে বাঁচি;
কবে তা'র দেখা পাব,
প্রাণ জুড়াব,
আশায় রইয়াছি॥
যে দিকে ঘুরাই আঁখি,
হরিময় সকলি দেখি,
হরি বৈলে জুড়াই আঁখি,
প্রাণপাখী বেন্ধে রাইখাছি;
মন আমার হয় না ধৈর্য্য—
গৃহকার্য্য সকল ভুইলাছি॥

ভ্রষ্টাচারী দুর্দ্দান্ত জগা আজ হরিনামের গুণে হরি-প্রেমে মাতোয়ারা।

(৩২)

হরি বল নৌকা রে খোল
সাধের জোয়ার যায়।
মনমাঝি তোর পায়ে ধরি,
নদীর ধার চিনিয়ে ধইর পাড়ী,
না পরে ঘোলায়;
মন পবনের বেগ উঠেছে,
বাদাম তুলে দেও নৌকায়।
আগের নাইয়া মাঝি ভাল,
পাছে থেকে আগে গেল,
ফিরে ফিরে চায়;

মাঝি ডেকে বলে, আয় সকলে,
নৌকা ভিরা প্রেম তলায়।
ধার—স্রোত।

(৩৩)

(হা রে মন) আমার হৃদয়পিঞ্জরায় বসে,
রাধাকৃষ্ণ বল না।
তুমি বল নাম আমি শুনি ;
আমি বলি নাম তুমি শোন না॥

ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরে *
আটাইশ অক্ষর দেও না ছেড়ে,
শুধু রাধাকৃষ্ণ নাম, চার অক্ষরে,
সাধুজপে নাম, জীবে জপে না॥

বল্ রে মন করপুটে,
শিশুজনম যাবে কেটে,
মানুষ আত্মা বস্‌বে ঘটে,
স্বভাব যাবে, কোন অভাব রবে না।

হরিনামে প্রহ্লাদ ভক্ত
বিষানলে পেল মুক্ত,
তেম্নি মত হলে চিত্ত,
নিরানন্দের গন্ধ দেহে রবে না॥

গোসাই বলে মনোদুঃখে,
বলে বা কে বোঝে বা কে,
মনের দুঃখ মনে থাকে,
মন মিলে মনের মানুষ মিলে না।

শ্রীগোপীনাথ দত্ত।

* ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরঃ—
হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে॥

নব্যজার্ম্মাণির কৃষি-নীতি

জার্ম্মাণিকে আমরা সাধারণতঃ শিল্পপ্রধান দেশ বলিয়াই জানি আমাদের এই ধারণা কতকাংশে সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। জার্ম্মাণির অধিবাসিবৃন্দের শতকরা ত্রিশ জন লোক এখনও কৃষিবিষয়ক নানাবিধ কার্য্যে জীবিকার্জ্জন করিয়া থাকে। প্রায় শতবৎসর পূর্ব্বে কৃষিকার্য্যই জার্ম্মাণদের জীবিকা-নির্ব্বাহের একমাত্র উপায় ছিল—শতকরা ৮০ জনেরও বেশী লোক তখন কৃষিব্যবসায়ী ছিল। শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিব্যবসায়ী লোকের সংখ্যা কমিয়াছে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া কৃষির প্রতি জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট বা জনসাধারণের কিছুমাত্র অনুরাগ কমে নাই, বরং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। আধুনিক জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রসিদ্ধ যুদ্ধবীর মল্‌ট্‌কে (Maltke) বলেন যে কৃষিকার্য্যের উন্নতির সহিত সমগ্র জার্ম্মাণসাম্রাজ্যের উন্নতি একসূত্রে গ্রথিত ;—কৃষির অবনতি হইলে বিশাল জার্ম্মাণসাম্রাজ্যের পতন অবশ্যম্ভাবী। *

মল্‌ট্‌কের এই উক্তি দ্বারা কৃষির প্রতি জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্টের মনোভাব অতি সুস্পষ্টরূপে প্রকটিত হইতেছে।

জার্ম্মাণিতে প্রায় এককোটী সত্তরলক্ষ লোক কৃষিজীবী ; তন্মধ্যে প্রায় বিশলক্ষ লোক নিজের জমী ও দেড় লক্ষ লোক অপরের নিকট হইতে জমী বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া চাষ আবাদ করিয়া থাকে ; এতদ্ব্যতীত প্রায় ত্রিশ লক্ষ লোক কৃষিক্ষেত্রে মজুর প্রভৃতির কাজ করিয়া দিনাতিপাত করিয়া থাকে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে জর্ম্মণদের শতকরা ত্রিশজন

* "The German Empire will collapse without firing a shot when German agriculture collapses."

মাত্র, অর্থাৎ সমগ্র অধিবাসিবর্গের প্রায় একতৃতীয়াংশ লোক জীবনধারণের জন্য কৃষির উপর নির্ভর করিয়া থাকে; আবার এই একতৃতীয়াংশেরও একঅষ্টমাংশ অর্থাৎ শতকরা মাত্র ৪ জন লোকের নিজের ক্ষেত-জমি আছে। তথাপি কৃষির উন্নতির জন্য সম্মিলিত জার্ম্মাণগবর্ণমেণ্ট ও সাম্রাজ্যভুক্ত বিভিন্ন ষ্টেট্ যথাশক্তি চেষ্টা করিয়া থাকে—এমন কি প্রয়োজন হইলে সময়ে সময়ে শিল্পবাণিজ্যের অসুবিধা করিয়াও কৃষিকার্য্যের সহায়তা করিয়া থাকে। জার্ম্মাণসাম্রাজ্যভুক্ত ষ্টেট্‌সমূহের মধ্যে প্রাশিয়াই সর্ব্বপ্রধান—প্রাশিয়ার রাজাই জার্ম্মাণসাম্রাজ্যের কাইজার বা সম্রাট। সুতরাং রাজ্যসংক্রান্ত সকল বিষয়েই প্রাশিয়ার একটু বেশী আধিপত্য থাকা অসম্ভব নহে। প্রাশিয়া সাধারণতঃ কৃষিপ্রধান। এইজন্য জার্ম্মাণিতে একটী প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে যে প্রাশিয়াতে কৃষিব্যবসায়িগণ সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী; আবার প্রাশিয়াই জার্ম্মাণসাম্রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা। সুতরাং প্রাশিয়ার কৃষিনীতিই জার্ম্মাণির সর্ব্বত্র অল্পবিস্তার অনুসৃত হইয়া থাকে। * বস্তুতঃ, এই ধারণার মূলে যথেষ্ট সত্য নিহিত রহিয়াছে।

প্রধানতঃ তিনটী কারণে কৃষিকার্য্য ও কৃষিব্যবসায়ীর প্রতি জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের এরূপ উচ্চ ধারণা জন্মিয়াছে। প্রথমতঃ, জার্ম্মাণির প্রায় সকল লোকেরই বিশ্বাস যে একমাত্র কৃষিসম্পদের উপরই জার্ম্মাণির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত। উপরে মল্‌টুকের যে উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে তদ্দ্বারাই ইহা বিশেষরূপে প্রমাণিত হইতেছে। সর্ব্বসাধারণের এইরূপ ধারণার জন্য জার্ম্মাণির অনেক ষ্টেটেই কৃষিব্যবসায়ীরাই অধিকতর রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগ ও পরিচালনা করিয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, কিঞ্চিদধিক শতবর্ষ পূর্ব্বেও জার্ম্মাণিতে 'সামন্ত প্রথা" (Feudalism) প্রচলিত ছিল; জমিদারদের প্রতি অগাধবিশ্বাস ও অটলভক্তি এবং সর্ব্বতোভাবে তাহাদের আজ্ঞাপালন, ইহাই সামন্তপ্রথার মূলমন্ত্র। অবশ্য সামন্তপ্রথা এক্ষণে প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু জমিদারের প্রতি জনসাধারণের সেই বিশ্বাস ও ভক্তি এখনও যথেষ্ট পরিমাণেই বিদ্যমান রহিয়াছে কৃষির উন্নতিতেই জমিদারদের লাভ—সুতরাং জমিদারদের দেখাদেখি জনসাধারণেরও কৃষিকার্য্যের প্রতি একটা বিশেষ উচ্চ ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে। তৃতীয়তঃ, পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে প্রাশিয়ার রাজাই সম্মিলিত জার্ম্মাণসাম্রাজ্যের কাইজার বা সম্রাট। প্রাশিয়াতে পূর্ব্বোক্ত সামন্তপ্রথার এখনও সম্পূর্ণ লোপপ্রাপ্তি হয় নাই; এখনও জমিদারগণ প্রুশিয় রাজসিংহাসনের স্তম্ভস্বরূপ বিরাজমান রহিয়াছে। কাজে কাজেই প্রুশিয় রাজাকে বাধ্য হইয়াই জমিদারদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ দেখাইতে হয়, এবং এই দৃষ্টান্ত অন্যান্য ষ্টেটেও বহুল পরিমাণে অনুসৃত হইয়া থাকে।

উপরে যে তিনটী কারণের উল্লেখ করা হইল, তাহা ছাড়াও কৃষিজীবী জমীদারদের প্রতি জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্টের বিশেষ অনুগ্রহপ্রদর্শনের আরও একটী গূঢ় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে। ইংলণ্ডের ন্যায় জার্ম্মাণির রাজা ও শাসনকর্ত্তৃগণকে কোনও কার্য্যের জন্য জনসাধারণ বা তাহাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির নিকট জবাবদিহি হইতে হয় না। অনেক সময়েই শাসক ও শাসিতের উদ্দেশ্যের কোনও মিল থাকে না, কখন কখনও বা পরস্পরবিরোধীও হইতে দেখা যায়। এমতাবস্থায় গবর্ণমেণ্টের পক্ষে জনসাধারণের প্রতিনিধিসভায় এমন এক দল লোকের সহায়তা আবশ্যক যাহার উপরে গবর্ণমেণ্ট সময়ে অসময়ে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতে পারেন। শাসনকার্য্যাদি পরিচালনের জন্য অর্থসংগ্রহই গবর্ণমেণ্টের প্রধান আবশ্যক। এজন্য জনসাধারণের প্রতিনিধিসভায় গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ভোটাধিক্যের নিতান্ত প্রয়োজন। যাহারা

* "The farmers govern Prussia and Prussia governs Germany."

সাধারণতঃ শিল্পবাণিজ্যপ্রভৃতিতে লিপ্ত থাকে, টাকা প্রদান করিতে তাহারা প্রায়ই নারাজ হইয়া থাকে। এমতাবস্থায় গবর্ণমেণ্টকে বাধ্য হইয়াই জমিদারসম্প্রদায়ের উপর নির্ভর করিতে হয়। রাজার পক্ষাবলম্বন করাই জমিদারদেরও সাধারণ স্বভাব। তাহারা নিজেরা জমিদার এবং সেইজন্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জমিদার রাজার পক্ষালম্বন করাই তাহাদের অভ্যাস ও স্বভাব; কারণ উভয়েরই স্বার্থ প্রায় একই রকমের। জমিদারকে সাহায্য করিতে হইলেই যাহাতে তাহাদের অবস্থা ভাল থাকে তৎপ্রতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি দিতে হয়। কৃষির উন্নতিতেই জমিদারের উন্নতি। সুতরাং গবর্ণমেণ্টকেও বাধ্য হইয়াই কৃষির উন্নতির জন্য যত্নবান্ হইতে হয়। কেবল যে প্রাশিয়ষ্টেটেই এই নীতির অনুসরণ করা হইয়া থাকে তাহা নহে, পরন্তু জার্ম্মাণির প্রায় সকল ষ্টেটেই এইরূপ করা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ, জার্ম্মাণির জমিদারসম্প্রদায়ের একটী বিশেষ দল আছে—এই দল প্রায় সকল কার্য্যেই গবর্ণমেণ্টের পক্ষালম্বন করিয়া থাকে।

জার্ম্মাণেরা অত্যন্ত আত্মনির্ভরশীল জাতি;—প্রয়োজনীয় বা অপ্রয়োজনীয় কোন জিনিসের জন্যই অন্য কোন জাতির মুখাপেক্ষী হওয়া তাহাদের সম্পূর্ণ প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তাহাদের বিশ্বাস যে কোনও প্রকার আন্তর্জাতিক পরনির্ভরতা দ্বারা জার্ম্মাণির শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষিত হইবে না। *

বৈদেশিক জিনিসের আমদানির উপর জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট অতি উচ্চ হারে শুল্ক আদায় করিয়া থাকেন। এই উচ্চ শুল্ক স্থাপন দ্বারা বৈদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহকে জার্ম্মাণদ্রব্যের উপর শুল্কের পরিমাণ কমাইতে বাধ্য করা জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্টের প্রধান উদ্দেশ্য নহে—বিদেশী জিনিষ যাহাতে জার্ম্মাণীর বাজারে প্রবেশলাভ করিয়া স্বদেশী জিনিসের কোনও প্রকার ক্ষতিসাধন করিতে না পারে, তাহার বিধান করাই এইরূপ উচ্চ শুল্ক-প্রবর্ত্তনের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য। কোনও বৈদেশিক খাদ্যদ্রব্যই যাহাতে সহসা জার্ম্মণির বাজারে প্রবেশ লাভ না করিতে পারে তজ্জন্য যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্যেই জার্ম্মাণদের অভাব পূরণ করিতে হইবে,ইহাই জার্ম্মাণ কৃষিনীতি; কিন্তু সম্প্রতি জার্ম্মাণির লোকসংখ্যা যেরূপ দ্রুতগতিতে বাড়িতেছে তাহাতে এক জার্ম্মাণি হইতে সকলের সমস্ত অভাবপূরণের সম্ভাবনা নাই। এই অতিরিক্ত লোক-সংখ্যার বসবাস ও অভাবপূরণের জন্যই জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট আজ ঔপনিবেশিক রাজ্যসংস্থাপনের জন্য এত যত্নবান্ হইয়াছেন। *

উপরে যাহা বলা হইল তাহাতে কৃষিকার্য্যের প্রতি জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্টের মনোভাব ও মতলব অতি সুস্পষ্ট ভাবেই বুঝা যাইবে। স্বয়ং গবর্ণমেণ্টই যখন প্রকাশ্য-ভাবে এইরূপ মতবাদের পোষণ করেন, তখন যাঁহারা সাক্ষাৎভাবে কৃষিকার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট, সেই অনুগৃহীত জমীদারসম্প্রদায় যে স্ব স্ব স্বার্থসাধনের জন্য জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্টের কৃষিনীতির সুযোগ গ্রহণ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বস্তুতঃ, যখনই

* "Germany's essential theory of the most favourable position for herself in the world is that of complete selfsufficiency and independence, not that of international interdependence"

* "The German ideal is that Germany should feed and support her own people and the colonial demand is in reality a part of this general design, namely for the possession of overflow departments, whither she can send her surplus population, that part which her theory of independence makes it impossible for her to support."

কৃষিজীবিগণের কোনও প্রকার স্বার্থহানি হইবার আশঙ্কা উপস্থিত হয়, তখনই জার্ম্মাণির জমীদারসম্প্রদায় একবাক্যে উহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। এস্থলে এতদ্বিষয়ক দুইটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা বোধ হয় নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কিছুদিন পূর্ব্বে জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট যখন নৌবিভাগের বলবৃদ্ধির প্রস্তাব উপস্থিত করেন তখন জমীদারসম্প্রদায় ইহার বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করেন। জমীদারগণ ভাবিয়াছিলেন যে নৌশক্তির বৃদ্ধি সাধিত হইলে জার্ম্মাণিকে নানাপ্রকারেই বৈদেশিক বাণিজ্যের সহিত বিজড়িত হইয়া পড়িতে হইবে এবং তাহার ফলে হয়ত বহুবিধ বৈদেশিক কৃষিজাত দ্রব্য জার্ম্মাণির বাজারে প্রবিষ্ট হইয়া জার্ম্মাণ-কৃষির সর্ব্বনাশসাধন করিবে এবং তাঁহাদের নিজের লাভের পরিমাণও কাজে কাজেই অনেক কমিয়া যাইবে। বলাই বাহুল্য, জমীদারদের এই আশঙ্কার মূলে কোনও সত্য ছিল না; স্বার্থনাশের আশঙ্কাতেই তাঁহারা এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। আবার প্রুশীয়রাজ যখন ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য দেশের সর্ব্বত্র কৃত্রিম খালখনন দ্বারা শিল্পপ্রধান পশ্চিমপ্রাশিয়ার সহিত কৃষিপ্রধান পূর্ব্ব-প্রাশিয়ার সংযোগ সাধনে অভিলাষী হন, তখনও প্রধানতঃ এই কারণেই জমীদারসম্প্রদায় ইহার বিরুদ্ধেও দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন; কিন্তু প্রুশিয়রাজের আগ্রহাতিশয্যপ্রযুক্ত এই আন্দোলনে কোনও ফললাভ হয় নাই। জার্ম্মাণ জনসাধারণ বৈদেশিকদ্রব্যকে সাধারণতঃ কিরূপ চক্ষে দেখিয়া থাকে উপর্য্যুক্ত দৃষ্টান্ত দুইটী হইতেই তাহা সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে প্রাশিয়া রাজ্যে, বিশেষতঃ, পূর্ব্বপ্রাশিয়াতে জমীদারদেরই প্রাধান্য বেশী এবং জমীদারেরাই সাধারণতঃ কৃষিব্যবসায়িগণের নেতা। ইহাও বলা হইয়াছে যে প্রুশিয় রাজদরবারে জমীদারদের ক্ষমতাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সরকারী কার্য্যের প্রায় সকল বিভাগেই যথেষ্ট পরিমাণে জমীদারগণকেই নিযুক্ত করা হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত আবশ্যকমত বিশেষ বিশেষ বিধি প্রণয়ন করিয়াও কৃষকসম্প্রদায়ের উৎসাহ-বর্দ্ধন করা হইয়া থাকে। জার্ম্মাণির কৃষিজাত দ্রব্য যাহাতে দেশের মধ্যেই উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে তজ্জন্য বৈদেশিক কৃষিজাত দ্রব্যের উপর উচ্চহারে শুল্ক বসান হইয়া থাকে। ইহাতে বড় বড় জমীদার ও কৃষিব্যবসায়ীর অনেক সুবিধা হইলেও ছোট ছোট কৃষকের পক্ষে অনেক সময়েই সুবিধা হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ পশুখাদ্যের আমদানীর উপর শুল্কের কথার উল্লেখ করা যাইতে পারে। ছোট ছোট কৃষকগণের পক্ষে একই সময়ে সম্বৎসরের উপযোগী সমস্ত পশুখাদ্য একযোগে কিনিয়া রাখা অনেক সময়েই সম্ভবপর হইয়া উঠে না। এমতাবস্থায় হঠাৎ কোনও কারণে দেশমধ্যে পশুখাদ্যের অভাব উপস্থিত হইলে এই শ্রেণীর কৃষকসম্প্রদায়ের দুর্দ্দশার আর সীমা থাকে না। বৈদেশিক পশুখাদ্যের উপর উচ্চ শুল্ক স্থাপিত হওয়ায় উহার যথেষ্ট পরিমাণে আমদানী হয় না; যাহা হয়, তাহাও এত উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হয় যে তাহা খরিদ করা তাহাদের মত গরীব লোকের সাধ্যায়ত্ত নহে। কাজে কাজেই তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া অনেক সময়েই গরুবাছুরাদি বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হয়। একই সময়ে বাজারে অধিকসংখ্যক গবাদি পশুর আমদানী হওয়াতে কিছুদিনের জন্য মাংসাদির মূল্য কিছু কমে বটে, কিন্তু দেশ হইতে গবাদির সংখ্যা যথেষ্ট কমিয়া যাওয়াতে কিছুদিন পরেই মাংসাদি ও তৎসঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যের মূল্য চতুর্গুণ বাড়িয়া যায়। সুতরাং জার্ম্মাণ-কৃষিনীতির ফলে জমীদার ও অবস্থাপন্ন কৃষিব্যবসায়িদের লাভের পরিমাণ যথেষ্ট বেশী হইলেও গরীবের পক্ষে উহা দ্বারা কিন্তু ডবল ক্ষতিই হইয়া থাকে। আবার খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়াতে শিল্পব্যবসায়িগণেরও অত্যন্ত কষ্ট উপস্থিত হইয়া থাকে ও তজ্জন্য শিল্পবাণিজ্যেরও যথেষ্ট ক্ষতি হয়। সুতরাং এই নীতি দ্বারা মুষ্টিমেয়

লোকের সুবিধা ও লাভের জন্য সর্ব্বসাধারণের অনিষ্ট সাধন করা হইয়া থাকে মাত্র।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য একদিকে বৈদেশিক কৃষিজাত দ্রব্যের আমদানীর উপর যেমন অত্যন্ত উচ্চহারে মাশুল আদায় করা হইয়া থাকে, পক্ষান্তরে আবার দেশীয় জমীদার ও কৃষকসম্প্রদায়ের নিকট হইতে তেমনি যথা—সম্ভব অল্প কর আদায় করা হয়। উত্তরাধিকারীসূত্রে প্রাপ্ত জমীদারী ও জোতস্বত্বের উপর ট্যাক্স্ বসাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট অনেক দিন হইতেই চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু জমীদার ও কৃষকসাধারণের প্রতিকূলাচরণবশতঃ এখনও সে চেষ্টা সম্যক্ কার্য্যে পরিণত হয় নাই। বস্তুতঃ, রাজা হইতে সামান্য লোক পর্য্যন্ত সকলেই কৃষিকার্য্যকে অতিশয় শ্রদ্ধার চক্ষে অবলোকন এবং কৃষকগণকে সর্ব্বপ্রকারে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া থাকে। বিগত ১৯১৩ সালে রাজধানী বার্লিন সহরে কৃষিব্যবসায়িগণের সম্মিলন সভার যে বার্ষিক অধিবেশন হয়, সেই অধিবেশনে স্বয়ং জার্ম্মাণসম্রাটই বলিয়াছিলেন যে কৃষক-সম্প্রদায়ই বিস্তৃত জার্ম্মাণসাম্রাজ্যের একমাত্র মেরুদণ্ড, এবং জার্ম্মাণির কৃষি দ্বারাই জার্ম্মাণীর সমুদয় অধিবাসীর অন্নসংস্থান করিতে হইবে। *

জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্টের কৃষিনীতি সম্বন্ধে উপরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইল। এক্ষণে জার্ম্মাণির কৃষিকার্য্যের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে সংক্ষেপে ২।৪টী কথা বলিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করা যাইবে।

পূর্ব্বপ্রাশিয়া ও মেকলিন্‌বার্গ প্রদেশে বড় বড় জমীদার ও জোতদারের বসতি অধিক, সুতরাং এতদঞ্চলে ইঁহাদেরই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আধিপত্য; পক্ষান্তরে, ব্যাভেরিয়া, বাদেন ও রাইননদীতীরস্থ ভূভাগে ক্ষুদ্র ২ জমীদার ও জোতদারের সংখ্যাই খুব বেশী। এরূপ হইবার কারণও আছে। প্রথমোক্ত স্থানদ্বয়ের জমীগুলি তাদৃশ উর্ব্বর নহে, সুতরাং কৃষিক্ষেত্র আয়তনে অত্যন্ত বৃহৎ না হইলে এতদঞ্চলে কৃষিকার্য্য দ্বারা বিশেষ লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা কম। কিন্তু শেষোক্ত স্থান-সমূহের জমী অত্যন্ত উর্ব্বরা; অল্পপরিমাণ জমীতেই যথেষ্ট আয় হইয়া থাকে। এতদঞ্চলে ছোট ছোট ক্ষেত্রে সাধারণতঃ দ্রাক্ষা প্রভৃতির আবাদই যথেষ্ট পরিমাণে হইয়া থাকে।

সমগ্র জার্ম্মণিতে প্রায় ৮ কোটী একর জমীর চাষাবাদ হইয়া থাকে। (এক একর=৩/॥ তিন বিঘা অর্দ্ধ কাঠা)। ইহার শতকরা প্রায় ৫ ভাগ অর্থাৎ আনুমানিক চল্লিশ লক্ষ একর জমী ক্ষুদ্র২ কৃষিক্ষেত্রে বিভক্ত; এই সমস্ত ক্ষেত্রের প্রত্যেকের পরিমাণ পাঁচ একরের বেশী হইবেনা। এইপ্রকার কৃষিক্ষেত্রের প্রায় ⅓ অংশে দ্রাক্ষার আবাদ ও অবশিষ্টাংশে বাগানাদি করা হইয়া থাকে। ৫ হইতে ১০ একর পরিমাণের যত ক্ষেত্র আছে তাহারও প্রায় ⅓ অংশে দ্রাক্ষা উৎপাদিত হয়। ৫০ হইতে ২৫০ একর বিশিষ্ট ক্ষেত্রসমূহের একচতুর্থাংশে বিট, একতৃতীয়াংশে বিবিধ শস্য, শতকরা প্রায় ৫ ভাগে দ্রাক্ষা ও অবশিষ্টাংশে অন্যান্য জিনিষ জন্মে। এতদপেক্ষা বৃহত্তর ক্ষেত্রসমূহের শতকরা প্রায় ৫৮ ভাগেই একমাত্র বিটের আবাদ হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে প্রাশিয়াতেই এরূপ বড় বড় কৃষিক্ষেত্রের সংখ্যাধিক্য লক্ষিত হয়। সোসিয়ালিষ্ট বা শ্রমজীবিসম্প্রদায় এই সমস্ত ক্ষেত্রস্বামীকে সাধারণতঃ "চিনির জমীদার" (Sugar barons) বলিয়া উপহাস করিয়া থাকে। জার্ম্মাণির কৃষিযোগ্য সমগ্র জমির প্রায় চতুর্থাংশই এইরূপ বৃহত্তম ক্ষেত্রে গঠিত। ২৫০ একর জমিবিশিষ্ট ক্ষেত্রের পরিমাণ সমগ্র কৃষিযোগ্য জমীর প্রায় একতৃতীয়াংশ হইবে।

---

* "The agricultural population is the backbone of the modern Empire, and the German agriculture must and can feed the whole of the population of Germany."—Emperor at Agricultural yearly Assembly in Berlin, 1913.

পূর্ব্বপ্রাশিয়া, মেকলিন্‌বার্গ, সাইলিসিয়া, স্তাক্‌সনি, এবং পোমারেনিয়া প্রদেশেই বৃহত্তম জমীদার ও ক্ষেত্রস্বামীর বসবাস। এক মেকলিন্‌বার্গস্বেরিণ প্রদেশের জমীর শতকরা ৬০ ভাগেরও বেশী বড় ২ জোতদারের হস্তগত। পক্ষান্তরে, ব্যাভেরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে কদাচিৎ ২।১জন বড় জোতদার দেখা যায়।

বড় ২ জমীদার ও জোতদারগণই সাধারণতঃ রাজদরবারে আধিপত্য লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং কৃষিকার্য্যের উন্নতিবিধানের জন্য যে সমস্ত বিধিব্যবস্থার প্রণয়ন করা হয়, তাহাতে ইহাদেরই সুবিধা ও স্বার্থরক্ষার জন্য যতটা দৃষ্টি দেওয়া হয়, ছোট ২ কৃষকদের প্রতি তত দেওয়া হয় না—পরন্তু, কখন কখন এতদ্বারা তাহাদের স্বার্থের বিশেষ ব্যাঘাত জন্মিয়াই থাকে।

জার্ম্মাণিতে অপরের জমী খাজানা করিয়া লইয়া তাহার চাষাবাদ করার প্রথা খুব কম; সমগ্র জার্ম্মাণিতে এরূপ কৃষিক্ষেত্রের সংখ্যা এক লক্ষ ত্রিশ হাজারের বেশী হইবে না। জমীর স্বত্বাধিকারীগণ সাধারণতঃ নিজেরাই চাষাবাদ করাইয়া থাকে এবং এরূপ কৃষিব্যবসায়ী স্বত্বাধিকারীর সংখ্যা বিশ লক্ষের কম হইবে না। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে সমগ্র জার্ম্মাণিতে অন্যূন ত্রিশ লক্ষ লোক কৃষিক্ষেত্রে নানাবিধ কাজ করিয়া জীবিকার্জ্জন করিয়া থাকে। ইহাদের অধিকাংশই উত্তরজার্ম্মাণীর বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্রেই কাজ করে। এস্থলে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে কিঞ্চিদধিক শত বৎসর পূর্ব্বেও জার্ম্মাণিতে সামন্ত প্রথা ও তৎসংক্রান্ত দাসত্ব প্রথার (Feudal serfdom) বহুল প্রচলন ছিল। * বিগত ১৮০৭ সাল হইতে এই প্রথা উঠিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু তথাপি এখনও জমীদার-প্রজা ও জমীদারমজুরের ব্যবহারে উহার কিছু কিছু চিহ্ন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত মজুরদের প্রতি নানাবিধ দুর্ব্যবহার ও বেতনাদি লইয়া নানা প্রকার গোলমালের কথা পূর্ব্বে প্রায়ই শুনা যাইত। কিন্তু এক্ষণে সর্ব্বত্রই নানাবিধ কলকারখানা স্থাপিত হওয়াতে কৃষিক্ষেত্রে কাজ করিবার লোকসংখ্যা অনেক কমিয়া যাওয়ায় জমীদারগণকে বাধ্য হইয়াই মুটেমজুরদের প্রতি অনেকটা ভদ্রব্যবহার করিতে হইতেছে।

জার্ম্মাণির শ্রমজীবিসম্প্রদায় এখনও তাদৃশ জোটবদ্ধ হইয়া কাজ করিবার প্রণালী ভালরূপে শিখিতে পারে নাই। সোসিয়াল ডিমক্র্যাটদের (Social democrats) একটা দল আছে বটে, কিন্তু উহা তাদৃশ প্রভাবশালী নহে। পক্ষান্তরে, চতুর্দ্দিক হইতেই এইরূপ দলগঠনে নানাবিধ বাধাপ্রদান করা হইয়া থাকে। হোটেলওয়ালারা সোসিয়ালিষ্টদিগকে কখনও স্থান দেয় না—পুলিসেও তাহাদিগকে সর্ব্বদা নজরবন্দী করিয়া রাখে।

দক্ষিণ ও পশ্চিম জার্ম্মাণির কৃষিক্ষেত্রগুলি অত্যন্ত ক্ষুদ্রায়তন হওয়ায় সে অঞ্চলের কৃষকগণের চাষবাদের বিশেষ অসুবিধা হইয়া থাকে; পক্ষান্তরে, উত্তর ও পূর্ব্বাঞ্চলে কৃষকসাধারণের এককালীন উচ্ছেদসাধন করিয়া বড় বড় কৃষিক্ষেত্রের সৃষ্টি করাতে জনসাধারণের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। সম্প্রতি এই উভয় প্রকার দোষেরই প্রতীকারের জন্য নানাবিধ উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে। এই জন্যই দক্ষিণাঞ্চলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষিক্ষেত্রগুলি যাহাতে আরও ক্ষুদ্রতর খণ্ডে বিভক্ত না হয় তজ্জন্য জ্যেষ্ঠপুত্রই যাবতীয় সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হইবে এরূপ আইনপ্রণয়নের কথা হইতেছে এবং উত্তরাঞ্চলের বৃহত্তম ক্ষেত্রগুলি ভাঙ্গিয়া ছোট করিবার চেষ্টাও চলিতেছে।

* এই serfdom বা দাসত্বপ্রথানুসারে দাসগণকে মুনীবের জোতেই নিয়ত বসবাস ও চাষাবাদ করিতে হইত। ইচ্ছা করিলেই তাহারা জমি পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে পারিত না এবং জমীদারকর্ত্তৃক জমী হস্তান্তরিত হইলে সেই জমীর সঙ্গে সঙ্গেই তৎসংলগ্ন দাসগণকেও নূতন ভূস্বামীর অধীনস্থ হইতে হইত।

সুপ্রসিদ্ধ অর্থশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত ভন্ রুম্‌কার্ (Von Rumker) বলেন যে জার্ম্মাণিকে যদি খাদ্যদ্রব্যের জন্য পরমুখাপেক্ষীই হইতে হয় তবে জার্ম্মাণির সৈন্য-সংখ্যারই বৃদ্ধি কর, অথবা শিল্পবাণিজ্যেরই উন্নতি কর—কিছুতেই জার্ম্মাণির প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইবে না।*

এই নীতির বশবর্ত্তী হইয়াই জার্ম্মাণ কৃষকসম্প্রদায় নানাবিধ বৈজ্ঞানিক উপায়ে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণের যথাসম্ভব বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিতেছে।

উচ্চহারে শুল্কস্থাপন দ্বারা বৈদেশিক খাদ্যদ্রব্যাদির আমদানির পরিমাণ যথাসম্ভব কমাইয়া দেওয়ায় খাস জার্ম্মাণির যে সকল স্থান কৃষিকেন্দ্র হইতে বহু দূরে অবস্থিত, সেই সকল স্থানে, বিশেষতঃ পশ্চিম প্রাশিয়ার শিল্পপ্রধান নগরসমূহে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত চড়া। এই কারণেই জার্ম্মাণির ভিন্ন ভিন্ন সহরে একই প্রকার খাদ্যদ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন দাম দেখা যায়। এই অসুবিধার দুরীকরণমানসে গবর্ণমেণ্ট আভ্যন্তরিক বাণিজ্যের সুবিধার জন্য রেলমাশুলাদি যথেষ্ট কমাইয়া দিতেছেন এবং দেশের সর্ব্বত্রই কৃত্রিম খালখনন ও লাইট্ রেল-ওয়ের বিস্তারসাধন দ্বারা সর্ব্বত্র যাতায়াতের সুবিধা করিয়া দিতেছেন। কৃষকগণ যাহাতে পাইকার বা দালালের সাহায্য ব্যতিরেকে সাক্ষাৎভাবে নিজেরাই বাজারে মাল উপস্থিত করিতে পারে তাহার ব্যবস্থার জন্যও যথেষ্ট যত্ন ও চেষ্টা হইতেছে।

বস্তুতঃ, খাদ্যদ্রব্যাদির বর্ত্তমান মূল্যের হ্রাসকরণ অপেক্ষা শস্যোৎপাদনের খরচার পরিমাণ কমান এবং যাহাতে অনবরত চাষাবাদ করা সত্তেও জমির উর্ব্বরতাশক্তি না কমিয়া বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পায় তাহার উপায় উদ্ভাবন—এই দুইটিই আধুনিক জার্ম্মাণ কৃষিজীবিসম্প্রদায়ের প্রধান লক্ষ্য হইয়াছে। কৃষিকার্য্যে নানাবিধ যন্ত্র, বিশেষতঃ বাষ্প ও তাড়িতশক্তি দ্বারা চালিত যন্ত্র ও কৃত্রিম সারের প্রয়োগ দ্বারা এই উদ্দেশ্য বহুল পরিমাণে সাধিত হইতেছে। কৃষিক্ষেত্রে এক্ষণে কি পরিমাণ বিদ্যুৎচালিত যন্ত্রাদির ব্যবহার হইতেছে তাহার সঠিক বিবরণ সংগ্রহ করা যায় নাই, কিন্তু গত দশবৎসরের মধ্যে বাষ্পচালিত যন্ত্রের সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে। এই সময়ের মধ্যে বাষ্প-চালিত শস্যমাড়াই কলের ও লাঙ্গলের সংখ্যা যথাক্রমে ২½ লক্ষ ও ১৭০০ হইতে ৫ লক্ষ ও ৩০০০ হাজার হইয়াছে। আঠার বৎসর পূর্ব্বে প্রাশিয়াতে একর-প্রতি ১০০ শত পাউণ্ডের বেশী সোড়া (potash) সাররূপে ব্যবহৃত হইতনা—কিন্তু এক্ষণে একরপ্রতি হাজার পাউণ্ডও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (১ পাউণ্ড = অর্দ্ধসের)। এই সময়ের মধ্যে ব্যাভেরিয়াতে একর-প্রতি ব্যবহৃত সারের পরিমাণ ২০ হইতে ৩০০ তিন শত পাউণ্ডে উঠিয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ অর্থাৎ ১৫।২০ বৎসর পূর্ব্বেই জার্ম্মাণিতে জনপ্রতি দৈনিক মজুরীর পরিমাণ গড়ে ২০ পেনি বা ১।০ এক টাকা চারি আনার বেশী ছিল না; কিন্তু এক্ষণে উহার পরিমাণ ২ শিলিং বা ১॥০ দেড় টাকারও বেশী হইয়াছে। প্রাশিয়ার পূর্ব্বাঞ্চলেই মজুরীর পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা কম। জার্ম্মাণিতে একজন মজুর ও তাহার স্ত্রী বৎসরে প্রায় ৪০।৪৫ পাউণ্ড বা ৬০০৲। ৬৭৫৲ টাকা রোজগার করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত হংসাদি পালন দ্বারা আরও কিছু উপার্জ্জন করা যাইতে পারে। বড় বড় কৃষিক্ষেত্রে বিশেষতঃ যে সকল ক্ষেত্রে বিটের আবাদ হয়, সেই সকল ক্ষেত্রে বৎসরের সকল সময়েই অধিকসংখ্যক মুটেমজুরের দরকার হয় না। কিন্তু সময়বিশেষে আবার একযোগে বহুসংখ্যক লোকের প্রয়োজন হয়। এই জন্যই ক্ষেত্রস্বামীগণকে সাধারণতঃ বৈদেশিক মুটেমজুরদের উপরেই বিশেষভাবে নির্ভর

* "Germany's armaments by land and sea and her industrial and commercial development are pointless and hopeless from the national standpoint except upon the basis of Germany's national ability to feed her own population."

করিতে হয়। ইহারা ঠিক কাজের সময় দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং কাজ শেষ হইলেই স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া থাকে। বৎসরে এইরূপ প্রায় সাত লক্ষ বিদেশী মজুরের আমদানি হইয়া থাকে এবং ইহাদের অধিকাংশই কৃষিক্ষেত্রে কাজ করে। ইহাদের দৈনিক আজুরা, পুরুষের পক্ষে ২ শিলিং ২ পেনি হইতে ৩ শিলিং ৬ পেনি এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে ১ শিলিং ২ পেনি হইতে ১শিলিং ১০ পেনি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। অনেকে বলেন যে বৈদেশিক অশিক্ষিত ও অসভ্যপ্রায় কুলীমজুরের এইরূপ অবাধ আমদানীতে জার্ম্মাণ জনসাধারণের নৈতিক চরিত্র-হানির বিশেষ আশঙ্কা আছে।

জার্ম্মাণিতে কোঅপারেটিভ্ সোসাইটীর (co-operative credit societies) বহুল প্রচলন আছে এবং তদ্দারা কৃষিকার্য্য ও কৃষকসাধারণের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। বিগত ১৯১১ সালে প্রায় পঁচিশ হাজারেরও বেশী শুধু কৃষিজ খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনবিষয়ক ক্রেডিট সোসাইটী ছিল এবং উহাদের সভ্যসংখ্যা ৪০ লক্ষের কম হইবে না। ঐ সালে কেবল দুগ্ধসংক্রান্তই ৩১৯৩টী সোসাইটী ছিল। এই সোসাইটীগুলির প্রায় সকলই কোন না কোন কেন্দ্রসমিতির অধীনস্থ হইয়া কাজ করিয়া থাকে। নিম্নলিখিত তিন প্রকার কেন্দ্রসমিতির প্রসারপ্রতিপত্তিই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী—(১) ইম্পিরিয়াল ইউনিয়ান্ (Imperial Union or Darmstadt); (২) স্কাল্‌জ্ ডেলিজ ইউনিয়ান্ (The Schultxe Delitzsche Union): (৩) রৈফিসেন্ ইউনিয়ন্ (The Raiffeisen Union)

জার্ম্মাণিতে এক্ষণে বৎসরে ৫০ হইতে ৬০ কোটী পাউণ্ডের কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির মূল্যই ১৪ কোটী বিশ লক্ষ পাউণ্ডের কম হইবে না এবং পশ্বাদি ও উহাদের হাড় প্রভৃতির মূল্যও অন্যূন বিশ কোটী পাউণ্ড হইবে। (১পাউণ্ড = ১৫৲ টাকা) *

শ্রীমন্মথনাথ মজুমদার

* বিশেষ দ্রষ্টব্য :—এই প্রবন্ধে জার্ম্মাণি সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমান যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্ববর্ত্তী বিবরণ হইতে সংগৃহীত; যুদ্ধারম্ভের পর জার্ম্মাণীর আভ্যন্তরীণ অবস্থার সঠিক কোনও খবর পাইবার উপায় নাই।

—লেখক।

বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্যের অভাব ও তৎপ্রতীকার। *

এক কথায় বঙ্গসাহিত্যের আধুনিক অবস্থা বর্ণনা করিতে গেলে বলিতে হয়, বঙ্গসাহিত্য কর্ণধারবিহীন নৌকার ন্যায় সময়ের স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে; লক্ষ্য স্থির নাই, উদ্যমের লক্ষণ নাই, চালকগণ নির্জ্জীবভাবে যন্ত্রচালিতের ন্যায় কেবলই গীতিরক্ষার জন্য এক ২ বার ক্ষেপণী নিক্ষেপ করিতেছে। বঙ্গসাহিত্য আজ নেতাশূন্য; তাহাতে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবল হইয়াছে। সাহিত্য-সমাজের উচ্চমর্য্যাদা অকুতোভয়ে লঙ্ঘিত হইতেছে। সাহিত্যের উন্নতগৌরবের ধুরন্ধর কেহই নাই। সাহিত্যরাজ্যের শাসনদণ্ড আজ নিদ্রিত। সাহিত্যানুশীলনের কর্ত্তব্য ও গাম্ভীর্য্যবোধ অতি অল্প লেখকেরই আছে। সাহিত্য সাধনার বিষয় না হইয়া অনেকেরই কেবল প্রমোদের বিষয় হইয়াছে। ইহার অপরিহার্য্য ফল এই হইয়াছে যে সাহিত্য শিথিলগ্রন্থি ও চাপল্য-যুক্ত হইয়াছে। ইহাতে ভাষার ঝঙ্কার বাড়িয়াছে, অর্থের গৌরব বাড়ে নাই। শীর্ণদেহ ঢাকিবার জন্য কেবল অলঙ্কারেরই প্রাচুর্য্য হইয়াছে। সাহিত্যের বিভাগবিশেষের প্রতি অত্যধিক প্রবণতা দ্বারা সাহিত্য একদেশদর্শী হইয়া পড়িয়াছে। নিঃস্বার্থ সাহিত্যব্রতের দৃষ্টান্ত অতি বিরল হইয়াছে। সাহিত্যসেবা লক্ষ্য না হইয়া উপলক্ষ মাত্রে দাঁড়াইয়াছে। হৃদয়বান্ লেখকের অভাবে যেমন হৃদয়গ্রাহী লিখা হইতেছে না, তেমনই গুণগ্রাহী পাঠকসমাজও গঠিত হইতেছে না। ধনিলোকদিগের দ্বারা সাহিত্যসেবিদিগের পরিপুষ্টি না হওয়াতে সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির পক্ষে ব্যাঘাত হইতেছে।

* বর্দ্ধমানের অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের সাহিত্য-শাখায় পঠিত।

সমবেতচেষ্টার অভাবে সাহিত্যের সমুচিত স্ফূর্ত্তি ও সর্ব্বাঙ্গীন স্বাস্থ্যবিধান হইতে পারিতেছে না। এ হেন দীনা, ক্ষীণা, মলিনা সাহিত্যজননীর মুখ কিরূপে উজ্জ্বল হইতে পারে তাহা বঙ্গসন্তানমাত্রেরই একান্ত চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত। এই সম্বন্ধে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে যতদূর সম্ভব আলোচনা করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য। অগ্রে আমরা (১) রচনাপ্রণালী, (২) বিষয়নির্ব্বাচন (৩) ভাব-বিকাশ এবং (৪) রুচি এই কয় ভাগে বঙ্গসাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থার পর্য্যালোচনাকরতঃ, পশ্চাৎ দোষের প্রতিকার, ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য ও উন্নতির উপায় নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিব।

(১) রচনাপ্রণালী। বঙ্গসাহিত্যের উচ্ছৃঙ্খলতার কথা আমরা মুখবন্ধেই বলিয়াছি। আধুনিক রচনাতে তাহার বিশেষ প্রমাণই পাওয়া যায়। রচনার স্বাধীনতা বাঞ্ছনীয় হইলেও যদিচ্ছাচার অনুমোদনীয় নহে। বিশেষ বিশেষ নিয়মে বিশেষ বিশেষ ভাষার বিকাশ হইয়াছে; তাহার ব্যভিচার করিলে যে ভাষার অস্বাভাবিক অবস্থা উৎপন্ন হইয়া সাহিত্যকে বিকারগ্রস্ত করিবে তাহা নিঃসন্দেহ।

অনেক লেখক ব্যাকরণের শাসন ও শিষ্টপ্রয়োগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না। ইহাতে ভাষা অনেক স্থলে ইংরেজীগন্ধী হইতেছে। ইংরেজীর অনুকরণ বা অনুবাদ দুষণীয় নহে, কিন্তু বঙ্গভাষার প্রকৃতির সহিত তাহার সামঞ্জস্যবিধান করিতে না পারিলে কি প্রকারে তাহা ভাষার পুষ্টিসাধন করিবে? এইরূপ কৃত্রিম ও বিদেশীয় সাজে সজ্জিত হইয়া বঙ্গভাষা স্বদেশীয়ের নিকট অপরিচিতবেশে উপস্থিত হইতেছে। ভাষার আর একটী দোষের কথা এই প্রসঙ্গেই উল্লেখযোগ্য। কাহার কাহারও মতে ভাষা কথিত আকারেই লিখিত হওয়া উচিত। টেকচাঁদ ঠাকুর বনামে প্যারিচাঁদ মিত্র "আলালের ঘরের দুলালে" এই মত প্রচলিত করিতে প্রথম চেষ্টা পান; পরে "হুতোম পেঁচার নক্সাতে" কালী-প্রসন্ন সিংহ তাঁহার সহযোগিতা করেন। কিন্তু "গুপ্ত-কথা" ব্যতীত সাহিত্যে আর কোথাও ইহার আদর হয় নাই। বঙ্কিমবাবুর রচনাপ্রণালী উদ্ভূত হইলে উহাকে সাহিত্যরঙ্গমঞ্চের যবনিকা আশ্রয় করিতে হয়। বঙ্গসাহিত্যের বর্ত্তমান চূড়ামণি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পুনর্ব্বার ইহাকে আসরে অবতীর্ণ করেন। সেই হইতে সাহিত্যে ইহা ক্রমেই দৃঢ়বদ্ধ হইতেছে। কিন্তু রবীন্দ্রবাবু ইহাকে নূতনজীবন দান করিয়া নূতন বেশে উপস্থিত করিয়াছেন। নবসংস্কারে ইহাতে টেকচাঁদপ্রণালী ও বঙ্কিমবাবুর প্রণালীর নবসম্মিলন হইয়াছে। ঠাকুরপরিবারের হাতে ইহার কৃতকার্য্যতা মন্দ হয় নাই; কিন্তু আমাদের আশঙ্কা, ইহাতে পাছে সাহিত্য গ্রাম্যতাদোষে দুষ্ট হইয়া লঘুতা প্রাপ্ত হয়। স্বাভাবিক সুন্দর রূপ সকলেরই প্রীতিকর, কিন্তু তাহাতেও অমার্জ্জিত সৌন্দর্য্য অপেক্ষা মার্জ্জিত সৌন্দর্য্যই অধিকতর প্রীতিকর। ভাষারও সহজ সরলতা অপেক্ষা মার্জ্জিত কমনীয়তাই অধিক প্রীতিপ্রদায়িনী। বিশেষতঃ, মার্জ্জিতভাষা মার্জ্জিতভাবেরই প্রতিধ্বনি। সুতরাং মার্জ্জিত ভাষা দ্বারা সুশিক্ষারও সহায়তা হয়। সংস্কৃতসাহিত্যেও শিক্ষাভেদে নাটকীয় পাত্রে প্রাকৃত ভাষা আরোপিত হইয়াছে। বঙ্গসাহিত্যেও নাটকের ও উপন্যাসের কথোপকথনে প্রচলিত ভাষার ব্যবহার বিশেষ উপযোগী হইয়া থাকে।

চপলতা বর্ত্তমান ভাষার অপর দোষ। পরিহাস-প্রিয়তা অনেক লেখকের স্বভাব হইয়াছে। বিষয়ের গুরু লঘু বিচার নাই, সুযোগ পাইলেই উপহাস করিতে পারিলেই যেন ইঁহারা চরিতার্থ হন। ইহাতে আরও অমার্জ্জনীয় এই দোষ হইয়াছে যে লেখক আত্মম্ভরিতায় স্ফীত হইয়া সমস্তকেই ক্ষুদ্র ভাবিয়া অবহেলার চক্ষে দেখিয়া থাকেন।

এ পর্য্যন্ত আমরা কেবল গদ্যরচনার কথা লিখিয়া আসিয়াছি; এক্ষণে আমরা পদ্যরচনার কথা লিখিব। অধুনা রবীন্দ্রবাবুর কবিতাই কবিগণের আদর্শ। পূর্ব্বে

কবিতা প্রকৃতিবিষয়িণী (Realistic) ছিল; রবীন্দ্রবাবুই প্রথম ইহাকে কেবল ভাবময়ী (Idealistic) করেন। আধুনিক সময়ে রবীন্দ্র বাবুর অনুকরণেই বহু কবিতা রচিত হইতেছে; কিন্তু রবীন্দ্রবাবুর কল্পনাসৌভাগ্য সকলের না থাকাতে অনেকস্থলেই কেবল বাহ্যগঠনই দৃষ্ট হয়, প্রকৃত ভাব মরীচিকার ন্যায় সম্পূর্ণ অনায়ত্ত থাকে।

(২) বিষয়নির্ব্বাচন। আধুনিকালে উপন্যাস ও গল্পসাহিত্যেরই প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। মাসিকপত্রের কলেবর উপন্যাস ও গল্পেই প্রায় পূর্ণ হইয়া থাকে। মুদ্রিত পুস্তকের অর্দ্ধেকেরও অধিক কেবল উপন্যাস ও গল্প। সাহিত্যে যেন উপন্যাস ও গল্পের বান ডাকিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত সৌন্দর্য্যসৃষ্টি দুই এক খানিতে বই হয় নাই। সমাজের স্থায়ী আদর্শ অঙ্কনের প্রতিভা প্রায় কোন লেখকেরই দৃষ্ট হয় না। চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল ভাষা ও আখ্যানের চমৎকারিত্বে মনোরঞ্জন, ইহাই সাধারণতঃ গল্পের উদ্দেশ্য দেখা যায়। উপন্যাসের অবনতিতেই ইহার উৎপত্তি।

কবিতা। আজকাল খণ্ড কবিতা লিখিবার এমনই একটা প্রবল ঝোঁক উপস্থিত হইয়াছে যে রবিবাবু হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই কেবল খণ্ড কবিতাতেই আপনাদের সমস্ত কবিত্বশক্তির নিয়োগ করিতেছেন। ইহাতে তাঁহারা কেবল কবিতা সৃষ্টিই করিতেছেন, কিন্তু কাব্যসৃষ্টি করিবার অবসর আর তাঁহাদের হইতেছে না। ভাবের সাধন অভাবে তাঁহাদের কবিতার অধিকাংশই আবছায়াময় হইতেছে। এই আবছায়াময় কবিতায় কোন আদর্শচিত্রণ নাই, ছায়াবাজির ন্যায় কেবলই কৌতুকপ্রদর্শন। সুতরাং ইহাতে যেমন ব্যক্তিগত কোন উপকার হইতেছে না, তেমনই জাতীয় কোন উপকারও হইতেছে না। কাব্যে আদর্শচিত্রণের জন্য যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি, বিশাল সহৃদয়তা, ও উচ্চ কল্পনার প্রয়োজন, তদভাবে কবিতাপ্রবাহ যে সঙ্কীর্ণখাতগামী হইবে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

বিষয়নির্ব্বাচনপ্রসঙ্গে আমরা দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে দর্শন ও বিজ্ঞান বঙ্গসাহিত্যে নাই বলিলেই হয়। কেবল অনুবাদেই যাহা কিছু ইহাদের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু অনুবাদ সাহিত্যের কলম মাত্র। মৌলিকতার সহিত যোগ না হইলে যেমন দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধি হইবে না, তেমনই আমরা ইহাদিগকে সাহিত্যের নিজস্বও বলিতে পারিব না।

(৩) ভাববিকাশ—আধুনিক সময়ে মৌলিকতার অভাব আমরা লক্ষ্যই করিয়াছি। আন্তরিকতার অভাবে কোন ভাবের সমুচিত পরিণতি হইতে পারে না। পূর্ব্বের লেখকগণ স্ব স্ব আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্ব দৃঢ়রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার উৎকর্ষসাধনে ঐকান্তিক যত্নবান্ হইতেন। সুতরাং তাহাতে কৃতকার্য্যতাও তদনুরূপই হইত। আধুনিক লেখকগণের মধ্যে বিষয়ের উৎকর্ষ অপেক্ষা আত্মপ্রতিষ্ঠাই অধিক অভীপ্সিত হইয়াছে। ইহার ফল, বহু আড়ম্বরে লঘুক্রিয়া। অনেকেই যথোচিত আয়োজন না করিয়াও কেবল নাম কিনিবার জন্যই লিখিতে প্রবৃত্ত হন। ইহাতে ভাবের অভাবে কেবল ভাষারই ধ্বনি হইয়া থাকে। কোন্ বিশেষ স্থায়িভাবকে সাহিত্যে সঞ্চারিত করাই পূর্ব্বলেখকদিগের প্রধান লক্ষ্য ছিল। আধুনিক সময়ে ক্ষণিক আবেগেই সাহিত্যের স্ফূর্ত্তি হইতেছে। কোন সমগ্র ভাবের অনুসরণ ও অনুশীলন কদাচিৎ লক্ষিত হয়। সাহিত্যের যে একটী জাতীয় কর্ত্তব্য আছে তাহার বোধ অল্প লেখকেরই দেখা যায়। অনেকেই আত্মচরিতার্থতাই সাহিত্যচর্চ্চার প্রধান সফলতা মনে করেন। কিন্তু যে স্থলে পূর্ব্বলেখকদিগের মধ্যে জাতীয়ভাব উদ্বোধিত করিবার একাগ্র যত্ন লক্ষিত হয়, তৎস্থলে আধুনিক লেখকদিগের মধ্যে জাতীয় দোষের সমালোচনা ও বিদ্রূপই মাত্র দেখা যায়, আদর্শগঠনের কোন উদ্যোগই দেখা

যায় না। ইঁহারা ভাঙ্গিতে ক্ষিপ্রহস্ত, কিন্তু গড়িতে উদাসীন।

(৪) রুচি—আধুনিক সময়ে রুচির অপকৃষ্টতা হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। কারণ এক্ষণে গুরু বিষয় অপেক্ষা লঘু বিষয়েরই প্রতি অধিক অভিনিবেশ দেখা যায়। এই জন্যই রচনার পল্লবিততাই অধিক আদরণীয় হইয়াছে। গল্প ও বর্ণনারই আকর্ষণ বাড়িয়াছে। সহৃদয়তার অভাব হওয়াতে দোষানুসন্ধান প্রবৃত্তিই বলবতী হইয়াছে। ইহাতে আলোচনা অপেক্ষা সমালোচনাতেই অধিক প্রীতি দেখা যাইতেছে। আধুনিক বিদ্বেষপ্রসূত সমালোচনার ইহাই মূল।

উপায় বিধান—আমরা প্রথমেই বলিয়াছি বঙ্গ-সাহিত্যের এখন নেতা নাই। বঙ্কিমবাবুর মৃত্যুতেই বঙ্গ-সাহিত্য অনাথ হইয়াছে। তিনি রচনা ও সমালোচনায় সাহিত্যের নিয়ন্তা ছিলেন; তাঁহার চতুর্দ্দিকে উন্নত সাহিত্যসমাজ গঠিত করিয়া তদ্দ্বারা বিপুল সাহিত্য-রাজ্য স্থাপিত করিয়াছিলেন। সাহিত্যের মর্য্যাদালঙ্ঘনকারীকে তিনি কখনও ক্ষমা করিতেন না। সাহিত্যের গৌরববর্দ্ধনকারীকেও তিনি উৎসাহ প্রদান করিতে ও আদর করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

বঙ্কিমবাবু একা যাহা করিয়াছিলেন, এক্ষণে দশজনেও কেন তাহা পারিবে না? আমরা দেখিতেছি এই কয়েক বৎসরের মধ্যে মাসিকপত্রিকার সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা বহুগুণ বাড়িয়াছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে বিশেষ বিচারপূর্ব্বক প্রবন্ধনির্ব্বাচন করিলে অন্ততঃ কয়েকখানি মাসিকপত্র সুপরিচালিত হইতে পারে। একদিকে প্রবন্ধগ্রহণ সম্বন্ধে যেমন বিশেষ নিয়ম করা উচিত, পক্ষান্তরে, প্রবন্ধলেখককে যথোপযুক্ত পারিশ্রমিক দানে উৎসাহ প্রদান করাও কর্ত্তব্য। এই প্রকারে একটী মাসিকপত্রের বা সংবাদপত্রেরও যদি উচ্চগৌরব প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তাহাতে লিখিয়া কৃতিত্বলাভের জন্য সকলেই লালায়িত হইবে। অথচ উক্তরূপ সম্মার্জ্জন দ্বারা পত্রিকার প্রচার ও আদরও যে বৃদ্ধি পাইবে তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

নিরপেক্ষ ও সহৃদয় সমালোচনা দ্বারাও সাহিত্য কর্ত্তব্যপথে পরিচালিত হইতে পারে। বর্ত্তমান সাহিত্যে দর্শন ও বিজ্ঞানের সমুচিত চর্চ্চা হইতেছে না, বিজ্ঞানের বিবিধ শাখা এখনও বঙ্গসাহিত্যের নিকট অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। বিশেষ প্রলোভন ব্যতীত কেহ এ সকল ব্যয় ও শ্রমসাধ্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে প্রস্তুত হইবে না। তজ্জন্য বিশেষ ২ বৃত্তি স্থাপন একান্ত আবশ্যক। বাবু জয়গোপাল বসু মল্লিক বেদান্তের চর্চ্চার জন্য যে বৃত্তিস্থাপন করিয়াছেন তাহারই ফলস্বরূপ মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গের ধনিসন্তানেরা মল্লিক মহাশয়ের সদৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলে বঙ্গ-সাহিত্যের মহোপকার সাধিত হইতে পারে।

পূর্ব্বকালে যেমন রাজা বিক্রমাদিত্য, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি বিদ্যোৎসাহী নৃপতিবর্গ আপনাদের রাজসভায় বিদ্বদ্গোষ্ঠী স্থাপিতকরতঃ অরুণ সারথির ন্যায় তাঁহাদের প্রতিভাসূর্য্যকে প্রকাশিত করিয়া তাঁহাদের যশঃপ্রভায় একদিকে সাহিত্যকে চিরসমুজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন ও অপরদিকে তাঁহাদের নিজের রাজমুকুটকেও চির-দীপ্ত করিয়া গিয়াছেন, তদ্রূপ বর্ত্তমান রাজামহারাজ-প্রভৃতি যদি আপনাদের আশ্রয়ে সাহিত্যসেবীর সমাজ-সংগঠন করেন তবে তাহাতে তাঁহারা নিজেরা যেমন তদ্দ্বারা গৌরবমণ্ডিত হইবেন, তেমনই তাহাতে জাতীয় সাহিত্যকেও গৌরবমণ্ডিত করিবেন।

ভাওয়ালের কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের "সাহিত্য সমালোচনী" সভার ন্যায় স্থানে স্থানে সভা স্থাপিত হইয়া যদি যোগ্য গ্রন্থকারদিগের নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক গ্রন্থ ক্রয় দ্বারা বা পুরস্কারস্বরূপ অর্থ দান দ্বারা উৎসাহিত করা হয় তবে যোগ্য গ্রন্থকারের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে পারে।

অবস্থাবিবেচনায় প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার বা লেখকদিগকে যদি মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায়, তবে তাঁহারা নিশ্চিন্তভাবে সাহিত্যানুশীলন করিয়া দেশের হিতসাধন করিতে পারেন। কারণ, দারিদ্রের কঠোর নিষ্পেষণে কবিতা বা প্রতিভা কিছুরই স্ফূর্ত্তি সম্ভবপর নহে। তাই কবি বলিয়াছেন "অন্নচিন্তা চমৎকারা কাতরে কবিতা কুতঃ।" "দারিদ্রদোষো গুণরাশিনাশী।"

ত্রিপুরার বিদ্যোৎসাহী মহারাজবাহাদুর কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে শেষজীবনে মাসিকবৃত্তি প্রদান করিয়া কাশীধামে তাঁহার শান্তিলাভের সহায়তা করিয়া ছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু দীনেশচন্দ্র সেনের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ ত্রিপুরা রাজকোষের সাহায্যেই প্রথম মুদ্রাযন্ত্রের লৌহগর্ভ হইতে জন্মলাভ করে। সম্প্রতি কাসিমবাজারের দানব্রত মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দারের বিরাট "সমসাময়িক ভারত" গ্রন্থাবলীর মুদ্রণব্যাপারে যে রাজোচিত সাহায্য প্রদান করিয়াছেন তাহাতে বঙ্গসাহিত্যে যেমনই একটী বিশাল সৌধ প্রতিষ্ঠিত হইবে, তেমনই তাঁহার নিজের অক্ষয়কীর্ত্তি-স্তম্ভও সংস্থাপিত হইবে।

দরিদ্র গ্রন্থকারদিগকে গ্রন্থপ্রকাশে সাহায্য করিবার জন্য দেশে ধনিপ্রকাশকের অভাব। এরূপ প্রকাশকের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া আবশ্যক।

দেশে বহুল পরিমাণে পাঠগোষ্ঠী স্থাপিত হইলেও গ্রন্থের বহুল প্রচার দ্বারা গ্রন্থকারদিগের আদর বাড়িতে পারে।

সমবেতচেষ্টার দ্বারা বিলাতী গ্রন্থাবলীর ন্যায় সাহিত্যের বিশেষ ২ বিভাগে গ্রন্থাবলী প্রণয়ন জন্য বিশেষ উপযুক্ত লেখক সকল নিযুক্ত হইলে বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ পরিপুষ্টি ও প্রভূত বলবৃদ্ধি হইতে পারে এবং লেখকদিগের মধ্যেও সহযোগিতার ভাব সঞ্চারিত হইতে পারে।

এই সকল উপায়ে সাহিত্য সম্মানজনক ও লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হইলেই সাহিত্যের আশানুরূপ শ্রীবৃদ্ধি সম্ভাবিত হইবে। তখন সাহিত্যসেবার জন্য স্বতঃই ঐকান্তিকতা উদ্বোধিত হইবে এবং এই ঐকান্তিকতা হইতে একপ্রাণতার উৎপত্তি হইয়া সাহিত্য এক মহতী শক্তি জাগরিত করিবে। ইহারই বলে সাহিত্য এক মহৎ জাতীয় লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে। ইহাই সাহিত্যের প্রকৃত সফলতা প্রদান করিবে।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

প্রতিজ্ঞা যৌগন্ধরায়ণ

মহাকবি ভাসকৃত প্রতিজ্ঞা যৌগন্ধরায়ণের বঙ্গানুবাদ

পাত্র-পাত্রীগণ

পুরুষগণ

যৌগন্ধরায়ণ—বৎসরাজ উদয়নের মন্ত্রী।
উন্মত্তক—উন্মত্তবেশী মন্ত্রী।
শ্রমণক—শ্রমণকবেশী উদয়নের মন্ত্রী রুমণ্বান।
বিদূষক (বসন্তক)—রাজা উদয়নের নর্ম্মসচিব।
ব্রাহ্মণ—কৌশাম্বীবাসী ছদ্মবেশী পুরুষ।
হংসক—উদয়নের সহচর জনৈক পণ্ডিত।
গাত্র সেবক—কৌশাম্বীবাসী ছদ্মবেশী মাহুত।
সালক—যৌগন্ধরায়ণের লোক।
নির্মুণ্ডক—প্রতিহারী।
মহাসেন—উজ্জয়িনীর রাজা (প্রদ্যোত)।
ভরতরোহক—মহাসেনের মন্ত্রী।
বাদরায়ণ—মহাসেনের কাঞ্চুকীয়।
ভট—বাসবদত্তার পরিচারক।
দুইজন নাগরিক।

স্ত্রীগণ।

বাসবদত্তা—উজ্জয়িনীপতি মহাসেনের কন্যা।

অঙ্গারবতী—মহাসেনের মহিষী।

বিজয়া—যৌগন্ধরায়ণের প্রতিহারী।

প্রতিজ্ঞা নাটকের গল্পাংশ

[খৃষ্টের জন্মের বহুশত বৎসর পূর্ব্বে যমুনার তীরে কৌশাম্বী নামে এক সুসমৃদ্ধ রাজ্য ছিল। এই রাজ্যে উদয়ন নামে ভারতবিখ্যাত ভরতবংশীয় এক রাজা রাজত্ব করিতেন। যৌগন্ধরায়ণ নামে তাঁহার এক অতি বিচক্ষণ ও প্রভুহিতৈষী মন্ত্রী ছিলেন। সেই সময়ে অবন্তী দেশে মহাসেন নামে এক অতি পরাক্রান্ত রাজা রাজত্ব করিতেন। মহাসেনের একটী রূপবতী কন্যা ছিল—তাঁহার নাম বাসবদত্তা। রাজা ইচ্ছা করিলেন, উদয়নের সহিত বাসবদত্তার বিবাহ দিবেন। একে উদয়ন মহাপবিত্র ও অতি উচ্চ ভরতবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন.—তাহার উপর তিনি শাস্ত্রবিদ্যায়, সমরবিদ্যায় ও সঙ্গীতবিদ্যায় একান্ত পটু এবং প্রজাগণও তাঁহার গুণে একান্ত অনুরক্ত; এই সকল কারণে তিনি মহাসেনের বিবাহপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতেও পারেন, এই আশঙ্কায় অবন্তীর রাজা কৌশলে উদয়নকে হস্তগত করিবার সঙ্কল্প করিলেন। উদয়ন হস্তি-বিদ্যায় পরম পারদর্শী ছিলেন, তিনি বীণা বাজাইয়া হস্তী বশ করিতে পারিতেন। মহাসেন ঐরাবতের ন্যায় একটা মনোহর কৃত্রিম নীল হস্তী রাজ্যপ্রান্তে শালবনে স্থাপন করিয়া বৎসরাজ্যে চরমুখে সংবাদ পাঠাইলেন যে, নাগবনে একটা অপূর্ব্ব হস্তী আসিয়াছে। উদয়ন শুনলেন, শুনিয়া স্থির করিলেন এই হাতীটা ধরিতেই হইবে। পরে তিনি হস্তী শিকার করিতে নাগবনে আসিয়া শত্রুর ছলে শত্রুহস্তে বন্দী হইলেন। মহাসেনের মন্ত্রী সালঙ্কায়ন তাঁহাকে অবন্তীতে লইয়া গেল।

কৃষ্ণাষ্টমীর পরদিন কুমারী বাসবদত্তা খোলা শিবিকায় আরোহণ করিয়া যক্ষিণী দেবীর মন্দিরে পূজা দিতে গিয়াছিলেন। নগরের জল-প্রণালীর জল উপচিয়া রাজপথ ডুবাইয়া দিয়াছিল, সুতরাং রাজকুমারীকে কারাগৃহের সম্মুখ দিয়া যাইতে হইয়াছিল। বন্দী উদয়ন কারাগৃহের জানালা দিয়া রাজকুমারীকে দেখিলেন. দেখিয়া তাঁহার অনিন্দনীয় রূপে মুগ্ধ হইলেন। কুমারী বাসবদত্তাও সুরূপ বৎসরাজকে দেখিয়া তাঁহার অনুরাগিণী হইলেন। রাজা মহাসেন উভয়ের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বাসবদত্তাকে উদয়নের নিকট বীণা শিখিতে অনুমতি দিলেন। এইরূপে বৎসরাজের কারাবাস প্রমদ বনবাসে পরিণত হইল।

প্রভুপরায়ণ যৌগন্ধরায়ণ মহারাজ উদয়নের আকস্মিক বিপদের কথা শুনিয়া পূর্ব্বেই ব্যথিত হইয়াছিলেন, এখন আবার উদয়ন শত্রুকন্যার রূপে মোহিত হইয়াছেন, এই অপৌরুষেয় সংবাদ পাইয়া তিনি একান্ত মর্ম্মাহত হইলেন; কিন্তু ইহাতে তাঁহার রাজভক্তির অণুমাত্রও লাঘব হইল না। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, যদি আমি যৌগন্ধরায়ণ হইয়া থাকি, তবে রাজার বীণা ও অবন্তীকুমারীর সহিত রাজাকে বৎসরাজ্যে ফিরাইয়া আনিবই আনিব। এই বলিয়া মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ গুপ্তচর পাঠাইয়া অবন্তীরাজ্য ছাইয়া ফেলিলেন, বহু সৈন্য ছদ্মবেশে মহাসেনের রাজধানীতে আশ্রয় পাইল। তিনি স্বয়ং উন্মত্তের বেশে অবন্তীর রাজপথে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। মন্ত্রী রুমণ্বান শ্রমণকের বেশধারণ করিয়া যৌগন্ধরায়ণকে সাহায্য করিতে লাগিলেন পরে সুযোগ বুঝিয়া একদিন রাজা উদয়ন বাসবদত্তার সহিত রাজহস্তীতে আরোহণ করিয়া অবন্তী হইতে পলায়ন করিলেন। সংবাদ পাইয়া অবন্তীর সৈন্যগণ তাঁহাদের অনুসরণ করিল। যৌগন্ধরায়ণ স্বীয় লোকজন একত্র করিয়া তাহাদিগকে বাধা দিলেন। বহুক্ষণ যুদ্ধ চলিল। পরে মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের অসি ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি শত্রুহস্তে বন্দী হইলেন। কিন্তু মহাসেন তাঁহার নীতি-

কুশলতার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে মুক্ত করিয়া সসম্মানে কৌশাম্বীনগরীতে পাঠাইয়া দিলেন।

স্থাপনা।

সূত্রধারের প্রবেশ।

সূত্রধার। যিনি স্বয়ং বাসবের কল্যাণ বিধান করেন, যিনি বিপুল সেনাবলে বলীয়ান্, যাঁহার পরাক্রম অসীম, যিনি রাজবৎসল, যিনি শক্তিমান মহাপুরুষ, এবং যিনি যুগনিয়ামক, তিনি (ভগবান) তোমাদিগকে পালন করুন। (পরিক্রমণ ও নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ওগো, এদিকে এস।

নটীর প্রবেশ।

নটী। এই যে আমি এসেছি।

সূত্র। বেশ, একটা গান গাও ত। তোমার গান শুনে সকলের মনে যখন ফুর্ত্তি হবে তখন নাটক আরম্ভ করা যাবে। তুমি ভাবছ কি? একটা গাও।

নটী। কি গাব, মনটা ভাল নয়। কাল স্বপ্নে বন্ধুবান্ধবের অমঙ্গলের মত দেখেছি, তাই তোমাকে বল্‌তে যাচ্ছিলুম, একটা লোক পাঠিয়ে সকলের খবর নাও।

সূত্র। আচ্ছা, তাই নিচ্ছি। আমাদের উপকারী, এমন একজনকেই পাঠাতে হবে দেখ্‌ছি।

(নেপথ্যে)

সালক, কাপড় চোপর পরে নাও।

সূত্র। যৌগন্ধরায়ণ যেমন লোক চান ঠিক তেমনটিই পাঠাব।

(উভয়ের প্রস্থান)।

প্রথম অঙ্ক।

সালকের সহিত যৌগন্ধরায়ণের প্রবেশ।

যৌগ। সালক, কাপড় চোপর প'রে নাও—শীগ্‌গির কর।

সাল। হাঁ, আর্য্য, এই নিচ্ছি।

যৌগ। তোমাকে অনেক দূর যেতে হবে, তা জান?

সাল। প্রাণ দিয়ে আর্য্যের আদেশ পালন করব।

যৌগ। হাঁ করবে বৈ কি, আমাদের সকলের স্বার্থই সমান। কর্ম্ম দুষ্কর হ'লেও সেটা যদি ভাল লোকের উপর পড়ে, আর সে যদি ভালবাসার খাতিরে মনিবের কাজ গ'ছে নেয়, তবে সে কাজ সে কর্‌বেই। যদি সে কাজ সিদ্ধি না হয় সেটা দৈবের দোষ, আর যদি হয় তবে দৈবের গুণ।

মহারাজ যে তিন বনে সর্ব্বদা হাতী শিকার করেন তার মধ্যে যেটার নাম নাগবন কাল তিনি সেখানে যাবেন, তোমাকে মহারাজের আগেই সেখানে যে'য়ে হাজির হ'তে হবে।

সাল। যেন মন্ত্রী মশায়ের আদেশ মত সব কাজ কত্তে পারি তার জন্য আমাকে একটা কিছু লিখে দিতে হবে।

যৌগ। বিজয়া—

বিজয়ার প্রবেশ।

বিজ। আর্য্য, এই আমি এসেছি।

যৌগ। বিজয়া, শীগ্‌গির যা যা কত্তে হবে সালককে লিখে' দাও, আর অন্তঃপুর থেকে প্রতিসরা* নিয়ে এস।

* কঙ্কণ, হস্তসূত্র প্রভৃতি অভিজ্ঞানচিহ্ন।

বিজ। যে আজ্ঞা, আর্য্য।

যোগ। সালক, তুমি কি আগে কখনও নাগবনে গিয়েছ ?

সাল। না মন্ত্রী মশায়, তবে সেখানে যাওয়ার পথ আমার শোনা আছে।

যোগ। তা হ'লে তোমার মেধাশক্তি ত কম নয় হে! সালক, আমি শুনলুম একটা কৃত্রিম বুনো হাতীকে বনের ভেতর লুকিয়ে রেখে অবন্তীরাজ প্রদ্যোত আমাদের রাজাকে ধরবেন এই ফন্দি এঁটেছেন। আর খুবই সম্ভব আমাদের রাজাও এই ফাঁদে পড়বেন। (স্বগত) হায়, প্রদ্যোত! বৎসরাজকে তোমার এত ভয়! তোমার অক্ষৌহিণী সেনা আছে ব'লে যে গর্ব্ব ক'রে থাক তার বল এখন বুঝা গেল। শুনেছি তোমার সৈন্যসংখ্যা গ'ণে শেষ করা যায় না, তোমার সেনাপতিও অসংখ্য। কিন্তু এই সৈন্য একটা কিছু কাজ করেছে এমন কথা আজ পর্য্যন্তও শুনিনি। আর যদি সেনাপতিরা তোমার অনুরক্তই হবে তবে যেখানে যুদ্ধ করা উচিত সেখানে ছল কেন ? শুধু সৈন্য থাকলে কি হয়! অনুরাগবিহীন সেনা আর অনুরাগবিহীন স্ত্রী এই দু'য়ে কোনই তফাৎ নেই।

বিজয়ার প্রবেশ।

বিজয়া। এই যে সব লিখে' নিয়ে' এসেছি। রাণী মা বললেন সব বউদের হাত থেকে তিনি শীগগিরই প্রতিসরা পাঠিয়ে দিচ্ছেন।

যোগ। বিজয়া, রাণীমাকে বল গিয়ে, যাও দেরী ক'রো না—প্রতিসরা সব বউদের হাত থেকে দিলেও হবে, একজনের হাত থেকে দিলেও হবে।

বিজয়া। আচ্ছা, যাচ্ছি; তাই বলি গিয়ে।

[প্রস্থান।]

নির্মুণ্ডকের প্রবেশ।

নির্মু। মন্ত্রী মশায়ের মঙ্গল হোক।

যোগ। একি! নির্মুণ্ডক যে!

নির্মু। মন্ত্রী মশায়, মহারাজের কাছ থেকে হংসক এসেছেন।

যোগ। কি! হংসক একা এসেছেন! সালক, তুমি একটু বিশ্রাম কর। এখনি যাবে, না একটু ব'সে যাবে ?

সাল। মন্ত্রী মশায় যেমন বলেন।

যোগ। নির্মুণ্ডক, হংসক ঠাকুরকে এখানে নিয়ে এস।

নির্মু। যে আজ্ঞা।

যোগ। হংসক ঠাকুর মহারাজকে ছেড়ে একা এলেন কেন ?(স্বগত) যত ভাবছি মন ততই উদ্বিগ্ন হচ্ছে। কোনও লোক বিদেশে গেলে তার বন্ধুবান্ধব যেমন আকুল হ'য়ে তার পথপানে তাকিয়ে থাকে, আর বিদেশ থেকে ফিরে এলে ভাল খবর শুনবে কি মন্দ খবর শুনবে এই ভেবে আতঙ্কিত হয়, আমারও ঠিক সেই দশা হ'য়েছে। না জানি হংসক কি বলবেন ? ভালই বলবেন, না মন্দই বলবেন ?

হংসক ও নির্মুণ্ডকের প্রবেশ।

নির্মু। ঠাকুর মশায়, আসুন আসুন।

হংস। মন্ত্রী মশায় কোথায় ?

নির্মু। এই যে মন্ত্রী মশায় এখানেই আছেন। আপনি এঁর কাছে যান।

হংস। (অগ্রসর হইয়া) মন্ত্রী মশায়ের মঙ্গল হোক।

যোগ। হংসক ঠাকুর, মহারাজ নাগবনে যান নাই ?

হংস। হাঁ আর্য্য, তিনি কালই গিয়াছেন।

যোগ। কালই গিয়েছেন, সব মাটি হ'ল। আর লোক পাঠিয়ে লাভ কি ? হায়! হায়! শেষে রাজা

প্রদ্যোতের ফাঁকিতেই পড়লেন! আর কিছু আশা আছে কি? না আজই আমাদেরও প্রাণত্যাগ ক'রে এই অপমানের প্রায়শ্চিত্ত কত্তে হবে?

হংস। না মন্ত্রী মশায়, মহারাজ প্রাণে বেঁচে আছেন।

যৌগ। তা হ'লে ঘোর বিপদ এখনও ঘটে নি! মহারাজ তবে বন্দী হয়েছেন?

হংস। মন্ত্রী মশায় ঠিকই বুঝেছেন, মহারাজ সত্যই বন্দী হয়েছেন।

যৌগ। মহারাজ কি ক'রে বন্দী হ'লেন? হায়! প্রদ্যোতের অদৃষ্ট বড় ভাল! এমন একটা গুরুতর কাজ এত সহজে হাসিল কল্লে! আজ থেকে লোকে খাঁটি বুঝতে পারবে যে বৎসরাজের মন্ত্রীগুলি নেহাৎ অকর্ম্মণ্য। আজ থেকে এদের মুখে কালি পড়লো। পাছে যে বিপদ হবে তাও যিনি আগে দেখতে পান, এমন বিচক্ষণ মন্ত্রী রুমণ্বান এখন কোথায়? অশ্বারোহীরাই বা গেল কোথায়?

যে সকল রাজবৎসল লোক মহারাজের সঙ্গে ছিলেন, তাঁদের উচ্চ বংশে জন্ম, তাঁরা বহুগুণের আধার, রাজা তাঁদিগকে একমাত্র স্নেহ দিয়ে কি'নে রেখেছিলেন, তারা সত্যই বীরপুরুষ ও বলিষ্ঠ দেহ। শত্রুপক্ষ কি এদের সকলকেই ঘুষ দিয়ে বশীভূত কল্লে? না এরা অগণিত বিপক্ষ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে বিনষ্ট হ'ল?

হংস। রাজার সঙ্গে যদি সমস্ত সৈন্য থাকৃত তবে তিনি বন্দী হ'তেন না।

যৌগ। কি! মহারাজের সঙ্গে সৈন্য ছিল না? এরা গেল কোথায়?

হংস। আর্য্য, তবে শুনুন।

যৌগ। আপনি পথ চ'লে ক্লান্ত হয়েছেন, বসুন। ব'সে বলুন।

হংস। যে আজ্ঞা। (উপবেশন) শুনুন মন্ত্রী মশায়। রাত শেষ হ'য়ে গেছে, মাত্র ভোর হ'য়েছে। চলার পক্ষে সেই সময়টাই খুব ভাল সময়। এমন সময়ে মহারাজ বালুকাঘাট দিয়ে নর্ম্মদা নদী পার হ'য়ে বেণুবনে গিয়ে সকলকে সেখানে থাকৃতে বল্লেন। তার পর মাত্র ছাতা আর হাতী ধত্তে যে কয়জন লোকের দরকার, সেই কয়জন লোক সঙ্গে ক'রে মৃল্লিকায় ঢাকা বনের পথ দিয়ে নাগবনে চ'লে গেলেন।

যৌগ। বেশ, তার পর।

হংস। তখন সূর্য্য ধনুর মত একটু মাত্র উঠেছে; মহারাজ এর মধ্যেই কয়েক যোজন ছাড়িয়ে গেলেন, মদয়ন্তী পর্ব্বত আর এক ক্রোশ মাত্র দূরে আছে—মন্ত্রী মশায়, তখন, কি আর বলুব, আমরা দেখলুম একটা হাতীর পাল,—ভারি ভীষণ—গাঁথুনি শেষ হয় নি এমন একটা পাথরের প্রাচীরের মত, যেন তড়াগের ধার থেকে গেঁথে তুলেছে।

যৌগ। প্রাচীরের মত হাতীর দল! তার পর।

হংস। হাতীগুলি দেখে আমাদের সঙ্গের লোকজন সব ভাবছে কি করা যায়, আর হাতীগুলিও এতগুলি লোক দেখে একটু শঙ্কিত হয়েছে। ইতিমধ্যে কো'থেকে এক বেটা পদাতিক—সকল অনর্থের মূল—সেই বেটা একেবারে মহারাজের সামনে এসে উপস্থিত হ'ল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

অনুবাদ

(রসেটি হইতে)

(১)

হরিত-বরণ তটিনীর কূলে
সদাই সে বসি গাহিত গান,
রবি-করে খেলা দেখিয়া মাছের
পুলকে তাহার ভরিত প্রাণ ;

আমি ঢালিতাম নয়নের বারি
বসিয়া নীরব চাঁদের তলে,
দেখিতাম কত ঝরিত কুসুম,
ভেসে যেত পাতা স্রোতের জলে ;

মধুর আশায় গাহিত সে গান,
আমি কাঁদিতাম স্মৃতির তরে :
গানগুলি তার শূন্যে মিশে গেছে,
অশ্রুগুলি মোর সাগরনীরে।

(২)

ভালবাসা নহে কভু শুধু হাসি খেলা,
যে সে শুধু অকাল-[illegible]।
প্রণয় পরশে বটে পাই নব প্রাণ,
থাকে না সে নূতন জীবন !

প্রেমের ইঙ্গিতে মোরা ক্ষণিকের তরে
ফুটে উঠি কুসুমের মত।
দুটি দিন হেসে খেলে যাই গো শুকায়ে
চিরদিন চরণে দলিত।

মুস্তফা।

আমি সব দেখিলে দেবতা মোহ জাএ।
হেন রূপ জৌবন জে তোমাতে মিসাএ॥
আমি সব দেখিলে গোক্ষের মন টলে।
হেন সোন (?) যারে পাইলে তারে কেবা ফেলে।
হরি হর য়াদি করি দেবতা সকল।
সকল জানিয় প্রভু কামেত দুর্ব্বল॥
হাড়িপা বাখান করি সিদ্ধার ভিতরে।
দেখিয়া নারির রূপ মুনির মন হরে॥
দেবতা গন্ধর্ব নর সিদ্ধ বিদ্যাধর।
নারি লৈয়া গৃহবাস করএ সত্তর॥
চারি বেদ চৌদ্দ শাস্ত্র করত বিচার।
ধর্ম্ম পন্ত ভাবি কেহ নাহি হএ পার॥
জত সব কহে গোক্ষ কি বলএ ভাল।
স্ত্রি পুত্র ধন জন ভোগ কত কাল॥
মুনির্ষ জনম জান অধিক দুল্লব।
সুক তেজি কেনে চাহ করিতে লাঘব॥
কত কাল সুখ ভোগ মনির্ষ জনমে।
তাতে কেনে জুগী হইতে চাহ নিজ মনে॥
রামের জানকি জান মদনের রতি।
কৃষ্ণের নারি সৈত্য ভামা তেজি নিজ পতি॥ (১)
চন্দ্রের রহিনি কিবা পুরন্দর নারি।
রাবনের মন্দাদরি সিবের গঙ্গা গৌরি॥
গন্ধর্ব্বের রম্ভা নারি শাস্ত্রেত জে দেখী।
পৃথিবীতে কে বা য়াছে স্ত্রি জে উপক্ষি॥
কার ঘরে না আছএ দেখএ কামিনী।
এ সকল ভাবি দেখ প্রভু সিরমণি॥
বুড়া (কা) লে য়ুন প্রভু কি সাধিবা কায়া।
দুক্ষভোগ হৈতে যত গোক্ষে করে মায়া॥

রাজ্জপাট এড়ি কেনে হৈবা দেশান্তরি।
নিতি মনে য়াসা হইব পরে দিব করি॥
রাজ্জ তেজি দেশান্তরি তুমি কেনে জাইবা।
ভিক্ষুক হইয়া তোমি কত মাগী খাইবা॥
তুমি রাজা প্যাটে বৈস আমি পাটেশ্বরি।
আমারে তেজিয়া কেনে জাইবা দেশান্তরি॥
কায়া মনে সেবিবাম তোমার চরণে।
তুন্ধি এড়ি গেল আমি তেজিব জীবনে॥
কোটি ২ জনের জানহ তুহ্মি রাজা।
লৈক্ষে ২ মুনির্ষে তোমারে করে পূজা॥
কোটি কোটি জ্ঞানি হৈতে তুমি মহাজন।
কুটি কোটি লোকে খাএ তোমার বেতন॥
পরের খাইবা ভাত নিতি পরবাস।
না পাইলে না খাইবা প্রভু নিতি উপবাস।
প্রভাত হইলে প্রভু তোমার লাগে ভোক।
খুধাএ না পাইলে প্রভু বড় পাইবা সোক॥
সগণ্ডা ভাজন পঞ্চাস বেঞ্জন।
পঞ্চাম্রেতে প্রতিনিতি তোমার ভোজন॥
যুধা অন্ন পাইবা জে আর কচুর সাগ।
সপ্নে হ না পাইবা তুমি রাজভোগ লাগ॥
সুবন্ন মন্দিরে থাক কামিনির কোলে।
খাতা পাতি সুতিবা তুমি জুগী হৈয়া গেলে॥
খড়্গা চর্ম্ম ধরিয়া তোমার চকি থাকে।
জুগী হইলে চকি দিব শ্রীকালে তোমাকে॥
বিচিত্র আসনে প্রভু গায় দুখাএ। (২)
ভাঙ্গ দোলা খাথা কেমনে দিবা গাএ॥
পোকে জোকে খাইবেক খাইব উলুসে।
পাইবা নানা দুক্ষ কহিলাম বিসেসে॥

(১) শ্যামদাস সেনের শাস্ত্রজ্ঞান খুব তীক্ষ্ণ ছিল বলিয়া মনে হয় না। সত্যভামা নিজপতি ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণকে ভজনা করিয়াছিলেন, ইত্যাদি শাস্ত্র জ্ঞানের পরিচায়ক নহে।

(২) দুঃখিত হয়. দুঃখ অনুভব করে ; অথবা ব্যথা দেয়।

বিচিত্র মন্দিরে থাক নিতি বৈঙ্গ খাটে।
সদর্ত্ত করিএ সেবা কদলির চাটে ॥
ইবলিয়া মোঙ্গলায় আথির দিল সান।
সোলসত জুবতী মিলি ধরেন জোগান ॥
ভোলেত পড়িল মিন প্রেমের য়ালাপে।
জলেত পড়িলে যেন খণ্ডি যায় তাপে ॥
বিন্দুনাথেরে দেখি রাজার কোলে দিয়া।
মোঙ্গলা কমলা বৈসে রাজার বামে গিয়া ॥
মায়া করি বৈসে আসি নিকটে মিনের।
অঙ্গেত লাগাইয়া অঙ্গ বিখল মনের ॥
দুই নারি বৈসে দুই দিগেত চাপিয়া।
নানা মতে মায়া করি রাখএ ভুলাইয়া ॥
অঙ্গ ভঙ্গ করিয়া ছাড়িয়া বান্দে কেশ।
দুই পায় আছাড়িয়া কামিনি করে ভেশ ॥
এতেক দেখিয়া মিনে জ্ঞান নাহি পাএ।
ডাইনে ডাকিয়া গোর্ক্ষে বলে হাএ হাএ ॥
এতেক জর্ত্তনে গুরু করিলাম চেতন।
মায়া পাতি জুবতিএ ভুলাইল মন ॥
এত কৈয়া গুরুকে না পারি বুঝাইতে।
নানা মতে না পারিল কদলি য়ানিতে ॥
ভোলা মিননাথ গুরু পড়িল ভোলেত।
জুবতী এড়িতে গুরুর নাহিক মনেত ॥
পাগল হইল গুরু ভোলে পড়ি গেল।
জুবতী দেখিয়া বেটা য়ঁথনে মিলিল ॥
বাঘিনিরে দেখিয়া গুরুর হৈল রঙ্গ।
এ সব দেখিয়া গোর্ক্ষ হইল য়াতঙ্গ ॥
মিনের চরিত্র দেখি জতিজে গোর্ক্ষাই।
মনেত ভাবিয়া দুর্ক্ষ বলিল কিটাই ॥
অতি দুর্ক্ষে বোলে নাথে গুরুরে চেতাই।
তুমি হেন পাগল যে ত্রিভুবনে নাই ॥
স্ত্রিপুত্র লইয়া যে রহিলা এহি ঠাই।
ডুবাইলা সংসার গুরু শুনরে মিনাই ॥

রমনির বচনে বচন ভালা না লাগে।
য়ামি কহি জত ইতি তোমারে ধরে রাগে ॥
আমার বাক্য মুনিতে যে তোমার জঞ্জাল।
সিসিরের জল সোসে হইয়া জম কাল ॥
আমার বচন গুরু শুন দিয়া মন।
রমনির হাতে পড়ি হইলা অচেতন ॥
দিন দুই চারী য়াছে মরিবা যে সাচা।
য়ামার বচন জান সব তুমি মিছা ॥
য়খনহ শুন শুদ্ধি বচন য়ামার।
পশ্চাতে না পাইবা দুর্ক্ষ মনে য়াপনার ॥
দিন চারি আছে আউ নিশ্চয় জানিল।
তোমার চরিত্র আমি দেখিয়া চিনিল ॥
জল যদি থাকে নৌকা বাইয়া যাইতে পারি।
দুর্ক্ষ করিয়া নৌকা যেন কুলে তরি ॥
তেনমতে কষ্ট করি গুরু বাক্য ধরী।
সুজন কাণ্ডারি হৈলে ভবসিন্দু তরি ॥
কিবা স্ত্রিপুত্র বাপু কিবা মিত্র জন।
এ সকল সম্পদ জান নিসির সর্পন ॥
মরিলে না জাইব কেহ তোমার সংহতি।
দিনচারি কান্দিবেক মুন মহামতি ॥
যেবা বস্তু লৈয়া তুমি য়াসিছ ভোবনে।
সেই সব বস্তু জান যাইবে তোমার সনে ॥
অবহেলা না করিয় স্থির কর মন।
জত্ন করি ধর এবে গুরুর বচন ॥
পদ্মপত্রের জল যেমন করে টলমল।
তেমনত তোমার আউ জানিয় নির্চ্চয় ॥
যেই জনে জত্ন করে চিরকাল রহে।
য়বহেলা না করিলে সর্ব্বরক্ষা হএ ॥
আউ না থাকিলে জান সকল য়সার।
মিছা ধার্ন্দা ভাব কেনে সংসার মার্ঝার ॥

জিবন থাকিলে সে তোমার ঘরবাড়ী।
মরিলে দুর্ল্লব প্রাণ না য়াসিব ফিরি।।
মন ঘোড়া পোবন জিন নিশ্চএ জানিয়া।
ঘোড়া বন্দ করি রাখ বাউ ভর দিয়া।।
তবে সেহি বাউ জান জাইব ছাড়িয়া।
যোগ কথা কহি বাপু যুন মন দিয়া।।
মিনে বোলে সুন বাপু পণ্ডিত গোর্ক্ষাই।
জত কথা কহ তুমি পৈত্যএ জে পাই।।
তবে কি মায়াএ মোর জড়িছে সরীর।
কামিনির মুখ দেখি চির্ত্য নহে স্থির।।
কদলি সকল য়ামি না দেখি নয়ানে।
ক্ষেণেক রহিতে আমি না পারি নির্জ্জনে।।
য়াসনেত মন নাহি বাগিনী রাখে সান্দি।
দুই মত ভাবি মোর নহে মন বন্দি।।
গোর্ক্ষনাথে বোলে গুরু আমা ভাণ্ড কেনে।
ত্রিভুবনে হেন কর্ম্ম করে কোন জনে।।
দুই মন পরিত্যাগী এক মনে ভাব।
তবে সে বুজিবা তুমি গুরুর বাক্য লাব।।
পানি ফুটি থাকিতে যে নৌকা খেলে জলে। (১)
যুজন কাণ্ডারি হৈলে কি করে উথালে।।
জানিয়া না জান গুরু য়াপনে কোন জন।
বুজিয়া না বুজ গুরু কিসের কারন।।
ই বুলিয়া জতিনাথে ভাবে মনে মন।
কিরূপে সারিমু (২) মুহি গুরু অতি ধন।।

কদলির ভোলে গুরু হইল ঝর ঝর।
না ছাড়িব মায়ামোহ ভ্রমে নিরান্তর।।
মায়াদড়ি বান্দিলেক ভোলা মচন্দর।
মায়া ছাড়ি নারে গুরু হইতে সন্তন্তর।।
স্থির হইতে নারে গুরু ভাবে দুই মত।
মনে মনে কৈল সার গোর্ক্ষ য়বধৌত।।
এত ভাবি জতিনাতে আগে কৈল হাত (৩)।
কোল হতে লৈইলেক বিন্দু জগর্ন্নাত।।
মিনে বোলে যুন বাপু জতি যে গোর্ক্ষাই।
পাখালিয়া আন তোমার বিন্দুনাত ভাই।।
ঝুলিখাথা মোর কাছে জায়ত এড়িয়া।
সরবর হতে আন তানে ধোয়াইয়া।।
আজি কান্দাইব মুহি কদলির মাই।
ধোয়াইয়া তাহানে মুই জানাইব বড়াই।।
বিন্দুনাতেরে মারি জানাইমু সবাক।
তবে সে জানিব গুরু সাচা হেন মোক।।
য়াছে কি না য়াছে মায়া পরক্ষি চাহিমু।
য়াপনার গুন জত বেক্ত জে করিমু।।
এত ভাবি বালক লৈয়া গেল সরবরে।
নৌখের য়াছাড়া (৪) দিয়া পেট খান চিড়ে।।
পেট ফারি বিন্দুনাতের ঝুলি নিকলিল।
ধোপার কাপড় জেন য়াছাড়িআ ধুইল।।
বিছাইয়া রদ্রেত দিল সৈল মৎস্য জেন।
বালক দেখিয়া কান্দে কদলির গন।।
সমুদ্র হিল্লুল জেন কান্দে হুলাস্তুলি।
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে জতেক কদলি।।
কান্দিতে কান্দিতে সবে মিনের ঠাহি কহে।
কান্দিয়া আকুল সব গড়াগড়ি বাহে।।
আচম্বিতে মাথে পড়িল বজ্র ঘাত।
পুত্রবধু দেখি কান্দে রাজা মিননাথ।।

---

(১) ফুটি অর্থ এখানে নিশ্চয়রূপে বুঝা যাইতেছেনা। পানিফুটি—(১) কতকখানি জল (২) জল ফেলিবার ব জল ঢুকিবার ছিদ্র। (৩) জলের স্ফুটন বা তরঙ্গ।—এই তিন অর্থ হইতে পারে; ইহার মধ্যে দ্বিতীয় অর্থেই সঙ্গত অর্থবোধ হয়।

(২) রক্ষা করিব, সামলাইব।

(৩) হাত বাড়াইল।

(৪) আঁচড়।

কথাতে বিন্দুক য়ান দেখম নয়ানে।
কেমতে মারিল তাকে পাপিষ্ঠ দুর্জ্জনে॥
সমুখে য়ানিল তাথে দেখিতে তনয়।
মুখে মুখ দিয়া কান্দে রাজা মহাসয়॥
কান্দিতে কান্দিতে মিন য়াখির বহে ধার।
কেনে হেন গোর্ক্ষনাথ কৈলা অবেভার॥
সথর য়ধিক জান গুরু পুত্র ভাই।
হেন কর্ম্ম কৈলা কেনে গুরুকে না চাহি॥
না চাহিলা য়ামার দিগ বধিলা জে ভাই।
আমার জে জুগীকুলে জাতি বধ নাই॥
কাল রুপে আইলা গোর্ক্ষ মোর মনে লএ।
বিদ্ধিকালে পুত্রসোক প্রানে নাহি সয়॥
কান্দিতে কান্দিতে মিন হৈল অচেতন।
পুত্র পুত্র বোলি রাজা মুদিল নয়ন॥
সোলস কদলি কান্দে মিননাথে বেড়ি।
উচ্চস্বরে কান্দে সবে দির্গ ডাক ছাড়ি॥
পুত্র সোকে মিননাথে অচতন্ন হইল।
উর্দ্ধেসিয়া গোর্ক্ষনাথ কহিতে লাগীল।
পাখালিতে বিন্দুনাথ আজ্ঞা দিলা মোরে।
ভাল মত পাখালিলাম কান্দহ কিসেরে॥
সঙ্করের সিস্য তুমি সর্ব্বলোকে জানে।
মহামন্ত্র য়াহুতিআ জিয়াও তাহানে॥
পুত্রসোকে ভোর হইয়া কেনে মর তুমি।
তুমি জদি না পার জিয়াইয়া দিব য়ামি॥
তাহা সুনি মিন নাথে চিন্তিলেক মনে।
আমারে পরিক্ষে গোর্ক্ষে বুজিলাম ধরানে॥
সিসু য়ানি দেয় মোরে বোলে মিন রায়।
মরা সিসু য়ানি গোর্ক্ষে দিলেন্ত তথাএ॥
হাতে জল লৈয়া জেন মিননাথে পড়ে।
ভ্রম হইয়া আছে নাথে মনে নাহি স্বরে॥
য়াস্ত মন্ত্র পড়িয়া গোর্ক্ষে ছুড়ি দিল।
উঠিয়া বসিল মড়া জিবন সঞ্চরিল॥

পুত্র পাইয়া মিননাথে কোলেত লইল।
জাতি সতি গোর্ক্ষনাথ বড় বাখানিল॥
কদলি সকলে বোলে কথার রার্ক্ষস।
মায়াবন্ত মোহাসক্ত য়াজ্জিলেক জস॥
কেমন সাহস মোর পুরি কৈল দারি।
ভোলাইয়া পারে মোর প্রভু নিতে হরি॥
সোলস কদলি য়াসি মিননাথ ধরি।
মিনের চৌদিগে থাকি কদলিএ বেড়ি।
নানা মন্ত্র আর্ত্তিয়া করিব পাগল।
কিরুপে রাখিব প্রভু ভাবিল সকল॥
তা দেখিয়া গোর্ক্ষনাথে আগ্নি হেন জলে।
চন্দ্র সুর্জ্জ সাক্ষি করি জতি নাথে বোলে॥
মুখে খায় মুখে বর্জ মুখে জাহ সঙ্গ।
উড়হ গগন পথে হইয়া বাদুর রঙ্গ॥
বিক্ষ পত্র চুসি তোরা করহ আহার।
এহি শাপ দিল য়ামি শুন দুরাচার॥
বাদুর হইয়া সব কদলি গেল উড়ি।
কদলি সকল গেল মিননাথ এড়ি॥
ভোলা হইয়া য়াছে দেখ গুরু মিনরায়।
জিজ্ঞাসা করএ গোর্ক্ষে ধরি দুইপাএ॥
না ঝরিল না টুটিল রবি য়ার সসি।
এ কারণে গুরু গোসাহি তোমারে জিজ্ঞাসি॥
সুর্জ্জতাপে গুরু তোমার না সুসিল কায়।
তবে কেনে মসুরার উড়িয়া জে জাএ॥
মনপোবন যেন হৈল ভুলা মেলা।
এতেকে সে রাজহংস উড়িয়া সে গেলা॥
আস্ত য়াসনের বস্তু না করিলা ভয়।
এহি সে কারনে গুরু তোমার মির্ত্তু হয়॥
এহা সুনি মিননাতে কহেন তৎপর।
গোর্ক্ষেরে বুজায় মিনে দিয়া পৈতউর্ত্তর॥
না জাএ পরমহংস নাহি জাএ দুর।
ফিরি ফিরি আইসে হংস নিরাঞ্জনপুর॥

৬৭৮। ৫০০ মূর্খ লইয়া স্বর্গও না চাই
৫ জন পণ্ডিত লইয়া পাতালেই যাই ।।

৬৭৯ ভাইয়ের ঘরে ভাইস্তা হইছে
ভরসা হইছে খানি ॥

* * *

ভাইস্ত্যা—ভ্রাতুষ্পুত্র।
খানি—কিছু।

৬৮০। মুড়ায় খায় বুড়া।*

৬৮১। অসতের লম্বা বড়াই।

৬৮২। খাইতে না পারলেও আকাই আছে।
আকাই—আকাঙ্ক্ষা।

৬৮৩। চ্যারেং ব্যারেং করে
যেন মানুষ দেখে না।

৬৮৪। খাইতে নাই
শুইতে রাজাপাটী।

৬৮৫। আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর।

৬৮৬। ছেৎ প্যাৎ তের
খাইতে ক্যান্ বার।
জুলী, আরো পিঠা দের ॥
দের—দেও।

৬৮৭। অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।

৬৮৮। ঘরের মধ্যে ঘর।
কোন্‌খান্ দিয়া দুয়ার। †

৬৮৯। কুইড়া গরুর ভিন্ন গোঠ।

* মুড়া—এক সন্তান জন্মিলে তৎপরে পুনঃ ঋতুমতী না হইয়াই যদি স্ত্রীলোকের গর্ভ হয়, তবে সেই গর্ভজাত সন্তানকে একমুড়া সন্তান বলে। উক্ত প্রকারে জাত সন্তানের জন্মগ্রহণের কিছু কাল মধ্যে পরিবারস্থ বৃদ্ধ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে বলিয়া প্রবাদ।

† মশারি খাটান বিছানায় শুইতে দেখাইয়া দেওয়ায় দরজা খুঁজিয়া না পাইয়া উক্তি।

৬৯০। হয় যদি তিলটা।
কইয়া ফালায় তালটা ॥

৬৯১। পাঁচ দশ কড়ায় সাড়ে দশ গণ্ডা।
(১) যে বিনাসম্বলে পথ চলে।
(২) আপনা ধন পরের কাছে রাখিয়া যে বলে আমার।
(৩) পরের কথা মাত্রই যে বিশ্বাস করে।
(৪) ছাড়া বাগানে কলাগাছ রোপণ করিয়া যে খাইতে চায়।
(৫) শ্বশুরবাড়ী যুবতী স্ত্রী রাখিয়া যে নিশ্চিন্ত থাকে।
ইহাদের প্রত্যেকের মূল্য দশ কড়া কড়ি মাত্র।

৬৯২। কামের নামে যোগোতা নাই
খাইতে দামাদর।
যোগোতা—যোগ্যতা, ক্ষমতা।
দামাদর—পেটুক।

৬৯৩। যে কইব আমারে গাজাখোর।
তার চৌদ্দপুরুষ গরুচোর ॥
গাঁজা খাইতে যে করব মানা।
কল্কীটা ফিকা তার চোক দুটা করব কাণা ॥
ফিকা—নিক্ষেপ করিয়া।

৬৯৪। আইজ রাজা কাইল ভিকারি
বাইর ফুটানি দিন দুচারী ॥
আইজ—আজি। কাইল—কল্য।

৬৯৫। এক বিছানায় শোয়
গায় গায় লাগে না।

৬৯৬। হুতাশে জীবনের ক্ষয়।
গুরু দিলে আস্তে আস্তেই হয় ॥
হুতাশে—হুতাশে।

৬৯৭। আমার নাম রাম দত্ত।
আমি জা'ন হগল তত্ত্ব॥
হগল—সকল।

৬৯৮। আহারা নাপ্তের
পোঝাবরাদে ক্ষুর।
আহারা— অকর্ম্মণ্য।
পোঝা বরাদ্দে—বোঝা ভরিয়া।

৬৯৯। হেই যে কইছে মাইন্‌ষ্যে।
হেই কথায় লাঙ্গুর পাইছে॥
হেই— সেই।
লাঙ্গুর—লাগাল।

৭০০। ঝগড়া ঝাটীর দ্বন্দ্ব।
বাপের বাপের শ্রাদ্ধ॥

৭০১। কুত্তারে দিলেও পিটা পয়াস।
ছাড়ে না তবু গুয়ের আশ॥

৭০২। জন্ম মৃত্যু বিয়া।
বিধির বিধান দিয়া॥

৭০৩। হাতে কি? মিরকাদিন।
খাও কই॥ তেলের থালী?

৭০৪। সে রামও নাই।
সে অযোধ্যাও নাই॥

৭০৫। হাটবারেই হাট মিলে।

৭০৬ যার ঝি তার পোড়া।
পাড়াপড়্‌শীর কান খাড়া॥

৭০৭। কালনেমির লঙ্কা ভাগ।

৭০৮। হাতে হাতে দিলে নুন।
যায় তার সকল গুণ॥
নুন—লবণ।

৭০৯। সাত বার খাইয়া একাদশী।

৭১০। কিবা রঙ্গের একাদশী
তাতে আবার মুগের জালা॥

৭১১। মাইন্‌ষের মন,
কুমারের চাক।
পলকে দেয়
আঠার পাক॥

৭১২। লোকের মুখেই জয়।
লোকের মুখেই ক্ষয়॥

৭১৩। বার হাত কাকুড়ের
তের হাত বিচি।

৭১৪। আর কি ছাগল গাছে ধরে?

৭১৫। বান্ধা গরু ছুটলে পরে।
তিন রাজ্য ভাঙ্গে এক দৌড়ে॥

৭১৬। কাছাছাড়া লোক।

৭১৭। বড়র বড়ই গুণ।

৭১৮। শ্রাদ্ধের দেনায় ভরে।
বিয়ার দেনায় মরে।

৭১৯। গরীবের বাড়ী হাতীর পাড়া।

৭২০। পরের মুখে ঝাল খাওয়া।

৭২১। বেগুণ তলাইয়া ঝোল।

৭২২। ওস্তাদের মাইর শেষ রাত্রে।

৭২৩। সন্তার তিন অবস্থা।

৭২৪। মনে মনে কয়।
মনকলা খায়॥

৭২৫। কথা ত কয় না,
যেন রুইয়া থোয়॥

৭২৬। কীল খাইয়া কীল চুরি।

৭২৭। কাউয়ার উপর কামানের চোট।
কাউয়া—কাক।

৭২৮। রাজা রাজবল্লভই গেছে।
তুমি আমি কে?

৭২৯। যার হাতে কলম,
তার কথাই কয়।

৭৩০। যথা ধর্ম্ম, তথা জয়।

১৩১। পরের কান্ধে বাঁশ থুইয়া
যত ফরফরি।
আপনা কান্দে বাঁশ পইলে
হাগতে টোকায় তিন থান খড়ী।

১৩২। স্বভাবটা মন্দ না।
চিৎ হাত আর বুট করে না।
বুট--উপুর।

১৩৩। সুরের পিঠে পৈল সুর :
দৌড় পাড়ে দামড়া বাছুর ॥

১৩৪। এপার তন মার্‌লাম ছুরি,
লাগল কলা গাছে।
আটু বাইয়া রক্ত পড়ে,
চোক গেল রে দাদা ভাই॥
তন—থেকে ॥
আটু—হাঁটু। বাইয়া—বাহিয়া।

১৩৫। পূবের সুরুয পশ্চিমে উঠলেও
একথা না যাব ভুলে।
সুরুয— সূর্য্য।

১৩৬। বাড়ীতে বটে আসে যায়।
মনটা থাকে চরায় বরায় ॥

১৩৭। বজুরা একটা মাছের ছাতা।
তারে দিছে তিনটা কাটা ॥
আমারেই যদি দিত তিনটা কাটা।
উল্‌টাইয়া দিতাম জগৎটা॥

১৩৮। মনে মনে কয়, ছনে ছনে যায়।
গিরস্তের দুয়ারে একটা আছাড় খায়॥

১৩৯। বাপুরে কালীচরণ।
মহতে বুঝে মহতের মরম।
কোথাকার একটা ছেব্‌লা টাকী।
আমারে কয়, কৈ থাইকা' আলি লো
ভেদী লেদী ॥ *

১৪০। আমিও ফকির হইলাম,
দেশেও আকাল লাগল।
আকাল—দুর্ভিক্ষ।

১৪১। পোলা কি পোলা
যেন্‌ কোৎ কোড়ার ছাও।

১৪২। পোলারে মোর মারিছ না রে
নাইবা করল লেখাপড়ি
হ'ক না কেন বলদ ছলদ
পাইবই একটা দারোগগিরি।

১৪৩। কাহা যায়েঙ্গে ?
বাবু! কাছার যায়েঙ্গে।
কাহাছে আয়া ?
এ্যাঃ বা-বু কা-ছার-ছে আয়া :

১৪৪। ভিক্ষার চাউল
কাড়া আর আকাড়া।

১৪৫। মাছের তেল দিয়াই মাছ ভাজা।

১৪৬। ছৈয়ালের বড়া তেলে পইল।
পইল—পড়িল।

১৪৭। নাউ নোয়া নাঠী
লক্ষ্মীপুজার নাড়ু।
নাউতলা দা নাটী নইয়া
নড় নড় নড় ॥

১৪৮। থাকলে তাঔর বাপেরও শ্রাদ্ধ হয়।
না থাকলে আপনা বাপের শ্রাদ্ধ হয় না

* ভেদা মাছ সাধারণতঃ জোরবলহীন। একটী ভেদা মাছ দেখিয়া চঞ্চল টাকী বলিল, কৈ থাইকা আইলি গো, ভেদী লেদী?' ভেদার বড় রাগ হইল; কিন্তু কি করে, মনের দুঃখে যাইতে যাইতে এক বালিয়া মাছের সহিত দেখা হইল। উভয়েই কতকটা বোকার ন্যায়—কাজেই বালিয়া মাছটা উহাকে জিজ্ঞাসা করিল, কোথা হতে এলে গো, ভেদাই পতাকা?' ভেদার আনন্দ দেখে কে? তাই উক্ত বচনটী বলিয়াছে। যেমনে তেমনে মিলে, মন্দ নয়।

১৪৯। নাক কাটা বাসুদেব।
১৫০। তালুছোলা * মরা,
পেটমোটা অম্বলের ভরা
আর ঘন ঘন মোতন।
এ কয়টা বড় লোকের লক্ষণ।
১৫১। কুত্তার পেটে ঘি সয় না।
১৫২। সপ্তকাণ্ড রামায়ণ পইড়া
সীতা কার বাপ ?
পইড়া—পড়িয়া।
১৫৩। আল্লা,
ভাত্তে কাপড়ে একেলেই মার্‌লা।
একেলেই—একেবারেই।
১৫৪। কি দেখলাম কি অইল
দালান কোঠা ছাগলে খাইল॥
অইল—হইল।
১৫৫। এক হাত গাছে সাত হাত লাউ।
১৫৬। এক মাঘে কি জার যায় ?
জার—শীত।
১৫৭। মাইন্‌ষের ভাগ্যে দেব্‌তায় খায়।
১৫৮। দশের কথায় মরণও ভাল।
১৫৯। রাজার রাজ্যি কি আওরে খাইছে ?
১৬০। সুখরি দুঃখরে ?
এ্যাঃ এ্যাঃ—দুঃখরে।
পহেলা পহেলা কি না ?
১৬১। লাটার আগা আর রুইত মাছের মাথা,
খালি মা লো মা। *
১৬২। এক খানা খোল্লা, আর দুইখানা কোলা।
তারপরই গেলা।

* এক ব্রাহ্মণের জামাতা শ্বশুর বাড়ী আসিয়া ঠাঁই নিয়াছে, যেন বাড়ীঘর নাই। দিনেক দুদিন কাটিয়াছিল মন্দ নয়—যথেষ্ট আদরই ছিল। এতদিন ধরিয়া জামাইএর থাকা হেতু শ্বশুর বড় বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে; কারণ যা কিছু ভাল খাবার আশা করিয়া আনে, তাই যে জামাইর পাতে পড়ে—শ্বশুরের আকাঙ্ক্ষা মিটে না। আজ বাজারে যাইয়াই শ্বশুর খুব বড় একটা রোহিতের মাথা কিনিয়া লইয়া রাস্তায় আসিতে আসিতে ভাবিল, হতচ্ছাড়াকে আজ আগে তাড়ান চাই, তারপর সাধ মিটাইয়া মাথাটা খাব। অতি ত্রস্তভাবে বাটী যাইয়া মাথাটা নামাইয়া রাখিয়াই জামতার নিকট উপনীত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল, 'আঃ আমার বিয়াইন গো! তুমি এমন ভালমানুষটা ছিলে। আর তোমার সহিত দেখা হইল না" জামাতা মাছের মাথাটাও দেখিয়াছে, আর শ্বশুরের কান্নাও শু'নতেছে। সে ব্যাপারটা বেশ বুঝিতে পারিয়া বাটী রওনা হইল—আর মনে মনে বলিল, আচ্ছা, রসো, মাথাটা খাওয়াই। রওনা হইয়াই জামাই কাঁদিতে লাগিল, "লাটার আগা দিয়া আর রুইত মাছের মাথা দিয়া যে খাইতে চাইছিলি, তা' আর খাইলি না লো মা! শ্বশুরের পাকের ঘরের পেছনেই লাটার সুন্দর সুন্দর কচি ডগা ছিল—শ্বশুর যাইয়া তাহা তুলিয়া আনিয়া স্ত্রীকে পাক করিতে দিল। ঝ্যাটার ভিক্ষাবাদে বুড়িধন্ত বিস্মার হইয়া গিয়াছে—মাথাটা খুব খাওয়া হইল।

১৬৩। গুরু ধরে শিষ্যের পায়।
গুরু শিষ্য স্বর্গে যায়॥
১৬৪। পীপ্‌ড়ার বলও বল।
১৬৫। ঢাকের বাদ্য নিস্তব্ধেই মিষ্ট।
১৬৬। অত্যন্তে পাপান্ত।
পাপান্তে বাপান্ত॥
১৬৭। হাতের আলিস্যে দাতে ছাতা।
ছাতা—ময়লা।
১৬৮। পচা শামুকে পা কাটে।
১৬৯। আম্মকের গু তিনখানে লাগে।
পায়, হাতে আর নাকে॥



প্রতিভা

৫ম বর্ষ ভাদ্র ১৩২২ ৫ম সংখ্যা

বাঙ্গলার ইতিহাস *

সমালোচনা (২)

তৃতীয় পরিচ্ছেদে গ্রন্থকারের যে কয়েকটি উক্তি ভ্রান্ত বলিয়া ধারণা হইয়াছে পূর্ব্বপ্রবন্ধে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। এই পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার আরও কয়েকটি মত প্রকাশ করিয়াছেন, যাহার সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি মাত্রের উল্লেখ করিব।

(১) "খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম সহস্রাব্দে উত্তরাপথের পূর্ব্ব-সীমাস্থিত প্রদেশগুলি আর্য্যগণের করায়ত্ত হইয়াছিল; এই ঘটনার তিন বা চারি শতাব্দী পরে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত, মগধের শূদ্রজাতীয় রাজগণের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ভাষাতত্ত্ববিৎ ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এক-বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে প্রাচীন ভারতের শূদ্রগণ অনার্য্যবংশসম্ভূত। উত্তরাপথে শূদ্রবংশজাত রাজবংশের প্রাধান্যস্থাপনের প্রকৃত অর্থ—আর্য্যজাতীয় বিজেতৃগণের নির্ব্বীর্য্যতা ও ক্ষত্রিয়বংশজাত আর্য্য রাজ-গণের অধঃপতন। আর্য্যরাজগণের অধঃপতনের পূর্ব্বে উত্তরাপথের পূর্ব্বাঞ্চলে আর্য্যধর্ম্মের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, জৈনধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম এই আন্দোলনের ফল।"

রাখালবাবু যে প্রশ্নটি উত্থাপিত করিয়াছেন তাহা অতীব গুরুতর; ইহার সম্পূর্ণ আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে। এ বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই; কিন্তু রাখালবাবু যেরূপ দৃঢ়তাসহকারে কথাগুলি বলিয়াছেন তাহাতে মনে হয় যেন তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি অবিসংবাদিত সত্য। প্রথমতঃ, রাখালবাবুর মতে মহাপদ্মনন্দ ও মৌর্য্যরাজগণ অনার্য্যবংশসম্ভূত; তাঁহার একমাত্র যুক্তি এই যে পুরাণে ইঁহাদিগকে শূদ্র বলা হইয়াছে এবং ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে শূদ্রগণ অনার্য্য। এই যুক্তিটি আমাদের নিকট সমীচিন বোধ হয় না। ঋগ্বেদে যাঁহাদিগকে শূদ্র বলা হইয়াছে, তাঁহারা অনার্য্যবংশসম্ভূত ছিলেন ইহা সম্ভবপর বটে। কিন্তু ঋগ্বেদ ও পুরাণপ্রভৃতির রচনাকাল, এতদুভয়ের মধ্যে সুদীর্ঘ ব্যবধান। সুতরাং খৃষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে শূদ্র বলিতে যে শুধু অনার্য্যই বুঝাইত তাহার প্রমাণ কি? কিন্তু ইহার সমর্থক প্রমাণ না থাকিলেও বিরোধী প্রমাণের অভাব নাই। প্রাচীন সংহিতাদি গ্রন্থে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে যে আর্য্যাচারভ্রষ্ট ব্যক্তিমাত্রই শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হইত। এ সম্বন্ধে দুই একটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিব।

* বাঙ্গলার ইতিহাস, শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত; শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত—মূল্য ২॥০ টাকা।

"যো'নধীত্য দ্বিজো বেদানন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥"

মনু—২।১৬৮।

"ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ॥" ২৫
"যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ॥" ২৬

মহাভারত, বনপর্ব্ব, ১৮০ অঃ (বঙ্গবাসী সম্পাদিত)।

শেষোক্ত শ্লোকের নীলকণ্ঠকৃত নিম্নলিখিত টীকাও উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

"শূদ্রোঽপি শবাদ্যপেতো ব্রাহ্মণ এব ব্রাহ্মণোঽপি কামাদ্যপেতঃ শূদ্র এবেত্যর্থঃ।"

অবশ্য মনু ও মহাভারতের শ্লোকগুলি মহাপদ্মনন্দের পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল কিনা এ বিষয়ে তর্ক উঠিতে পারে। কিন্তু যে পুরাণের শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া রাখালবাবু মহাপদ্মনন্দ ও মৌর্য্যরাজগণকে শূদ্র প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, সেই পুরাণ গ্রন্থসমূহ মনু ও মহাভারতের পরবর্ত্তীকালে রচিত ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে শূদ্র বলিতে প্রাচীন কালে কি বুঝাইত সে বিষয়ে মনু ও মহাভারত অধিকতর প্রামাণিক।

এ স্থলে আর একটি কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। মহাপদ্মনন্দের মাতা শূদ্রাণী, কিন্তু তাহার পিতা শূদ্র ছিলেন এরূপ কথা কোন পুরাণেই বলে না। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতির সহিত শূদ্রাণীর বিবাহ যে বহুলপরিমাণে প্রচলিত ছিল মনুসংহিতায় তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। ক্ষত্রিয় পিতার ঔরসে শূদ্রাণীর গর্ভে জাত বহুসংখ্যক পুত্রকন্যা সমাজে বিদ্যমান ছিল। ইহাদের সহিত আবার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বিবাহক্রিয়া সম্পাদিত হইত। সুতরাং ঋগ্বেদরচনার সহস্রাধিক বর্ষ পরেও শূদ্র বলিতে যে কেবল অনার্য্যই বুঝাইত, এরূপ মনে করা সুকঠিন। অতএব আর্য্য মহানন্দের শূদ্রা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, ইহা হইতে এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, আর্য্যজাতীয় ক্ষত্রিয়রাজগণকে পদদলিত করিয়া অনার্য্যগণ প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিল।

জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে রাখালবাবুর মত স্পষ্ট বোঝা যায় না। উপরে তাঁহার গ্রন্থ হইতে যে কয় পংক্তি উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহার এরূপ অর্থও হইতে পারে যে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মও অনার্য্যপ্রাধান্যের ফল; অর্থাৎ ঐহিক ও পারত্রিক উভয় বিষয়েই অনার্য্যগণ আর্য্যগণের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; ইহার ফলে একদিকে মহাপদ্মনন্দের সিংহাসনলাভ ও অন্যদিকে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুত্থান। এই মতটি নিরতিশয় ভ্রান্ত বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু রাখালবাবু স্পষ্ট এ কথা বলেন নাই যে বৌদ্ধধর্ম্ম অনার্য্যজাতির ধর্ম্ম, সুতরাং এ সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

এই পরিচ্ছেদসম্বন্ধে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে রাখালবাবু কোথায়ও মগধে অন্ধ্ররাজগণের আধিপত্যের বিষয়ে কিছুই বলেন নাই। পুরাণে মগধের রাজবংশবর্ণনাপ্রসঙ্গে লিখিত আছে যে শেষ কাণ্বরাজাকে নিহত করিয়া অন্ধ্রগণ সিংহাসন অধিকার করেন। পুরাণের এই উক্তির সমর্থক প্রমাণাবলীও কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে, পূর্ব্বপ্রবন্ধে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। অন্ধ্রগণের মগধাধিকার ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি স্মরণীয় ঘটনা। কারণ ইহার পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যের কোন জাতি আর্য্যাবর্ত্তের কোন অংশ অধিকার করিয়াছিলেন এরূপ প্রমাণ নাই। তামিলসাহিত্যে দেখা যায় যে খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর কোন কোন রাজা গঙ্গানদীপর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছিলেন এইরূপ গর্ব্ব করিয়াছেন; সম্ভবতঃ, অন্ধ্রগণ তাঁহাদের অধীনস্থ তামিলরাজগণের সাহায্যে মগধাক্রমণ করেন। সুতরাং অন্ধ্রগণের মগধাক্রমণ আর্য্যাবর্ত্তের বিরুদ্ধে দাক্ষিণাত্যের অভিযানস্বরূপ বলা যাইতে পারে। কেহ কেহ বাঙ্গালাসাহিত্যে তামিল প্রভাব, অজন্তের গুহার চিত্রাবলীতে বাঙ্গলার দৃষ্ট

প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন; অসম্ভব নহে যে এই অভিযানই তৎসমুদয়ের মূলকারণ। সুতরাং অন্ধ্রগণের মগধাধিকারপ্রসঙ্গ বাঙ্গলার ইতিহাসে স্থান না পাওয়ায় আমরা কিছু বিস্মিত হইয়াছি। রাখালবাবু যদি পুরাণের উক্তি অনৈতিহাসিক মনে করিয়া অন্ধ্রগণের মগধাধিকার অস্বীকার করেন, তবে সে কথা তাঁহার স্পষ্ট বলা উচিত ছিল।

মগধে কুষাণবংশের অধিকার বিষয়ে রাখালবাবু চীনদেশীয় ইতিবৃত্তের কোন সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। করিলে, আমাদিগকে তিনি অনেক নূতন তথ্য দিতে পারিতেন। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। রাখালবাবু বলিয়াছেন "এই সময়ে (খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর শেষভাগে) বঙ্গে বা মগধে কোন্‌জাতীয় কোন্ বংশের অধিকার ছিল তাহা অদ্যাপি জানিতে পারা যায় নাই।" চীনদেশীয় "উই—লিও" গ্রন্থ (১) ২৩৯ ও ২৬৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত; ঐ সময়ের ইতিহাসবর্ণনাপ্রসঙ্গে গ্রন্থকার মগধ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "ইউচিগণ (কুষাণ) মগধ জয় করিয়াছে এবং ঐ প্রদেশ হইতে করগ্রহণ করিতেছে।"

ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে অন্ততঃ আনুমানিক ২৬০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত মগধ কুষাণবংশীয়ের অধীন ছিল। গুপ্তরাজগণের আদিপুরুষ মহারাজা গুপ্তের রাজত্বকাল, পণ্ডিতগণের মতে ২৭৫—৩০০ খৃঃ অব্দ। (২)

সুতরাং আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে কুষাণ বংশীয়ের নিকট হইতেই গুপ্তগণ মগধ অধিকার করিয়াছিলেন। বাংলার ইতিহাসে ইহা একটি সম্পূর্ণ অভিনব তথ্য। চীনদেশীয় ইতিবৃত্তের সাহায্যে এইরূপ আরও কয়েকটি অভিনব তথ্য অবগত হওয়া যায়; স্থানান্তরে তাহার আলোচনা করিব।

চতুর্থ ও পঞ্চম পরিচ্ছেদে গুপ্তাধিকারকাল বিবৃত হইয়াছে। রাখালবাবুর গ্রন্থের যাহা বিশিষ্টতা এই দুই পরিচ্ছেদেই আমরা তাহার প্রথম পরিচয় পাই। মোটামুটি গুপ্তরাজগণের সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু আবিষ্কৃত বা আলোচিত হইয়াছে, গ্রন্থকার এই দুই অধ্যায়ে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। যে যে গ্রন্থ বা পত্রিকায় ঐ সমুদয় বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে, পাদটীকায় গ্রন্থকার তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। যাঁহারা গুপ্তাধিকারকাল সম্বন্ধে বিশদ্‌ভাবে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করেন, এই দুইটী পরিচ্ছেদ তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান হইবে সন্দেহ নাই। কোন বাঙ্গালা গ্রন্থে এ পর্য্যন্ত গুপ্তরাজগণের সম্বন্ধে এই প্রকার আলোচনা দেখি নাই। জন অ্যালান কৃত গুপ্তরাজগণের মুদ্রাবিষয়ক গ্রন্থ ব্যতীত ইংরেজী কোন গ্রন্থ বা পত্রিকায়ও গুপ্তরাজগণের সম্বন্ধে প্রায় সমুদয় জ্ঞাতব্য তথ্য এইরূপ এক স্থানে আলোচিত হয় নাই। ফ্লিটকৃত গুপ্তলেখমালা, ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ লিখিত ভারতবর্ষের ইতিহাস, ও গুপ্তরাজগণবিষয়ক প্রবন্ধ, (Ind. Ant.) ইহার প্রত্যেকটির অপেক্ষা রাখালবাবুর গুপ্তগণের ইতিহাস অধিকতর সম্পূর্ণ। ইহা বাঙ্গালা-সাহিত্যের পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিষয়ে এম্ এ পরীক্ষার্থিগণ গুপ্তরাজসম্বন্ধে এই দুইটি পরিচ্ছেদ পাঠ করিলে বিশেষ উপকৃত হইবেন।

এই পরিচ্ছেদ দুইটি সম্বন্ধে অপর দিকে আমাদের কিছু বক্তব্য না থাকিলেই আমরা বিশেষ সুখী হইতাম; কারণ, বাংলাভাষায় এরূপ লেখা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দেখিতে স্বতঃই ইচ্ছা হয়। দুঃখের বিষয়, এ স্থলেও গ্রন্থকারের অনবধানতার পরিচয় পাই। প্রথমতঃ, কয়েকটি গুরুতর

(১) 'টুং পাও' নামক ফরাসী পত্রিকায় ইহা অনূদিত হইয়াছে; আলোচ্য অংশটীর অনুবাদ এইরূপ—

"Les yue-che les ont asservis et leur ont imposé des taxes" (*T'oung Pao 1905 P. 551*)

(2) Indian Antiquary 1902—p. 258; J. Allan's Catalogue of Gupta Coins p. XVI

মুদ্রাঙ্কনদোষ এই পরিচ্ছেদ দুইটির অঙ্গহানি করিয়াছে। ৫১ পৃঃ ৯ পংক্তিতে "অন্ধরাজ' স্থানে, 'অন্ধ্ররাজ', ৭৬ পৃঃ ১৮ পংক্তিতে 'কৃষ্ণগুপ্তের "পৌত্র" স্থানে "কৃষ্ণগুপ্তের প্রপৌত্র", ৭৭ পৃঃ ১২ পংক্তিতে 'আদিত্যবর্ম্মা' স্থানে আদিত্যবর্দ্ধন, এবং ৯৯ পৃঃ দ্বিতীয় গুপ্তরাজগণের বংশলতায় দেবগুপ্ত ও দ্বিতীয় জীবিতগুপ্ত এই উভয়ের মধ্যে বিষ্ণুগুপ্তের নাম হইবে।

৫৯ পৃঃ গ্রন্থকার বলিয়াছেন, "বামনভটের 'কাব্যালঙ্কার সূত্রবৃত্তি" গ্রন্থে প্রথম কুমারগুপ্তের উল্লেখ আছে"।

যে শ্লোকার্দ্ধের প্রতি লক্ষ্য করিয়া গ্রন্থকার এই কথা বলিয়াছেন তাহা এই, "সোঽয়ং সংপ্রতি চন্দ্রগুপ্ততনয়শ্চন্দ্রপ্রকাশো"। ইহাতে বস্তুতঃ "কুমারগুপ্তের" উল্লেখ নাই, আছে "চন্দ্রগুপ্ততনয়"। গুপ্তরাজবংশে তিনজন চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন; সুতরাং এখানে কোন্ চন্দ্রগুপ্তকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করিবার একমাত্র উপায় বসুবন্ধু বা সুবন্ধুর কালনিরূপণ; কারণ বসুবন্ধু (পাঠান্তর—সুবন্ধু) উক্ত রাজার আশ্রয়ে ছিলেন, এইরূপ উক্ত হইয়াছে। যদি এখানে সুবন্ধু পাঠ ধরা যায়, তবে চন্দ্রগুপ্ততনয়কে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র কুমারগুপ্তরূপে গ্রহণ করা যায় না; কারণ সুবন্ধু কুমারগুপ্তের পরবর্ত্তী লোক। যদি বসুবন্ধু পাঠ ধরা যায়—এবং ইহাই অধিকতর সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়—তাহা হইলেও চন্দ্রগুপ্ততনয়কে নিঃসংশয়ে কুমারগুপ্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কারণ, বসুবন্ধুর কালনির্ণয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কাহারও মতে বসুবন্ধু চতুর্থ শতাব্দীর লোক। (৩)

এই মতানুসারে চন্দ্রগুপ্ততনয় অর্থে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পুত্র সমুদ্রগুপ্তকে বুঝিতে হইবে। জে তাকাকুসুর মতে বসুবন্ধুর সময় ৪২০—৫০০ খৃঃ অব্দ। এই মতানুসারে চন্দ্রগুপ্ততনয়কে কুমারগুপ্তরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু এখানে 'চন্দ্রগুপ্ততনয়শ্চন্দ্রপ্রকাশো' বাক্যে, সম্ভবতঃ তৃতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র (?) প্রকাশাদিত্যকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, জন্ আলান এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। (৪)

এইরূপে দেখা যায় যে পণ্ডিতগণের মধ্যে এ বিষয়ে বিশেষ মতভেদ বর্ত্তমান; সুতরাং গ্রন্থকারের উল্লিখিত উক্তি সঙ্গত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

রাখালবাবুর মতে "খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে পাটলিপুত্রের রাজা কে ছিলেন তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই।"

৩১৯ খৃঃ অব্দে চন্দ্রগুপ্ত রাজত্বলাভ করেন; সুতরাং তাঁহার পিতা ও পিতামহ, মহারাজ ঘটোৎকচ ও মহারাজ গুপ্ত চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে পাটলিপুত্রের রাজা ছিলেন এই মতগ্রহণে কোন বাধা দেখি না। জন্ আলান এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। এই মত গ্রহণে রাখালবাবুর কি আপত্তি তাহা স্পষ্ট বলা উচিত ছিল। অন্যত্র রাখালবাবু বলিয়াছেন, "চন্দ্রগুপ্তের পিতার নাম ঘটোৎকচগুপ্ত ও তাঁহার পিতামহের নাম শ্রীগুপ্ত; ইঁহারা বোধ হয় সামান্য ভূস্বামী ছিলেন"। (৪৬ পৃঃ) গুপ্ত ও ঘটোৎকচ উভয়েই মহারাজ উপাধিভূষিত ছিলেন; সুতরাং তাঁহারা সামান্য ভূস্বামী মাত্র ছিলেন এরূপ অনুমান করিবার কারণ কি বুঝিলাম না। এ কথা সত্য যে চন্দ্রগুপ্ত অধিকতর সম্মানজ্ঞাপক মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাহার কারণ বোধ হয় এই যে তিনি পিতৃরাজ্যের সীমা বিস্তৃত করিয়াছিলেন ও অন্যান্য রাজার উপরে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা হইতে এ কথা প্রমাণিত হয় না যে মহারাজ উপাধিধারী গুপ্ত ও ঘটোৎকচগুপ্ত সামান্য ভূস্বামী মাত্র ছিলেন। যদি তাহাই হইত, তবে পরাক্রান্ত গুপ্তসম্রাটগণ নিজেদের বংশপরিচয়ে তাঁহাদিগের নামের উল্লেখ করিতেন কিনা সন্দেহের বিষয়।

রাখালবাবুর মতে চন্দ্রগুপ্তের পিতামহের নাম শ্রীগুপ্ত। কিন্তু খুব সম্ভব নামটী 'শ্রীগুপ্ত' নহে, কেবলমাত্র 'গুপ্ত'; শ্রী উপাধিসূচক। ফ্যাসেন সর্ব্বপ্রথমে ইহা লক্ষ্য করেন;

(৩) Bulletin De L'Ecole francaise D'Extreme Orient, 1911 Pp. 339 ff

(৪) Catalogue, Gupta Coins, P. LV

পরে ফ্লীট্ ইহা বিশদভাবে প্রমাণিত করেন; আলান, ভিনসেণ্ট স্মিথ প্রভৃতি সকলেই এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। (৫)

চন্দ্রবর্ম্মার দিগ্বিজয়কাল সম্বন্ধে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "চন্দ্রবর্ম্মার দিগ্বিজয়কালে মগধে লিচ্ছবি রাজবংশের জামাতা চন্দ্রগুপ্ত নামক জনৈক ব্যক্তি একটি ক্ষুদ্র রাজ্য-স্থাপন করিয়াছিলেন"। (৪৫ পৃঃ) চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকালেই গুপ্তসাম্রাজ্য প্রয়াগপর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এরূপ অনুমান করিবার কারণ আছে; সুতরাং গ্রন্থকারের মতে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য-স্থাপনের অনতিকালপরেই চন্দ্রবর্ম্মার দিগ্বিজয় সংঘটিত হইয়াছিল। ৪০ পৃষ্ঠার পাদটীকায় গ্রন্থকার "প্রবাসী"তে প্রকাশিত যে প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে দেখিতে পাই, "গুপ্তবংশীয় প্রথম সম্রাট প্রথম চন্দ্রগুপ্ত অথবা তাঁহার পিতা মহারাজ ঘটোৎকচগুপ্ত চন্দ্রবর্ম্মার নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন"। (৬)

সুতরাং গ্রন্থকারের মতে ৩২০ খৃঃ অব্দের অনতিকাল-পরেই চন্দ্রবর্ম্মার দিগ্বিজয়ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর কর্ত্তৃক প্রকাশিত মন্দাসোর-লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে নরবর্ম্মা ৪০৪-৫ খৃঃ অব্দে রাজত্ব করিতেছিলেন। এই নরবর্ম্মা যে চন্দ্রবর্ম্মার ভ্রাতা, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাহা প্রমাণিত করিয়াছেন এবং রাখাল বাবুও এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং চন্দ্রবর্ম্মার দিগ্বিজয় ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার রাজ্যকাল, এতদুভয়ের মধ্যে প্রায় ৭০।৮০ বৎসরের ব্যবধান থাকিয়া যায়; ইহা অসম্ভব না হইলেও অস্বাভাবিক বটে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে চন্দ্রবর্ম্মার পিতামহ জয়বর্ম্মা ৩৫০ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। (৭)

কিন্তু ইহা সত্য না হইলেও, নূতন প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত চন্দ্রবর্ম্মার দিগ্বিজয়কাল চতুর্থ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের পূর্ব্বে অনুমান করা সঙ্গত নহে। সুতরাং চন্দ্রবর্ম্মা সমুদ্রগুপ্তের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন এরূপ মনে করা যাইতে পারে। ইহা হইতে সমুদ্রগুপ্তের রাজত্ব সম্বন্ধে একটি নূতন আলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে উল্লিখিত আছে যে সমুদ্রগুপ্ত, রুদ্রদেব, মতিল নাগদত্ত, চন্দ্রবর্ম্মা প্রভৃতির উচ্ছেদসাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু চন্দ্রবর্ম্মার ইতিহাস যে টুকু জানা গিয়াছে তাহা হইতে অনুমিত হয় যে চন্দ্রবর্ম্মা প্রভৃতিই প্রথমে নবপ্রতিষ্ঠিত গুপ্ত-সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। সমুদ্রগুপ্ত আত্মরক্ষার্থে তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই যুদ্ধের ফলে প্রায় সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে গুপ্তসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

গুপ্তরাজগণসম্বন্ধে চীনদেশীয় গ্রন্থে যে সমুদয় বিবরণ আছে রাখালবাবু তাহার কিছুমাত্র আলোচনা করেন নাই। পরিব্রাজক ইৎ-সিং শ্রীগুপ্ত নামক এক মহারাজার উল্লেখ করিয়াছেন। এই রাজা চীনদেশীয় তীর্থযাত্রীগণের নিমিত্ত একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন এবং ইহার ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ ২৪টি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। এই 'শ্রী গুপ্ত' সম্ভবতঃ গুপ্তরাজবংশের আদিপুরুষ মহারাজ গুপ্ত। (৮) চীনদেশীয় ওয়াং-হিউয়েনৎসের ইতিবৃত্তে সমুদ্রগুপ্তের কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। ফরাসীপণ্ডিত সিল্ভান লেভী সর্ব্বপ্রথম ইহার আবিষ্কার করেন। ইহা হইতে জানা যায় যে সমুদ্রগুপ্ত সিংহলের রাজা মেঘবর্ণের সমসাময়িক ছিলেন। উক্ত রাজা বহুবিধ মূল্যবান রত্নাদিসহ সমুদ্রগুপ্তের নিকট একজন দূত প্রেরণ করিয়া গয়ায় একটি মঠস্থাপনের অনুমতি প্রার্থনা করেন; সমুদ্রগুপ্ত এই প্রার্থনা রক্ষা করিয়াছিলেন। (৯) ৫৩৯ খৃঃ অব্দে চীনসম্রাট উ-টি

(৫) Indische Altertumskunde, II P. 943
I.A. XIV. P. 94, Gupta Inscription PP.8,9.
J. Allan's Catalogue of Gupta Coins P. XIX

(৬) প্রবাসী, ১৩২০, দ্বিতীয়ভাগ—৪৯৯ পৃঃ।

(৭) "must have lived in 350 A.D. or there—about." I. A. 1913, P. 218.

(৮) John Allan's Catalogue P. XV

(৯) Journal Asiatique Mai June 1900 P 406-11.

মগধরাজের নিকট দূত প্রেরণ করেন এবং কতকগুলি বৌদ্ধগ্রন্থ ও তাহার অনুবাদের নিমিত্ত একজন পণ্ডিতকে চীনদেশে পাঠাইতে তাঁহাকে অনুরোধ করেন। মগধরাজ (সম্ভবতঃ প্রথম জীবিতগুপ্ত অথবা ৩য় কুমারগুপ্ত) 'পরমার্থ'কে কতকগুলি গ্রন্থসহ চীনদেশে প্রেরণ করেন। এই সমুদয় ঘটনার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ বাংলার ইতিহাসে স্থানলাভ করিবার যোগ্য বলিয়া মনে করি। ইহাদের অপেক্ষা অনেক অপ্রয়োজনীয় কথা গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু এ গুলির উল্লেখ নাই কেন বুঝিতে পারিলাম না।

কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্ক সম্বন্ধে রাখালবাবু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে শশাঙ্ক মগধের গুপ্তবংশজাত ছিলেন। তিনি ইহা অনুমান করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই; বরং স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন, শশাঙ্ক কোন্ বংশজাত "তাহা নির্ণয় করিবার উপায় অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই"। (৭৮ পৃঃ) শ্রীযুক্ত বাবু রমাপ্রসাদ চন্দ এই অনুমান গ্রহণ করেন নাই এবং এ বিষয়ে তাঁহার মত বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বাংলার এই দুইজন বিশেষজ্ঞের লেখা পড়িলে পাঠকগণ অনায়াসে এই প্রশ্নের উভয় দিক দেখিয়া বিচার করিতে পারিবেন। (১০)

যে যুক্তিবলে রাখালবাবু উক্ত অনুমানে উপনীত হইয়াছেন তাহার সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক।

(১) "শশাঙ্কের অপর নাম নরেন্দ্রগুপ্ত। হর্ষচরিতের একখানি পুথিতে নরেন্দ্রগুপ্তের নামের উল্লেখ আছে। এতদ্ব্যতীত হর্ষচরিতের টীকাকার ষষ্ঠ উচ্ছ্বাসের টীকায় এই কথা স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।" (৮২ পৃঃ)

বুলার হর্ষচরিতের একখানি পুথিতে নরেন্দ্রগুপ্তের নাম দেখিতে পাইয়াছিলেন, এ কথা সত্য। কিন্তু এতদ্ব্যতীত হর্ষচরিতের টীকাকার স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে কোথায়ও একথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই।

(১০) মানসী, ১৩২২, পৃঃ ৫৮২।

আর একটি বিষয় অনুধাবন করা কর্ত্তব্য। ২৯২ পৃষ্ঠায় রাখালবাবু লিখিয়াছেন "এই গ্রন্থদ্বয়ের (দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর) কোন কোন পুথিতে বল্লালসেনের কালবাচক এক বা ততোধিক শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়; ......অদ্যাবধি দানসাগর ও অদ্ভুত সাগরের যে সমস্ত পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে তন্মধ্যে অধিকাংশ গুলিতে এই শ্লোকদ্বয় দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে এই শ্লোকদ্বয় পরবর্ত্তীকালে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।" (অধোরেখাগুলি আমাদের নিজস্ব)।

কতকগুলি শ্লোক একাধিক পুথিতে থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ পুথিতে না থাকায় যদি এ কথা প্রমাণিত হয় যে ঐগুলি প্রক্ষিপ্ত, তবে একখানি ব্যতীত হর্ষচরিতের অপর পুথিগুলিতে নরেন্দ্রগুপ্তের নাম না থাকায় ইহাও প্রমাণিত হয় যে নরেন্দ্রগুপ্তনামটিও প্রক্ষিপ্ত। অথচ রাখালবাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে শশাঙ্কের অপর নাম নরেন্দ্রগুপ্ত। বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে লিখিত একই ইতিহাসে বিপরীতবিচারপ্রণালী অবলম্বিত হইতে দেখিয়া আমরা কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়াছি।

(২) "অধিকাংশ গুপ্তবংশীয় সম্রাটগণের মুদ্রায় রাজার নাম লিখনকালে একটি অক্ষরের নিম্নে আর একটি অক্ষর অঙ্কিত হইত, শশাঙ্কের মুদ্রাতেও এই লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়"। (৮৩ পৃঃ)

গুপ্তবংশীয়ব্যতীত অন্য রাজগণের মুদ্রায়ও উক্ত প্রণালীতে নাম লিখিত হইত। সুতরাং ইহা হইতে শশাঙ্কের সহিত গুপ্তরাজবংশের কোন সম্বন্ধ অনুমান করা যায় না। (১১)

রাখালবাবু স্বদেশবৎসলতাহেতু মাঝে মাঝে যে দুই একটি মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা তাঁহার মত ঐতিহাসিকের উপযুক্ত হয় নাই বলিয়াই আমরা মনে করি। রাজ্যশ্রী-সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন "রাজ্যশ্রীকে কারারুদ্ধ করিবার

(১১) V. Smith's Catalogue of Coins in the Indian Museum Plate XIV figs 4, 5, 6, 7, 8

বিশেষ কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু বিনা কারণে একজন গুপ্তবংশীয় নরপতি রমণীর প্রতি অত্যাচার করিয়াছিলেন ইহা বিশ্বাস করিতেও প্রবৃত্তি হয় না।" (৮৫পৃঃ) এই শেষোক্ত বাক্যটি ঐতিহাসিকের উপযুক্ত নহে; কারণ খজুরাহোর প্রস্তরগাত্রে খোদিত একটী শ্লোকে এ বিষয়ে ভারতের প্রাচীন রাজগণের যে কলঙ্কচ্ছবি অঙ্কিত হইয়াছে তাহা কখনও মুছিবার নহে। (১২)

গুপ্তবংশের অধঃপতন ও পালবংশের অভ্যুদয়, এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী অরাজকতার যুগ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। এই সময়ের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস জানা যায় না; সুতরাং এই যুগসম্বন্ধে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত যে সমুদয় তথ্য পাওয়া যায়, তাহা একত্রিত করাই ঐতিহাসিকের কর্ত্তব্য। রাখাল-বাবুও এই কার্য্যটী মোটামুটি সুসম্পন্ন করিয়াছেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু তাঁহার মত প্রাচীন লেখ-মালায় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিও দুই একটি বিষয় লক্ষ্য করেন নাই ইহাতে আমরা বিস্মিত হইয়াছি। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটির উল্লেখ করিতেছি। রায় বাহাদুর হীরালাল মহাশিবগুপ্তের সিরপুর-শিলালিপি প্রকাশিত করিয়াছেন। (১৩) ইহার একাদশ পংক্তিতে (ষোড়শ শ্লোকে) নিম্নলিখিত শ্লোকটি দেখিতে পাওয়া যায়,

"নিষ্পঙ্কে মগধাধিপত্য মহতাং জাতঃ কুলে
বর্ম্মণাং পুণ্যাভিঃ কৃতিভিঃ কৃতী কৃতমনঃ কম্পঃ
সুধাভো [জি] নাং।
যামাসাদ্য সুতাং হিমাচল ইব শ্রী সূর্য্যবর্ম্মা নৃপঃ প্রাপ
প্রাক্ পরমেশ্বর শ্বশুরতা গর্বানি খর্বং পদম্॥"

ইহা হইতে নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়।

(১) বর্ম্মরাজবংশে সূর্য্যবর্ম্মা নামে নরপতি মগধের রাজা ছিলেন।

(২) এই বর্ম্মরাজবংশ মগধে রাজত্ব বা আধিপত্য করায় বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল

(৩) সূর্য্যবর্ম্মার কন্যার সহিত প্রাক্‌পরমেশ্বরের বা পূর্ব্বদেশাধিপতির (মহাশিবগুপ্তের পিতা হর্ষগুপ্তের) বিবাহ হইয়াছিল।

শিলালিপিখানি মহাশিবগুপ্তের রাজ্যকালে খোদিত হইয়াছিল; ইহাতে কোন তারিখ নাই, কিন্তু অক্ষরতত্ত্ব হিসাবে ইহাকে অষ্টম বা নবম শতাব্দীর বলিয়া মনে হয়। সূর্য্যবর্ম্মা মহাশিবগুপ্তের মাতামহ। এই শিলালিপি মহাশিবগুপ্তের রাজ্যলাভের কিছুকালপরে লিখিত হইয়াছিল এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে; কারণ ইহাতে মহাশিব-গুপ্তের বহু যুদ্ধজয়ের উল্লেখ আছে। সুতরাং সূর্য্যবর্ম্মা ৭ম শতাব্দীর শেষভাগে বা অষ্টম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

বর্ম্মণ উপাধিধারী মৌখরীবংশীয় রাজগণ দ্বিতীয় গুপ্ত-বংশের সমকালে মগধে রাজত্ব করিতেন ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। (১৪)

ফৈজাবাদ জেলার এই রাজবংশের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। (১৫) সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভে এই রাজ্য বিলুপ্ত হইয়াছিল।

বঙ্গদেশে বর্ম্মণ উপাধিধারী আর একটি রাজবংশের পরিচয় পাওয়া যায়—ভোজবর্ম্মাপ্রভৃতি এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদের কালনির্ণয় লইয়া যথেষ্ট মতভেদ

(১২) "কাত্বং কাংচী নৃপতিবনিতা কা ত্বমন্ধ্রাধিপস্ত্রী
কাত্বং রাঢ়া পরিবৃঢ়বধূঃ কা ত্বমঙ্গেন্দ্র পত্নী।
ইত্যালাপাঃ সমরজয়িনো যস্য বৈরি প্রিয়াণাং
কারাগারে সজলনয়নেন্দীবরাণাং বভূবুঃ॥"
(E. I. 1 P. 145)

(১৩) Ep. Ind. XI P. 184

(১৪) "These '(Later Guptas of Magadha)... shared the rule of that province (Magadh) with another dynasty of Rajas who had names ending in Varman, and belonged to a clan called "Maukhari"—V. A. Smith, Early History of India, 3rd Edition, P. 312

(১৫) Burns in J. R. A. S. 1906

আছে; যথাস্থানে তাহা আলোচিত হইবে। কিন্তু খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে এই বংশের রাজ্যকাল নির্দ্দেশ করা যায় না।

পূর্ব্বে বলিয়াছি সূর্য্যবর্ম্মা সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে বা অষ্টম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। সুতরাং যে বংশে তাঁহার জন্ম এবং মগধে আধিপত্যহেতু যে বংশের প্রতিষ্ঠালাভ হইয়াছিল, সেই বর্ম্মবংশীয় রাজগণ সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীতে মগধে রাজত্ব করিতেন এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। অতএব ভোজবর্ম্মাপ্রভৃতির বংশের সহিত যে ইহাদের কোন নিকট সম্বন্ধ ছিল না অন্য প্রমাণাভাবে তাহা এক প্রকার স্থির করা যাইতে পারে। মৌখরি-বংশীয়গণের সহিত ইহাদের কোন সম্বন্ধ ছিল কিনা তাহার স্থির নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না।

৯৭পৃষ্ঠায় রাখালবাবু বলিয়াছেন, "অনুমান হয় খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষপাদে অথবা অষ্টম শতাব্দীর প্রথম পাদে মগধের গুপ্তরাজবংশের অধিকার লোপ হইয়াছিল"। কিন্তু ইহার পরে মগধ কাহাদের অধীনে ছিল রাখাল-বাবু তাহা নির্ণয় করিতে পারেন নাই, কারণ তিনি সিরপুরলিপি একেবারেই লক্ষ্য করেন নাই। এই লিপি হইতে যে ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়, তাহাতে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে গুপ্তগণের পরে মগধ বর্ম্মবংশীয়গণের অধীনে ছিল। এইরূপে সিরপুরলিপি হইতে বাংলার ইতিহাসের এক অনাবিষ্কৃত অধ্যায় আমাদের নিকটে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইউয়ান্ চোয়াং পূর্ণবর্ম্মা নামে একজন মগধের রাজার উল্লেখ করিয়াছেন। রাখালবাবু ইঁহার সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেন নাই, প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। ইউয়ান্ চোয়াং বলিয়াছেন যে শশাঙ্ককর্ত্তৃক উৎপাটিত বোধিবৃক্ষ পূর্ণবর্ম্মাকর্ত্তৃক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সুতরাং পূর্ণবর্ম্মা ৬১৯ (শশাঙ্কের শেষ জানা তারিখ) ও ৬৪২ (ইউয়ান্ চোয়াং এর দ্বিতীয়বার নালন্দা প্রভৃতি স্থানে গমনের তারিখ) খৃষ্টাব্দের মধ্যে মগধের রাজা ছিলেন। যখন আনুমানিক সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীতে মগধে এক বর্ম্মরাজবংশের পরিচয় পাইতেছি, তখন পূর্ণবর্ম্মা যে সেই বংশেরই একজন রাজা ছিলেন এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে; অবশ্য ইহা অনুমান মাত্র,—সুপ্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত নহে। রাখালবাবু তাঁহার গ্রন্থে এ বিষয়ের কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই, তাই তাঁহার দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করিতেছি।

মৌখরিবংশীয়গণ মগধে আধিপত্য করিতেন, ভিন্‌সেণ্ট স্মিথের এই উক্তি পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। বোধ হয় ইহাদের সহিত দ্বিতীয় গুপ্তবংশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। এই কারণেই ইহাদের রাজধানী কান্যকুব্জের বিরুদ্ধে শশাঙ্কের অভিযান। মৌখরিরাজ গ্রহবর্ম্মন্ হর্ষবর্দ্ধনের ভগ্নী-পতি ছিলেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর অব্যবহিতপরেই পূর্ণবর্ম্মা-নামধারী মগধরাজের পরিচয় পাই; অসম্ভব নহে যে এই পূর্ণবর্ম্মা মৌখরিবংশজাত এবং হর্ষবর্দ্ধনকর্ত্তৃক তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ মগধের রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

ইউয়ান্ চোয়াং এর মতে পূর্ণবর্ম্মা মৌর্য্যরাজ অশোকের বংশধর। ইউয়ানচোয়াং পূর্ণবর্ম্মার সম-সাময়িক ব্যক্তি; সুতরাং তাঁহার কথা একেবারে উপেক্ষা করা যায় না। রাখালবাবু এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেন নাই; কিন্তু এটি একটি বিশেষ কৌতুহলোদ্দীপক তথ্য। ইউয়ান চোয়াংএর সমকালে এবং পরবর্ত্তী সময়ে যে মৌর্য্যনামধারী রাজবংশ বিদ্যমান ছিল তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর ঐহোলমন্দিরলিপিতে উল্লিখিত আছে যে তিনি কঙ্কণের মৌর্য্যরাজগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। (১৬) জনাশ্রয় পুলকেশীবল্লভের ৪৯০ চেদী সংবতে (৭৩৯ খৃঃ অব্দ) উৎকীর্ণ নৌসরিশাসনে (১৭)

(১৬) Ind. Ant. Viii

(১৭) Duff's Chronology of India P. 64., Archaeological Survey of Western India, Vol. IX, P. 4.

মৌর্য্যরাজগণের উল্লেখ আছে। উক্ত শাসনানুসারে আরবগণকর্ত্তৃক মৌর্য্যরাজগণ পরাজিত হন। এই মৌর্য্যরাজগণের সহিত মগধের মৌর্য্যবংশের কোন সম্বন্ধ ছিল কিনা, এবং পূর্ণবর্ম্মার সহিত এতদুভয়ের কি সম্বন্ধ তাহা নিরূপণ করা কঠিন।

রাখালবাবুর মতে "যশোবর্ম্মাদেব কর্ত্তৃক পরাজিত মগধনাথ ও গুপ্তবংশীয় রাজা দ্বিতীয় জীবিতগুপ্ত একই ব্যক্তি"। (১০৫ পৃ) ইহার প্রমাণাভাব। পাদটীকায় প্রমাণস্বরূপে গৌড়রাজমালা ১৫ পৃঃ, এইরূপ লিখিত হইয়াছে। এই শেষোক্ত গ্রন্থে আছে যে যশোবর্ম্মার প্রতিদ্বন্দ্বী সম্ভবতঃ দ্বিতীয় জীবিতগুপ্ত। রাখালবাবু 'সম্ভবতঃ' কথাটি বাদ দেওয়ায় অনুমিত হয় যে তিনি এ বিষয়ে আরও কোন দৃঢ় প্রমাণ পাইয়াছেন; কিন্তু তৎসমুদয়ের উল্লেখ করা উচিত ছিল। পূর্ব্বে সূর্য্যবর্ম্মাসম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে অনুমান হয় যে এই প্রতিদ্বন্দ্বী বর্ম্মবংশীয়।

রাখালবাবু কহ্লন মিশ্র কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ গৌড়ীয়গণের বীরত্বকাহিনী বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন। গৌড়রাজমালার প্রণেতা ইহা বিশ্বাস করেন, কিন্তু ললিতাদিত্যের দক্ষিণাপথবিজয়কাহিনী কিঞ্চিৎ পরিমাণে কল্পনাপ্রসূত বলিয়া মনে করেন। ইহাতে রাখালবাবু মন্তব্য করিয়াছেন, "একই গ্রন্থকারকর্ত্তৃক লিখিত একই গ্রন্থে একই বিষয়ে এক অংশ অমূলক ও দ্বিতীয় অংশ সত্যরূপে গ্রহণ করা ইতিহাসরচনার বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী নহে।" (১০৭ পৃঃ) রাখালবাবুর এই সিদ্ধান্ত আমরা কোন মতেই গ্রহণ করিতে পারি না। মেগাস্থিনিসের 'ইণ্ডিকা' একই গ্রন্থ ও একই বিষয়ে লিখিত হইয়াছিল। তাহার কতকাংশ রাখালবাবু তো দূরের কথা, নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিকও বিশ্বাস করিতে পারেন না। অথচ তাহার অন্য অংশ অন্যান্য ঐতিহাসিক এবং স্বয়ং রাখালবাবুও বিশ্বাস করিয়াছেন। (পৃঃ ৩০) ললিতাদিত্যের দক্ষিণাপথাভিযান ও সেকেন্দরের ভারতাভিযান বিষয়হিসাবে তুল্য। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ এই শেষোক্ত অভিযানসম্বন্ধে যাহা যাহা লিখিয়াছেন, তৎসমস্তই কদাচ বিশ্বাস করা যাইতে পারে না; কিন্তু তাহার কতকাংশ রাখালবাবু স্বয়ং বিশ্বাস করিয়াছেন। (২৯ পৃ) ইউয়ান্-চোয়াং শশাঙ্কের বৌদ্ধবিদ্বেষের কথা যাহা লিখিয়াছেন, রাখালবাবুর মতে তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নহে; অথচ এই ইউয়ান্ চোয়াংকথিত শশাঙ্ক সম্বন্ধে অপর কয়েকটি তথ্য (৮২পৃঃ) ও কর্ণসুবর্ণ ও হর্ষবর্দ্ধনের ইতিহাস বিশ্বাস করিতে তিনি কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই। বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীর সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ এই যে তাহা প্রয়োজনভেদে পরিবর্ত্তন করা যায় না। সুতরাং ১০৭ পৃষ্ঠায় রাখালবাবু যাহাকে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী বলিতে চাহেন, আমরা তাহা গ্রহণ করিতে অক্ষম। কোন গ্রন্থকার যাহা কিছু বলেন তাহাই বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। দেখিতে হইবে তাঁহার সত্য জানিবার সুযোগ কতটুকু ছিল, সত্য গোপন করিবার কোন প্রলোভন ছিল কিনা ইত্যাদি। রাজগণের বিজয়কাহিনী অতিরঞ্জিত করিয়া বর্ণনা করা সভাকবিগণের স্বভাবসিদ্ধ; সমসাময়িক প্রশস্তিতে পর্য্যন্ত ইহা লক্ষিত হয়। সুতরাং কহ্লন ললিতাদিত্যের দক্ষিণাপথবিজয়কাহিনীসম্বন্ধে যে সমস্ত অতিরঞ্জিত বর্ণনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার উপর নিজের কল্পনা মিশ্রিত করিয়া কাল্পনিক চিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকিবেন, ইহা অসম্ভব নহে। কিন্তু কহ্লন লিখিয়াছেন,

"অদ্যাপি দৃশ্যতে শূন্যং রামস্বামিপুরাস্পদং
ব্রহ্মাণ্ডং গৌড়বীরাণাং সনাথং যশসা পুনঃ॥"

'অদ্যাপি' কথাটিতে বুঝা যায়, যখন কহ্লন গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন তখনও রামস্বামীর মন্দির শূন্য ছিল এবং পৃথিবী (কাশ্মীর?) গৌড়বীরগণের যশে পরিপূর্ণ ছিল। সুতরাং কহ্লনের সময়ে গৌড়ীয় বীরত্বকাহিনী সাধারণের মনে বদ্ধমূল ছিল; ইহা কহ্লনের কল্পনাপ্রসূত নহে। মূলে কোনও দৃঢ় সত্য না থাকিলে স্বীয় দেশের অখ্যাতিসূচক ও শত্রুর যশোজ্ঞাপক এইরূপ একটি জনশ্রুতি

কাশ্মীরে প্রচলিত থাকিতে পারে ইহা বিশ্বাস করা সুকঠিন।

জয়াপীড়ের গৌড়জয়সম্বন্ধে রাখালবাবু যাহা লিখিয়াছেন, আমরা তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। সুদূর গৌড়ে জয়াপীড় কি করিয়াছিলেন তাহার সঠিক বিবরণ কাশ্মীরবাসীর জানিবার কোন সুবিধা ছিল না। বিশেষতঃ, এ ক্ষেত্রে জয়াপীড়ের বীরত্ব ও গৌড়বাসীর সহায়হীনতা অতিরঞ্জিতভাবে বর্ণনা করিবার বিশেষ প্রলোভন ছিল।

আদিশূর ও কুলশাস্ত্রসম্বন্ধে রাখালবাবু যাহা বলিয়াছেন তাহা আমাদের সম্পূর্ণ অনুমোদিত, অর্থাৎ অন্যবিধ প্রমাণ ব্যতিরেকে কুলশাস্ত্রের কোন কথা প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। এই বিষয়ে রাখালবাবু যে দৃঢ় সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন তাহা সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। কুলশাস্ত্রপ্লাবিত বঙ্গদেশে যাঁহারা প্রকৃত ইতিহাস অধ্যয়ন করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে গ্রন্থের অন্ততঃ এই অংশ পাঠ করিতে বিশেষ অনুরোধ করি। রাখালবাবুর গ্রন্থের এই অংশের মূল্য কি তাহা বুঝিতে হইলে আমাদের দেশের সাধারণশিক্ষিতগণের মনে এ বিষয়ে কি প্রকার ধারণা তাহা জানা আবশ্যক। এ জন্য অধিকদূর যাইতে হইবে না। শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসুর গ্রন্থাবলী ও 'বিজয়া' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দেবরায়ের প্রবন্ধ দেখিলেই তাহা বুঝা যাইবে। (১৮) এই শেষোক্ত প্রবন্ধ 'বিজয়া'র ন্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ পত্রিকায় স্থান পাওয়ায় আমাদের দেশের সম্পাদকশ্রেণীভুক্ত শিক্ষিতগণের মধ্যে কাহারও কাহারও এ বিষয়ে অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়; আর আমাদের দেশের সাহিত্যরথিগণেরও এ বিষয়ে অভিজ্ঞতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুকে ইতিহাসের শাখাসভাপতিপদে বরণ। ইহার উপর টীকা নিষ্প্রয়োজন।

(১৮) বিজয়া, আষাঢ়, ১৩২২।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের শেষভাগে রাষ্ট্রকূটরাজগণের কালনির্ণয়সম্বন্ধে রাখালবাবু কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। নবাবিষ্কৃত লিপির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। রাখালবাবু লিখিয়াছেন,

"ইনি (প্রথম কৃষ্ণ) ৭০৫ শকাব্দে (৭৮৩ খৃষ্টাব্দে) দক্ষিণাপথরাজরূপে জৈন হরিবংশপুরাণে উল্লিখিত হইয়াছেন। (১২৩ পৃঃ)

* * * * ৭৮১ খৃঃ অব্দে রাষ্ট্রকূটরাজ কৃষ্ণরাজ জীবিত ছিলেন।" (১২৫ পৃঃ)

জৈনহরিবংশপুরাণে আছে—

"শাকেষ্বব্দশতেষু সপ্তসু দিশং পঞ্চোত্তরেষূত্তরাং
পাতীংদ্রায়ুধনাম্নি কৃষ্ণনৃপজে শ্রীবল্লভে দক্ষিণাং"।

এখানে কৃষ্ণনৃপজ শব্দে কৃষ্ণরাজের পুত্রকেই বুঝাইতেছে, কৃষ্ণরাজকে নহে। সুতরাং ৭০৫ শকাব্দে কৃষ্ণরাজের পুত্রই রাজা ছিলেন।

রাখালবাবু কর্করাজের ধুলিয়ালিপি (১৯) একেবারেই লক্ষ্য করেন নাই—তাহাতে ৭০১ শকাব্দে দ্বিতীয় গোবিন্দ রাজা ছিলেন এইরূপ স্পষ্ট উল্লিখিত আছে। সুতরাং ৭০৫ শকাব্দে দ্বিতীয় গোবিন্দ অথবা ধ্রুব রাজা ছিলেন। কৃষ্ণরাজা ৭০৫ শকাব্দে বর্ত্তমান থাকা তো দূরের কথা, ৭০১ শকাব্দের পূর্ব্বেই লোকান্তরিত হইয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার।

(১৯) E. I. VIII P. 182

ভাটিয়াল গান

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

হৃদয় দুয়ারে আজিকে আইল ও
কাহার মধুর বাণী শুনিলাম ও,
ও কি শুনিলাম, শুনিলাম, শুনিলাম ও,
ও কি শুনিলাম ও।
মোহ মদিরা পিয়ে (আমি) অচেতনে ছিলাম শুয়ে,
কে মোরে ডাকিয়ে আজ জাগাল,জাগাল,আজি জাগাল ও।
শুনেছি যা সুখ দিনে, কে আজি পশিয়ে প্রাণে,
সেই পুরাণ মধুর বাণী শুনাল শুনাল আজি শুনাল ও।
শুনিয়ে এ বাণী তাঁর, (আমি) রহিতে পারি না আর,
প্রাণ আকুল আজি হইল, হইল, (আজি) হইল ও।

আমি সংসারের মোহনিদ্রায় অভিভূত ছিলাম, হঠাৎ আজ এ কাহার মধুর আহ্বান "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া" আমার প্রাণ আকুল করিয়া তুলিল? এ যে সেই চেনা সুর! কত জন্মজন্মান্তরে শুভ মুহূর্ত্তে এই আহ্বান শুনিয়াছি! এ যে আমার সেই প্রাণ-প্রিয়তমের উন্মাদকর আহ্বান! আমি ত তাঁর ডাক শুনিয়া আর ঠিক থাকিতে পারিতেছি না! আমার প্রাণের অভ্যন্তরে কি এক মধুরতামাখা বিরহবেদনা উথলিয়া উঠিয়া আমাকে আকুল করিয়া তুলিয়াছে!

এ গানটি ব্রাহ্ম ভক্ত শ্রীযুত সীতানাথ দত্ত মহাশয় রচনা করিয়াছেন। ভাটিয়াল সুরসংযোগে যখন ইহা গীত হয়, তখন পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়।

(৩৭)

কালা রে মোর মনোহর
তুমি আমার রসের গুণনিধি।
একরূপ গুণ দিয়া সৃজিলেক বিধি।
এ মেঘ আঁধার রাত্রি, কেহ নাহি সাথে,
একেলা আসিছ বন্ধু, পরাণ লইয়া হাতে।
বন্ধু এ মেঘ আঁধার রাত্রি, বিজলির ছটা,
ধীরে ধীরে বারাইও পাও, পিছল হইছে ঘাটা।

এক দিন "ঘন ঘোর মেঘ ঘেরা দুর্দ্দিনে" কজ্জল-কৃষ্ণ নিশীথে শ্যাম নটবর রাধার কুঞ্জে উপস্থিত। দেখিবামাত্র রাধিকা প্রাণের প্রেম-ভালবাসার গভীর উৎসটি যেন মন্থন করিয়া সোহাগমাখা মধুর বচনে শ্যামকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "কালারে, মোর মনোহর তুমি আমার রসের গুণনিধি," বিধাতা তোমায় আমায় একরূপ গুণ দিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন, সমধর্ম্মী বলিয়াই না আমাদের পরস্পরের এমন আকর্ষণ! এই সমগুণান্বিত বলিয়াই না আত্মায় আত্মায় মিলনাকাঙ্ক্ষা! যা হোক্, আজ এমন দুর্যোগের রাত্রিতে প্রাণ হাতে করে তুমি একা কেন এলে প্রাণনাথ? দেখ পথঘাট অবিশ্রান্ত বারিপাতে অত্যন্ত পিচ্ছিল হইয়াছে, ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকিতেছে, তুমি অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া এস, আমার বড়ই আশঙ্কা হইতেছে পাছে তুমি পড়িয়া গিয়া আঘাত পাও!

এই গানের রচয়িতা সৈয়দ আসদ্দিন। ইনি এক জন মুসলমান বৈষ্ণবকবি। ইহা সুবিখ্যাত "সাহিত্য" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। মুসলমান কবি কেমন সহৃদয়তার সহিত এই পদটি লিখিয়াছেন! ইহা ভাটিয়াল সুরে গীত হইয়া থাকে।

(৩৮)

ও প্রাণ কৃষ্ণ বিনে সখী আমি মলেম প্রাণে,
ও কিসে ধৈরজিয়ে রব ঘরে গো।
কাইল ব'লে গিয়াছেন হরি, অক্রূরের রথে চড়ি গো,
আইজ কাইল হইতে দুই দিন গণি,
আমার ছেইড়ে গেছে মধুপুরী গো।
আমার অন্তিম কালে, তোরা সব সখী মিলে গো,
নিও ঐ যমনার তীরে (প্রাণ থাকিতে থাকিতে)
কৃষ্ণ নামটি সুধাইও কর্ণমূলে;
ওগো তোমরা সবে বল', হরি হরি
ওগো আমি প্রাণে মরি গো।

৩৮ (ক) (পাঠান্তর)।

প্রাণের হরি বিনে, হরি বিনে মরি প্রাণে,
আমি ধৈর্য্য ধ'রে রই কেমনে গো।
ওগো কাইল আসিবে বইলে হরি,
গেছে অক্রূরের রথে চড়ি গো,
বুঝি হরি আসিবে প্রাণ অন্তে;
যদি প্রাণ থাকিতে (ওগো ওগো প্রাণ সখী গো)
না পাই দেখা, তবে আমার কি কাজ আছে জীবন
[রাখায় গো।

একবার যে ভগবৎপ্রেমের আস্বাদন পাইয়াছে তার কাছে সামান্য দুই দিনের বিরহও প্রাণান্তকর হইয়া উঠে; তখন সে মৃত্যুসময়েও প্রেমময়ের রূপ ধ্যান ও নাম শ্রবণ করিতে করিতে যাহাতে প্রাণ ত্যাগ করিতে পারে তজ্জন্য আকুল হয়।

(৩৯)

কি দেখলেম সজনি তরু কদম তলে গো।
যমুনার জল আনতে যাইতে, দেখলেম নয়নে আচম্বিতে গো,
তিলেক না পারি পাশরিতে,
ও সে যে ভুবনমোহন রূপ, গলায় বনমালা গো।
পদের উপর পদ থুইয়ে
পাঁচনিতে ঠেকাইয়ে গো,
দাঁড়াইছে ত্রিভঙ্গ হইয়ে,
ও সে যে ভুবনমোহন রূপ, গলায় বনমালা গো।

সেই অরূপের রূপ "আচম্বিতেই" দেখা যায়। সে বিদ্যুৎ-প্রভার ন্যায় ঝলক দিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু একবার যাহার হৃদয়ে রূপের ঢেউ খেলিয়াছে সে "তিলেকের" জন্যেও তাহা "পাশরিতে" পারে না। রাধিকা এখনও তাঁর মানসনয়নে দেখিতেছেন। নীল যমুনাতটে বিকচ নীপমূলে চরণে চরণ রাখিয়া, করধৃত দীর্ঘ পাঁচনীতে দেহভার ন্যস্ত করিয়া সেই ভুবনমোহন ত্রিভঙ্গিমঠামে দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার কণ্ঠে বনফুলহার মন্দানিলে মৃদু মৃদু দুলিতেছে।

(৪০)

ওরে বাঁশী বাজ ধীরে ধীরে,
এত কেন গভীর গরজ তোমার।
গভীর রবে গৃহে জাগে কাল ননদী আমার!
গভীর গরজ সম্বর, ক্ষণেক ধৈরজ ধর;
এলাম, বিলম্ব নাই আর।
কৃষ্ণ অধর, সুধাপানে, গৌরব বেড়েছে মনে,
উন্মত্ত আছ গানে, না কর বিচার।
বসি গুরুজন মাঝে, বাজ বাঁশী, মরি লাজে,
নাম ধ'রে বেজ নারে আর।

সেই প্রেমিক শিরোমণির মোহন বাঁশী বাজিয়াছে; সে বাঁশী কেবল প্রেমপাগলিনীর নাম ধরিয়া রাধা রাধা বলিয়া গভীর রবে বাজিতেছে, আর রাধা সে আহ্বানে এমনই তন্ময় হইয়া গিয়াছেন যে বাঁশীকে চেতন ভাবিয়া তাহাকেই তিরস্কার করিতেছেন। তাঁহার ভয়, পাছে সংসারের গুরুজন সে আহ্বান শুনিতে পাইয়া তাহাকে আটক করিয়া রাখে। রাধা এ আহ্বানের মর্ম্ম বুঝিয়াছেন, আর বিলম্ব নাই, শ্যামসম্মিলনে তিনি এখনই ধাইবেন, তবে কেন মিছে আর বাঁশীর এ গভীর গর্জ্জন!

হায়, শ্যামের বাঁশী ত দিনে নিশীথে অবিরামই ধ্বনিত হইতেছে, কিন্তু কে তাহা শোনে, রাধা ভিন্ন কাহার কর্ণেই বা তাহা প্রবেশ করে? সংসার-মায়ামুগ্ধ গুরুজন উহা শুনিতে পান না; তবে কেন রাধার এ মিছে ভয়?

(৪১)

হৃদি দহিছে রে—আমার তাপিত হৃদয় দহিছে রে,—
হৃদি দহিছে দহিছে দহিছেরে বন্ধুর লাগিয়া।
ওগো আমি যদি (ওগো সখী, প্রাণ সখী গো)
মাটী হইতাম—বন্ধুর চরণে লাগিয়া রহিতাম।

ওগো আমি যদি (ওগো সখী, প্রাণ সখী গো)
চন্দন হইতাম—বন্ধুর অঙ্গেতে মিশিয়া রইতাম।
ওগো আমি যদি (ওগো সখী, প্রাণ সখী গো)
কাজল হইতাম—বন্ধুর চক্ষেতে লাগিয়া রহিতাম।

রাধিকার কৃষ্ণবিরহ অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে. প্রেমময়ের অদর্শনে তাহার হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। তিনি বিরহের নিদান এই পার্থিব দেহকে ধিক্কার দিয়া সখীকে বলিতেছেন, "হায়, আমি যদি এ ছার দেহরূপিণী না হইয়া মাটী হইতাম, তবে তাঁর নিখিলশরণ চরণকমলে সংলগ্ন হইয়া থাকিতে পারিতাম, অথবা চন্দন হইলে তাঁর সেই সকলজ্বালাহরণ শীতল অঙ্গে মিশিয়া রহিতে পারিতাম, অথবা কজ্জল হইলে আমার প্রাণবন্ধুর সেই জগৎভুলান নলীননয়নে লাগিয়া থাকিতে পারিতাম।"

(৪২)

ও গউর চাঁদ. তোরা দেখ্ আইসে গো চাঁদ
নদে' উদয় হইয়াছে!
চাঁদের মালা চাঁদ গাথনি কে গাঁইথা দিল
(সজনী গো এমন রূপ আর জনম ভ'রে দেখি নাই গো)
হাতে চাঁদ, কপালে চাঁদ,
চাঁদে চাঁদে আলয় (আলো) কইরাছে।

লেগেছে এক চাঁদের বাজার
তাকি জান না,
ও তার পাদপদ্মে কোটি চাঁদ
করে সাধনা।
ওগো ব্রহ্মার বাঞ্ছিত যে চাঁদ,
চাঁদে চাঁদে মিশা গিয়াছে।

জ্যোৎস্নাপ্লাবিত পল্লীগ্রামের প্রাঙ্গনে সারিন্দার মধুর ধ্বনির সঙ্গে যখন বহু কণ্ঠে এই গান গীত হইতে থাকে, তখন সেই গৌরাঙ্গপ্রেমমুগ্ধ কৃষককৃষাণীর প্রাণের মধ্যে কি এক ভুবনমোহন রূপের তরঙ্গ খেলিয়া যায়, তাহা কে বলিবে? উহা কেবল অনুভবের যোগ্য।

(৪৩)

গৌরপ্রেমসাগরে, প্রেমসাগরে সাঁতার খেলে,
ওগো আমি মরমে মজিয়ে থাকি সই।
ও সে যে গৌরপ্রেমতরঙ্গনদী,
(ও গো ওগো প্রাণসখী গো)
সে নদীর ধারা বহে নিরবধি সই।

ও সেই গৌরপ্রেম কলঙ্কেরডালি,
সে ডালি সদায় রাখি মাথায় তুলি সই।

যে ভগবৎ প্রেমসাগরে ডুবিয়াছে, তার অন্য চিন্তার অবসর কোথায়? সে প্রেমের ধারা অবিচ্ছিন্ন, সে সর্ব্বদাই উহাতে নিমজ্জিত হইয়া আছে; সংসারের লোক তাহাকে কতই না নিন্দা করে, কিন্তু সে সেই কলঙ্কের ডালি মাথায় তুলিয়া লইয়া আপন ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া থাকে।

(৪৪)

ও দিন গেল রে মন রে গৌর ব'লে ডাক।
ওরে তুই গৌরনামে করলি হেলা,
(হেলায় হেলায় দিন ফুরাল)
ওরে তোর দাঁড়াবার স্থান নাই
গাছের তলা।
ওরে তোর ভবের বাসা দিন দুই চারি,
(চিরদিন হেথায় রবে না)
এখনও তোর ঠিক হ'ল না
আপন বাড়ী।
ওরে তুই আর কি এমন জনম পাবি,
(দুর্লভ জন্ম বৃথা গেল)
ওরে তুই মইলে কি আর
মানুষ হবি।

ওরে একবার গৌর বল মনরসনা,
(ভক্তিভরে উচ্চ স্বরে)
এ ভবে মানবজনম আর হবে না।

এ সংসারে যে তোমার আপন বলিবার একটী গাছের তলাও নাই। এখনও সময় আছে, একবার ভক্তিভরে ভগবানের নাম করিয়া তাহারই আশ্রয় লও, তিনিই যে তোমার "চির বাসস্থান, চির জন্মভূমি"। এ সাধনোপযোগী দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া হেলায় উহা নষ্ট করিও না। এ দেহের অবসান হইলে কে জানে আর মানবজন্ম হইবে কি না ?

৪৫

আমার মন ভাল না,
আমার স্বভাব ভাল না,
গুরু কি ধন চিন্‌লাম না—চোক থাকৃতে
হইলাম রে কাণা।
স্ত্রীপুত্র রে, পাষাণ মন, স্ত্রীপুত্র
তোর কেউ ত সঙ্গে যাবে না।
মন তোরে করি রে মানা, কুপথে যাইও না,
সাধন কর, বস্তু চিন, কষ্ট রবে না ;
ভাইবন্ধুরে পাষাণমন, ভাইবন্ধু
তোর কেউ ত সঙ্গে যাবে না।
মন রে একে তনুক্ষীণ, শমনে গণে দিন,
মিছে মায়ায় বন্দী হইয়ে রইলেম চিরদিন ;
নদীর কূলে বইসারে পাষাণমন, গাঙ্গের কূলে,
বইসা জল পিপাসা গেল না !

ইহা আত্মানুসন্ধানের চিত্র। স্ত্রীপুত্রের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া রহিলাম ; ভগবান যে আত্মদৃষ্টির অপূর্ব্ব ক্ষমতা দিয়াছেন, তাহা থাকিতে ত সেই পরমগুরু পরমাত্মাকে চিনিলাম না ! মন, তুমি এখনও সাবধান হও, কুপথ পরিত্যাগ কর, সাধনার বলে সত্য বস্তু চিনিয়া লও, তোমার সকল কষ্ট ঘুচিয়া যাইবে। আর বিলম্ব করিও না, হায় তোমার অলক্ষ্যে শমন তোমার দিন গণিতেছে, ফুরাইলেই এ দেহের অবসান হইবে, তবে কেন মিছা মায়ায় বন্দী হইয়া আছ ! হায়, ভগবান ত তোমার আপন অন্তরেরই বস্তু, তবে কেন তুমি তাঁহাকে হারাইয়া এ সংসারযন্ত্রনা ভোগ করিতেছ ? নদীতটে দাঁড়াইয়াও তোমার জলপিপাসা মিটিল না ! হায় একি বিড়ম্বনা !

৪৬

গুরু দয়াল হইলে হবে কি, আমি ত ভক্তিহীন, ভক্তিহীন।
গুরুনামের বলে পাষাণ গলে, আমি তা হ'তে কঠিন।

গুরু দয়াল বটে সত্য, নিজে আমি কুপদার্থ,
হলেম গো পদার্থবিহীন ;
আমি মন খুলে, নয়নজলে
চরণ ভজলাম না এক দিন।

এক দিন না করলেম চিত্তে
গুরুর ঐ চরণ চিন্তে।
কুচিন্তায় গেল রাত্রিদিন,
ওগো জন্মাবধি গেল না গো
আমার মনের মলিন।

মজতাম যদি গুরুর পদে
তবে যেতেম নিরাপদে,
বিপদে হইত শুভ দিন,
আমি বিষয় জ্বালায় জ'লে মলেম,
সোনার তনু হ'ল ক্ষীণ।

সারাজীবন হেলায় খেলায় কাটাইয়া জীবনসায়াহ্নে চিন্তাশীলের চিত্তে এরূপ ভাবই ফুটিয়া ওঠে। যদিও "মোর ভগবাম ভেদিয়া পাষাণ বহান প্রেমের ধারা," কিন্তু আমার এ প্রাণ যে পাথরের চেয়েও কঠিন ! হায়, আমি ত একদিনের জন্যেও সেই প্রেমময়কে "মনফুলে, নয়ন জলে" ভজনা করি নাই,—বিষয়জ্বালায় জ্বলে তনু ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, তবু ও না ! মনোদর্পণ মলিনতায়

আচ্ছন্ন, ভগবৎপ্রেমের সূর্য্য কিসে প্রতিফলিত হইবে? চিত্তকলসী চিরনিম্নমুখ হইয়া রহিয়াছে, গুরুর কৃপাবারি চারিদিক হইতে অজস্র বর্ষিত হইতেছে সত্য, কিন্তু তথায় প্রবিষ্ট হইবে কিরূপে?

কিন্তু নিরাশ হওয়ার কিছুই নাই! মনের ময়লা এক দিন অপসৃত হইবেই, চিত্তকলসী একদিন উর্দ্ধমুখ হইবেই; এই অনুতাপই তাহার লক্ষণ; তখন প্রেমসূর্য্যেরও দর্শন পাওয়া যাইবে, কৃপাবারিও লাভ হইবে!

৪৭

গেল দিন অসাধনে, মন, একবার হরিগুণ গাও রে।
মুখ আছে, বলতে পার, তবে কেন আলস্য কর।
ক্রমে ক্রমে হরিনামে রুচি কর;
ও রে ভজনের মূল মানবজনম, আর কি তুমি চাও রে।

হরিনাম সিন্ধুনদী, পান কর নিরবধি,
ভবনদী পার হয়ে যাবে যদি,
ওরে হরিনামে ডঙ্কা মেরে ব্রজধামে যাও রে।

প্রথমে ভগবানের নাম লইতে সাধারণতঃ ইচ্ছা হয় না, কিন্তু তাই বলিয়া মানুষ কি ভগবানের নামগান ছাড়িয়া দিবে? কখনই না; ক্রমে ক্রমে ঐ নাম করিতে করিতে উহাতে রুচি আনয়ন করিতে হইবে, এবং তখন উহার আস্বাদ পাইলে এ মানবজীবন ধন্য হইবে এবং জীবনের কর্ত্তব্যও সাধন করা হইবে। ভগবানের নাম সুধানদীর মত, সাগরের মত তোমারই সম্মুখ দিয়া বহিয়া যাইতেছে; উহা কেমন শীতল, কেমন স্নিগ্ধ! তুমি প্রাণ ভরিয়া ঐ সুধা পান করিয়া সর্ব্ব জ্বালা হইতে মুক্ত হও, এবং এ সংসারের পরপারে সেই নিত্যানন্দ ধামে চলিয়া যাও।

৪৮

ওগো প্রাণ সই, এ বার সাধনের ঘরের কূল পাইলাম না।
আরে ভেক দিলা কেবল গুরু, সাজ দিলা না।
কত নৌকা আসে যায়, কত নৌকা মারা যায়
গো প্রাণ সই; কেহর উনা, কেহর দুনা,
আসলে কেউ বোঝে না।

কাঠল পাইকা বুলি কয়, যাহাঁর মনে যাহা লয়
গো প্রাণ সই; রাধার মাধব, রাধার কেশব,
আসলে কেউ বোঝে না।

গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র লওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু সাধনে সিদ্ধি লাভ কিসে হইতে পারে তাহার কোনও অন্ধি সন্ধি পাওয়া যাইতেছে না। কত লোকই ত এ সংসারে আসিতেছে, যাইতেছে, কাহারও পতন হইতেছে, কাহারও বা উত্থান হইতেছে, কিন্তু প্রকৃত তথ্য যে কি, কেন যে এরূপ হয়, কেহই তাহা বোঝে না। এখানে নানা মুনির নানা মত, যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই বলিতেছে, কিন্তু মাধব যিনি তিনি রাধারই, ভগবান ভক্তেরই, এই আসল কথাটি কেউ বোঝে না।

"কাঠল পাইকা" কথার অর্থ বুঝিতে পারা গেল না।(১)

৪৯

ডুবল রে তোর মানবতরী ভবসাগরের পাকে প'ড়ে।
আরে এমন বান্ধব কেবা আছে, কে তুলিবে কেশে ধ'রে।

এসেছ মন ভবের বাজারে,
কুসঙ্গাসুরায় (অসুরে) লাগুর পেইলে
সব নিবে কেড়ে;
কি দোষ দিব (রে মন) বিধাতারে
সকলই কপালে করে।

মানবতরীর মাল্লা ছয় জনা,
ছয় জনা ছয় দিকে টানে,
কেউ ত শোনে না;
গুণ ছিঁড়িয়া সব পলাইল
আমি একা রইলাম পড়ে।

ভবনদীর তুফান রে ভারি,
যে দিকে চাই সেই দিকে নাই
পারের কাণ্ডারী;

(১) এক প্রকার পাখী; কাঠ ঠোক্রা (?)—প্রঃ সঃ।

গুরু বিনে এই নিদানে (অন্তকালে)
কে নিবে আর ভব পারে।

এ সংসারসাগরের পাকতরঙ্গে পড়িয়া এ দেহতরী ত নিমগ্নপ্রায় হইয়াছে। হায়, এ সময়ে তোমাকে কে উদ্ধার করিবে? এ ভবের হাটে ব্যাপার কর'তে এসেছিলে, কিন্তু কুসঙ্গে প'ড়ে তোমার সব সম্বল হারাইলে, এমনই অদৃষ্টের ফের! তোমার সঙ্গী ইন্দ্রিয়গ্রাম এক্ষণে তোমার বশে নহে; ষড়রিপু নানাদিক হইতে টানাটানি করিয়া তোমাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে. সকলেই এখন তোমাকে একলা ফেলিয়া তোমার বন্ধন কাটাইয়া চলিয়াছে; এদিকে ভীষণতরঙ্গাকুল সংসারসমুদ্র ঝঞ্ঝাঘাতে তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে, ভীত চিত্ত চারিদিকে চাহিয়া কোথাও কাণ্ডারীর দর্শন পাইতেছেনা! হায় এই অন্তিমকালে গুরুবিনে কে তাহাকে উদ্ধার করিবে?

গত আষাঢ় সংখ্যা "প্রতিভায়" শ্রীযুত গোপীনাথ দত্ত মহাশয় এই গানটি প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু আমার সংগ্রহে পদের কিছু ব্যতিক্রম আছে বলিয়া ইহাও প্রকাশ করিলাম।

৫০

মন রে তোর পায়ে ধরি চাঁদ বদনে হরি বল।
ইহকালে পরকালে, কালের পক্ষে হবে রে ভাল।

হরিনাম যার জাগে অন্তরে,
শমনে কি ছুইতে পারে—কি করবে কালে।
হরি বল বদন ভরে, নেচে গেয়ে ব্রজে চল।

গুরু যে ধন দিয়াছে তোরে
একদিনও বিরলে ব'সে জপলি নে তারে।
মিছা ভূতের বেগাড় খেটে সাধের দিন তোর
বৃথায় গেল।

মিছা মন ব'সে ভাব কি,
গণা দিন ফুরায়ে গেল,
আর কিরে বাকি?
মদন চাঁদ কয় রামানন্দ,
ভাবতে ভাবতে জনম গেল।

হরিনামের বীজমন্ত্র ত গ্রহণ করা হইয়াছে, কিন্তু মন বশীভূত হইল কই? এমন যে ভগবানের নাম, যাহা মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যায়, সেই ইহকালের পরকালের মঙ্গলনিদান নাম জপ করিয়া আনন্দে অমরধামে চলিয়া যাও। হায়, একদিনের তরেও নির্জ্জনে বসিয়া নাম জপ করিলে না, ভগবচ্চিন্তায় হৃদয়মন ডুবাইলে না, সংসারে কেবল পঞ্চভূতের বেগাড় খেটেই মরিলে! এদিকে তোমার নির্দ্দিষ্ট পরমায়ু ফুরাইয়া আসিল, এখনও বসিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছ? হায়, ভাবিতে ভাবিতেই যে জনম কাটাইয়া দিলে!

৫১

মুরসিদ্ আমার বানিয়ারে সাধ কর ব্যাপার,
বিনা পাল্লায় বিনা ডাণ্ডি তুলেছে সংসার।

পুষ্করিণীর চারি পারে নানা পক্ষীর বাসা,
আরে ঝাঁকে উড়ে ঝাঁকে পড়ে, ঐ আল্লার তামাসা।

আল্লা রইল হালে রে রছুল পয়গম্বর,
আরে ডাইন চৌখে কি কইতে পারে বাও চৌখের খবর?

এই লহর দরিয়ার মধ্যে বিষম যমের থানা,
নেকি বান্দা পার হইবে, বদি যাইতে মানা,
(ভাই ফিরে যা)।

কমল মগদে বলে এ তনু আপ্‌না,
ভুখারে দিও ভাত, তিয়াইসারে পানি,
নেংটারে দিও বস্ত্র, ভেস্তের নিশানী।

মুরসিদ্—গুরু। বানিয়া—বণিক। পাল্লা—তুলপাত্র। নেকি (নেক্)—ধার্ম্মিক। বান্দা—সৃষ্ট জীব, লোক। বদি—পাপী। কমল মগদ—একজনের নাম। ভেস্ত—স্বর্গ।

হে আমার মনব্যাপারী, তুমি এ ভবে ব্যাপার করিতে ইচ্ছা কর, কিন্তু মনে রাখিও, গুরু "বিনা পাল্লা" এবং "বিনা ডাণ্ডি"তেই কোন রূপ জড়বস্তুর সাহায্য ভিন্নই এই সংসার ধারণ করিয়া আছেন। অতএব জড়বস্তুর ব্যাপার করিয়া কি লাভ হইবে? যদি ব্যাপার করিতেই চাও, তবে চিন্ময় তত্ত্বেরই ব্যাপার কর।

এ সংসারে ভগবানের লীলায় বিবিধ প্রকারের পক্ষীকুল যেমন একস্থলে বাস করিয়া, একত্র দল বাঁধিয়া, মিলিয়া মিশিয়া চলা ফেরা করে, তোমাকেও সেইরূপ সকলের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া, বনিবনাত করিয়া কাজ করিয়া যাইতে হইবে।

ভগবানকে কর্ণধার করিয়া এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগের নির্দ্দেশানুসারে গোপনে কর্ম্ম করিয়া যাও; দক্ষিণ চক্ষু যেমন বাম চক্ষুর "খবর" বলিতে পারে না, তেমনই তোমার পুণ্যকর্ম্মও যেন তোমার নিকটতম প্রতিবেশীও জানিতে পারে না। "Let not thy left hand know what thy right hand doeth." The Gospel, St. Mathew, Chap. 6.

এই তরঙ্গসঙ্কুল সংসারনদীতে ভয়ানক মৃত্যু দৃঢ়ভাবে বসিয়া আছে। তাহার দ্বারে ধার্ম্মিক ব্যক্তিরাই কেবল পার হইতে পারে, পাপীর তথায় প্রবেশ নিষেধ।

কমল মগদ বলিতেছেন, এই দেহ নিজের নহে; এ সংসারে ক্ষুধিতকে অন্ন, পিপাসার্ত্তকে জল, এবং বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দেওয়াই অর্থাৎ পরোপকারই স্বর্গলাভের উপায়।

৫২

আরে কোহিলা না ডাহিও আর
বন্ধু গিছুন যন্ত, ডাহ কোহিল হন্ত,
হিন যদি ডাহ কোহিল, মোর মাথাটি খাও।

বন্ধু গিছুন বিদেশৎ, খৎনা লিখুন ছমাসৎ রে,
আরে বন্ধুর লাগি মোর কলিজা জ্বলি জ্বলি যায়!

পতিবিরহকাতরা তরুণী কোকিলঝঙ্কারে ব্যথিত—মনা হইয়া পাখীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন:—কোকিল্! তুমি যথেষ্ট ডাকিয়াছ, আর ডাকিও না। আমার প্রাণবন্ধু যেখানে গিয়াছেন, সেই খানে যাইয়া তুমি ডাক; সেইখানে ডাকিলে এ অভাগিনীর কথা মনে পড়িলে হয়ত তিনি এখানে আসিতেও পারেন। তাই বলিতেছি, তুমি আমার প্রাণনাথের নিকট যাইয়াই তোমার ঐ পাগলকরা স্বরলহরী ঢাল। কিন্তু আমার মাথা খাও, এখানে ডাকিও না। দেখ, আমার বন্ধু আজ বহুদিন বিদেশে গিয়াছেন, দীর্ঘ ছয়মাসেও একখানা সামান্য চিঠিও লিখেন না! হায়, এদিকে তার অদর্শনে আমার "কলিজা" জ্বলিয়া খাক্ হইয়া যাইতেছে, আর তুমি কিনা তাহাতে ইন্ধন যোগাইতেছ! তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, নিষ্ঠুর, আর অমন করিয়া ডাকিয়া আমার জ্বালা দ্বিগুণিত করিও না।

শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত।

চন্দ্রকান্ত প্রসঙ্গ

অভিন্নহৃদয় বন্ধু—"প্রতাপ বাবু"

(১১)

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু শ্রীযুত প্রতাপচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সম্বন্ধে এখানে আমরা দু' চারিটী কথা না বলিয়া পারিতেছি না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি, তর্কালঙ্কার মহাশয়ের জীবনের উন্নতির—শুধু উন্নতির নহে,—সমস্ত জীবনের সুখদুঃখের সহিত প্রতাপবাবুর জীবন জড়িত। প্রতাপবাবু কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ৺ বারাণসী ঘোষের বংশধর। সহরে ও মফস্বলে ইঁহাদের বিস্তৃত জমিদারী ছিল; লক্ষ্মীসরস্বতীর অসাপত্নমধুর সম্মিলনে সে সময়ে প্রতাপ—বাবুর পরিবার বিশেষ সুখী ও গৌরবান্বিত ছিলেন।

প্রতাপবাবু অনুপনীত কায়স্থ ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পরিবারে এমন কয়েকটী অদ্ভুত নিয়ম ছিল, যাহা কলিকাতা বা অন্যত্র কায়স্থসমাজে, অন্ততঃ তখনকার দিনে, পরিদৃষ্ট হইত না।

তাঁহার পারিবারিক বিবাহাদি উৎসবে প্রাচীন রীত্যনুসারে উৎসবানুষ্ঠান হইত। তাঁহার রুচি অনেকটা বৈদিকমার্গাবলম্বিনী ছিল। তিনি পারিবারিক ক্রিয়াকর্ম্মে অনেক সময় বৈদিক মন্ত্রাদি উচ্চারণ করিতেন, এবং সেজন্য প্রিয়বন্ধু তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কাছে একদিনও কোনও ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায় না। এ সকল বিষয়ে তাঁহার স্বাধীন মত কোনও প্রকারে বাধা পায়, তাহা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। তাঁহার পিতৃদেব তাঁহার নিকট আদর্শ পুরুষ বলিয়া স্বীকৃত। সুতরাং তাঁহাদের আচরণ পরিত্যাগ করিতে তিনি সর্ব্বদাই অসম্মত। কিন্তু তর্কালঙ্কার মহাশয়ও এ সকল বিষয়ে তাঁহাকে বাধাপ্রদান করেন নাই। তিনি জানিতেন উহা প্রচলিত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বিধি-বহির্ভূত; এবং সেই জন্যই স্বয়ং সে সকল কার্য্যস্থলে উপস্থিত থাকিতে পারিতেন না;—প্রতাপবাবুও তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বিবেক ও শাস্ত্রজ্ঞানের সম্মানরক্ষার জন্য সেইরূপ অনুরোধ কখনও করেন নাই। বৈদিক মন্ত্রের মধ্যে "প্রণব" উচ্চারণেই প্রতাপবাবুর বিশেষ আসক্তি ছিল।

প্রতাপবাবু "সাজে পোষাকে" এখন কিরূপ জানি না,—যেহেতু এখন তিনি বিন্ধ্যাচলে সস্ত্রীক "বানপ্রস্থ" অবলম্বন করিয়াছেন; তখন কিন্তু অধিকাংশ সময়েই পশ্চিমাদের অনুকরণ করিতেন। প্রকাণ্ড-বপুঃ, সুন্দর বলিষ্ঠ-গঠন, প্রতিভা-সমুজ্জলদৃষ্টি প্রতাপবাবু পশ্চিমভারতের অনুকরণে মাথায় পাগরী, গায়ে মেরজাই, পায়ে শুঁড়ওয়ালা জুতা ও হাতে লাঠি লইয়া যখন বাহির হইতেন, তখন এক অপূর্ব্ব দৃশ্য হইত। প্রতাপবাবুর বাড়ীতে বিলাসের সামগ্রীও প্রচুর ছিল। গাড়ী ঘোড়ার অভাব ছিল না। 'সাহেব সুবোর' শুভাগমন প্রায় সর্ব্বদাই হইত। ডাক্তার স্যাণ্ডার্সের মাসিক একটা বেতন ছিল;—তা ছাড়া আগমনমাত্রেই দস্তুরমত ভিজিট পাইতেন। বেতনের উদ্দেশ্য আর কিছু ছিল না,—কাহারও অসুখবিসুখ হইলে তাঁহাকে ডাক দেওয়া মাত্র, অন্যত্র ডাক থাকিলেও, তিনি তাহা উপেক্ষা করিয়া তখন তখনই প্রতাপবাবুর বাড়ীতে ছুটিয়া আসিতে বাধ্য থাকিবেন, শুধু এই জন্যই মাসিক একটা বেতন ছিল। এ সকল খরচ অবশ্য অনেকের কাছেই অতিরিক্ত বলিয়া মনে হইবে; কিন্তু বড়মানুষির হিসাবে উহা অতিরিক্ত নহে! প্রতাপবাবুর বড়মানুষি চা'ল ব্যয়বহুল ছিল বটে, কিন্তু অশোভন ছিল না। প্রতাপবাবুর চাকুরিটী বড় রকমই ছিল—তিনি কলিকাতার রেজিষ্ট্রার ছিলেন। তা ছাড়া, তিনি একজন উচ্চকুলোদ্ভব কায়স্থ জমীদার। প্রতাপবাবু এসিয়াটিক সোসাইটীর সহিত বিশেষ সম্বদ্ধ ছিলেন এবং নিজেও রীতিমত সাহিত্যচর্চ্চা করিতেন। তাঁহার "বঙ্গাধিপ পরাজয়" নামক ঐতিহাসিক উপন্যাস বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি উক্ত পুস্তকে বঙ্গাধিপ প্রতাপাদিত্যের আখ্যায়িকা সরল ও সুন্দর ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই পুস্তকের আকার ছোট নহে, পরন্তু যা'তা দিয়াও পূর্ণ নহে। প্রতাপবাবুর মধ্যে একটা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বস্তু আছে:—তিনি যখন যাহা করিতেন, প্রাণ ঢালিয়া দিয়া করিতেন;—"চড়ুইভাতি" হইতে সন্ধ্যা উপাসনা পর্য্যন্ত সকল কাজের মধ্যেই তাঁহার প্রাণ—ঢালা একাগ্রতা ও অনুরাগ লক্ষ্য হইত। বৃদ্ধ বয়সে সুদূর বিন্ধ্যাচলেও এই নিয়মের ব্যত্যয় হয় নাই বলিয়া শুনা যায়। এমনটী প্রায় দেখা যায় না। বঙ্গাধিপ পরাজয়েও তিনি প্রাণ ঢালিয়া সাহিত্যসৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু অন্য কারণে উহা সাধারণের নিকট তেমন আদরলাভ করিতে পারে নাই। বঙ্গাধিপ পরাজয়ের ন্যায় বৃহদাকার উপন্যাস বাঙ্গালা ভাষায় বিরল।

প্রতাপবাবু তাঁহার 'বেহালার বাগানে' অনেক সময়ে চড়ুইভাতি করিতে যাইতেন। "বাবুদের বাগান বাড়ীতে যাওয়া' এখনকার মত সে সময় তেমন ঘন ঘন হইতনা, এবং প্রতাপবাবুর বেহালার বাগানে যাওয়া ব্যাপারটীও বড় সোজা ছিল না। সে এক প্রকাণ্ড অনুষ্ঠান —তাহাতে বিস্তর খরচপত্র ও হাঙ্গামা হইত। প্রথমতঃ ৪।৫ খানা গাড়ী চাই; সে সকল গাড়ীতে সহরের গণ্যমান্য বন্ধুবান্ধব বাগানে যাইতেন; উঁহাদের আহারাদির জিনিসপত্রের সুলভতার বন্দোবস্ত করিবার জন্য সেখানে লোক রাখিতে হইত। তাঁহারা সকলেই সেখানে যাইতেন, বাগানে বেড়াইতেন, নিজেরাই হাঁড়ি ঘড়া সংগ্রহ করিয়া, কাঠ কাটিয়া, কলাপাত আনিয়া, তৈল লবণ ডাল চাউল সংগ্রহ করিয়া (অবশ্য মোটা জিনিসগুলি প্রতাপবাবুই রাখাইতেন) এক এক গাছের তলায় সমারোহে চুলা গাড়িয়া পাক চাপাইয়া দিতেন। বার কয়েক সেই আনন্দ ভোজনে তর্কালঙ্কার মহাশয়ও যোগদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রতাপবাবুও সেই গাছের তলায় নিজেই পাক করিতেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় রন্ধনকার্য্যে সুপটু ছিলেন না, তবুও তাঁহাকেই রাঁধিতে হইত। নানাপ্রকার বিঘ্নবিড়ম্বনাকে আনন্দভোজনের "উৎসব প্রকর্ষ" অনুভব করিয়া তাঁহারা বৎসরে ২।১ দিন সেখানে মুক্ত জীবনের মধুরতা উপভোগ করিতেন। এই আনন্দভোজনে প্রতাপবাবুর শিশুসুলভ সরলতা ও অনাবিল আনন্দলাভের জন্য ব্যাকুলতা ফুটিয়া উঠিত। প্রতাপবাবু সেই আনন্দ ও উৎসবকে সারা প্রাণ দিয়া উপভোগ করিতেন। আহারান্তে গাছের তলায় বন্ধুগণ মিলিয়া একটী দরবার গড়িয়া তুলিতেন; কেহ পান, কেহ বা হরিতকী চিবাইতেছেন, কেহ বা 'খেলো হুকায়' তামাক টানিতেছেন, কেহ বা সিগারেটের ধুম উদ্গীরণ করিতেছেন; ভৃত্যগণ শোভাসম্পাদন করিতেছে মাত্র—এ আনন্দভোজনে তাহারাও আজ স্বাধীন! তাহারাও স্বাধীনভাবে রাঁধিয়া বাড়িয়াই খাইতেছে, এবং এক দিনের জন্য দাসত্ব হইতে মুক্তি লাভ করিয়া, গাছের তলায় চোখ বুঁজিয়া দেশের স্ত্রীপুত্রের কথা ভাবিতে ভাবিতে অলক্ষিতে ঘুমাইয়া পড়িতেছে। বাবুদের দরবারে অনেক সময় বালকসুলভ খেলা চলিত, বা প্রায় তাহাদেরই মত মুক্ত ও সরল প্রাণে হাসিতামাসার ফোয়ারা ছুটিত। বিশ বৎসর পূর্ব্বেও প্রাণভরা আনন্দে বাঙ্গলার আবালবৃদ্ধের উচ্চহাস্য আকাশ ধ্বনিত করিয়া তুলিত! আর এখন? এখন আমাদের অন্তঃপুর ও বহিঃপুরে শারীরিক অকালবার্দ্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক অকালবার্দ্ধক্যও সমভাবেই প্রভাব বিস্তার করিতেছে। আমরা এখন বিংশশতাব্দীর শিক্ষাভিমানী বাঙ্গালী—আমাদের কি আর 'চাষাভূষাদের' মত প্রাণভরা উচ্চহাসি শোভা পায়? আমাদের বালক বা যুবকদের মধ্যেও এখন আর তেমন উৎসাহ বা স্ফূর্ত্তির লক্ষণ দেখা যায় না; প্রাণের স্পন্দন যেন বাঙ্গলার সীমারেখা অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে,—অযথা গাম্ভীর্য্য বা অকাল—বার্দ্ধক্যের শুষ্ক অভিনয় আমাদের জাতীয় জীবনকে দিন দিন অবসন্ন ও তিক্ত করিয়া তুলিতেছে। এমন জীবন লইয়া মরণের অভিনয় শুধু সেই দেশেই সম্ভব, যে দেশের সুখদুঃখ বা জীবনমরণের অনুভূতিটাও "কেতাব মুখস্থ" করিয়া শিখিতে হয়। যা'ক্—প্রতাপবাবুদের সেই আনন্দ—ভোজনোৎসবে প্রাণের স্পন্দন, সজীবতার লক্ষণ বিলক্ষণ প্রকাশ পাইত। আমরা ছোট বেলায় দেখিয়াছি—এবং কয়েকবার এরূপ 'বনভোজনের' অনুষ্ঠানও করিয়াছি;—এখন তাহার একাংশও লাভ করিতে পারিলে বুঝি বা ধন্য হইতে পারিতাম। প্রৌঢ়তার সীমারেখায় পৌছিয়া কৈশোর বা যৌবনের অনাবিল আনন্দধারা অন্ততঃ মুহূর্ত্তের জন্যও ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত কাহার না আগ্রহ হইয়া থাকে? এখনকার লোকেরও হয়; কিন্তু বর্ত্তমান আত্মসঙ্কোচিনী সভ্যতার পীড়নে আমরা সে আগ্রহকে মাথা তুলিতে দেই না। যে আনন্দময়ী প্রকৃতি হইতে জন্মলাভ করিয়াছি, প্রতিদিন তাহাকেই বঞ্চনা করিতেছি;

সুতরাং আমরা দিনদিনই হীনবল ও ক্ষীণায়ু হইয়া পড়িতেছি। বাঙ্গালীর ঘরে বাহিরের এই অকালপক্কতার প্রতিবিধান নিতান্তই আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

যাহা বলিতেছিলাম। আহারান্তে বন্ধুগণ গাছতলায় দরবার করিতেন,—তর্কালঙ্কার মহাশয় সেই দরবারে বিশেষ রূপেই অগ্রণী হইতেন। একদিন সেই দরবারে কথা—প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রবাবু (১) তর্কালঙ্কার মহাশয়কে বলিলেন, "দেখুন, আপনাদের হাতে কলম ছিল বলিয়া আপনারা নিজেদেরই সুবিধা বেশী করিয়া দেখিয়াছেন।" কথাটা রহস্যের ছলে হইলেও পিতৃপিতামহগণের উপরে অযথা কলঙ্কারোপে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের আত্মসম্মানবোধে আঘাত লাগিয়াছিল। তিনিও রহস্যচ্ছলেই উত্তর করিলেন, "দেখুন ভূপেন্‌বাবু, একবার চিন্তা করিয়া দেখা উচিত নহে কি যে, সে সময়ে আপনাদের হাতে কলম থাকিলে আপনারাও কি করিতেন?" ভূপেন্‌বাবু একটু চিন্তা করিয়া সরলভাবেই বলিলেন, "কথাটা ঠিক। যে জাতি সমগ্র ভারতবর্ষে—শুধু ভারতবর্ষে নহে, সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম জ্ঞানার্জ্জন ও জ্ঞানবিতরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের হাতে কলম ছিল বলিয়াই অপর জাতির প্রতিও তেমন অসমদর্শিতা ও অত্যাচার দেখা যায় না। তখন যাঁহাদের হাতে কলম থাকিত, তাঁহারাই হয় ত এইরূপ ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইতেন।" প্রতাপবাবুর আনন্দভোজন বৎসরে অন্ততঃ একবার অনুষ্ঠিত হইতই।

প্রতাপবাবু একবার সেরপুরে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। কলিকাতায় শতসুখসম্ভোগের কোলে প্রতিপালিত প্রতাপবাবু দুর্গম সুদূর পথ বহু—ক্লেশে অতিক্রম করিয়া অভিন্নহৃদয় বন্ধু তর্কালঙ্কার মহাশয়ের জন্মভূমি সেরপুরে উপস্থিত হইলেন। সেরপুর পল্লীশ্রেষ্ঠ হইলেও কলিকাতার তুলনায় কিছুই নহে; তথাপি প্রতাপবাবু সেরপুরের পল্লীসৌভাগ্যদর্শনে সুখী হইয়াছিলেন। সেরপুর বিদ্বান ও ধনবানের স্থান; স্থানীয় জমীদারগণ প্রতাপবাবুকে বিশেষ সম্মানের সহিত গ্রহণ করিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সহিত পরিচয় হইবার পরে ইঁহাদের সঙ্গেও প্রতাপবাবুর বিশেষ পরিচয় ঘটিয়াছিল। প্রতাপবাবু ইঁহাদিগকেও বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন। প্রাসাদবাসী প্রতাপবাবু তর্কালঙ্কার মহাশয়ের খড়ের ঘরেই অতিসুখে এই কয়দিন কাটাইয়া দিলেন। স্থানীয় বহুলোক দুবেলা তাঁহার সঙ্গে পরিচয় করিবার জন্য যাতায়াত করিতেন; 'কলিকাতার বাবু' আসিয়াছেন শুনিয়া অশিক্ষিত সাধারণ লোকও দু'বেলা আসিত; প্রতাপবাবু কাহাকেও নিরাশ করিতেন না—চাষাদের সঙ্গেও নানাপ্রকার রহস্য-বহুল আলাপ করিয়া শিশুর মত সরল প্রাণে হাসিয়া উঠিতেন। তাহারা মহাখুসি হইয়া 'কলিকাতার বাবুর' গুণের "তারিপ" করিতে করিতে গৃহে ফিরিত। প্রতাপ—বাবু নাকি চাষাদের সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গের অনুকরণে ভাষা বলিবার চেষ্টা করিয়া অনেক সময়ে নিজেই ঠকিয়া যাইতেন এবং হাসিয়া অস্থির হইতেন।

প্রতাপবাবু দ্বিতীয়বার ময়মনসিংহ যাইবার সুযোগ পাইলেন না; পেন্‌সন পাইয়া একমাত্র স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন। সুদূর বিন্ধ্যাচলে এক আবাসবাটী নির্ম্মাণ করিয়া প্রতাপবাবু সংসারের সকল কেলেঙ্কারী হইতে মুক্তিলাভের জন্য তথায় বাস করিতে লাগিলেন; আজিও বৃদ্ধ দম্পতী বিন্ধ্যবাসিনীর শান্তিময় ক্রোড়ে বাস করিতেছেন।

লিখিতে লজ্জা ও দুঃখ বোধ হয়, প্রতাপবাবুর বড় সাধের অট্টালিকা আজ পরহস্তগত। পরিবারবর্গ বিভিন্ন মতাবলম্বী, সুতরাং বিভিন্ন স্থানবাসী; জ্যেষ্ঠপুত্র ভূপেন্দ্রশ্রী ঘোষ অকালে মৃত্যুমুখে পতিত। বৃদ্ধ দম্পতি বিত্তনাশ ও পুত্রনাশের অসহ্য শোকজ্বালা জগদীশ্বরী বিন্ধ্যবাসিনীর করুণাবারিসিঞ্চনে কতকটা নিবারিত করিয়াছেন। তাঁহারা ক্রমশঃ শোকদুঃখের অতীত হইবার পথে অগ্রসর হইতেছেন; জগদীশ্বরী মহাপ্রাণ প্রতাপবাবুর মনোবাসনা পূর্ণ করুন।

(১) অনারেবল শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু এম এ, বি. এল, এটর্নী।

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ছাত্রদের সঙ্গেও প্রতাপবাবুর অতি ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি যখনই ১০৯ নম্বর বাড়ীতে আসিতেন, তখনই অন্ততঃ ১০।১৫ মিনিট ছাত্রদের সঙ্গে বাক্যালাপ করিতেন। মাঝে মাঝে ছাত্রদের জন্য নানাপ্রকার খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করাইয়া পাঠাইয়া দিতেন।

ইদানীং কাতরাবস্থায় তর্কালঙ্কার মহাশয় স্বাস্থ্যোন্নতি-মানসে বিন্ধ্যাচলে প্রতাপবাবুর আশ্রয়ে কয়েক মাস বাস করিয়াছিলেন;—বোধ হয়,উহা তাঁহার কাশীলাভের ৩'বৎসর পূর্ব্বে। সে সময়ে তাঁহার সঙ্গে দুইটী ছাত্র ছিলেন। প্রতাপবাবু তাঁহাদের সঙ্গেও এই শেষ বয়সেও রহস্য করিতে ছাড়িতেন না। যে দিন মাংস পাক করিবার জন্য ছাত্রগণ মসলা চাহিতেন, প্রতাপবাবু সে দিন সহস্রবার "বাঙ্গাল" বলিয়া তাঁহাদিগকে অপ্রস্তুত করিতেন। "বাঙ্গালেরা মসলা বেশী ব্যবহার করে বলিয়া তাহাদের হজম হয়না, ওরা মাংসটা একেবারেই খাইতে জানে না, খালি মসলা খায়; আরে, এত মসলাই যদি লাগিবে, তবে মাংস কেন, কাঠ ও খাওয়া যাইতে পারে" ইত্যাদি, ইত্যাদি। প্রতাপবাবু সে দিন পাকের ঘরের দরজায় বসিতেন, কিছু ধনিয়া হলুদ, "জম্বু" নামক পশ্চিমাঞ্চলের একটা প্রসিদ্ধ মসলা এবং দধি, এ সকলের দ্বারা বেশ করিয়া মাংস পাক করাইতেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় আহারে বসিতেন, কিছু খাইতেন। এমন মাংসপাক জীবনে কখনও ঘটিলে তো ভাল লাগিবে? প্রতাপবাবুর প্রশ্নের উত্তরে কোনরূপে আত্মরক্ষা করিয়া সরল ব্রাহ্মণ, বন্ধুর উৎসাহ, মতবাদ ও কথার সম্মান রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেন। ছাত্রেরাও এরূপ মাংস খাইতে ভাল বাসিতেন না; প্রতাপবাবু কিন্তু ঐ মাংস খাইয়া শত মুখে সুখ্যাতি করিতেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় অনেক দিন সেখানে বাস করিয়া দেশে ফিরিলেন। তাঁহার কাশীলাভের সংবাদ প্রতাপবাবুকে যেরূপ মর্ম্মাহত করিয়াছিল, তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা আমরা খুঁজিয়া পাইনা,—নিজের ও দেশবাসীর পক্ষ হইতে প্রতাপবাবুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও ধন্যবাদ প্রদান করিবার ভাষা আজিও সৃষ্ট হয় নাই। প্রতাপবাবু তর্কালঙ্কার মহাশয়ের জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহা শুধু তাঁহার জন্যই করেন নাই, সমগ্র দেশবাসীর গৌরবময় মঙ্গলের জন্যই করিয়াছেন। শুধু এই পুণ্যেই তাঁহার আত্মার সদ্‌গতি হইবে এবং নামের উজ্জ্বল স্মৃতি চিরকাল বর্ত্তমান থাকিবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীকৃষ্ণ সিদ্ধান্তশাস্ত্রী।

প্রতিভা

অগ্নি-রসা অয়ি দেবি! নিরমম স্নেহে
সন্তানে করাও স্নান আগুনের ধারে!
ভবময় বিবসনে আনিছ ঘুরায়ে!
পাগল—পাগল সে যে পেয়েছে যাহারে।

উলঙ্গ, বাতুল, ওগো, বিশ্ব-বিষপায়ী
নীলকণ্ঠ ধূর্জ্জটীর অমৃত-তনয়া,
গোপিনী, গোপননেত্র-নিবাসিনী অগ্নি,
বিশ্ব-বিষহরী দেবি, জয় সর্ব্ব-জয়া!

নিত্য-ইচ্ছাময়ী তুমি, চিত্তে নিবসতি,
দৃষ্টিমাত্র পরকাশ সৃষ্টির মূরতি!

নিত্য লয়ে যাও চিতে অজ্ঞাতের পুরে
আগুসরি' নয়নের সীমা-চক্রবালে,
—সৃষ্টির উপরে সৃষ্টি অব্যক্ত জঠরে,
জয়! শুধু তব জয় ইহ পরকালে!

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন।

মনের পরিণতির ও মস্তিষ্কের পরিণতির সম্বন্ধ

মস্তিষ্কের পরিণতিতেই মনের পরিণতি। মস্তিষ্ক অসংখ্য স্নায়বীয় পদার্থের (nervous units) সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই সব স্নায়বীয় পদার্থকে নিউরোন্ (neurones) কহে। নিউরোন্‌সমূহ বিবিধ শ্রেণীতে সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। প্রত্যেক শ্রেণীর ক্রিয়া সম্পূর্ণ বিভিন্ন। মোটামুটি বলিতে গেলে, নিউরোনদের তিনটি বৃহৎ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা—(১) অনুভবকারী নিউরোনসমূহ—(afferent or sensory neurones) (২) কার্য্যকারী নিউরোন্ সমূহ—(efferent or motor neurones); (৩) সম্মিলিত নিউরোন্ সমূহ (associated neurones) একটি নিউরোনে (neurone) একটি করিয়া কোষ (cell) ও তাহার কয়েকটি করিয়া শাখা থাকে। এই শাখাগুলির মধ্যে একটি করিয়া শাখা প্রধান; ইহাকেই একসন (axion) কহে। কেন না, এই শাখাতেই nerve (নার্ভ) বা স্নায়ুর প্রধান অংশ।

মস্তিষ্কের ভিতর অংশ ও বাহির অংশ আছে। বাহির অংশকে করটেকস (Cortex) কহে। এই বাহির অংশটাই চৈতন্যের (Consciousness) আধার। ইহার রঙ্‌টা দেখিতে ধূসর (grey)। ইহা অসংখ্য স্নায়ুকোষ ও তাহাদের শাখাসমূহ দ্বারা গঠিত।

ভূমিষ্ঠ হইবার কালে, শিশুর মস্তিষ্কে কতকগুলি কোষ (cell) ভিন্ন আর কিছুই থাকে না। এগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট অবস্থায় থাকিলে দেখা যায়। প্রথম অবস্থায় ইহাদের একটিও শাখা থাকিতে দেখা যায় না; কিন্তু ভ্রূণটি যেই একটু বড় হইতে থাকে, অমনি এক-একটি করিয়া শাখা প্রকাশ হইতে থাকে। তখন তাহার মস্তিষ্কটি পূর্ব্বের ন্যায় কেবলমাত্র কোষময় থাকে না। ইহার গঠন তখন কতকটা জটিল হইয়া পড়ে। শিশুর মস্তিষ্কে যে সকল স্নায়ুকোষ (nerve cell) আছে তাহাদের বৃদ্ধি ও পরিণতির দিকে একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে, কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্য না যোগাইলে তাহাদের পরিণতি সম্ভব নহে। কিন্তু শুধু খাদ্য যোগাই-লেই যে স্নায়ুকোষগুলি পরিণত হইবে তাহাও নহে। এমন তো প্রায়ই দেখা যায়, যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য সত্ত্বেও এক একটা শিশু তেমন পরিণত হইতে পারে না, কেমন যেন রুগ্ন থাকিয়া যায়। সেইরূপ কোন কোন স্থানে যথেষ্ট খাদ্য দিলেও স্নায়ুকোষগুলি তেমন পরিণত হইতে দেখা যায় না। রক্তের মধ্য হইতে স্নায়ুকোষগুলির যদি তাহাদের পরিপোষক পদার্থ বাছিয়া লইয়া দেহজাত করিবার শক্তিটি না থাকে, তাহা হইলে যতই খাদ্য দেও না কেন, তাহাতে কোনই ফল হয় না। মস্তিষ্ককোষসমূহের এই স্বাভাবিক শক্তিটির অভাবে মস্তিষ্কের অনেক প্রকার অপরিণতি ঘটিতে পারে। মস্তিষ্ক সম্বন্ধে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। মস্তিষ্ক শরীরের অন্যান্য অংশ হইতে পরিপোষক পদার্থ গ্রহণ করিয়া আপনার ক্ষয় নিবারণ করিতে পারে; তাহার প্রমাণ, কিছুদিন অনাহারে থাকিলে শরীর শুকায় বটে, কিন্তু মস্তিষ্কের ওজন কমিতে দেখা যায় না। পুরাতন ক্ষয়রোগে যে সব শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহাদের দেহ কঙ্কালসার হয় বটে, কিন্তু মস্তিষ্কের কোন রূপ ক্ষয় হইতে দেখা যায় না! ডোনালডসন্ (Donal-dson) পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন, শরীরের পরিণতি পক্ষে বিঘ্ন উপস্থিত হইলে, মস্তিষ্কেরও যে পরিণতি ও বৃদ্ধি হইবে না, তাহার কোন অর্থ নাই। মস্তিষ্ককোষের স্বাভাবিক পরিণতি প্রবণতার যদি অভাব থাকে, তাহা হইলে, যত ভাল করিয়াই শরীরের পরিপোষণ করা যাক না কেন, তাহাতে মস্তিষ্কের কোনই উন্নতি হইবে না। তাহার প্রমাণ, স্বাভাবিকনির্ব্বোধ ছেলে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহাদের দেহ যে অপরিণত বা অপুষ্ট তাহা কেহই বলিতে পারে না। অতএব মস্তিষ্কের স্বাভাবিক

পরিণতির চেষ্টা যদি না থাকে, তাহা হইলে, কোন প্রকারেই তাহার পরিণতি সম্পাদন সম্ভব হয় না।

তবে কি মনের পরিণতির উপর শিক্ষা ও খাদ্যের কোনই হাত নাই? প্রথমতঃ, মস্তিষ্কের পরিপোষণ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। মস্তিষ্কের পরিণতি ও ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ বিশুদ্ধ (oxygenated) রক্তের আবশ্যক। এই রক্তে অবশ্য এতটা পরিপোষক পদার্থ থাকিবে, যাহাতে মস্তিষ্ক অনায়াসে তাহার পরিপোষণ ও গঠন ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারিবে। আমরা জানি যদি কোন শিশুর থাইরইড্ গ্রন্থির (Thyroid gland) স্রাব (secretion) বন্ধ হয়, তাহা হইলে শিশুটির মস্তিষ্কের বৃদ্ধি হইতে পারে না। শিশুটি নির্ব্বোধ থাকিয়া যায়। এরূপ শিশুকে যদি প্রত্যহ একটু করিয়া মেষের থাইরইড্ গ্রন্থি (Thyroid gland) খাওয়ান যায়, তাহা হইলে মস্তিষ্ক-কোষ সমূহের বৃদ্ধি সম্ভব হয়। Thyroid gland (থাইরইড্ গ্ল্যাণ্ড্) তাহা হইলে, মস্তিষ্ক-কোষগুলিকে বৃদ্ধি হইবার পক্ষে উত্তেজনা করিয়া থাকে। ইহা রক্তের মধ্যে এমন একটা পদার্থ প্রদান করে, যাহা না হইলে মস্তিষ্কের পরিণতি হইতে পারে না। মস্তিষ্কের বাহির অংশ যাহাকে কর্টেক্স্ (cortex) বা গ্রে ম্যাটার্ (grey matter) কহে, তাহাতে খুব বেশি পরিমাণ রক্ত সরবরাহ হইয়া থাকে। তাহার কারণ মস্তিষ্কের এই অংশটি দ্বারাই যত প্রকার মানসিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। শক্তির ব্যয় ভিন্ন কোন ক্রিয়াই হইতে পারে না। এখানকার কোষ-(cell) গুলি শক্তি সঞ্চিত করিয়া রাখে এবং কার্য্যকালে তাহা ব্যয় করিয়া থাকে। অক্সিজেনের (oxygen) সাহায্য ব্যতিরেকে তাহা হইতে পারে না। এই কারণে এই স্থানটিতে অধিক পরিমাণে টাট্‌কা বিশুদ্ধ রক্ত যাওয়ার আবশ্যক। এই স্থানটিতে যদি মুহূর্ত্তের জন্য টাট্‌কা বিশুদ্ধ রক্ত (oxygenated blood) না যাইতে পারে তাহা হইলে অচৈতন্য দেখা দিয়া থাকে।

মস্তিষ্কের পরিণতি ও ক্রিয়ার সহিত রক্ত সরবরাহের (blood-supply) সম্বন্ধ।

বাহ্য জগৎ এবং আমাদের দেহ নিয়ত মস্তিষ্কে উত্তেজনা প্রেরণ করায়, আমাদের বাহ্য জগৎ এবং নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে চেতনা বিদ্যমান থাকে। এই সব উত্তেজনা বন্ধ করিলে, মস্তিষ্কে যতই কেন বিশুদ্ধ রক্ত থাকুক্ না, তথাপি আমাদের কোন চেতনা থাকে না। অতএব দেখা যাইতেছে, মস্তিষ্কের গ্রে ম্যাটার, (grey matter) যাহাকে cortex of the brain কহে, তাহার স্নায়ুকোষগুলির স্বাভাবিক ক্রিয়াশীলতা থাকিলেও, ক্রিয়া উৎপাদনের জন্য বিশুদ্ধ রক্ত ও বাহ্যজগতের উত্তেজনার একান্ত আবশ্যক। বিশুদ্ধ টাট্‌কা রক্ত বলিলে সেইরূপ রক্ত বুঝাইবে যাহাতে যথেষ্ট সংখ্যক লোহিত কণিকা (red corpuscles) থাকে, এবং প্রত্যক লোহিত কণিকাটির মধ্যে পর্য্যাপ্তপরিমাণ হেমোগ্লোবিন্ (haemoglobin) বা লাল বর্ণের পদার্থ (red colouring matter) আছে; এ সকল থাকিলেই যে রক্ত বিশুদ্ধ ও টাট্‌কা হইল তাহা নহে। এ সকল ছাড়া মস্তিষ্ক-কোষের গঠন ও পরিপোষণের উপযোগী পদার্থও থাকা চাই। এইরূপে রক্তের অভাব ঘটিলে, মস্তিষ্কের বৃদ্ধি হইতে পারিবে না ও তাহার কোষগুলি মানসিক ক্রিয়া উৎপাদনের উপযোগী শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিবে না। আবার রক্তে যদি কোনরূপ বিষাক্ত পদার্থ থাকে, তাহা হইলেও মানসিক ক্রিয়া উৎপাদন বিষয়ে বিঘ্ন জন্মাইতে পারে। আহারের দোষে শিশুদের অজীর্ণ রোগ দেখা দিলে, রক্ত দূষিত ও বিষাক্ত হইতে পারে, এবং এই অজীর্ণ দোষ যদি বেশিদিন স্থায়ী হয়, তাহা হইলে, তাহাদের দেহের ও মস্তিষ্কের উভয়েরই পরিণতি সম্বন্ধে গোলযোগ উপস্থিত হয়। এ অবস্থায় শিশুটি থাকিয়া থাকিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে, ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারে না; বিনা কারণে ক্রন্দন করে, খাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে এবং হয় ত তাহার হাত পায়ের আক্ষেপ (convulsion) হইতে থাকে। মা যদি বুদ্ধিমতী ও সুচতুরা হ'ন, তাহা হইলে এগুলিকে উপেক্ষা না করিয়া, ইহাদের আসল কারণটি দূর করিতে চেষ্টা করেন। পেটের মধ্যে

খাদ্য দ্রব্যের উৎসেচন (fermentation) বশতঃ যে বিষের সৃষ্টি হয়, তাহাতে রক্ত দূষিত হয় এবং তাহার জন্য দেহের পরিপোষণের বিঘ্ন হয় বটে, কিন্তু এরূপ অবস্থায় শিশুটি যে মাথায় না বাড়ে এমন নহে. কিন্তু মস্তিষ্কের যে সময়টিতে পুরা দমে পরিণতি হয়, সে সময়টিতে পরিপোষণ সম্বন্ধে প্রতিকূল অবস্থা ঘটিতে দিলে তাহার ফল মন্দ না হইয়া যাইতেই পারে না। মস্তিষ্কের সব চেয়ে বৃদ্ধির সময় হইতেছে জীবনের প্রথম তিন বৎসর। ভূমিষ্ঠ হইবার কালে মস্তিষ্কটি যত বড় থাকে, তিন বৎসর বয়সে, তাহার তিন গুণ আকার ধারণ করে। পরিপোষণের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থাকিয়াও যদিচ তিন বৎসর বয়সে শিশুটির মস্তিষ্কটিকে প্রায় তিনগুণ বাড়িতে দেখা যায়, তথাপি ইহা হইতে এমন সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, প্রতিকূল অবস্থা তাহার মস্তিষ্কের পরিণতি বিষয়ে কোনই ক্ষতি বা অনিষ্ট করিতে পারে নাই। যে শিশু নিয়ত পেটের অসুখে পীড়িত, সেও প্রায় সুস্থ শিশুর মতই মাথায় বাড়িতে থাকে ; তাই বলিয়া পেটের অসুখে তাহার দেহের পরিণতি বিষয়ে কোনই ক্ষতি বা অনিষ্ট করে নাই এমন কথা কেহই বলিতে পারে না। এখন এই প্রশ্নটি উঠিতে পারে—প্রতিকূল পরিপোষ্য অবস্থাতেও মস্তিষ্ক যদি আকারে বৃদ্ধি হইতে থাকে, তবে তাহার ক্ষতি হইল কোন দিক দিয়া ? তাহার উত্তরে এই কথা বলিতে পারা যায়—দেহের পরিপোষণের বিঘ্ন ঘটিলে যেমন শারীরিক দৌর্ব্বল্য জন্মায়,সেইরূপ মস্তিষ্কের পোষণ বিষয়ে বিঘ্ন জন্মাইলে, তাহারও দুর্ব্বলতা দেখা দেয়। এই সকল শিশু অতিরিক্ত মানসিক শ্রম করিতে অপারগ। অল্পেতেই ইহাদের মানসিক চাঞ্চল্য দেখা দেয় ; দাঁত উঠিবার সময় সময় ইহাদের হস্তপদাদির আক্ষেপ (convulsion) হয়। দৈবক্রমে ইহাদের যদি নিউমোনিয়া (pneumonia) হুপিং কফ্ (whooping cough) হাম (measles) প্রভৃতি রোগ দেখা দেয়, তাহা হইলে, মস্তিষ্কের এবং শরীরের অন্যান্য অংশের ঐ সকল রোগের বিষ প্রতিরোধ করিবার শক্তি থাকে না।

শিশুর খাদ্য।

শিশুদের অনেক সময়, এত বেশী খাওয়ান হয় এবং এমন সব জিনিস খাওয়ান হয়, যাহাতে তাহাদের পেটের গোলযোগ না হইয়া যায় না। ইহার ফলে, তাহাদের বমি হয়, উদরাময় দেখা দেয়, এবং নানাবিধ স্নায়বীয় উপসর্গ উপস্থিত হয়। আহারের দোষেই শিশুদের মৃত্যু সংখ্যা এত বেশী বলিতে হইবে। আহারের দোষেই অনেক শিশু জন্মের মত দুর্ব্বল থাকিয়া যায়। বলা বাহুল্য এ কারণটি সম্পূর্ণ বিচারসাপেক্ষ। ইহা বিচার করিতে হইলে মাতার পক্ষে সন্তানপালন বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান থাকার আবশ্যক। এ বিষয়ে তাঁহার রীতিমত শিক্ষা থাকার দরকার। ভূমিষ্ঠ হইবার পরে যত দিন দাঁত দেখা না দেয়, অর্থাৎ নয় মাস বয়স পর্য্যন্ত মাতৃস্তন্যই শিশুর স্বাভাবিক খাদ্য। বিশেষ কারণ না ঘটিলে শিশুকে তাহার এই স্বাভাবিক খাদ্য হইতে বঞ্চিত করিতে নাই ; করিলে, তাহার ফল প্রায় স্থানেই ভাল হইতে দেখা যায় না। ইহাতে শিশুর দেহও মস্তিষ্ক, উভয়েরই পরিণতি বিষয়ে গোলযোগ ঘটিবারই সম্ভাবনা।

মস্তিষ্কের পরিণতি কল্পে উত্তেজনার আবশ্যক।

মস্তিষ্কের পরিণতির জন্য মস্তিষ্কের কোষ গুলির স্বাভাবিক পরিণতিচেষ্টা ও উপযুক্ত পরিমাণে বিশুদ্ধ রক্তের আবশ্যক একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু শুধু এই দুটি হইলেই যে মস্তিষ্ক সুপরিণত হয় তাহা নহে। ইহার পরিণতির জন্য উত্তেজনার আবশ্যক। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের স্নায়ুগুলি এবং শরীরের অন্যান্য অনুভব করা স্নায়ুগুলির (sensory nerve) উত্তেজনা ভিন্ন মস্তিষ্কের বা মনের পরিণতি হইতে পারে না। কথাটা আরও একটু স্পষ্ট করিয়া আলোচনা করার আবশ্যক। শিশু তাহার নিজের অস্তিত্ব এবং তার অভাব জানিতে পারে, তাহার অনুভব শক্তির সাহায্যে। ত্বক্, মাংসপেশী, এবং সন্ধিসমূহের মধ্যে যে সব অনুভব করা স্নায়ু (sensory nerve) শেষ হইয়াছে, তাহাদের দ্বারা

তাহার মস্তিষ্কে সংবাদ প্রেরিত হইতেছে, এবং এই প্রেরণার সাহায্যেই তাহার শ্বাসপ্রশ্বাস হইতেছে, ক্ষুধা টের পাইয়া আহার্য্য গ্রহণ করিতেছে, মলমূত্রাদি ত্যাগ করিতেছে। রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দাদির অনুভব হয়, চক্ষু জিহ্বা নাসিকা ত্বক্ কর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে; কিন্তু এ সকলের অনুভূতির ক্ষেত্র হইতেছে মস্তিষ্কের বাহির অংশ, যাহাকে গ্রে ম্যাটার্ (grey matter) কহে। অতএব জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে রূপরসাদির প্রেরণার দ্বারা বাহ্য জগতের অস্তিত্ব বিষয়ে জ্ঞান জন্মায়; ও গুলি জ্ঞানের পথ। ইহাদের সাহায্য ব্যতিরেকে জ্ঞানোন্মেষ সম্ভব নহে। মনের পরিণতির জন্য জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উত্তেজনার আবশ্যক। জন্মান্ধ শিশুর মস্তিষ্কের দর্শন-ক্ষেত্রের কোষগুলির পরিণতি হইতে পারে না; কেন না, আলোক-রশ্মির উত্তেজনা সেখানে পৌঁছিতে পারে না। একটা কুক্কুর-শাবক ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাহার চোক দুটি তুলিয়া ফেলিয়া, কিছু দিন পরে তাহার মস্তিষ্কের দর্শন-ক্ষেত্র ও একটা স্বাভাবিক সুস্থ কুকুরছানার মস্তিষ্কের দর্শন-ক্ষেত্রের পরীক্ষা করা হইয়াছিল; পরীক্ষায় দেখা গেল, অন্ধ শাবকটির দর্শন-কেন্দ্রের কোষগুলি সুস্থটির তুলনায় অনেকটা ক্ষুদ্রাকার ও অপরিণত। অতএব মস্তিষ্কের কোষের পরিণতি ও বৃদ্ধির জন্য উত্তেজনার একান্ত আবশ্যক।

নিদ্রা ও মানসিক পরিণতি।

মস্তিষ্কের পরিণতি ও সুচারুভাবে তাহার কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য নিদ্রার একান্ত আবশ্যক। নিদ্রাকালে সমস্ত শরীরেরই বিশ্রাম ও শান্তি হয় বটে, কিন্তু মস্তিষ্কের যে অংশটি চৈতন্যের আধার (Cortex of the brain) তাহার যতটা বিশ্রাম হয়, এমন শরীরের আর কোন অংশের নহে। এ সময় মস্তিষ্ক তাহার ক্ষয়পূরণ করে এবং শক্তি সংগ্রহ করিয়া লয়। অতিশয় স্নায়বীয় উত্তেজনার লক্ষণই হইতেছে অনিদ্রা। অনিদ্রা মানসিক অবসাদ এবং স্নায়বীয় অবসন্নতার কারণও বটে, ফলও বটে। অন্ধকার ও নীরবতা অনুকূল অবস্থা মনে করিতে হইবে। চুপ করিয়া শুইয়া থাকা, নড়াচড়া না করাও নিদ্রাকর্ষণের কার্য্যে সহায়তা করিয়া থাকে। শিশুরা যেখানে ঘুমায়, সেখানে গোলমাল করা, কি শব্দ করা অত্যন্ত অন্যায়। ইহাতে তাহাদের সুনিদ্রার বিঘ্ন হয়। মস্তিষ্কের উপযুক্ত পরিমাণ বিশ্রাম ঘটিতে না দিলে মানসিক শক্তি জন্মাইতে পারে না। স্তন্যপায়ী শিশু ও বালকবালিকাদের ঘুমের মাত্রা বেশী হওয়ার দরকার। রোগকালে অন্য সময়ের অনেক বেশি নিদ্রার আবশ্যক।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচি।

নব্যজার্ম্মাণির শ্রম-শিল্প

বর্ত্তমান জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের বয়স এই সবে মাত্র ৫০ পঞ্চাশ বৎসর হইয়াছে; কিন্তু তথাপি এই অত্যল্পকালের মধ্যেই শ্রম-শিল্পে উহা যেরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছে, তাহা ভাবিলে বাস্তবিকই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। "জার্ম্মাণ শিল্পের উন্নতি ও তাহার কারণ" নামক গ্রন্থের প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ মিঃ ই ডি হাউয়ার্ড (E. D. Howard) বলেন যে, জার্ম্মাণগণ প্রথমাবস্থাতেই বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য লালায়িত না হইয়া, যাহাতে দেশের অভাব দেশ হইতেই মোচন করা যায়, তদ্বিষয়ে সবিশেষ

মনোযোগী হইয়াছিল, এবং এই "স্বদেশীই" শ্রমশিল্প-বিষয়ে তাহাদের সর্ব্ববিধ ভাবী উন্নতির মূল কারণ। ১৮৮০ খৃঃ অব্দে জার্ম্মাণির খনিসমূহ হইতে যে লৌহ উত্তোলিত হইয়াছিল, দশ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৯০ খৃঃ অব্দে তদপেক্ষা প্রায় ৫৫½ লক্ষ টন (১টন=২৭ মণ) অধিক লৌহ উত্তোলিত হইয়াছিল। শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয় যে, ইহার দুই তৃতীয়াংশেরও অধিক লৌহ জার্ম্মাণির চতুঃসীমা মধ্যেই ব্যবহৃত হইয়াছিল। উক্ত গ্রন্থ হইতে আরও জানা যায় যে রাসায়নিক শিল্পসম্বন্ধেও জার্ম্মাণি ঠিক এই নীতিরই অনুসরণ করিয়াছিল। জার্ম্মাণি আগে নিজের ঘর সামলাইয়া তবে অন্যের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছে।

যাহাতে যতদূর সম্ভব সস্তায় জিনিস তৈয়ারী হইতে পারে তাহার ব্যবস্থাকল্পেই জার্ম্মাণি সর্ব্বপ্রথমে যত্নশীল হইয়াছিল। ইহার কারণ এই যে, অত্যধিক সস্তায় জিনিস পাইলে জার্ম্মাণির জনসাধারণ আর বিদেশী দ্রব্য উচ্চ-মূল্যে কিনিবে না, সুতরাং ক্রমে ক্রমে বিদেশী দ্রব্য জার্ম্মাণি হইতে দূরীভূত হইবে এবং সস্তা দেশীয় জিনিস তাহার স্থান অধিকার করিবে। ফলতঃ, কার্য্যেও ঠিক তাহাই হইল—জার্ম্মাণির বাজার হইতে অনেক বিদেশী পণ্য নিষ্কাশিত হইল। বলাই বাহুল্য, উৎপন্ন দ্রব্যের উৎকর্ষাপকর্ষের প্রতি কোনও দৃষ্টি না রাখাতে প্রথমাবস্থায় প্রস্তুত শিল্পদ্রব্যসমূহ অত্যন্ত নিকৃষ্টই হইতে লাগিল। আজকাল যেমন জাপানে তৈয়ারী বলিলেই আমাদের একটা ধারণা হয় যে উহা সস্তা বটে, কিন্তু উৎকৃষ্ট নহে, তখন জার্ম্মাণির জিনিসের প্রতিও লোকের অনেকটা এইরূপ ধারণাই ছিল; এমন কি ১৮৭৩ সালে ফিলাডেলফিয়া সহরে আমেরিকার স্বাধীনতালাভের শততম বার্ষিকোৎসব উপলক্ষে স্বয়ং জার্ম্মাণ প্রতিনিধিই "সস্তা অথচ নোংড়া" (Cheap and nasty) বলিয়া জার্ম্মাণ শিল্পের নিন্দা করিয়াছিলেন। প্রথমাবস্থায় জার্ম্মাণ শিল্প-দ্রব্যের এরূপ নিকৃষ্ট হইবার আরও একটী কারণ ছিল। প্রথম প্রথম শিল্পবিষয়ে জার্ম্মাণিকে ইংলণ্ডের উৎকৃষ্টতর জিনিসেরই অনুকরণ করিতে হইত; ইহা ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না। দীর্ঘকাল হাতে কলমে কাজ করিয়া ইংলণ্ড যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিল, জার্ম্মাণির পক্ষে তাহা একদিনেই লাভ করা সম্ভবপর হয় নাই; সুতরাং যাহা তাহাদের পক্ষে তৎকালে সাধ্যায়ত্ত ছিল, সেই দিকেই, অর্থাৎ সস্তায় জিনিস প্রস্তুতকরণ বিষয়েই তাহারা প্রথমে মনঃসংযোগ করিল ও অভিজ্ঞতাও ক্রমে ক্রমে জন্মিল।

এইরূপ অত্যধিক সস্তায় জিনিস প্রস্তুত হওয়াতে জার্ম্মাণীর প্রাচীন হস্তশিল্পগুলি ক্রমে ক্রমে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু উপায় ছিল না। জার্ম্মাণি স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিল যে, কলকারখানার সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া জার্ম্মাণ হস্তশিল্পের পক্ষে দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুতরাং তাহার বিনাশ সাধন করিয়াও জার্ম্মাণি ইংলণ্ডের অনুকরণে দেশে কল-কারখানার প্রচলন করিতে বাধ্য হইল। এখন হিসাব করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে ইহাতে জার্ম্মাণির যথেষ্ট ইষ্ট ব্যতীত কিছুমাত্র অনিষ্ট হয় নাই।

জার্ম্মাণ শিল্পের উন্নতির দ্বিতীয় কারণ, দেশের সর্ব্বত্র রেলপথের বিস্তার। ১৮৬০ সালে সমগ্র জার্ম্মাণিতে যত মাইল রেল লাইন ছিল, গ্রেট ব্রিটেনে তাহার দ্বিগুণ ছিল;

কিন্তু ১৮৯৭ সালে এই অনুপাত ঠিক উল্‌টা দাঁড়ায়;—অর্থাৎ ৪০ বৎসরের মধ্যে জার্ম্মাণিতে প্রায় ৪ গুণ রেল পথ নির্ম্মিত হয়। ২১টী ক্ষুদ্র ও অতি অপ্রয়োজনীয় রেললাইন ছাড়া জার্ম্মাণীর সমুদয় রেললাইনই সরকার অর্থাৎ সাম্রাজ্যান্তর্গত ষ্টেটসমূহের দ্বারা পরিচালিত—সরকারই উহার লাভ লোকসানের ভাগী। ইহাতে একটী মহালাভ এই হইয়াছে যে শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিকল্পে যখনই রেলপথ-নির্ম্মাণের এবং মাশুলাদি কমাইবার দরকার হয়, তাহা তখনই করা হইয়া থাকে। এ জন্য গবর্ণমেণ্টকে সময়ে সময়ে যথেষ্ট কর্জ্জ করিতে হয় বটে, কিন্তু এতদ্দ্বারা পরিণামে যে লাভ হইয়া থাকে, তাহার তুলনায় এই কর্জ্জ কিছুই নহে। জার্ম্মাণির রেললাইনগুলি সম্রাটের হস্তে ও তত্ত্বাবধানে লওয়াই জার্ম্মাণসাম্রাজ্যের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বিস্‌মার্কের মতলব ছিল; কিন্তু সাম্রাজ্যান্তর্গত ষ্টেটসমূহ একবাক্যে ইহার প্রতিবাদ করাতে বিস্‌মার্কের উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ফ্রাঙ্কোপ্রুশীয় যুদ্ধের পর প্রুসিয়া ষ্টেটেই সর্ব্বপ্রথমে তদন্তর্গত রেলপথসমূহ নিজ হস্তে গ্রহণ করে; এবং ইহাতে উহার অত্যধিক লাভ হওয়াতে অন্যান্য ষ্টেটও ক্রমে ক্রমে ঐ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়াছে।

রেলপথের বিস্তার দ্বারা শিল্পবাণিজ্যের যেমন উন্নতি হইয়াছে, দেশের সর্ব্বত্র কৃত্রিম খাল খনন দ্বারাও তদপেক্ষা কম উন্নতি হয় নাই; বর্ত্তমান সময়ে জার্ম্মাণির যাবতীয় নদীই কৃত্রিম খালের দ্বারা পরস্পর সংলগ্ন; বিশেষতঃ, উত্তর জার্ম্মাণির সমতল ক্ষেত্রেই এইরূপ খালের আধিক্য দেখা যায়। বলা বাহুল্য, এ ক্ষেত্রেও জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্টই অগ্রণী ও উদ্যোগী,—গবর্ণমেণ্টের নিজব্যয়ে ও তত্ত্বাবধানেই এই সমস্ত খাল খনিত হইয়াছে। এক্ষণে এতদ্দ্বারা যে মাশুল আদায় হয়, তাহাতে খালখননের খরচা পোষাইয়াও সরকারের যথেষ্ট লাভ হইয়া থাকে। বিগত ১৯১১ সালে প্রায় বিশ হাজার নৌকায় ৮ আট কোটী টন্ পণ্য খাল ও নদী পথে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, যাহাতে জার্ম্মাণির অভাব জার্ম্মাণি হইতেই পূরণ হয়, বিদেশের এক ছটাক জিনিসও জার্ম্মাণির বাজারে বিক্রীত না হয়, তাহার সম্যক ব্যবস্থা করাই জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্টের প্রধান মতলব;—কোনও প্রকার আন্তর্জ্জাতিক পরনির্ভরতায় তাহাদের আদৌ কোন আস্থা নাই। এই জন্য কোনও কারণে তাহাদের শিল্প-বাণিজ্যের কোনও প্রকার আশঙ্কা উপস্থিত হইলে, জার্ম্মাণ জনসাধারণ তখনই তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া থাকে। প্রুশিয় গবর্ণমেণ্ট যখন দেশের সর্ব্বত্র খাল খনন করিতেছিলেন, তখন জার্ম্মাণগণ এই কারণেই ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিল। তাহারা ভাবিয়াছিল যে সর্ব্বত্র এইরূপ খাল খনিত হইলে, এই সমস্ত খালপথে বৈদেশিক পণ্য জার্ম্মাণির সমস্ত বাজার ছাইয়া ফেলিবে। রেলপথ বিস্তারের সময়ও এইরূপ আপত্তি উঠিয়াছিল। কিন্তু পরে এতদুভয়ের উপকারিতা বুঝিতে পারিয়া এক্ষণে তাহারা নীরব হইয়াছে।

রেলপথনির্ম্মাণ ও খালখনন দ্বারা ব্যবসাবাণিজ্যের অভূতপূর্ব্ব সুবিধা হইয়াছে বটে, কিন্তু ফলিত রসায়ন-বিদ্যার উন্নতিতেই জার্ম্মাণ শিল্পের যথার্থ উন্নতি হইয়াছে। টেক্‌নিক্যাল স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের বিজ্ঞানাগার—এই দুইয়ের সমবেত চেষ্টাতেই জার্ম্মাণির বর্ত্তমান শিল্পোন্নতি; এই দুইয়ের উপরেই জার্ম্মাণ রসায়ন-শিল্পের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

কৃত্রিম রং; বিশেষতঃ, কৃত্রিম নীল তৈয়ারীর উপায় উদ্ভাবনই জার্ম্মাণ ব্যবহারিক রসায়নবিদ্যার চূড়ান্ত কীর্ত্তি। মিউনিক্ সহরের সুপ্রসিদ্ধ রসায়ন-বিদ্ পণ্ডিত ডাক্তার বেয়ার (Dr. Bayer) ১৮৯৭ সালে সর্ব্ব প্রথমে কৃত্রিম নীল প্রস্তুত করেন। এই উদ্ভাবনের ফলে জার্ম্মাণ শিল্পজগতে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। ১৮৯৭ সালের পূর্ব্বে জার্ম্মাণি প্রায় দেড় কোটী টাকার বিদেশী উদ্ভিজ্জ নীল আমদানী করিত—কিন্তু এক্ষণে (বর্ত্তমান যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে) বৎসরে ইহার তিন গুণেরও অধিক মূল্যের কৃত্রিম নীল বিদেশে চালান দিয়া থাকে। প্রায় সব কলকারখানাতেই যথেষ্ট পরিমাণ গ্যাস ও পাথুরিয়া কয়লা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এই গ্যাস ও কয়লাপ্রসূত অনেক জিনিসই নিতান্ত "অকেজো" ভাবে পড়িয়া থাকিত। কিন্তু ফলিত রসায়নবিদ্যার অচিন্ত্যপূর্ব্ব উন্নতির ফলে এক্ষণে এই সমস্ত পরিত্যক্ত ও নিতান্ত "অকেজো" জিনিস (Bye-products) হইতে বৎসরে প্রায় ৯ নয় কোটী টাকার কৃত্রিম রং প্রস্তুত হইয়া থাকে।

বিগত ১৯০৯ সালে সমস্ত জার্ম্মাণিতে শুধু রাসায়নিক শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের জন্যই অন্যূন ১৫০টী কোম্পানী ছিল। উহাদের সমবেত মূলধনের পরিমাণ ৩৭½ কোটী টাকার কম হইবে না। এবং ঐ বৎসরে কোম্পানিসমূহের গড়ে শতকরা কুড়ি টাকা লাভ হইয়াছিল।

সাধারণতঃ, রাইন্ ও মেইন্ নদীতীরস্থ ভূভাগেই অধিকাংশ রাসায়নিক শিল্পাগার প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু ইহা ছাড়া অন্যান্য স্থানেও ২৪টী বড় বড় কারখানা আছে। বার্লিন সহরের সুপ্রসিদ্ধ আনিলাইন কোম্পানির (Aniline Company) কারখানায় ৫৫ জন রসায়নবিদ্ পণ্ডিত এবং ২১ জন বিশেষজ্ঞ বা কারিগর (Experts) নিযুক্ত আছেন। লাড্উইগ সাফেনের বাডিশা আনিলাইন ফেব্রিক (Badische Aniline Fabrik) নামক কারখানায় ১৪৮ জন বৈজ্ঞানিক ও ৭৫ জন কারিগর কাজ করিতেছেন। প্রসিদ্ধ এল্বার্ফিল্ড্ ফ্যাক্টরীর বৈজ্ঞানিক ও কারিগরের সংখ্যা যথাক্রমে ১৪৮ ও ১৫০। সারের জন্য ব্যবহৃত পটাসিয়াম্ সল্ট্ বা সোড়ার ব্যবসা জার্ম্মাণির একচেটিয়া বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বৎসরে প্রায় ৯ কোটী টাকার সোড়া জার্ম্মাণি হইতে বিদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত দেশের সর্ব্বত্র যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা থাকাতে খাস জার্ম্মাণির মধ্যেও যথেষ্ট পরিমাণে সোড়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অনেক শিল্পেই জার্ম্মাণি অভূতপূর্ব্ব উন্নতি লাভ করিয়াছে সত্য, কিন্তু লৌহ ও ইস্পাতের উপরেই যে জার্ম্মাণ শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইংলণ্ডের ন্যায় জার্ম্মাণির লৌহ ও কয়লার খনিগুলি পরস্পর সন্নিকটবর্ত্তী নহে বটে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃক রেলপথসমূহ নিজহস্তে গৃহীত হওয়াতে এবং প্রয়োজনানুসারে গবর্ণমেণ্ট রেলের মাশুলাদি যথেষ্ট পরিমাণে কমাইয়া দেওয়াতে ঔপনিবেশিক বাণিজ্যে জার্ম্মাণির লৌহজাত দ্রব্যাদি ইংলণ্ডের সহিত তীব্র প্রতিযোগিতায়ও আত্মপ্রতিষ্ঠাস্থাপনে সমর্থ হইয়াছে।

বর্ত্তমান জার্ম্মাণসাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠার অনতিকালপরেই খনি হইতে সদ্য উত্তোলিত অপরিস্কৃত লৌহ পরিস্কৃতকরণের সুপ্রসিদ্ধ টমাস গিলক্রাইষ্ট (Thomas Gilchrist) প্রথার আবিষ্কার হয়। জার্ম্মাণির লৌহশিল্পে এতাদৃশ উন্নতিলাভের ইহাই অন্যতম মুখ্য কারণ। এই প্রণালী দ্বারা অতি

সহজেই অপরিষ্কৃত লৌহ হইতে ফস্‌ফরাসের ভাগ পৃথক করা যায়।

পূর্ব্বোক্ত ফ্রাঙ্কোপ্রুসিয় যুদ্ধের পরে এবং উহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ "লরেণ" প্রদেশ জার্ম্মাণসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই প্রদেশে বিস্তর কয়লা ও লৌহের খনি আছে; এবং সেগুলি পরস্পর সন্নিকটে অবস্থিত। লরেণ প্রদেশ জার্ম্মাণির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর হইতেই এইখানেই সর্ব্ববিধ লৌহপরিষ্কারকরণের কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে রাইন্ নদীতীরস্থ ওয়েষ্টফেলিয়া প্রদেশে লৌহপরিষ্কারের কারখানা ছিল। কালক্রমে লরেণে কেন্দ্র স্থানান্তরিত হইলেও জলপথে এখনও অনেক লৌহ পরিষ্কারকরণার্থ ওয়েষ্টফেলিয়াতে নীত হইয়া থাকে। কারণ এখানে যথেষ্ট পরিমাণে কোক কয়লা পাওয়া যায়। সাইলেসিয়া প্রদেশেও লৌহপরিষ্কারের কারখানা আছে, কিন্তু সেখানকার কয়লা তত ভাল নহে।

অন্যান্য খনিজ দ্রব্যের মধ্যে পাথুরে লবণ (Rock salt), তাম্র, সীসা, ও দস্তা জার্ম্মাণির প্রায় সর্ব্বত্রই অল্পবিস্তর পাওয়া যায়। বিগত ১৯১০ সালে প্রায় সাড়ে চারি কোটী টাকা মূল্যের রৌপ্য, দস্তা, ও সীসা খনি হইতে উত্তোলিত হইয়াছিল। ঐ বৎসরে প্রায় ৩৭½ লক্ষ টাকার পাথুরে লবণ ও সাড়ে সাত কোটি টাকার পটাসিয়াম্ সল্ট খনি হইতে উত্তোলিত হইয়াছিল।

বৈদ্যুতিক শক্তিচালিত শিল্পের (Electrical Industry) দ্রুত উন্নতিতে জার্ম্মাণির অনেক লৌহই আজকাল দেশমধ্যেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে জার্ম্মাণিতে তাড়িতশক্তিচালিত শিল্পের অস্তিত্বই ছিল না, কিন্তু এক্ষণে ইহাতে অন্যূন ৬০,০০০ হাজার লোক খাটিতেছে, এবং বৎসরে অন্যূন বারো কোটী টাকার বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি বিদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। জার্ম্মাণির প্রায় সকল সহরেই বৈদ্যুতিক ট্রাম গাড়ীর চলন আছে—সুতরাং তজ্জন্যও যথেষ্ট যন্ত্রাদির কাটতি হইয়া থাকে। তাড়িত শক্তির সাহায্যে জার্ম্মাণির কৃষিকার্য্যেরও যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। দেশের অনেক স্থানেই বড় বড় বৈদ্যুতিক কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং এই সমস্ত কেন্দ্র হইতে চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী ক্ষেত্রসমূহে বৈদ্যুতিক আলোক ও তাড়িত-শক্তির সরবরাহ করা হইয়া থাকে।

ইস্পাতনির্ম্মিত জিনিস ও কলকারখানা প্রস্তুত বিষয়ে জার্ম্মাণদের তাদৃশ মৌলিকত্ব পরিলক্ষিত না হইলেও অন্যদেশে আবিষ্কৃত নূতন কলকারখানার হুবহু অনুকরণে জার্ম্মাণদের সমকক্ষ জাতি পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ; পৃথিবীর যেথানেই যাহা আবিষ্কৃত বা নির্ম্মিত হউক না কেন, জার্ম্মাণেরা অতি অল্প সময়ের মধ্যে এবং অসম্ভবরূপ অল্পখরচে তাহার অবিকল নকল করিতে পারে। সুতরাং বৈদেশিক মূল আবিষ্কারক বা নির্ম্মাতার সহিত প্রতিযোগিতাতে জার্ম্মাণেরা সহজেই জয়লাভ করিতে পারে।

বস্ত্রশিল্পে জার্ম্মাণি এখনও অনেক জাতিরই পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। বিগত শতাব্দীতে ইংলণ্ডে যখন নিত্য নূতন কারখানার সৃষ্টি হইতেছিল, তখনও জার্ম্মাণিতে হস্তচালিত তাঁতেরই একাধিপত্য ছিল। সম্প্রতি কলকারখানার যথেষ্ট প্রচলন হইলেও হস্তচালিত তাঁত এখনও সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হয় নাই—১৫।২০ বৎসর পূর্ব্বেও প্রায় এক লক্ষ লোক এই উপায়ে জীবিকার্জ্জন করিত।

হস্তচালিত তাঁতসমূহে সাধারণতঃ রেশম বস্ত্রই নির্ম্মিত হইয়া থাকে। তবে এক্ষণে টেক্‌নিকাল স্কুলসমূহ ক্রমে ক্রমে এই কাজ নিজের হাতে লইতেছে। জার্ম্মাণির মধ্যে স্যাক্‌সনি (Saxony) ষ্টেটই বস্ত্রশিল্পে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত। "টুল" (Tulle) নামক একপ্রকার বস্ত্রের ব্যবসা স্যাক্‌সনির একেবারে একচেটিয়া বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। "Germany for the Germans" নামক গ্রন্থের প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ বেরী সাহেব (R. M. Berry) বলেন যে, বিশবৎসর পূর্ব্বেও স্যাক্‌সনিতে এই টুল কাপড়ের নামগন্ধও ছিল না, কিন্তু এক্ষণে বৎসরে প্রায় তিন কোটী টাকা মূল্যের টুল কাপড় প্রস্তুত হইয়া থাকে। সমগ্র জার্ম্মাণিতে এক বস্ত্রশিল্পেই প্রায় দশলক্ষ লোক খাটিয়া থাকে। ইহার অর্দ্ধেকই স্ত্রীলোক।

১৯০০-১৯০১ সাল জার্ম্মাণ শিল্পের পক্ষে অত্যন্ত দুর্ব্বৎসর ছিল। ক্রমাগত অত্যধিক পরিমাণে জিনিস প্রস্তুত হওয়াতে মহাজনদের হাতে এত অধিক মাল জমিয়া গেল যে, ঐ সালে সমস্ত দ্রব্যের দরই অসম্ভবরূপে কমিয়া গেল। ইহাতে অনেক ব্যবসায়ী একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়ে। তখন ভিন্ন ২ শিল্প ও ব্যবসায়ের মূলধনিগণ (Capitalist) সমবেত হইয়া দেশের নানা স্থানে কেন্দ্রসমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়া যাহাতে প্রয়োজনাতিরিক্ত জিনিস প্রস্তুত হইতে না পারে তাহার ব্যবস্থাকরণে মনোযোগী হয়। এই সমস্ত কেন্দ্রসমিতি সাধারণতঃ "সিণ্ডিকেট" (Syndicate) এবং "কার্টেল" (Cartel) নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে জার্ম্মাণির অধিকাংশ শিল্পই কোন না কোন সিণ্ডিকেট্ বা কার্টেলকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। আমেরিকাতেও এই সিণ্ডিকেটপ্রথার প্রচলন আছে বটে, কিন্তু সেখানকার জনসাধারণ সাধারণতঃ এই প্রথার ঘোরতর বিরোধী। জার্ম্মাণির সোসিয়ালিষ্টগণ সময়ে সময়ে এই প্রথার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু জার্ম্মাণ জনসাধারণ সাধারণতঃ এ বিষয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করে না। এই স্থলে ইহাও বলিয়া রাখা উচিত যে, জার্ম্মাণি ও আমেরিকার সিণ্ডিকেটে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। আমেরিকার সিণ্ডিকেটের মত জার্ম্মাণ সিণ্ডিকেটের "কাচা" ও "পাকা", উভয় প্রকার মালেই একচেটিয়া আধিপত্য নাই—এবং সিণ্ডিকেটের অন্তর্ভুক্ত ভিন্ন ২ কোম্পানি ও কর্পোরেশানসমূহ যথেষ্ট স্বাধীনভাবে ক্ষমতা পরিচালন করিয়া থাকে।

জার্ম্মাণির জনসাধারণ যে সাধারণতঃ কোনও বিষয়েই উচ্চবাচ্য করিতে চাহে না, তাহার আরও অনেক কারণ আছে। জার্ম্মাণির বিদ্যালয়সমূহে সর্ব্ববিষয়ে নিয়মানুবর্ত্তিতা (Discipline) ও রীতিমত শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। দীর্ঘকাল যাবৎ এইরূপ শিক্ষার একটী ফল এই হইয়াছে যে, এই সমস্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত লোক ঠিক কলের মত কাজ করিয়া যাইতে পারে; চিরন্তন প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার কোনও ক্ষমতা তাহাদের আদৌ জন্মে না। নীরবে কর্ত্তৃপক্ষের আদেশপালনই ইহাদের দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হইয়াছে। জার্ম্মাণির বাধ্যতামূলক সামরিক নীতিও এইরূপ স্বভাব-গঠনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। জার্ম্মাণির রাষ্ট্রনীতিও এরূপ যে, তাহাতে কোনও প্রকার ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সুবিধা ও সম্ভাবনা নাই

বলিলেই হয়। জার্ম্মাণ রাষ্ট্রনীতিতে রাজ্যের প্রয়োজন ব্যতীত প্রজাসাধারণের পৃথক ও স্বতন্ত্র কোনও অস্তিত্বের আবশ্যক নাই। কোনও প্রকার ওজর আপত্তি না করিয়া গবর্ণমেণ্টের আদেশপালনই জার্ম্মাণ প্রজাবৃন্দের একমাত্র কর্ত্তব্য, এবং এইরূপ ভাবে আজ্ঞাপালন করিতে করিতে জার্ম্মাণ জনসাধারণের মন হইতে আপনাদের ভিন্ন সত্তার জ্ঞান পর্য্যন্তও তিরোহিত হইয়া গিয়াছে বলিয়াই অনুমান হয়। নিয়ত কলকারখানাতে কাজ করাতে মানুষের চরিত্র অনেক সময়ে এইরূপই হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত হাওয়ার্ড সাহেব সত্য সত্যই বলিয়াছেন যে, জার্ম্মাণ সামরিক নীতি দ্বারা জার্ম্মাণ জনসাধারণ যে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে,, মূলধনব্যবসায়িগণ আপনাদের উপযোগী তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর অন্য কোনও প্রকার শিক্ষা ব্যবস্থার আশাও করিতে পারেন না।

ইংরাজেরা বলিয়া থাকে যে, জার্ম্মাণির সিণ্ডিকেট-সমূহ বিদেশে খুব সস্তাদরে মাল বিক্রয় করে, কিন্তু খাস জার্ম্মাণির বাজারে জার্ম্মাণ পণ্য অতি উচ্চমূল্যে বিক্রীত হয়; অর্থাৎ স্বদেশের বাজারের সমতা রক্ষার জন্য জার্ম্মাণ সিণ্ডিকেট অনেক সময়েই লোকসান্ দিয়াও বিদেশের বাজারে জার্ম্মাণ জিনিস ছাড়িয়া দিয়া থাকে। ইহাতে বৈদেশিকগণের লাভ হয় বটে, কিন্তু জার্ম্মাণির জনসাধারণের বিশেষ কষ্ট হইয়া থাকে। এই অভিযোগ অনেকাংশে সত্য সন্দেহ নাই; কিন্তু এ বিষয়ে জার্ম্মাণদের একটী গভীর উদ্দেশ্য আছে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, জার্ম্মাণ সিণ্ডিকেটসমূহই সাধারণতঃ উৎপাদিত জিনিসের পরিমাণ নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়া থাকে। ইহাতে এক দিকে যেমন বাজারদরের সমতা রক্ষিত হয়, পক্ষান্তরে সেইরূপ মুটেমজুরদিগকেও কোন সময়েই কাজের অভাবে নিতান্ত বেকারভাবে বসিয়া থাকিতে হয় না। সিণ্ডিকেটপ্রথার আর একটী গুণ এই যে, এতদ্দ্বারা মুটেমজুর ও কর্ম্মচারীবৃন্দের তত্ত্বাবধানকার্য্য অতি সুন্দররূপে পরিচালিত হইয়া থাকে। বড় বড় প্রতিষ্ঠান দ্বারা এই সমস্ত কার্য্য যেরূপ সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতে পারে, ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান দ্বারা কখনই সেরূপ হইতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ সুপ্রসিদ্ধ ক্রুপ্ কোম্পানির উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সুবিশাল কোম্পানি উহার মুটেমজুর ও কর্ম্মচারিগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য, আহার-বাসস্থান, আমোদপ্রমোদ ও পেন্‌সন্ প্রভৃতির যেরূপ সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছে, গবর্ণমেণ্টের প্রণীত আইনেও সেরূপ ব্যবস্থা নাই।

জার্ম্মাণিতে আজকাল ছোট ছোট কোম্পানির পরিবর্ত্তে বড় বড় কোম্পানির সংখ্যাই অতি দ্রুত বাড়িয়া যাইতেছে; ব্যক্তিগত ব্যবসায়প্রথার পরিবর্ত্তে কোম্পানিমূলক ব্যবসায়েরই অধিক চলন হইতেছে। এই অভিনব ব্যবসা-প্রথার বিরুদ্ধে মুটেমজুর ও কর্ম্মচারিদের যে ২।৪টী দল না আছে, তাহা নহে। তন্মধ্যে "সোসিয়াল্ ডিমোক্রেসীর" (Social Democracy) নামই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু অন্যান্য দেশে সোসিয়ালিষ্টগণ যেরূপ ক্ষমতাপন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, জার্ম্মাণিতে এখনও ইহারা তাদৃশ শক্তিশালী হইতে পারে নাই। প্রচলিত সামাজিক বিধিব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধনই এই দলের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়াতে অনেকেই এই দলে যোগদান করিতে সাহসী হয় না। তবে রাইক্‌ষ্ট্যাগ্ বা জার্ম্মাণ পার্লামেণ্টে সোসিয়ালিষ্টগণ ধীরে ধীরে শক্তি লাভ করিতেছে। সোসিয়াল

ডিমক্রেসী হইতে সম্প্রতি "দক্ষিণ জার্ম্মাণ সংস্কারক" (South German Revesionist) নামক একটী নূতন দলের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহারা সোসিয়ালিষ্টদের মত ততটা বিপ্লববাদী নহে; সুতরাং ইহার সভ্য-সংখ্যা শীঘ্র বৃদ্ধি হওয়াই সম্ভবপর।

এতদ্ব্যতীত খৃষ্টান্ ইউনিয়ান্ (Christian Union) এবং হার্সডান্কার্ ইউনিয়ান্ (Hirsch-Duncker Union) নাম আরও দুইটী শ্রমজীবিসমিতি আছে। সোসিয়াল ডিমক্র্যাটেরা বলে যে, রাজা বা রাজপুরুষদের সঙ্গে ধর্ম্ম বা ঈশ্বরের কোনও সম্পর্ক নাই। কিন্তু ইহারা এই মতের পোষকতা করে না। খৃষ্টান ইউনিয়ানের সভ্য সংখ্যা সাড়ে তিন লক্ষের কম হইবে না। হার্সডান্কার ইউনিয়ানের সভ্যসংখ্যাও প্রায় ১,১০,০০০। ইহারা কোনও প্রকার রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করা সঙ্গত মনে করে না। এই সমিতির সভ্যসংখ্যা খুব বেশী না হইলেও উচ্চশ্রেণীর ও শিক্ষিত শ্রমজীবিগণই সাধারণতঃ ইহার সভ্য। এতদ্ব্যতীত, ছোট বড় আরও কয়েকটী শ্রমজীবি সমিতি আছে।

বিগত ১৯১১ সালে প্রাগুক্ত শ্রমজীবি সমিতিসমূহের সভ্যসংখ্যা ৩, ৭৯১, ৬৬৫ জন ছিল এবং উহাদের সম্মিলিত মূলধনের পরিমাণ প্রায় ৬ কোটী টাকা।

যেখানেই মূলধন ও মজুরীর মধ্যে সংঘর্ষ, সেইখানেই শ্রমজীবিদের পক্ষে ধর্ম্মঘট করা অবশ্যম্ভাবী। জার্ম্মাণিতেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই! বিগত ১৯১১ সালে সমগ্র জার্ম্মাণিতে প্রায় ১০,০০০ হাজার কারখানায় ২,৫৬৬টী ধর্ম্মঘট হইয়াছিল এবং তাহাতে প্রায় ৬ লক্ষ শ্রমজীবী যোগদান করিয়াছিল। অন্যান্য দেশে শ্রমজীবিগণ দলবদ্ধ হইয়া যাহাতে নিয়োগকর্ত্তাদিগের অনিষ্ট করিতে না পারে, তজ্জন্য তাহাদের বিশেষ বিশেষ সমিতি আছে। জার্ম্মাণীতেও এইরূপ কয়েকটী সমিতি সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; কিন্তু ইহাদের ফলাফল এখনও ভালরূপে জানা যায় নাই। (১)

শ্রীমন্মথনাথ মজুমদার।

বিক্রমপুরের গঙ্গাযাত্রা

রত্নকিরীটিনী জনম-ভূমি! তুমি যে স্বনাম-ধন্যা!
"চন্দ্র-পালের" নন্দদুলালী! "বল্লালরাজ"কন্যা!
পণ্ডিত-দ্বিজ-মণ্ডিত তুঁহু ছিল যে উজল অঙ্ক,
নীরব আজি সে উৎসব-রব—মৌন ডমরু-ডঙ্ক!
"দীপঙ্করের" পুণ্যপ্রদীপ নির্ব্বাণ তব কক্ষে,
সুন্দর শত মন্দির মঠ "কীর্ত্তিনাশার" বক্ষে!
নাহি সে "নব-পঞ্চরতন", নাহি সে "বল্লভ-রাজ",
নাহি সে "শুক-কৃষ্ণসাগর"—সে "রাজনগর" আজ!
"চাঁদ-কেদার"-কীর্ত্তি-কাহিনী, গৌড়-গৌরব-গাথা,
বীর-রমণী "সোনামণি" কই? "ইসা খাঁ", "আদম" কোথা?
অনল-কুণ্ডে আত্ম-আহুতি!—বল্লাল-বল্লভা কই?
"রামপাল" আজি স্মৃতির শ্মশান—সতীত্বে মহিমময়ী!
পূর্ব্ব গরিমা খর্ব্ব মা তব—সকলি গিয়াছে খোয়া,
কোথা সে "গজারি"—গজের স্তম্ভ! কুলির "কোদাল ধোয়া"?
"বর্ম্ম ভৌমিক"—হুবহু অলীক! মৌলিক-"বসুর" বাচা!
"নদীয়ায় নববিক্রমোদ্ভব"—ধন্য "অর্ণব-প্রাচ্য!"

শ্রীকুলচন্দ্র দে।

---

(১) বর্ত্তমান যুদ্ধারম্ভ হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী বিবরণ হইতে বর্ত্তমান প্রবন্ধ সংকলিত হইল। কারণ, জার্ম্মাণির বর্ত্তমান আভ্যন্তরীণ অবস্থার সঠিক বিবরণ এক্ষণে পাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।—লেখক।

প্রতিজ্ঞা যৌগন্ধরায়ণ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

যৌগ। থামুন, থামুন, আপনি না বল্লেন এখান থেকে এক ক্রোশ দূরে মল্লিকালতায় ঢাকা নখদন্ত ছাড়া একটা নীল হাতী আমি দেখেছি, পদাতি এই কথা বলেছিল?

হংস। হাঁ, আর্য্য ঠিকই ধরেছেন। সাবধান ব্যক্তির বিপদ ঘটল।

যৌগ। সাবধান হলে কি হবে! দৈব অনিবার্য্য!

হংস। সেই নৃশংসকে একশত স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দিয়ে মহারাজ বল্লেন, "আমি হস্তিবিদ্যা জানি। শাস্ত্রে আছে, যে হাতীর শরীরের রং নীল পদ্মের মত, সেই হাতী চক্রবর্ত্তী লক্ষণযুক্ত। সুতরাং এই হস্তিযূথ ধরবার জন্য তোমরা সাবধান হও। আর আমি মাত্র বীণা বাজিয়ে ঐ হাতীটি ধরে আনব।"

যৌগ। রুমণ্বান কি ক'রে মহারাজকে ছেড়ে দিলেন?

হংস। না, রুমণ্বান মহারাজকে ছেড়ে দেন নি। তিনি অনুনয় করে মহারাজকে বল্লেন, মহারাজ ঐরাবত প্রভৃতি দিগ্‌গজ ধরা সম্ভব নয়। বিশেষতঃ এত বড় হাতী ধরে রাখা শক্ত, সুতরাং এতে বিপদের সম্ভাবনা আছে। সীমান্তদেশের লোকও ভাল নয়; তাই বলি, এই যূথের কাছে মাত্র পদাতি রেখে সকলেই আপনার সঙ্গে যাব। মহারাজের একাকী যাওয়া উচিত নয়।"

যৌগ। সকলের সামনেই রুমণ্বান মহারাজকে এই কথা বলেছিলেন? এরূপ রাজভক্তি বাস্তবিকই প্রশংসনীয়; তার পর?

হংস। তার পর, 'আমার শপথ' বলে রুমণ্বানকে নিবারণ করে, নীলবলাহক হাতী থেকে নেমে সুন্দর পাটল ঘোড়ায় চ'ড়ে মাত্র কুড়িজন পদাতিক সঙ্গে নিয়ে মহারাজ চলে গেলেন। তখন সূর্য্য অর্দ্ধেকও উঠে নি।

যৌগ। মহারাজের মঙ্গল হ'ক। হায়! হাতীর অনুরাগের জন্য পূর্ব্ব বৃত্তান্ত মহারাজ একটুও ভাবলেন না।

হংস। তার পর দ্বিগুণ পথ চলে শালগাছের ছায়ায় একশত ধনু দূর থেকে মহারাজ সেই দিব্বি হাতীটার মূর্ত্তি দেখতে পেলেন। তিনি হাতী দেখলেন না, মাত্র দাঁত দুটা দেখেই বুঝলেন যে সেখানে হাতী আছে। শালগাছে হাতীটা ঢাকা ছিল ব'লে তার শরীরের নীল জ্যোতিঃ গাছের রঙ্গের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল; কাজেই হাতী দেখা যায় নি।

যৌগ। হংসক ঠাকুর, হাতী নয়, আমাদের বিপদ দেখলেন একথা বলুন্ না।

হংস। তারপর, মহারাজ ঘোড়া থেকে নেবে দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করে হাতে বীণা নিলেন। তারপর, এক মহান্ বীণার শব্দ শোনা গেল। শব্দ শুনে বোধ হল যেন কার্য্যসিদ্ধি বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।

যৌগ। বীণার শব্দ! তার পর।

হংসক। এই শব্দ মহারাজের বীণার বুঝতে পেরে আমরা অগ্রসর হয়ে একত্র হলেম। আর মহারাজ সেই কৃত্রিম হাতীটার কাছে গেলেন। সেটার ভিতরে খুব ভাল অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে অনেক যোদ্ধা লুকিয়ে ছিল।

যৌগ। তার পর?

হংসক। তার পর, নাম গোত্র উল্লেখ করে মহারাজ আত্মীয়গণকে ডাকতে লাগলেন, বল্‌লেন, এটা প্রদ্যোতেরই ছল। তোমরা আমার পিছনে এস। আমি পরাক্রম দেখিয়ে শত্রুর এই ছল নষ্ট করে দেব। এইরূপ বলতে বলতে মহারাজ শত্রুসৈন্যের মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

যৌগ। ঢুকে পড়লেন! হাঁ, মহারাজের উপযুক্ত কাজই কর্‌লেন, মানীব্যক্তি বঞ্চিত হ'লে লজ্জিত হয়ে শক্তিরই প্রয়োগ করে থাকেন। কৃতনিশ্চয় শূরের নিকট আর কি আশা করা যেতে পারে! তার পর?

হংস। তার পর, সুন্দর পাটলে চড়ে মহারাজ অনেককে

আঘাত কল্লেন। এক জনকে আঘাত করা তাঁর ইচ্ছা ছিল না। সুন্দর পাটল মহারাজের মনের ভাব বুঝতে পেরে তাঁকে নিয়ে শত্রুর মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলে; মহারাজ যেন ক্রীড়া কচ্ছেন এরূপ ভাবে শত্রুকে প্রহার কর্ত্তে লাগলেন। কিন্তু শত্রুসেনা অনেক—মহারাজা একাকী অনেকক্ষণ যুদ্ধ কল্লেন, তাঁর সঙ্গী সমস্ত নষ্ট হয়ে গেল। তথাপি মহারাজ আত্মরক্ষা কত্তে লাগলেন। আমিও আত্মরক্ষা কত্তে সাহায্য করতে লাগলাম। পরে অনবরত যুদ্ধ করে, শরীরের বহু স্থানে আহত হয়ে ঘোড়াটি মরে যাওয়ায়, দারুণ রৌদ্রে মহারাজ মূর্চ্ছিত হলেন!

যৌগ! কি! মহারাজ মূর্চ্ছিত হলেন! তার পর?

হংসক। তারপর, পাশের জঙ্গল থেকে কর্কশ লতা তুলে—এদের নামও বলতে পারি না—দুষ্টেরা মহারাজকে সাধারণ লোকের মত প্রহার কল্লে।

যৌগ। কি মহারাজকে প্রহার কল্লে!

যাঁর কাঁধ দুটি স্থূল, হাতীর শুঁড়ের মত যাঁর হাতের আঙ্গুলের পর্ব্বগুলি বড় বড়, যে হাতে চাপ আস্ফালন করে তিনি বহু দূরে শর নিক্ষেপ কত্তে পারেন; যে হাতে তিনি বিপ্রগণের অর্চ্চনা করেন, সাধু ব্যক্তি ও উপকারী সুহৃদগণকে আলিঙ্গন করেন, সেই হাতের বলয় স্থানে শত্রুরা বাঁধলে? হংসক ঠাকুর, মহারাজের মূর্চ্ছা ভাঙ্গল কখন?

হংস। পাপিষ্ঠদের গর্ব্ব খর্ব্ব হলে পর।

যৌগ। পাপিষ্ঠেরা মহারাজের দেহ মাত্রই ধর্ষণ কত্তে পেরেছে, তেজ নষ্ট কত্তে পারে নি—এটাই ত আমাদের সৌভাগ্য; তার পর।

হংস। তারপরে, মহারাজের চৈতন্য হলে পাপিষ্ঠদের কেহ বল্লে, "ইনি আমাদের ভাইকে মেরেছেন", কেহ বল্লে "ইনি আমাদের পিতাকে মেরেছেন', আবার কেহ বল্লে 'ইনি আমাদের বন্ধুকে মেরেছেন," এরূপ ভাবে মহারাজের পরাক্রম বর্ণনা কত্তে কত্তে পাপিষ্ঠেরা পালিয়ে গেল।

যৌগ। তার পর।

হংস। আর একটা বড় আশ্চর্য্য কথা। একটা লোক একটা দুষ্কার্য্য কত্তে উদ্যত হয়েছিল। লোকটা ডান দিকে ফিরে কিছু না বলে মহারাজের চুল ধরে টানলে। যুদ্ধ করেছিলেন বলে মহারাজের চুলগুলি আলুথালু হয়েছিল। তারপর খুব জোরে মারবার জন্য লোকটা তরোয়াল তুললে।

যৌগ। হংসক ঠাকুর, একটু থামুন—আমাকে একটু গভীর শ্বাস নিতে দিন।

হংস। তারপরে সেই নৃশংস রক্তস্রোতে পিচ্ছিল ভূমিতে পা পিছলে পড়ে গিয়ে আর তার চেষ্টা কার্য্যে পরিণত কত্তে পারে নি।

যৌগ। সেই পাপিষ্ঠ পড়ে গেল!

শত্রুর ব্যূহে যে পৃথিবী আক্রান্ত হয় না, যে পৃথিবী অধর্ম্ম হ'তে বিমুক্ত, যে পৃথিবী সর্ব্বদাই রক্ষিত, সেই পৃথিবীই বিপন্ন মহারাজকে রক্ষা কল্লে।

হংস। তারপর, মহারাজের কুম্ভপ্রহারের প্রথমে মূর্চ্ছিত প্রদ্যোতের অমাত্য শালঙ্কায়ন 'অকার্য্য করো না' 'অকার্য্য করো না' বলে সেইখানে এসে উপস্থিত হলেন।

যৌগ। তার পর?

হংস। তারপর, প্রণাম করে, শালঙ্কায়ন মহারাজের বন্ধন মোচন করে দিলেন। অবশ্য তখন এই রূপ প্রণাম দুর্লভ।

যৌগ। মহারাজ মুক্ত হলেন! শালঙ্কায়ন, তুমি বাস্তবিকই সাধু। অবস্থায় শত্রুও সুহৃদ হয়। হংসক ঠাকুর, আমার মন এখন বিপদ থেকে কিঞ্চিৎ মুক্ত হল মনে কচ্ছি। সেই সাধু ব্যক্তি তার পর কি কল্লেন?

হংস। তারপর, আর্য্য, শালঙ্কায়ন শিষ্টাচারের সঙ্গে মহারাজকে সান্ত্বনা করে, বহুস্থানে গুরুতর আঘাত পেয়েছেন

ব'লে বাহন ও আসনে যেতে অসমর্থ বলে 'বদ্ধশয়নে' শুইয়ে তাঁকে উজ্জয়িনীতে নিয়ে গেল।

যৌগ। বটে, মহারাজকে উজ্জয়িনীতে নিয়ে গেল! এইরূপেই বিপদ ঘটল! এই পরাজয়েও যে রাজা এরূপ ব্যবহার পেলেন, এটা আমাদের আশাতীত। প্রদ্যোতের বুদ্ধিকৌশলে মহারাজ বিপন্ন হলেন। যিনি পূর্ব্বে তাঁহাকে (প্রদ্যোতকে) গ্রাহ্য করেন নি, কিরূপে এখন্ তাঁকে দেখবেন্! যিনি সর্ব্বদা সিদ্ধবাক্য, তিনি কিরূপে বীরের প্রতি ব্যবহারে অযোগ্য বাক্য শ্রবণ করবেন্! তিনি এখন নিষ্ফলভাবে কিরূপে ক্রোধ সহ্য করবেন! আর কারারুদ্ধ থেকে শিষ্টাচারই প্রাপ্ত হন বা অশিষ্টাচারই প্রাপ্ত হন, কিরূপে (প্রদ্যোতের) অধীন্ হ'য়ে থাকবেন?

প্রতীহারীর প্রবেশ

প্রতী। আর্য্য, এই প্রতিসরা এনেছি।

যৌগ। সময় থাকতে এগুলি এল না। দুর্ভাগ্যের সময় চেষ্টা নিষ্ফল হয়ে থাকে। রণ শেষ হয়ে গেলে অশ্ব প্রভৃতির নীরাজনা ও কৌতুক মঙ্গল করে লাভ কি?

প্রতী। আর্য্য, এই যে প্রতিসরা।

যৌগ। বিজয়ে, রেখে দাও।

প্রতী। মহারাণীকে (মহারাজের মাতা) কি বলব?

যৌগ। বিজয়ে. এই কথা বলো।

প্রতী। কি?

যৌগ। এই কথা।

প্রতী। বলুন, আর্য্য, বলুন।

যৌগ। না, না বলে পারা যাবে না। মহারাণীকে বলতে হবে। বিজয়ে, যদি শুনবে তবে হৃদয় স্থির কর। (কাণে কাণে বলিলেন) এই কথা।

প্রতী। হা হা।

যৌগ। বিজয়ে, তুমি বিজয়া হও।

প্রতী। হায়। হতভাগিনী আমি—আমাকে ত যেতে হবেই।

যৌগ। বিজয়ে! মহারাজ বন্দী হয়েছেন, হঠাৎ মহারাণীকে একথা বলো না। মায়ের মন স্নেহদুর্ব্বল। এই হৃদয় রক্ষা কত্তে হবে।

প্রতী। কি বলব এখন?

যৌগ। শুন—

প্রথমতঃ, যুদ্ধে সর্ব্বদা যে সকল বিপদ ঘটে থাকে, তা বর্ণনা করবে। তার পর যুদ্ধে হত ব্যক্তির কথা বলবে; তার পরে অভীষ্ট নষ্ট হয়েছে এরূপ আভাস দিবে। পরে যখন মনে শোক উৎপন্ন হবে তখন তোমার বর্ণনার বিষয় বলবে।

প্রতী। হাঁ, বুঝলুম। (প্রস্থান)

যৌগ। হংসক, তুমি মহারাজের সঙ্গে গেলেনা কেন?

হংস। আর্য্য, আমি নিজকে কৃতার্থ করার জন্য চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু শালঙ্কায়ন আমাকে কৌশাম্বীতে এসে এই বৃত্তান্ত বলার জন্য পাঠিয়ে দিলেন।

যৌগ। তবে কি তোমাকে সঙ্গে যেতে না দেওয়ার জন্য এরূপ বল্লেন, অথবা আত্মীয়লোক যাতে সঙ্গে যেতে না পারে তজ্জন্যই এরূপ কল্লেন।

হংস। হাঁ, তাই হবে।

যৌগ। তবে কি সালঙ্কায়ন তোমার ভাব দেখে বিস্মিত হয়ে এ কথা বল্লেন, না, নিজের কার্য্যসিদ্ধির সুবিধার জন্য একথা বল্লেন? আচ্ছা, মহারাজ আমাকে কিছু বলে পাঠান নি?

হংস। হা, আর্য্য,বলেছেন। জলভরা চোখে মহারাজকে প্রদক্ষিণ করে যখন আমি বিদায় চাই, তখন তাঁর যেন অনেক কথা বলবার ছিল বোধ হল। তিনি বললেন, যাও, যৌগন্ধ –

যৌগ। হংস, স্বচ্ছন্দে বল—তুমি মহারাজার কথাই বলছ।

হংস। যৌগন্ধরায়ণের সঙ্গে দেখা করো।

যৌগ। এমন কথা! আর অন্য কোন মন্ত্রীর নাম না করে, কেবল বলুলেন—যৌগন্ধরায়ণের সঙ্গে দেখা করবে!

হংস। হাঁ, আর্য্য।

যৌগ। আমিও কোনও প্রতিকার কত্তে পারি নি, রাজার অন্ন খেয়েছি, তার ঋণও শোধ কত্তে পারি নি, রাজার কাছে যে উপকার পেয়েছি, তারও প্রতিকার করি নি; মহারাজ আমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে বল্লেন্!

হংসক। হাঁ, মন্ত্রী মহাশয়।

যৌগ। আচ্ছা, মহারাজ আমাকে ছদ্মবেশে দেখতে পাবেন।

শত্রুর নগরেই হউক, কারাগারেই হউক বা বনেই হউক প্রাণ দিয়েও আমি শত্রুরাজার প্রাণসংহার করব। আর যে রাজা মনে কচ্ছেন, "আমি আমার শত্রুকে জয় করেছি", তাঁকে প্রতারিত করে যদি পুনরায় আমাদের রাজাকে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত কত্তে পারি, তা'হলেই আমার শ্লাঘা!

(নেপথ্যে)

হা মহারাজ! হা মহারাজ!

যৌগ। (এই আর্ত্ত কণ্ঠ বলে দিচ্ছে) যথাশক্তি শোকের প্রতিকার কত্তে হবে। আর স্ত্রীলোকের এই কাতর কণ্ঠ মন্ত্রীদের অক্ষমতাও প্রকাশ কচ্ছে!

প্রতীহারীর প্রবেশ।

প্রতীহারী। মন্ত্রী মহাশয়, রাজমাতা—

যৌগ। কি! কি!

প্রতী। (রাজমাতা) বল্‌ছেন।

যৌগ। কি (বলছেন)

প্রতী। এত বন্ধুবান্ধব সঙ্গে ছিল, তবু বৎসরাজের এই হল! কিন্তু দৈবের উপর হাত কি? যা হউক, আত্মীয়দিগকে উপযুক্ত সম্মান করে যিনি সঙ্কটে বিষণ্ণ হন না, বিষণ্ণ হয়েও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হন না, প্রবঞ্চিত হলেও যিনি হতাশ্বাস হন না, বিশেষ বিপদের আঘাতেও যিনি প্রাণত্যাগ কত্তে প্রস্তুত হন না, বৎসরাজের সখা এবং মন্ত্রী, সেই বুদ্ধিমান যৌগন্ধরায়ণকে বলো, "হে পুত্র, আমার ছেলেকে এনে দাও।"

যৌগ। রাজমাতা রাজবংশের উপযুক্ত ধীর বাক্যই বলেছেন। আমি অবশ্যই তাঁর সম্মান রাখব। বিজয়া, জল নিয়ে এস ত?

প্রতী। হাঁ, মন্ত্রীমহাশয়। (জল লইয়া পুনঃ প্রবেশ) এই জল এনেছি।

যৌগ। নিয়ে এস। (মুখ ধুইয়া) বিজয়া, মহারাণী কি বলেছেন।

প্রতী। রাজমাতা বলেছেন, "পুত্র, আমার ছেলেকে এনে দাও।"

যৌগ। হংসক, মহারাজ কি বলেছেন?

হংসক। যৌগন্ধরায়ণের সঙ্গে দেখা করো।

যৌগ। বিজয়া, রাহু যেমন চন্দ্রকে গ্রাস করে, মহারাজ যদি সেইরূপ শত্রুর করতলগত হয়ে থাকেন, তা হলেও তাকে মোচন করব। নতুবা আমি যৌগন্ধরায়ণ নই।

প্রতী। হাঁ, আর্য্য। (প্রস্থান)

নির্মুণ্ডকের প্রবেশ

নির্মু। আর্য্য, আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটেছে। মহারাজের শান্তির জন্য ব্রাহ্মণ ভোজন হচ্ছে, তখন উন্মত্ত বেশধারী একজন ব্রাহ্মণ এসে হেসে বল্লে, "আপনারা সকলেই খুব খাবেন। এই রাজবংশের মঙ্গল হবে দেখছি।" এই কথা বলতে বলতেই আবার সেই ব্রাহ্মণ অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

যৌগ। বটে!

ব্রাহ্মণের প্রবেশ

ব্রাহ্মণ। তিনি এই পোষাকগুলিই পরেছিলেন, এবং স্বীয় প্রয়োজনসাধনের উদ্দেশ্যেই এ গুলি ছেড়ে গিয়েছেন! এইগুলি পরেই ভগবান দ্বৈপায়ন এসেছিলেন!

যৌগ। এইরূপেই ভগবান দ্বৈপায়ন এসেছিলেন? বটে!

যৌগ। আচ্ছা, দেখি কেমন পোষাক!

ব্রাহ্মণ। এই দেখুন, মন্ত্রীমহাশয়।

যৌগ। আমার যে চেহারা বদলে গেল দেখছি! বাঃ, মহারাজের কাছে গিয়েই বসেছি! আমাকে উপদেশ দেবার জন্যই এই পোষাকগুলি তিনি ফেলে গিয়েছেন! সেই সাধু উন্মত্তের বেশ ধরেছিলেন। এই পোষাক রাজাকেও মুক্ত করবে, আমার ছদ্মবেশেরও সাহায্য করবে।

প্রতীহারীর প্রবেশ

প্রতী। আর্য্য, রাজমাতা বলেছেন, "আমি আমার পুত্র যৌগন্ধরায়ণকে দেখতে চাই।

যৌগ। এই আমি যাচ্ছি। আপনি শান্তিগৃহে আমার অপেক্ষা করেন গিয়ে।

ব্রাহ্মণ। যে আজ্ঞা (প্রস্থান)

যৌগ। হংসক ঠাকুর, আপনি বিশ্রাম করুন।

হংস। যে আজ্ঞা, মন্ত্রী মশায়। (প্রস্থান)

যৌগ। বিজয়া, তুমি আগে যাও।

প্রতী। যে আজ্ঞা, আর্য্য।

যৌগ। দেখ। কাঠে কাঠে ঘষলে আগুন জ্বলে, মাটি খুঁড়লে জল উঠে। উৎসাহীর কিছুই অসাধ্য নাই। ভাল করে কাজ আরম্ভ করলে অবশ্যই কার্য্যসিদ্ধি হয়ে থাকে।

[প্রস্থান।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

নিরাকুলী ব্রত।

ব্রতের নিয়ম :—শনিবার দিন সন্ধ্যার পর এই পূজা করিতে হয়। বিধবারাও এই ব্রত করিতে পারেন। যে কোন মাসে এই ব্রত করা যায়। ৵১। সোয়া সের চিনি, ১।০ সোয়া বিরা পান, আ-গণা (না গণিয়া) সুপারী, একটী জলঘট, নানা প্রকার ফল ও একখানা পূজার আসন, ব্রতের উপকরণ। আসনটীতে একখানা রঙ্গিন বস্ত্র পাতিয়া তাহাতে ফল ও ফুল দিতে হয়। আসনটীর বাম পার্শ্বে একখানা কলার মাইজে (অবিকশিত কদলীপত্রে) সুপারীগুলি রাখিতে হয়। জলঘটটিতে ৫টী কি ৭টী সিন্দুরের ফোটা দিয়া তারপর ধূপ ও বাতি জ্বালাইয়া একজন ব্রতিনী হাতে দূর্ব্বা লইয়া ব্রতের কথা বলেন, আর অপর ব্রতিনীগণ হাতে দূর্ব্বা লইয়া ব্রতকথা শুনেন। পূজান্তে পূজার প্রসাদ বিতরণ করা হয়। পূজার পানগুলি খাইবার সময় পেচ্‌কি (পানের রসসংমিশ্রিত নিষ্ঠিবন) ফেলা নিষেধ।

এক দেশে এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণদম্পতী বাস করিতেন। ব্রাহ্মণ প্রত্যহ ভিক্ষা করিয়া ৵১ একসের, ৵॥ আধসের যাহা চাউল পাইতেন, তদ্দ্বারা অতি কষ্টে তাঁহাদের জীবন রক্ষা হইত। একদিন ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করিতে যাইয়া সমস্ত দিন চেষ্টা করিয়াও কিছুই পাইলেন না। তখন ব্রাহ্মণ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এখন কি করিয়া খাওয়া যায়! বাড়ী যাইয়া ব্রাহ্মণীকে কি বলিব? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বাড়ী রওয়ানা হইয়াছেন। পথে এক গৃহস্থবাড়ী দেখিতে পাইয়া অতি বিষণ্ণমনে সেই বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে গিয়া দেখেন, তাহারা পূজা করিতেছে। তখন ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন :— "তোম্‌রা কোন্ দেব্‌তার পূজা কর্‌তেছ। এই পূজার ফল কি।" তারা (তাহারা) কইল (কহিল), "আম্‌রা (আমরা) নিরাকুলী ঠাইক্‌রাইনের (ঠাকুরাণীর) পূজা করবার লইছি (করিতেছি)। এই ব্রত কর্‌লে (করিলে) নিধইনার (নির্ধনের) ধন অয় (হয়), নিপুত্রার (অপুত্রকের) পুত্র অয়, যে যা বাঞ্ছা করে, তার তা ফলে।" ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ মনে মনে ভাবিলেন :—"নিরাকুলী ঠাইকরাইন্ যদি আমার দুখ (দুঃখ) দূর করে, তাইলে (তাহা হইলে) আমি এই দেব্‌তার পূজা করুম্ (করিব)।" ব্রাহ্মণ পূজাস্থানে এই প্রকার মানস করিয়া বাড়ী আসিলেন। আসিবার সময় পথিমধ্যে কিছু চাউল পাইলেন। ইহা দ্বারা দুইজনের ক্ষুন্নিবৃত্তি হইল। তৎপরদিন ব্রাহ্মণ

অন্যান্য দিনের মত ভিক্ষায় গেলেন। কিন্তু আজ দেবতার অনুগ্রহে তিনি চাউল, বস্ত্র, টাকা, পয়সা প্রভৃতি অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাইলেন। ব্রাহ্মণ অতি আনন্দিত মনে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া ব্রাহ্মণীকে বলিলেন:—"আমি পূজার হগল (সকল) জিনিসপত্র আইনা (আনিয়া) দেই, তুমি পাড়াপড়শী (পাড়াপ্রতিবেশী) ডাইকা (ডাকিয়া) আইনা (আনিয়া) নিরাকুলী ঠাউকরাইনের পূজা কর।" তখন ব্রাহ্মণী পাড়াপ্রতিবেশী ডাকিয়া আনিয়া পূজা করেন। এই ভাবে প্রত্যেক শনিবারে পূজা করিয়া দেবতার অনুগ্রহে বিপুল বিত্তবিভবের অধিকারী হইলেন। এমন কি ব্রাহ্মণ সেই দেশের রাজা হইলেন। ব্রাহ্মণী বন্ধ্যাছিলেন। দেবানুগ্রহে তাঁহার একটী পুত্র জন্মিল। বারবৎসর বয়সের সময় জাঁকজমকের সহিত পুত্রটীর বিবাহকার্য্য সুসম্পন্ন হইল। পিত্রালয় হইতে বধূর সঙ্গে একজন দাসী আসিয়া ছিল; সে একদিন বধূকে কহিল, "কি লো আমি ত অনেকদিন ধইরা (যাবৎ) তর (তোর, পিতৃদাসী, কাজেই তোর বলিয়া সম্বোধন করিবার অধিকার আছে) বাপের বাড়ী আছি; তর বাপ-অত (বাপওত) একজন বড় মানুষ। তার-অত কত দালান-কোঠা আছে। আমি একদিন্অত, তগর (তোদের) ঘরে ফুল দিতে দেখি নাই।" এই বলিয়া দাসী ঝাঁটা দ্বারা ঘর পরিষ্কার করিয়া ফুলগুলি বাহিরে ফেলিয়া দিল। নিরাকুলীদেবী ইহাতে ক্রোধান্বিত হইয়া গৃহ হইতে বহিষ্কৃতা হইয়া ব্রাহ্মণকে অভিশাপ দিয়া বলিলেন:— "কি বামন, তর এত আম্বর (অহঙ্কার) অইছে (হইয়াছে)। তুই নির্ধইনা আছিলি, তরে ধন দিলাম, তুই নিপুত্রা আছিলি, পুত্র দিলাম, তর ভাত মিল্‌ত না (জুটিতনা), অথন (এখন) আমার পরসাদে (অনুগ্রহে) সুখে চাইট্টা (চারিটী) ভাত খাস্। তুই যেই বামন আছিলি হেই (সেই) বামন অইবি (হইবি)। এই বলিয়া নিরাকুলী দেবী অন্তর্ধান করিলেন। তার পরই ব্রাহ্মণের অমঙ্গল হইতে আরম্ভ হইল। একদিন ব্রাহ্মণের পুত্র তাহার স্ত্রীকে কহিল:— "আমাগ (আমাদের) বড় বিপদ, তুমি অথন (এখন) তোমার বাপের বাড়ী যাও। সেইখানে (সেইস্থানে) সুখে খাও গা; (খাও গিয়া) আমি বন ভরমন্ (ভ্রমণ) কইরা (করিয়া) আসি গা (আসি গিয়া)।" বধূ কহিল, "আমি অ (ও) তোমার লগে (সঙ্গে) যামু (যাব), আমি রাজার মাইয়া (মেয়ে), ভিক্‌কা (ভিক্ষা) কর্‌তে (করিতে) পারুম্ না (পারিব না)।" অনেক তর্কবিতর্কের পর ব্রাহ্মণের পুত্র স্ত্রীকে সঙ্গে লইতে স্বীকৃত হইল। এক দিন গভীর রাত্রিতে দুইজন গৃহ হইতে বাহির হইয়া এক নিবিড় বনে উপস্থিত হইল। সেই স্থানে যাইয়া দুইজনেই বৃক্ষবল্কল পরিধান করিল। নল খাগ্‌রা ভাঙ্গিয়া জল পান করিয়া ও বন্য ফলমূল খাইয়া কষ্টে স্রষ্টে জীবন ধারণ করিতে লাগিল। কয়েক দিন পর এই বনেই তাহার স্ত্রী দুইটী যমজ পুত্র প্রসব করিল। প্রসবান্তে একদিন স্ত্রী স্বামীকে কহিল:—"জল তিরাষে (তৃষ্ণায়) আমার প্রাণ যায়, এট্টু (একটু) জল দিয়া আমার প্রাণ রাখ,। বনের বাইরে (বাহিরে) গিয়া দেখ, কোন খানে (স্থানে) নি (কি) পাখী উড়ে। যেখানে পাখী উড়ে, সেইখানে জল আছে।" ব্রাহ্মণ-পুত্র স্ত্রীর জন্য জল আনিতে গেল।

এ দিকে এই দেশের রাজার মৃত্যু হওয়ায় রাজসিংহাসন শূন্য। রাজহস্তী ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। হস্তী যাহাকে আনিয়া সিংহাসনে বসাইবে, তিনিই অবিসংবাদিত-রূপে এই দেশের রাজা হইবেন। হস্তী ব্রাহ্মণপুত্রকে পৃষ্ঠে তুলিয়া লইয়া সিংহাসনে বসাইল। ব্রাহ্মণ-পুত্র রাজত্ব পাইয়া স্ত্রীপুত্রের কথা ভুলিয়া গেলেন। এদিকে তাঁহার স্ত্রী পিপাসায় অত্যন্ত কাতরা হইয়া পুত্রদ্বয়কে স্তন্য পান করাইয়া, পত্রাচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়া জল পান করিবার জন্য নিকটবর্ত্তী এক নদীর তীরে উপস্থিত হইল। সেই সময় এক সওদাগর নৌকারোহণে এই নদী দিয়া যাইতেছিলেন; তিনি

ব্রাহ্মণী রূপ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া মাঝিমাল্লাগণকে কহিলেন, "তোমরা নৌকা কিনারে লাগাইয়া এই কন্যাকে আনিয়া নৌকাতে উঠাও।" আদেশমাত্র তাহারা এই কার্য্য সম্পন্ন করিল। বধূ দেখিল, এখন তোষামোদ ভিন্ন মুক্তির আর উপায় নাই। কাজেই অনুনয় বিনয় করিয়া মুক্ত হইবার চেষ্টা করিয়াও যখন কৃতকার্য্য হইতে পারিল না, তখন কহিল:—"আমার দুইটী ছোট পোলা (পুত্র) জঙ্গলে থুইয়া আইছি (আসিয়াছি)। সওদাগর বলিলেন:—"ও (এই ব্যক্তি) ফাকি দেয়; তরাতরি নৌকা বা (তাড়াতাড়ি নৌকা বাহিয়া যা)। বধূ তখন আর মুক্ত হইবার উপায় নাই জানিয়া সূর্য্যদেবের আরাধনা করিতে লাগিল, "হে সূর্য্যঠাকুর, তুমি রাইত দিন হগল (সকল) কর্ত্তে পার; যাতে (যাহাতে) আমার সতীত্ব বজায় থাকে, তুমি তাই (তাহাই) কর; তুমি আমার রূপ নেও। তোমার অলস্তগলস্ত আমায় দেও (অলস্ত শব্দের বিশেষ কোন অর্থ নাই, গলস্ত, যাহা গলিয়া পড়িতেছে)।" সূর্য্যদেব স্তবে তুষ্ট হইয়া আকাশ হইতে ব্রাহ্মণীর নিকট আসিয়া ব্রাহ্মণীকে নিজের রূপ দিয়া ব্রাহ্মণীর রূপ লইয়া গেলেন।

ব্রাহ্মণী ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া অনশনব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক বার বৎসর কাল এই নৌকাতে অবস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণীকে খাইতে বলিলে বলিতেন যে আমার একটী ব্রত আছে; সেই ব্রতপ্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে বার বৎসর উপবাস করিতে হয়। ব্রাহ্মণীর শরীরের দুর্গন্ধে কেহই আর তাহার নিকট যাইতে পারে না।

এদিকে এক গোয়ালের "কল্লেশ্বরী" নাম্নী একটী গাভী ব্রাহ্মণীর পুত্রদ্বয়কে দুগ্ধ দিয়া প্রতিপালন করিতে লাগিল। একদিন গোয়ালা গাভী দোহন করিবার জন্য গাভীর নিকট গেল। কিন্তু গিয়া দেখে যে গাভীর স্তনে দুগ্ধ নাই। তৎপর দিনও এই প্রকার হইল। তখন গোয়ালা ক্রোধে সেই "কল্লেশ্বরী" গাভীকে অনেক প্রহার করিল। ইহা দেখিয়া গোয়ালার স্ত্রী কহিল:—"এমন সুন্দর গাই (গাভী), তারে তুমি মার। না অয় (হয়) দুই এক দিন দুধ না দিল; তাতে কি।" তখন গোয়ালা কহিল:—"আইজ তিন দিন ধইরা কোন্ ছোচা (দুষ্ট) জানি পানাইয়া (দোহন করিয়া) এর (ইহার) দুধ রাখে।" কিন্তু গোয়ালিনীর কথায় গোয়াল গাভীকে আর মারিল না। গাভী কোথায় যায়, কে তাহার দুগ্ধ দোহন করিয়া রাখে, ইহা স্থির করিবার জন্য পরদিন গাভীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কতদূর গেলে পর গোয়ালা দেখিতে পাইল যে গাভীটি সমুদ্রে নামিল। গোয়ালাও তাহার সঙ্গে সমুদ্রে নামিল। গাভী সাঁতার দিয়া সমুদ্র পার হইল। গোয়ালাও গাভীর লেজে ধরিয়া সমুদ্র পার হইল। কল্লেশ্বরী এক বনে প্রবেশ করিল, গোয়ালাও সঙ্গে সঙ্গে সে স্থানেই গেল। গিয়া দেখে, গাভী দুইটী ছেলেকে দুগ্ধ পান করাইল। তাহাদের রূপে বন আলোকিত হইয়া গিয়াছে। দুধ পান করাইয়া গাভী বাড়ীতে রওয়ানা হইল। গোয়ালাও গাভীর লেজ ধরিয়া সমুদ্র পার হইয়া বাড়ী আসিয়া গোয়ালিনীকে কহিল:—"আমি গাইটারে মাইরা বড় ভাল করি নাই। তুমি শিগ্গির (শীঘ্র) পেটে কাঠা (ধামা) বাইন্ধা (বান্ধিয়া) দৈ (দধি) বেচ্বার লাইগা (জন্য) নগরে যাও। আমি সুন্দর দুই রাজপুত্তুর (পুত্র) পাইছি।"

গোয়ালিনী তাহাই করিল। নগরের লোকেরা ইহা দেখিয়া কহিল:—"ঐ গোয়ালিনী, তুই না বাঁঝা (বন্ধ্যা), তর আবার ইয়া (ইহা) (অইল) হইল কবে।" তখন গোয়ালিনী বলিল:—"শেষ কালে পেট (গর্ভ) অইছে (হইয়াছে), আমি কি লজ্জায় বাড়ীর (বাহির) অই (হই)। আমার সোয়ামী (স্বামী) আট দিন ধইরা দৈ ভইরা (ভরিয়া) গেছে (গিয়াছে), কি করি ঠেকা দেইখা (দেখিয়া) আমি ঐ (এই) দৈ লইয়া পাড়ায় আইছি। (আসিয়াছি)। তোমরা যা দাম কও তাতেই দৈ দিয়া যামু! দেখ না, আমার শরীরটা বড় কেমন।" এই কথা শুনিয়া পাড়ার সকলেই গোয়ালিনীকে আশীর্ব্বাদ করিল যে, "তর যখন শেষ কালে পেট অইছে,

তর পোলা (পুত্র) অউক (হউক), তুই শেষ কালে বইয়া (বসিয়া) চাইরট্টা (চারিটী) ভাত খাইয়া যা।" সেই রাত্রিতে গোয়ালা সমুদ্রের ঐ পার হইতে ছেলে দুইটীকে নিয়া আসিল। সকলেই 'জোকার' দিতে লাগলি যে গোয়ালিনীর ২টী যমজ পুত্র হইয়াছে। সকলেই ছেলে দেখিয়া গোয়ালিনীকে, সন্তানকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেল।

যথাসময়ে ছেলেদের নামকরণ ইত্যাদি হইয়া গেল। ক্রমে ক্রমে তাহাদের বার বৎসর বয়স হইল। তাহারা গোপদম্পতীকেই তাহাদের মাতাপিতা বলিয়া জানে। একদিন বড় ছেলেটি গোয়ালাকে কহিল :—"বাবা, এই ঘাট টা রাখ্বার আমার বড় ইচ্ছা অইছে।" গোয়ালা কহিল :—"কও কি, তোমরা কতকাল বইয়া খাইয়া যাইতে পারবা ; ঘাট দিয়া কি করবা।" ছেলেটি কহিল :—"না বাবা, তুমি রাজা মশয় (মহাশয়ের) কাছে কইয়া (কহিয়া) ঘাট রাইখা আইয় (আসিও) গা (গিয়া)।" গোয়ালা রাজার নিকট গিয়া কহিল :— "রাজামশায়, আমার পোলা আপনার ঘাট রাখ্বার চায়, যদি দেন, তয় বড় ভাল অয়।" রাজা বলিলেন :— "তোমার পোলার বয়স কত। গোয়ালা কহিল :— "আমার পোলা বার বছরের অইছে।" রাজা বলিলেন :— 'তাইলে একটা নার (নৌকার) মাঝে তোমার পোলারে পোষাক পিন্ধাইয়া (পরাইয়া) দেও গা।" গোয়ালা বাড়ী আসিয়া তাহাই করিল। এদিকে ছোট ছেলে কহিল ; বাবা, আমিও (ও) দাদার লগে যামু।" গোয়ালা তাহাকেও দিল। দুই জনই নৌকাতে গিয়া রহিল। এ স্থান দিয়া এখন যত নৌকা যাতায়াত করে, দুই ভাই সকল নৌকাই ডাকিয়া আনিয়া খাজানা আদায় করিয়া ছাড়িয়া দেয়। বিধির বিচিত্র বিধান ; যে সওদাগরের নৌকায় তাহাদের মা ছিলেন, দৈবাৎ একদিন সেই নৌকাই যাইতেছিল। নৌকা দেখিয়া দুই ভাই ডাকিয়া বলিল :—"কার নৌকা যায়, ভিড়াইয়া (কিনারায় লাগাইয়া) যাইয় (ও)।" সওদাগর নৌকা ভিড়াইলেন না, বরং বলিলেন, "আজ বুঝি তগর (তোদের) কথায় ভিড়ামু। যদি ভিড়ান লাগে, রাজার নিকট জাইনা (জানিয়া) ভিড়ামু।" তৎপর (তাহারা) সওদাগরেরা নৌকা কিনারায় লাগাইয়া সেই স্থানে রাত্রি যাপনের ইচ্ছা করিল।

অপর নৌকায় ছোট ভাই বড় ভাইকে কহিল :—"দাদা একটা হাস্তর (প্রস্তাব) কও।" বড় ভাই কহিল :—"ভাইরে, আমাগ দুঃখের পার নাই। আম্রা আবার হাস্তর কমু।" ছোট ভাই কহিল :—ক্যা (কেন) দাদা, আমাগ মা আছে, বাপ আছে, হগল (সকল) সময় আমরা ছানা সন্দেশ খাই ; আমাগ আবার দুঃখ কি। দাদা, এই কথা কে জানে, কে হোনে (শোনে), হাস্তর কইতে অবে (হবে)। তখন বড় ভাই কহিল, তবে হোন, আমি কই।

"মা গেছে আনে (অপরে), বাপ গেছে বানে
(বন সকলে, বনে)।
আম্‌রা দুই ভাই আছি নানান খানে (স্থানে)।
যেগুণে আছাল (আছিল, ছিল) কল্লের সরি
(কল্লেশ্বরী) গাই,
তার এক বাণের (বাঁটের) দুধ খাইয়া আম্‌রা বাচ্চি
(বাঁচিয়াছি) দুটী ভাই।"

এই কথা শ্রবণ করিয়া সওদাগরের নৌকায় ইহাদের মা কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। সওদাগর কহিলেন, "কন্যা, তুমি কাঁদবার লাগ্‌ছ ক্যা (কেন)।" তখন ইহাদের মা উত্তর করিলেন :—"হোন না, ঐ নায় থাইকা (থাকিয়া) দুই বান্দরে (বানরে) আমারে কত বকবার (গালি দিবার) লাগ্‌ছে।" তখন সওদাগর কহিলেন :— "তুমি কাইন্দ না (কাঁদিওনা), আমি রাজার কাছে নালিশ করুম (করিব)। দেহি (দেখি) হে (সে) কি বিচার করে।" তৎপরদিন সওদাগর খুব সকালে গিয়া ঐ ছেলে দুইটীর বিরুদ্ধে রাজার নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। অভিযোগ শ্রবণ করিয়া বলিলেন :—"তোমার নার (নৌকার) আতুর মাইয়ালোকটারে ঘুর্ণি (পরদা আবরণ) টানাইয়া রাজদরবারে নিয়া আইয় (আস)।"

সওদাগর রাজাদেশে তাহাকে রাজদরবারে নিয়া আসিলেন। রাজা গোয়ালের স্ত্রী, পুত্রদ্বয় ও গোয়ালাকে ডাকিয়া রাজদরবারে আনাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন:—"তোমার পোলারা এই সদাগরের মাইয়া লোক্‌টারে বক্‌ল (বকিল) ক্যা" । (কেন)। গোয়ালা বলিল :—"আমার পোলারা কোন-দিন কারে বকে না, আইজ বুঝি ওরে (উহারে) বক্‌ল। আমার বিশ্বাস হয় না।" তখন রাজা মেয়েমানুষটীকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—"তারা (তাহারা) তোমারে কি বইলা (বলিয়া) বক্‌ছে (বকিয়াছে)।" মেয়ে মানুষটী কহিলেন :—"আমারে জিগাইয়া (জিজ্ঞাসা করিয়া) কাম নাই। এই পোলা দুইটীর নিকট জিগান (জিজ্ঞাসা করুন)। তখন রাজা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—"তরা কিশের (কিশের) লাইগা (জন্য) তারে বক্‌ছস্ (বকিয়াছিস্)।" তাহারা কহিল:— "রাজা মশয়, আমরা বকি নাই। তয় (তবে) আমার ছোট ভাই আমাকে একটা হাস্তর (প্রস্তাব) কইতে কইছাল্ (কহিয়াছিল)। তখন আমি কইছিলাম. 'ভাইরে আমাগ ... ... দুধ খাইয়া বাকি দুইটী ভাই।' ইহা শুনিবামাত্র রাজা ও আতুর মেয়েমানুষটি কাঁদিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া সভাস্থ সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন। রাজাকে তদবস্থ দেখিয়া সভাস্থ সকলেই জিজ্ঞাসা করিলেন :— "রাজা মশয়. আপ্‌নে কান্‌ছেন ক্যা।" তখন রাজা শোক কথঞ্চিৎ প্রশমিত করিয়া বলিলেন :—"এই মাইয়া লোকটী আমার স্ত্রী. পোলা দুইটীও আমার পোলা। তোম্‌গরে (তোমাদেরে) একটা পরীক্ষা দেখাই, তাইলে তোম্‌রা বিশ্বাস কর্‌বা।" তখন রাজা বলিলেন :—"তোমরা এখানে একটা পুকর্নী (পুষ্করিণী) কাইটা (কাটিয়া) সেইটা দুধ দিয়া ভর (পূর্ণ কর)।" রাজাদেশে সেইস্থানে একটী পুকুর কাটা ও দুগ্ধদ্বারা তাহা পরিপূর্ণ করা হইল। তখন রাজা আদেশ করিলেন :—"পোলা দুইটারে পুকুরের এই পার রাখ, আর মাইয়া লোক দুই টারে ঐ পারে রাখ। ঐ পার থেইকা (হইতে) যার বুকের দুধ এই দুই পোলার মুখে আইয়া পড়বে, সেই তাদের মা"। রাজাদেশে তাহাই করা হইল। তখন রাজা বলিলেন :—"গোয়াল্‌নী. তুই তর দুধে (স্তনে) টিবি (চাপ) দে।" গোয়ালিনী অত্যন্ত বেগে স্তনে চাপ দিল। কিন্তু তাহা হইতে একবিন্দু দুগ্ধও বাহির হইল না। তৎপর রাজা আতুর মেয়েমানুষটীকে বলিলেন :—"তুই তর দুধে টিবি দে।" এই কথা শ্রবণ করিয়া আতুর মেয়েমানুষটী সূর্য্যদেবকে স্তব করিয়া বলিতে লাগিলেন :—"হে সূর্য্য ঠাকুর, তোমার অলক্তগলস্তরূপ নিয়া আমার রূপ আমারে ফিরাইয়া দেও।" সূর্য্যদেব রূপ পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া সভাস্থ লোকের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। এদিকে রূপ পরিবর্ত্তন করিয়া স্ত্রীলোকটী নিজ স্তনে হস্তপ্রদান করা মাত্রই গোমুখীর মুখ হইতে নিঃসৃত পবিত্র বারিধারার ন্যায় মাতৃস্তন্যের ধারা আসিয়া সন্তানদের মুখে পতিত হইতে লাগিল। ধন্য মাতৃস্নেহ! এতদ্দর্শনে সকলের দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল যে এই দুইটী সন্তান এই স্ত্রীলোকটীর গর্ভজাত। রাজারও তাহাই প্রত্যয় হইল। নিরাকুলীদেবীর আশীর্ব্বাদে তাঁহাদের সকলের মিলন হইল। রাজা নিজ মাতাপিতা আত্মীয় বন্ধুবান্ধব আনিয়া মহাসমারোহে পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবীর অনুগ্রহে উত্তরোত্তর তাঁহার শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে দেশময় পূজার প্রচলন হইয়া গেল।

শ্রীমহিমচন্দ্র নন্দী

সেনাপতি বেন *

মোগলবীর কুব্‌লা খাঁ যখন কেথেরাজ্যে দূত পাঠাইলেন, সকলে বলিল, "সর্ব্বনাশ! সাপের লাঙ্গুলে ধরিয়া নাড়া দিও না;—পথ ছাড়িয়া দাও! সেলাম দিয়া বিদায় কর!" কিন্তু সেনাপতি বেন বলিলেন, "না, না। কিছুতেই না! দাসানুদাস বেন বাঁচিয়া থাকিতে কেথেসম্রাট কুব্লা খাঁর পায়ে মাথা নোঁয়াইবেন? তা কিছুতেই হইবে না!" সেনাপতির অঙ্গীকার বজ্রাগ্নির মত কেথেবাসীর অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একেবারে আগুন ধরাইয়া দিল।

সাত বার কুব্লা খাঁ কেথে আক্রমণ করিলেন। মঙ্গো-লিয়ার গোঁয়ারগোবিন্দ সেনার দল পাহাড়ী ঝঞ্ঝার মত সাত সাতবার আসিয়া কেথের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল। পাহাড়ের মত অটল বীর বেন সাত সাতবার সে দুর্দ্দম বেগ হাত নাড়িয়া ফিরাইয়া দিলেন।

তারপর একদিন যে যুদ্ধ বাধিল—কি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সে! কেথের পাঁচশ মাত্র সৈন্যকে অসংখ্য মোগল

---

* এই আখ্যায়িকার জন্য লেখক Modern Review নামক পত্রিকার কাছে ঋণী।

ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, তলোয়ারে তলোয়ারে আকাশে ছায়া করিয়াছে, মরা মানুষের উপরে দাঁড়াইয়া জেতা মানুষ যুঝিতেছে! অসিগুলি ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া শিলাবৃষ্টির মত আকাশে উড়িতেছে! যোদ্ধাদের ঘামে কাদা হইয়াছে, রক্তে নদী হইয়াছে, নিশ্বাসে ঝড় বহিতেছে। কি ভয়ঙ্কর! কি ভয়ঙ্কর!

সে ভয়ঙ্কর সংবাদ বৃদ্ধ কেথেপতির কাছে পৌঁছিল। কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি চোখের তারা আকাশে তুলিয়া বলিলেন, "যাও—যাও—বেনকে থামাও। আমি যুদ্ধ চাই না!"

বেন উত্তর পাঠাইলেন, "এখনো কেথে সৈন্যের বুকের রক্ত সব ঝরিয়া পড়ে নাই!"

বেনের পাঁচশ সৈন্যের দুইশ মারা পড়িল; বাকী তিন শ সুদসমেত দুই শ'র শক্তি বুকে ধাঁধিয়া যুঝিতে লাগিল।

কেথের অধীশ্বর আবার খবর পাঠাইলেন, "আমি যুদ্ধ চাই না।"

বেন আবার উত্তর করিলেন, "এ দাসের চৈতন্য এখনো লোপ পায় নাই। কেথের বুকে পরদেশী রাজার পদরেণু পড়িবে, বেনের চেতনা থাকিতে তা হইবে না!"

এমনি করিয়া সাত সাতবার কেথে মুইয়া পড়িতে চাহিল; সাত সাতবার বেন তাকে তুলিয়া ধরিলেন। পরিশেষে যে ঝাপটা আসিল, তা মহাকালের প্রলয় নিশ্বাসের মত প্রচণ্ড।

চার শ পঞ্চাশ জন কেথে সৈন্য প্রাণ দিয়াছে, পঞ্চাশজন মাত্র লড়িতেছে। উচ্চৈশ্রবার মত অশ্বগুলি ফেনায় ঘর্ম্মে আকুল হইয়া উঠিয়াছে, মালভূমির প্রখর সূর্য্য আকাশপথে আগুন ছড়াইতেছে; মনের আগুনে ও বাহিরের আগুনে মিলিয়া যোদ্ধাদের মাথায় ফেনোচ্ছ্বাস খেলাইতেছে! সেখানে আর মানুষ নাই—কেবল পশু! নির্ম্মম, নিষ্ঠুর, উন্মত্ত পশু! সে বানের মত অস্থির, ঝড়ের মত প্রবল, বজ্রপাতের মত সর্ব্বনাশী!

বেন হাত তুলিয়া বলিলেন, "বীরগণ! রাজাধিরাজের সমন আসিয়াছে! দেখিও বিচার-ঘরে গিয়া বেন কাহাকেও হেটমথে না দাঁড়াইতে হয়!" সেনাপতির সে সাবধানবাণী মদের নেশার মত সৈন্যদের প্রাণে পৌঁছিল। পঞ্চাশখানা রক্ত মাখা অসি পঞ্চাশটি বিদ্যুৎ-শিখার মত আকাশের গায়ে জ্বলিয়া উঠিল; তারপর যা হইল, বলিবার নয়। সন্ধ্যার সময় অচৈতন্য বেনকে বন্দী করিয়া কুল্লা খাঁর সৈন্যগণ শিবিরে ফিরিয়া গেল।

বেন বন্দী হইলেন বটে, কিন্তু তাঁর দুর্দ্দম সাহস ও আত্মত্যাগ বৃদ্ধ কেথেপতির অন্তরে যে আগুন ধরাইয়া দিল, তাহা আর নিবিল না। বুকের কলিজা ফাটিয়া, চোখের মণি ফাটিয়া, সে তেজের শিখা তাড়িতের মত ছুটিয়া চলিল। পাশে যাঁরা ছিল—পাত্র, মিত্র, সৈন্যসামন্ত—ফুটন্ত খইএর মত লাফাইয়া উঠিল। সে উত্তাপের আঁচ পাইয়া পাঁচশোর জায়গায় পাঁচ হাজার কেথেবাসী মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। কুল্লা খাঁ দেখিলেন, আগুন চালে ধরিয়াছে, এখন আর দেশলাইটাকে বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিয়া কোন ফল নাই।

এক মাস কয়েদ ঘরে থাকিয়া বেন যখন অস্থিচর্ম্ম-সার হইলেন, তখন কুল্লা খাঁ বলিলেন, "তোমার বীরত্বে তুষ্ট হইয়াছি, বর চাও।"

বেন উত্তর করিলেন, "সম্রাটের যদি এত দয়া, আমাকে কেথেতে ফিরিয়া যাইতে দেওয়া হউক।"

কুল্লা খাঁ বলিলেন, "যাইতে দিতে পারি, যদি তুমি কথা দেও যে কেথে আমার কাছে বশ্যতা স্বীকার করিবে।"

আগুনের ফুলিঙ্গ বেনের কোটরগত চক্ষুর ভিতর ঝিলিক দিয়া উঠিল। কেথে তবে এখনো স্বাধীন? কেথের বৃদ্ধ রাজার পায়ের চারিদিকে তবে হাজার বেন এখনো বল্লম ঘাড়ে করিয়া দাঁড়াইয়া? ধন্য ভগবান! তিনি মুহূর্ত্তে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া জোর হাতে বলিলেন, "সম্রাটের বৃথা আশা! বাঁচিয়া থাকিতে এ দাস কেথেকে অবনত দেখিতে পারিবে না।"

"ভাল, তবে মরিয়াই দেখ।"

কুল্লা খাঁ ঘাতককে ইঙ্গিত করিলেন। নিষ্ঠুর ঘাতক বেনের শীর্ণদেহের হাড়ে হাড়ে জ্বলন্ত লৌহশলাকা বিদ্ধ করিতে লাগিল। পৃথিবীর মত ধীর বীর বেন পাহাড়ের মত অটল, আকাশের মত স্থির, চন্দ্রিমার মত প্রসন্ন ভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন। সন্ধ্যার তারা একখণ্ড কালো মেঘের কোলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

শ্রীঅখিল কুমার শর্ম্মা।

৭৭০। সাত নকলে আসল খাস্তা।

৭৭১। বুড়া বানরেও গাছ বায়।

৭৭২। পেটে থাকলে গুণ করে।
পেটের বাহির হইলে রণ করে॥

৭৭৩। ঢোলের বাড়ি কাপড়ের গিটে থাকে না।

৭৭৪। বিশ্বকর্ম্মার পুত্র চিকা।
চিকা—ইন্দুরজাতীয় প্রাণীবিশেষ।

৭৭৫। রাম না জন্মিতেই রামায়ণ!

৭৭৬। ঘোড়া দেখ্‌লে খোড়া হয়।

৭৭৭। কম্বলের লোম বাছলে আর কিছুই থাকে না।

৭৭৮। সারা গায় এক ঘর।
তার নাম অন্দর॥

৭৭৯। ঘর পড়্‌লে ছাগলেও পাড়ায়।

৭৮০। তুমি আমার পোলার গা ধর।
আর আমি তোমার ভাত দুগা খাই॥

৭৮১। ঢেকি উপলক্ষে মঙ্গল।

৭৮২। ধান ভান্‌তে শিবের গীত।

৭৮৩। শাকেই জোড় হাত।

৭৮৪। যে কয় রাম।
তার লগেই যাম্‌॥
লগে—সঙ্গে। যাম্‌—যাইব।

৭৮৫। আত্মসুখী, পর বৈরাগী।

৭৮৬। আপ্‌না ধান বিষ পাইয়ারী।
পরের ধান না এক পাইয়ারী॥
পাইয়ারী—পঞ্চুরী।

৭৮৭। আপ্‌না বুঝ পাগলেও বোঝে।

৭৮৮। এক মাইন্‌ষের তিন রোগ।
নাকের আগে বিষফোট॥

৭৮৯। হাতার বউ ভাত রান্‌ছে
ছাতার গন্ধ কয়।
হেন্সুম অইত কইছিলাম্‌ বউ
পিড়া পাইত্যা বয়॥
বৌ—বউ। হাতার—সাতকড়ির।
হেন্সুম—সেই সময়।
পাইত্যা—পাতিয়া।

৭৯০। বিয়ার ডাকও পইল।
আগার কথা মনে অইল।
পইল—পড়িল।
আগার—বাঘের। অইল—হইল।

৭৯১। বাঁচতে না দেয় ভাত কাপড়।
মৈলে করবে দানসাগর॥
মৈলে—মরিলে।

৭৯২। বেল্লিকের নিমন্তন্ন আচাইলে সিদ্ধি।

৭৯৩। তোমার খুটার তলেও কারো ঘর না।
তোমার কথায়ও কারো ডর না॥
খুটা—খুটী, থাম।

৭৯৪। বুড়া দিদিরে আবার কি শিখায়।

৭৯৫। কুত্তার লেজে ঘি মাখ্‌লেও সিধা হয় না।
সিধা—সোজা।

৭৯৬। কাছিমে ডিমা পাড়ে,
গুইলে খায়।
কাছিম—কচ্ছপ। ডিমা—ডিম।
গুইলে—গোসাপ।

৭৯৭। চোক্‌ পাগাইলে সব আমার।
চোক্‌ বুজিলে সবই অন্ধকার॥
পাগাইলে—মেলিলে।

৭৯৮। শাশুরী ভাঙ্‌লে খোলা হয়।
বউ ভাঙ্‌লে কামের নয়॥

৭৯৯। জাতে জাত টানে
কাকড়ায় গাত টানে ॥
গাত—গর্ত্ত।

৮০০। ফুয়ের চোটে।
আগুন ছোটে ॥

৮০১। ঘিয়ে, ভাতে, লেমুর রসে।
খাইছৎনি তোর বাপের বয়সে।
লেমু—লেবু।

৮০২। যত মেঘ তত বৃষ্টি।
যত গুড় তত মিষ্টি ॥

৮০৩। আপ্‌না ভাত খাইয়া,
পরের জুতা কয় হাত লম্বা।

৮০৪। যত আঠা তত ল্যাঠা।
যত গুড় তত মিঠা ॥

৮০৫। আশ্বিনে রান্ধে
কার্ত্তিকে খায়।
যে বর মাগে সেই বর পায় ॥

৮০৬। যাবার সুম কমর কাইচ্ছ্যা।
শেষে আউগ্‌গারে ভাই পাউচ্ছা ॥
সুম—সময়। কমর—কোমর।
কাইচ্ছা—কাছটী করিয়া
বান্ধিয়া, আঁটিয়া।
আউগ্‌গা—অগ্রসর হও।
পাউচ্ছা—পশ্চাতে অপসরণ।

৮০৭। গরজে আর আহম্মকে সমান।
ডাবায় জিরায় হেইটুক্‌।
জিরায়—অবসর দেয়। ডাবা—হুকা।
হেইটুকু—সেটুকু।

৮০৮। সারাদিন পোকা হইয়ে
বহ্নিমাঝে মজিবে।
লেখাপড়া হ'বে কিন্তু
সব নষ্ট করিবে ॥

৮০৯। আমি রাম দাস্তার মা,
আমারে দিল এট্টু আগুন।
এই থুইলাম চালের বাতায়,
রাম দাস্তা বাড়ী আসুক ॥
এট্টু—একটু।

৮১০। বাচারে কয় আমাছা,
কমলারে কয় কাউ।
আটের মধ্যে হিন্দুর কিন্যা,
ভেট্‌কি দিছে সাউ ॥
বাচা—মৎস্য বিশেষ।
আটের—হাটের।
হিন্দুর—সিন্দুর।
কিন্যা—কিনিয়া।

এক ব্যক্তি কতকগুলি বাচামাছ হাটে আনিয়া বলিতেছে, 'আমাছা নিবে কে?' বাচামাছ বেশ সুস্বাদু এবং মূল্যও যথেষ্ট। ঐ ব্যক্তি সাধারণ দামে সে মাছ বিক্রয় করিয়া গিয়া পুনঃ এক ঝুড়ী কমলা লইয়া পরদিন বাজারে আসিয়া বলিতে লাগিল, 'কাউ নিবে কে?' কাউ পয়সা দিয়া কিনে কে? যদি বা কিনিতে হয় তাহা হইলে একপয়সায় অনেকগুলি মিলে; সে কাউএর দরে কমলাগুলি বিক্রয় করিয়া গেল। ভাবগতিক দেখিয়া অনেকেই লোকটাকে বোকা ঠাওরাইল। তারপর একদিন হাটে এক কলস সিন্দুর আনিয়া অর্দ্ধমূল্যে বিক্রয় করিয়া গেল। এক সাউ উহা অতি সস্তায় খরিদ করিল। লোকটাকে নেহায়েৎ বোকা মনে করিয়া সব সিন্দুর আর যাচাই করিয়া দেখিল না। বাড়ী যাইয়া যখন দেখিল যে কলসীটার অধিকাংশ ভাগই সুরকীতে পূর্ণ ও গলদেশে মাত্র কিছু সিন্দুর রহিয়াছে, তখন সাউএর শিরে করাঘাত কে দেখে।

৮১১। নিত্যি উপাস্থারে কে দেয় ভাত।
নিত্য মরারে কে দেয় কাঠ ॥
উপাস্থা—উপবাসী।
নিত্যি—প্রত্যহ, অবিরত।

৮১২। কুত্তার পেটে ঘি সয় না।

৮১৩। সাধ কইরা ফোড়াইলাম কান।
এখন সূতা দিতে যায় পরাণ॥

৮১৪। এক বুঝা যায় পৈলে।
আর বুঝা যায় মৈলে॥

পৈলে—অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইলে, দেউলিয়া হইলে।
মৈলে—মরিলে।

৮১৫। যাহা বায়ায় তাহা তিগায়।

৮১৬। যে দেশের যেই ভাও।
উব্বৎ কইরা যায় নাও॥
উব্বত—উবুর, উল্টা ভাবে।

৮১৭। একটা পান্তা ভাতে ছত্রিশটা ব্যাধি,
গণ্ডায় গণ্ডায় খাইলে আর কিছুই না।

৮১৮। দাসেরে থাবা। (থাবা—চড়।)
মইষেরে নাবা॥ (নাবা—নাকাদড়ী।)
ছৈ এরে গিল। (ছৈ—শিম।)
বউ এরে কিল॥ (গিল—ঝাঁটা)

৮১৯। হাত চাগিয়া কিলাইলে।
চুলের গিট্ আপ্‌নিই খোলে॥

৮২০। শ্লোনরে ভাই পণ্ডিত।
উব্বইত্যা লাচারীর গীত॥
দামড়ী ছিড়্‌ড়া দড়ী দিল লড়্।
সে দড়ীতে কাএন থায়॥
উব্বইত্যা লাচারীর ভায়।
লাও মুড়া দা পাতলা বায়॥
আতাইলের মধ্যে উষ্টা খাইয়া।
খেতটা পড়্‌লো চিত্তর হইয়া॥
মুড়াদা—মাথায় দিয়া।
বায়—বাহিয়া যায়।
আতাইল—আইল, আলি।
উষ্টা—হোচট্।
খেত—ক্ষেত্র।
চিত্তর—চিত।

৮২১। আদা,
সকল অষুদের আধা॥
অষুদ—ঔষধ।
আধা—অর্দ্ধেক।

৮২২। দিতে আইছেন কোলাকুলী।
কাজ নাই এত লেমুন্তিতালীর॥

৮২৩। আন্‌মানে হারে বার পয়সা।
হারে— সারে।

৮২৪। নাই দেশে এরণ্ডও গাছ।
আর নাই বনে খাটাসই বাঘ।

৮২৫। আঙ্গুলটা দেখাইলে।
ফানাই গিলে॥

৮২৬। সরকারীতে খায়।
মজিদে ঘুমায়॥

৮২৭। পাঁচকলমে বোথা।

৮২৮। মুখ পোড়া হনু!

৮২৯। লঙ্কার ফেরৎ।

৮৩০। পোড়ামাটী আর জোড়া লয় না।

৮৩১। গোয়ার গোবিন্দ।

৮৩২। বলদ পঞ্চানন।

৮৩৩। যাত্রা শোনে ফাত্রা লোকে।
কবি শোনে ভদ্দর লোকে॥
ফাত্রা—বাচাল।
ভদ্দর—ভদ্র।

৮৩৪। টানইয়ায় না টান্‌লে।
লাভ নাই কেবল কান্‌লে॥
কান্‌লে—কাঁদিলে।

৮৩৫। সর্ব্বচূর্ণ গদার বাড়ি।
বাড়ি—আঘাত।

৮৩৬। এ কথায়ই এত এ্যাঃ কি?
আরে আমার আহ্লাদের ডকি॥
এ্যাঃকি—হিক্কা তুলিয়া কান্না।
ডকি—মেটে পাতিল বিশেষ।

৮৩৭। খাট পেটে আই-ঢাই।
মোটাপেটে দিলেই নাই॥

৮৩৮। ঢাল নাই তরোয়াল নাই,
নিধিরাম সর্দ্দার।

৮৩৯। ব্যাংএর মুতে আর,
কে খায় আছাড়।
মুতে—প্রস্রাবে।
খায়—পড়ে।

৮৪০। শাক সর্প-বকারণ।
তেঁ পাচা পনর কিল
খাইলাম অকারণ॥
যদি কইতাম লবণি।
আরও পাঁচটা
খাইতাম ল বাম্‌না॥*

* এক ব্রাহ্মণ ও এক চাষা এক রাস্তা দিয়া যাইতেছিল। যাইতে যাইতে চাষা কতকগুলি শাক দেখিয়া বলিয়া উঠিল; 'ত্যাখ্‌ছেন, ঠাকুর মশয়! কেমন সুন্দর হাগ।' ব্রাহ্মণ বলিল, 'না হে, ও ত 'হাগ' নয়; ও যে 'শাক'; চাষা—"আচ্ছা, বাজী হ'ক, কার কথা সত্য। যে হারিবে সে ৫টা কিল খাইবে।' ব্রাহ্মণ স্বীকৃত হইল। মাঠে আর লোক পাবে কোথা; একদল চাষার কাছে যাইয়া ঐ চাষা জিজ্ঞাসা করিল, 'ভাই, এগুলি কি?' "ক্যান? এ যে 'হাগ'। তখন আর কি? চাষার হস্তে ব্রাহ্মণের পিঠে ৫টা কিল পড়িল। তারপর ক্রমে ক্রমে 'হাপ' ও 'বগ' এর পরিবর্ত্তে 'সর্প ও 'বকারণ' বলায় চাষাদের বিচারমতে ব্রাহ্মণ 'পাঁচ' 'পাঁচ' দশ কিল খাইল। আরও কিছু দূর গিয়া চাষা বলিল, 'ঐ দেখুন, ঠাকুর মহাশয়! একটা ছেলে 'নিম৫' লইয়া যায়। ব্রাহ্মণ এবার কিছু সেয়ানা হইয়াছিল, তাই আর কিছু না বলিয়াই পথ চলিয়া বাটী পৌছিল এবং চাষার মেলে পড়িয়া অকারণ শাস্তিভোগের বৃত্তান্ত স্ত্রীর নিকট প্রকাশ করিল।

৮৪১। যখন পড়্‌বে চঙ্গের মই।
এ রঙ্গ বা থাকবে কই!

৮৪২। মায় কান্দে বাপে কান্দে
আছাড় বিছার খাইয়া।
ভাইর বৌ গুগলী কান্দে
চোখে মরিচ দিয়া॥

৮৪৩। সেই মামা, সেই মামী,
সেই মামারই ঘর।
এখন কেনগো মামী, দেখি
দুধের মধ্যে সর!

৮৪৪। যেমন কর্ম্ম, তেমন ফল।
অর্দ্ধেক লাথি অর্দ্ধেক চড়॥

৮৪৫। কীর্ত্তনীয়ার গুড়া।
কবিরাজের বুড়া॥
গুড়া—ছোকৃড়া, ছোট ছেলে।

৮৪৬। গুরুমারা বিদ্যা।

৮৪৭। যত কাপড়, তত শীত।

৮৪৮। বামোন বাড়ীর ডাইল ভাত।
তার নাম পস্‌সাদ॥
বামোন—ব্রাহ্মণ।
পস্‌সাদ—প্রসাদ।

৮৪৯। মানুষ মারা কল।

৮৫০। সর্ব্বকর্ম্মে যার উস্‌।
তারে কয় মানুষ॥
উস্‌—হুস্‌, সতর্কতা।

৮৫১। প্যান্‌ প্যাল্লা ভাতারে,
আর ক্যাণ্‌ ক্যাণ্যা জরে।
আর কিছু না করুক,
জ্বালাইয়া মারে॥

৮৫২। টাকা দিয়া কিন্‌লাম দই।
গোয়ালনী আমার কিয়ের মই॥
কিয়ের—কিসের।

প্রতিভা

৫ম বর্ষ — আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩২২ — ৬ষ্ঠ, ৭ম সংখ্যা

কান্তনামা বা রাজধর্ম্ম। *

১৩২০ বঙ্গাব্দে কোন কার্য্যোপলক্ষে যখন আমি দিনাজপুর জেলাস্থিত বালুরঘাট সবডিভিসনে অবস্থান করিতেছিলাম, তখন অবসরকালে মধ্যে মধ্যে প্রত্নানুসন্ধানে বাহির হইতাম।

পুস্তক আবিষ্কার-কাহিনী

২৫শে মাঘ তারিখে বালুরঘাট আদালতের উকীল শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের সহিত বিখ্যাত ধীবরদীঘি দেখিতে যাই এবং যোগেশবাবুর ফকণ্ডা-গ্রাম-নিবাসী এক মুসলমান মক্কেলের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করি। আমি তখন কুমিল্লা হইতে প্রাপ্ত এবং মৎসম্পাদনে ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত কবি ভবানী দাস প্রণীত ময়নামতীর গান নামক প্রাচীন পুস্তক সম্পাদন করিতেছিলাম। ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষাবিৎ শ্রীযুক্ত গ্রিয়ারসন্ সাহেবের ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে অবগত ছিলাম যে, তিনি ময়নামতীর গানের এক সংস্করণ রঙ্গপুরের যুগীদের মুখ হইতে শুনিয়া সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দিনাজপুরেও ময়নামতীর গান প্রচারিত আছে কি না, ফকণ্ডা পৌছিয়া একটু স্থির হইয়াই আমি সেই অনুসন্ধান আরম্ভ করি। কথা-প্রসঙ্গে যোগেশবাবুর মক্কেলের নিকট অবগত হই যে, তাহার এক পূর্ব্বপুরুষ ভারী লেখনদার ছিলেন এবং তাঁহার স্বহস্তে লিখিত ও রচিত অনেক পুঁথি তাহাদের বাড়ীতে আছে; আর তাঁহার মধ্যে ময়নামতীর পুঁথিও এক খণ্ড আছে। ফকণ্ডাগ্রাম বালুরঘাট মহকুমার যে অংশে অবস্থিত, তাহাকে কান্তনগর পরগণা বলে। যোগেশবাবুর মক্কেল বলিল যে, কাশিমবাজার-রাজবংশপ্রতিষ্ঠাতা কান্তবাবুর নামে এই পরগণার নাম কান্তনগর হইয়াছে এবং এই বিষয়ে তাহার উক্ত পূর্ব্বপুরুষ-রচিত এক খানা পুস্তক আছে। পুঁথিখানার নাম কান্তনামা বা রাজধর্ম্ম। আমি উভয় পুঁথিই দেখিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলাম, কিন্তু প্রত্নানুসন্ধানী বাবুদের লুব্ধদৃষ্টি-পাতে পাছে তাহার পূর্ব্বপুরুষের এই স্মৃতিচিহ্নগুলি অন্যের হাত ছাড়া হইয়া যায়, বোধ হয় এই ভয়েই সে তখন তাহা দেখাইল না। পরে যোগেশবাবুর সহায়তায় ও যত্নে পুঁথি দুই খানা আমার হস্তগত হইলে পর দেখিলাম যে, একখানা আবদুল স্কুর মহম্মদ রচিত ময়নামতীর পুঁথি এবং অপর খানাই

---

* ঢাকা সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

বর্ত্তমানে আলোচ্য গ্রন্থ কান্তনামা বা রাজধর্ম্ম।* সুকুর মহম্মদের ময়নামতীর গান সম্পাদিত হইতেছে, শীঘ্রই ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইবে।

* এই সঙ্গে যোগেশবাবুর মক্কেলের গৃহে রক্ষিত আর একখানা পুঁথিও পরীক্ষা করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম। কাহারও কোন কাজে লাগিতে পারে অনুমান করিয়া তাহার বিবরণ এখানে লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি।

বালুরঘাট হইতে ৭ মাইল পশ্চিমদক্ষিণে আগ্রাদুগুন-নামক স্থানে একটি প্রকাণ্ড স্তূপ আছে। স্থানীয় প্রবাদ এই যে, এই স্তূপের চারিদিকে এবং নিকটবর্ত্তী কাশীপুর নামক স্থানে বৈরাটনগর বা বিরাটনগর নামে এক প্রকাণ্ড সহর ছিল এবং এখানে অনেক বাদশা রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। যোগেশবাবুর মক্কেলের গৃহে রক্ষিত পুস্তক এই বৈরাটনগরের ও নিকটবর্ত্তী ধীবরদীঘির শাসনকর্ত্তাদের সম্বন্ধে কাব্যাশ্রিত বিবরণে পূর্ণ। পুস্তকখানি আকারে অত্যন্ত বৃহৎ, প্রায় সহস্রাধিক পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। আমার অবসরের অল্পতাপ্রযুক্ত আমি পুঁথির সমস্তটা ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ পাই নাই; তবে পুঁথির প্রথমাংশে যে সত্যসত্যই বৈরাটনগরের বাদশার বিবরণ আছে, তাহা তাড়াতাড়ি পাঠ করিয়া দেখিয়াছিলাম। এই পুস্তকখানা অত্যন্ত সাবধানতার সহিত মালিককর্ত্তৃক রক্ষিত হইতেছে, কিন্তু পুঁথির অবস্থা ক্রমেই জীর্ণ হইয়া আসিতেছে এবং কেহ উদ্যোগী হইয়া উদ্ধার না করিলে উহা কালক্রমে লুপ্ত হইয়া যাইবে, সন্দেহ নাই। রীতিমত পরীক্ষিত হইলে হয়ত দেখা যাইবে যে, পুস্তকখানা ঐতিহাসিক হিসাবে অত্যন্ত মূল্যবান। কারণ নিম্নে লিখিতেছি।

পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত মুসলমানি বাঙ্গালায় লিখিত "গাজি কালু ও চম্পাবতী কন্যার পুঁথি" নামক পুস্তকে এই বৈরাটনগরের উল্লেখ দেখা যায়। উক্ত পুস্তকের বিভিন্ন লেখক-লিখিত বিভিন্ন সংস্করণ বাজারে প্রচলিত আছে, কিন্তু সমস্তেরই মূল বিবরণ এই :—বৈরাটনগরে সেকান্দর শাহ্ নামে এক রাজা বাস করিতেন। গাজি নামে তাঁহার এক পুত্র ছিল।

আলোচ্য গ্রন্থ কান্তনামা বা রাজধর্ম্ম ৬০ পাতায় সম্পূর্ণ গ্রন্থ। ইহার মধ্যে ১ম ও শেষ পাতায় মাত্র এক পৃষ্ঠা। প্রত্যেক পাতার আয়তন ১২" × ৪" এবং প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ৮লাইন করিয়া

গাজি অল্পবয়সেই রাজত্ববিরাগী হইয়া যান এবং পালিত ভ্রাতা কালুকে লইয়া দক্ষিণের রাজা মটুক রায়কে পরাজিত করিয়া তাহার কন্যা চম্পাবতীকে বিবাহ করেন। অতঃপর, গাজি প্রসিদ্ধ পীর সাহ্ জালালের সহায়তায় শ্রীহট্টের রাজা গৌর-গোবিন্দকে পরাজিত করিয়া শ্রীহট্টে মুসলমান অধিকার বিস্তৃত করেন।

পূর্ব্ববঙ্গে যাহারা গাজি কালু ও চম্পাবতী কন্যার পুঁথির রচয়িতা এবং প্রচারক তাঁহাদের সকলেরই ধারণা যে, এই পুঁথিতে উল্লিখিত বৈরাটনগর রাজসাহী বিভাগেরই কোথায়ও অবস্থিত। কাজেই এই পুঁথির বৈরাটনগর এবং ফকণ্ডা হইতে আবিষ্কৃত পুঁথির বৈরাটনগর যে একই স্থান এবং তাহাই ফকণ্ডার ৫ মাইল পূর্ব্বে স্থিত বর্ত্তমান আগ্রাদুগুণ, এ বিষয়ে প্রায় নিশ্চিত হওয়া যায়।

বৈরাটনগরের সেকান্দর সাহ গাজি কাল্পনিক লোক নহেন, তিনি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এবং শ্রীহট্টবিজয়ে যে তাঁহার যথেষ্ট হাত ছিল তাহাও কাল্পনিক নহে, তাঁহার ও শিলালিপির প্রমাণ বাহির হইয়াছে। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে Dacca Review পত্রিকার August সংখ্যায় শ্রীযুক্ত H. E. Stapleton-সম্পাদিত East Bengal Notes and Queries স্তম্ভে, তাঁহার ও শ্রীযুক্ত তাসাদ্দক আহম্মদ মহোদয়ের সমবায়ে লিখিত Ghazi Saheb, the Patron-Saint of Boatmen and First Musalman Invader of Sylhet নামক প্রবন্ধে এই সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে এবং সাহ্ জালাল দরগা হইতে সংগৃহীত ও বর্ত্তমানে Dacca Museumএ রক্ষিত একটি শিলা-পাঠ প্রকাশিত হইয়াছে। এই লিপির প্রারম্ভেই লিখিত আছে, "সুলতান ফিরোজ সাহ দেহলাবীর আমলে ৭০৩ হিজরিতে (=১৩০৩ খৃষ্টাব্দে) সেকান্দর খাঁ গাজী কর্ত্তৃক আরসা শ্রীহট্টের প্রথম জয় সাধিত হইয়াছিল।" কাজেই

লিখিত। ক্বচিৎ দুই এক পৃষ্ঠায় ৯ লাইনও লিখিত হইয়াছে। মধ্যে কয়েক পাতা হারাইয়া লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; পুস্তকের যথাস্থানে তাহা নির্দ্দিষ্ট হইল। দুই একটি পৃষ্ঠার একার্দ্ধ লুপ্ত হইয়া পাঠোদ্ধারের ব্যাঘাত জন্মাইয়াছে; ইহা ভিন্ন পুস্তকখানা সর্ব্বত্রই সহজপাঠ্য। পুঁথিখানা অন্যান্য সমস্ত প্রাচীন পুঁথিরই মত প্রথমাংশে ও শেষাংশে কিঞ্চিৎ জীর্ণ।

পুঁথির বর্ণনা।

সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয় অশেষ পরিশ্রমস্বীকারপূর্ব্বক পুঁথির মূলানুগত পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন এবং সম্পাদনকালে, উদ্ধৃতপাঠ মূলপুঁথির সঙ্গে মিলাইয়া আমিও দেখিয়াছি। কাজেই উদ্ধৃতপাঠ সম্পূর্ণ মূলানুগত হইয়াছে বলিয়া আশা করা যায়। মূলপুঁথির বর্ণবিন্যাস উদ্ধৃতপাঠে অবিকল গৃহীত হইয়াছে। ভবানী দাসের ময়নামতীর গানের ভূমিকায় আমি এই মত প্রকাশিত করিয়াছিলাম যে,পাঠোদ্ধারকালে লিপিকারদের স্পষ্ট ভুলগুলি সংশোধন করিয়া পাঠোদ্ধার করা উচিত। এখন আমি দেখিতেছি যে লিপিকারদের ভুলগুলি এতই স্পষ্ট যে তাহা সংশোধিত না হইলেও কাহারও বুঝিতে কষ্ট হয় না। বরং, সংশোধনকালে যাহা আপাতদৃষ্টিতে ভুল বলিয়া মনে হয় অথচ প্রাকৃত রীতি অনুসারে যাহা শুদ্ধ, তাহারও পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া ফেলা সম্ভব। তদনুসারে কান্তনামার পাঠে কোনও পরিবর্ত্তন করা হয় নাই।

ব্যাখ্যা ও পাঠোদ্ধার কাহিনী

কান্তনামার ব্যাখ্যাকার্য্য সম্পূর্ণ আমাদ্বারাই সম্পাদিত হইয়াছে। পুঁথিতে অপরিচিত মুসলমানী শব্দ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে। সেই সমস্ত শব্দের অর্থপরিগ্রহ সকল সময় সহজসাধ্য হয় নাই।

পুস্তকের অষ্টম পাতায় গ্রন্থকার আত্মপরিচয় দিয়াছেন।

দেখা যাইতেছে যে গাজির পুঁথির শ্রীহট্টবিজয়বৃত্তান্ত অমূলক নহে।

তৎকালীন বাঙ্গালার ইতিহাস আলোচনা করিলে এই ব্যাপারের গুরুত্ব বুঝা যাইবে। ১২০০ খৃষ্টাব্দের দুই এক বৎসর আগে পাছে মহম্মদী বক্তিয়ার নদীয়া লুণ্ঠন এবং দেবকোট অধিকার করিলেও তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গে মুসলমান প্রভুত্বের অবসান হয়। বঙ্গের পরবর্ত্তী সুলতানগণ যেখানে সৈন্যসামন্ত লইয়া রাজধানী গাড়িয়া বসিতেন, তাহারই চারিদিকে কিছুদূর পর্য্যন্ত তাঁহাদের অধিকার বিস্তৃত থাকিত। সম্রাট বলবন যখন বঙ্গদেশে আসিয়া বিদ্রোহী সুলতান টোগ্রলকে শাসিত করিয়া ১২৮০ খ্রীষ্টাব্দে স্বীয় পুত্র নসিরুদ্দিন মহম্মদ বগরা খাঁকে বাঙ্গালার সিংহাসনে স্থাপিত করিলেন, তখন হইতেই বাঙ্গালাদেশে রীতিমত শাসনসংরক্ষণ আরম্ভ হইল এবং মুসলমানপ্রভুত্ব দৃঢ়মূল হইতে লাগিল। ১২৮০-১২৯৬ খৃঃ নসিরুদ্দিনের রাজত্ব। ১২৯৬-১৩০২ খৃঃ তৎপুত্র কৈকায়ুসের রাজত্ব। ১৩০২-১৩২২ খ্রীঃ নাসিরুদ্দিনের দ্বিতীয় পুত্র, উপরোক্ত শিলালিপিতে উল্লিখিত সুলতান সামসুদ্দিন ফিরোজ সাহের রাজত্ব। এই তিন রাজত্বে বাঙ্গালা দেশে মুসলমানশাসন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মিনহাজলিখিত তবকতই নাসিরিতে লিখিত আছে যে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে বক্তিয়ার কর্ত্তৃক নদীয়া লুণ্ঠনের পরেও ১২০ বৎসর অর্থাৎ ১৩২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সেনবংশীয় রাজগণ সমতট বঙ্গে রাজত্ব করিতেছিলেন। কাজেই শেষ সেনরাজের রাজত্বও ফিরোজ সাহের আমলেই পড়িতেছে এবং তাঁহার আমলেই সুন্দরবনবিজয়, শ্রীহট্টবিজয় ইত্যাদি সংঘটিত হইয়া সমস্ত বঙ্গে ও আশেপাশে মুসলমানপ্রভুত্ব ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। দেশপ্রচলিত গাজির পুঁথিগুলি এই বিজয়ব্যাপারেরই স্মৃতিবিজড়িত।

যোগেশবাবুর মক্কেলের গৃহে রক্ষিত পুঁথিতে হয়ত এই বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইতে পারে; কারণ, খোদ বৈরাটনগরের অদূরবর্ত্তী ফকগুাগ্রাম হইতেই তাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে। বৈরাটনগর বা বর্ত্তমান আগ্রাদুগুণে প্রকাণ্ড স্তূপ আছে। সেকান্দর খাঁ গাজি কি করিয়া এই স্তূপ ধ্বংস করিলেন এবং স্বীয় অধিকার তথায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তাহার বিবরণও এই পুথিতে পাওয়া যাইতে পারে।

ফতুৰ্ব্বা মণ্ডল নামে ছিল একজন।
তাহার পুত্র খোদাদিন মণ্ডল বিদিত ভুবন॥
তাহার পুত্র মামন মণ্ডল সর্ব্বলোকে কএ।
তাহার পুত্র গুরাই মণ্ডল আমার পিতা হএ॥
জেশ্ট ভাই জানুৰ্ব্বা মণ্ডল আমি কনেশ্ট তার।
জমেউৰ্ব্বা, রহিম, হবিব, কনেশ্ট আমার॥
সরিমৰ্ব্বা, গরিবুৰ্ব্বা বইমাত্র ভাই।
পিতার সপ্ত পুত্র আমরা প্রথক কেহ নাই॥
সকলে চলিয়া গেল আমাকে ছাড়িয়া।
সপ্ত ভ্রাতার মর্দ্ধে রৈলাম আমি অভাগিয়া॥
সপ্তপুত্র নিল আমার মনে দিয়া দুক।
পিতার আগে পুত্র গেলে তারে কিবা যুক॥
লেখিতে তাহার নাম প্রাণ জারে জার।
কলেজা না লএ বার কি লেখিব আর॥

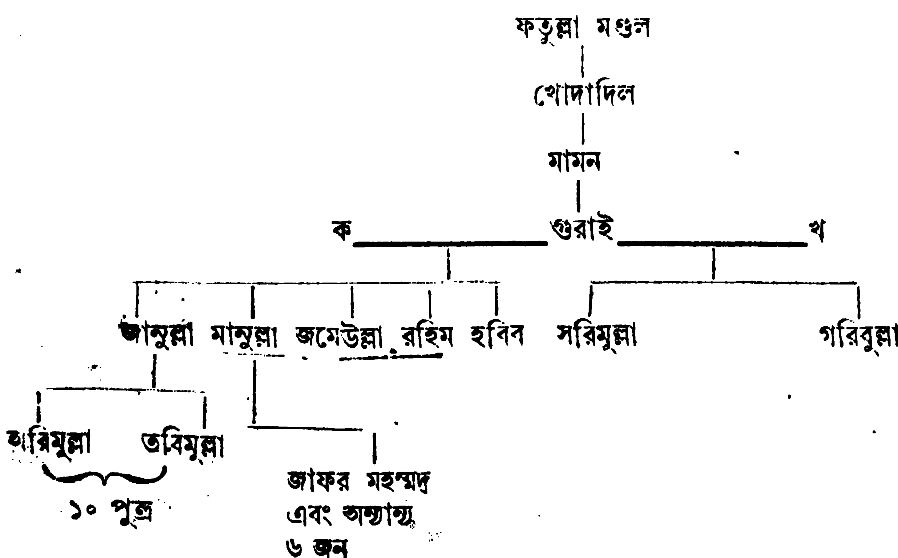
গ্রন্থকারের পরিচয়। তাহার নাম নির্দ্দেশ। পুস্তক রচনার কাল।

পুত্র ভ্রাতা গেল আমার ক্ষিত্তির কারণে।
খাইতে লইতে সদাএ পুত্র পড়ে মনে॥
হাএরে দারুন বিধি কেনে দিলে দুক।
সএঅন স্বপনে দেখি পুত্রের চন্দ্রমুক॥
আরিমুৰ্ব্বা তারিমুৰ্ব্বা ভাতিজা দুইজন।
জাফর মহাম্মদ আমার বন্ধিল নিরাঞ্জন॥
এই তিনটি বন্ধ কৈল জগতের নাথ।
বুঝিতে না পারি আমি কি হএ প্রর্চ্ছ্যাত॥
ক্ষিত্তের কারণে আমার কুড়িজন গেল।
এসব লইয়া বিধি মন তরক্কিল॥ *

তৃতীয় পাতার ২য় পৃষ্ঠায় এবং চতুর্থ পাতার ১ম পৃষ্ঠায় আরও আত্মপরিচয় আছে।

সপ্ত পুত্র ছএ ভাই সকল বিধির ঠাঞি
ভ্রাতা পুত্র গেল তিন (দুই ?) জন।

* বংশাবলি।



ভ্রাতাবধু ঘরের লোক পাইয়া পুত্রের সোগ
একে একে মৈল কুড়ি জন।
জেষ্ট ভ্রাতার দুটি পুত্র আমার একটি যুত্র
বধ্ব কৈল আপে নৈরাকার।

* * *

দুই ভাতিজার দশ ছাইলা সে হি কৈল মন ভুলা
খেনে খেনে আসি ধরে গলা।

* * *

পুরি হৈল সঙ্গারন ভক্ষি হৈল পোরা অন্ন
প্রাণ আর বাচিতে নাহি আশা।
এহি রূপে নিরাঞ্জন বুঝেন আমার মন
সজ্যাএ আমার হএ ছাইএর বাসা।

উদ্ধৃত আত্মপরিচয়াত্মক স্থান হইতে গ্রন্থকার মিঞা সা মানুল্লার বংশাবলি পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় পাদটীকায় প্রদত্ত হইল।

শেষজীবনে আত্মীয়বিয়োগশোকজর্জ্জরিত অবস্থায় গ্রন্থকার পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। গ্রন্থরচনার সময় গ্রন্থকারের ছয় ভাই, তিন ভাতিজা, ৭ পুত্র, নিজের স্ত্রী এবং ভ্রাতৃবধূগণ লইয়া পরিবারের বিশ জনের মৃত্যু হইয়াছে। তাহার উপর গৃহদাহ হইয়া সমস্ত পরিবার নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছে। ৮ পাতার প্রথম পৃষ্ঠার চতুর্থ ছত্রে দেখা যায় যে কবির নিজেরও শারীরিক অবস্থা বড় ভাল ছিল না। মনের অবস্থার পরিচয়—

আমার অন্তরে দুক মনে কিছু নাহি যুক
সোগ চিন্তা সদাএ পোরে হিয়া।
ভাই ভাতিজা পুত্র সোগ তাথে নাহি নিদ্রা ভোগ
কি মতে রহিব বিস্মরিয়া॥
খেনে আমার মন রাগে ধরি খাএ বনের বাঘে
তবে আমার জুড়াইত হিয়া।
নাহি পাই পথের দিশ খায়া মরি জহর বিস
নহে মরি জলে ঝাম্প দিয়া॥ ৪।২।১৪-২১

এই অবস্থায় কাব্য রচনা করা অসাধারণ ধৈর্য্য ও মনের বলের পরিচায়ক।

মানুল্লা মণ্ডলের বাড়ী দিনাজপুর জেলাস্থিত বর্ত্তমান বালুরঘাট পরগণার অন্তর্গত কুকণ্ডাগ্রামে ছিল। তথায় গ্রন্থকারের বংশধরগণ এখনও বাস করিতেছে। গ্রন্থকার প্রাতঃস্মরণীয়া পুণ্যবতী মহারাণী স্বর্ণময়ীর স্বামী মহারাজ কৃষ্ণনাথের সমসাময়িক ছিলেন। গ্রন্থরচনাকালে গ্রন্থকারের বৃদ্ধাবস্থা, এবং কৃষ্ণনাথ তখন জমীদারীর ভার পাইয়াছেন। গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠায় অনেক কাটাকুটী দেখা যায় এবং তাহার মধ্যে ১২৫০ এই সনটি লিখিত দেখা যায়। ১২৫২ সনে মহারাজ কৃষ্ণনাথ পরলোকগমন করেন। কাজেই এই ১২৫০ সনটিই পুস্তকরচনায় বৎসর, সেই বিষয়ে একরূপ নিশ্চিত হওয়া যায়।

গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠাতে অত্যন্ত কাটা কুটি ও পরিবর্ত্তন দেখিয়া এবং বাকী সমস্ত পৃষ্ঠা পরিষ্কৃতরূপে লিখিত দেখিয়া এই সিদ্ধান্ত হয় যে, শেষ পৃষ্ঠাখানা কবির আদিরচনার নিদর্শন। বাকী পৃষ্ঠাগুলি আদিরচনার পুঁথি হইতে পরিষ্কৃত নকল; তবে এইখানি যে আগাগোড়া গ্রন্থকারের স্বহস্তে লিখিত এবং মূলপুঁথি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। কারণ, মানুল্লা মণ্ডলের নাতির নিকট অবগত হইয়াছি যে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে এক মানুল্লা মণ্ডলই ভাল লেখনদার ছিলেন। কান্তনামা, ময়নামতীর গান, বৈরাট নগরের পুঁথি এবং অন্যান্য যত পুস্তক তাঁহার বাড়ীতে দেখিয়াছি, তাহা সমস্তই এক হস্তলিপিতে লিখিত। কাজেই এই সমস্ত পুথিই মানুল্লা মণ্ডলের স্বহস্তলিখিত এবং আমাদের সংগৃহীত কান্তনামাও যে গ্রন্থকারের স্বহস্তলিখিত মূলপুঁথি, এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য। পূর্ব্বকালে একখানা কাব্য লিখিত হইলেই তাহা পালা বাঁধিয়া গীত হইত এবং দশজনে তাহা নকল করিয়া লইত। কান্তনামাও যে সভাতে গাহিবার আশায়ই লিখিত হইয়াছিল স্থানে স্থানে তাহার পরিচয় আছে। কান্তনামা বা রাজধর্ম্ম পুস্তকের কিরূপ প্রচার হইয়াছিল, সে অনুসন্ধান করিবার সুযোগ পাই নাই।

প্রাচীন কবিগণ স্বপ্নে আদেশ পাইয়া পুস্তক রচনা করিতেন। যে দেব বা দেবীর মহিমা কাব্যে কীর্ত্তিত হইবে,

তিনি স্বপ্নে আসিয়া কবিকে আদেশ জানাইতেন এবং

স্বপ্নাদেশে পুস্তক রচনা

স্বপ্নাদিষ্ট কবি তদনুসারে কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। কাব্যে প্রায়ই এই স্বপ্নব্যাপারের বিস্তৃত বর্ণনা থাকে এবং স্বপ্নে অবিশ্বাসী জনগণকে কাব্যকীর্ত্তিত দেব বা দেবীর কোপের ভয় দেখান হইয়া থাকে। মানুল্লা মণ্ডলও স্বপ্নাদেশে রাজধর্ম্ম রচনা করিয়া কান্তবাবুর বংশের, বিশেষতঃ, মহারাজ হরিনাথের ও কৃষ্ণনাথের কীর্ত্তি জগতে ঘোষণা করিয়াছেন। চতুর্থ পাতার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় এবং পঞ্চম পাতায় এই স্বপ্নাদেশের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। স্বয়ং ভগবান্ আসিয়া স্বপ্নে তাঁহাকে মহারাজ হরিনাথের কীর্ত্তি রচনা করিয়া পুত্র কৃষ্ণনাথকে শুনাইতে আদেশ করিয়াছিলেন। জমীদারের জমীদারীতে বাস করিয়া তাহার পরিবারের ইতিহাস লইয়া অধিক আলোচনা যে প্রজার পক্ষে নিরাপদ নহে, মানুল্লা মণ্ডলের সেই জ্ঞান বিলক্ষণ ছিল। পিতা বৈকুণ্ঠে গিয়াছেন, কিন্তু প্রজার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করার ফলে সেখানে গিয়াও তিনি শান্তি পাইতেছেন না, পুত্র কৃষ্ণনাথকে এই কথা শুনাইলে তিনি কি মূর্ত্তি ধারণ করেন, সে বিষয়ে মানুল্লা মণ্ডলের মনে যথেষ্ট অনিশ্চিততা ছিল। তাই "প্রাণ তরসিয়া লিখি মহারাজার বাণী" এই পদটি প্রায়ই মধ্যে মধ্যে দিয়া দিয়াছে। রাজধর্ম্মপুস্তক মহারাজ কৃষ্ণনাথের নয়নগোচর করিতে কখনও গ্রন্থকারের সাহস হইয়াছিল কি না সন্দেহ। এই রাজভয়, জনাপবাদভয়, উভয় ভয়ই ভগবানের আশ্বাসে নিবারিত হইয়াছিল :—

সন্ধ্যাতে বসিয়া আমি ভাবি এ আপনে।
প্রভাতের সপন মিথা নহে ত কখনে ॥

* * *

সপনে প্রতিএ বাক্য নহেত কখন ॥
আরত রাজার ক্বিত্তি লেখিতে লাগে ভএ।
না জানি বাসিবে মন্দ রাজ মহাশএ ॥
আমিত পরজা বটে সেহি রাজেস্বর।
না জানি বাসিবে মন্দ হইয়া পাসর ॥

এহি চিন্তা করি আমি আপনা আপনি।
আচম্ভিতে রাওাজ হইল সুন্য বানি।
আপনার ক্বিত্তি যুনি তোমাক মন্দ কয়।
তাহার বিচার আমি করিব তথা এ ॥ (৬ষ্ঠ পাতা)

* * *

আপোন প্রিদিষ্টা কিছু না লিখি আপনি।
লাচার হইয়া লিখি ইস্বর বাচনি ॥

* * *

প্রাণ তরসিয়া লিখি বড় লাগে ডর।
নাচার কে মন্দ যেনে জানিবে ইস্বর। ৯।১।১১-১২

* * *

মন দিয়া যুনে জদি রাজধর্ম্ম পুঁথি।
ধনে বংশে সংসারে তাথে বাঢ়াএন বিধি ॥
এক মনে যুনে জদি রাজধর্ম্ম বাণী।
বৈকণ্ঠে যাইবা স্থান এই বাক্য যুনি ॥
রাজধর্ম্ম পুস্তক জে বা উপহাস্ব করে।
বংস্ব নাশ হবে তার নরক্য আথেরে ॥ ৯।২।১৭-১৪

ভগবান তাঁহাকে দিয়া রাজার কীর্ত্তি লিখাইয়া লইবেন, এইজন্যই বারে বারে তাহাকে আত্মীয়বিয়োগ, শোক, গৃহদাহ, রোগ ইত্যাদি দিয়া পরীক্ষা করিয়া লইয়াছেন এবং লইতেছেন, মানুল্লা মণ্ডল এই কথা গ্রন্থমধ্যে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

পুস্তকে বর্ণিত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত সার

"শ্রীশ্রীহরি সহাএ"—বলিয়া পুস্তক আরম্ভ হইয়াছে এবং প্রথম দুই পাতা হরির স্তবে পূর্ণ। ৩।১ পৃষ্ঠায় মহারাজ কৃষ্ণনাথের প্রসঙ্গের অবতারণা হইয়াছে।

হরিনাথ রাজার ঘরে পুত্র হৈল ইস্বরে
সংসারেতে ক্বিত্তি রাখিবার।
রাজকুল উর্দ্ধারিতে আইল রাজার ছিতে
শ্রীকৃষ্ণনাথ রাজা নাম জার ॥

শ্রীকৃষ্ণনাথ রাজা নাম রূপ দুর্ব্বাদল শ্যাম
রাজপদে ভক্ত অতিশএ।
কেহত চিন্থিতে নারে জশ ক্রিত্তি সংসারে
ক্রিত্তি জাহার ভুবন বিজএ॥
যে জন শরন লএ ক্রিপাযুক্ত তারে হএ
অনাসে বাচেন সেহি জন
নিজরূপ নাহি ধরে রাজারূপে ক্রিপা করে
কে বুঝিতে পারে তাহার মন॥

* *

রাজছত্র মাগে জারে বর্ন্নভেদ কিবা তারে
ছত্তিস বর্ন্নের সিরমণি।
নিজরূপ আচ্ছাদনে থাকে রাজা সর্ব্বক্ষণে
তাহার পদ দেখিব কেমনি॥

ভগবান আসিয়া কবিকে স্বপ্নাদেশ করিলেন যে তুমি এই কৃষ্ণনাথের "পিতা উদ্ধারন"-রূপ কীর্ত্তিগাথা রচনা কর। কবি রোগ, শোক, লোকের উপহাসের ভয় ইত্যাদি ওজর আপত্তি দেখাইলেন, কিন্তু ভগবানের আশ্বাসে সব দূর হইয়া গেল, এবং—

এহি বলি কাগজ কলম হস্তেত করিয়া।
দুএটি অক্ষর লিখি বালিস হিলা দিয়া॥
দুএটী অক্ষর জখন লিখিলাম আপোনে।
জহমত বেরাম যুপ্ত হইল তখনে॥
ভালা মতে বসিলাম হিলানি ছাড়িয়া।
ধন্দ হৈল লোকজন আমাকে দেখিয়া॥
ইশ্বর ভাবিয়া আমি করিলাম ধিয়ান।
আমার অন্তরে হৈল পদের জোগান॥
তবে জহমত আমার হৈল বিমচন।
একিল্লা হইয়া কৈল্লাম পুথির পত্তন॥
গোসাঞি ভাবে কহে বাক্য অন্তরে আমার।
পুস্তকে লিখিএ আমি করিয়া পেচার॥
আপোনি প্রিদিষ্টা কিছু না লেখি আপনি।
লাচার হইয়া লিখি ইশ্বর বাচনি॥

অতঃপর, নিজের বংশের পরিচয় দিয়া কবি রাজধর্ম্মপুস্তক রচনার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছেন—

যুনিতে পাইলে রাজা করে পিত্রি কাজ।
তবে পিতা রৈক্ষা পাএ বৈকণ্ঠের মাজ॥

এবং রাজধর্ম্ম পুস্তকের নিন্দা করিলে কি শাস্তি ভোগ করিতে হইবে, তাহারও আভাস দিয়াছেন। অতঃপর, ধর্ম্মরাজ, নল, হরিশ্চন্দ্র, যুধিষ্ঠির ইত্যাদি রাজপুণ্যফলে এবং পুত্রবৎ প্রজাপালনের সুকৃতিতে কিরূপে অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিয়াছেন, আর শ্রীচন্দ্র নামক রাজা পিতার মৃত্যু এবং পুত্রের অন্নপ্রাশন ও বিবাহ উপলক্ষে প্রজার নিকট হইতে তিন গুণ "বাবত" অর্থাৎ ট্যাক্স একবারে আদায় করিয়াছিল বলিয়া কিরূপে নরকে গিয়াছিল, তাহার বিবরন লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই পাপ-কাহিনীর উপর কবির মন্তব্য—

ধর্ম্মি রাজা হৈলে সে বাবত লৈবে কেনে।
প্রজা আদি পালিবেক পুত্রের সমানে॥
পাপ বাক্য শ্রবণে হয় অপবিত্র তন।
দেহ পবিত্র জর্ন্নে হরি বোলে সর্ব্বজন॥

অতঃপর, দানবীর বলি ও কর্ণের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়া কবি কৌশলে কাশিমবাজারের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কান্তবাবুর প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন—

সেহি মতে পুর্ন্নমন্ত কান্ত বাবু ছিল।
প্রধান পুত্রকে ভেজি ইশ্বরে সম্পিল॥
জগতের নাথ তাহে প্রছন্ন হইল।
পুর্ন্ন ফলে কান্তবাবু মহারাজা হৈল॥
কান্তবাবুর পিতা ছিল অন্ত বাবু নান।
পুত্র পুর্ন্নে হৈল তার বৈকণ্ঠেত ধাম॥

* * *

রাজা হৈল কান্ত বাবু দোয়ানি পরগনা।
সহজে আদায় কৈল মুলুকের খাজানা॥
মুলুকে ফিরিল কান্ত বাবুর দোহাই।
জাহার সমো পুন্নিমন্ত রাজা কেহ নাই॥

ছুটি যাই ভেরকলম ছিল কপাল উপরে।
রাজা হৈল কান্ত বাবু সন্ধ্যাহার্ত্যরে॥
এগারো সত্ত বাহার্ত্যরে হৈল জমিদার।
ঈশ্বর প্রচ্ছন্ন হৈল কপালে তাহার॥
সর্ব্ব রাজার দুইআনা নির্ম্ময় না জানি।
ভূমের নাম হৈল কান্তবাবুর দোয়ানি॥
ছুকু পায়া মোহারাজা ফিরাএ পরোআনা।
আপন নামে কান্ত নগর করিল পরগনা॥
কান্ত নগর পরগনা কান্ত বাবুর নাম।
মানিল পরজা সব করিয়া সেলাম॥

কান্তবাবু অল্পায়রূপে "বাবত" না লইয়া প্রজাপালন করিতে লাগিলেন, তাঁহার জমীদারীতে প্রজাগণ মহাসুখে বাস করিতে লাগিল। বাহিরবন্দনামক নবপ্রাপ্ত জমীদারী কিন্তু অত সহজে কান্তবাবুর শাসন মানিয়া লইল না। সেখানে প্রজাগণ সকলেই ধনী, অনেকের বাড়ীতেই হাতী আছে, তাহারা সকলে বিদ্রোহী হইয়া বসিল। প্রজাশাসন করিতে কান্তবাবু সসৈন্যে সাজিয়া গেলেন এবং বিশ দিনে বাহিরবন্দ অধিকার করিলেন। প্রজাগণ তবু বশ মানিল না দেখিয়া প্রাচীন প্রথামত তাহাদের ঘরবাড়ী জ্বালাইয়া দিলেন। তখন প্রজাগণ বশ মানিল এবং তিন সনের বাকী খাজানা একবারে আদায় হইয়া গেল। মাল্লা দেওয়ানের সময় এই সকল কাহিনী তাজা ছিল; লোকমুখে শুনিয়াই তিনি বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যথা—

"আমি কিবা জানি ভাই গুরুর মুখে শুনি।
রচিল মাল্লা দেওান মহারাজার বাণী॥

অতঃপর, নানা দানধর্ম্ম করিয়া কান্তবাবু স্বর্গে গেলেন এবং লোকনাথ জমীদারী পাইলেন। লোকনাথও

"বাবত বলি কয়া করি না নিল কখন।"

এবং সুখে রাজত্ব করিয়া নাবালক পুত্র হরিনাথকে রাখিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন। নাবালক হরিনাথের সময় প্রজাগণ বড় দুঃখে পড়িল। দুষ্ট কর্ম্মচারীবর্গ ছল করিয়া বাবত লইয়া প্রজাবৃন্দকে কষ্ট দিতে লাগিল। প্রজার প্রদত্ত খাজানা নিজেরা আত্মসাৎ করিয়া প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়াছে এই রটনা করিয়া জমীদারী ইজারা দিতে লাগিল। বিপন্ন হইয়া—

এই বলি আরাধন করে প্রজাগণ।
সাবালক হৈয়া পাটে বসুক রাজন॥

প্রজার প্রার্থনায় ভগবান সদয় হইলেন এবং হরিনাথ—

"সাবালক হৈয়া জখন পাটে হৈল রাজা।
পূর্ব্ব মত পালন কৈল যতেক পরজা।"

ক্রমে হরিনাথের ঘরে পুত্র জন্মিবার সময় হইল এবং কাহাকে পুত্ররূপে পাঠান যায় ভাবিয়া ভগবান চিন্তিত হইলেন। অবশেষে অনেক চিন্তা করিয়া এই ঠিক করিলেন যে নিজেই হরিনাথের পুত্র কৃষ্ণনাথরূপে জন্মগ্রহণ করিবেন। এমন সময় ব্রহ্মা আসিয়া আপত্তি করিলেন যে, হরির দশ জন্মই খ্যাত; তাহার মধ্যে নয় জন্ম হইয়া গিয়াছে, আর মাত্র কল্কীজন্ম বাকী আছে। এ অবস্থায় আর এক জন্ম কি করিয়া হইতে পারে? কৃষ্ণনাথজন্মের কথা গুপ্তভাবে থাকিবে বলিয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া ভগবান কৃষ্ণনাথরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। এই খানে রাম, কৃষ্ণ এবং নিমাইরূপে ভগবানের জন্মগ্রহণ করিবার কিছু কিছু বিবরণ আছে। কৃষ্ণনাথের ষষ্ঠী এবং অন্নপ্রাশন খুব ধুমধাম করিয়া নিষ্পন্ন হইল। ষষ্ঠীর দিন বিধাতাপুরুষ আসিয়া অন্যান্য সুকৃতির সঙ্গে কৃষ্ণনাথের কপালে নাবালক থাকিতে পিতার মৃত্যু এবং মাতা হরসুন্দরীর সহিত কিছু বিবাদ লিখিয়া গেলেন। এদিকে ইজারাদারের অত্যাচারে অস্থির হইয়া প্রজাগণ এক দিবস হরিনাথের নিকট নালিশ জানাইতে আসিল। কিন্তু হরিনাথ সে নালিশ গ্রাহ্য করিলেন না, বরং প্রজাগণ নিজ খরচে খাইয়া দারোয়ানের নিকট লাঞ্ছিত হইয়া বিষণ্নমনোরথ হইয়া অশেষ কষ্ট পাইয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল।

"কুন মতে জাইতে তারে না দিল দরানি।
ফিরিয়া জাইছে প্রজা চক্ষের মোছে পানি।
প্রজা বোলে রাজা দুঃখ না শুনিল কানে।
দুঃখ বুঝি লিখিআছে নাথ নিরাজনে॥"

* * * *

ছএ রোজের পথ আসিয়াছি আগরিয়া।
রাজা না যুনিল দুক্ষ জাব কি খাইয়া ॥

এই অপরাধে ভগবান হরিনাথের "গুহ্য" লিখিলেন। হরিনাথের মৃত্যু হইল। পূর্ব্বকৃত পুণ্যের ফলে হরিনাথ বৈকুণ্ঠে গেলেন বটে, কিন্তু সেখানকার সকল সুখভোগের মধ্যেও প্রজাগণ তাঁহার বাড়ীতে নিজ খরচে খাইয়া এবং তদভাবে উপবাসী থাকিয়া যে ক্ষুধার জ্বালায় জ্বলিয়াছিল, তদনুরূপ জ্বালা বৈকুণ্ঠেও হরিনাথকে অস্থির করিয়া তুলিল; কিছুতেই তাহার জ্বালা কমে না, গায়ে যেন মোটেই হাওয়া লাগে না। এমন সময় একদিন ভগবান এক বৃদ্ধ গণক-ব্রাহ্মণের রূপ ধরিয়া রাজাকে গণিয়া জানাইয়া গেলেন যে, প্রজার নালিশ না শুনাতে এবং প্রজা যে তাঁহার বাড়ী আসিয়া নিজ খরচে খাইয়াছে এবং তদভাবে উপবাসী রহিয়াছে, এই অপরাধে তাঁহার এই দুর্দ্দশা। কেহ যদি তাঁহার কীর্ত্তিগাথা রচনা করিয়া জগতে প্রচার করিয়া তাঁহার এই জ্বালার কথা মহারাজ কৃষ্ণনাথকে জানায়, তবে তাহা শুনিয়া মহারাজ কৃষ্ণনাথ দানধ্যান এবং প্রজার প্রতি ন্যায় ব্যবহার করিবেন। তাহা হইলেই তাঁহার গাত্রদাহ নিবারিত হইবে। অবশেষে ভগবান কৃপাপরবশ হইয়া হরিনাথকে নিজ মূর্ত্তিতে দেখা দিয়া তাঁহার ছয় আনা গাত্রদাহ নিবারিত করিয়া গেলেন, এবং নরলোকে তাঁহার কীর্ত্তি প্রচারিত করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

এদিকে হরিনাথের মৃত্যুর পর শ্যামকিশোর নামক ইজারাদারের অত্যাচারে প্রজাগণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল এবং ঘরবাড়ী ছাড়িয়া পলাইতে লাগিল। অবশেষে কৃষ্ণনাথ রাজা হইয়া প্রজাগণকে পুত্রবৎ পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পুণ্যে অষ্টাদশ পুরুষ পর্য্যন্ত মুক্তি পাইয়া বৈকুণ্ঠে গেলেন এবং হরিনাথের গাত্রদাহও নিবারিত হইল। পরিশেষে, কৃষ্ণনাথের এক অত্যুক্তিপূর্ণ স্তুতিগাথা দ্বারা পুস্তক সমাপ্ত হইয়াছে।

পুস্তকের গুরুত্ব এবং নূতনত্ব

রাজধর্ম্ম পুস্তকখানি যে নূতন ধরণের, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। পৌরাণিক এবং জনশ্রুতিমূলক চরিতাখ্যান লইয়া কাব্যরচনা বাঙ্গালা সাহিত্যে বহুলভাবে প্রচলিত থাকিলেও, ঐতিহাসিক এবং সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গের কথা কাব্যাকারে লিপিবদ্ধ করার উদাহরণ অভিনব। সমসাময়িক বিখ্যাত ঘটনাবলি লইয়া গাথা রচনা করিবার প্রথা ছিল বটে, কিন্তু সে গাথাবলি কখনও কাব্যপদবীবাচ্য হইয়া উঠে নাই। মানুল্লা দেওয়ান সমসাময়িক এবং পরিচিত ঘটনাবলি লইয়া রাজধর্ম্ম রচনা করিয়াছেন, এবং খুব উৎকৃষ্ট না হইলেও প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যাবলির মাপকাঠিতে মাপিলে তাঁহার পুস্তককে কাব্য বলিয়া অসঙ্কোচে নির্দ্দেশ করা যায়। তাঁহার রচনা সর্ব্বত্র সতেজ ও সরল, এবং স্থানে স্থানে এমন স্বাভাবিক ভাবস্ফূর্ত্তি হইয়াছে যে তাহাতে হৃদয় স্পর্শ করে। মহারাজ হরিনাথের পুত্রজন্মোৎসব বর্ণনা করিতে করিতে সহসা তাঁহার নিজের পরলোকগত পুত্রের কথা মনে পড়িয়া নয়ন সলিলসিক্ত হইয়া গিয়াছে; যথা :—

"পুত্র কথা আমার বেথা চক্ষে আমার কুহা।
মস্তকে উঠিছে আমার পুত্রসোগের ধুঙা॥"

২৪।১।২৭—১৮

এই দুই ছত্রে পুত্রবিয়োগকাতর পিতৃ-হৃদয়ের একখানা এমন করুণ ছবি সহসা আমাদের নয়নসমক্ষে ফুটিয়া উঠে, যাহার তুলনা নাই। কোম্পানির আমলের ইজারাদারের অত্যাচারের কথা এখন ইতিহাসের বিষয়ীভূত; এডমাণ্ড বার্ক অগ্নিময়ী ভাষায় তাহা অমর করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু "প্রাণ তরঙ্গিয়া" মানুল্লা দেওয়ান শ্যামকিশোর রায়ের অত্যাচারের যে চিত্র রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার মূল্য বঙ্গীয় সাহিত্যিক এবং ঐতিহাসিকবৃন্দের নিকট অল্প হওয়া উচিত নহে। বার্কের অগ্নিময়ী ভাষার সহিত উপমিত হইতে না পারিলেও, এই চিত্র করুণ-রসে মনকে দ্রবীভূত করে; যথা :—

আগিলা ইজারাএ প্রজা হৈয়াছে গিসস্ত।
সামকিসর কালেট্যরিত কৈল বন্দোবস্ত ॥
কালেট্যরিত ডৌল লইয়া করিল ইজারা।
মুলুকে জাইয়া কৈল পরগনা উজারা ॥
মশিদা কাথরপুরি করিয়া আপনে।
দোয়ানি দেখিতে চাহে কহেন এখনে ॥
তাহা যুনি ভাবে সব ভ্রত প্রজাগণ।
না জানি লেখিল দুস্ক নাথ নিরাঞ্জন ॥
মার সব্দ বিনে-বাক্য আর কিছু নাই।
এমন লোক নাহি বাক্য বোলে তার ঠাঞি ॥
হাল খাজানা বকয়া করি এখেবারে চিঠি।
কম্পিত হইল জেন দোয়ানির মাটি ॥
তিন সনে বকয়া লৈতে হুকুম কালেট্যরি।
তিন মাসে সকলকার লৈল আদায় করি ॥
হেন লোক নাহি বাক্য বোলে তার পাশে।
হাল খাজানা বকয়া করি নিল তিন মাসে ॥
রাজা হৈলে দয়া বুঝে অন্যে নাহি জানে।
নানহানি বাবত করি লএ প্রজার স্থানে ॥
নত শত বেচি নিল আর তাম্যা কাশা।
কহিতে না মানে কিবা হুরুমতের ভরসা ॥
জল বিনে খেত নাহি ঘরে যুশার নাঞি।
হাকিম হৈল দুরাচার পলাইয়া জাই ॥
জার ঘরে যুসার আছে সেই দিল টাকা।
জার ঘরে যুসার নাহি হৈল পলাতোকা ॥
আমরা পলাইতে নারি জীবনের আস।
সপ্ত পুরুস হৈল আমার এহি গ্রামে বাস ॥
উঠি উঠি তিন সনে কম হৈল জল।
তাতে খেত থোরা হএ প্রজার টলমল ॥
নানহা ছলে ইজারাদারে বেশী করি লএ।
এহি রূপে পলাতকা হৈল পরগনায় ॥
আমরা পলাইতে নারি ভাবিএ ইশ্বর।
কতো দিনে হৈবে রাজা পাটের উপর ॥

অতঃপর, কবি শ্যামকিশোর রায়কে নরকে পাঠাইয়া এই বর্ণনার শেষ করিয়াছেন,—

জেমন শ্যামকিশোর-রায় দৌরাত্ম করিল।
ইশ্বরের হুকুমে সেহি জমালএ গেল ॥
নরকৈ মজিবে জাবত চন্দ্র দিবাকর।
ইশ্বর নারাজ হৈল তাহার উপর ॥

মাহুল্লা দেওয়ান রাজধর্ম্ম কি উদ্দেশ্যে লিখিয়াছিলেন, শত স্বপ্নাদেশের দোহাই দিলেও তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। তাঁহার অত্যুক্তিপূর্ণ স্তুতিগাথা স্থানে স্থানে অত্যন্ত বিরক্তিজনক সন্দেহ নাই, কিন্তু কবির সাহসকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতে হয়। পূর্ব্বকালে প্রজার উপর জমীদারদের অসীম ক্ষমতা ছিল; জমীদার কোপিত হইলে প্রজার সর্ব্বনাশসাধনে তাহাকে বেশী বেগ পাইতে হইত না। এ অবস্থায় জলে থাকিয়া কুম্ভীরের বিষয় আলোচনা করায় কবির বিশেষ সাহস প্রকাশ পাইতেছে। কারণ, ভগবানের অবতার বলিয়া স্তুতি করিলেই যে মহারাজা কৃষ্ণনাথ খুসী হইবেন, এবং পিতা স্বর্গে গিয়াও প্রজার প্রতি অন্যায় অত্যাচার করার ফলে শান্তিতে নাই, এই কথা প্রজার মুখ হইতে অবিচলিতভাবে শ্রবণ করিবেন, সে বিষয়ে কিছুই নিশ্চিতত্ত্ব ছিল না। এই প্রকার রাজভয় মস্তকে লইয়াও এবং "প্রাণ তরসিয়া লিখি মহারাজার বাণী" বারে বারে বলিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে যে, তিনি রাজধর্ম্ম, অর্থাৎ প্রজার প্রতি জমীদার কিরূপ ব্যবহার করিবেন, তাহার আদর্শ আঁকিতে সমর্থ হইয়াছেন—ইহাতে কবির যথেষ্ট প্রশংসাই করিতে হয়।

মামুল্লা দেওয়ানের প্রস্তাবিত রাজধর্ম্মের মূল, সূত্র—

রাজা হৈয়া নিতি প্রিতি না বৈসে পাটতে।
প্রজার দুক্ষ নাহি যুনে দোষ আছে তাথে ॥
আপন খরচে প্রজা রাজার পুরে খাএ।
তাথে উপবাসী হৈলে শেহ দোস হএ ॥ ২৮।২।৫-৮

* * *

রাজা হৈলে পিতা হএ প্রজা হএ বেটা।

* * *

ধৰ্ম্মি রাজা হৈলে সে বাবত লৈবে কেনে।
প্রজা আদি পালিবেক পুত্রের সমানে॥ ১২-১৩ পাতা।

দেখা যাইতেছে যে নিয়মিত খাজানা দিতে সেকালের প্রজারা কিছুমাত্র কাতর হইত না, কিন্তু বাবত বা অন্যায় টাক্‌স দিতে হইলেই তাহাদের গায়ে অত্যন্ত বাধিত, এবং জমীদারের সর্ব্ববিধ অত্যাচারের মধ্যে, বাবত লওয়াটাই তাহারা নিতান্ত অসহ্য মনে করিত।

মানুল্লা দেওয়ানের পুস্তকে মহারাজ কৃষ্ণনাথ ও হরিনাথের যে সকল কর্ম্মচারী ও পার্শ্বচরের নাম আছে, তাহারা হয়ত এতদিনে বিস্মৃতির অতল জলে ডুবিতে আরম্ভ করিয়াছে; কিন্তু এই পুস্তকপ্রচারে তাহাদের স্মৃতি আরও কিছুদিন জাগিয়া থাকিবে বলিয়া আশা করা যায়।

পুস্তকের ভাষায় বিশেষ কিছু বৈচিত্র নাই; তবে মুসলমানী শব্দের প্রাচুর্য্য দেখা যায়, এবং মুসলমান কবির রচিত পুস্তকে তাহা স্বভাবতঃই আশা করা যায়। লিপিবৈচিত্র্যের মধ্যে লক্ষ্যের যোগ্য এই যে 'ি' কার সর্ব্বদা বামধারে একটি সরল রেখামাত্র দ্বারা লিখিত হইয়াছে। কবির ধর্ম্মবিষয়ে উদারতা লক্ষ্যের যোগ্য; ভগবানকে হরি, ঈশ্বর এবং নিরঞ্জন বলিয়া অধিকাংশ স্থানেই উল্লেখ করিয়াছেন। পুস্তকপাঠে মনে হয়, মুসলমান শাস্ত্র অপেক্ষা হিন্দুদের পুরাণকথা ইত্যাদির সহিতই তাঁহার পরিচয় ঘনিষ্টতর ছিল।

পরিশেষে, বালুরঘাটস্থ উকীল বন্ধুবর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বি, এল, মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত বি, এ মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। যোগেশবাবু সংগ্রহ করিয়া না দিলে এই পুস্তক আমি কখনই পাইতাম না; আর সুরেশবাবু অসীম ধৈর্য্যের সহিত একটি মূলানুগত পাঠ প্রস্তুত করিয়া না দিলে, এত শীঘ্র এই পুস্তক প্রচারিত হইতে পারিত না, এবং পাঠোদ্ধার ও সম্পাদন এই দুই কার্য্য কখনও আমার দ্বারা হইয়া উঠিত কিনা সন্দেহ।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।

কৈশোরের পূর্ব্বাবস্থা

শিশু-জীবনের অষ্টম হইতে দ্বাদশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সময়কে কৈশোরের পূর্ব্বাবস্থা বা প্রাক্-কৈশোর (Pre-Adolescence) বলা যাইতে পারে। মানব-জীবনের এই সময় অতি বৈচিত্রময়। শিশুদের দন্তোদ্ভেদ-কার্য্য এই সময়ে প্রায় শেষ হইয়া আইসে, মস্তিষ্কও পূর্ণাকৃতি প্রাপ্ত হয়। স্বাস্থ্যের অবস্থাও যেমন এই সময়েই সর্ব্বোৎকৃষ্ট থাকে, কাজ করিবার শক্তি ও প্রবৃত্তিও তেমনি প্রবল হয়। কষ্ট-সহিষ্ণুতা, ক্লান্তি-সহন-ক্ষমতা প্রভৃতি গুণ-রাজিরও এই সময়েই ক্রম-বিকাশ হইতে থাকে। বালক-বালিকাগণ আর এখন সদাসর্ব্বদা ঘরের রুদ্ধ বায়ুতে আবদ্ধ থাকিতে বা বয়োবৃদ্ধগণের আদেশানুসারে পরিচালিত হইতে ইচ্ছা করে না। সর্ব্বপ্রকার অনুভূতি-শক্তি এই সময়ে অত্যন্ত প্রখরতা প্রাপ্ত হয়, এবং সদসদ্‌বিচারক্ষমতা, ধর্ম্মানুরাগ, সমবেদনা, ভালবাসা, সৌন্দর্য্যোপভোগ-ক্ষমতা প্রভৃতি গুণাবলীর অদৃশ স্ফুরণ না হইলেও, আকস্মিক বিপদ্‌পাত, দুর্ঘটনা এবং প্রলোভন প্রভৃতির হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার যথেষ্ট ক্ষমতা জন্মিয়া থাকে।

মানবজাতির অতীত ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, মানুষ চিরকালই এইরূপ ছিল না—অতি সামান্য অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমবিকাশপরম্পরায় স্তরে স্তরে উন্নত হইয়া মানব বর্ত্তমান আকার ও অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। অভিনিবেশ-সহকারে মানবচরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিলে এই প্রাগৈতিহাসিক যুগের পূর্ব্বপুরুষগণের চরিত্রগত ও ব্যবসায়-গত অনেক বিশেষত্বই বর্ত্তমান মানব-জীবনে পরিলক্ষিত হইবে। অনেকে মনে করিতে পারেন যে মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বুঝি তাহার চরিত্র-গত বিশেষত্বগুলিরও বিনাশ হইয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। পূর্ব্বপুরুষের অনেক বিশেষত্বই পরবংশীয়গণ প্রাপ্ত হয়। যুগে যুগে মানবের যে যে বিশেষত্ব বিকশিত হইয়াছে, তৎসমুদয় ঠিক পৌর্ব্বাপর্য্য-ক্রমে আমাদের জীবনে প্রতিফলিত হইয়া থাকে; অর্থাৎ জাতি-

গত হিসাবে যে বিশেষত্ব যত প্রাচীন, আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে তাহা তত পূর্ব্বে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। উপরে বর্ত্তমান সময়ের প্রাক্‌কিশোরাবস্থার বিশেষত্ব সম্বন্ধে যাহা যাহা বলা হইয়াছে, তৎসমুদয় প্রাগৈতিহাসিক যুগের পূর্ব্বপুরুষগণের অবস্থাবিশেষের পরিচায়ক বলিয়াই অনুমান হয়—হয় তো বর্ত্তমান যুগের শিশু-জীবনের এই সময় (৮ হইতে ১২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সময়), সে সময়ের মানুষের পূর্ণযৌবনাবস্থার পরিচায়ক। পিতামাতা প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত নিকটতর পিতৃগণের অনেক বিশেষত্বও আমাদের জীবনে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। কিন্তু এগুলি অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে দেখিতে পাওয়া যায়; কেন না, পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, যে বিশেষত্ব যত দূরবর্ত্তী, তাহা তত পূর্ব্বে দেখা দিয়া থাকে। বালক ও শিশুগণের জীবনে যে সমস্ত বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, প্রৌঢ় বা বৃদ্ধাবস্থায় বিকশিত বিশেষত্বসমূহ অপেক্ষা সেগুলি অধিকতর প্রাচীন অবস্থার বিজ্ঞাপক। সুতরাং এই হিসাবে শিশুকে পিতারও পিতা বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না। কিন্তু অতি-মানবীয় যুগ হইতে প্রাপ্ত বিশেষত্বসমূহ বয়সে প্রাচীন হইলেও, আমাদের জীবনে তাহাদের প্রভাব নিতান্ত কম নহে।

সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী-পণ্ডিত রুশো (Rousseau) বলেন যে, বারো বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বালক-বালিকাগনকে কোনও প্রকার কৃত্রিম বা হাতগড়া নিয়মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ না করিয়া, বংশপরম্পরা-লব্ধ ও অপেক্ষাকৃত অসভ্যাবস্থার পরিচায়ক সহজাত সংস্কার ও প্রবৃত্তিনিচয়কে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বিকশিত হইতে দেওয়া উচিত। আধুনিক জৈব-বিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিতগণও রুশোর মতের সমর্থন করেন। তাঁহারা বলেন যে, যথোপযুক্ত আবেষ্টন বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সম্যক বন্দোবস্ত করিতে পারিলে, এইরূপ নৈসর্গিক শিক্ষা দ্বারা প্রভূত ফল লাভ হইতে পারে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, বালকবালিকাগণ নানাপ্রকার অসভ্যোচিত হাবভাবের বিকাশ ও কার্য্যকলাপে বিশেষ আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে। ইহাতে তাহাদের কোনই দোষ নাই,—অর্দ্ধসভ্য বা অসভ্য পূর্ব্বপুরুষগণ হইতে তাহারা যে বিশেষত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা তাহারই বহিঃপ্রকাশের চেষ্টা মাত্র। অনেক সময়েই দেখা যায় যে, বালক-বালিকাগণের মনোবৃত্তিনিচয় কোনও কারণে সহসা বাধা প্রাপ্ত হইয়া যথাসময়ে সম্যক বিকাশ ও পরিণতি লাভ করিতে না পারিলে, উত্তরকালে তৎসমুদয় প্রায়ই অপেক্ষাকৃত ভীষণতর আকার ধারণপূর্ব্বক আত্ম-প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু এগুলিকে যথাসময়ে ও যথোপযুক্তভাবে বিকশিত হইতে দিলে, ভবিষ্যতে আর তাদৃশ কুফল উৎপন্ন হয় না। সুতরাং যদি মৃগয়া, মৎস্যশীকার, কলহবিবাদ প্রভৃতি জাতিগত ও বংশ-পরম্পরালব্ধ সহজাত প্রবৃত্তিনিচয়কে যথাসময়ে ও যথোপযুক্ত-ভাবে বিকাশিত হইতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে এক্ষণে এত যত্ন ও চেষ্টা সত্ত্বেও যে শিক্ষাসমস্যার সম্যক সমাধান হইতেছে না, সেই উদার ও সার্ব্বজনীন আদর্শ শিক্ষার দ্বার অতি সহজেই উদ্‌ঘাটিত হইতে পারিবে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, শিশুজীবনের সম্যক বিকাশ ও পরিণতির জন্য, তাহাদের সহজাত এবং অল্পবিস্তর অসভ্যোচিত সংস্কারসমূহকে অনিষ্টজনক বা অপ্রয়োজনীয় বিবেচনা না করিয়া, উহাদের যথাসম্ভব প্রকাশ ও পূর্ণতা লাভের জন্য কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা দেওয়া আবশ্যক। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, অতি দূরবর্ত্তী পূর্ব্বপুরুষগণেরও জাতিগত ও ব্যবসায়গত অনেক বিশেষত্বই বর্ত্তমান কালের শিশুজীবনে প্রকটিত হইয়া থাকে। ইহাও দেখা যায় যে, এই সমস্ত বংশপরম্পরালব্ধ বিশেষত্বসমূহের সম্যক্ প্রকাশের জন্য বালকবালিকাগণও একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা অনুভব করিয়া থাকে। সুতরাং এই সমস্ত দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষাকে সমূলে বিনাশের চেষ্টা না করিয়া, অন্ততঃ আংশিক ভাবেও উহাদের পরিতৃপ্তি সাধনের ব্যবস্থা করা উচিত। অতীত যুগের সাহিত্য, ইতিহাস ও কিম্বদন্তি প্রভৃতি হইতে নানাবিধ উপাখ্যান শুনাইলে এই উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে সাধিত হইতে পারে। শিশুহৃদয় সাধারণতঃই অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ। এই সমস্ত উপাখ্যান ও কাহিনী শ্রবণ করিলে অতীত জাতীয় জীবনের সমস্ত চিত্র কল্পনাবলে তাহাদের চক্ষুর সম্মুখে প্রত্যক্ষবৎ উদ্‌ভাসিত

হইবে এবং তজ্জন্য তাহারা এক অনির্ব্বচনীয় এবং অননুভূত-পূর্ব্ব আনন্দ প্রাপ্ত হইবে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের পূর্ব্ব-পুরুষগণের হৃদয়ে যে সমস্ত ভাব ও ধারণা নিয়ত বিরাজ করিত, এই সমুদয় কাহিনীশ্রবণে শিশুহৃদয়েও তৎসমুদয়ের পুনরাবির্ভাব হইবে; তাহারা স্ব স্ব জীবনেও ঠিক পৌর্ব্বা-পর্য্যক্রমে অতীত সমস্ত জাতীয় জীবনটারই পুনরভিনয় করিতে পারিবে। অতীতকালের সকল অবস্থাই সম্যক ফিরিয়া পাওয়া আদৌ সম্ভবপর নহে; কিন্তু এই প্রণালীতে বালক-বালিকাগণের শিক্ষারম্ভ হইলে অনেক সময়েই যে তাহাদিগকে অকালপক্কতার (Pre-cocity) বিষময় ফল হইতে রক্ষা করা যাইতে পারিবে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। আজ-কাল সহরের বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ যে প্রকার শিক্ষাপদ্ধতির প্রচলন দেখা যায়, তাহাতে অধিকাংশ সময়েই কেবল এই অকালপক্কতারই সৃষ্টি হইয়া থাকে মাত্র। বলাই বাহুল্য, এইরূপ কৃত্রিম হাতগড়া শিক্ষাব্যবস্থাতে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হওয়া সম্ভবপর নহে। "প্রাকৃতিক" শিক্ষা (Study of Nature) দ্বারা এই দোষের অনেক নিরাকরণ করা যাইতে পারে। শিক্ষার নামে বালকবালিকাগণকে প্রকৃতি-জননীর স্নেহময় ক্রোড় হইতে কাড়িয়া না লইয়া, বরং যাহাতে তাহারা আরও অধিক মাত্রায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যাস্বাদনে সমর্থ হয়, তজ্জন্য তাহাদিগকে সময়ে সময়ে গ্রামে প্রান্তরে, পর্ব্বতে উপবনে, বনে নদীতীরে পরিভ্রমণ করিতে দেওয়া উচিত। তাহা হইলে তাহাদের পর্য্যবেক্ষণশক্তির সম্যক উন্মেষ ও বিকাশ সাধিত হইবে। সর্ব্বদা পাঠ্যপুস্তকে তাহাদিগকে আবদ্ধ রাখা কোন ক্রমেই সঙ্গত নহে। ইহাতে তাহাদের মনে পাঠ্যপুস্তকের প্রতি অকৃত্রিম ঘৃণা ও বিরক্তির সঞ্চারই হইয়া থাকে মাত্র। তাহাদের দেহ ও মন এই সময়ে প্রকৃতি ও মানবচরিত্রের সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হইবার জন্য অতি-মাত্রায় লালায়িত হয়। সুতরাং যতদুর সম্ভব অনুকূল আবেষ্টনের মধ্যে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের উপভোগ ও সরস উপাখ্যানাদির বর্ণনার ব্যবস্থা দ্বারা তাহাদের শিক্ষারম্ভ করা উচিত। এইরূপে যে শিক্ষার বীজ উপ্ত হয়, তাহাই প্রকৃত শিক্ষাপদবাচ্য, ও উত্তরকালে তাহাই মহামহীরুহে পরিণত হইয়া নানাবিধ সুস্বাদু ও মনোহর ফলপুষ্প ধারণ করতঃ পৃথিবীতে স্বর্গীয় শোভা বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আমাদের সভ্যতা যেমন ক্রমেই জটিলতর আকার ধারণ করিতেছে, জীবনধারণের জন্য যেমন নিত্যই অভিনব জ্ঞান ও শিল্পচাতুর্য্যের প্রয়োজন বাড়িতেছে, তাহাতে সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্র প্রাগুক্ত শিশুশিক্ষাপ্রণালীর অনুসরণ করা সম্ভবপর নহে। শিশুগণ প্রকৃতির সন্তান হইলেও, কিছুদিন পরে তাহাদিগকেও জটিলতাপূর্ণ সভ্যসমাজে বাস করিতে হইবে; সুতরাং তজ্জন্য শিশুগণকে এই সময় হইতেই প্রস্তুত করিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ের স্কুলগৃহের অবরুদ্ধ বায়ু ও ক্ষীণ আলোক স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নহে সত্য; সেখানে নিরন্তর অল্পপরিসর বেঞ্চের উপর উপবেশনে স্বাস্থ্য-ভঙ্গের গুরুতর সম্ভাবনা আছে; এই সমস্ত স্কুলে শিশুশরীরের অর্দ্ধেকেরও বেশী মাংসপেশীর কিছুমাত্র অনুশীলন না করিয়া শুধু বাক্‌শক্তি ও লিখনশক্তির উৎকর্ষবিধানের জন্য জিহ্বা ও অঙ্গুলীর অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর মাংসপেশীর অনুশীলনের প্রতিই অত্যধিক যত্ন করা হয়, ইহাও সত্য; কিন্তু গত্যন্তর নাই। সভ্যসমাজে বাস করিতে হইলে এই সমস্ত অসুবিধা সহ্য করিতেই হইবে; বালকবালিকাগণকে অল্পবয়সেই প্রকৃতির ক্রোড় হইতে ছিন্ন করিয়া লইয়া শিক্ষাগারে প্রেরণ করি-তেই হইবে। অসাময়িক হইলেও, ভবিষ্যৎ সমাজের উপযোগী হইবার জন্য যুবকোচিত কারুকর্ম্ম শিক্ষার বিশেষপ্রকার শিক্ষাব্যবস্থা করিতেই হইবে। এতৎসমুদয়ই সম্পূর্ণ সত্য ও অবশ্যস্বীকার্য্য বটে; কিন্তু আট বৎসর পর্য্যন্ত শিশুগণকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এবং বংশানুক্রম-প্রভাবের অনুকূলে বর্দ্ধিত হইতে দেওয়া উচিত; তৎপূর্ব্বে কখনও কাহাকেও আধুনিক বিদ্যালয়ের কৃত্রিম ও হাতগড়া নিয়মের অধীন করা কর্ত্তব্য নহে।

বিদ্যালয়ে তাহারা সাধারণতঃ যে সমস্ত প্রভাবের সংস্পর্শে আইসে, অনেক সময়েই শিশুহৃদয় প্রথম প্রথম তাহাতে

সাড়া দেয় না। অন্তর্দৃষ্টিক্ষমতা, কৌতুহলপ্রবৃত্তি, ভাবপ্রবণতা প্রভৃতির এই সময়ে বিকাশাবস্থা মাত্র—যৌবনোচিত বিশেষত্বসমূহ এখনও ভ্রূণাবস্থা অতিক্রম করে নাই। বালকবালিকাগণকে এই সময়ে যে সকল নিয়মের বশীভূত করিতে চেষ্টা করা হয়, তৎসমুদয় অধিকাংশ সময়েই তাহাদের নিকট সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারপ্রণোদিত, কৃত্রিম এবং প্রকৃতিবিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। অনেকেই বিনা বাক্যব্যয়ে কলের মত তাহা মানিয়া চলে, বা কলেকৌশলে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করে; আবার কেহ কেহ প্রকাশ্যভাবে বিরুদ্ধাচরণ করিতেও ত্রুটী করে না। অল্প বয়সে শিশুদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণের এইরূপ আরও অনেক কুফল আছে, সত্য; কিন্তু উপায় নাই। অপিচ, এই সময়ে শিশুদিগের কতকগুলি উৎকৃষ্ট গুণেরও বিকাশ হইতে থাকে। এই সময়ে তাহাদের সর্ব্বপ্রকার অনুভূতিশক্তি যেমন প্রবল থাকে, মেধাশক্তিও সেইরূপ তীক্ষ্ণ ও দীর্ঘকালস্থায়ী হয়। এই সময়ে তাহারা নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গুণাবলী যেমন অতি সহজে আয়ত্ত করিতে পারে, সেইরূপ নিত্য নূতন ও পরিবর্ত্তিত অবস্থার সহিত মিলিয়া মিশিয়া চলিবার শক্তি ও প্রবৃত্তিও তাহাদের অত্যন্ত প্রবল থাকে। সুতরাং বহির্ম্মূলক ও যন্ত্রগতিক শিক্ষার (External and mechanical training) পক্ষে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সময়। বস্তুতঃ, লিখন, পঠন, চিত্রাঙ্কন, হস্তশিল্প, গীতবাদ্য, বৈদেশিক ভাষা ও উহার উচ্চারণ প্রভৃতি এই সময়েই সম্যক অধিগত না হইলে, ভবিষ্যৎ জীবনে আর তৎসমুদয় এত সহজে ও সম্পূর্ণভাবে শিক্ষা করা অধিকাংশ সময়েই সম্ভবপর হইয়া উঠে না। বলা বাহুল্য, শৈশবাবস্থাতেই এইরূপ শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বিত হইলে শিশুদিগের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক ক্ষতির যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে; এবং যাহাতে এই সমস্ত অবশ্যম্ভাবী দোষের যতদূর সম্ভব নিরাকরণ করা যায়, তাহার উপায় উদ্ভাবনই আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু যে প্রণালীতে এক্ষণে এই উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করা হয়, তাহাকে "ড্রিল" বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু উহা কখনই প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষাপদবাচ্য হইতে পারে না; ইহা ঔষধিস্বরূপ হইতে পারে বটে, কিন্তু কখনই স্বাস্থ্যবিধায়ক সুস্বাদু খাদ্যরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য নহে।

বালক-বালিকাগণকে কি প্রণালীতে শিক্ষা প্রদান করিলে উৎকৃষ্ট ফললাভ করা যাইতে পারে, প্রাচীন শিক্ষাবিদ্ পণ্ডিতগণের নিকট আমরা তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট আভাস পাইতে পারি। ফলতঃ, সুকুমারমতি বালকবালিকাগণকে দীর্ঘকাল বিদ্যালয়ের অবরুদ্ধ বায়ুতে আটকাইয়া রাখিয়া তাহাদের গভীর বিরক্তির উদ্রেক না করিয়া, কিছুক্ষণ পরেপরেই তাহাদিগকে কিয়ৎকালের জন্য অবসর দিলে, যাহাতে তাহারা আগ্রহ ও প্রীতিসহকারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তজ্জন্য নিয়ত উৎসাহিত ও প্ররোচিত করিলে, এবং শিক্ষকের অনুপস্থিত সময়ে তাহারা স্বাভাবিক আগ্রহ ও বুদ্ধিমত্তাসহকারে যে সকল কাজ করে, তৎপ্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও নির্ভরতা প্রদর্শন করিলে যে যথেষ্ট উৎকৃষ্ট ফললাভ হইবে তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান সভ্যতার ফলে এইরূপ শিক্ষার আবশ্যক বটে, কিন্তু পূর্ব্বে যে প্রাকৃতিক শিক্ষার কথা বলা হইয়াছে, তাহার সহিত এই শিক্ষাব্যবস্থার আকাশপাতাল প্রভেদ। প্রথমোক্ত শিক্ষাব্যবস্থা দ্বারা শিশুদের সর্ব্বাঙ্গীন স্বাস্থ্যোন্নতি সংসাধিত হয়, শিশুরাও অত্যন্ত আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে সমস্ত বিষয় শিখিয়া থাকে। ইহাতে সময়ের কোনওরূপ বাঁধাবাঁধি নাই, নিয়মের কাঠিন্য নাই, শিক্ষকের কৃত্রিম সংস্পর্শজনিত বিরক্তিকর প্রভাবও নাই। খেলা ও কাজে যে পার্থক্য, এই দুই প্রকার শিক্ষাব্যবস্থাতেও ঠিক সেই পার্থক্য। সুতরাং শিশুদিগকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা প্রদান করিতে হইলে, আমাদিগকে সর্ব্বদাই প্রথমোক্ত প্রাকৃতিক শিক্ষা প্রণালীর কথা মনে রাখিতে হইবে।

কৈশোরাগমে মানুষের পুনর্জ্জন্ম হয়, মানবোচিত গুণাবলীর সম্যক বিকাশ ও পরিণতি সাধিত হইয়া থাকে। বাল্যে অতিমানবীয় যুগের বিশেষত্বসমূহের পরিস্ফুটন হয়, কিন্তু কৈশোরে পরবর্ত্তীযুগের ধর্ম্মরাজি আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। এই ক্রমপরিণতি ঠিক সমভাবে সাধিত হয় না; এক সময়ে বা অতি দ্রুতবেগে সাধিত হয়, আবার হয়তো তাহার পরমুহূর্ত্তেই

কিছুদিনের জন্য সমস্ত স্থগিত থাকে। ইহা হইতে ইহাই অনুমান হয় যে মানুষের ক্রমবিকাশ-পদ্ধতিও সম্পূর্ণ অবিচ্ছিন্ন ও সরল নহে; অতীতকালে হয়ত তাহাকে নানাবিধ বাধাবিপত্তি ও প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়াই ক্রমে ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। কিশোরাবস্থায় আমাদের শারীরিক দৈর্ঘ্য, গুরুত্ব ও শক্তিবৃদ্ধির বার্ষিক হার বা পরিমাণ অতি দ্রুতবেগে বাড়িয়া থাকে, এমন কি অনেক সময়ে দ্বিগুণ হইতেও দেখা যায়; পূর্ব্বে আদৌ বিদ্যমান ছিল না, এমন অনেক শারীর-শক্তির নূতন বিকাশ ও কার্য্যারম্ভও এই সময়ে হইয়া থাকে। শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও যন্ত্রাদিরও যথেষ্ট স্থায়ী বা অস্থায়ী পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়। ইহাদের কতকগুলি বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত বাড়িতে থাকে, আবার কতকগুলি শীঘ্র শীঘ্রই নিতান্ত হীনবল ও সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে বা বিনাশপ্রাপ্ত হয়। অনেকের বাল্যাবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, আবার কেহ কেহ অতি দ্রুত যৌবনে পদার্পণ করে। জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইবার জন্য প্রকৃতিদেবীই যেন এই সময়ে মানুষকে হস্তপদ, মস্তিষ্কশক্তি প্রভৃতি উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিয়া দেন এবং নারীদেহকেও মাতৃত্বের উপযোগী করিয়া গঠন করেন।

শ্রীমন্মথনাথ মজুমদার।

ভাটিয়াল গান

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৩৪)

আগে তোর ষোল আনা (১) কর গা ঠিক।
নদীর তলে ফান (১) পেতে চান (২)
ধরবি যদি অ রসিক॥
এক দিন দুই দিন কইরারে মন,
পূর্ণিমাতে হও গা ঠিক।
সেই পূর্ণিমার চান নদীর তলে
লাল জলে করে ঝিক্ মিক্॥

গুরুর কাছে ভাববস্তু আছে,
তার কাছে ডুবসাতার শিখ।
সেই নদীর পারে গেলে পরে
জ্ঞান হইয়ে যায় দিক্‌বিদিক্॥
সেই নদীতে কামকুম্ভীর আছে,
ধইরে খায় সব অরসিক।
যদি চান ধর্‌তে কুমীরে খাইল,
পাগলা রে জীবনে ধিক্॥

(৩৫)

সদাই আনন্দে রেখো মন,
মুখে হরি গুণাগুণ গাও রে।
নামই ব্রহ্ম, নামই গতি,
নামই কর সার রে।
(আরে) নামে প্রেমে অক্য (৩) করে,
নামের মধু খাও রে।
সদাই আনন্দে‥‥ গাও রে।

---

(১) জ্ঞানেন্দ্রিয় ৫—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক।
কর্ম্মেন্দ্রিয় ৫—হস্ত, পদ, গুহ্য, লিঙ্গ, বাক্য।
ষড়রিপু ৬—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য।
১৬ আনা

(১) ফান—ফাঁদ। (২) চান—চাঁদ।
(৩) অক্য—ঐক্য, মিল।

সোত (১) উজান, বাতাস পিট্টা (২),
কুলে কুলে বাও রে।
পাড়ে আছে সাধুর বাজার
কিছু কিম্না লও রে॥
সদাই……গাও রে।

রাধারাণীর প্রেম বাজারে
রসিক দোকানদার রে।
কেহ বেচে, কেহ কিনে,
কেহ যায় দর কইরা রে॥
সদাই……গাও রে।

বায়াত্তর বছরের পাড়ী,
আমার ভাঙ্গা নাও (৩) রে।
রাধার নামে বাদাম দিয়ে
ধীরে ধীরে যাও রে॥
সদাই……গাও রে॥

(৩৬)

আমার মন হরিবল, হরিবল, বল হরিবল,
আর কি তোর মানবজনম হবে রে।
ভবনদীর পাড়ে আছে এক বেটা মুড়ারে মন,
আর এক বেটী মুড়ী। (৪)
তাদের সঙ্গে দিতে হবে
ভবনদী পাড়ী রে॥

আরে মন, ভাই বল, বন্ধু বল,
সম্পত্তির ভাগী রে মন, সম্পত্তির ভাগী।
অসময়ে নিদান কালে
শ্রীগুরু কাণ্ডারী রে॥

(আরে) ভবনদীর পারে রে মন
বিষম যমের থানা, রে মন বিষম যমের থানা।
সে ঘাটে সাধু যায় রে নেচে গেয়ে,
পাপী যাইতে মানা রে॥

(৩৭)

গুরু বইলে যার প্রাণ কাঁদে,
তার তুলনা আছে বা কই।
আছে মন প্রাণ তার কাছে কাছে,
অগো সে বিনে প্রাণ বাঁচে কই॥

গুরুরূপে নয়ন গেছে যার,
দিবানিশি ঐ ভাবনার বিরাম নাই গো তার।
সে জন্মের মত প্রাণ দিয়াছে,
দিল প্রাণ, আর নিল বা কই॥

অ যার ভক্তি আছে গুরুর চরণে,
অন্য দেবদেবী তারে সন্তোষ হয় মনে।
যারে প্রাণ দিলে প্রাণ পেতে পারি,
তারে নয়ন দিলাম বা কই॥

পূর্ব্ব জন্মের সাধনের ফলে,
ইহ জন্মে গুরু সেবার
সাধ হয় মনে;
গোঁসাই গোপী বলে, অধর ধরা
যায় না গুরুর চরণ বই॥

(১) সোত—স্রোত।

(২) পিট্টা—পশ্চাৎগামী; প্রতিকূল।

(৩) নাও—নৌকা।

(৪) মুড়া, মুড়ী—পুরুষ, প্রকৃতি।

(৩৮)

গুরু আমায় পাড়ে নিয়ে চল রে দয়াল,
গুরু আমায় পাড়ে নিয়ে চল।

দশটার সময় আস্‌লাম ঘাটে,
আরো দু'টা বাজল রে তাতে,
আমি বইসে রইলাম পারের ঘাটে,
আমার হাতে নাই সম্বল॥

একে আমার জীর্ণ-তরী,
পাপের বোঝায় হইল রে ভারী,
(হা রে), গুরু এসে হও কাণ্ডারী,
নইলে জীবন গেল রে গেল।

মাঝি (১) নয় রে কাজের কাজী,
মাল্লা ছয় জন (২) বড় রে পাজী,
(হা রে), ভব সাগরের মাঝামাঝি,
কোন্ পাকে ঘোলায় (৩) ফালাইল॥

(৩৯)

গুরু যে ধন দিয়াছে তোরে,
চিন্‌লি না তারে।
তুই ঘরে যেয়ে দেখ্‌লিনা রে,
কত রত্ন আছে স্তরে স্তরে॥
চিন্‌লি না তারে॥

মাল ভরা ধন সিন্দুকেতে,
তারে চিন্না নে মন পরখ করে;
চাবি সে শ্রীরূপের হাতে;
তারে খুঁজলে পরে মিলবে চাবি,
যদি ডুবতে পার ঐ রূপ সাগরে॥
চিন্‌লি না তারে॥

সহজ মানুষ আছে ঢাকা, (১)
সাধন কর্লে পাবি দেখা,
সে মানুষ ত্রিভঙ্গ বাঁকা;
মানুষ উল্টাকলে সদাই চলে,
ত্রিবেণীতে উজান ধরে॥
চিন্‌লি না তারে॥

(৪০)

প্রেম করা হইল না,
মনের মানুষ খুজে পেলেম না।

মানুষ মানুষ অনেক আছে,
প্রেম কি মিলে যার তার কাছে,
মানুষ বিনে মানুষ রতন
কখন মিলে না;
ও রে যদি মিলে দুই এক জনা,
মন ত মিলে না॥

ও রে গুরু যারে কৃপা করে,
তৈয়ার কইরে লয় রে তারে,
কুমারী প ঙ্গ হইলে
কখন ছাড়ে না;
গুরু দয়া ক'রে নাম রাখিল
রঙ্‌ ধরাইল না॥

আছে আমার কামের গন্ধ,
কিসে প্রেমের হয় সম্বন্ধ,
রসিকের সঙ্গ বিনে
গন্ধ যাবে না;

(১) মাঝি—মন।
(২) মাল্লা ছয় জন—কামক্রোধাদি ষড়রিপু।
(৩) ঘোলায়—ঘূর্ণা জলে।

(১) ঢাকা—প্রচ্ছন্ন।

ওরে সেই মানুষের সঙ্গ পেলে
হতেম রে সোনা ॥

অম্বিকায় কয় মনের ভাবে,
প্রেম করিবা ভাবে ভাবে,
গুরুর কাছে যেয়ে প্রেমের
রীতি শিখ না ;
মানুষ ধর্ত্তে পারলে কর্ত্তে পারবা
প্রেম সাধনা ॥

(৪১)

নিকটে নিদান রে, আমার মন,
গুরুকে ভুল না।
এ দেহ ঢলিয়া পড়িয়া যাবে,
দেখে কি দেখ না রে।
মন, গুরুকে ভুল না ॥

সৎগুরু নয়ননিধি রে, তোর জ্যোতি যে মলিন,
তোরে হরি বল্‌তে কে না করে,
দেখে কি দেখ না রে ॥

ভাঙ্গিল রঙ্গিলার বাসা রে,
পিপাসা গেল না ;
অ তোর এ দেহেরি আশা ভরসা
গেল না রে ॥

জগৎ গোসাই ভেবে বলে রে,
শোন্ রে অবোধ মনা,
অ তোর শ্যামল নয়নে রেখো
নয়ন নিশানা রে ॥

(৪২)

গুরুধনের যে কারবারী,
তার কারবারের ভয় কি আছে।
সে যে পঞ্চরসের (১) দোকান খুলে,
মহানন্দে বইসাছে ॥

পাঁচ আনা, (২) দশ আনা (৩) কেউ,
কেহ যোল আনা, (৪)
যার যেমন ভাব, বস্তু কিনে
বসেছে সে জনা ;
এবার পঁচিশ আনা (৫) দিয়ে কেহ
সর্ব্বস্ব কিনে নিয়েছে ॥

সে যে গুরুবাক্য চোথায়ে দর
করিয়ে দায়-ধরা,
করে এক বাক্যেতে বেচা কিনা,
নাইকো অন্য ধারা ;
সে যে কি যে কি অপূর্ব্ব জিনিস,
যত বেচে বাড়িতেছে ॥

সে যে ভাবের পাল্লাতে তুইলে
প্রেমের বাটখাড়া,
নিষ্ঠাদাড়ী ধইরে জিনিস
ওজন করে তাঁরা ;
প্রেমরসের হাটে বসে তাঁরা
সদানন্দে ভাস্‌তেছে ॥

---

(১) পঞ্চরস—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর।

(২) পাঁচ আনা—জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক।

(৩) দশ আনা—জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, হস্ত, পদ, গুহ্য, লিঙ্গ, বাক্য।

(৪) যোল আনা—চক্ষুকর্ণাদি দশেন্দ্রিয় ও কামক্রোধাদি ষড়রিপু।

(৫) পঁচিশ আনা—দশেন্দ্রিয়, ষড়রিপু, অষ্টপাশ, ও মন।

খেচা কিনা করে তাঁরা
বিজাতীয়ের সনে,
বিজাতী জিনিস কি মিলে
স্বজাতীয়ের স্থানে ;
প্রেমরসের হাটে গিয়ে তাঁরা
প্রেম বৈচিত্রে মইজাছে ॥

অধম রসিক বলে, মন রে তুই
কি করলি এবার,
তোর যেম্নি ধন তেম্নি রইল,
না কৈরে কারবার ;
কি যে কি জব দিবি, মন রে,
যেয়ে মহাজনের কাছে ॥

(৪৩)

গুরুর ভাব নিয়ে বইসে থাক
সরল হইয়ে।
জলে স্থলে অগ্নি দিলে
বিপদ নাই তার কোন কালে।

মায় যে জানে পুত্রের বেদন
অজ্ঞান বালকের কালে।
দয়াল গুরু জানে শিষ্যের বেদন
প্রাণে প্রাণ মিশাতে পার্‌লে ॥

পক্ষী করে বৃক্ষের আশা,
বাদুরে ডাল ধ'রে ঝোলে।
ডাল ছাড়্‌লে পরে, পড়বি ফেরে,
না ছাড়্‌লে যাবি তইরে ॥

(৪৪)

হরিনাম স্মরণে প্রেমের উদয়,
ধারা বহে নয়নে।
বল দেখি রে এই হরি নাম বদনে ॥

জগা মাধা যে ছিল,
(তারা) দয়াল নিতাইরে মার্‌ল,
মাইর খেয়ে দয়াল নিতাই
হরিনাম দিল ;
জগা কেন্দে বলে, মাধা ভাই রে,
ধর গা নিতাইর চরণে ॥

যত নৈদে নাগরী,
তারা সুখ পাসরি,
হরিনামে মগ্ন হইয়ে
দেয় গড়াগড়ি ;
তারা কোলের ছেলে দেয় গো ফেলে,
দয়াল নিতাইর চরণে ॥

হরিনাম মহামন্ত্র,
নামে না পাইল অন্ত,
কলির জীব উদ্ধারিতে যায় নিত্যানন্দ ;
আনিয়ে গোলোকের প্রেমধন
বিলাইল জগৎ ভরে ॥

(৪৫)

পাগলা মন রে,
আনন্দে হরিগুণ গাও।
সঞ্চিত যত ধন ছিল,
কামিনী হরিয়া নিল,
শুধা ডিঙ্গা ঘাটে ঘাটে বাও ॥
পাগলা..................গাও ॥

চক্ষু দুটী রত্নে ভরা,
চরণ দুটী রথের ঘোড়া,
হস্ত দুটী গুরু সেবায় লাগাও।
পাগলা.....................গাও ॥

চৌদ্দপোয়া নৌকা-দাড়া, (১)
দোপাটে গড়ন সাড়া,
রাধার নামে বাদাম দিয়ে যাও ॥
পাগলা..............গাও॥

(৪৬)

আমার গৌর বলে প্রাণ কান্দে,
আমি পাই না গো তারে।
সে ত ধরা দিয়ে দেয় না ধরা,
আশায় ঘুরায়ে মারে॥

ঠাঁই লয়েছে হৃদয় মাঝে,
তিলেক না দূরে বসে,
ঘোরে আশে পাশে;
সে যে ধরতে গেলে ছুটে পলায়,
চায় না গো আর ফিরে ॥

গোরা আপন ভাবে কান্দে হাসে,
অ তার গণ্ড দুটী অবিরত
নয়ন-জলে ভাসে;
সদা হরি বৈলে ধরায় লোটায়,
প্রেমরসে হৃদয় ভইরে ॥

প্রেমের ঝড় উঠিলে, বান ডাকিবে,
দুঃখী তাপী কেউ রবে না,
সব ভেসে যাবে;
দীন গোপীনাথ কয়, অ ভোলা মন,
ভেসে যা ঐ প্রেম-পাথারে ॥

(৪৭)

গৌর এস হে, এস হে, এস হে, অ চান গৌর,
হৃদিপদ্মে দিয়াছি আসন।
তোমায় নয়ন-জলে স্নান করাব,
মাথার কেশেতে মুছাব চরণ ॥

(১) চৌদ্দপোয়া নৌকা দাড়া—সাড়ে তিন হস্ত পরিমিত মানব-দেহ।

যে তোমার চিন্তা করে,
বিষয় দিয়ে ভুলাও তারে,
আপনে থাক আড়ে আড়ে,
তোমায় খুঁজিলে না পাই দরশন ॥
কৃপা করে এস গৌর,
হৃদিপদ্মে দিয়াছি আসন ॥

চাতক থাকে মেঘের আশে,
মেঘ বইয়ে যায় অন্য দেশে,
আমায় কৃপাসিন্ধু-বারি দিয়ে,
দাসের মনোবাঞ্ছা কর পূরণ ॥

(৪৮)

আছে রাই রূপে যার অঙ্গ ঝাপা ;
কি হেরিলাম গৌর বাকা।

মাথায় শিখা, রামাবলী,
কি অপরূপ যায় গো দেখা।
রাধা তন্ত্র রাধা মন্ত্র,
রাধার নাম যার অঙ্গে লেখা ॥

সুরধনী গিয়েছিলেম,
কি অপরূপ যায় গো দেখা।
তোমরা সবে যাও গো গৃহে,
আর আমি যাব না একা ॥

এক দিন জল ভরতে গেলাম,
কি অপরূপ পাইলাম দেখা ॥
ঘাটে কেউ ছিল না, কেউ ছিল না,
সে ছিল, আর আমি একা ॥

গোসাই দাণ্ডচন্দ্রে বলে,
চাইর যুগে যার করণ আটা।
যার হয়েছে সাধন সিদ্ধি,
সে পেয়েছে এক দিন দেখা ॥

(৪৯)

মন চলিয়া যা রে,
বলিয়া করুম্ কি।
অন্তিমে নাই আমার,
সঙ্গের সঙ্গতি॥

ছায়া লইতে গেলাম রে ভাই,
বটবৃক্ষ তলে।
সে পত্র ঝড়িয়া পড়ে,
আপন কর্ম্ম ফলে॥
মন.....................সঙ্গতি॥

আগে যদি জানি রে ভাই,
সাধু এমন চোর।
তবে কি রে দিতাম জাগা,
তে-মাল্লার উপুর॥
মন.....................সঙ্গতি॥

আগে যদি জানি রে ভাই,
ঘাটে বান্ধা তরী।
তবে কি রে দিতাম ছাইড়া রে,
বাপমায়ের বাড়ী॥
মন.....................সঙ্গতি॥

(৫০)

আমার সে দিন রইল কই।
ভাবি যারে, পাইনা গো তারে,
অ গো বিধির কি ঘটনা সই।

যে রূপ দেখে নয়ন গো দিলাম,
আশা-পথ চেয়ে রইলাম গো সই।
কেন্দে রমণ দাসে গো বলে,
আশার দিন ফুরাল সই॥

(৫১)

আমার গৌরচান্দের
রূপ নি পাসরা যায়।
না হেরিলে আকুল সদায়॥

কুটী (১) চন্দ্র জিনি এতই রূপ,
রজনী প্রভাতে যথা উদয়ে ভানু।
গোরার কিবা শোভা, মনোলোভা,
কুটী চন্দ্র রাঙ্গা পায়॥

গোলোকের ধন নদীয়ায় এল,
কলির জীব নিস্তারিতে
গোরা উদয় হইল;
গোরা দণ্ডধারী, দয়াল হরি,
নয়ন জলে ভেসে যায়॥

সে ত হরি বৈলে কান্দিয়া বেড়ায়,
ক্ষণে ক্ষণে সোনার অঙ্গ
ধুলায়ে লোটায়;
একখানা রামাবলী, স্কন্ধে ঝুলি,
দীনহীন কাঙ্গালের প্রায়॥

(৫২)

তোরা কে যাবি গো আয়
গউর-প্রেমের বাজারে।
প্রেমরসের দোকান খুইলে,
দয়াল নিতাই ডাকে আয়।
গউর-প্রেমের বাজারে॥

মিলেছে এক নতুন বাজার,
বিকাইছে রস কি চমৎকার,
মধুর ভাণ্ডার;
হাটে নারী হইলে যেতে পারে,
হাটে পুরুষ নেয় না রে॥

(১) কুটী = কোটী।

মাইয়ায় মাইয়ায় বেচা কিনা,
হাটে পুরুষ নেয় না রে॥

বেচা কিনা শতে শতে,
সুজন রসিকের মতে,
শ্রীগুরুর হাটে ;
গুরুজনার ভাব জানিলে,
হাটে মাল বিকায় রে॥

আত্মসুখে সুখী হইয়ে,
কেন রে মন রলি ভুইলে,
গেলি না রে প্রেমের বাজারে,
গোসাই নীলকান্তে কয়,
হলধর, তুই ভুইলে রলি রে॥

(৫৩)

আমার মন আর কবে বলিবা হরি।
ডুবল মানব-তরী॥

জোপাটে গড়াইয়া নৌকা
গোছা সারি সারি।
নৌকার মাঝখানে বসিয়া মার
ভাবরসের পাতাম জিনারী॥

মহাজনের মাল ভরিয়ে
দিচ্ছ ভবে পাড়ি।
নৌকার হাল মানে না, পাল খাটে না,
কুল চাপে না, হায় কি করি॥

গুরুর নামে দেহতরী,
দিচ্ছ ভব পাড়ি।
ভব-সাগরের ঘোলায় পইড়ে,
ডুবতেছে রে মানবতরী॥ *

শ্রীগোপীনাথ দত্ত।

* উপরোক্ত সংগৃহীত সঙ্গীতাদিতে কতকগুলি বাউলিয়া বা 'বাউলাতী' গানও আছে। বাউলিয়া গান নানা সুরে গীত হইতে শুনা যায়। দেহতত্ত্বসম্বন্ধীয় গানমাত্রই ভাটীয়াল বা 'মিঠান' সুরে লম্বা টানে গীত হয়।

উক্ত সংগীতসংগ্রহ-কার্য্যে রাজাবাড়ীনিবাসী শ্রীযুক্ত গোরাচাঁদ কর, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত চন্দ্রমণি দাস ও শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র গোপ মহাশয়দের নিকট বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি; তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। —লেখক

উত্তর ব্রহ্ম ভ্রমণ

১৯১০ সালের মার্চ্চ মাসের মধ্যভাগে রেঙ্গুন হইতে মে-মিও রওয়ানা হই। মান্দালয়ের * দুই তিন মাইল নিম্নে মিওহঙ্গ ষ্টেশনে গাড়ী বদলাইয়া অন্য লাইনে মে-মিও যাইতে হয়। গাড়ী প্রাতে মিওহঙ্গ আসে। ইহার ৩৯ মাইল পরে মে-মিও। মিওহঙ্গ হইতে কয়েকটী ষ্টেশনের পর সিদাও (Sedaw) নামক ষ্টেশন হইতে গাড়ী আস্তে আস্তে পাহাড়ের উপর ঘুরিয়া ঘুরিয়া দুইটী সুরঙ্গ অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিতে থাকে। মে-মিও কয়েকবার গিয়াছি। মাননীয় লাটসাহেব গ্রীষ্মাবকাশের জন্য এখানে ছয়মাস কাল অতিবাহিত করেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সেক্রেটারিয়েটের কতিপয় কর্ম্মচারী, তাঁহাদের কেরানীগণসহ মে-মিও আইসে। এখানে একটী সেক্রেটারিয়েট ও অন্যান্য আফিস আছে।

১৮৮৬ সালে কর্ণেল মে নামক একজন সৈনিক কর্ম্মচারী একদল সেনাসহ মেমিও সহরে অবস্থান করেন। তাঁহার নাম হইতেই এই সহরের 'মে-মিও' (May-myo) নাম হইয়াছে। ইহার কিছু পূর্ব্বে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে নানাপ্রকারের বিবাদ-বিসম্বাদের সূত্রপাত হয় ; তাহার বিস্তৃত উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। অবশেষে, ১৮৯০ সালে কিয়াওজান (Kyawzan) নামক একজন

* মান্দালয় রেঙ্গুন হইতে রেলপথে ৩৮৩ মাইল দূর।

"বো" (ডাকাত অথবা মোড়ল = chief) বড়ই উৎপাত আরম্ভ করে। তাহাকে দমন করিয়া সহরে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করার জন্য ইংরাজপক্ষ হইতে এখানে সৈন্য সমাবেশ করা হয়। যুদ্ধে হটিয়া কিয়াও-জান্ সান রাজ্যে (Shan state) ও পরে চীনদেশে পলাইয়া যায়। ইহার পর হইতেই সহরের উন্নতি আরম্ভ হইয়াছে। ব্রহ্মভাষায় এই সহরের নাম পিন-উ-লুইন (Pyin-u-Lwin)। সমুদ্রতল হইতে এই সহর ৩,৬০০ ফুট উচ্চ। ইহার চতুর্দ্দিকেই ছোট বড় নানাজাতীয় পাহাড় আছে। সহরটী ১ বর্গমাইল স্থান ব্যাপিয়া সমতল ভাবে অবস্থিত।

জিবিন্জী-টোন্বো (Zibingyi-Tonbo), টোংবিও (Taungbyo), এবং কিয়েট-নেপা-হিউগেট-কিথাইট(Kywet napa-Huget-Kyithait) নামক সরকার কর্ত্তৃক সংরক্ষিত তিনটী বন (Forest Reserve) আংশিকভাবে মে-মিও সবডিভিশনে পড়িয়াছে। এই সব বনে বাঁশ, ও সেগুন প্রভৃতি কয়েক জাতীয় কাঠ পাওয়া যায়। সহর হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে সাব-ওয়াটাং (Sabwataung)নামক পাহাড়ে পাইন (pine) বৃক্ষ জন্মে; স্থানে স্থানে ওক (oak), পিপুল (peepul) ও তারপিনের গাছও দৃষ্ট হয়। শীতকালে নানাজাতীয় ফুলের সৌরভে সহরটি আমোদিত হয়। বড় বড় সূর্য্যমুখী ফুল বৎসরে একবার মাত্র প্রস্ফুটিত হয়। নানাজাতীয় গোলাপ ও বহুবিধ অর্কিড্ও যথেষ্ট আছে। ইহা ছাড়া নানা-প্রকারের জঙ্গলী ফুলও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

ডিসেম্বর মাসে বড়ই ঠাণ্ডা পড়িতে থাকে। এমন কি চারিধারের ঘাসগুলি পর্য্যন্ত শীতের আতিশয্য সহ্য করিতে না পারিয়া অর্দ্ধমৃতাবস্থা প্রাপ্ত হয়। আবার শীতকাল চলিয়া গেলেই নানাজাতীয় ফুল ইত্যাদির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সহরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আবার ফিরিয়া আইসে। প্রায় ১২ মাসই গরম জলে স্নান করিতে হয়; বৎসরের মধ্যে দুই একমাস কোনও প্রকারে ঠাণ্ডা জলে স্নান করা চলে। বর্ষাকালে কোন কোন বৎসর অতিশয় বৃষ্টি হয়। ১৮৯৯ সালে বর্ষার সময়ে ৭৪ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হইয়াছিল। শুনিতে পাই, এখানে বিগত ৫০ বৎসরের মধ্যে এত অধিক বারিবর্ষণ হয় নাই। ১৮৮৯ ও ১৮৯১ সালের ঝড় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শীতের জন্য বর্ম্মীরা এই স্থান পছন্দ করে না। কিন্তু সাহেব ও ভারতবর্ষের নানা-জাতীয় লোকের স্বাস্থ্য বেশ ভাল থাকে। শীতের পরিচ্ছদাদির দিকে দৃষ্টি রাখিলে এস্থানে স্বাস্থ্যের উন্নতি ব্যতিরেকে অবনতির আশঙ্কা নাই।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী ভদ্রলোকদের সমাবেশে সহরটী বড়ই ভাল লাগিত। তখন এই সহরে প্রায় ৩০।৪০ জন বাঙ্গালী ছিল। ৺দুর্গাপূজার সময় তিন দিন নিমন্ত্রণ খাইতে খাইতে পেটের অসুখ হইবার উপক্রম হইত; আবার প্রতি রবিবারে ৺হরিসভা উপলক্ষে এক একজনের বাড়ীতে পালাক্রমে সকলে আসিয়া মিলিত হইত, ও হরিনামের সঙ্গে সঙ্গে পরিতোষসহকারে হরির প্রসাদস্বরূপ নানাজাতীয় ফল ও মিষ্টান্নাদিতে উদরপূরণ করিত। এই সাপ্তাহিক সম্মিলনের ফলে সকলের মধ্যে একতা ও ভালবাসার বন্ধন বেশ দৃঢ় ছিল। অধুনা কয়েকজন পদস্থ বাঙ্গালীবাবু অন্যত্র বদলী হইয়া গিয়াছেন; সহরের সে অপূর্ব্ব ভাব যেন আর ততটা নাই। নানা কারণে হরিসভার কার্য্যাদিও এক্ষণে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তবে এখনও যাঁহারা সেখানে বাস করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই বেশ ভদ্রলোক; কাহাকে কোনও অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না।

মেমিও বাজারে কপি, কুমড়া, আলু ও নানাজাতীয় শাকসব্জী পূর্ব্বে খুব সস্তা ছিল। আজকালও রেঙ্গুন অপেক্ষা সস্তা দরে এই সব জিনিস পাওয়া যায়, কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। তখন পাঁচ দিন পর বাজার বসিত। এখন বোধ হয়, তিন দিন অন্তর বাজার মিলে। প্রত্যহ সব জিনিসই অল্প-বিস্তর পাওয়া যায়। মৎস্য মান্দালয় হইতে আসে, কারণ মেমিওর নিকটে কোন নদী নাই। এ জন্য মৎস্য অত্যন্ত মহার্ঘ। রোহিত মৎস্য ২৲ টাকা ভিশের * কম পাওয়া

* ভিশ—এক ভিশ আমাদের দেশী পৌণে দুই সেরের সমান।

যায় না; কখন কখনও ৩।৪ টাকাও হয়। আজ কাল মৎস্য বড়ই দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। সহরে দেশী ও বিলাতী দুই দল সৈন্য আছে। হিন্দুস্থানী সৈন্যেরা গরু, ভেড়া ও পাঁঠা ইত্যাদি পোষে। ইহার ফলে পাঁঠা ভেড়া ও খাসির টাট্‌কা মাংস এক এক ভিশ ১।৴০ কি ১।।০ টাকা মূল্যে বিক্রীত হয়। উত্তম গব্যঘৃতও দুষ্প্রাপ্য নহে। ঝরণার জল পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয়। ঝরণা হইতে পাইপ দ্বারা জল আসে। সাধারণ ব্যবহারের জন্য প্রতি বাড়ীতে কূপ আছে। সুতরাং জলের কষ্ট নাই।

উত্তর ও দক্ষিণ সান ষ্টেটে চা, চুরুট ও বিস্কুট ইত্যাদি অনেক আমদানী হয়। ১৮৯৬—৯৭ সালে প্রায় ২০,৩৬,৭১৬৲ টাকার জিনিস আমদানী হইয়াছিল। ঐ সালে লবণ, লোণা মাছ, তুলা, পশম ও লৌহ ইত্যাদিতে ২০,৭৬,৫৩৪৲ টাকার জিনিষ রপ্তানি হইয়াছিল।

সহরে বৌদ্ধ মন্দির নাই বলিলেও চলে। বাজারের এক ধারে একটী মাত্র ক্ষুদ্র মন্দির ও অতিথিশালা (Ziyat) আছে। মান্দালয়-লেসিও রাস্তার ধারে ২।১টী ছোট মন্দির দেখা যায়। লাট সাহেবের বাড়ী বাহির হইতে ভালরূপ দেখা যায় না, কারণ বাগানের বৃক্ষশ্রেণী চতুর্দ্দিক হইতে বাড়ীটাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। ইংরেজদের ক্লাবঘর একটী নাতিদীর্ঘ মাঠের উপরে অবস্থিত। ঘোড়দৌড় কিম্বা পলো খেলার সময় এস্থানে অত্যন্ত জনতা হয়। বড়দিনের সময় সৈন্যগণ এখানে কুচ কাওয়াজ করিতে আসে। এই মাঠের নিকটবর্ত্তী কয়েকটী বাড়ীর দৃশ্য বড়ই সুন্দর। বাড়ী কয়েকটী উচ্চ টিলার উপর স্থাপিত। বড় বড় প্রায় বাড়ীতেই চিমনী আছে। উহাদের অধিকাংশই কাষ্ঠনির্ম্মিত। কয়েকখানা পাকা বাড়ীও সহরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে। অধিকাংশ বাড়ীতেই সুন্দর সুন্দর ফুল ও শাকসবজীর বাগান আছে। পূর্ব্বে এই সহরে ঘন জঙ্গল ছিল; তখন শীতও বর্ত্তমান সময়াপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। জঙ্গলকর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শীত অনেক কমিয়াছে; নতুবা শীতকালে এখানে থাকা অতি কষ্টকর ব্যাপার হইত। সাহেবদের স্কুল, খৃষ্টানদের কয়েকটী গির্জ্জা ও গবর্ণমেন্ট কর্ম্মচারীদের বাড়ীগুলি বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সহরের মধ্যে সার্কুলার রোড টিই (Circular Road) সর্ব্বাপেক্ষা বড়। এই রাস্তাটী সীমানার ন্যায় সহরের প্রায় তিন দিক বেষ্টন করিয়া আছে। রাস্তাগুলি ছোট হইলেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মেমিওর বর্ত্তমান লোক সংখ্যা ১১, ৯৭৪ (পুরুষ ৮, ০০৮, স্ত্রীলোক ৩, ৯৬৬)।

তৎপর আমরা সোয়েবো (Shwebo) রওয়ানা হই। মেমিও হইতে মিওহঙ্গ আসিয়া প্রথমতঃ ছেগাইঙ্গ চলিলাম। এটী শাখা লাইন। অনেক দিন হইতেই নদীর উপর পুল দেওয়ার প্রস্তাব চলিতেছে; কবে পুলের কাজ আরম্ভ হইবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। ফেরী জাহাজে অমরাপুর হইতে ঐরাবতী নদী পার হইয়া পুনরায় ছেগাইঙ্গ গাড়ীতে উঠিলাম।

ছেগাইঙ্গ (Sagaing) দুই তিনবার গিয়াছি। সুতরাং এই স্থানে সহরের একটু বিবরণ দিতেছি। রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে সরকারী ডাকবাংলা প্রায় দেড় মাইল দূর। সেখানেই আমাদিগকে কাজ করিতে হইত। যাইবার সময় রাস্তায় এক যায়গায় দেখা গেল, কুকীদের কাপড়ে রং দেওয়া হইতেছে, ও অনেকগুলি কাপড় শুকাইতে দেওয়া হইয়াছে। ঐরাবতী নদীর পারের রাস্তাই ক্রমশঃ সহরে প্রবেশ করিয়াছে। রাস্তা হইতে নিম্নে অনেক দূর পর্য্যন্ত বালুকারাশি; তাহার পর ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী ঐরাবতী, আবহমান কাল আপন মনে তর্ তর্ বেগে চলিয়াছে। এই বালিপূর্ণ স্থানে বর্ম্মা কৃষকেরা গরু লইয়া আমাদের দেশের ঘোড় দৌড়ের ন্যায় খেলা করে। অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে প্রায়ই মোরগের লড়াই সংক্রান্ত (Cock fight) মোকদ্দমার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। বাজি রাখিয়া এই সব খেলা আরম্ভ হয়। এক একটী ভাল দৌড়ের মুরগীর মূল্য ৩০৲ টাকা পর্য্যন্তও হয়। এই সব কাণ্ডকারখানা বড়ই অদ্ভুত। মধ্যে মধ্যে দুই একটী ছেলেধরার মোকদ্দমাও হয়। ছোট ও বড় ছেলে কিম্বা বৃদ্ধদিগকে জোর করিয়া জঙ্গলে আট্‌কাইয়া রাখা হয়; পরে উড়া

চিঠিতে টাকার দাবী করা হয়। টাকা নির্দ্দেশমত স্থানে পাঠাইয়া দিলে, ছেলেদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু, টাকা না দিলে, তাহাদের প্রাণসংহার করা হয়। কি ভীষণ ব্যাপার! এই বিংশ শতাব্দীতেও এরূপ দুই একটী ঘটনা সরকারী কাগজপত্র কলুষিত করিতেছে। ধরা পরিলে, উপযুক্ত শাস্তিও দেওয়া হয়।

ছেগাইঙ্গ শব্দটীর অর্থ বৃক্ষ-শাখা (Sit—এক জাতীয় বৃক্ষ, এবং Kaing—শাখা); পালি নাম,জিয়া-ওরা (Zeyahwra), বাঙ্গলায় জয়পুর। এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণটী উত্তর ব্রহ্ম গেজেটে আছে। গেজেটিয়ারের বিবরণটী ব্রহ্মভাষায় লিখিত ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ট্যাগাই-নিগো (Tagai-nego)-র রাজা থ্যাডো-মহা-যেজা (Thado Maha Yaza)-র প্রধানা রাণীর দুইটী অন্ধ পুত্র জন্মে। তাহাদের নাম মহা-থামবোয়া (Maha-thambwa) এবং সুলা-থান্‌বোয়া (Sula-thanbwa)। রাজা ইহা দর্শনে বড়ই লজ্জিত হন, এবং রাণীকে গোপনে পুত্রদ্বয়কে নিহত করিতে আদেশ দেন। কিন্তু রাণী অপত্যের মায়া পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া, গোপনে পুত্রদ্বয়কে ১৯ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত লালন-পালন করেন। এই সময় রাজা ইহা জানিতে পারিয়া, উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্যাদিসহ তাহাদিগকে নদীতে ভাসাইয়া দেন। নৌকাখানা নদীর স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে যাইতে যাইতে, ছিট্ (Sit)-নামক বৃক্ষের ডালে আটকিয়া যায়। এজন্যই ইহার নাম (Sit Kaing)। ধীরে ধীরে উচ্চারণ পরিবর্ত্তিত হইয়া ইহা এক্ষণে সেগাইং (Sagaing) হইয়াছে। ইহার পর তাহাদের দৃষ্টি-শক্তি লাভ হয়। ধীরে ধীরে তাহারা সেলিং (Salin)-নামক স্থানে উপস্থিত হয়। আরও কিছু দূরে আসিয়া, তাহাদের খুড়ার সঙ্গে দেখা হয়। তিনি তথায় কুঙ্গীর ন্যায় বাস করিতেছিলেন। কিছুদিন পর খুড়া মহাশয় তাঁহার পালিতা কন্যার সঙ্গে বড় ভ্রাতুষ্পুত্রটীর বিবাহ দেন। পিতার মৃত্যুর পর মহা-থাম্বোয়া ছয় বৎসর নিরাপদে রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সুলা-থান্-বোয়া বিধবা ভ্রাতৃবধূকে বিবাহ করিয়া ৩৫ বৎসর রাজত্বের পর মানব-লীলা সংবরণ করিলে,তাঁহার পুত্র দ্বোথা-বৌং (Dwotha-baung) পিতৃ-সিংহাসনে আরূঢ় হন, এবং বর্ত্তমান প্রোম-নামক স্থানে নূতন রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়া ৭০ বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি ব্রহ্ম-রাজদের মধ্যে একজন শক্তিশালী ও বিখ্যাত রাজারূপে খ্যাত।

কথিত আছে, তাসি-সিন্-থিহাথু (Tasi Shin Thihathu)-র পুত্র থিংকা-স্ব-য়ুন ১৩১৫ খ্রীষ্টাব্দে ছেগাইঙ্গ নগরটী প্রস্তুত করেন। ইনিই ছেগাইঙ্গ সহরে জিন্‌জিন্ (Zingin)-নামক কুঙ্গী-নিবাস (monastery) স্থাপন করেন। এই বংশের উত্তরাধিকারিগণ ৪৯ বৎসর এখানে রাজত্ব করেন। তৎপর এথিন্-খায়ার (Athin Khaya) (থিংকা-স্ব-য়ুনের অন্য নাম) পৌত্র ১৩৬৪ খ্রীষ্টাব্দে আভা-নগরী স্থাপন করেন। এই সালেই সান-গণ যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া ছেগাইঙ্গ ও পিনিয়া(Pinya) নামক স্থান-দ্বয় নষ্ট করিয়া ফেলে। আভা ও ছেগাইঙ্গ দীর্ঘকাল একই রাজার শাসনে ছিল; কিন্তু ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে পেইং নৌং (Payin Naung) আভা দখল করেন। এই সময় হইতে ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই স্থান দুই জন পেগু সম্রাটের অধীনে করদ-রাজ্য-রূপে শাসিত হয়। কিন্তু এই শেষোক্ত সালে আভার উপরোক্ত করদ রাজা পেগু পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত করেন, ও পর্ত্তুগীজদের নিকট হইতে ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে সিরিয়াম্ (Syriam) দখল করেন। তখন থাডু-ধম্ম-যেজা (Thadu-dhamma-yaza) কর্ত্তৃক আভা নগরী রাজধানী-রূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। ইহার পর তেলেং-জাতি (Talaing) ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে আভা দখল করে। অলোং-প্রা (Alaung-pra)-র রাজত্ব-কালে তাহারা তাড়িত হয়। ইতিমধ্যে ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মণিপুরীরা ছেগাইঙ্গে অত্যাচার আরম্ভ করে। এজন্য রাজা অলঙ্গপ্রার জ্যেষ্ঠপুত্র নৌং-ডোগি (Naung-dawgyi) ১৭৬০-৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ছেগাইঙ্গে পুনরায় রাজধানী উঠাইয়া আনেন। তাঁহার মৃত্যুর পর আবার আভায় স্থায়ীভাবে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। ১৮৮৫ সালের ১৪ই ডিসেম্বর এই স্থান ইংরাজদের দখলে আসে।

ছেগাইঙ্গ বেশ স্বাস্থ্যকর স্থান। এপ্রিল ও মে মাসে একটু গরম পড়ে। বর্ষাকালে নদীতীরের বালুকারাশি জলমগ্ন হয়, ও নদীর জলীয় বাতাসে সহরটী খুব ঠাণ্ডা থাকে। পূর্ব্বে বর্ম্মারা ছেগাইঙ্গ ও অমরাপুরা নগর দুইটীকে কতকটা স্বর্গের ন্যায় মনোজ্ঞ স্থান বলিয়া বিবেচনা করিত।

ছেগাইঙ্গ পঁহুছিবার কিছু পূর্ব্বে নদীতীরের পর্ব্বত-গাত্রে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অনেকগুলি মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন পাহাড় বেশ উচু। এই মন্দিরগুলি দেখিলে ব্রহ্ম-রাজদের ও তাঁহাদের প্রজাবর্গের বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি অসীম ভক্তি ও সহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায়। কোন কোন মন্দির প্রায় তিন চারিশত ফুট উচ্চ পাহাড়ের উপর অবস্থিত। মন্দির-স্থাপনার্থে নানাপ্রকার সরঞ্জাম কত কষ্ট করিয়া এরূপ জনশূন্য পাহাড়ে উঠাইতে হইয়াছে, তাহা ভাবিলেও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। হায়! যে দেশের লোক ধর্ম্ম-পালনের জন্য এরূপ অকাতরে অর্থ-ব্যয় ও অসীম পরিশ্রম করিয়াছে, আজ কালের কুটিল গতিতে, অত্যধিক স্ত্রী-স্বাধীনতার ফলে তাহাদের কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা ভাবিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। একেশ্বর-বাদমূলক মহাযান-পথাবলম্বী ধর্ম্ম-বাহকগণ কবে অন্যান্য স্থান হইতে আসিয়া, পুনরায় হীনযানের আংশিক নাস্তিক্য-বাদের নিরাশ ও শুষ্ক ভাব দূর করিয়া নূতন ভাবের স্রোতে দেশকে পারমার্থিক উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিবেন! যদিও জনসাধারণ প্রথমতঃ মহাযান-ধর্ম্ম বুঝিতে পারিবে না, তথাপি শিক্ষিত নেতাদের কি নানাপ্রকারের বিদ্যালয়াদি স্থাপন করিয়া, তাহাদিগকে শিক্ষিত করিয়া নূতন-ভাবে ঐহিক ও পারত্রিক উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে সাহায্য করা কর্ত্তব্য নহে? বৎসর বৎসর কুঙ্গী-নিবাস স্থাপনে কত অর্থ-ব্যয় হইতেছে। যদি এই অর্থের সামান্য অংশ দ্বারাও স্থানে স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়, তবে ভবিষ্যতে অনেক ফল লাভ হইতে পারে। কেবল নাস্তিক্য-বাদ নহে, ভূত-প্রেতের উপাসনায়ও দেশ অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছে। আজও মন্দিরে মন্দিরে নর-নারীগণ নটের পূজা ও আরাধনায় মত্ত। ব্রহ্মদেশে লেখা-পড়া জানা স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা বঙ্গদেশ অপেক্ষা অনেক বেশী, কিন্তু তথাপি তাহাদের এরূপ অবস্থা দেখিলে কোন্ হৃদয়বান্ ব্যক্তির না দুঃখ হয়?

কমিশনার সাহেবের ও অন্যান্য সাহেবকর্ম্মচারীদের বাড়ীগুলি নদীতীরে অবস্থিত। গবর্ণমেণ্টের আফিসগুলি স্থানে স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছে।

এই সহরে নানাজাতীয় লোক বাস করিতেছে। মণিপুরী, সান, তেলাইঙ্গ, চীনা ও হিন্দুস্থানী দোকানদারগণ সহরের জন-সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত করিতেছে। ইহা ছাড়া কয়েকজন খৃষ্টিয়ান ও বাঙ্গালীও আছেন। এক্ষণে সহরের লোকসংখ্যা ১০, ৯৩৭ (পুরুষ ৫, ৪২৭; স্ত্রীলোক ৫, ৫১০)।

এখানে অতি উৎকৃষ্ট রেশমী লুঙ্গী ও পেছো (বড় কাপড়) প্রস্তুত হয়। এক একখানির মূল্য ১০০।১৫০ দেড়শত টাকা পর্য্যন্তও হয়। সাধারণতঃ, চীন ও শ্যাম দেশ হইতে রেসম আসে; এখানে রঞ্জিত ও সিদ্ধ করিয়া বিশেষজ্ঞগণ উহা ব্যবহারোপযোগী করিয়া লন। এই জেলার নানাস্থানে নীল, তুলা, পাথরচুণ, এক প্রকার খস্‌খসে মোটা কাগজ ও বহুবিধ কৃষিজাত দ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানিও হয়।

কাঁঠাল গাছের শাখা হইতে রস বাহির করিয়া কুঙ্গীদের কাপড়ে রং দেওয়া হয়। বোধ হয় অন্য কোনও দেশে কাঁঠাল গাছের ডাল হইতে কোন প্রকারের রং প্রস্তুত হয় না। এদেশে কিন্তু ইহা হইতে এক প্রকার হরিদ্রা বর্ণের রং বাহির করা হয়।

ছেগাইঙ্গ সহরে ৩৯টী বৌদ্ধ-মন্দির আছে বলিয়া উত্তর-ব্রহ্ম-গেজেটে উল্লেখ আছে। আফিসের কাজে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকায় মফঃস্বলের অনেক মন্দিরেই প্রবেশ করিতে পারি নাই। প্রতিদিন নিয়মিত দুই বেলা কাজ করিয়া সন্ধ্যার সময় প্রায়ই অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িতাম। নানাস্থানে যাতায়াতে মন্দিরের কেবল বাহ্য সৌন্দর্য্যই নয়ন-পথে পড়িয়াছে। সহর হইতে প্রায় ২ ও ৬ মাইল দূরে দুইটী প্রসিদ্ধ মন্দির আছে। রেলগাড়ী হইতে লক্ষ্য করিলে সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত মন্দিরটীর আকৃতি দূর হইতে দেখা যায়। সময়াভাবে ইহার মধ্যেও প্রবেশ

করিতে পারি নাই। উৎসব উপলক্ষে উপরোক্ত মন্দির দুইটীতে বহুলোকের সমাগম হয়।

ছেগাইঙ্গের বাজারটী ছোট হইলেও, শাকসব্জী ও মৎস্য প্রচুর পরিমাণে ও অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। মাংসের দাম প্রায় অন্যান্য সহরেরই তুল্য। ব্রহ্মদেশের অনেক সহরেই ভাল গব্যঘৃত পাওয়া যায় না, কিন্তু ছেগাইঙ্গ সহরের কিয়দ্দূরের পৌনা কিম্বা প্রবাসী হিন্দুস্থানীদিগকে বলিলে, তাহারা বাড়ী আসিয়া কাঁচা মাখন হইতে ঘৃত তৈয়ার করিয়া দিয়া যায়; মূল্য, ব্রহ্মদেশের অন্যান্য স্থানের তুলনায় খুব বেশী নয়। আমি একবার বাঁধা কপি ও আঙ্গুর ফল আনিয়াছিলাম। আঙ্গুরের মূল্যও বেশ সস্তা। এক এক তোড়ায় প্রায় ২০।২২টী থাকে, মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র। তখন ফলগুলি একটু কাঁচা ছিল। ঐ সময়ে তিন পয়সায় এক টুকরী গোল বেগুন পাওয়া যাইত। (ক্রমশঃ)

শ্রীনলিনীকান্ত দাশগুপ্ত।

এস মা!

আজি,

বন্দিত বনরাজি গুঞ্জন-রাগে,
নন্দিত সমীরণ পুষ্প-পরাগে,
ইন্দিবর কত বন্দী তড়াগে—
সরিতে,
অরণ্য লেপিয়া দিল কে
হরিতে?

অম্বরে গুরু গুরু ডম্বরু-নাদ;
শীতল ঢল ঢল শারদ চাঁদ;
কাঞ্চন বীণা আজি পঞ্চমে বাঁধ
তরুণি!
ঘাটেতে লাগিল কার
তরণী?

চঞ্চল চকা-চকি দ্বন্দ্ব-আনন্দে;
পল্লী পুলকিত শিউলি-গন্ধে;
গাঁথিছে ভাগীরথী কুলু কুলু ছন্দে—
কবিতা!
সোনা দিয়া কে সাজাল
শরতের সবিতা?

কাননে আজি কেন কানুন বাজে?
নির্ম্মল মেহ-নীলে আকাশ রাজে,
কুন্দ-কুমুদ-কাশে সুন্দর সাজে
ধরণী?
ঘরে এস অয়ি শিব-
ঘরণি!

অঞ্চলে অভিনব ধান্যের শীষ্;
শরণ্যে! এ যে তব স্বর্ণ-আশীস্!
ধন্য করি আজি সকল দিশ্,
এস মা!
তুমি যে আমার শ্যামা!
সুষমা!

শ্রীকুলচন্দ্র দে।

প্রতিজ্ঞা যৌগন্ধরায়ণ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিষ্কম্ভক

কাঞ্চুকীয়ের প্রবেশ

কাঞ্চু। ওহে আভীরক, তুমি প্রতীহারীকে গিয়ে বল যে, কাশী-রাজের সভা-পণ্ডিত আর্য্য জৈবন্তি দূত হ'য়ে এসেছেন। দূতকে যেমন ভদ্রতা কত্তে হয়, সমস্ত ক'রে, তাঁকে বসতে দাও; সাবধান, যেন তাঁর কোনও কষ্ট না হয়। অতিথি-সৎকার যেন ঠিক নিয়ম-মত করা হয়। (স্বগতঃ), যে যে রাজ-

বংশের সঙ্গে সম্বন্ধ হ'তে পারে, রোজ রোজ সেই সব রাজ্য থেকে দূত কেবল আসছেই; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! মহারাজ কাকেও কিছু বল্‌ছেন না; কাকে অনুগৃহীতও কচ্ছেন্ না, কাকে বিমুখও কচ্ছেন্ না। হবে! বিবাহ-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ দৈবেরই হাত।

মেয়েকে পরের হাতে দিতেই হবে, না দিয়ে উপায় নেই। তবে বিধি যার সঙ্গে বাঁধন স্থির করে রেখেছেন, এখনো তার দূত আসে নি? তাই মহারাজ যে সকল রাজার সঙ্গে সম্বন্ধ আস্‌ছে, তাঁদের রূপ, গুণ এবং বংশ জেনেও, বিধি-প্রেরিত দূতের অপেক্ষায়,কাউকে কিছু বল্‌ছেন না;—আশাও দিচ্ছেন না, নিরাশও কচ্ছেন না।

দেশদেশান্তর থেকে কত লোকেই বারবার আস্‌ছে, রাজপুরী লোকজনে গম্ গম্ কচ্ছে—

এই যে মহারাজ মহাসেন!—স্কন্ধদেশে নবোদ্গত দূর্ব্বা-ঙ্কুরের মত মনোরম নীলমণি-খচিত স্বর্ণালঙ্কারে তাঁর কি রমণীয় শোভাই হ'য়েছে! তিনি নিবিড় কনক-তাল-বনের এক কোণ থেকে বাইরে আসছেন, বোধ হচ্ছে যেন কুমার কার্ত্তিকেয় শরবন থেকে বহির্গত হচ্ছেন!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

সপরিবারে রাজার প্রবেশ

রাজা। সব রাজাই ত আমার অশ্বখুরোৎক্ষিপ্ত ধূলি-রাশি মুকুট-প্রান্তে বহন ক'রে পদানত হ'য়েছে; কিন্তু হস্তি-বিদ্যায় গর্ব্বিত,গুণবান্ বৎস-রাজ যতদিন আমার সম্মুখে অবনত মস্তক না হচ্ছে, তত দিন আমি কিছুতেই পরিতোষ লাভ কত্তে পাচ্ছি না। বাদরায়ণ—

কাঞ্চুকীয়ের প্রবেশ।

কাঞ্চু। মহাসেনের জয় হ'ক।

রাজা। দৈবজ্ঞকে বস্‌তে দিয়েছ?

কাঞ্চু। হাঁ, তাঁকেও দিয়েছি, আর অনুরূপ অতিথি-সৎকারও করেছি।

রাজা। তুমি সর্ব্বদাই রাজকুলের সুনাম আকাঙ্ক্ষা ক'রে থাক; যা করেছ, তা করা উচিতই হ'য়েছে। অতিথির সৎকার করাই গৃহস্থের ধর্ম্ম। মেয়ের বিবাহ-প্রস্তাবে সকলেই অন্যের উপর ভার দিয়ে,নিজেরা দায়িত্ব থেকে মুক্ত হ'তে চায়। (কাঞ্চুকীয়ের দিকে তাকাইয়া), বাদরায়ণ, তুমি যেন কিছু বল্‌তে ইচ্ছুক হ'য়েছ?

কাঞ্চু। তেমন কিছু নয়, তবে মেয়ের বিয়ে সম্বন্ধেই কিছু বল্‌তে যাচ্ছিলুম্।

রাজা। তবে সে কথা চাপা দিতে চাচ্ছ কেন? এ সম্বন্ধে সকলেরই বল্‌বার অধিকার আছে। তোমার যা বল্‌বার আছে, সচ্ছন্দে বল।

কাঞ্চু। মহাসেন, আমি বল্‌ছিলুম কি, রোজ রোজই ত নানা রাজ্য থেকে রাজকুমারীর বিবাহ-প্রস্তাব নিয়ে দূত আস্‌ছে; কিন্তু মহাসেন কাকেও বিমুখ কচ্ছেন না,বা কাকেও অনুগ্রহও দেখাচ্ছেন না। এটা কি রকম?

রাজা। বাদরায়ণ, এই রকমই বটে। এর একটা কারণ হচ্ছে, খুব ভাল বরের আশা; আর একটা কারণ হচ্ছে, বাসবদত্তার প্রতি একান্ত স্নেহ। এই দুই কারণে কিছুই ঠিক কত্তে পাচ্ছি না।

সর্ব্বপ্রথম বরের বংশের দিকেই মন আকৃষ্ট হয়, তার পর স্নেহ; যদিও স্নেহ মৃদুগুণবিশিষ্ট, তথাপি এর প্রভাব খুব বেশী। তার পর চাই, রূপ ও কান্তি;—স্ত্রীলোকের ভয়ে যে আমি রূপের কথা বলছি, তা' মনে করো না; রূপও একটা গুণ। সকলের শেষে দেখ্‌তে হয়, বরের শারীরিক সামর্থ্য; সামর্থ্য না থাক্‌লে যুবতীগণকে রক্ষা করা যায় না।

কাঞ্চু। আই ত; কিন্তু মহাসেনকে বাদ দিলে, এক জনের এতগুলি গুণ আছে, এমন লোক ত আমি দেখ্‌ছি না।

রাজা। তাইতেই ত চিন্তার কারণ হ'য়েছে।
পিতা কন্যার বরই দেখে দিতে পারেন, তার পরে যে সুখ-সম্ভোগ, সেটা ভাগ্যাধীন; এর অন্যথা দেখা যায় না। মেয়েকে বিয়ে দিয়ে ফেল্‌তে মার বড়ই কষ্ট হয়, সুতরাং রাণীকে একবার ডেকে আন।

কাঞ্চু। মহাসেনের যেমন আদেশ।

[প্রস্থান।

রাজা। বৎস-রাজকে ধ'রে আন্‌তে শালঙ্কায়নকে পাঠান হয়েছে; এখনো ফেরে নি। কাশী-রাজের প্রেরিত দূত দেখে আমার তারই কথা মনে হচ্ছে। সেই ব্রাহ্মণ আজ পর্য্যন্তও কোন খবর পাঠাচ্ছে না কেন? তা হবে—
যার যা ইচ্ছা, তার চেষ্টাও তেমন, এবং তার দিকেই মন আকৃষ্ট হয়। কিন্তু বৎস-রাজের সচিবেরাও ভারি সাবধানে রয়েছে।

পরিজনের সহিত রাণীর প্রবেশ

দেবী। মহাসেনের জয় হ'ক।

রাজা। রাণী, ব'স।

দেবী। মহাসেনের যেমন আদেশ।

রাজা। বাসবদত্তা কোথায়?

দেবী। বাসবদত্তা বৈতালী উত্তরার কাছে নারদীয়া বীণা শিখ্‌তে গেছে।

রাজা। তার আবার সঙ্গীত-বিদ্যার দিকে মন গেল কেন?

দেবী। বাজে কথা শুনে আর কি কর্‌বে? খাঁটি কথা হচ্ছে এই যে, কাঞ্চনমালা বীণা শিখ্‌ছে; তাই দেখে, তারও শিখ্‌তে ইচ্ছা হ'য়েছে।

রাজা। হাঁ, বালক-বালিকার স্বভাবই এই।

দেবী। মহাসেনকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কত্তে চাই।

রাজা। কি কথা!

দেবী। বাসবদত্তার জন্য একজন আচার্য্য রাখ্‌তে আমার ইচ্ছে হচ্ছে।

রাজা। বাসবদত্তার এখন বিয়ের বয়স, এখন আর শিক্ষক রেখে কি হবে? এখন পতিই তাকে শিখাতে পার্‌বে।

দেবী। তার এখনই বিয়ের কাল হ'ল!

রাজা। বেশ, রোজ রোজ মেয়ের বিয়ে দাও, মেয়ের বিয়ে দাও, বলো, আর এখন বুঝি কষ্ট হচ্ছে।

দেবী। মেয়ের বিয়ে দিতে আমার আপত্তি নেই, শুধু বিরহ-দুঃখ ভেবেই আমি কাতর হচ্ছি। আচ্ছা, কার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া স্থির হ'ল।

রাজা। এখনও ঠিক হয় নি।

দেবী। এখনও হয় নি!

রাজা। এখনও মেয়ের বিয়ে হয় নি ভাব্‌লে মনে লজ্জা হয়; আবার, মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিলে, মনও ব্যথিত হয়। ধর্ম্মানুরোধে মেয়েকে অন্যের স্নেহাধীন কর্‌লে, মায়ের মনেও দুঃখ হ'য়ে থাকে।

এখনই বাসবদত্তার শ্বশুর-সেবার উপযুক্ত কাল। আবার, কাশী-রাজের দূত আর্য্য জৈবন্তিও বিবাহ-প্রস্তাব নিয়ে রাজধানীতে এসেছেন। সুতরাং, কাশী-রাজের গুণের দিকেই আমার মন আকৃষ্ট হচ্ছে। (স্বগত), রাণী ত কিছুই বল্‌ছে না। দেখ্‌ছি, চো'খ ছল ছল কচ্ছে, কিছুই নিশ্চয় কত্তে পাচ্ছে না। আচ্ছা, একবার বলে দেখি। (প্রকাশ্যে), বিবাহ-প্রস্তাব নিয়ে অনেক রাজার দূত এসেছে, তা শুনেছ, রাণী।

দেবী। আমি বাজে কথা শুনতে চাই না। যেখানে দিলে, পরে অনুতাপ কত্তে হবে না, এমন যারগায়ই দাও।

রাজা। এখনই আভাষে দুঃখ প্রকাশ হচ্ছে; কিন্তু পরে যাতে আমায় তিরস্কার শুন্‌তে না হয়, সে জন্য তুমিই সম্বন্ধ স্থির কর;—আমি এইমাত্র বলতে পারি যে, আমাদের সঙ্গে সম্বন্ধ কর্‌বার জন্য মগধ, কাশী, অঙ্গ, সৌরাষ্ট্র, মিথিলা, শূরসেন প্রভৃতি রাজ্য থেকে দূত এসেছে। এদের মধ্যে এক্ এক জনের এক এক গুণে আমাকে প্রলোভিত কচ্ছে;—রাণী কাকে পছন্দ করেন?

কাঞ্চুকীয়ের প্রবেশ।

কাঞ্চু। বৎস-রাজ—

রাজা। কি! বৎস-রাজ!

কাঞ্চু। মহাসেন প্রসন্ন হ'ন—সু-খবর তাড়াতাড়ি বল্‌তে গিয়ে, আগা গোড়া স্থির ক'রে উঠতে পাচ্ছি না।

রাজা। সু-খবর!

দেবী। (উঠিয়া), মহাসেনের জয় হ'ক।

রাজা। (আনন্দে) দেবী যে সু-খবরটা না শুনেই চ'লে যাচ্ছেন্? রাণী, বস।

দেবী। মহাসেনের যেমন আদেশ। (উপবেশন)।

রাজা। দাঁড়ান, দাঁড়ান, শীঘ্র বলুন।

কাঞ্চু। (উঠিয়া), অমাত্য শালঙ্কায়ন বৎস-রাজকে বন্দী করেছেন।

রাজা। (হর্ষে), কি বল্লেন আপনি?

কাঞ্চু। অমাত্য শালঙ্কায়ন বৎস-রাজকে বন্দী করেছেন।

রাজা। উদয়ন!

কাঞ্চু। হাঁ, মহারাজ।

রাজা। শতানীকের পুত্র উদয়ন!

কাঞ্চু। হাঁ, তাই।

রাজা। সহস্রানীকের পৌত্র উদয়ন!

কাঞ্চু। হাঁ, তাঁর কথাই বল্‌ছি।

রাজা। উদয়ন—যিনি কৌশাম্বীর ঈশ্বর!

কাঞ্চু। হাঁ, তিনিই বটেন।

রাজা। যিনি সঙ্গীতবিদ্যায় পটু, সেই উদয়ন।

[illegible]। হাঁ, খবর তাই।

[illegible]। তা হ'লে, নিশ্চয়ই বৎস-রাজ!

[illegible] হাঁ, নিশ্চয়ই বৎস-রাজ।

[illegible] তবে কি যৌগন্ধরায়ণ মারা গেছেন?

[illegible]। না, তিনি কৌশাম্বীতেই আছেন।

রাজা। তা হ'লে বৎস-রাজ কখনও বন্দী হন্ নি।

কাঞ্চু। মহাসেন! আমার কথা বিশ্বাস করুন।

রাজা। হাত দিয়ে মন্দার পর্ব্বত ঢাকা যেমন অসম্ভব, বৎস-রাজ বন্দী হয়েছেন, তোমার এই খবর বিশ্বাস করাও তেমনই অসম্ভব। শত্রুরাও যুদ্ধে যাঁর পরাক্রমের কথা কীর্ত্তন করে, তাঁহার এবং যৌগন্ধরায়ণের বুদ্ধির কথা এখনও আমার কর্ণে ধ্বনিত হচ্ছে।

কাঞ্চু। মহাসেন, প্রসন্ন হ'ন। আমি ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ হ'য়েছি—কখনও মহাসেনের নিকট মিথ্যা বলি নাই।

রাজা। তা ঠিক। শালঙ্কায়নের কাছ থেকে এই খবর নিয়ে কে এসেছে?

কাঞ্চু। কোন লোক আসে নি, খুব দ্রুতগামী রথে চ'ড়ে, বৎস-রাজকে সঙ্গে নিয়ে শালঙ্কায়ন নিজেই এসেছেন।

রাজা। শালঙ্কায়নই এসেছেন! তা হ'লে, আজ সৈন্যগণ যুদ্ধসজ্জা ত্যাগ করে বিশ্রাম কত্তে পারবে। আজ থেকে গুপ্তচরের ভয় হ'তে রাজগণ বিমুক্ত হ'লেন! তা হ'লে এখন সকল সমতা হ'ল। আজ আমি যথার্থই মহাসেন!

দেবী। কি! অমাত্য নিজেই নিয়ে এসেছেন!

রাজা। হাঁ, অমাত্যই এনেছেন।

দেবী। এই জন্যই এত দিন বাসবদত্তাকে অন্য কারুর হাতে দিতে ইচ্ছা করি নি।

রাজা। এখন তিনি আমার যুদ্ধে জিত শত্রু। বাদ-রায়ণ, শালঙ্কায়ন এখন কোথায়?

কাঞ্চু। সিংহদ্বারে আছেন।

রাজা। যাও, তুমি ভরতরোহককে গিয়ে বল, বৎস-রাজকে আগে রেখে, রাজার মত সম্মান ক'রে, মন্ত্রী শালঙ্কায়ন যাতে নগরে প্রবেশ করেন, তিনি তার বন্দোবস্ত করুন।

কাঞ্চু। যে আজ্ঞা, মহাসেন।

রাজা। আচ্ছা, তা হ'লে আপনি যান।

কাঞ্চু। এই আমি যাচ্ছি।

রাজা। বৎস-রাজকে দেখ্‌তে চাইলে যেন কাউকে নিষেধ করা না হয়।

পূর্ব্বে যাঁর কেবল কার্য্যের কথাই পুরবাসিগণ শুনেছে, এখন তারা তাঁকে সাক্ষাৎ দেখুক। এখন বৎস-রাজের অবস্থা, যজ্ঞের নিমিত্ত বদ্ধ প্রচ্ছন্ন-রোষ সিংহের ন্যায়।

কাঞ্চু। যে আজ্ঞা, মহাসেন। [প্রস্থান।

দেবী। এই রাজবংশে অনেক উৎসবই দেখেছি—কিন্তু মহাসেনকে আজ যে রকম আহ্লাদিত বোধ হচ্ছে, পূর্ব্বে আর কখনও সে রকম বোধ হয় নি।

রাজা। দেবি, আজ বৎস-রাজ বন্দী হয়েছেন শুনে যেমন আনন্দ হয়েছে, এমন আনন্দের অনুষ্ঠানের কথা আমি পূর্ব্বে

কখনও শুনেছি বলেও মনে হচ্ছে না। বৎস-রাজ আজ বন্দী, —কি আনন্দ! কি আনন্দ!

দেবী। নিশ্চিতই কি বৎস-রাজ!

রাজা। হাঁ, বৎস—রাজই বটে।

দেবী। শুন্‌লুম যে, বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে অনেক রাজ্য থেকেই দূত এসেছে, কিন্তু বৎস-রাজ কোনও দূত পাঠান নি?

রাজা। দেবি, যে মহাসেনের নামই শুন্‌তে পারে না, সে আবার সম্বন্ধ কর্‌বে?

দেবী। কি! মহাসেনের নামই শুন্‌তে পারে না? তবে কি বৎস-রাজ বালক, না মূর্খ?

রাজা। বালকই বটে, মূর্খ নয়।

দেবী। তার এত অহঙ্কার কিসে?

রাজা। অহঙ্কারের অনেক কারণ আছে। যে বংশে বেদ-পারগ বহু রাজর্ষি জন্মগ্রহণ করেছেন, সেই ভারত বংশে ইঁহার জন্ম; বংশ-পরম্পরাগত সঙ্গীত-বিদ্যায় ইনি পারদর্শী; নবীন বয়সের অনুরূপ তাঁর রূপ; আরও কারণ আছে, যাতে পুরবাসিগণ সকলেই তাঁর প্রতি একান্ত অনুরক্ত।

দেবী। বাসবদত্তার বরের এমন গুণই-চাই বটে। আচ্ছা, তবে কার প্রতিকূলতায় তাঁর এই বিপদ ঘট্‌ল?

রাজা। তুমি কি তাঁর এই দুরবস্থা দেখে বিস্মিত হচ্ছ? বিস্মিত হওয়ার কোনই কারণ নাই।

তৃণখণ্ডে নিক্ষিপ্ত অগ্নি-কণা প্রদীপ্ত হ'য়ে, সমগ্র পৃথিবী দগ্ধ কত্তে পারে বটে, কিন্তু উদয়নের দীপ্ত শাসনও আমার রাজ্য-সীমায় অবসন্ন হ'য়ে পড়ে।

কাঞ্চুকীয়ের প্রবেশ।

কাঞ্চু। মহাসেনের জয় হ'ক। মহারাজের নির্দ্দেশমত সৎকার ক'রে শালঙ্কায়নকে নগরে আনা হয়েছে। তিনি নিবেদন করেছেন, ভরত-বংশীয়গণের ব্যবহৃত এই ঘোষবতী বীণা বহুকাল বৎস-রাজকুলের অধিকারে ছিল। ইহা এখন আপনার হস্তে এসেছে—গ্রহণ করুন।

(বীণা-প্রদর্শন)

রাজা। হাঁ, এই বিজয়-মঙ্গল অবশ্যই গ্রহণ কত্তে হবে। (বীণা-গ্রহণ) কি! এই বীণার নামই ঘোষবতী?

অঙ্গুলির অগ্রভাগের ঘর্ষণে যার তার থেকে শ্রুতি-মধুর স্বর-লহরী উৎপন্ন হয়, যে বীণা স্বভাব-রক্তা, যার মধুর রবে ঋষি-মুখ-নিঃসৃত মন্ত্র—শক্তির ন্যায়, গজ-হৃদয় বশীভূত হয়, এই সেই বীণা ঘোষবতী!

আহা! যুদ্ধ-জয়ের ফলে লব্ধ রত্ন যদি নিজ পরিবারের কোনও লোক উপভোগ কত্তে পারে, তবে বড়ই আনন্দের বিষয় হয়; কিন্তু আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র গোপালক অর্থশাস্ত্রেই একান্ত অনুরক্ত; কনিষ্ঠ অনুপালক শুধু ব্যায়াম কত্তেই ভালবাসে, এবং সঙ্গীতশাস্ত্রের প্রতি তার বড়ই বিদ্বেষ; সুতরাং কাকে দিলে যে এই ঘোষবতী সুপাত্রে ন্যস্ত হবে, তা বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। দেবি, তুমি না বল্‌ছিলে, বাসবদত্তা বীণা শিখ্‌তে আরম্ভ করেছে?

দেবী। হাঁ, বল্‌ছিলাম বটে।

রাজা। তা হ'লে, এই বীণা বাসবদত্তাকেই দাও।

দেবী। এই বীণা পেলে সে বীণার পাছে পাগল হ'য়ে যাবে।

রাজা। করুক না পাগলামি; শ্বশুরের ঘরে ত আর পাগলামি কত্তে পাবে না। বাদরায়ণ, উদয়ন কোথায়?

কাঞ্চু। অমাত্যের সঙ্গে নগরে প্রবেশ করেছেন।

রাজা। বৎস-রাজ শালঙ্কায়নের তত্ত্বাবধানেই আছেন?

কাঞ্চু। উদয়ন সমান ভাবে যুদ্ধ করেছিলেন, তাই পায়ে ও শরীরে শর-প্রহারে জর্জ্জরিত হয়েছেন; সুতরাং শয্যায় শুইয়ে, কাঁধে করে তাঁকে গৃহমধ্যে নেওয়া হয়েছে।

রাজা। ছি! ছি! তাঁকে এত প্রহার করা হয়েছে? প্রকৃত তেজ বাধা পেলে এইরূপই ঘটে। এ সময়ে উপেক্ষা কর্‌লে নৃশংসের আচরণ হয়। বাদরায়ণ, ভরত-রোহককে উদয়নের ব্রণ-চিকিৎসার বন্দোবস্ত কত্তে আদেশ দাও।

কাঞ্চু। মহাসেনের যেরূপ আজ্ঞা।

রাজা। আচ্ছা, তুমি যাও।

কাঞ্চু। এই যাচ্ছি।

রাজা। তুমি দেখ্‌বে, যেন উদয়নের প্রতি সৎকারের

বিন্দুমাত্রও ত্রুটি না হয়। তাঁর শরীরের ভাব থেকেই বুঝ্‌তে পারবে, তাঁর প্রীতি হ'ল কি না। গত যুদ্ধের কোন কথাই তুল্‌বে না। তিনি যদি হাঁচি দেন, তবে আশীর্ব্বাদ-বাক্য উচ্চারণ ক'রো। আর, সময়ানুরূপ স্তুতি ক'রে, তাঁকে সম্মান কোত্তেও ভুলে যেয়ো না।

কাঞ্চু। মহাসেনের আদেশ শিরোধার্য্য। (প্রস্থান ও পুনঃ-প্রবেশ) মহাসেনের জয় হ'ক। উজ্জয়িনীর পথেই বৎস-রাজের ব্রণের চিকিৎসা হ'য়েছে। দ্বিতীয়বার চিকিৎসা করার এখন সময় নয়। এই যে দুপুর হ'ল।

রাজা। যিনি নিজকে বীর মনে করেন, সেই উদয়ন এখন কোথায়?

কাঞ্চু। তিনি এখন ময়ূর-যষ্টি-মুখে আছেন।

রাজা। ছি! ছি! সেখানে কি এ সময়ে থাকা যায়? তাঁকে শাগ্‌গির মণিভূমিতে নিয়ে আস্‌তে বল। সেখানে গরম লাগ্‌বে না।

কাঞ্চু। যে আজ্ঞা, মহাসেন। (প্রস্থান ও পুনঃ-প্রবেশ) মহাসেনের সমস্ত আদেশই পালন করা হ'য়েছে। অমাত্য ভরত-রোহক মহাসেনের সঙ্গে দেখা কত্তে চাচ্ছেন।

রাজা। বুঝেছি, বৎস-রাজের সৎকারটা তাঁর পক্ষে ভাল লাগ্‌ছে না। এটা তাঁর নীতি-বিরুদ্ধ। আচ্ছা, আমিই তাঁকে এক বার অনুনয় ক'রে দেখি।

দেবী। কি, সম্বন্ধ স্থির হ'ল?

রাজা। না, এখনও হয় নি।

দেবী। এত তাড়াতাড়ি ক'রে দরকার কি? বাসবদত্তা এখনও বালিকা বৈ ত নয়!

রাজা। রাণীর যেমন ইচ্ছা। আচ্ছা, রাণী, তবে এখন তুমি অন্তঃপুরে যেতে পার।

দেবী। মহাসেনের যেমন আদেশ।

[পরিজনসহ দেবীর প্রস্থান।

রাজা। (চিন্তা করিয়া),

পূর্ব্বেও তাঁর সঙ্গে শত্রুতা ছিল; অহঙ্কারের ফলে তাঁকে ধ'রে আনায়, তিনি এখন আমার বধ্য হ'য়েছেন। কিন্তু তিনি এখন যুদ্ধ-ক্লিষ্ট, বিপন্ন ও সংশয়ারূঢ়। এ সব বিষয় চিন্তা ক'রে, আমিও কর্ত্তব্য বিষয়ে সংশয়ান্বিত হচ্ছি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

শরতের গান

শারদ উষার রঙ্গিল আলো
লেগেছে, আমার লেগেছে,
নয়নে লেগেছে;
মধুপ আজি গুঞ্জি গুঞ্জি,
কমল-মধু মেগেছে,
ওগো মেগেছে।

কে আজ, আকাশ-ভরা হাওয়ার মাঝে
করুণ সুরে প্রণয় যাচে!
দৈন্য যত, জড়িমা যত,
কেমন করে ভেঙ্গেছে,
ওগো ভেঙ্গেছে!

আজি, গাছের শাখে, পাখীর নীড়ে
শুনি কাহার গান?
আজি, নীলের মাঝে মিনতি ভরা
এ কা'র দু'নয়ান?

আজি, শিউলি-তলা ধবল ক'রে,
আঁচল পেতে কে অই ভোরে,
লতার বাহু লতিয়ে ডাকে,
ওরে আমার প্রাণ?

কাজল জলের উজল ঢেউ যে
হৃদয়ে তোর লেগেছে!
মধুপ আজি গুঞ্জি গুঞ্জি
কমল মধু মেগেছে!

ও গো মধুপ, ও গো বঁধু,
পরাণে মোর যা কিছু মধু,
লও গো চুষে, লও সকলি,—
প্রণয়ে প্রাণ জেগেছে,
আজি জেগেছে !

এত দিন পরে চেয়েছ বঁধুরে,
প্রেমের নেশা যে লেগেছে,—
ও গো, হৃদয়ে আমার
লেগেছে।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার শর্ম্মা।

সোসিয়ালিজ্‌ম্

১৮৩৩ খৃঃ অব্দে "The Poor Man's Guardian" নামক সংবাদপত্রে "সোসিয়ালিজ্‌ম্" (Socialism) শব্দের সর্ব্বপ্রথম ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার দুই বৎসর পরে সুপ্রসিদ্ধ রবার্ট ওয়েন্ (Robert Owen) "সর্ব্বজাতি-বর্ণ-সমবায়-সমিতি"(The Association of all Classes of all Nations) নামে একটী সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। এতদুপলক্ষে সমগ্র ইংলণ্ডে একটী বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হয়, এবং সেই সূত্রে "সোসিয়ালিজ্‌ম্", "সোসিয়ালিষ্ট" প্রভৃতি শব্দ ইংরাজী সাহিত্যে ও ইংরাজ জন-সাধারণের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইহার কিছুদিন পরে সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী গ্রন্থকার রেবোঁ (Reybaud) তৎ-প্রণীত "নব্য-সংস্কারক-সম্প্রদায়" (Reformateurs modernes) নামক গ্রন্থে রবার্ট ওয়েন্, সাঁ-সিমোঁ (Saint Simon), ফুরিয়ে (Fourier) প্রভৃতির আলোচনা প্রসঙ্গে এই শব্দটীর বহুল ব্যবহার করেন, এবং তাহার পর হইতেই 'সোসিয়ালিজ্‌ম্' ও তদর্থক অন্যান্য শব্দ ক্রমে ক্রমে সমস্ত পৃথিবীতে প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে।

শব্দ-শাস্ত্রের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, কোনও শব্দের প্রথম ব্যবহারের পর দীর্ঘকাল যাবৎ নিয়তই উহার অর্থগত পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। "সোসিয়ালিজ্‌ম্" ও তদর্থক শব্দ-সমূহের অদৃষ্টেও তাহাই ঘটিয়াছে। সোসিয়ালিজ্‌মের প্রথম প্রবর্ত্তক পূর্ব্বোক্ত ওয়েন্ প্রভৃতি এগুলি যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছিলেন, এক্ষণে তদপেক্ষা অনেক ব্যাপকতর অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যতই নূতন দেশ ও নূতন প্রতিবেশের সংস্পর্শে আসিতেছে, সোসিয়ালিজমের আকৃতি ও প্রকৃতিরও ততই পরিবর্ত্তন হইতেছে; সুতরাং অর্থেরও বিভিন্নতা ঘটিতেছে। এই জন্য পণ্ডিতদের মধ্যে ইহার সংজ্ঞা সম্বন্ধে যথেষ্ট মতানৈক্য দেখা যায়। বিখ্যাত জার্ম্মাণ পণ্ডিত রশারের (Roscher) মতে "সোসিয়ালিজ্‌ম্, জনসাধারণের হিত-সাধনের জন্য মানব-হৃদয়ের কতকগুলি অতি-মানবীয় ভাবের সমষ্টি মাত্র।" য়্যাডল্‌ফ্ হেল্‌ড্ (Adolf Held) বলেন যে, মানব-হৃদয়ের যে সকল ভাব আমাদের ব্যক্তিগত কার্য্য-প্রবৃত্তিকে সমাজ-শাসনের অধীনে আনিতে চেষ্টা করে, প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহাই "সোসিয়ালিষ্টিক" পদবাচ্য। ফরাসী পণ্ডিত জ্যানে (Janet) ইহার অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, আধুনিক মনুষ্য-সমাজে যথেষ্ট ধন-গত বৈষম্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ধনী-লোকদিগের নিকট হইতে তাহাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত ধন গ্রহণ-পূর্ব্বক সমাজের অপেক্ষাকৃত নির্ধন শ্রেণীর মধ্যে উহার যথাযথ বণ্টন করিয়া দিয়া, চিরকালের জন্য এই ধনগত সামাজিক বৈষম্যের দূরীকরণের জন্য 'সোসিয়ালিজ্‌ম্' বা সমাজ-সমবায়-তন্ত্র গবর্ণমেণ্টকে প্রণোদিত করিয়া থাকে। ল্যাভেলে (Lave-leye)ও অনেকটা এইরূপ সংজ্ঞাই প্রদান করিয়াছেন। ভন্ শীল্ (Von Scheel) ইহাকে দুঃখ-দারিদ্র-ক্লিষ্ট জন-সাধারণের অর্থনৈতিক দর্শন-বাদ (Economic philosophy of the suffering classes) রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ইউরোপীয় সমাজে সোসিয়ালিজ্‌ম্ অতি অল্প দিন মাত্র আবির্ভূত হইয়াছে। ইহা এখনও কোনও নির্দিষ্ট স্থায়ী

আকার গ্রহণ করিতে পারে নাই। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে নিয়তই ইহার পরিবর্ত্তন হইতেছে। সুতরাং ইহার স্বরূপ-সম্বন্ধে এরূপ মতভেদ হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক। এমন কি, সোসিয়ালিষ্ট-নেতৃবৃন্দের মধ্যেও ইহার উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি সম্বন্ধে নানারূপ মতানৈক্য দেখা যায়। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর আর্থিক অবস্থার সমন্বয়-সাধনই যে ইহার মূল উদ্দেশ্য, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। ধনী ও জমীদারদের হস্ত হইতে অতিরিক্ত ধন ও জমী লইয়া সর্ব্বসাধারণের মধ্যে তাহা ভাগ করিয়া দিতে হইবে, এ বিষয়েও কোনও মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু কি প্রণালীতে এই ভাগ করিতে হইবে, ভবিষ্যৎ সমাজের আকৃতি ও আদর্শ কিরূপ হইবে, কেন্দ্র-নিয়ন্ত্রিত শাসনবিধির কোনও আবশ্যকতা আছে কি না, এবং থাকিলে, ভবিষ্যৎ সমাজের সহিত উহার কিরূপ সম্বন্ধ বিহিত করিতে হইবে, ইত্যাদি বিষয়ে কোনও দুই জনের এক মত দেখা যায় না। সাঁ-সিমোঁ বলেন যে, ব্যক্তিগত যোগ্যতারূপ ভিত্তির উপরেই ভবিষ্যৎ সমাজ-সৌধের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, এবং সেই সমাজে স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই সম্পূর্ণ সমান অধিকার ও স্বাধীনতা থাকিবে। ফুরিয়ে বলিতেন যে, চারি শত পরিবার বা মোট আঠার শত লোক লইয়া এক একটী সঙ্ঘ (Phalange) গঠিত করিতে হইবে। এই সঙ্ঘে মানুষের ব্যবহারোপযোগী সকল প্রকার জিনিসই তৈয়ারী হইবে। সমগ্র সঙ্ঘের আয় একটী সাধারণ তহবিলে আসিবে। সঙ্ঘান্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই তহবিল হইতে আহার গ্রাসাচ্ছাদনোপযোগী অর্থ-সাহায্য করিতে হইবে। আয়ের অবশিষ্টাংশ শ্রম (labour), মূলধন (capital), ও পারদর্শিতা (talent) অনুসারে যথাক্রমে $\frac{5}{12}$, $\frac{4}{12}$ এবং $\frac{3}{12}$ অংশে ভাগ করিয়া দিতে হইবে। লুই ব্লাঁর (Louis Blanc) কল্পিত সমাজের ব্যক্তিমাত্রই লাভের সমান অংশ পাইবার অধিকারী। জার্ম্মাণির সোসিয়াল ডিমক্র্যাটেরা (Social Democrat) বলে যে, সাধারণ তহবিল হইতে সকলকেই প্রত্যেকের অভাবানুরূপ অর্থ-সাহায্য করা উচিত। আন্তর্জাতিক শ্রমজীবি-সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়া বর্ত্তমান রাষ্ট্র-তন্ত্র-মাত্রেরই উচ্ছেদ সাধন করা কার্‌ল্‌ মার্ক্স (Karl Marx) প্রভৃতির অভিপ্রায়।

সোসিয়ালিষ্টদের নিজেদের মধ্যেই যখন এত মতান্তর, তখন বাহিরের লোকের মনে যে তাহাদের ক্রিয়াকলাপ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নানারূপ ভ্রান্ত ধারণা জন্মিবে, তাহাতে কিছুমাত্র আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কারণ নাই। কেহ কেহ সোসিয়ালিজ্‌মকে "বিপ্লব-বাদ" বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। অবশ্য দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে দু চারি জন উষ্ণ-শোণিত যুবক যে ন্যায়ের সীমা উল্লঙ্ঘন করে নাই, ইহা বলা যায় না। কিন্তু দুই এক জনের উচ্ছৃঙ্খলতার অপরাধে পৃথিবীব্যাপী একটী বিরাট আন্দোলনকে অন্য প্রমাণের অভাবে দোষী সাব্যস্ত করা কতদূর ন্যায়ানুমোদিত তাহাও বিবেচ্য। অপিচ, কোনও নূতন মত-বাদ প্রচারের প্রথমাবস্থায় প্রায়ই এইরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা দেখিতে পাওয়া যায়। বিনা রক্তপাতে ইউরোপে ধর্ম্ম-সংস্কার (Reformation) সাধিত হয় নাই। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলবাসী শতসহস্র নিরীহ লোকের রক্তপাতের ফলস্বরূপই আজ নিগ্রোজাতি দাসত্ব হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে। আধুনিক উদারনৈতিক মত-বাদও (Liberalism) এককালে ইংলণ্ডের রাজপুরুষগণ কর্ত্তৃক বিপ্লব-বাদরূপে পরিগণিত হইত।

তবে, সোসিয়ালিষ্টগণ তাহাদের মতবাদের অনুকূলে যে সমস্ত কথা বলে, তাহা সমস্তই কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে, এতদ্দ্বারা যে একটা বিষম রক্তপাতহীন বিপ্লবের সংঘটন হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ইঁহারা বলেন যে, শতসহস্র বৎসরের নিতান্ত একদেশদর্শী সভ্যতার ফলে সমাজে অত্যাচার ও অবিচারের মাত্রা নিতান্ত অসহনীয়রূপে বাড়িয়া গিয়াছে। দেশের যাবতীয় ধন ও জমী সমস্তই এক শ্রেণীর লোকের হস্তগত হইয়াছে। ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, মূলধনের অধিস্বামী ও জমীদারবৃন্দ সংখ্যায় নিতান্ত নগণ্য হইলেও, অসংখ্য নিরন্ন জনসাধারণকে আপনাদের স্বার্থসাধনের অভিপ্রায়ে ক্রীতদাসের মত খাটাইয়া লইতেছে। এই নিরন্ন মুটেমজুরসম্প্রদায়ই প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া যাবতীয় লাভজনক দ্রব্য উৎপন্ন করিতেছে,—কিন্তু সম্পূর্ণ লাভ গ্রহণ করিতেছেন

জমীদার ও মূলধনী সম্প্রদায়। সোসিয়ালিষ্টগণ বলেন যে, ভবিষ্যৎ মানবজাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করিতে হইলে, এই সাম্প্রদায়িক বিভাগের—এই অর্থমূলক বৈষম্যের দূরীকরণ অবশ্য কর্ত্তব্য। আধুনিক "মূলধন-মজুরী"-প্রথার ফলে মজুর-সম্প্রদায় যে শুধু পেটে না খাইয়া মরিতেছে, তাহা নহে; পরন্তু, সর্ব্বপ্রকারে তাহাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাধীনতার বিলোপ হওয়াতে, তাহাদের ও তাহাদের পরিবারবর্গের নৈতিক চরিত্রেরও চরম দুর্গতি হইতেছে। পক্ষান্তরে,মূলধনী ও জমীদারসম্প্রদায় ও তাহাদের উপজীবিবর্গ এইরূপে অনায়াসে পরের পরিশ্রমে আশাতিরিক্তভাবে লাভবান্ হওয়াতে, তাহাদের মধ্যে অলসতা ও বিলাসিতা উত্তরোত্তর হুবহু বাড়িয়া চলিতেছে—তাহারা আপনাদিগকে অবাধে পাপের স্রোতে ভাসাইয়া দিতেছে। শুধু ব্যক্তিগত লাভাধিক্যের প্রতিই দৃষ্টি থাকাতে, উৎপন্ন দ্রব্যের শিল্প-সৌন্দর্য্য ক্রমেই বিনাশপ্রাপ্ত হইতেছে। মুষ্টিমেয় ধনী-সম্প্রদায় এক দিকে যেমন কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ না করিয়া,যাবতীয় জিনিসেরই বৃথা অপব্যয় করিতেছে,অপর দিকে অসংখ্য মুটে-মজুরসম্প্রদায় সর্ব্বদা দুঃখ, দৈন্য, ও নৈরাশ্যের অসহনীয় পীড়নে প্রপীড়িত হইতে থাকাতে, তাহাদের মনুষ্যত্ব ক্রমেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে। সমগ্র সমাজ যেন পরস্পর-ধ্বংসকামী দুইটী শত্রুশিবিরে পরিণত হইয়াছে। সোসিয়ালিষ্টগণ বলেন যে, এই কৃত্রিম বৈষম্যের দূরীকরণ করিয়া সমাজে পুনরায় সাম্য,মৈত্রী,ও স্বাধীনতার আদর্শ প্রতিষ্ঠাপিত করিতে হইবে—সম্প্রদায়-বিশেষের হস্ত হইতে যাবতীয় ধন ও জমী লইয়া সমাজের সকল স্তরের সকল লোকের মধ্যে উহার যথাযথ বণ্টন করিয়া দিতে হইবে।

অনেকে সোসিয়ালিজ্‌ম্‌কে বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার দুরারোগ্য ব্যাধিরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বাস্তবিক ইহাকে ব্যাধি বলা যাইতে পারে কিনা, তাহা বিশেষ বিবেচ্য। বিগত দ্বিসহস্র বৎসরের ইউরোপীয় সভ্যতার ক্রম-বিকাশের ইতিহাস অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ইউরোপীয় সভ্যতা এতদিন যাবৎ যে পথে চলিয়া আসিয়াছে, ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সোসিয়ালিজ্‌ম্ উহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি মাত্র। প্রাচীন গ্রীক, রোমক, ও মধ্য-যুগীয় সভ্যতার মধ্যেই ইহার বীজ প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত ছিল এবং সময়ে সময়ে আংশিকভাবে আত্মপ্রকাশও করিয়াছিল। কিন্তু অনুকূল দেশ,কাল ও পরিবেশের অভাবে উহা বর্ত্তমান সময়ের মত বিশালাবয়ব ধারণ করতঃ জনসমাজের সবিস্ময় দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। সমগ্র ইউরোপীয় সভ্যতার আনুপূর্ব্বিক আলোচনা এ স্থলে সম্ভবপর নহে,—আলোচ্য বিষয়ের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়ও নহে। কেবলমাত্র অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয়, বিশেষতঃ ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের, সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেই, সোসিয়ালিজ্‌মের স্বরূপ-তত্ত্ব স্পষ্টরূপে আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইবে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই যে,সামন্ত-প্রথা (Feudalism)ও নফর-প্রথা(Serfdom) দেশ হইতে মুখ্যভাবে বিদূরিত হইয়াছে বটে, কিন্তু রাজ-শক্তি কতিপয় শক্তিশালী পরিবার ও ব্যক্তিবিশেষ কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও খর্ব্বীকৃত হইয়া রহিয়াছে। ইংলণ্ড-রাজ তৃতীয় জর্জ(George III ১৭৬০—১৮২০) অনিয়ন্ত্রিত রাজ-তন্ত্রের পুনঃ-প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নানাকারণেই তাঁহার সে চেষ্টা সম্পূর্ণ বিফলই হইয়াছিল। ফরাসীজাতির সাম্রাজ্য-স্থাপনাকাঙ্ক্ষার মূলোচ্ছেদপূর্ব্বক ইংরাজজাতি পূর্ব্বে ও পশ্চিমে, ভারতবর্ষে ও ক্যানেডায়, বিস্তৃত অধিকার স্থাপন করিয়াছে। ইংলণ্ডের বাণিজ্যতরী পৃথিবীর সর্ব্বত্র হইতে ধনসম্পদ আহরণপূর্ব্বক জননী জন্মভূমির চরণপ্রান্তে কনকাঞ্জলি প্রদান করিতেছে—জলে স্থলে ইংরাজজাতি অপরাজেয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাণিজ্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই ইংলণ্ডের শিল্প-সমৃদ্ধিও অভাবনীয় উন্নতির পথে পদার্পণ করিয়াছে। নানাবিধ দৈব ঘটনাও শিল্পোন্নতি-কল্পে ইংলণ্ডের আনুকূল্য করিতেছে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ফ্ল্যান্ডার্স (আধুনিক বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ড) ও ফ্রান্সই শিল্প-বিষয়ে সমগ্র ইউরোপের শীর্ষস্থানীয় ছিল। কিন্তু রোমান্ ক্যাথলিক মতাবলম্বী ফ্রান্স ও স্পেনের নৃপতিবর্গের অভাবনীয় অত্যা-

চারের ফলে এই সমস্ত দেশের শিল্পিবৃন্দ চিরকালের জন্য দেশ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ইংলণ্ডের স্নেহময় ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কায়মনোবাক্যে পালিকা মাতার সর্ব্বপ্রকার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। ইহাদের সাহায্যে ও বৈদেশিক অধিকার ও বাণিজ্যের প্রভাবে শিল্প ও বাণিজ্য-জগতে ইংলণ্ড অচিরেই পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইল।

খৃষ্টীয় ১৭৬০ হইতে ১৮২০ সাল পর্য্যন্ত সময় ইংলণ্ডের ইতিহাসে শিল্প-বিপ্লবের যুগ (The Age of Industrial Revolution) নামে অভিহিত হইয়াছে বাস্তবিক, ইহা কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে। ইহার পূর্ব্বে ইংলণ্ডে ও সমগ্র পৃথিবীতে কুটীর-শিল্প ও হস্ত-শিল্পেরই প্রাধান্য ছিল; কিন্তু নিত্য নূতন কল-কারখানার প্রবল স্রোতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সমস্তই ভাসিয়া যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের সহিত উনবিংশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের তুলনা করিলে, আমরা এই শিল্প-বিপ্লবের প্রকৃত গুরুত্ব ও বহু-ব্যাপকত্ব সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। এই শিল্প-বিপ্লবের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা পাথুরিয়া কয়লা দ্বারা লৌহ-পরিষ্কারের উপায় উদ্ভাবন, ও বাষ্প-শক্তির আবিষ্কার। প্রথমটী দ্বারা নিত্য নূতন লৌহ-নির্ম্মিত কল-কারখানা প্রস্তুতের উপায় সহজ ও অল্পব্যয়সাধ্য হইল। হস্ত-শিল্প ও কুটীর-শিল্পের আমলে শিল্পীর ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতা অপ্রতিহত ছিল। কিন্তু বাষ্প-শক্তির আবিষ্কার দ্বারা শিল্পি-সম্প্রদায় ও মুটে-মজুরগণ সম্পূর্ণভাবে কলের অধীন হইয়া পড়িল।

শিল্প-জগতের এই বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে ও উহার অবশ্যম্ভাবী ফল-স্বরূপে ইংরাজ জনসাধারণের দৈনন্দিন রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনেও যুগান্তর উপস্থিত হইল। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংলণ্ডের রাজ-শক্তি কতিপয় প্রতাপশালী পরিবার ও ব্যক্তি কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত ছিল। তাঁহারাই সর্ব্ব বিষয়ে দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্প ও বাণিজ্যোন্নতির ফলে নূতন ধনী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া দাঁড়াইল এবং নিজেদের উন্নতির ভিত্তি দৃঢ়রূপে প্রোথিত করিবার জন্য রাজনৈতিক অধিকার লাভে সচেষ্ট হইল। এই সময় হইতে ১৮৩২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের ইতিহাস এই নূতন ও পুরাতন সম্প্রদায়-দ্বয়ের শক্তি-পরীক্ষার ইতিহাস।

এদিকে নূতন নূতন কল-কারখানার প্রচলন হওয়াতে, জন-সাধারণের সামাজিক জীবনেও অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। হস্ত-শিল্প ও কুটীর-শিল্পের ধ্বংসের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। পূর্ব্বতন প্রণালীতে জীবিকার্জ্জনে অসমর্থ হইয়া, ইহারা দলে দলে কল-কারখানাতে মজুর-বৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইল। একস্থানে এইরূপে বহু-সংখ্যক লোকের সমাবেশ হওয়াতে ইংলণ্ডে নিত্য নূতন সহরের সৃষ্টি হইতে লাগিল। কল-কারখানার মালিকেরা ক্ষুধার তাড়নে তাড়িত, উপায়হীন মজুর-সম্প্রদায়কে আপনাদের করকবলিত দেখিয়া, সর্ব্বপ্রকার দয়াদাক্ষিণ্য ও মনুষ্যত্বে বিসর্জ্জন দিয়া, কেবল আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির ও অর্থাগমের যন্ত্রস্বরূপ উহাদিগকে যথেচ্ছভাবে কার্য্যে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহাদের স্বপ্নাতীত অর্থলাভ হইতে লাগিল বটে, কিন্তু শ্রমজীবি-সম্প্রদায় ও তাহাদের পরিবার-বর্গের দুঃখ-দুর্দ্দশার সীমা রহিল না।

শ্রম-শিল্প-বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের অন্য দিকেও আর একটী বিপ্লবের আয়োজন অনুষ্ঠান চলিতেছিল। ইতিহাসে ইহা কৃষি-বিপ্লব (Agricultural Revolution) নামে অভিহিত হইয়াছে।

ইংলণ্ডে সামন্ত-প্রথার তিরোধানের পর কৃষি-যোগ্য জমিগুলি খণ্ডশঃ বিভক্ত হইয়া নানাপ্রকারে জনসাধারণের হস্তগত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংরাজ কৃষকদের অবস্থা প্রায় আমাদের দেশের কৃষকের বর্ত্তমান অবস্থার ন্যায় ছিল। প্রত্যেকের জোত অনেকগুলি খণ্ডে বিভক্ত ও বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ছিল। আমাদের দেশের কৃষকগণ যেমন মামুলীপ্রথা অনুসারে চাষ আবাদ করে, তাহারাও তখন সেইরূপই করিত। জমীর উর্ব্বরতা-শক্তির বৃদ্ধি প্রভৃতির প্রতি কাহারও তাদৃশ আগ্রহ পরিলক্ষিত

হইত না, এবং ইচ্ছা থাকিলেও, ছোট ছোট জোতদারের পক্ষে আবশ্যকানুরূপ অর্থ ব্যয় করা অনেক সময়েই সম্ভবপর ছিল না। আবার, জোতগুলি খণ্ডশঃ বিভক্ত ও পরস্পর দূরবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত থাকাতে, উহাদের সম্যক তত্ত্বাবধানের জন্য বহু সময় বৃথা অতিবাহিত হইত। কেবল কৃষিকার্য্যের আয় হইতে অনেক পরিবারেরই যাবতীয় অভাবের পূরণ হইয়া উঠিত না। এইজন্য অবসর সময়ে কৃষকদের নিজের ও তাহাদের পরিবারবর্গের নানাবিধ হস্ত-শিল্পদ্বারা যথেষ্ট উপার্জ্জন করিতে হইত। কিন্তু কলকারখানার বহুল প্রচলন-হেতু হস্ত-শিল্প ও কুটীর-শিল্পের বিনাশ সাধিত হওয়াতে, উহাদের আর্থিক অবস্থার আরও অবনতি হইয়া গেল। সুতরাং উহাদের দ্বারা কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধনের আশা একেবারে তিরোহিত হইল। এদিকে দিন দিনই অধিকসংখ্যক লোক সহরের কলকারখানা প্রভৃতিতে কার্য্যে নিযুক্ত হওয়াতে, একদিকে যেমন কৃষকদের সংখ্যা হ্রাস হইতে লাগিল, অপর দিকে খাদ্যাদির জন্য অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক লোককে অল্প-সংখ্যক কৃষকের পরিশ্রমের উপর নির্ভর করিতে হইল। ফলে, খাদ্যসামগ্রীর দাম অতিমাত্রায় বাড়িয়া গেল। বিদেশী দ্রব্যের উপর অতিরিক্ত হারে শুল্ক ধার্য্য থাকাতে বিদেশ হইতে আবশ্যকানুরূপ আমদানীও হইত না। তখনও অবাধ বাণিজ্যের (Free Trade) কথা ইংরাজ রাজপুরুষগণ কল্পনাও করিতে পারেন নাই। সুতরাং বৈদেশিক আমদানী দ্রব্যের উপর নির্দ্ধারিত শুল্কের হার না কমাইয়া, যাহাতে দেশের কৃষিকার্য্যেরই যথাসম্ভব উন্নতি করা যাইতে পারে, তজ্জন্য রাজপুরুষগণ নানাবিধ উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ডে যে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইত, তাহাতে ইংরাজদের আদৌ কুলান হইত না। উপায়নির্দ্ধারণের জন্য কৃষি-বোর্ডের সম্পাদক আর্থার ইয়ং সাহেব ১৭৯৪ সালে সমস্ত ইংলণ্ড পরিভ্রমণ করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে,কৃষির উন্নতি করিতে হইলে, ছোট ছোট কৃষকসম্প্রদায়ের পরিবর্ত্তে বড় বড় অর্থশালী জোতদারের এবং খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোতের পরিবর্ত্তে এক লপ্তে বৃহৎ বৃহৎ জোতের সৃষ্টি করিতে হইবে। ইয়ং সাহেবের প্রস্তাব শীঘ্রই আইনে পরিণত হইল। উহার ফল এই দাঁড়াইল যে, দেশের অর্থশালী জমীদার ও ব্যবসায়ীগণ কৃষকদের জমি কিনিয়া লইতে লাগিলেন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই কার্য্য অবিরাম গতিতে চলিল। হস্ত-শিল্পের বিনাশ হেতু কৃষকগণের অবস্থা পূর্ব্বেই সাতিশয় শোচনীয় হইয়াছিল। এক্ষণে জমি হইতে উচ্ছেদ হওয়াতে, উহারা নিরাশ্রয়ভাবে পেটের দায়ে দলে দলে সহরের কলকারখানায় আশ্রয়প্রার্থী হইতে বাধ্য হইল। সংখ্যাতিরিক্ত লোক কর্ম্মপ্রার্থী হওয়াতে কল-কারখানার মালিকেরাও সুযোগ বুঝিয়া উহাদের সঙ্গে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

এই সমস্ত ব্যাপারের কিছুদিন পূর্ব্বেই ১৭৭৬ খৃঃ অব্দে সুপ্রসিদ্ধ য়্যাডাম্ স্মিথের (Adam Smith) যুগ-প্রবর্ত্তক গ্রন্থ "জাতীয় সম্পদ" (The Wealth of Nations) প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ গ্রন্থে তিনি "স্বচ্ছন্দানুবর্ত্তন-নীতি"র (Laisser-faire) প্রচার করেন। য়্যাডাম্ স্মিথের এমন উদ্দেশ্য ছিল না যে, সমাজের শক্তিশালী ধনি-সম্প্রদায় দরিদ্র মুটে-মজুরদিগের প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করিবে, আর, কেহই তাহাদিগকে কিছু বলিতে পারিবে না। কিন্তু দরিদ্রগণ চিরকালই কোণঠেঁসা হইয়া থাকে। শক্তিশালী জমীদার ও কলকারখানার ধনকুবের মালিকগণ য়্যাডাম্ স্মিথের প্রচারিত নীতি আপনাদের উদ্দেশ্য সাধনের ব্রহ্মাস্ত্ররূপে ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন যে, মুটে-মজুরদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা তাঁহারাই নির্দ্ধারিত করিবেন, গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার কোনও ক্ষমতা নাই। ইঁহারাই তখন দেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী। রাজপুরুষগণেরও প্রায় সকলেই এই সমস্ত জমীদার ও কারখানার মালিকদিগের সহিত নানারকমে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সুতরাং তাঁহারা দরিদ্রের আর্ত্তনাদে কর্ণপাত না করিয়া, আত্মীয়-স্বজনের ও সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের স্বার্থ-সাধনের দিকেই অধিকতরভাবে মনোনিবেশ করিলেন। খাদ্যদ্রব্যাদির মূল্য দিনদিনই অভাবনীয়রূপে চড়িতেছিল বটে, কিন্তু অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে শ্রমজীবীদের মাহিনা

বা মজুরীও সঙ্গে সঙ্গে কমিতেছিল। অল্প মজুরী দিয়া পাওয়া যায় বলিয়া, কল-স্বামীগণ দিন দিন অধিক সংখ্যায় স্ত্রীলোক ও অল্পবয়স্ক বালকবালিকার নিয়োগ করিতে লাগিলেন। ইহাতে একদিকে যেমন উহাদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক অবনতির চরম হইতে লাগিল, পক্ষান্তরে, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের পক্ষে চাকুরী মেলা দায় হইয়া পড়িল। ঠিক এই সময়ে (১৭৯৩খৃঃ) ফরাসী বিপ্লব ও তাহার পরেই নেপোলিয়ানের সহিত ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া উঠাতে, ইউরোপীয় প্রায় সকল দেশেরই শিল্প-বাণিজ্য একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। ইংলণ্ডের পক্ষে মহাসুযোগ উপস্থিত হইল। একা ইংলণ্ড সমগ্র ইউরোপের কাপড় ও লৌহজাত দ্রব্যের সরবরাহকার হইয়া দাঁড়াইল। ইহাতে কলকারখানার মালিকদের অচিন্তনীয়রূপে লাভ হইতে লাগিল বটে, কিন্তু ইংলণ্ডের সম্পদবৃদ্ধিতে শ্রমজীবী-গণের অবস্থার অবনতি ব্যতীত উন্নতি হইল না।

যে যে স্থানে কলকারখানা স্থাপিত হইল, সেই সেই স্থলেই নূতন সহরের সৃষ্টি হইতে লাগিল বটে, কিন্তু যাহারা এই সমস্ত নূতন সহরের অধিবাসী হইল, তাহাদের অবস্থার কথা স্মরণ করিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এই সমস্ত মুটে-মজুরেরা যে স্থানে বাস করিত, তাহাকে মনুষ্যের বাস না বলিয়া পশুর বাস-গহ্বর বলিলেই ঠিক হয়। ইহাদের মধ্যে কোনও সামাজিক সম্বন্ধ বন্ধন ছিল না। এক এক জন এক এক স্থান হইতে আসিয়াছে; একের সহিত পূর্ব্বে কোনও কালে অন্যের আলাপ-পরিচয় পর্য্যন্ত ছিল না। সর্ব্বপ্রকার পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন হইতে বিযুক্ত হইয়া, নিরক্ষর অশিক্ষিত শ্রমজীবী-সম্প্রদায় সর্ব্বপ্রকার দুর্নীতির স্রোতে আপনাদিগকে ভাসাইয়া দিয়া উদরের যাতনা ও ক্ষুধার্ত্ত পরিবারের আর্ত্তনাদ ভুলিতে চেষ্টা করিত। নিয়োগকর্ত্তাগণ মুটে-মজুরদিগকে অর্থলাভের যন্ত্রবিশেষ বিবেচনা করিত। যেন তেন প্রকারেণ অল্প খরচে অধিক লাভ করা ব্যতীত মুটে-মজুরদের সহিত অন্য কোনও প্রকার সম্বন্ধ আছে, ইহা তাহারা কল্পনাও করিতে পারিত না। এইরূপ শিল্প-প্রথা ইতিহাসে ফ্যাক্টরী সিষ্টেম (Factory System) ও ক্যাপিটালিজ্‌ম্ (Capitalism) নামে পরিচিত। ১৮১৫ সাল পর্য্যন্ত এইরূপ অবস্থা চলিল। নেপোলিয়ানের সহিত যুদ্ধ থামিয়া যাওয়াতে ইংলণ্ডের শ্রম-শিল্পের ব্যবসায় অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়ে, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে মুটে-মজুরদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়।

এই সময়ে প্রাগুক্ত Factory System ও Capitalism প্রথার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে সোসিয়ালিজ্‌মের প্রথম প্রবর্ত্তক পূর্ব্বোক্ত রবার্ট ওয়েনের আবির্ভাব হয়।

ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, কোনও নূতন মত-বাদের প্রচার করিতে হইলে, দুইটী বিষয়ের নিতান্ত আবশ্যক—বস্তুভিত্তি, ও আদর্শ-কল্পনা। বস্তুভিত্তি না থাকিলে যেমন কিছুই নিরলম্বভাবে অবস্থান করিতে পারে না, তেমনি একটা জ্বলন্ত আদর্শ চক্ষের সমক্ষে না থাকিলে, উহার জীবনী-শক্তিও সংরক্ষিত হইতে পারে না। শিল্প-বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ ইংলণ্ডের যে শোচনীয় অবস্থার বর্ণনা করা হইয়াছে, সোসিয়ালিজ্‌ম্ উহাকেই বস্তু-ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া স্থায়িত্বলাভে চেষ্টা করিতেছিল বটে,—কিন্তু ফ্রান্স হইতে উহার জীবনী-শক্তির নিদানস্বরূপ আদর্শ সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ও মধ্যভাগের ফরাসী দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, সেখানে রাজ-শক্তি সম্পূর্ণ একচ্ছত্র ও অনিয়ন্ত্রিত; রাজানুগ্রহ-পুষ্ট অভিজাত-সম্প্রদায় দেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী। নির্ব্বাক্ প্রজা-সাধারণ পদ-দলিত, কর-ভার নিপীড়িত, ও অত্যাচার-ক্লিষ্ট। দরিদ্রেরা ট্যাক্স দিত, আর রাজপুরুষ ও অভিজাত-সম্প্রদায় অম্লানবদনে উহার যথেচ্ছ অপব্যবহার করিতে কিছু-মাত্র কুণ্ঠা বোধ করিত না—তাহারা যাবতীয় অধিকার ভোগ করিত—কিন্তু তদনুরূপ কোনও দায়িত্ব বোধ তাহাদের ছিল না। কিন্তু সহিষ্ণুতারও একটা সীমা আছে, এবং সেই সীমা অতিক্রান্ত হইলে মানুষ হিতাহিত বিবেচনা-শূন্য হইয়া বিরুদ্ধভাবে উত্থিত হয়। ফরাসী দেশেও তাহাই

হইল। ফরাসী-রাজের অনিয়ন্ত্রিত স্বেচ্ছাচার শাসন-রীতি ও অভিজাত-বর্গের অনুষ্ঠিত অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে শীঘ্রই প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইল। ভল্‌টেয়ার (Voltaire) ও রুশো (Rousseau) এই পদ-দলিত জন-সাধারণের মুক্তি-দ্রষ্টারূপে সাহিত্য-সমরে অবতীর্ণ হইলেন, এবং তাঁহাদের প্রচারিত মত-বাদের পরিণামে ফরাসী-বিপ্লবের তাণ্ডব নৃত্যের আবির্ভাব হইল। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করাই ফরাসী-বিপ্লববাদীদের ইষ্টমন্ত্র ছিল। তাহাদের এই উদ্দেশ্য সম্যক সফল না হইলেও, অত্যাচারের স্রোত যে অতঃপর বহুল পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ওয়াটার্লু-ক্ষেত্রে অনিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্রাবলম্বী ইউরোপীয় রাজন্যবর্গ কর্তৃক নেপালিয়ানের পরাজয়সাধন ও ফরাসী-বিপ্লবের দমনের পরে, ইউরোপে ফরাসী-বিপ্লবের আদর্শের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়। মেটার্‌নিকের বুদ্ধি-প্রণোদিত ইউরোপীয় রাজ-শক্তি প্রজা-সাধারণকে আবার পদানত করিতে প্রয়াসী হয়। ইউরোপীয় রাজন্যবর্গের এই অভিপ্রায়ের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ফরাসী সোসিয়ালিজ্‌মের প্রবর্ত্তক সাঁ-সিমোঁর আবির্ভাব হয়। এবং ইংলণ্ডীয় কর্ম্ম-বাদ ও ফরাসী আদর্শ-বাদ, এতদুভয়ে সম্মিলিত হইয়া আধুনিক ইউরোপীয় সোসিয়ালিজ্‌মের সৃষ্টি হইয়াছে। আধুনিক সোসিয়ালিজ্‌ম্, ইংলণ্ডে য়্যাডাম্ স্মিথের ও ফ্রান্সে ভলটেয়ার ও রুশোর প্রচারিত মত-বাদের ক্রম-পরিণতি মাত্র।

সোসিয়ালিজ্‌মের উৎপত্তি সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে সমাজের বিভিন্ন স্তরের আর্থিক অবস্থার সামঞ্জস্য সাধনই সোসিয়ালিজ্‌মের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু সমাজের প্রচলিত গঠন-প্রণালীর পরিবর্ত্তন সাধন করিতে না পারিলে, এই সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর নহে, এবং সমাজ-গঠনের পরিবর্ত্তন করিতে হইলেই রাজ-শক্তিকে বা গবর্ণমেণ্টকেও তদনুরূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে—রাজতন্ত্রশাসনপ্রথা প্রভৃতির আবশ্যকমত পরিবর্ত্তন করিয়া গণতন্ত্রের (Democracy) প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা আবশ্যক। কারণ, সোসিয়ালিজ্‌ম্ রাজনৈতিক গণতন্ত্রেরই অর্থনৈতিক অনুপূরক মাত্র। সুতরাং একের সাহায্য ব্যতীত অপরের স্থায়িত্ব ও উন্নতি লাভ সম্ভবপর নহে। এই জন্য সমাজের সর্ব্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে আর্থিক সমন্বয় সাধন করা সোসিয়ালিষ্টগণের মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও, তাহারা বর্ত্তমানে রাজনৈতিক শাসনপ্রথার আবশ্যকানুরূপ পরিবর্ত্তন সাধনেই অধিকতর মনোযোগী হইয়াছে।

১৮১৭ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডে রবার্ট ওয়েন তাঁহার মতবাদ প্রচার করেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, ঠিক ঐ সালেই সাঁ-সিমোর মতবাদও ফ্রান্সদেশে প্রচারিত হয়। ১৮৫০ সাল পর্য্যন্ত উভয় দেশে স্বতন্ত্রভাবে উভয় মতের প্রচার ও বিস্তৃতি হইতে থাকে। সাঁ-সিমো ও ফুরিয়ের পর ফ্রান্সে প্রুধোঁ (Proudhon) ও লুই ব্লাঁ (Louis Blanc) তাঁহাদের পন্থানুসরণ করেন। এবং রবার্ট ওয়েনের পর মরিস্ (Maurice), কিন্‌স্‌লী (Kingsley) প্রভৃতি "খ্রীষ্টান" সোসিয়ালিষ্টগণ (Christian Socialists) তাঁহার স্থান অধিকার করেন।

১৮৫০ খৃঃ অব্দে এই উভয় মতবাদের সম্মিলন হয় এবং তাহার পর হইতে জার্ম্মাণ, রুশীয় ও ইতালীয় চিন্তাবীরগণ এই সম্মিলিত মতবাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীমন্মথনাথ মজুমদার।

সুখ !

কা'রে বল সুখ ?—মন, কা'র সাধনায়,
কণ্টক-পূরিত এই বিশাল জগতে,
ভ্রমিতেছ দিবানিশি মোহ ছলনায়,
দুখের পসরা লয়ে,—পারি না বুঝিতে !

জানি না, এ সংসারের কোন্ গুপ্তদেশে,
কোথায় লুকায়ে আছে,—কারে বল সুখ ;—
আমি দেখি, রাজা, প্রজা, দীন নির্ব্বিশেষে,
কেবলি দুখের বোঝা বহিয়ে বিমুখ।

সুখ !—সে যে কিছু নয়, জলদের হাসি,
ক্ষণেক চমক মাত্র দেখায়ে লুকায়,
দুকূলে ভাঙিয়ে আশা ক্ষুব্ধ ঊর্ম্মিরাশি,
হৃদয়ের স্তরে স্তরে কর্ম্মনাশা ধায় ।

এমন যে সুখ,—তাহে নাহি মোর সাধ,
আমার যা' নিত্য দুঃখ,—তাই থাক্ থাক্ ।

শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ।

দাক্ষিণাত্যে লিঙ্গ-পূজক

দেশ, কাল প্রভৃতির বিভিন্নতায় রীতি-নীতিতেও যে কত বিভিন্নতা ঘটে, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয় । ভারতবর্ষে শিব-লিঙ্গোপাসকের অভাব নাই । কিন্তু এই শিব-লিঙ্গের পূজা পদ্ধতি ভারতের এক এক প্রদেশে এক এক প্রকার । একমাত্র দাক্ষিণাত্যের লিঙ্গোপাসকদিগের বিষয় আলোচনা করিলেই, ইহার যাথার্থ্য উপলব্ধি হইবে ।

দাক্ষিণাত্যে লিঙ্গোপাসকগণকে লিঙ্গবন্ত বলে । চলিত কথায় লিঙ্গবন্ত বলিলে, সম্প্রদায়ভুক্ত যে কোন ব্যক্তিকেই বুঝায় ।

লিঙ্গোপাসকদিগের ধর্ম্ম অতি সরল । তাহারা একেশ্বর-বাদী, এবং শিবই তাহাদের একমাত্র দেবতা । ইহারা বেদকে ভক্তি করে; কিন্তু বেদের যে সমস্ত টীকা টিপ্পনির উপর ব্রাহ্মণ-গণের অবিচলিত আস্থা, সেই সমস্ত টীকা টিপ্পনি লিঙ্গায়ৎ-গণ মোটেই মানে না ; তাহাদের ধর্ম্ম বিশ্বাস অনেকটা আদিম যুগের হিন্দুদের বিশ্বাসেরই অনুরূপ । পুরোহিতসম্প্রদায়ের প্রয়োজনীয়তা ইহারা স্বীকার করে না । যদিও বর্ত্তমান সময়ে ইহাদের মধ্যে কার্য্যতঃ কিছু কিছু জাতিভেদ দেখা যায়, তথাপি ইহারা জাতিবিচার হইতে আপনাদিগকে সম্পূর্ণ মুক্ত বলিয়াই পরিচয় দেয়, এবং ব্রাহ্মণপ্রাধান্য সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে । ইহাদের মতে যজ্ঞ, প্রায়শ্চিত্ত, উপবাস, কিংবা তীর্থযাত্রা প্রভৃতির কোনই উপকারিতা নাই । লিঙ্গই মহেশ্বর শিবের একমাত্র মূর্ত্তি বা চিহ্ন স্বরূপ এবং এই লিঙ্গই একমাত্র অবিসংবাদিত সত্য ও বিশ্বাস্য, ইহাই লিঙ্গায়ৎ-দিগের প্রধান ধর্ম্মমত ।

ইহারা লিঙ্গকে দুই ভাগে বিভক্ত করে, "স্থাবর" ও "জঙ্গম" । হিন্দুদিগের মন্দিরাদিতে স্থাপিত লিঙ্গ 'স্থাবর' লিঙ্গ এবং যে লিঙ্গ ইহারা জীবিতাবস্থায় বামহস্তে বা গ্রীবাদেশে সর্ব্বদা ধারণ করে, অথবা মৃতব্যক্তিদিগের বামহস্তে বাঁধিয়া দেওয়া হয়, তাহাকে 'জঙ্গম' লিঙ্গ বলে । স্ত্রী পুরুষ, যুবা বৃদ্ধ, ধনী নির্ধন, সম্প্রদায়ভুক্ত সকলেরই এই লিঙ্গ-ধারণ অবশ্য কর্ত্তব্য । ইহা হারাইয়া গেল বা কোন প্রকারে নষ্ট হইলে, ধর্ম্মজীবনে মৃত্যু হইল বলিয়া ইহারা মনে করে ; কিন্তু এরূপ অবস্থায় প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ কোনও-রূপ পূজা অর্চ্চনা করিয়া পুনরায় লিঙ্গধারণ করিতে আজকাল প্রায়ই দেখা যায় ।

কোনও প্রকারের মাংস বা মাদক দ্রব্য স্পর্শ করাও লিঙ্গায়ৎদিগের পক্ষে একান্ত নিষিদ্ধ । সকল বিষয়েই ইহারা অত্যন্ত রক্ষণশীল এবং ইহারা কদাপি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট নিয়ম-নিচয়ের ব্যতিক্রম করে না । এই কারণে আজিও লিঙ্গায়ৎ-সমাজে প্রাতীচ্যপ্রভাব কিছুমাত্র প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই ও ইহাদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষাও প্রচারিত হয় নাই । চতুর্দ্দিকস্থ নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল পরিবেশের মধ্যে বাস করিয়াও দাক্ষিণাত্যের লিঙ্গ-পূজকগণ তাহাদের সামাজিক রীতিনীতি ও ধর্ম্মভাব আজও সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ ও অটুট রাখিয়াছে । সকল বিষয়েই অত্যন্ত মিতাচারী বলিয়া ইহাদের সামাজিক জীবন অপেক্ষাকৃত উন্নত । বহিঃ-প্রভাব হইতে দূরে থাকায় ইহাদের কথিত কেনেরীয় ভাষার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য, শিষ্টতা ও ওজস্বিতা এখনও কিছুমাত্র নষ্ট হয় নাই ।

লিঙ্গায়তদিগের সামাজিক রীতিনীতি বুঝিতে হইলে, উহাদের ধর্ম্মমত সম্বন্ধেও কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক, এবং এতদুদ্দেশে তাহাদের ধর্ম্মমতের ক্রমাভিব্যক্তির কিঞ্চিৎ আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না ।

ইহা কোনও স্বয়মুদ্ভূত ধর্ম্ম, অথবা বৃহত্তর ও প্রাচীনতম শৈবধর্ম্মেরই পুনরভ্যুত্থিত রূপ-বিশেষ, তাহা এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। এই ধর্ম্মমতের প্রতিষ্ঠাতা 'বাসব' সম্বন্ধে চলিত আখ্যায়িকা কিয়ৎপরিমাণে ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

বাসবের জীবনের অনেক ঘটনাই খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে 'পাশ্চাত্য' চালুক্যগণের পূর্ব্বতন রাজধানী কল্যাণ নগরে ঘটিয়াছিল। এই কল্যাণ-নগর বর্ত্তমান সময়ে নিজাম রাজ্যান্তর্গত বিদর প্রদেশে অবস্থিত। চালুক্যগণ প্রথমতঃ উত্তর ভারত হইতে দাক্ষিণাত্যে আগমন করে, কিন্তু কোন্ সময়ে আসে, ঠিক করিয়া বলা যায় না। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতেও তাহাদিগকে নর্ম্মদার দক্ষিণ তীরে দেখা যায়। সপ্তম শতাব্দীতে ইহারা দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া যায়; ইহার পাঁচশত বৎসর পরেও প্রাগুক্ত কল্যাণ নগরে ইহার 'পাশ্চাত্য' শাখা অবস্থান করিতেছিল বলিয়া বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে।

হিন্দুস্থানের দক্ষিণাংশ চিরদিনই একাধিক রাজ্যে বিভক্ত, ও বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দু প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র ছিল। বাসবের প্রাদুর্ভাবকালে বিজ্জলা নামে কোনও জৈন রাজা কল্যাণ নগরে রাজত্ব করিতেছিলেন। বিজ্জলা চালুক্য-বিজিত কলচুরি-বংশীয় এবং জনৈক সামন্ত রাজা মাত্র ছিলেন। তিনি চালুক্য সেনার অধিনায়ক ছিলেন, এবং ১১৫২ খৃঃ অব্দে স্বীয় প্রভু তৃতীয় তৈলকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। কেহ কেহ বলেন, তৈলকে রাজ্যচ্যুত করিবার অনেক বৎসর পরে বিজ্জলা সম্পূর্ণভাবে রাজদণ্ড নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। চালুক্যগণ ১১৮২ খৃঃ অব্দে বিজ্জলার পুত্রগণের নিকট হইতে সিংহাসন পুনরধিকার করেন, কিন্তু সাত বৎসর অতীত হইতে না হইতেই পুনরায় বিতাড়িত হন। অবশেষে লিঙ্গায়ৎ ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে উহাদের চরম অবনতি ঘটে।

এই সময়ে হিন্দুগণ জৈনদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছিল বটে, কিন্তু বাসবের অভ্যুদয়ে হিন্দুসম্প্রদায় দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এইরূপে বিভক্ত হইয়া পড়াতে, হিন্দুগণ অত্যন্ত হীনবল হইয়া পড়ে, এবং ক্রমে ক্রমে মহিশুর হইতে আগত হয়শালা বল্লাল ও উত্তরদিকবর্ত্তী দেবগিরির যাদবগণ কর্ত্তৃক যুগপৎ আক্রান্ত হওয়ায়, তাহাদের রাজ্য এই দুই প্রবল প্রতিবেশী রাজ্যের মধ্যে লুপ্ত হইয়া যায়।

এই সময় দাক্ষিণাত্যে শৈবধর্ম্ম প্রবলভাবে পুনরুত্থিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে বহু বিখ্যাত শৈবমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়, এবং বহু বিদ্বান ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি শৈবধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রস্তরলিপি প্রভৃতির দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। এই সময়ে জৈনধর্ম্মাবলম্বিগণ পশ্চিম দাক্ষিণাত্যের মহীশুর অঞ্চলে প্রভূত ক্ষমতাশালী ছিল, এবং ইহাদের সহিত সংঘর্ষ হেতুই বোধ হয়, শৈবধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানের গতি এত তাড়াতাড়ি বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল।

একখানি শিলা-লিপিতে উল্লিখিত আছে যে, "জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের আচরিত বিরোধী ক্রিয়াকলাপ ও রীতিনীতির বিনাশসাধনের জন্য ভগবান শিব এক মনুষ্য সৃষ্টি করেন।" আনুমানিক ১২০০ খৃঃ অব্দে এই লিপি উৎকীর্ণ হয়, এবং এতদ্বারা ইহাই বোধ হয় যে, এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। রাইস্ (Rice) সাহেব বলেন যে, বিখ্যাত শৈব ব্রাহ্মণ শঙ্করাচার্য্য অষ্টম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্মকে সাংঘাতিকভাবে পরাভব করেন, এবং অল্পদিনের মধ্যেই শৈবধর্ম্মকে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করেন; কিন্তু জৈনধর্ম্ম দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্তও শৈবধর্ম্মের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই সময়ে বৈষ্ণব-সংস্কারক রামানুজাচার্য্যের আবির্ভাব হয়। রাইস্ সাহেবের মতে রামানুজের আবির্ভাবেই জৈন ধর্ম্মের উচ্ছেদ হয়। কিন্তু বিষ্ণুপাসকগণ শৈবদিগের প্রায় দুইশত বৎসর পরে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অনেক বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিল। সুতরাং এরূপ মনে করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে, একাদশ শতাব্দীতে শৈবগণ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, ঠিক এই সময়েই অর্থাৎ ত্রয়োদশ

শতাব্দীতেই ইউরোপের ইটালিতেও ভজনালয় প্রভৃতি নির্ম্মাণের বিশেষ ধুম পড়িয়া গিয়াছিল।

বাসবের জন্মকাল নিশ্চিতরূপে ঠিক হয় নাই,—তবে অনেকে অনুমান করেন যে ১১০৬ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। লিঙ্গায়তদের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ লিঙ্গ-পুরাণ, বাসব-পুরাণ ও চন্ন-বাসব-পুরাণে বাসবের ক্রিয়াকলাপের বর্ণনা পাওয়া যায়। বাসবপুরাণ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ও চন্নবাসবপুরাণ ১৫৮৫ খ্রীঃ অব্দের পরে লিখিত বলিয়া জানা গিয়াছে। সুতরাং উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের বর্ণিত বিবরণ যে প্রবাদমূলক, এবং এই শ্রেণীর অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় ঐতিহাসিকমূল্যহীন অলৌকিক উপাখ্যানে পরিপূর্ণ, তাহা বলাই বাহুল্য। বিপুলাচার্য্য-চরিত গ্রন্থে বাসব সম্বন্ধে জৈনপক্ষীয় বিবরণ পাওয়া যায়। ইহা বহু বিষয়েই উপরোক্ত গ্রন্থদ্বয় হইতে ভিন্নমতাবলম্বী হইলেও, যে যে বিষয়ে লিঙ্গায়তগণের মতের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে, তৎসমুদয় ফ্লীট্ (Fleet) সাহেবের Epigraphia Indica (Vol. IV. p. 239) হইতে সঙ্কলন করিয়া নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বিজাপুর জেলান্তর্গত বাগভাদী মহকুমায় মদীরাজ ও তাঁহার স্ত্রী মদালাম্বিকা বাস করিতেন। তাঁহারা জাতিতে ব্রাহ্মণ ও শৈবমতাবলম্বী ছিলেন। লুপ্তপ্রায় শৈব ধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের জন্য শিবের বৃষ তাঁহাদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। বৃষের অবতার বলিয়া ঐ পুত্রের নাম বাসব হয়। কথিত আছে যে, বাসব অল্পবয়সেই সমস্ত জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছিলেন, এবং অষ্টম বৎসর বয়সের সময় উপনয়ন দিতে চাহিলে,পৈতা লইতে অস্বীকার করিয়া বলেন যে, তিনি জাতি-ভেদ উঠাইয়া দিবার জন্য শিবের অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বাসবের অনন্যসাধারণ জ্ঞান,ধর্ম্মপ্রাণতা ও উপবীত প্রভৃতি প্রত্যাখ্যান উপনয়নসংস্কারে আগত তদীয় খুল্লতাত কালাচুরীয় রাজা বিজ্জলার প্রধান মন্ত্রী বলদেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি তাঁহার কন্যা গঙ্গাদেবী অথবা গঙ্গাম্বার সহিত বাসবের বিবাহ দেন। কিন্তু অভিনব মতবাদের প্রচার হেতু বাসব ব্রাহ্মণগণ-কর্ত্তৃক নির্য্যাতিত হইয়া জন্মভূমি পরিত্যাগকরতঃ কাপ্পাদী নামক গ্রামে বাস করিতে থাকেন। সেখানে ভগবান শিবের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি জীবনের প্রথম ভাগ কর্ত্তন করেন। ইতিমধ্যে বলদেবের মৃত্যু হয় এবং বাসবের ক্ষমতা ও গুণের বিষয় জনসাধারণের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচারিত হয়; সুতরাং বিজ্জলা বাসবকে বলদেবের কার্য্যে নিযুক্ত করিতে স্থির-সঙ্কল্প হন। প্রথমে অনিচ্ছা থাকিলেও, রাজপদের প্রতিপত্তি তাঁহার মতবাদপ্রচারের সহায়তা করিবে আশায়, বাসব রাজ-কার্য্য গ্রহণপূর্ব্বক ভগ্নী নাগলাম্বিকা সমভিব্যাহারে কল্যাণ নগরে গমন করেন এবং রাজাকর্ত্তৃক বিশেষভাবে প্রত্যুদ্গত হইয়া প্রধান মন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতির পদে অভিষিক্ত হন। ফলতঃ, রাজ্যমধ্যে রাজার পরেই তাঁহার স্থান ছিল, এবং রাজাও তাঁহাকে আরও ঘনিষ্টভাবে আকৃষ্ট করিবার জন্য স্বীয় ভগ্নী নীললোচনার সহিত তাঁহার পরিণয় সম্পাদন করেন। প্রায় এই সময়ে বাসবের অবিবাহিতা ভগ্নী নাগলাম্বিকার গর্ভে শিবতেজে শিবসুত সমরদেবতার অবতারস্বরূপ এক পুত্র জন্মে। এইরূপ কথিত হয় যে, একদা বাসব কোনও পবিত্র পর্ব্বত-শিখরে আরাধনান্তর বরলাভের প্রার্থনা করিবার সময় দেখিতে পাইলেন যে, একটি পিপীলিকা মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে একটি বীজ মুখে করিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। বাসব ঐ বীজটি সংগ্রহ করিয়া গৃহে লইয়া যান, এবং বাসবের অজ্ঞাতসারে তদীয় ভগ্নী উহা ভক্ষণকরতঃ গর্ভবতী হন। অপরূপ সৌন্দর্য্যহেতু বাসবের ভাগিনেয়ের নাম চন্ন-বাসব (চন্দ্র-বাসব) অথবা সুন্দর বাসব রাখা হয়। চন্ন-বাসব ধর্ম্মপ্রচারে তাহার মাতুলকে যথেষ্ট সাহায্য করেন, এমন কি স্বয়ং বাসব অপেক্ষাও চন্ন-বাসব অধিকতর কার্য্যকুশল ছিলেন বলিয়া অনেক স্থানে বিবৃত হইয়াছে।

বর্ণিত পুরাণদ্বয়ের অধিকাংশ ভাগই মতবাদের, ব্যাখ্যায়, পৌরাণিক বৃত্তান্তবর্ণনে, পূর্ব্ববর্ত্তী শৈব সাধুগণের প্রশংসায়, এবং বাসবের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের বিবরণে পূর্ণ। যাহা হউক, উভয় পুরাণের মতেই মাতুল ও ভাগিনেয় উভয়েই এই ধর্ম্মের অতি উদ্যমশীল নায়ক ছিলেন এবং লিঙ্গায়তগণ

হইতে ভিন্ন মতাবলম্বীগণকে, বিশেষতঃ জৈনদিগকে নির্য্যাতিত ও উচ্ছেদ করিবার জন্য উপদেশ দিতেন। অধিকন্তু, বাসব জঙ্গম অথবা লিঙ্গায়ত পুরোহিতগণের পোষণার্থ রাজ-কোষ হইতে অজস্র অর্থ ব্যয় করিতেন। রাজকোষ হইতে অর্থব্যয় এবং জৈনদিগের প্রতি অত্যাচার, প্রধানতঃ এই দুই কারণেই জৈনধর্ম্মাবলম্বী বিজ্জলা বাসবের প্রতি ক্রমে ক্রমে আস্থাশূন্য হইয়া পড়েন। উপরন্তু, বাসবের প্রতিদ্বন্দ্বী মঞ্চন্ন-নামক অপর একজন মন্ত্রী স্বয়ং শৈব হইয়াও, এই বিদ্বেষ-বহ্নি বর্দ্ধিত করিয়া দেন। অবশেষে এই মনোমালিন্য ভীষণভাব ধারণ করিয়া এমন এক দুর্ঘটনা ঘটাইয়াছিল, যাহাতে বিজ্জলা আততায়ীর হস্তে নিহত এবং বা[illegible] মৃত্যুমুখে পতিত হন।

কল্যাণ নগরে দুইজন অতি ধর্ম্মাত্মা লিঙ্গায়ত বাস করিতেন। স্বভাবসিদ্ধ নিষ্ঠুরবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য বিজ্জলা ঐ দুই মহাজনের চক্ষু উৎপাটিত করিয়া দেয়। ইহাতে বাসব কল্যাণ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, এবং জগদ্দেব নামক জনৈক লোককে বিজ্জলাকে হত্যা করিবার জন্য নিযুক্ত করেন। জগদ্দেব দুইজন সহচরসহ কোন উপায়ে রাজপুরীর মধ্যে প্রবেশকরতঃ রাজসভার মধ্যেই বিজ্জলাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে। ইত্যবসরে বাসব কুদনী-সঙ্গমেশ্বরে পৌছিয়া ধর্ম্মচিন্তায় নিমগ্ন হন, এবং চন্ন-বাসব উত্তর কানাড়ার অন্তর্গত উল্‌ভী নামক স্থানে কোনও এক গুহা মধ্যে আশ্রয় লাভ করেন।

উপরোক্ত আখ্যায়িকা বাসব-পুরাণ হইতে গৃহীত হইয়াছে। চন্ন-বাসবপুরাণ-বর্ণিত ঘটনা ইহা হইতে অনেকাংশে বিভিন্ন। উহাতে বিজ্জলা মাতুলপদারূঢ় চন্ন-বাসব কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল বলিয়া উল্লিখিত আছে। জৈন বিবরণ মতে বিজ্জলা বাসবের ভগ্নীকে উপপত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিল এবং তজ্জন্যই বাসবের এত প্রাধান্য হইয়াছিল। বাসব-প্রেরিত বিষাক্ত ফলভক্ষণে বিজ্জলার মৃত্যু হয়, এবং বাসবও বিজ্জলার পুত্রের প্রতিহিংসা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কূপমধ্যে লম্ফপ্রদান করায়, মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অন্যান্য প্রামাণিক গ্রন্থানুসারে বাসব যৌবনে পিতৃক্রোধ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কল্যাণ নগরে পলাইয়া আসে। এবং তদীয় খুল্লতাত বলদেব তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিয়া আশ্রয় দান করেন। বাসব পরে খুল্লতাতের পদ লাভ করেন। এই বিবরণ বোধ হয় সি, পি, ব্রাউনের প্রদত্ত বিবরণ হইতে অনুকৃত হইয়াছে; কিন্তু পুরাণগুলির অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী অনুবাদ আলোচনা করিলে, ইহা ভ্রমাত্মক বলিয়া অনুমিত হয়। বাসবের কল্যাণ নগরে আগমন সময়ে বিজ্জলা অতি ক্ষমতাবান্ ছিলেন, সুতরাং বাসব ১১৫৬ খ্রীষ্টাব্দের পরে কল্যাণে আসিয়াছিল বলিতে হইবে। যদি ১১০৬ খ্রীষ্টাব্দই বাসবের জন্মকাল বলিয়া গৃহীত হয়, তবে প্রায় ৫০ বৎসর বয়ক্রমকালে বাসব বিজ্জলা কর্ত্তৃক রাজকার্য্যে আহুত হইয়াছিল। বিজ্জলা ১১৬৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বীয় পুত্রকে সিংহাসন দান করেন এবং ইহার কিছুকাল পরে তিনি নিহত হইয়া থাকিবেন, এরূপ অনুমান করা যায়। পক্ষান্তরে, বলদেব যখন [illegible] উপনয়ন দেখিতে আসিয়াছিলেন, সে সময়ে তিনি বিজ্জলার মন্ত্রী থাকিতে পারেন না; কারণ বিজ্জলার রাজ্যারম্ভের বহু পূর্ব্বে ১১১৪ খ্রীষ্টাব্দে বাসবের উপনয়ন সংঘটিত হইয়াছিল। যাহা হউক, পুরাণোক্ত বিবরণ ও ঘটনাগুলিকে সঠিক ঐতিহাসিক সত্যরূপে গ্রহণ করিবার কোনও কারণ নাই, এবং কার্য্যতঃও আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিকগণের অধ্যবসায়-লব্ধ তাম্রশাসন প্রভৃতির লিখিত অধিকতর নির্ভরযোগ্য বিবরণ সমূহের আলোচনা করিলে, প্রচলিত আখ্যায়িকার ঐতিহাসিক সত্যতার উপর বিশেষ সন্দিহান হইতেই হয়। তবে দাক্ষিণাত্যে লিঙ্গায়ত ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের মূলে যে প্রকৃতই বাসব-নামীয় এক ধর্ম্ম-বীরের হাত আছে, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত বিজাপুর জেলার মনগনি নামক গ্রামের এক মন্দির-গাত্রের একটী শিলা-লিপিতে তাহার প্রমাণ উৎকীর্ণ আছে। এই লিপিতে বাসবের পিতৃকুলের পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে এবং তিনি পরম মাহেশ্বর ও "পৃথিবীস্থ জনগণের ধর্ম্মপিতা" বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ইহা হইতেই বুঝা যায়, এই বাসব লিঙ্গায়ৎ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বাসব-চন্দ্রমা। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত ধারবার জেলার আবলুর নামক স্থানে আবিষ্কৃত একখানা লিপিতে

বাসবের কিঞ্চিৎ পররর্ত্তী একান্তদ রামায্য নামক আর এক শৈব ধর্ম্মবীরের পরিচয় পাওয়া যায়। এই দুই লিপি এবং অন্যান্য অনেক লিপি হইতে বুঝা যায় যে, বাসবপ্রবর্ত্তিত লিঙ্গায়ত ধর্ম্ম প্রাথমিক ক্ষুদ্র আরম্ভ হইতে পর পর ধর্ম্মবীরগণের চেষ্টায় বর্ত্তমান বিপুল আকার ধারণ করিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত।

শিশুশিক্ষার ব্যবস্থা

মনের পরিণতির উপর শিক্ষার প্রভাব :—শিক্ষার দ্বারা শিশুর বুদ্ধির বিকাশ হয়। কিন্তু যে সব শিশুর ঘটে আদৌ বুদ্ধি নাই, অথবা যাহারা সামান্যমাত্র মানসিকশ্রমেই অতিশয় ক্লান্তি অনুভব করে, তাহাদের বুদ্ধির বিকাশ করা শিক্ষকমহাশয়ের সাধ্যাতীত। এসকল ক্ষেত্রে জ্ঞানার্জ্জনের জন্য যে পরিমাণ মনোসংযোগ করিবার আবশ্যক, তাহার একান্ত অভাব এবং সেই কারণে শিক্ষার দ্বারা এক্ষেত্রে কোনই ফল হইতে দেখা যায় না। মনোসংযোগের অভাবটি যদি কোনও সহজাত কারণে না হয়, যদি ইহা শিশুর পালনের দোষে ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে ইহা নিবারণ-সাপেক্ষ এবং কিয়ৎপরিমাণে চিকিৎসা-সাপেক্ষও বটে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য শিশুর দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধন করা, শিশুর ভিতরে যে সব সদ্গুণ আছে সেগুলিকে বাছিয়া লইয়া ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করা, তাহার চরিত্রে সদাচরণ প্রতিষ্ঠিত করা এবং অসদাচরণের পথ হইতে তাহাকে নিবৃত্ত করা। শৈশবে মন অতিশয় নমনীয় এবং অনুকরণ-প্রিয় থাকে। এই কারণে এই সময়ে তাহার চরিত্রে সদাচরণ-প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দেওয়াও যেমন সহজ, আবার অসৎ প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দেওয়াও তেমনি সহজ। মনোরঞ্জনপ্রবৃত্তি ও বিশ্বাস-প্রবণতা শিশুর স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কুসঙ্গে পড়িলে, এই দুইটি গুণই তাহাকে পাপাচরণের পথে সাহায্য করিতে পারে। অতএব শিশু যাহাতে কুসঙ্গে না পড়িতে পারে, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। শিশুর চরিত্রগঠন ও শিক্ষা বিষয়ক সম্পূর্ণ ভার শিক্ষকের উপর ন্যস্ত করিলে চলে না। পিতামাতার মনে রাখা উচিত, এ বিষয়ে শিক্ষকমহাশয়ের সম্পূর্ণ হাত নাই, অংশতঃ আছে মাত্র। শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল ও বিফল হওয়া অনেকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। গৃহশিক্ষারও ইহার উপর কম হাত নাই। পিতামাতা, বিশেষতঃ মাতা, শিশুর চরিত্রগঠন সম্বন্ধে যতটা করিতে পারেন, এমন আর কেহই পারে না।

শিক্ষা বিষয়ে চক্ষু ও হস্তের সহচারিতা :—চক্ষু ও হস্তের মধ্যে যে একটা পরস্পর সাহচর্য্যের ভাব আছে, শিক্ষা দিবার সময় সে কথাটি ভুলিলে চলিবে না। চক্ষু চালক, হস্ত কর্ম্ম ও স্পর্শকারক। চতুষ্পদ পশুদের হাতের গতি-শক্তি ভিন্ন কর্ম্ম করিবার শক্তি নাই। তাহারা ঘ্রাণে-ন্দ্রিয়ের সাহায্যে খাদ্যাখাদ্যের বিচার করে, এবং মুখ দিয়া তাহা ধারণ করে। এই কারণে তাহাদের মস্তিষ্কের আঘ্রাণ-কেন্দ্র অধিকতর পরিণত হইয়াছে। কিন্তু দ্বি-পদেরা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে খাদ্যাখাদ্যের বিচার করে না। এই কারণে তাহাদের আঘ্রাণের কেন্দ্র ততদূর পরিস্ফুট হইতে পারে নাই। তৎপরিবর্ত্তে ইহাদের দর্শন-কেন্দ্র, শ্রবণ-কেন্দ্র ও স্পর্শ-কেন্দ্র গুলি বিশেষভাবে পরিস্ফুট ও সুপরিণত হইয়াছে। শিশু শুধু চোখে দেখিয়া কোন জিনিসের যথার্থ ভাবটির ধারণা করিতে পারে না। সে যাহা দেখে, তাহাকে হাত দিয়া স্পর্শ করিয়া এবং নাড়া-চাড়া দিয়া,উহার আকার অবয়ব, মসৃণতা, দৃঢ়তা প্রভৃতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করে। অতএব চোখ ও হাতের মধ্যে যে একটা সহচারিতার ভাব আছে,একথা অস্বীকার করিবার জো নাই, এবং ইহা আছে বলিয়াই মানুষ আজ সকলের শ্রেষ্ঠ জীব হইয়াছে। এই কারণে শিক্ষা দিবার সময় শুধু বই পড়া-ইলেই চলিবে না, শিশুর হাতেরও যাহাতে সম্যক পরিচালনা হয়, তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। চোখ ও হাত দুইয়ের পরিচালনা না হইলে,বুদ্ধি এবং বিবেচনা কিছুই সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হইতে পারে না। শিশুর মনে যে সব কল্পনার উদয় হয়, সম্ভব

হইলে, সে গুলিকে কার্য্যে পরিণত করিতে দিতে হয়। হাত এক হিসাবে মনের খেলানা, আবার অন্য হিসাবে মনের শিক্ষাদাতাও বটে। কোন কিছুর সাহায্য না লইয়া রেখা-অঙ্কনের চেষ্টা শিক্ষার পক্ষে খুবই ভাল ব্যবস্থা মনে করিতে হইবে। শিশুদের যে সব স্বাভাবিক খেলা আছে, সেগুলিও মনের পরিণতির পক্ষে খুবই সাহায্য করিয়া থাকে।

কিণ্ডারগার্টেন্ শিক্ষাপ্রণালী :—কিণ্ডারগার্টেন্ শিক্ষা-পদ্ধতির প্রথম উদ্দেশ্য শিশুর স্পর্শ, দৃষ্টি ও শ্রবণ-শক্তির পরিণতি সাধন করা। নানাপ্রকার খেলা দ্বারা এই উদ্দেশ্যটি যেরূপ সহজে সম্পাদিত হয়, এমন আর কিছুতে নহে। খেলাচ্ছলেই তাহাকে বিবিধ পদার্থ ও নানাপ্রকার ভাবের সহিত পরিচিত করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। ইহার পর, তাহাকে লিখিতে পড়িতে শিখাইতে হইবে। শিশু যখন কোন কাজ করিবে, শিক্ষকমহাশয় তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিবেন মাত্র। কাজটি কি করিয়া করিতে হইবে, সে বিষয়ে পূর্ব্ব হইতেই তাহাকে কোনরূপ উপদেশ দিবেন না, বা কার্য্য করিবার কালে কোন স্থানে ঠেকিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে সাহায্যও করিবেন না। কোন স্থানে যদি ভুল হয়, তাহা নিজের হাতে সংশোধন করিয়া দিবেন না; শিশুর স্বাধীন চেষ্টার উপর তিনি যেন কিছুতেই হস্তক্ষেপ না করেন। তিনি শুধু নীরবে তাহার কাজ দেখিয়া যাইবেন মাত্র। ক্রীড়াচ্ছলে শিক্ষা দিবার জন্য নানাপ্রকার যন্ত্র, খেলানা প্রভৃতির আবিষ্কার হইয়াছে। শিশুদিগের শিক্ষার পক্ষে এগুলির খুবই উপযোগিতা আছে। শিশুর ঘ্রাণ-শক্তি ও আস্বাদন-শক্তিরও পরিণতি করিতে চেষ্টা করা উচিত। আঘ্রাণ ও আস্বাদনদ্বারা আমরা অনেক সময় খাদ্য ও পানীয়ের ভালমন্দ বিচার করিতে সমর্থ হই। দূষিত, দুর্গন্ধ বায়ুর অস্তিত্ব আঘ্রাণ দ্বারাই টের পাওয়া যায়। অতএব আঘ্রাণ ও আস্বাদন-শক্তি পরিণত না হইলে, অনেক সময় আত্মরক্ষা করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়।

মনের পরিণতির উপর সুখ ও দুঃখের প্রভাব :—সুখের ও দুঃখের স্মৃতি মনের পরিণতির পক্ষে কম সাহায্য করে না। সুখের অবস্থায় জীবের সকল শরীরে ও মনে যে একটা আরাম ও স্বচ্ছন্দতার ভাব হয়, জীব তাহা কখনও ভুলিতে পারে না। ইহার পুনরনুভূতির জন্য সে সর্ব্বদাই সচেষ্ট হয়। যথার্থ আনন্দ সুস্থ দেহ ও সুস্থ মনের উপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া থাকে। অতএব প্রকৃত আনন্দ ও সুখ পাইতে হইলে, শরীর ও মন যাহাতে তাহাদের ক্রিয়া সুস্থভাবে সম্পন্ন করিতে পারে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা বিশেষ আবশ্যক। বাসনার তৃপ্তিতেই আনন্দ ও সুখ। কিন্তু শুধু বাসনার তৃপ্তিতেই কেহ বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। আপনাকে অনিষ্টের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য যন্ত্রণা ও কষ্টের অনুভূতিও থাকা চাই। মন্দ জিনিস খাইলে 'গা বমি বমি' করে, এবং আরও নানাবিধ কষ্ট হয়। এ কষ্টের কথা স্মৃতি-পটে মুদ্রিত থাকে; কাজেই যাহাতে পুনরায় ইহা না ঘটিতে পারে, তাহার জন্য জীব সাবধান হয়। যন্ত্রণা আত্মরক্ষার একটা মস্ত উপায়। বেদনাই মানুষকে উন্নতির পথে অগ্রবর্ত্তী করিয়াছে। কষ্ট ও দুঃখকে দূরে রাখিতে হইলে, বুদ্ধি-প্রয়োগের আবশ্যক। ইহাতে বুদ্ধিবৃত্তির বিশেষ উন্নতি হইবারই কথা।

ভাবের আধিক্যের দমন ও চরিত্রগঠন :—চরিত্র-গঠনের জন্য আত্ম-সম্মান, আত্ম-নির্ভরতা ও আত্ম-সংযম বৃত্তির বিশেষ রকম অনুশীলন করার দরকার। ইহা না হইলে, কোন শিক্ষাই সম্পূর্ণ হইতে পারে না। অতি শিশুকাল হইতেই আত্মসংযম অভ্যাস করাইতে হয়। রাগ, ভয় ও ঘৃণার লক্ষণ অতি শৈশবেই প্রকাশ পায়। এগুলির যে কোন আবশ্যকতা বা সার্থকতা নাই, তাহা নহে, কিন্তু সংযমের অভাবে অনেক সময় মানুষ এই আদিম সংস্কারগুলির যথেষ্ট অপব্যবহার করিয়া থাকে। শিশু ক্ষুধা পাইলে, কি কোনরূপ যন্ত্রণা পাইলে, রাগান্বিত হয় এবং ক্রন্দনের দ্বারা তাহা ব্যক্ত করিয়া থাকে। এস্থলে তাহার রাগের একটা সার্থকতা আছে, ইহা শিশুর অভাব বা কষ্ট নিবারণের পক্ষে সাহায্য করিয়া থাকে। কিন্তু শিশু এই স্বাভাবিক বৃত্তিটির যে অপব্যবহার করিতে না পারে, এমনও নহে; সে যখন বুঝিতে পারে যে কাঁদিলেই তাহার সকল আব্দার বাপ

যা রক্ষা করেন, তখন সে তাহার অন্যায় আব্দারও পরিপূর্ণ করিবার উদ্দেশে রাগপরবশ হয় এবং ক্রন্দনের আশ্রয় লয়। বাপ-মাও ইচ্ছা না থাকিলেও, শুধু ক্রন্দন থামাইবার জন্যই, তাহার অন্যায় অভিলাষটি পুরণ করেন। এইরূপে শিশুর আত্মদমন-বৃত্তিটি পরিস্ফুট হইতে পারে না এবং তাহার চরিত্রও যথোচিৎভাবে গঠিত হইতে পারে না। শিক্ষার দোষে আত্মসংযম-শক্তি কিরূপে নষ্ট হয়, বাইরন্ (Byron) তাঁহার নিজের চরিত্রে তাহা বিলক্ষণ টের পাইয়াছিলেন।*

ভয় :—ভয়ের উদ্দেশ্য আত্মরক্ষা। ভয় পাইলে, আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য হয় পলাইতে হয়, নয়, আপনাকে গোপন করিতে হয়। ভয়ের সহিত অন্ধকারের স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে। শিশুরা অন্ধকারে ভয় পায়। যদি অন্ধকারে ঘুমাইতে কোন শিশুর ভয় হয়, তাহা হইলে জোর করিয়া তাহাকে কখনও অন্ধকারে শুইতে বাধ্য করিতে নাই। আলোক ভিন্ন না-শোয়ার অভ্যাসটা আস্তে আস্তে ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিতে হয়। ভূত প্রভৃতির ভয় দেখাইয়া শিশুদিগকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিতে নাই।

সহানুভূতি পাইবার জন্য শিশুকালে অতিশয় ইচ্ছা হয়। এই ইচ্ছাটির অত্যন্ত প্রশ্রয় দিতে নাই। তাহাতে শিশুর ভবিষ্যৎ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। ক্রোধ, ভয় প্রভৃতি আদিম সংস্কার-গুলি সংযত করা যে একান্ত আবশ্যক,তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাদের স্বাভাবিক স্ফুরণ ও প্রকাশের পথ একেবারে বন্ধ করিতে চেষ্টা করিতে নাই। এগুলি মনে উদিত হইলে, শরীরের ভাবান্তর হয়। জোর করিয়া ইহাদের প্রকাশ হইতে না দিলে,ইহারা মনের উপর প্রবল আঘাত করে; তাহাতে মন একবারে বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইতে পারে। শাস্তির ভয় দেখাইয়া যদি কোন রোরুদ্যমান অথবা ক্রুদ্ধ শিশুকে অশ্রুবেগ অথবা ক্রোধ সংবরণ করিতে বাধ্য করা যায়, তাহা হইলে শিশুটির স্বভাব খিটখিটে ও অপ্রসন্ন হইতে পারে। এই সংবৃত ক্রোধ ও ভয় উত্তরকালে শিশুর চরিত্রে ঘৃণা ও প্রতিহিংসাবৃত্তির উদ্রেক করে। ক্রোধ, ভয় ও শোক প্রভৃতিকে প্রকাশ হইতে দিলে, মন হাল্‌কা হয়; কিন্তু ইহার জোর করিয়া সংবরণ করিতে গেলে, উহারা হৃদয়ের মধ্যে সর্ব্বদা গুমরাইতে থাকে। *

খুব শৈশবেই ঘৃণাবৃত্তিটিকে প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। আত্ম-রক্ষাবিষয়ে ইহারও একটা সার্থকতা আছে। অপকারক, তিক্ত, কষায়, ও কটু দ্রব্যাদি শিশুর রুচিকর নয়। এই সমস্ত জিনিস জোর করিয়া খাওয়াইলে, শিশু তাহা বমি করিয়া তুলিয়া ফেলে। বিস্বাদ ঔষধ বা কটু তিক্ত খাদ্যের প্রতি শিশুর বিজাতীয় ঘৃণা। এগুলি জোর করিয়া দিতে গেলে, ক্রোধ হওয়া তাহার পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। কিন্তু শিশু যে ইহার অপব্যবহার করে না, এমনও নহে। যে খাদ্য তাহার উপযোগী নয়, বয়স্কব্যক্তিদের উপযোগী, অনেক সময় সেই খাদ্য পাইবার জন্য সে বিশেষ বায়না ধরে, এবং একটা বিষম অনর্থ বাধাইবার উপক্রম করে। এরূপস্থলে তাহাকে উপবাস পাড়াইতে হয়; যতক্ষণ সে তাহার আপনার খাদ্যের প্রতি শ্রদ্ধা না দেখায়, ততক্ষণ তাহাকে কিছুই খাইতে দিতে

---

* তাই Childe Haroldএ বলিতেছেন ;—

I have thought
Too long and darkly till my
brain became,
In its eddy boiling and
o'erwrought,
A whirling gulf of fantasy and flame.
And thus untaught in youth to tame,
My springs of life were poisoned.

* সেক্‌স্‌পীয়ার এই ভাবটি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন ;—

Give sorrow words ; the grief that
does not speak,
Whispers the o'erfraught heart
and bids it break.

নাই। দুর্ভাগ্য এই যে, অনেক বাপ-মার মনেই ততখানি দৃঢ়তা নাই। শিশু যাহা চাহে, তাঁহারা তাহাই দিয়া থাকেন; ইহার ফলে শিশুটি অকারণ শারীরিক কষ্ট পায় এবং তাহার আত্মসংযম শিক্ষাও হয় না।

কৌতূহলপরায়ণতা শিশুদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ইহারা যাহাই দেখে, তাহারই বিষয়ে প্রশ্ন না করিয়া থাকিতে পারে না। চন্দ্র, সূর্য্য, মেঘ, বৃষ্টি, নদী, পর্ব্বত প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিষয়ে শিশু যে কত রকমেরই প্রশ্ন করিতে পারে, তাহার কোন সীমা সংখ্যা নাই। অনেক সময় ইহার জন্য তাহাকে তিরস্কার পাইতে হয়। ইহা ভাল নহে। অনেকে তিরস্কার করেন না বটে, কিন্তু উত্তরে এমন সব কথা বলেন, যাহার অসত্যতা বুঝিতে শিশুদের অধিক বিলম্ব হয় না। ইহাও ভাল নহে। শিশুও বড় কম দার্শনিক নহে। তাহার চোখে ধূলা দেওয়া খুবই যে সহজ, ইহা যেন কেহ মনে না করেন। শিশুর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যদি অসম্ভব ও অসঙ্গত হয়, তাহা হইলে সে কথা তাহাকে স্পষ্ট করিয়া বলা উচিত; প্রতারণা করিবার এমন কি আবশ্যক আছে?

স্ত্রীপুরুষ ভেদে শিক্ষার তারতম্য :—স্ত্রী ও পুরুষের যেমন দেহগত স্বাভাবিক পার্থক্য আছে, সেইরূপ মনোগত পার্থক্যও যে না আছে এমন নহে। পুরুষের মনোভাব ও নারীর মনোভাব এবং তাহাদের প্রকাশ-রীতি অনেক সময় ঠিক একরূপ নয়। বুদ্ধিবিষয়েও স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। রমণী যাহা বুঝে, তাহা চট্ করিয়া বুঝে; পুরুষের পক্ষে তাহা বুঝিতে কালবিলম্ব হয়। কোন বিষয়ে ধীর-ভাবে, বুদ্ধিপ্রয়োগ দ্বারা চিন্তা করিয়া দেখা নারীর পক্ষে একরূপ অসম্ভব বলিলেই হয়। সে যুক্তিপ্রমাণ না পাইয়া একেবারে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়। এই কারণে নারী কোন বিষয়ে যত শীঘ্র সিদ্ধান্ত করিতে পারে, পুরুষ তাহা পারে না। রমণীর ইচ্ছা-শক্তি ও মনের শক্তি পুরুষের তুল্য প্রখর নহে। স্ত্রীপুরুষের শরীর ও মনে যদি এতটা পার্থক্য, তাহা হইলে এক প্রকার শিক্ষাপ্রণালী স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই পক্ষে কি করিয়া উপযোগী হইতে পারে? পুরুষোচিত শিক্ষা দিলে, নারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহৎ গুণগুলি কখনও পরিস্ফুট হইতে পারে না। নারী স্ত্রী-প্রকৃতি পুরুষকে ও পুরুষ পুরুষ-প্রকৃতি নারীকে ভাল-বাসিতে পারে না। শিক্ষাকালে এ কথাটি ভুলিলে চলিবে না। যে শিক্ষায় নারীর নারীত্ব নষ্ট হইবার সম্ভব, তাহা নারীর পক্ষে কদাপি উপযোগী হইতে পারে না। পুরুষের মত নারীর দেহের ও মনের পরিণতি করিতে চেষ্টা করিতে গেলে, তাহার স্বাভাবিক লালিত্য ও সুকুমার ভাবটি নষ্ট হইয়া যায়। অতএব পুরুষোচিত ব্যায়াম ও মানসিক শ্রম নারীর পক্ষে ব্যবস্থা করা কখনও উচিত নয়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী।

চন্দ্রকান্ত প্রসঙ্গ

(১২)

জার্ম্মাণ পণ্ডিত 'দয়সেন'

আমরা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের অধ্যয়নের কথার উল্লেখ করিয়াছি। তিনি সারা জীবন অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অগাধ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। একবারও যাহা অধ্যয়ন করিতেন, তাহার তাৎপর্য্য মাত্রই তাঁহার স্মরণ থাকিত এমন নহে। তাঁহার অধীত গ্রন্থের সারগর্ভ পংক্তিগুলি অবিকল তাঁহার অভ্যাস্ত হইয়া যাইত। জীবনে কত হাজার হাজার পুস্তক পাঠ করিয়াছেন, কিন্তু কোন্ পুস্তকের কোন্ স্থানে কোন্ কোন্ বিষয়ের আলোচনা ও মীমাংসা করা হইয়াছে, তর্কালঙ্কার মহাশয় সে সকল বিষয়ের প্রসঙ্গমাত্র যথাযথভাবে সে সকল বলিয়া দিতে পারিতেন। বাস্তবিক এরূপ মেধাশক্তি-সম্পন্ন লোক অতি অল্পই দেখা গিয়া থাকে। বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ জার্ম্মাণ পণ্ডিত 'দয়সেন' (Deussen) ভারত-ভ্রমণ উপলক্ষে কলিকাতা আসিয়াছিলেন। অধ্যাপক 'দয়সেন' ভারতের নানাস্থানে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন, এবং এরূপ সম্মিলন তাঁহার ভারত-

শ্রবণের প্রধান অঙ্গ বলিয়া তিনি মনে করিতেন। ভারতের রাজধানী কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক 'দয়সেনের' শুভাগমন হইলে, প্রিন্সিপাল ন্যায়রত্ন মহাশয় ছাত্র ও অধ্যাপকমণ্ডলীর সহিত সসম্মানে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। অধ্যাপক 'দয়সেন' সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাইয়া তেমন তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। বাঙ্গালার উচ্চশ্রেণীর পণ্ডিত-মণ্ডলীর সহিত বিশেষরূপে সম্মিলিত হইবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। ইহার পর একদিন, বোধ হয় অধ্যাপক পি, কে, রায় মহাশয়ের ভবনে, একটি সান্ধ্য-সমিতির অনুষ্ঠান হয়; তাহাতে অধ্যাপক 'দয়সেনের' সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনার জন্য কলিকাতাবাসী উচ্চশ্রেণীর সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের আহ্বান হইয়াছিল। উক্ত পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে মহাত্মা তর্কালঙ্কার মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন। যথাকালে অধ্যাপক 'দয়সেনের' সহিত বাঙ্গালার উচ্চশিক্ষিত পণ্ডিত ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত-গণের সম্মিলন হইল। শুনা যায়, অধ্যাপক 'দয়সেন' ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। বাঙ্গালী পণ্ডিতগণের সহিত তিনি অনেকক্ষণ ভারতীয় কাব্য, নাটক, ও অলঙ্কারশাস্ত্রের অতি সারগর্ভ সমালোচনা করেন। অধ্যাপক 'দয়সেন' বাঙ্গালী পণ্ডিতদিগের শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় পাইয়া কেবল নিজেই বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন এমন নহে, ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে সুদূর জার্ম্মাণবাসী পণ্ডিতের অনুরাগ, পাণ্ডিত্য ও গবেষণার চরম দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সেদিনকার সভায় উপস্থিত পণ্ডিত-মণ্ডলীর সকলকেই স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। আমরা শুনিয়াছি, সেদিন-কার সভায় মহাত্মা তর্কালঙ্কার মহাশয়ও তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। অনেকক্ষণ আলোচনার পর অমর কবি কালিদাসের অমর কীর্ত্তি মেঘদূতের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিলেন। অধ্যাপক 'দয়সেন' শতমুখে তাহার সুখ্যাতি করিয়া এমন কতগুলি কথা বলিয়াছিলেন, যাহা বাস্তবিকই অভিনব তত্ত্ব বলিয়া পরিগৃহীত হইবার যোগ্য। অধ্যাপক 'দয়সেন' পরের দেশের পরের ভাষায় রচিত পরের সাহিত্যে এত পরিশ্রম করিয়াছেন, এত অনুশীলন করিয়াছেন যে, সেরূপ অনুশীলন যে কোনও ভারতীয় পণ্ডিতের পক্ষে অতিমাত্র গৌরবাবহ বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে।

'মেঘদূতে'র প্রসঙ্গে অধ্যাপক 'দয়সেন' উপস্থিত পণ্ডিত-মণ্ডলীর প্রতি একটী প্রশ্ন করিয়াছিলেন। প্রশ্নটি এইরূপ, মেঘদূতের—

* * * * *

"গর্ভাধানক্ষণপরিচয়ান্নূনমাবদ্ধমালাঃ।
সেবিষ্যন্তে নয়ন-সুভগং খে ভবন্তং বলাকাঃ" ॥

এই শ্লোকার্থের মূলীভূত কোনও প্রমাণ আছে কি না? কালিদাস বলিতেছেন, বর্ষার নবজলধর যখন আকাশমণ্ডল ছাইয়া ফেলে, তখন বলাকা-শ্রেণী গর্ভাধানের সময় উপনীত হইয়াছে মনে করিয়া, সেই মেঘমালার নীচে আনন্দে বিহার করিয়া থাকে। অবশ্য এরূপ প্রসিদ্ধি না থাকিলে কালিদাস তাহা বলিতে পারিতেন না। সেইরূপ প্রসিদ্ধির সমর্থনকল্পে কোনও প্রামাণিক বাক্য কোথাও পাওয়া যায় কি না, অধ্যাপক 'দয়সেন' তাহা জানিতে চাহিয়াছিলেন। প্রশ্ন শুনিয়া প্রায় সকলেই স্তম্ভিত হইয়াছিলেন; ইংরাজী শিক্ষিত সুপণ্ডিতগণ ভাবিতেছিলেন, বুঝি বা আজ বাঙ্গালার গৌরব-চূড়া ভূমিসাৎ হইতে চলিল! সেই সময়ে মহাত্মা তর্কালঙ্কার মহাশয় মেঘদূতের মল্লিনাথের ধৃত শ্লোকার্দ্ধ আবৃত্তি করিলেন,

"গর্ভং বলাকা দধতেঽভ্রযোগাৎ
নাকে নিবদ্ধাবলয়ঃ সমন্তাৎ"—।

অধ্যাপক 'দয়সেন'ও উহা আবৃত্তি করিলেন—এবং বলিলেন, কোনও মূলগ্রন্থে এরূপ প্রসিদ্ধির কথা সমর্থিত হইয়াছে কি না? এইবার তর্কালঙ্কার মহাশয় ঈষৎ হাসিয়া বেদান্ত দর্শনের ২য় অধ্যায়ের ১ম পাদের ২৫শ সূত্র "দেবাদি-বদপি লোকে'র শাঙ্কর ভাষ্যের কিয়দংশ আবৃত্তি করিলেন।

* * "বলাকাচ স্তনয়িত্নুরবশ্রবণাদ্ গর্ভং ধত্তে, পদ্মিনীচ চেতনপ্রযুক্তা সত্যচেতনেনৈব শরীরেণ সারান্তরাৎ সারান্তরমুপদর্পতি বল্লীব বৃক্ষং নতু স্বয়মেবাচেতনা সারান্তরোপসর্পণে ব্যাপ্রিয়তে"।

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের আবৃত্তি শুনিয়া অধ্যাপক 'দয়সেন' একান্ত মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন; অবশ্য শাঙ্করভাষ্য অনেকেই অধ্যয়ন করিয়াছেন, কিন্তু কার্য্যকালে কাহারও তাহা স্মৃতি-পথে উদিত হয় নাই। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের একটী বিশেষ শক্তি ছিল যে, যখন যাহা পড়িতেন তাহা প্রায় বিস্মৃত হইতেন না। অধ্যাপক 'দয়সেন' অন্য একদিন কথা-প্রসঙ্গে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নাম উল্লেখ করিয়া বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন যে, "আমি এই একজন পণ্ডিতকেই বিশেষভাবে জানিতে পারিলাম, যিনি ভারতীয় সংস্কৃত শাস্ত্র রীতিমত অনুশীলন করিয়াছেন"। বোধ হয়, ইহা প্রায় উনিশ কুড়ি বৎসরের কথা।

এখানে এটুকু বলিয়া রাখা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, তর্কালঙ্কার মহাশয় যে শাঙ্করভাষ্যটুকুর জন্য জার্ম্মাণ পণ্ডিত দয়সেনের নিকট প্রভূত সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, প্রকৃত পক্ষে সেটুকুর দ্বারা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পাণ্ডিত্যের পরিমিতি হইতে পারে না; ইহা দ্বারা আমরা এটুকুমাত্র বুঝাইতে চাহি যে, তিনি ভারতীয় সংস্কৃত শাস্ত্রের একজন অনন্যনিষ্ঠ সেবক ও উৎকৃষ্ট উপাসক ছিলেন; তিনি যেমন অসংখ্য শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তেমনি সে সকল গ্রন্থের সারমর্ম্ম ও আবশ্যক অংশগুলি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। অধ্যাপক দয়সেনও তাঁহার সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা করিয়া এটুকুই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এবং সেই জন্যই এত বড় প্রশংসা-বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন। আমরা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মৃত্যুশয্যাতেও তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তির পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইয়াছি। এমন কি, জীবনের প্রথম অবস্থায়ও যে সকল গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন, বার্দ্ধক্যে তাহার অনেক অংশ অনায়াসে আবৃত্তি করিতে শুনিয়াছি। বাস্তবিক এমন ভাবে শাস্ত্রসেবা করিতে বড় কাহাকেও দেখা যায় না। যাহা হউক, আমরা এসকল কথার আলোচনা ইতঃপূর্ব্বেও করিয়াছি। সংসারে যাঁহারা যে বিষয়ে বড় হন, তাঁহাদিগকে চিরজীবন তদ্গতচিত্তে সেই বিষয়েরই অনুশীলন করিতে হয়। সেই অনুশীলনের ফল পরিণত বয়সে পৃথিবীর জন্য সংস্থাপিত হইয়া থাকে। মহাপুরুষগণ নিজেদের চির জীবন অনুশীলন বা তপস্যার ফল পরবর্ত্তীদিগের জন্য রাখিয়া যান। আর রাখিয়া যান—'যাবচ্চন্দ্র দিবাকর' অক্ষয় কীর্ত্তি। তর্কালঙ্কার মহাশয়ও আমাদিগের জন্য তাঁহার সারা জীবন-ব্যাপী তপস্যার ফল নানা গ্রন্থ-ভাণ্ডারে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, আর সম্মুখে রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার কর্ম্ম ও ধর্ম্মময় জীবনের অত্যুজ্জ্বল আদর্শ। জার্ম্মাণ পণ্ডিত দয়সেন যাঁহার সঙ্গে কএক ঘণ্টা মাত্র শাস্ত্রালাপ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহার দেশবাসী পণ্ডিতগণ এক সময় সেই মহাত্মা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নানা বিষয়ক সংস্কৃত মৌলিক রচনা অবলোকন করিয়া সহস্রমুখে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। ভট্ট মোক্ষমূলর প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য দর্শনে অতিমাত্র বিস্মিত হইয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীকৃষ্ণ সিদ্ধান্ত শাস্ত্রী।

বঙ্গবাণী *

(গ্রন্থ-পরিচয়)

সাহিত্যিক হিসাবে বর্ত্তমানে বঙ্গ-সাহিত্যে শশাঙ্কবাবুর স্থান অতি উচ্চ। তাঁহার প্রণীত এই গ্রন্থখানির আবির্ভাব বঙ্গ-সাহিত্যে একটা অতি বড় ঘটনা বলিয়া মনে হয়।

এই গ্রন্থে প্রথমখণ্ডে, 'বঙ্গ-সাহিত্যের জাগরণ', 'বঙ্গ-সাহিত্যের বিকাশ', 'বাঙ্গলা ছন্দ'; এবং দ্বিতীয় খণ্ডে, 'কাব্যের অভ্যন্তরে হেমচন্দ্র', 'নবীনচন্দ্রের কবিধর্ম্ম', 'বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার অন্তর্জ্জীবন,' কালীপ্রসন্ন ঘোষ ও বাঙ্গলা গদ্য,' 'স্বদেশে দ্বিজেন্দ্রলাল,' এবং 'ইউরোপে রবীন্দ্রনাথ,' এই কয়েকটি প্রবন্ধ স্থান

---

* বঙ্গবাণী—শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন বি, এল,—প্রণীত। ঢাকা, এলবার্ট লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। মূল্য, সাধারণ ২৲ টাকা, বাঁধাই, ২৷৷০ টাকা।

পাইয়াছে। প্রথম দুই প্রবন্ধে, প্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বঙ্গ-সাহিত্যের প্রকৃতির পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম প্রবন্ধে, প্রথমতঃ বঙ্গ-সাহিত্যের আর্য্য আদর্শজাত প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া, পরে মুসলমান প্রভাব বর্ণিত হইয়াছে; অতঃপর রামমোহন রায়ের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া, ইংরাজের প্রভাবে বিশ্ব-সাহিত্যের সহিত পরিচয় স্থাপন করতঃ, বঙ্গ-সাহিত্য কি প্রকারে জাগরণ লাভ করিয়াছে, সেই ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তের বিবরণে প্রবন্ধ সমাপ্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রবন্ধে, এই আধুনিক ও বিশ্বমুখ আদর্শের নানা সম্পদ বঙ্গ-সাহিত্য কি প্রকারে আয়ত্ত করিয়াছে ও করিতেছে, কয়েকটি বিশিষ্ট লেখকের সাহিত্য-কৃতি অবলম্বন করিয়া, সাধারণ ভাবে তাহারই একটা আভাষ দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠরথিগণের রচনার আলোচনা দ্বারা এই বিষয়ের আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যান করা হইয়াছে। এই সংক্ষিপ্ত বর্ননা হইতেই বুঝা যাইবে যে, শশাঙ্কমোহন সমালোচনা-সূত্রে এই গ্রন্থে বঙ্গ-সাহিত্যের একখানি উচ্চ অঙ্গের ইতিহাসই প্রদান করিয়াছেন।

গ্রন্থের বিষয় সম্বন্ধে এতদ্ব্যতীত আর কিছু বলিবার সংপ্রতি আমাদের উপায় নাই। কারণ, গ্রন্থখানি বিপুলায়তন—দুই খণ্ডে পাঁচ শত পৃষ্ঠায় সমাপ্ত; তদুপরি সর্ব্বত্র সারবান বিষয়ের আলোচনা, এবং সেই আলোচনা একেবারেই চুটকি রকমের নহে। এরূপ অবস্থায় এই গ্রন্থের উপযুক্ত সমালোচনা এস্থলে সম্ভবপর নহে। অতএব, আমরা কেবল কয়েকটি সাধারণ কথায় বর্ত্তমানে ইহার প্রকৃতির পরিচয় মাত্র দিয়াই ক্ষান্ত হইব। ভবিষ্যতে সুযোগক্রমে গ্রন্থাধিকৃত বিষয়াদি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিবার বাঞ্ছা রহিল।

বঙ্গ-সাহিত্যে সমালোচনা এখনও মর্য্যাদার স্থান অধিকার করিতে পারে নাই বলিয়া একটা বোধ হয় যথার্থ অভিযোগই রহিয়াছে। ভূদেব, বঙ্কিম, চন্দ্রনাথ, কালীপ্রসন্ন, দীনেশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি নানারূপে উৎকৃষ্ট সাহিত্য সমালোচনা করিয়া থাকিলেও, যাহাকে উচ্চাঙ্গের সমালোচনা বলে—যাহার আবির্ভাবে ইউরোপে ও আমেরিকায় কাব্য, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতির ন্যায়, সমালোচনাও সাহিত্যের একটা স্বতন্ত্র শ্রেণীর স্থান অধিকার করিয়াছে; যেরূপ সমালোচনা সম্পর্কে সাহিত্যের মধ্য দিয়া জাতীয় জীবনের বিশেষত্বের বোধ জন্মে, বিশ্ব-সাহিত্যের সহিত পরিচয় সংস্থাপিত হয় এবং অনির্ব্বচনীয় রহস্যময় বিশ্বরসের অনুভব সহজ হয়; এবং এই সকলের ফলে শিক্ষা ও সংস্কারগত সংকীর্ণতা ঘুচিয়া গিয়া, মানব-মনের পরিধি বিস্তৃত ও সাহিত্য-রুচি উদার হইয়া উঠে, ও সমালোচনা মৌলিক সাহিত্যসৃষ্টির গৌরব লাভ করে—বাস্তবিক পক্ষে এ পর্য্যন্ত বঙ্গ-সাহিত্যে তাহার অত্যন্ত অভাবই ছিল বলিতে হইবে। শশাঙ্কমোহন সেই অভাব পূরণ করিলেন।

সাহিত্যের প্রকৃতি, সমালোচনার আদর্শ, এবং গ্রন্থকারের নিজের বিশ্বাসাদর্শ সম্বন্ধে তাঁহার মত গ্রন্থের বহু স্থানে এবং ভূমিকায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। শশাঙ্কবাবুর সকল সিদ্ধান্ত টিঁকিতে পারে কি না, উহাদের পরস্পর সঙ্গতি সহজেই বোধগম্য কি না, বিশ্ব-সাহিত্যের সমালোচনার ইতিহাসে শশাঙ্কমোহন, সাঁৎবু (Saint-Beuve), তাঁ (Taine), ব্রুণেতিয়ের (Brunetiere), ম্যাথু আর্নল্ড (Mathew Arnold), বা হার্ডার—হেগেল (Herder—Hegel) যুগের জার্ম্মাণ সমালোচকগণের, কোন একজনের শিষ্য, না উহাদের সকলের মতের ভালমন্দের সমষ্টির ফল, বা উহাদের সকলের সারভাগ মন্থনপূর্ব্বক উচ্চতর অভিনব আদর্শের স্রষ্টা, এইক্ষণে তাহার বিচারের অবকাশ নাই। কিন্তু এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার সমালোচনা সাহিত্যের মৌলিক সৃষ্টি, এবং সাহিত্যের ভিতর দিয়া মানুষের পরিপূর্ণ উদার শিক্ষার উপায়স্বরূপ হইবে। যে 'অশিক্ষা ও কুশিক্ষার' ফলে বাঙ্গলার সাহিত্যসেবী সাহিত্যের ক্ষেত্রেই সংকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছেন, এবং বিশ্বোদার সাহিত্য-রুচির অভাববশতঃ বঙ্গসাহিত্য যেরূপ অনুচিত কলহ-কোলাহলে সাহিত্য-বিষয়ে বধিরতা ও সাহিত্য-সেবকের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞার সৃষ্টি করিতেছে, এইরূপ গ্রন্থের পাঠ ও বহুল আলোচনাই অজ্ঞতা ও বিভ্রমজনিত সেই বিপদ হইতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায়।

তবে যিনি এই পাঠকার্য্য ও আলোচনায় অগ্রসর হইবেন, আজকালকার দিন বলিয়া তাঁহাকে এক সতর্ক

করিয়া দেওয়া প্রয়োজনীয় মনে করি। এই গ্রন্থের প্রত্যেক প্রবন্ধের শিরোদেশে প্রবন্ধের সার-সংক্ষেপ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তদ্দৃষ্টে মধ্যবর্ত্তী কোন স্থলে আরম্ভ করিলেও, সাহিত্যের তত্তদ্ বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া যাইবে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত রূপে গ্রন্থপাঠের সম্যক্ ফল লাভ করিতে হইলেই, গ্রন্থে আদ্যোপান্ত মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করার প্রয়োজন হইবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এই পুস্তক চুটকিতে পূর্ণ নহেটু ভাব ও ভাষা বিষয়ে শশাঙ্কবাবুর একটা বিশিষ্টতা আছে। সর্ব্বত্র সারবান বিষয়সকল সমুচিত ভাষায় আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার বর্ণিত বিষয়টির উপর নানাদিক হইতে এত আলোকপাত করিয়াছেন যে, প্রথম পাঠার্থী ইহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া আনন্দলাভ করিতে থাকিলেও, তাহার মনশ্চক্ষু ঝলসিত হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। বাক্য-রীতির দিক হইতেও বলা আবশ্যক যে, আকারে বৃহৎ হইলেও, গ্রন্থখানি বাক্যের জঞ্জালে পূর্ণ নহে। যেখানে যাহা উচিত, সেইরূপ শব্দের পর শব্দ বসাইয়া, মনোগত ভাবকে ভাষায় অনুরূপ আকার প্রদান করা হইয়াছে। এই সকল কারণে গ্রন্থখানি একাধিক বার পাঠ করিতে হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে পাঠকেরও চিন্তা করিতে হইবে।

শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের ইহাই বিশেষত্ব, এবং বঙ্গদেশের বর্ত্তমান অবস্থায়, কেবল সাহিত্যের দিক দিয়া নহে, অপর নানা দিক দিয়াও এরূপ গ্রন্থের প্রচার অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। কারণ, আজকাল যে কেবল সাহিত্যক্ষেত্রেই আগাছা, পরগাছা, ও বড় জোর তৃণ-রাশির অনায়াস-সম্ভাত উদ্ভব হইতেছে, তাহা নহে—দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, রস-রচনা প্রভৃতি সাহিত্যের সকল দিকেই স্বল্প-সন্তুষ্ট ও কোনরূপ কষ্টা-সহিষ্ণু একটা ভাব আমাদের সাহিত্যকর্ম্মেই যে দেখা দিয়াছে, তাহাই নহে;—পরন্তু বাঙ্গালীর সমগ্র জাতীয় জীবনে এইরূপ আদর্শ-ধারণায় অনিচ্ছা, ও শ্রমবিমুখতা বিরাজ করিতেছে। শুইয়া শুইয়া বারেকমাত্র পাঠে যে বিষয়ে সুখ না পাই, বা না বুঝি, তাহা পাঠ করি না; চুটকিকেও মনোরম করিতে হইলে, যেটুকু প্রয়াসের প্রয়োজন, রচয়িতা তাহাও অবলম্বন করে না। কেবল ইহাই নহে; পরন্তু, যে কার্য্যে ধৈর্য্যের প্রয়োজন, কোনরূপ কঠোরতার সহিত পরিচয় ঘটিবে, তাহাই আমরা ছাড়িয়া দিই। বাঙ্গালী বালক স্কুলকলেজে কোনরূপে পাশ করিতে পারিলে, তারপর কোনরূপে একটি চাকুরি জোটাইতে পারিলে, পরে কোনরূপে যাহা জুটিয়াছে তাহা বজায় রাখিতে পারিলেই বাঁচে, এবং অভিভাবকের সন্তোষবিধান করিতে পারে;—কোনরূপ ব্যক্তিত্ব নাই, কোনরূপ উন্নতি করিবার ইচ্ছা নাই, উন্নতির জন্য বিন্দুমাত্র কায়িক বা মানসিক কষ্ট সহ্য করিবার প্রবৃত্তি নাই, কিসে উন্নতি হইবে তাহার আদর্শ ধারণা করিবার উপযোগী চিন্তাশক্তি পর্য্যন্ত নাই। এরূপ দিনে শশাঙ্কবাবুর 'বঙ্গবাণীর' ন্যায় গ্রন্থের প্রচার আবশ্যক। ইহাতে অন্ততঃ সাহিত্যক্ষেত্রে চিন্তাশক্তির প্রয়োগ অপরিহার্য্য করিয়া তোলে, ব্যক্তিত্বকে জাগাইয়া দেয়—যেহেতু এরূপ গ্রন্থ চিন্তা করিয়া পড়িতে হইবে, এবং যে পাঠকের যত শিক্ষাদীক্ষা, তিনি সেই পরিমাণে লাভবান হইবেন। শশাঙ্কমোহন যাহা বুঝিয়াছেন, তাহা নির্ভীকভাবে বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই; মন খুলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন, আবার স্রোতে ভাসিয়া স্তুতিগানও করেন নাই;—এক রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে যে, তিনি কোনরূপে কাজ সারিয়া ফাঁকি দিবার চেষ্টা করেন নাই। তাঁহাকেও কিন্তু ফাঁকি দেওয়ার যো নাই। অন্ততঃ চিন্তার জগতে সারপদার্থের সাক্ষাৎকার লাভের জন্য, কেবল উপরেই না ভাসিয়া, কিছু আয়াস স্বীকার করিতেই হইবে। হয় ত জাতীয় জীবনের এই বিক্ষিপ্তাবস্থায় এক দিকে সত্যসন্ধ হইলে, অন্যান্য দিকেও তাহার প্রভাব বিস্তৃত হইতে পারে। যাহা হউক, ততদূর না হইলেও, এমন গ্রন্থের প্রচার হইলে, অন্ততঃ আমাদের বাঙ্গালা দেশের গণ্ডুষ-জল-সঞ্চারী সাহিত্য-সফরীগণ সরস্বতীর বর-প্রভাবে একেবারে রোহিতে পরিণত হইতে না পারিলেও, তাহাদের ফরফরাণী হইতে বিরত হইতে পারে।

ভাষার দিক দিয়া শশাঙ্কমোহনের আরও মৌলিকত্ব আছে। উহার সবিস্তারে উল্লেখের আপাততঃ স্থান নাই; তথাপি এটুকু বলিয়া রাখিতেই হইবে যে, সার্ রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুর, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি বর্ত্তমান ভাষা-শিল্পীগণের ন্যায় শশাঙ্কমোহনের ভাষারও একটা গৌরবময় স্বকীয় ভঙ্গী আছে। তাঁহার সহজলব্ধ শব্দ-সম্পদেরও এই বিশেষ গুণ আছে যে, যখন যে ভাব এবং ভাবের যত সূক্ষ্মসূত্রই প্রকাশিত করার প্রয়োজন হউক না কেন, তিনি ঠিক তদনুযায়ী শব্দটি বানাইয়া লইতে পারেন। এই প্রকার শব্দসমূহের নির্ম্মাণদক্ষতাগুণে ও উহাদের বিন্যাসকৌশলে শশাঙ্কবাবু ভাষাকে যথেচ্ছ খেলাইয়া দিতেছেন, এবং বাঙ্গালা ভাষার এক অভূতপূর্ব্ব শব্দসম্পত্তি ও প্রকাশিকা শক্তির পথ দেখাইয়া দিতেছেন। আমাদের আরও বিশ্বাস হয় যে, অতঃপর যাঁহারা সমালোচনা-কার্য্যে ব্রতী হইবেন, তাঁহারা শশাঙ্কমোহনের লেখা হইতে বাছিয়া বাছিয়া শব্দসম্ভার ব্যবহার করিবেন, এবং এইরূপে সাহিত্যের একটি দিকের শব্দ যোগাইয়া দিয়া, "বঙ্গবাণী" এতদ্বিষয়ে আদি-গ্রন্থের মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইবে।

কবিতা

(রসেটী হইতে)

(১)

যা'ক শুকিয়ে কোমল কুমুদ,
রক্ত গোলাপ যত ;
সব ফোটা ফুল পড়ুক ঝরে
সুপ্ত শিশুর মত।

যাও হেমন্ত, যাও চলে যাও,
আসুক কঠোর শীত ;
শ্যামল জগৎ ধূসর ক'রে
উঠুক শোকের গীত।

ছুট্‌ছে জীবন মরণ পানে—
ফুরিয়ে যাবার তরে ;
সকাল গেলেই সকাল পাব
সুখের দিনটি ফিরে।

(২)

তারাগুলি যদি স্বরগ হইতে
পড়িত খ'সি,
ফুলগুলি যদি ফুটিত গগনে
মধুর হাসি',
গগন তবুও আগেরই মতন
উজল র'ত,
জগতে তবুও শত রূপধারা
বহিয়া যেত।

গগনের পরী আসিত নামিয়া
মরত তলে,
সাজি ভ'রে তা'রা তারকা-কুসুম
লইত তুলে।

আমরাই শুধু রহিতাম চেয়ে
কুসুম আশে,
ফুলগুলি র'ত মেঘের ওপার
সুদূর দেশে।

(৩)

মেঘ-স্তর হতে অনন্ত উপরে
বায়ুও যে দেশে যেতে না পারে,
তারাগুলি সেথা আকাশের গায়
না জানি কি কাজ সাধন করে।

সকলেই নিজ আলোতে উজল,
ঘুরিতেছে সারা জীবন ভরা ;
কর্ত্তব্য তাদের উঠা আর ডুবা,
বিধির বিধান পূরণ করা।

যূথিকা—

৮৫৩। মাইন্‌ষের পরাণ ঘড়ীর কল।
একবার বিগড়াইলে বড় জঞ্জাল॥

৮৫৪। ভাই, দুধ কেমন?
ধলা।
সে কেমন?
বগের মতন।
বগ কেমন?
কাচির মতন।
কাচি কেমন?
এই দেখ। (কাচি দেখান)
(হাতড়াইয়া) অঃ, দুধ তবে ব্যাকা॥ *
বগ—বক।

৮৫৫। যা' না কাটে ধারে।
তা' কাটে ভারে॥

৮৫৬। ধারে না কাটে ত
ভারে কাটে।

৮৫৭। কারও কাটে ধারে।
কারও কাটে ভারে॥

৮৫৮। ভাত এমন চিজ্
খোদার থাইকা উন্নিশ বিশ॥
থাইকা—হইতে।
চিজ্—দ্রব্য।

৮৫৯। আগেত হাতীর পাঁচ পাই দেখায়,
শেষে হুড়াই গুটায়॥
হুড়া—শুণ্ড।

৮৬০। যার দৌড় বন্দর।
তার দৌড় তন্দর॥

* অন্ধের দুধ চিনিতে কথোপকথন।

৮৬১। না আছে নাই কাজ।
বইয়া বইয়া খই ভাজ॥
বইয়া—বসিয়া।

৮৬২। এমন কপালের কপাল।
গাই বিয়াইলেই আবাল॥
গাই—গাভী।

৮৬৩। উল্টা বুঝলি রাম।

৮৬৪। কই রাম রাজা হয়।
আর কই রাম বনে যায়॥

৮৬৫। সুখে থাক্‌তে ভূতে কিলায়।

৮৬৬। হাতুকে নাও।
হাতুকে ডিঙ্গি॥

৮৬৭। দেখন্ শোনন্ কওয়ন্ নাই।
সাম্‌নের খাওয়া ছাড়ন্ নাই॥

৮৬৮। ভোরের সাধা ঠেল্‌লে।
হারা দিনে না মিলে॥
হারাদিনে—সারাদিনে।
ঠেল্‌লে—উপেক্ষা করিলে।

৮৬৯। রাজার রাজ্যি কি
আওরে খাইছে?

৮৭০। তোমার খুটীর তলে
আমার ঘর না।

৮৭১। বাত্তি নিব্বার কালে।
দপ্ কইরা জ্বলে॥

৮৭২। তিন মঙ্গলে বৃহস্পতি।

৮৭৩। সাইবের পাতে খানা খাইছি,
আমি কি হনুরে!
সাইবের—সাহেবের।

৮৭৪। কলির বাওন, ধোরা সাপ,
যে না মারে তারও পাপ॥
বাওন—ব্রাহ্মণ।

৮৭৫। সে গুড়ে বালি।

৮৭৬। হাতের আলিস্যে দাতে ছাতা।

৮৭৭। বুড়াকালে যার মরে মাউগ্,
সে জ্বালায় গা মাইগ্যা খাউক॥
মাউগ—স্ত্রী। মাইগ্যা—মাগিয়া।

৮৭৮। মাথার উকুনেই মাথা খায়।

৮৭৯। কালা বাওন, কটা শূদ্র,
আর কুত্তা গর্দান্যা মুসলমান,
বিশ্বাস কল্লে থাকে না সম্মান॥

৮৮০। নাক থাকুলে স্যান্ হিনাইর আদর।
স্যান্—তবে ত।
হিনাই—নাসারন্ধ্রে নিঃসৃত কফ।

৮৮১। ভাত হইল পরাণের বড়ী।
খাইয়া ফালা তাড়াতাড়ি॥

৮৮২। আশায় কামাইয়া দাড়ী।
কইও, মোল্লাজী গেছেন বাড়ী॥

৮৮৩। বুড়ার বিয়ার দানসামগ্রী।
আম কাষ্ঠ আর ঝাড়ুর বাড়ী।
বাড়ী—আঘাত।

৮৮৪। অন্ধে আর চায় কি?
চায় তার দুই চোক।

৮৮৫। নিজের নাই মোটে উস্ (হুঁস্)।
তবু পথেরই দোষ॥

৮৮৬। যে খাইছে, খাইয়া গেছে,
তার কি আর কথা আছে?
সে যা গেছেই গেছে।

৮৮৭। ফাকি দিয়া টাকী লড়ায়।

৮৮৮। হাড়াইয়া তাড়াইয়া কাগুণ গোরু।

৮৮৯। সেদিন আর কি আছে।
সেদিন ত মাছেই খাইছে॥

৮৯০। কামের নামে ঠন্ ঠন্,
ফাকের মন্দ।

৮৯১। মান্য কল্লে কল্পতরু।
না হইলে দাম্ড়া গরু॥

৮৯২। থাকে লক্ষ্মী, যায় বালাই।

৮৯৩। জয়তার নামে ফয়তা।

৮৯৪। দেখ দেইখা বুড়া।
মাছ ধর্ত্তে ঠেটার গুড়া॥

৮৯৫। সেই ছালায় সেই ধান আটে।
তবু লাথিটার ঘায় আগে
ছালাটা ফাটে॥

৮৯৬। না দেওয়নের ভাইল।
আইজ্ আর কাইল্।

৮৯৭। সন্তরা খাইতে তেল না পায়।
আবার তেল দা বাত্তি আঙ্গায়॥
বাত্তি—বাতি। আঙ্গায়—জ্বালায়।

৮৯৮। ভাত খাইতে ভাত নাই,
কথার চাটাম্বরী।
* দিতে তেনা নাই,
তার বাক্স ভরা সাড়ী॥

৮৯৯। মাইয়া বেচা ট্যাকা।
গোমাংসের চাকা॥

৯৫০। হাটুতে গেলে আছাড় পরেহু।

৯০১। যে শ্লোর আউক।
তার মরে মাউগ॥

৯০২। আইছেন জামাই নিবেন ঝি।
এর বেশী আর কর্‌বেন কি?

৯০৩। আগে দেয় কত কোল।
শেষে দেখায় বুইড়া আঙ্গুল॥

৯০৪। ধানের মধ্যে খামা।
ইষ্টের মধ্যে মামা॥

৯০৫। খোদার এমন কাণ্ড।
নাইকলের ভিতর জল॥
নাইকল = নারিকেল॥

৯০৬। দেখ বউ, এ কদু কুটন না।
খোদা লইয়া খেলা॥
কদু = লাউ॥

৯০৭। কাঁচা খাউকা দেবতা॥

৯০৮। বাঘের ল্যাজ দা কান খাউজ্জায়,
আর উদ্দিশ পায় না॥
খাউজ্জায় = চুল্‌কায়।
উদ্দিশ = টের।

৯৯০। সাপ লইয়া খেলা।

৯১০। লড়াইতে গেলে হয়রান হইতে হয়।
লড়াইতে = দৌড়াইতে।

৯১১। কাপড়ই নাই,
আবার কাছা।

৯১২। কাছা ছাড়া পুরুষ।

৯১৩। ডাইনের দিন,
তাই সাইরা গেলি।
সাইরা = সারিয়া

৯১৪। শুভস্য শীঘ্রং,
অশুভস্য কালহরণং।

৯১৫। চেষ্টার অসাধ্য কাজ নাই।

৯১৬। সৎকর্ম্মে পাষণ্ডের অন্ত কি।

৯১৭। ঘসিতেং পাথরও ক্ষয় পায়।

৯১৮। পাওয়া দিব্ব দেওয়া কি
বেইচ্চা ফেল্লে করবা কি?
দিব্ব = দ্রব্য বেইচ্চা = বেচিয়া

৯১৯। চোক থাক্‌তে দিন কানা।

৯২০। পাওয়াটা দেওয়া নাই।
বেইচা ফেল্লে লাভ নাই॥

৯২১। বুড়া কালে যেন কুড়া
কুড়া = কৌতুক॥

৯২২। যতই কও আর যাই কই।
আসল কথার ভুল নাই॥

৯২৩। দশরথ!
তাউত্তা ছিড়্‌ড়া পট্টরৎ।

৯২৪। বাতির কোল আঁধার।

৯২৫। না খাইলা যাও।
গিয়া কলা খাও॥

৯২৬। যাচ্‌ত যা।
না যাচ্‌ত তেল দা চিড়া খা।

৯২৭। পেটের টানে না খাইলে।
জোরে বলে আর কত চলে॥

৯২৮। তৃষ্ণায় না খাইলে।
খাওয়াইবে কে?

৯২৯। জোরে বলে কে কি গিলে।

৯৩০। শিকলের বান যদ্দিন।
পরানের টান তদ্দিন।

৯৩১। ধান গাছে কয় খান তক্তা।

৯৩২। যে যত সাউদ তার পায়ে তত দাউদ॥

৯৩৩। পেটে নাই গাদি।
তারে দেও সাধি॥
সাধি=সাধ।

৯৩৪। কি দেখ্‌লাম্‌ কি হইল।
ছাতু মাখ্‌লাম্‌ গু হইল॥

৯৩৫। টাট্‌কা কড়ির আট্‌কা উত্তর।

৯৩৬। যেই বাড়ী দেখে পিঠার গুড়ি।
সেই বাড়ীর ছাড়ে না দুয়ারের মুড়ী॥

৯৩৭। কথা না কইলে কি হাওয়া ফুইরা বাইর হইল?

৯৩৮। বেবাক্‌ কর্ম্ম হইল পণ্ড।
লাভের মধ্যে না-খাইল দণ্ড।
বেবাক্‌=সমস্ত দণ্ড=ক্ষতি।
না-খাইল=অনর্থক।

৯৩৯। ফুটুফুটি পানি।
জাক্কের জানি॥
ফুটুফুটি=হাটু পরিমিত; পানি=জল।
জাক্কের=সম্মিলিত শব্দ।

৯৪০। পাও টানা আর নাও টানা সমান।

৯৪১। দিন থাক্‌তে হাট।
বল থাক্‌তে খাট॥
সকাল থাক্‌তে কর পুজিপাট্টা।
নয় শেষ কাটালে পড়্‌বে ঝাটা॥
কাটালে=কালে।

৯৪২। আপনা চড়কায় তেল নাই,
পরের চড়কায় থোর।

৯৪৩। আচারে রান্ধে বিচারে খায়।
হাউরী বউর কাম না ফুরায়॥
হাউরী=শাশুরী।

রাগ আহিরি

মৃদঙ্গ সবদে গোর্কে ব্রহ্ম তর্ত্ত বোলে।
গুরু ভোলাইতে গোর্কে ভালা গিত বোলে॥
গুরু গোসাঞি শিস (১) বরন দুই রাখি।
রক্তন বরন নেত্র কি কারণে দেখি॥
আম বৈস্বা পুর্ন্নমাসি সক্রান্তি পালিয় রার।
ডাইন পাসে না সোয়াইয় নারি (২)॥
নাকের সোয়াসে সর্ব্বাঙ্গ মুসিব হ
সর্ব্ব দিন না জাইব ভালরূপে।
য়াবুজা নরলোকে কিছু নাহি বুজে হ
ঘরে ঘরে বাঘিনি সে পোসে॥
দিবাতে জে বাঘিনি জগত মোহনী হ
রাত্রি হৈলে সর্ব্ব অঙ্গ চুসে।
বাঘিনীর দুগ্ধ ফুটি হরনি য়াউটে হ
বিড়ালে বসিয়া প্রতি হাসে॥
য়াউটিতে য়াউটিতে দুদ লাকড়িএ মুসিল হ
তেনাইল উড়িল আকাসে॥
মুড়ার উপরে গুরু ছেত্র গাছি বৈসে হ
তাথে উজাএ দাড়খীনা পুঠি॥
য়াধারের (৩) লোভে বগুলা (৪) বিমতি (৫) হ
কেটী (৬) বেজিয়া টানাটানি॥

(১) প্রদীপের শীষের ন্যায় কৃষ্ণ। গুরু গোসাঞী যে হইবে, তাহার নয়ন মসী-কৃষ্ণ অর্থাৎ সুস্থ ও প্রশান্ত হওয়া আবশ্যক। সেই নেত্র রক্তবর্ণ হইয়া গিয়াছে কেন?

(২) আহিরি রাগে ছন্দের বিশেষত্ব লক্ষ্যের যোগ্য।

(৩) চার; পাখী মৎস্য ইত্যাদির খাদ্য।

(৪) বক।

(৫) মতিচ্ছন্ন।

(৬) খেকি। পূর্ব্ববর্ত্তী আট ছত্রের অর্থ রহস্যময়।

রাগ ওপালি

খেমা করি রাখ কায়া পরম জতনে।
হারাইলে এহি কায়া না পাইবা য়াপনে॥
রবি সসি আমবৈস্যা এ তিথি পুর্ণিমা।
প্রতিবদ অষ্টমি না জাইবা নারির সিমা॥
জন্তে পৈর্ক্ষে (১) পালিয় য়ার দসমিরে।
বাঘিনীর রুপে নারির.......... ...॥
বৎসরেত বার বার মাসে একদিন।
তর্ত্ত জানিবা জদি গুরু মুখ চিন (২)॥
সন্দা পালিবা জেন মন পোবন।
মন বন্দি করি গুরু রাখহ জিবন॥
কদাচিৎ নিজ চন্দ্র না করিহ বয়।
বার বৎসরের আউ সে দিনেত জায়॥
মুন মুন মৈছান্দর গুরু যে হইষ্ঠা (৩)।
কহিয়া দেয় সাহালের (৪) স্থিতির জে নিষ্ঠা॥
কোন নালে আইসে প্রাণ কোন নালে জাএ।
কেমন সঙ্গে বোল উৎপত্তি হইল কায়॥
জল কুণ্ডে বাসুকি রহিছে কোন লৈর্ক্ষে (৫)।
কায়া রহিয়া আছে কহ কোন পৈর্ক্ষে॥
কোন লৈর্ক্ষে করে মন য়মনা গমন।
নিদ্রাতে চেতাএ (৬) মন য়াসি কোন জন॥
কথাএ বৈসে মন কথা এ পোবন।

(১) পক্ষ মধ্যে।

(২) সত্য কথা জানিতে চাহিলে, গুরুর মুখ চিনিয়া বাহির কর।

(৩) হইবার উপযুক্ত; কর্ম্মিষ্ঠ, বলিষ্ঠ প্রভৃতি শব্দ-দৃষ্টে এই শব্দটী অপূর্ব্ব প্রকারে একটী ক্রিয়াপদ হইতে সৃষ্ট হইয়াছে।

(৪) সৎ-হালের; উন্নত অবস্থার।

(৫) অবলম্বনে।

(৬) উত্তেজিত করে; স্বপ্ন দেখায়।

কথাএ বৈসে এহি পঞ্চ প্রবর্ত্তির স্থান ॥
বাদ্যের ভিতরে শব্দ কেবা করে নিতি।
কোন পীণ্ড (১) তাহার জে কোন স্থানে স্থিতি ॥
কোন প্রকারে করে বাক্যের সবদ।
তাহার নির্ন্নএ কথা কহ বিদগদ ॥
হাসিয়া জে গোর্ক্ষনাথে করিল প্রনাম।
ভাব সির্দ্ধা তবে বোল এ জিবাম ॥
হাসিয়া বোলে মিননাথে য়াপনার মনে।
তর্ত্ত সিদ্ধি দেখা পাএ বোলে কোন জনে ॥
ক্রোধ হৈল মিন রায় জোগে হইল য়াস।
কথাতে নাহি ইষ্টদেব না কৈল প্রকাস ॥
হাসিয়া বোলিল গোর্ক্ষে তুমি কোন য়ংশ।
পরিচয় কহ মোরে জ্ঞান নহে ঢংস ॥
প্রথমে কহিবা মোরে কায়া পরিচয়।
কথা হৈতে আইসে কায়া কাহার ওদএ ॥
দ্বিতিয়াএ কহিবা গুরু ইতর্ত্ত কারণ।
য়জপা কাহারে বোলি জপে কোন জন ॥
ত্রিতিয়াএ পঞ্চম শব্দ বাজে ঘড়িয়ালি।
কহিয়া দেয়ত মোরে হৃদএ আকুলি ॥
চতুর্থে শ্রীষ্টির জে কহত কারণ।
কহিবা সকল তর্ত্ত যুন মহাজন ॥
পঞ্চমে কহিবা কথা ঘন পরে তালি।
কহিয়া দেয় এহি তর্ত্ত তোমারে জে বোলি ॥
সষ্ঠমে কহিয়া দেয় প্রাণের বিচার।
কেমন মন্দিরে থাকে কি রূপ তাহার ॥
সপ্তমে কহিবা তর্ত্ত সংসারের সার।
গুরু তোমার কোন জন সিস্য তুমি কার ॥
অষ্টমেত আর কথা কহিবা অসর্ক্ষ।
জল য়ার য়াকাস রহিছে কোন লৈর্ক্ষ ॥
নয়মেত সকল ঘরে রহে অন্তর্দ্ধক্ষে।

(১) শরীরে।

সবার য়াহার আছে বাউ করি ভৈর্ক্ষ ॥
দসমে নিদ্রার বুজি কেহ নাহি রহে।
দিপ নিবিলে জতি কথাএ গীয়া রহে ॥
সরির বিওগে প্রাত্তি (নি) কথা জাইয়া রহে।
এহার পরম তর্ত্ত কহ মহাশয় ॥
একাদসে কহি যুন বচন বেবস্তা।
শব্দ উঠিলে ধনি রহে গীয়া কোথা ॥
দ্বাদসেত ক(হ) মোরে অপরূপ কথা।
এক রূপ দেখি মাত্র ভির্ন্ন ভির্ন্ন কথা ॥
ত্রদসে কহিয়া দেয় পরম কারণ।
নিদ্রা কাহারে বোলি জাগে কোন জন ॥
চতুর্দ্দসে কহিয়া দেয় মা বাপের স্থান।
তথনে আছিল তনু কাহার ভুবন ॥
কথাতে জমিলা তুমি কথা হইলা স্থির।
কেবা করিল তোমার এসব সরির ॥
পঞ্চদসে কহ যুনি জর্ম্ম জে কারণ।
কৈআ দেয় আদ্য কথা উৎপত্তি লৈর্ক্ষন ॥
সাহসে জিজ্ঞাসি কথা কহ মহাজন।
খোদসিলা কারে বোলি সেবে কোন জন।
উনবিংসে আর তর্ত্ত কহ মহা[illegible]
কেমন মন্দিরে থাকে কারে বোলে মন ॥
বিংসে কহ মনুরায় কথাএ স্থান স্থিতি।
কথাএ থাকিয়া আহার করে নিতি নিতি ॥
একবিংসে কহ গুরু মনের উপাএ।
যুগন্ধি চন্দন গন্ধ কথা থাকি পাএ ॥
দ্বাবিংসে কহিবা তর্ত্ত যুন গুরু রায় ॥
নিদ্রা কালে মনুরায় কোন থানে জাএ ॥
এয় গর্ব্বে য়াচিন জন নিগর্ব্বে জাত।
কোন দেব ছিল বোল তোমার সাক্ষ্যাত ॥
চতুরবিংসে কহ কথা যুনিতে স্বাধার (যুসার ?)।
ঘপ্নের ঘরনি মাহ পুত্র শোস্তা কার ॥

পঞ্চবিংসে য়ার তর্ত্ত কহ মহাজন।
য়ামবৈর্থ্যে চন্দ্র থাকএ মিলন ॥
অষ্টবিংসে রাহু ভেদ কহিবা নিশ্চঁএ।
জিজ্ঞাসা করম মুহি যুন মহাশয় ॥
সপ্তবিংসে আর কথা কহিয়া দেয় মোরে।
কথাএ জর্ম্ম মনুর্য়ার কথাতে সঞ্চরে ॥
ষষ্ঠবিংসে আর কথা কহত স্বরূপ।
কেবা করএ ধর্ম্ম কেবা করে পাপ ॥
নববিংসে য়ার তর্ত্ত কহ মোহামতি।
কথাতে বৈসএ সিব কথাতে সকতি ॥
ত্রিংসে তর্ত্ত জিজ্ঞাসিএ সুনএ কারণ।
কাহারে বোলিএ মন কাহারে পোবন ॥
একবিংসে য়াকার জে জিজ্ঞাসি তোমাএ।
কেবা খাইবার চাহে কেবা জোগাএ ॥
কলপানা করে জদি য়নায়ার ধন।
কাহা হতে হইলেক ছাযার কারণ ॥
ছায়া হতে কায়া আইল কায়া হতে মন।
কায়া ছাড়ি সিব সক্তি আইল ততর্ক্ষণ ॥
দ্বিতিয়াএ আজপা নাম যুনএ যুসার।
সদাএ জপএ তারে গস্তি নাহি আর ॥
ত্রিতিএত যুন পঞ্চ জিবের কারণ।
তিন কুটি টঙ্গি যেন হইল নির্ম্মান॥
সেহি টঙ্গি মৈদ্ধে বৈসে গৌর হর গৌরি।
পঞ্চ সন্ধি বাদ্য ধ্বনি বাজে ঘড়ি ঘড়ি ॥
সির্দ্ধা সবে সদাএ ভাবে স্থির করি মন।
খেমাইর প্রহরি দেখ তেজিবা কারণ ॥
রবির ঘরেতে সসি রাখিবা জত্যনে।
পঞ্চ সন্ধি বাদ্য বাজে যুনিবা শ্রবনে ॥
চতুর্থেত কহি যুন শ্রীঙ্গারের কারন।
সর্গ পুরি যুনি তারে যুন দিয়া মন॥
পঞ্চমে কহিব কথা নিতি পড়ে তালি।
তখনে চলিয়া জা (য়) নিজ ঘরে চুলি ॥

সষ্টমে কহিএ যুন প্রভুর বিচার।
রূপ রেক কহি তার য়াকার উকার ॥
সংসার ভরিয়া আছে রহে নিজ ঘটে।
দেখিতে না পারে প্রভু আছএ নিকটে ॥
সপ্তমে কহিব যুন গুরুর বিচার।
য়সার সংসার মৈর্দ্ধে গুরু মাত্র সার ॥
তিন গুন পরম কারণ মহাশয়।
তাহার সমান গুরু জানিহ নিশ্চঁয় ॥
জ্ঞানবস্তে জানিয় গুরুর সেবা মাথে।
ধন্দ ভাঙ্গি জ্ঞানপথ দেখাইব সাক্ষ্যাতে ॥
চমক পার্থরে যেন পলাদ ঘসএ।
দিপ্তিমান য়ানল জেন হেন নিকলএ ॥
তেন মতে তনু মর্দ্ধে আছে নিরাঞ্জন।
গুরু পদেত ভক্তি কর দরসন ॥
অষ্টমে কহিব স্থানের বিচার।
স্থির বাউ ভর করি করিছে সংসার ॥
নবমেত কহি যুন বাউর কারন।
যুগন্ধি ভরিয়া বাউ করিছে জিবন ॥
দসমেত কহিব দিপ নিবাহিয়া জাত্র।
পরান সরির স্থিতি মনেত মিসাএ ॥
সরির বিনাস ভাই ধন যবিচার।
য়াননে য়ানল জলে জলেত সঞ্চার।
খাকেত মিসিব থাক রৈব মাত্র সার।
ভর্ম্ম ছালি হৈয়া জাইব দেহা য়াপনার ॥
মন সেবিলে দড় রথ পারেন সারিতে।
তাহার উপরে হংস চরে নিতি নিতে ॥
পোবনে চালাএ রথ হইয়া নিঠুর।
উড়িয়া পরমহংস জাএ ব্রর্ম্মপুর ॥
একাদসে কহি যুন সব্দের কারন।
সব্দ পুরিয়া ধ্বনি উঠএ গগন ॥
দ্বাদসে কহিএ গুরু ঘটে নারায়ন।
মতিবুর্দ্ধি ভির্ন্ন হএ সেহিসে কারন ॥

ত্রয়দসে কহি তাহি চৈতন্ত কারন।
কিঞ্চিত কহিভ তাই ষুন দিয়া মন॥
য়াহার করিয়া ব্রহ্মা বাউ ভর করে।
উর্দ্ধবাউ ভর করি বলএ অন্তরে॥
চর্ম্মের চলন জেন লক্ষি সহসাতে।
নাড়ি সব কাপে জেন অশ্বতের পাতে॥
আখিতে মিলন হইয়া রহিল তুরিত।
সক্তিহিন হইয়া জেন পড়িল ভুমিত॥
সিবসক্তি চলি গেল প্রভু দরসনে।
মনার প্রহরি মন রহিল আপনে॥
নাগনাম বাউ জেন জানহ প্রধান।
চৈতন্ত করাএ সেহি জপী মহাজ্ঞ্যান।
চতুদসে কহি তত্ত্ব পরম কারন।
মাতাএ পীতাএ জখনে জেন দিল মিলন॥
জল লৌহ সরির ব্রহ্মাণ্ড ভিতর।
বিন্দুসাররূপ হইয়া কমল সমসর॥
জনক জননি জদি হইল মিলন।
ব্রহ্মনালে ভেদ কৈল গর্ব্বের গমন॥
পঞ্চদসে কহি ষুন পরম কারন।
জেম মতে হএ সিসু জনম লক্ষন॥
অগ্নি রাহু পৃথিবি হইলে এক সাত।
জলেতে জন্মিল কায়া বোলে গোক্ষনাথ॥
জলতে জন্মিল কায়া মুলে হৈল স্থির।
য়াউট য়াতি চন্দ্রে মোর হইল সরির॥
ষুন কহি য়এ মাতা পিতার বিচার।
জার গুনে দেখি সবান (১) সংসার॥
জন্মদাতা পীতা হইল স্তনদাতা মাএ।
বিসে (ষ) ধরএ গুন ষুজ্ঞ(ধ)ন না জাএ॥

(১) মুলে শব্দটিকে সয়ান, সয়াল, সযান, সযাল এইরূপ পড়া যায়। কিন্তু কোনরূপেই কোন অর্থেরও আভাস পাওয়া যায় না দেখিয়া, এবং পদটিতে ছন্দপতনও আছে দেখিয়া এখানে লিপিকার প্রমাদ অনুমিত হয়।

সপ্তদসে কহিবাম গুন বিলৈক্ষন।
ডিগম্বর হএ সিবে বোলে সর্ব্বজন॥
অষ্টাদসে কহি ষুন রিদএ য়াকুলি।
পরম আত্মা চিনএ জে পঞ্চে মিলি॥
উন বিংসে কহিবাম মনের বিচার।
গু(রু) মোর জ্ঞান হএ সির্ব য়ামি তার॥
বিনন্দ মন্দির ঘরে রহে মনুরায়।
মন স্থির হইলে সে কর্ম্ম সিদ্ধি পাএ॥
বিংসতিএ কহি তত্ত্ব না ভাবির য়ান।
ঘরের ঘরিনি মন রহে সেহি স্থান॥
বিকাস উপরে মন য়াছে অনুপাম।
বসিয়া জে মনুরায় করএ বিশ্রাম॥
নয়ান জথাস্তে দৃষ্টি তথা মনুরায়।
সব্দ জথাতে ষুনে তথা চলি জাএ॥
জথা তথা চলি জাএ আপনার ষুখে।
ফিরি য়াইসে মনুরায় আখির নিমেসে॥
একবিংসে কহি ষুন সংসার কারন।
ষুগন্ধি চন্দন ফুটে বৈকণ্ঠ ভুবন॥
ষুগন্ধি চন্দন গন্ধ ত্রিভোবনে পাএ।
সৌরবে মহিত মন ভ্রমিয়া বেড়াএ॥
দ্বাবিংসে কহিএ ষুন নিদ্রার উপায়।
নিদ্রাকালে মনুরায় কাজল কোঠাএ জাএ॥
ত্রিবিংসে কহি ষুন গর্ব্বের ধারন।
গর্ব্ব মৈদ্ধে ছিল দেহা হইল দ্রসন॥
সর্গ মৈর্ত্য পাতাল জে এ তিন ভোবন।
তিন ঠাই তিন দেব রহিল তখন॥
সমাদি হইল ভঙ্গ গর্ব্ব হইল পাত।
য়ন্তধ্যান হইল দেব সেহি হইল সাক্ষ্যাত॥
রঙ্গ পুজ জল মিন এহি তার চিন।
য়াখির পলকে প্রভু কৈল রাত্রি দিন॥
চতুরবিংসে কহি ষুন পরম কারন।
মাও ঘরিনি পুত্র ভাবের লৈক্ষন॥

সহস্র দলেত সক্তি সুন্দর কমল।
তাথে মধু পান করে বিনন্দ ভ্রোমর॥
ভোমর স্বরূপে দোগদ দেখি অনাদিনি।
মধু পানে পুত্র বুলি জগত জননি॥
সপ্তবিংসে রাহু ভেদ পরম কারন।
সরিরান্তে বৈসে রাহু সুন মহাজন॥
সপ্তবিংসে কহি সুন বচন সুসার।
আকাসে জন্মিল প্রাণ য়াদি মন আর॥
জলে উপজিল সে জে চন্দ্রেত মিসএ।
ব্যাপীত হইয়া মন রৈয়াছে সর্ব্বদাএ॥
অষ্টবিংসে কহি সংসারের সার।
ভাবিয়া চিন্তিয়া চাহ সরির মাঝার॥
মনুর্সে কুরএ পাপ লিন নহে পাপ।
মন উনমর্ত্ত হএ কহিল স্বরূপ॥
নববিংসে কহি সুন তর্ত্ত মন দিয়া।
ব্রহ্মাণ্ডে বৈসএ সিব পাতালে সক্তিয়া॥
ত্রিবিংসে কহি তর্ত্ত সংসারের সার।
• ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰॥
দেবের দুর্ল্লব জান মুর্ত্তির কারন॥
সিব সক্তি ভেদ জান মিলিল পোবন।
ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখ য়াপনে য়াপন॥
নববিংসে কহি চারি চন্দ্রের কারন।
য়াদি চন্দ্র জল বিন্দু গুরু(মু)খে জান॥
নিজ চন্দ্রে জানিয়া জে রহিছে পরান!
বিকাস উৎপর্ন্ন জেন মুদিত সন্দান॥
উন্মর্ত্ত্য চন্দ্রে জান জড়িয়াছে সর্ব্বস্থান।
গড়ল চন্দ্রের কথা সুনহ বাখান॥
ভক্ষিল গড়ল চন্দ্র য়াপে গোর্ক্ষরায়।
য়াপনে বুজিয়া চলিবা জে মনে জে না পাএ॥
মুল চন্দ্র জেই জানে তুরিতে গমন।
নিজ চন্দ্র আগে চলে পাছে চলে মন॥
পলাইবার ঠাহি জিবনের কিবা য়াশ।
কানে কহে কানাইর বাসি করিয়াছে বাস॥
কি জানি কি হইল মোরে কানাইর মুরারি।
হেন বুজি জাতি কুল লৈয়া গেল হরি॥
বিংসেত জে কহি কথা নিদ্রার কারন।
বাউ আহার জল জিবের ভৈক্ষর্ন॥
একবিংসে কহি কথা দেহার কারন।
দেহ উর্দ্ধেস সুন কথা প্রানে পীণ্ড জান॥
চতুরবিংসে কহি কথা পরম কারন।
পঞ্চে আগমন হৈলে দেহার মরন॥
পঞ্চ প্রান জখনে সরির ছাড়ি জাএ।
ধর্ম্মাধর্ম্ম য়ার চারি ভাবন না জাএ॥
মন পরিচয় জান মায়া মোহ টুটে!
য়াত্মা পরিচয় হৈলে লাগে বড় ঝুটে॥
পরম আত্মা পরিচয় না হএ সেহি কায়া আন্দা।
পরম আত্মা পরিচয় বিসম জে ধান্দা॥
পঞ্চবিংসে কহি সুন সরিরের সার।
গনিয়া না পয়স্তি গুরু এহার বিচার॥
নাসিকাতে বল বাউ বৈসে জ্ঞান ধর্ম্মে।
বুজিয়া না বুজে গুরু অখণ্ড যে কর্ম্মে॥
সপ্তবিংসে কহি সুন ভাই মনের বিচার।
য়সার সংসার মর্দ্ধে এহি মাত্র সার॥
পুব্বদিন হইল তার য়াসমান জমিন।
হাড় মাংস খাইল তার নিঠুর পোবন॥
ছাড় ছাড় আরে ভাই পুর্ব্বকুল য়াস।
পশ্চিমকুলে রহিয়াছে নিচিন্তে সোঁশ॥
উর্দ্ধ য়ানন য়ার করি মুষ্ট ভার।
জদিবা জিবা ভন দড় করিয়া ধর॥
কানর্থা মুলেত জান নিরাঞ্জন বৈসে।
ভির্ম্ম য়াদেস কর জেন স্বামি পাসে॥
নববিংসে কহি চারি চন্দ্রের কারন।
আদিচন্দ্র গুরুমুখে জলবিন্দু জান॥
নিজ চন্দ্র আগে চলে তার পাছে মন।

উন্মর্ত্ত চন্দ্রের কথা সুনহ লৈক্ষ্ন ॥
উনমাদ চন্দ্র রাছে সরির ভিতর।
গড়ল চন্দ্র সঙ্গে চলে হইয়া একাতর ॥
অন্ত চন্দ্র সেসে চলে ধর্ম্ম উর্দ্ধে ভর।
চন্দ্র বাহির হইলে পড়ি রহে ধন ॥
কালান্ত লৈক্ষ্ন কহি যুনহ বিসেস।
নিদ্রাকালে মির্ত্তুরূপ জানিহ বিসেস ॥
নাভিতে জালিয়া দীয়া যুক্তের পুথলি।
কমরে ধরিয়া তোলে গগন মণ্ডলি ॥
এক মন হইয়া ছায়া করে নিরক্ষন।
মুণ্ড না দেখিলে হএ অবস্ব মরন ॥
কর্ন্নেত অঙ্গুলি দিলে সব্দ নাহি যুনএ।
সপ্ত দিবসেত মির্ত্তু জানিয় নিস্চর ॥
সব্দ ধয়ে চির্ত্য দিয়া চিনে জেই জন।
সব্দ স্থির হইলে তার মরন তখন ॥
হাত নিরক্ষি জে না দেখে জেই জন।
একাদশ দিবসে পরে তাহার ম(রে)ন ॥
নানা জন্ত্র জেই জনে নিরক্ষন করে।
না দেখিলে ভানুছায়া সেহি ক্ষনে মরে।
বাম অঙ্গু দিয়া জদি অঙ্গুলি না পাএ।
তৃতীয় দিবসে মির্ত্তু খণ্ডান না জাএ ॥
এ (কে) কালে দুইপদ হয় ভগ্নবত।
নাসিকা চাপীলে বিন্দু না হএ বেকত ॥
গ্রিসে তনু আকর্স্বাত হএ মুর্ন্নকার।
মুণ্ড না থাকিলে আকর্স্বাত হএ মুন্যকার ॥
আগে ক্রোধ না থাকিলে পাছে ক্রোধ মন।
নিত্য ভ্রম হএ সেহি পায় সর্ব্বক্ষ্ন ॥
গ্রিধিণি সকুনি আসি সপ্নে মাস খাএ।
ওট সারস গাধা সর্পে দেখা পাএ ॥
কাছে কেহ না থাকে মুনিস্ত সঙ্গ পাএ।
না দেখএ ব্রহ্ম জুতি ভ্রসন বুথাএ ॥
আপনার ছায়া চাহিয়া গগন পানে চাহে।

আপনার সনে জদি পুরুস দেখ এ ॥
সর্ব্ব সির্দ্ধি তাহার জে জানিয় নিস্চরে।
এহি সব সার কথা তর্ত্তেত বুজাত্র ॥
তাড়ক মোওলে আর না হএ বেকত।
চন্দ্ররেখা না দেখে না দেখে মহাপত ॥
দুই আঙ্গুলি চাপিলে এতিন অঙ্গুলি।
ভূমি মৈর্দ্ধে না দেখে আদি চান্দের আহলি ॥
নাসিকা না দেখে জদি নতুবা করএ।
শ্রিংহার করিতে ঘণ্টার নাদ যুনএ ॥
দিবাতে গগনে জদি হয় উল্কা পাত।
কেহ গাত্র ঘুমি জদি পরে অকস্বাত ॥
দিবাতে শিত করে রাত্রিতে উমাএ।
মাসেক বিলম্বে তার মরন নিস্চএ ॥
এককালে নাভি দেস সদাএ কাপএ।
চলিলে কল্পন্যর লতি মির্ত্তু যোগ হএ ॥
দুই পদ এককালে তরিতে লুকাত্র।
সে দিবসে মির্ত্তু জাণিবা নির্চ্চএ ॥
এক মাস থাকিতে দুই চান্দ নাহি দেখী।
থাকিতে এগার মাস ঘোর হেন দেখী ॥
দমাসে খোমরাএ মাপিএ কমল।
নব মাসে লয় করে কমল সতদল ॥
অষ্ট মাসে অনাদিএ নিজ গৃহ ছাড়ে।
সপ্ত মাসেত পায় পথেত পিছলে ॥
পঞ্চমাস থাকিতে পাণ্ডব না হএ দেখা।
চারি মাস থাকিতে গগনে বহ্নি রেখা ॥
দশ দিনে সরিরের হএ টানাটানি।
নবদিনে নবদ্বার হএ জানা জানি ॥
ছএ দিনে ছএ রিতু হএ একাশ্বর।
পঞ্চদিনে পড়এ জে করে কড়মড় ॥
চারিদিন থাকিতে নাসাএ না পায় সুরে।
তিন দিন থাকিতে যে হংসা হংসি চরে ॥

দুই দিন থাকিতে চারি চন্দ্র কাজাগে (১) বৈসে।
একদিন থাকিতে সমন নিকটে আসি বৈসে ॥
উড়িল কদলি সব সুন্য হইল পুরি।
গোর্ক্ষনাথে বোলে গুরু ছাড় এহি পুরি ॥
(ছ) লেতে কহিয়া তবে হরের বচন।
ভ্রম ভাঙ্গি মিন নাথে গেল ততর্ক্ষন ॥
সপ্ন হতে মিন যেন উঠিল জাগীয়া।
য়াসনে বসিল মিনে সপ্ন ভঙ্গ হৈয়া ॥
গোর্ক্ষনাথে কৈল তবে আসনেত মন।
বিন্দুনাথেরে কৈল মন্ত্র আউতন ॥
এহি মতে তিন জনে চলিল সর্ত্তর।
কদলি তেজিয়া গেল বিজয়ানগর ॥
জ্ঞান সাদে মিননাথে বসিল ধ্যায়ানে।
অঙ্গে তঙ্গে তালি দিয়া এহিমত্ত জানে ॥
জতেক হরের বাক্য সকল র্স্বরিলা।
ভাবিতে চিন্তিতে পত সব উর্দ্ধেসিলা ॥
পুরান জুগিএ জদি জোগে কৈল মন।
ক্রেমে ক্রেমে জত জুগি কৈল উপাসন ॥
গোর্ক্ষের বচনে মিন স্থির কৈল কায়া।
মহাজ্ঞান পাইয়া মিন দুর কৈল মায়া ॥
সেন সাম দাসে কহে গোর্ক্ষ মহাশয়।
য়ানন্দে করিল তবে কদলি বিজয় ॥
মনেত ভাবিয়া গুরু য়সেস বিসশ।
জেই দিগে মন করে সেহি দিগে রস ॥

ইতি সন ১২২৪, মাহে ২৮ চৈত্র
মোকাম ভানি ॥ সর্ক্ষরমিদং জথা দৃষ্টিতং তথা লিখীতং
লেথক শ্রীতনুরাম দেব দাষ সদাএ গুরুপদে য়াস ॥

(১) কোজাগরে।

প্রতিভা

৫ম বর্ষ অগ্রহায়ণ ১৩২২ ৮ম সংখ্যা

বাতুলের গান

প্রাচীন কালে আমাদের দেশে কত লোকে কত রকমে সাহিত্য-রস-পিপাসার নিবৃত্তি করিত, অধুনা তাহার সম্যক্ বিনির্ণয় একরূপ অসম্ভব। সে কালের নানা ভাবের কত কবিতা, গান, ছড়া, হেঁয়ালী, প্রবাদ, প্রবচন প্রভৃতি নামধেয় জিনিস আজও দেশমধ্যে পাওয়া যাইতে পারে,—যাহা সংগৃহীত হইলে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের মনোবৃত্তির গতি ও পরিণতি, তাঁহাদের প্রতিভার বিকাশ, তাঁহাদের রুচি এবং তাঁহাদের সময়ের অনেক কথা আমাদের জ্ঞান-গোচর হইতে পারে। প্রাচীন লোকদের বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে ঐ রকম কত সম্পদ হইতেই না আমরা চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হইয়াছি! যাহা এখনও আছে, তাহাও দ্রুতগতিতে বিলোপের দিকে ধাবিত হইতেছে। সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের প্রাচীন সাহিত্যানুরাগী লেখকবর্গের আশু অবহিত হওয়া আবশ্যক। বিলম্বে আমাদের যে ক্ষতি হইবে, কিছুতেই তাহার আর পূরণ হইবে না। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই এদিকে মনোযোগী হইয়াছেন। সুখের বিষয়, ঢাকা-পরিষৎও এ বিষয়ে উদাসীন নহেন।

"প্রতিভার" পাঠকবর্গ নানারকম হেঁয়ালী ও প্রবচন দেখিয়া থাকিবেন, কিন্তু দেশমধ্যে যে আর এক রকম বিপরীত ভাবাত্মক প্রাচীন শ্লোক বা কবিতা (যাহাই বলুন) পাওয়া যায়, তৎপ্রতি তাঁহারা কখনও লক্ষ্য করিয়াছেন কি না বলিতে পারি না। কবিতাগুলি অদ্ভুত জিনিস,—প্রকৃত সত্যের ঠিক বিপরীত ভাব-দ্যোতক। উহাদের কোন সদর্থ আছে কি না, না পরিহাস-রসিকের উদ্ভট কল্পনা হইতেই উহাদের জন্ম, তাহা আমি বলিতে অক্ষম। উহাদিগকে কেহ কেহ উল্টা 'বাউলের গান' বলিয়া থাকে। বাস্তবিক পক্ষে তাহাদিগকে আপাতদৃষ্টিতে বাউলেরই (বাতুলেরই) কাণ্ড বলিয়া বুঝা যায়। বাতুল ভিন্ন এমন সত্যের বিরোধী কথা ত আর কেহ বলিতে পারে না। এজন্য আমি ইহা-দিগকে আপাততঃ "বাতুলের গান" নামেই অভিহিত করিলাম।

চট্টগ্রামে এমন বহু কবিতা পাওয়া যাইতে পারে। পাঠকবর্গকে আজ তাহাদের কয়েকটি উপহার দিতেছি। বলিয়া রাখা উচিত, কবিতাগুলি চট্টগ্রামের কথিত গ্রাম্য ভাষায় নিবদ্ধ ছিল। সকলের বোধ-সৌকর্য্যার্থ কথিত ভাষার রূপ পরিহারপূর্ব্বক কোন কোন স্থলে তাহাদের টীকা এবং সামান্য রূপপরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছি। আমাদের আশঙ্কা হয়, তথাপি চট্টগ্রাম-বাসী ভিন্ন অন্য লোকে ঠিক বুঝিতে পারিবেন না, এমন অনেক শব্দ কবিতাগুলিতে আছে। সেরূপ স্থলে লাচারি স্বীকার ভিন্ন আমাদের আর গত্যন্তর দেখি না।

অর্থ থাকুক আর নাই থাকুক, কবিতাগুলির রচনায় এই অজ্ঞাত-কুল-শীল বাউল (বাতুল) কবিদের বুদ্ধির প্রশংসা না

করিয়া থাকা যায় না। কোন কোনটার অভ্যন্তরে এমনই হাস্য-রস নিহিত রহিয়াছে যে, তাহা শ্রবণ বা পাঠ মাত্র আপনিই হাস্যের উদ্রেক হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্তরেও একটা ক্ষীণ আনন্দ ফুটিয়া উঠে। আর বাগ্বাহুল্য না করিয়া, আমরা কবিতাগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। পাঠকগণ নিজেরাই (যদি রসজ্ঞ হন) সে রস উপভোগ করিতে পারিবেন।

(১)

বিলের মাঝে চিলের বাসা, কুত্তা বিয়ায় গাছে।
সেই চিল ধরিয়া খাইল রাম দাড়িকা মাছে॥

(২)

বেঙ্গের ডাকে সিংহ মরে, সর্প খাইল বনে।
সেই বেং ধরি মাকড়ে খায় বসিয়া ঘরের কোণে॥

(৩)

মানুষের কান্ধে ঘোড়া চড়ি উড়িয়া বেড়ায় দেশ।
বদনার নালে হাতী খাইল, বাঝিয়া রৈল লেজ॥

(৪)

গাছের আগায় রাস্তা বান্ধি নীচে দি' চালায় গাড়ী।
পানির উপর ইট বসাইয়া পাকা বান্ধে বাড়ী॥

(৫)

মরা মানুষ হাঁটিয়া বেড়ায়, জিন্দা থাকে পড়ি।
চা'রটি ঘোড়া উড়িয়া বেড়ায় মরার কান্দে চড়ি॥

(৬)

না মাথায় দি' জুঞ্রির বায়, গাঙ্গে নাহি পানি।
ঝড় পড়িয়া জ্বলিয়া গেল বড় ঘরের ছানি॥

(৭)

গাছের উপর হাট বসাইল রাতিয়া বেচা কিনা।
অন্ধলোকে খরিদ করে, চোখ থাকিতে কাণা॥

(৮)

গাছের উপর মানুষ উঠি নীচে দি কাটে গোড়া।
চোরা যাই-গৃহস্থ বান্ধে, গৃহস্থ হৈল চোরা॥

(৯)

জোন পহরে ধান শুথাত দি', পাতিলায় দিল বাড়া।
বিলাইটিরে মাছ কুটতে দিয়া বউয়ে বেড়ায় পাড়া॥

---

(১) বিল—মাঠ, যেখানে কৃষিকার্য্য চলে।

কুত্তা—কুকুর।

বিয়ায়—প্রসব করে।

রামদাড়িকা—একরকম মাছ।

(৩) বদনা—লোটা, জলের নালযুক্ত ঘটী।

বাঝিয়া—বদ্ধ হইয়া।

(৫) জিন্দা—জীবিত (মানুষ)।

(৬) না—নৌকা।

জুঞ্রির—বাঁশের নির্ম্মিত ছাতিবিশেষ, যাহা কৃষকেরা বর্ষাকালে মাথায় দিয়া বৃষ্টি নিবারণ করে। কোন কোন দেশে 'জোমর' বলে।

বায়—বাহে।

গাঙ্গে—খালে, নদীতে।

ঝড়—বৃষ্টি। সাধারণতঃ এই অর্থেই চট্টগ্রামে 'ঝড়' শব্দ ব্যবহৃত হয়।

ছানি—ছাউনি, Thatching

(৭) রাতিয়া—রাত্রিকালে।

(৯) জোন পহরে—জ্যোৎস্নার আলোকে।

শুথাত—শুকাইতে।

পাতিলা—মৃৎপাত্র, যাহাতে ভাত রাঁধে।

বাড়া—ঢেঁকিতে ধান ভানাকে চট্টগ্রামে বাড়া দেওয়া বলে।

(১০)

বিলাই গেল সিলাই করিতে কাপড় নাই সাথে।
তুইটা হাতী মুখে করি ইন্দুর গেল গাতে॥

(১১)

দরিয়াতে পাথর ভাসে, শোলা ডুবি যায়।
ভাটার পানি উজান চলে, নৌকায় মানুষ বায়॥

(১২)

পাতিলার ভিতর রৌদ ভরিয়া ধান শুকাইল ঝড়ে।
ধানের ভরে রৌদ মরিল, সূর্য্য পলায় ডরে॥

(১৩)

কুত্তা গেল বাঘ মারিতে, বিলাইয়ে খাপ দি' চায়।
ইন্দুরে দেখি ঝাপ দি' পড়ি বিলাই ধরি খায়॥

(১৪)

পুকুর দেখি কত মাছ পানি খাইত যায়।
মাছের ডরে সেই পুকুর রাজ্য ছাড়ি ধায়॥

(১৫)

এক জনেরে তুই জনে মারে, অন্য তুইজন কান্দে।
চোরারে ছাড়ি দিয়া গৃহস্থ ধরি বান্ধে॥

(১৬)

সাত হাত পানির নীচে যাই হরিণে ঘাস খায়।
কাঠুয়া চিলে ঝাপ টা মারি হরিণ লৈয়া ধায়॥

(১৭)

পাতা পড়ি বাতাস মৈল, বৃক্ষ ধাইল উড়ি।
সাগরের পানি মরে আগুনেতে পুড়ি॥

(১৮)

গাছের আগায় চাই বসাচ্ছেন বাড়ই কুদাচ্ছেন গাছে।
দামড়া ছিঁড়ি দড়ি ধাইল জাল্যা দৌড়ায় মাছে॥

(১৯)

পানির উপর ঘোড়া দৌড়ে, উড়িয়া ধাইল মাছ।
হাল্যার কান্ধে যুয়াল দিয়া গরুয়ে করে চাষ॥

(২০)

এক মাছে তিন পুকুর খাইল গাছের উপর বই।
পেট ফাটিয়া পানি ধাইল, পুকুর গেল কই॥

(২১)

শুখনার উপর জাল বসাইল, জালে বাঝিল পানি।
জাল্যারে ত মাছে ধরি জালে নিল টানি॥

(২২)

ঘরের চালে আগুন দিয়া মাল ভরিল ঘরে।
ঘর পড়িয়া আগুন মৈল, পানি ধাইল ডরে॥

বিলাই—বিড়াল।
কুটুতে—কুটিতে।
(১০) সিলাই—সেলাই।
গাতে—গর্ত্তে।
(১২) রৌদ—রৌদ্র।
(১৩) বিলাইয়ে—বিড়ালে।
(১৪) খাইত—খাইতে।
ধায়—পলায়। সাধারণতঃ পলায়ন করা অর্থেই চট্টগ্রামে 'ধাওয়া' শব্দ ব্যবহৃত হয়।
(১৬) কাঠুয়া চিল—এক প্রকার চিল।

(১৮) আগায়—অগ্রভাগে।
চাই—মাছ ধরিবার এক রকম যন্ত্র।
বাড়ই—সূত্রধর।
দাম্ড়া—এঁড়ে বাছুর। Bull-calf
জাল্যা—জালিয়া, জেলে।
(১৯) হাল্যা—হালিয়া, হেলে, কৃষক।
যুয়াল—Yoke
বই—বসি।
(২০) কই—কোথায়।
(২১) শুখনা—শুষ্ক জায়গা।
বাঝিল—বদ্ধ হইল।

(২৩)

গাছে উঠি মাছি মরে, সর্প গেল চাইত।
কোণা বেঙ্গে খাপ্ দি' রৈছে সর্প ধরি খাইত॥

(২৪)

ছাগল লুটে, দড়ি হাঁটে, টেংরায় খাইল ধান।
এক মশায় একদিনে খাইল ত্রিশ বিড়া পান॥

(২৫)

ছাগল যাইয়া বাঘ ধরিয়া গাছে টানি তোলে।
দুধের ছাওয়াল ডরে ধাইল মারে লইয়া কোলে॥

(২৬)

পানির উপর ঘর বান্ধিল, ঘরে নাই ঠুনি॥
এক মশায় এক তিরাষে খাইল সাগরের পানি॥

(২৭)

গাছে উঠি কুত্তা মরে সর্প গেল চাইত॥
কোণা বেঙ্গে খাপ দি' রৈছে সর্প ধরি খাইত॥

(২৮)

ডান ঠেঙ্গে দরিয়া বান্ধি বাঁ ঠেঙ্গে সিচে পানি।
ঘরের ভিতর মাল ভরিয়া লাগাইল আগুনি॥

---

(২৩) চাইত—চাইতে, চাহিতে।
কোণা বেং—যে বেঙ্ গৃহ-কোণে থাকে।
খাইত—খাইতে।

(২৪) টেংরা—বাঁশের বেড়া বা fencing, যাহা ক্ষেতের চতুর্দ্দিকে দেওয়া হয়।
বিড়া—২০ গণ্ডা পানে এক কাঁচা 'বিড়া' হয়।

(২৫) ছাওয়াল—ছেলে।

(২৬) ঠুনি—থাম, খুঁটি।
তিরাষে—তৃষ্ণায়।

(২৮) ঠেঙ্গে—পদে।
দরিয়া—সমুদ্র।
বাঁ—বাম।
সিচে—সেচন করে।

(২৯)

মাছির গায়ে বাত কাটিয়া তাল গাছের দিল বাতি।
তুষের নৌকায় সোয়ার হৈয়া সাগর পার হয় হাতী॥

(৩০)

হাল চষিতে লাঙ্গল ধাইল, গরুয়ে ডাক কয়।
জিন্দা মানুষ কান্দে লৈয়া চা'র জন মরায় বয়॥

(৩১)

পুকুরেতে পানি নাই, ভাসিয়া বেড়ায় ফেনা।
রন্ধ্যা মাছে ডুব দি' ধাইল তেলৈন করি কাণা॥

(৩২)

মার গর্ভে স্বামীর জন্ম, স্ত্রীর জন্ম জলে।
মাঝির পেটে শাস্ত্র জন্ম নানান কথা বলে॥

(৩৩)

ছকুড়ি টাকা দি' আন্লাম নৌকা, ন কুড়ি লাগিল্ জলই।
কচু বন দি' নিতে ডিঙ্গার বেঙ্গে গিলে গলই॥

(৩৪)

হাতীর সঙ্গে মশায় লড়ে গাছের উপর যাই।
শতে শতে বাঘ মরি গেল্ মশার লাথি খাই॥

---

(২৯) বাত—ফোঁড়া বিশেষ॥

(৩০) জিন্দা—জীবিত।
বয়—বহন করে।

(৩১) ফেনা—জলের 'ফেনা'ও হয়, অথবা পানা, যাহা পুকুরের জলে জন্মে এবং ভাসিয়া বেড়ায়।
রান্ধ্যা—রাঁধা Cooked
তৈলেন—মৃৎপাত্র,যাহাতে ব্যঞ্জনাদি পাক করা হয়।
কানা—ছিদ্রযুক্ত।

(৩৩) জলই—পেরেক, nail
গলই—নৌকার পাছা, গলুই।

(৩৫)

গাভীর ডাকে বলদ গাভিন, বিরিষ হৈল ভাঁজা।
সেঁকা মাছে বিলাই খাইল, কুত্তায় পাইল মজা॥

(৩৬)

ইন্দুর গেল বিহা করিতে, বিলাইয়ে ধরে ছাতি।
ঘউয়ের মা নানীর পেটে সাপ হৈল বরাতী॥

(৩৭)

সাপের মাথায় বেং নাচে, বেজীএ দেখি হাসে।
কুত্তা বেটা তামাক খায়, বিলাই বসি কাশে॥

(৩৮)

কচু পাতায় হাতী নাচে, বেঙ্গে বাঁশী বায়।
তিনটি বাঘ জঙ্গলে ধরি এক শিয়ালে খায়॥

(৩৯)

মশার পেটে হাতীর জন্ম, বেঙ্গে হাতী খায়।
সেই মশার দুধ দোহাইলে এক'শ মণ পায়॥

(৪০)

ইন্দুর গেল বিহা করিতে, বিলাইয়ে বাজন বায়।
দরিয়াতে আগুন লাগি মৎস্য উড়ি ধায়॥

(৪১)

গাছের আগায় চাই বসাইয়া পল দি', সিচে পানি।
ঝাপ দি' পড়ে মরা মাছে খাইল ঘরের ছানি॥

(৪২)

গাছের মাথায় পুকুর দিয়া নীচ দি' বান্ধে পাড়।
দুই পুকুর দুই হাতে লৈয়া একটি মানুষ ধায় (ধায়)॥

(৪৩)

মার বিহার দিন বাপের জন্ম, বেটা গেল হাটে।
কোদাল দেখি কামার ধাইল, পুকুরে মাট্যাল কাটে॥

(৪৪)

বোবা বেটা গান করে, কান নাই বেটা শুনে।
অন্ধ লোকে সিলাই করে, পয়সা বিনে কিনে॥

(৪৫)

জামাইর গলে খাশুরী ঢুলে, শ্বশুর হয় তার শালা।
জন্ম ভাঁজা খাশুরী বেটি মাসে মাসে পোলা॥

(৪৬)

এক হাঁটু পানিত ছাগল চরে, বগা গেল চাইত।
পুঁটি মাছে খাপ দি' রৈছে বগা ধরি খাইত॥

---

(৩৫) গাভিন—গর্ভবতী।
বিরিষ—বৃষ।
ভাঁজা—বন্ধ্যা।
সেঁকা—Baked.

(৩৬) নানী—মাতামহী।
বরাতী—'বরযাত্রী' শব্দের সংক্ষিপ্ত প্রয়োগ।

(৩৭) বায়—বাজায়।

(৩৮) শিয়ালে—শৃগালে।

(৪১) চাই—মাছ ধরিবার যন্ত্র বিশেষ।
পল—ঐ। উহা ছিদ্রযুক্ত জিনিস। উহা দ্বারা জল সেচন চলে না।

(৪২) ধায়—ধাইতেছে। যাইতেছে, খাইতেছে ইত্যাদি বুঝাইতে চট্টগ্রামে কথিত ভাষায় যায়, খায় ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। নোয়াখালীতে ঐরূপ স্থলে যাইয়ের, খাইয়ের ইত্যাদি বলা হয়।

(৪৩) বেটা—পুত্র।
কামার—কর্ম্মকার।
মাট্যাল—মাটীয়াল, যাহারা মাটী কাটে।

(৪৫) ভাঁজা—বন্ধ্যা।
পোলা—ছেলে, সন্তান।

(৪৬) পানিত—পানিতে।
বগা—বক।
চাইত—চাহিতে।
খাইত—খাইতে।

(৪৭)

পাহাড়েতে জাল বসাইল, জাল লই ধাইল চিলে।
গোখা হৈয়া দড়িকা মাছে জাল্যা ধরি গিলে ॥

(৪৮)

ছাএর লাগি আধার আন্‌লাম, আধারে খাইল ছা।
দরিয়াতে ধুল গুঁজরে শুথনায় চলে না ॥

(৪৯)

এক ছনেতে বড় ঘর ছায় দেখিতে লাগে সরু।
উত্তর বিলে শকুন মরে, উড়িয়া বেড়ায় গরু ॥

(৫০)

পাথরের উপর পাথর, পাথর খাইল ঘুনে।
মার বিহার দিন বাপের জন্ম, আজান দিল কোনে ॥

(৫১)

উলটা বাউলে কয় বুঝন মহাকাল।
বাপে পুতে শালা সম্বন্ধী, মায়ে ঝিয়ে জাল ॥
উলটা বাউলে এমন ধারা।
মাদার গাছে ধরি আছে আঁট্যা কলার ছড়া ॥

শ্রীআবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ।

---

(৪৭) গোখা—রাগান্বিত।
জাল্যা—জেলে।

(৪৮) আধার—পাখীর খাদ্য।
ধুল—ধূলা।
গুঁজরে—গর্জ্জন করে।
না—নৌকা।

(৪৯) ছন—শন, খড়, যাহা দ্বারা চট্টগ্রামে ঘর ছাওয়া হয়।
ছায়—ছাওয়া হয়। (Is thatched)

(৫০) আজান—নমাজ পড়িবার জন্য লোকদিগকে মসজিদে যে আহ্বান করা হয়, তাহাকে 'আজান' বলে। সন্তান হইলেও আজান দিবার রীতি আছে।

(৫১) ঝি—কন্যা। জাল—জা, স্বামীর ভ্রাতৃ-বধূ।
আঁট্যা কলা—আঁটি বা বিচিযুক্ত এক রকম কলা।

ঈশা খাঁর কত্রাভূ নগরী *

ষোড়শ ও সপ্তদশ সতাব্দীর পাশ্চাত্য পর্য্যটকগণ তাঁহাদের ভ্রমণবৃত্তান্তসমূহের বহুস্থানে বারভুঞার একতম কত্রাভুর ভুঞার উল্লেখ করিয়াছেন। কত্রাভু তৎকালে কোথায় অবস্থিত ছিল, তৎসম্বন্ধে বহু মতভেদ দৃষ্ট হয়।

নিকোলাস্ পাইমেণ্টা (Nicholas Pimenta) পর্ত্তুগীজজাতীয় এবং জেসুইট্ সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক ছিলেন। তিনি ভারতের প্রধান পর্ত্তুগীজ উপনিবেশ গোয়ার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৫৯৮ ও ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ধর্ম্মপ্রচারার্থ তিনি ফ্রান্সিস্ ফার্ণাণ্ডিজ (Francis Fernandez), ডমিনিক ডা সোসা (Dominic da Sosa), মেলকিয়র ডা ফন্‌সেকা (Melchior da Fonseca) এবং এণ্ড্রু বাউয়েস্ (Andrew Bowes) নামক চারিজন জেসুইট্ পাদ্রীকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। এই সঙ্ঘই বেঙ্গল মিশন (Bengal Mission) বা বঙ্গদেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারক সঙ্ঘ নামে ইতিহাসে পরিচিত। ফ্রান্সিস্ ফার্ণাণ্ডিজ্ ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীপুর হইতে কত্রাভুতে গমন করেন। পাইমেণ্টার নিকট তিনি এই স্থান সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,—

'খৃষ্টধর্ম্মে কাহাকেও দীক্ষিত করা যায় কি না, সেই চেষ্টায় আমি মসনদ-ই-আলির রাজ্যান্তর্গত ক্যাট্রাবোতে গিয়াছিলাম; কিন্তু দেখিলাম যে, সে স্থানের অধিবাসিবৃন্দ সকলেই মুসলমান। মোগল সম্রাটের অধিকৃত আগ্রা, লাহোর, প্রভৃতি নগরীতে যাতায়াত করে, এইরূপ কতিপয় বণিকও সেইস্থানে বাস করে।'(১)

---

* ঢাকা সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

(১) "I went also on a tour to Katrabo, which is in the lands of Mousandolin to see whether there would be any means of making conversions ; but I found that nearly all were Mahometans. There are also there some foreign merchants, who come and go

সেবাষ্টিয়ান্ ম্যান্‌রিক্ (Sebastian Manrique) নামক সেণ্ট্ অগষ্টাইন্ সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক স্পেনদেশীয় ধর্ম্মযাজক ১৬২৮ হইতে ১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতের বহুস্থান পর্য্যটন করেন। তিনি হুগলীতে এক বৎসর এবং চট্টগ্রামে ছয় বৎসর অবস্থান করেন, এবং উড়িষ্যা (১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দ), ঢাকা, গৌড়, রাজমহল, প্রভৃতি বহুস্থান পরিভ্রমণ করেন। বঙ্গের বহুস্থানে দীর্ঘকালব্যাপী পর্য্যটনের ফলে তাঁহার এতদ্দেশ সম্বন্ধে বহু তথ্য অবগত হইবার সুযোগ ঘটে। ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি Itinerario de las Missiones que hizo নামে এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, এবং উহা ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দে রোম নগরী হইতে প্রকাশিত হয়। উক্ত গ্রন্থ সাধারণতঃ ইটিনারারী(Itinerary)নামেই পরিচিত। ম্যান্‌রিক্ তদীয় ভ্রমণবৃত্তান্তে বঙ্গের বারভূঞার নামের এক তালিকা এবং তৎসঙ্গে তাঁহাদের বিশদ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। উক্ত তালিকার মধ্যে ক্যাট্রাবোর ভূঞাও (অর্থাৎ ঈশা খাঁ) বারভূঞার একতম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন (২)।

পি. আবেট্. ডি. ক্লিমেণ্ট টোসি (P. Abbate D. Clemente Tosi) প্রধানতঃ ম্যান্‌রিকের গ্রন্থ অবলম্বনে Dell' India Orientale descrittione geografica et historica নামক এক পুস্তক প্রণয়ন করেন, এবং ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে উহা রোম নগরী হইতে প্রকাশিত হয়। তাহাতে বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত মসনদ-ই আলির অধিকৃত ক্যাটাব্রো (Katabro, capo d'una provincia) নামক স্থানের উল্লেখ আছে (৩)।

ভারতের ওলন্দাজ অধিকারসমূহের তাৎকালীন শাসনকর্ত্তা ভ্যান্‌ডেন্‌ব্রুক্ (Van den Broucke) ১৬৫৮ হইতে ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে Nieuwe Kaarte van't Koninkryk Bengale নামক বঙ্গদেশের এক মানচিত্র অঙ্কিত করেন। এই সুপ্রসিদ্ধ মানচিত্র ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত ফ্রান্সিস্ ভ্যালেণ্টিন্ (Francis Valentyn) প্রণীত Beschryving van oost—Indien নামক গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডে মুদ্রিত হয়। উক্ত ভ্যান্ ডেন্ ব্রুকের মানচিত্রে ক্যাট্রাবো নামক একটি স্থান চিহ্নিত আছে (৪)।

আবুল্ ফজল্ রচিত সুপ্রসিদ্ধ 'আকবর-নামা' ও 'আইন্-ই-আকবরী'তে বহুস্থানে ক্যাট্রাবোর উল্লেখ ও বর্ণনা আছে। ঈশাখাঁর বিরুদ্ধে মোগল সেনাপতি সাহাবাজ খাঁর অভিযানের একটি সুন্দর বর্ণনা 'আকবর-নামাতে' লিপিবদ্ধ আছে। খিজিরপুরে নদীর উভয় তীরস্থ দুর্গদ্বয় অধিকার করিয়া, সাহাবাজ খাঁ সোণারগাঁ ও এবং ঈশা খাঁর বাসস্থান কত্রাভু নামক জনাকীর্ণ নগরী স্বীয় অধিকারভুক্ত করেন। আকবর-নামা পাঠে ইহা প্রতীত হয় যে, ঈশা খাঁর বাসস্থান অথবা রাজধানী কত্রাভুতে ছিল, খিজিরপুর নহে (৫)।

এই স্থানের নাম বিভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক বিভিন্ন রূপে লিখিত হইয়াছে ; এবং এমন কি আকবরনামার এক এক সংস্করণে এক এক স্থানে এক এক প্রকার উচ্চারিত হইয়াছে। বিব্লিয়োথেকা ইণ্ডিকা (Bibliotheca Indica) সংস্করণে কত্রাভু লিখিত আছে। লক্ষ্ণৌ সংস্করণেও উহার এইরূপেই উচ্চারণ করা হইয়াছে। আকবর-নামার (৭৩৩ পৃষ্ঠাতে) যে স্থানে ঈশা খাঁর সহিত

from Agra, Lahor, and other towns of the Great Mogor"—Translated from DU JARRIC, Bovrdeavs, 1614, Vol. iii., p. 829.

(২) MANRIQUE, *Itinerary*, as quoted in J. Proc, A. S. B., New series, Vol IX. (1913), p. 439.

(৩) CLEMENTE TOSI, Roma, 1669, as quoted in J.A.S.B., Vol. XLIV. (1875), Pt. I. p. 182.

(৪) Van den Broucke's Map, attached to VALENTYN, Vde Deel, Vol.V., Dordrecht, 1727.

(৫) শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় বলেন,—কত্রাভুতে ঈশা খাঁর অস্ত্রাগার ছিল। "বারভূঞা" ৫৩ পৃঃ, এবং "ঢাকার ইতিহাস," ১ম খণ্ড, ৪৪৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

রাজা মানসিংহের পুত্র দুর্জ্জন সিংহের নৌ-যুদ্ধের বর্ণনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সেই স্থানে কত্রাভূর উল্লেখ আছে। এই কত্রাভূর যুদ্ধেই দুর্জ্জন সিংহ পরাজিত ও নিহত হন। উক্ত সংস্করণদ্বয়ে পূর্ব্বোল্লিখিত স্থানে করাভূ,এবং শেষোক্ত স্থানে কত্রাভূ লিখিত হইয়াছে। 'ইণ্ডিয়া আফিসে' সংগৃহীত ২৩৬ নম্বর গ্রন্থ আকবর-নামার পাণ্ডুলিপিতে উক্ত উভয় স্থানেই কত্রাভূ লিখিত আছে। পারসীক ভাষায় লিখিতে গেলে কস্রাভূ ও কত্রাভূ শব্দদ্বয়ে কেবল একটি বিন্দুর পার্থক্য। সুতরাং, হয়ত উহা লিপিকর-প্রমাদও হইতে পারে। 'ইণ্ডিয়া আফিসের' ২৩৫ নম্বর গ্রন্থ—আকবর-নামার পাণ্ডুলিপিতে কত্রাভূ অথবা কত্রালু লিখিত হইয়াছে। (৬)

মাসির্-উল্-উম্রা নামক পারস্যভাষানিবদ্ধ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে, ৪৭৪ পৃষ্ঠাতে আলোচ্য স্থানকে কত্রাপুর নামে অভিহিত করা হইয়াছে। (৭)

ঈশা খাঁর বংশধর জঙ্গলবাড়ীর জমিদারগণ পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তিচিহ্নস্বরূপ কতিপয় সনদ সযত্নে রক্ষা করিতেছেন। ঢাকার ভূতপূর্ব্ব সিভিল সার্জ্জন স্বনামখ্যাত ডাক্তার ওয়াইজ তন্মধ্যে তিনখানা সনদের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার একখানা আলমগীর বাদশাহের রাজত্বের চতুঃচত্বারিংশৎ বর্ষে (১৭০০ খৃষ্টাব্দে) শাহাজাদা আজিম উশ্বান কর্ত্তৃক হায়াৎ মহম্মদের পুত্র হয়বৎ মহম্মদকে প্রদত্ত। ইনি ঈশা খাঁর বংশধর, এবং ইঁহার বংশীয়গন হয়বৎ নগরের জমিদার, এবং এই হয়বৎ মহম্মদের নামানুসারেই হয়বৎ নগরের নামকরণ হয়। উক্ত সনদের পৃষ্ঠে সরকার বাজুহার অন্তর্গত ক্যাট্রোবো পরগণার উল্লেখ আছে। (৮)

আবুল্ ফজল্ আইন্-ই আকবরী গ্রন্থে সরকার বাজুহার অন্তর্গত কাটারমল বাজু নামক মহালের উল্লেখ করিয়াছেন। জ্যারেট (Jarret) তৎকৃত আইন্-ই-আকবরীর অনুবাদে উহাকে কটারমল বাজু (Katarmalbazu) (৯) এবং ফ্রান্সিস গ্ল্যাডউইন্ (Francis Gladwin) (১০) তাঁহার অনুবাদে কাটারমল বাজু (Kuttermul Bazoo) লিখিয়াছেন। আকবরের সময়ে উক্ত মহালের বার্ষিক রাজস্ব ২,৮০৪,৩৯০ দাম (প্রায় ৭৫,০০০৲ টাকা) ধার্য্য ছিল। আইন্-ই-আকবরীতে স্থানান্তরে এই স্থানকে কাটাবল (Katabal) আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে। (১১) টিফেন্থেলার (Tiefenthaler) এই স্থানকেই কাটারবল (Katarbal), এই ঈষৎ বিভিন্ন নাম প্রদান করিয়াছেন।

আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, একই স্থানকে পাশ্চাত্য পর্য্যটকগণ ও মুসলমান ঐতিহাসিকগণ বিভিন্নপ্রকার বিকৃত আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, ক্যাট্রাবো, ক্যাটাত্রো, কাটারমল, কাটারবল, কাটাবল, করাভূ, কস্রাভূ, কত্রালু, কত্রাপুর, প্রভৃতি উল্লিখিত সমস্ত নামই কত্রাভূ শব্দের বৈদেশিক-সুলভ বিকৃত উচ্চারণ-প্রসূত।

---

(৬) H. Beveridge.—J. A. S. B., 1904, Pp, 58, 59.

(৭) *Ibid.*

(৮) "The Jangalbari family has only preserved three Sanads of any importance.—

One bears the name of Shahzada 'Azim, better known as 'Azim-ush-shan, and the date 44th Julus of 'Alamgir (1700)." Haibat Muhammad, son of Hayat Muhammad is the recipient of the Sanad.

"Among the parganahs enumerated on the reverse is—Parganah Katrabo, in Sirkar Bazuha."—Dr. J. Wise. J.A.S.B., Vol. XLIII. (1874), p. 214.

(৯) JARRETT, *Ain i Akbari*, Vol. II., p. 138.

(১০) GLADWIN, *Ayeen Akbery*, (Calcutta Edition), p. 468.

(১১) JARRETT, *Ain*, p. 404.

ডাক্তার ওয়াইজ, বেভারিজ, রেভারেণ্ড হণ্টেন্, প্রভৃতি অনেকেই কত্রাভূর স্থান নির্দ্দেশে প্রয়াসী হইয়াছেন। ডাক্তার ওয়াইজের মতে ক্যাট্রাবো এখন একটি তপ্পা, এবং উহা লক্ষ্যা নদীর তীরে, খিজিরপুরের বিপরীত তটে অবস্থিত। উহা বহুকাল হইতে ঈশা খাঁর বংশধরগণের সম্পত্তিভুক্ত ছিল (১২)। খিজিরপুর বর্ত্তমান নারায়ণগঞ্জের এক মাইল উত্তরে, ঢাকা নগরী হইতে নয় মাইল দূরে, এবং সোনারগাঁও হইতে তিন মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। ডাক্তার ওয়াইজ বলেন, ঈশা খাঁর বংশের এক শাখা অদ্যাপি ঢাকা জেলার অন্তর্গত ক্যাট্রাবোতে, এবং অন্য শাখাসমূহ ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত জাফরাবাদ ও বাঘলপুরে, এবং ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত হরিশপুরে বাস করিতেছেন (১৩)।

বেভারিজ সাহেব ১৯০৩ সনের ২রা ডিসেম্বর তারিখে বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির সভাতে "On 'Isa Khan, the ruler of Bhati, in the time of Akbar" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সোসাইটির ঐ মাসের কার্য্যাবলীতে (Proceedings) উক্ত প্রবন্ধের একটি সংক্ষিপ্ত সার প্রকাশিত হয়, এবং পরে ১৯০৪ সনের সোসাইটীর পত্রিকাতে সমস্ত প্রবন্ধটিই প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে বেভারিজ সাহেব কত্রাভূ সম্বন্ধে বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিয়াছেন।

ডাক্তার ওয়াইজ বক্তারপুরে ঈশা খাঁর আবাস ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অধ্যাপক ব্লক্‌ম্যান্ তৎ-কৃত আইন্-ই-আকবরীর অনুবাদে সন্দেহের সহিত বক্তারপুর নামটির উল্লেখ করিয়াছেন। বেভারিজ সাহেব অনুমান করেন যে, বক্তারপুর ভুল পাঠ, ঐ স্থানে কত্রাভূ হইবে (১৪)। কত্রাভূর স্থান নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া বেভারিজ বলেন, ডাক্তার ওয়াইজ ক্যাট্রাবোকে লক্ষ্যাতীরস্থ একটি তপ্পা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এক বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডকে তপ্পা বলে ; কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে অধুনা ঐ নামে কোন জনপদের অস্তিত্ব নাই। টিফেন্-থেলারের গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড সংলগ্ন মেজর রেণেলের অঙ্কিত মেঘনা ও লক্ষ্যানদীর মানচিত্রে লক্ষ্যা অথবা বানার নদীর দক্ষিণ তীরে, ঢাকা নগরীর উত্তরে, এবং একডালার কিঞ্চিৎ উত্তরে গোরাব নামক একটি স্থান চিহ্নিত আছে। সম্ভবতঃ, উহাই কত্রাভূ হইবে। মোগল সেনাপতি সাহাবাজ খাঁ সোনারগাঁও অধিকার করিয়া জলপথে লক্ষ্যানদী বাহিয়া, অথবা স্থলপথে উহার তটদেশ দিয়া, এগারসিন্দূর এবং টোক গমন করেন ; এবং তথা হইতে ব্রহ্মপুত্র দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন খাত, যাহা স্থানীয় ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক অদ্যাপি ব্রহ্মপুত্র নামেই অভিহিত হয়, তদ্দারা সাহাবাজ খাঁ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। আকবর-নামা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, সাহাবাজ খাঁ সোনারগাঁও অধিকার করিয়াই কত্রাভূ লুণ্ঠন করিবার জন্য অগ্রসর হন। সুতরাং, সাহাবাজ খাঁ সোনারগাঁও হইতে লক্ষ্যা দিয়া উত্তর দিকে কত্রাভূ অভিমুখে যাইয়া থাকিলে, আধুনিক গোরাবর অবস্থিতি বিবেচনা করিয়া দেখিলে, উহা কত্রাভূর সহিত অভিন্ন বলিয়াই মনে হয়, ইহাই বেভারিজ সাহেবের যুক্তি। (১৫)।

পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধের শেষভাগে বেভারিজ কত্রাভূর অবস্থান সম্বন্ধে মত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, এবং প্রবন্ধশেষে ঐকটি

(১২) J. A. S. B. Vol. XLIV. (1875), p.182.

(১৩) J.A.S.B., Vol. XLIII. (1874), p. 211.

(১৪) বেভারিজ সাহেবের অনুমান যথার্থ নহে। কারণ, বক্তারপুর নামক একটি গ্রাম এতদঞ্চলে অদ্যাপি বর্ত্তমান। ভাওয়ালের সুপ্রসিদ্ধ বেলাই বিলের পার্শ্বে, এবং আধুনিক কালীগঞ্জের সন্নিকটে, লক্ষ্যানদী হইতে অদূরে বক্তারপুর অবস্থিত। সম্ভবতঃ এই বক্তারপুরে ঈশা খাঁর একটি আবাসস্থল ছিল ; কারণ, এই স্থানে অদ্যাপি একটি মৃৎস্তূপ দৃষ্ট হয়, এবং জনপ্রবাদ এই যে, উহা ঈশা খাঁর সমাধি। "১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে মোগল সেনাপতি সাহাবাজ খাঁ পাঠান দলপতি মাসুম খাঁর পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাঁহাকে "ভাটি প্রদেশে" বিতাড়িত করেন। অতঃপর তিনি বক্তারপুর ধ্বংস করিয়া সোনারগাঁও অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন"।—ঢাকার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ৪৮৭ পৃষ্ঠা।

(১৫) H. Beveridge.—J. A. S. B., 1904, p. 59.

পরিশিষ্ট (Postscript) যোগ করিয়া তাহাতে লিখিয়াছেন, ডাক্তার টেল্যার ও হান্টারের উল্লিখিত ঢাকা জেলার অন্তর্গত সাভারের সন্নিকটস্থ কাটিবাড়ী ও কত্রাভু সম্ভবতঃ অভিন্ন। টেলার ও হান্টার লিখিয়াছেন,—'হরিশ্চন্দ্র নামক জনৈক বুনিয়া রাজা সাভারের সন্নিকটস্থ কাটিবাড়ীতে রাজত্ব করিতেন।' হান্টারের পুস্তকে কাটিবাড়ীকে 'কাথোরাবো তপ্পে' নামেও অভিহিত করা হইয়াছে। বেভারিজ অনুমান করেন, এই কাটিবাড়ী অথবা কাথোরাবো এবং কত্রাভু অভিন্ন (১৬)।

কত্রাভুর অবস্থিতি সম্বন্ধে বেভারিজের অনুমান সুধীসমাজে আদৃত হয় নাই। একই প্রবন্ধে দুই প্রকার অনুমান করা হইতেই প্রতীয়মান হইতেছে যে, বেভারিজ নিজেও তাঁহার অনুমানের উপর তাদৃশ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। কেবল নামের সাদৃশ্য দেখিয়াই বেভারিজ গোরাব এবং কাটিবাড়ীকে কত্রাভুর সহিত অভিন্ন মনে করিয়াছেন, এইরূপই অনুমিত হয়। আমরা যতদূর জানি, তাহাতে গোরাবতে কোন মুসলমান নৃপতির কীর্ত্তিচিহ্নাদি এবং এমন কি তৎসম্বন্ধীয় কোন কিংবদন্তী পর্য্যন্ত প্রচলিত নাই, যদ্দারা বেভারিজের অনুমান সমর্থিত হইতে পারে। টেলার ও হান্টার যে স্থানকে কাটিবাড়ী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তাহার প্রকৃত নাম কোটবাড়ী। পূর্ব্ববঙ্গে চলিত ভাষায় দুর্গকে কোট বলে। সাভারেরই এক অংশে একটি পরিখা ও প্রাকারবেষ্টিত স্থানকে কোটবাড়ী বলা হয়। জনপ্রবাদ এই যে, এই স্থানে বৌদ্ধরাজা হরিশ্চন্দ্র পালের একটি দুর্গ ছিল। সাভারে ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে হরিশ্চন্দ্র রাজার বহু কীর্ত্তিচিহ্নাদি অদ্যাপি বর্ত্তমান (১৭)। সোনারগাঁও অঞ্চলে ঈশা খাঁ মসনদ-ই-আলির বহু কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি গ্রাম্য ব্যক্তিগণও দেখাইয়া দেয়; কিন্তু সাভার অঞ্চলে তাঁহার নাম সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। এতদঞ্চলে একটি মৃৎস্তূপের ইতিহাসও ঈশা খাঁর নামের সহিত জড়িত আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। গোরাব অথবা কাটিবাড়ীর সহিত কত্রাভুর ঐক্য সাধন করিবার চেষ্টা বেভারিজ সাহেবের সম্পূর্ণ স্বকপোলকল্পিত; এবং তাঁহার অনুমান অতি দুর্ব্বল ভিত্তির উপর স্থাপিত।

রেভারেণ্ড এইচ্ হষ্টেনও (Rev. H. Hosten) বেভারিজের উক্তির উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। তাঁহার মতে সোনারগাঁওর অধঃপতনের পরে কত্রাভু সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে, এবং উহা সোনারগাঁর সন্নিকটেই অবস্থিত ছিল। হষ্টেন ডাক্তার ওয়াইজের অনুমান সমীচীন বোধ করেন, এবং তাহার সমর্থনার্থ যে প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। ভ্যান্ ডেন্ ব্রুকের মানচিত্রে সোনারগাঁর দক্ষিণে অতি সন্নিকটেই ক্যাট্রাবো চিহ্নিত আছে। ইহা দ্বারা ডাক্তার ওয়াইজের সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয় (১৮)।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় তৎপ্রণীত "ঢাকার ইতিহাসে" কত্রাভুর স্থান নির্দ্দেশ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—উহা "লক্ষ্যানদীর তীরে অধুনা তপ্পা কাটারব নামে প্রসিদ্ধ খিজিরপুরের বিপরীত দিকে অবস্থিত। * * * * বিভারিজ সাহেবের অনুমান আমাদের নিকট সমীচিন বলিয়া বোধ হয় না। আকবর-নামায় সাহাবাজের অভিযানের যে একটি সুন্দর বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তৎপাঠে এই স্থানকে "পনার" বা লক্ষ্যাতীরে নির্দ্দেশিত করাই যুক্তিসঙ্গত (১৯)।"

(১৬) H. Beveridge.—J. A. S. B., 1904, p. 62.

(১৭) রাজা হরিশ্চন্দ্র পালের বিস্তৃত বিবরণ এবং তাঁহার কীর্ত্তিচিহ্নাদির বহু চিত্র মৎ-প্রণীত ঢাকা সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাবলীভুক্ত "পূর্ব্ববঙ্গে পালরাজগণ" নামক পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে।

(১৮) Rev. H, Hosten.—J. Proc. A. S, B., 1913, pp. 440, 441.

(১৯) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় প্রণীত "ঢাকার ইতিহাস," প্রথম খণ্ড ৪৪৮, ৪৪৯ পৃষ্ঠা।

আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, বেভারিজ কর্ত্তৃক কত্রাভুর স্থান-নির্দ্দেশ সুধীসমাজে গৃহীত হয় নাই; পরন্তু, ডাক্তার ওয়াইজের সিদ্ধান্তই সকলে সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। বেভারিজ সাহেব ডাক্তার ওয়াইজের মতের প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন,—'খিজিরপুরের সন্নিকটে ক্যাট্রাবো নামক কোন স্থান নাই।' কিন্তু, প্রকৃতপ্রস্তাবে খিজিরপুরের প্রায় বিপরীত দিকে লক্ষ্যাতীরে কাটারব নামক একটি তপ্পা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় সেই স্থানেই ক্যাট্রাবোর স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ডাক্তার ওয়াইজও সম্ভবতঃ এই স্থানেরই উল্লেখ করিয়াছেন। আমরাও ডাক্তার ওয়াইজের মতই গ্রহণ করিলাম।

বিশেষতঃ, ভ্যান্ ডেন্ ব্রুকের মানচিত্রে ঢাকা নগরীর কিঞ্চিৎ উত্তরে লক্ষ্যা নদীতীরে খিজিরপুর (Chidderpoer) চিহ্নিত আছে; এবং খিজিরপুরের ঠিক বিপরীত দিকে লক্ষ্যাতীরে, এবং ব্রহ্মপুত্রতটস্থ সোনারগাঁও (Sonnergam) নগরীর কিঞ্চিৎ পশ্চিমে ক্যাট্রাবো (Catterabo) নামক স্থান অঙ্কিত আছে। ডাক্তার ওয়াইজের বর্ণনা এই মানচিত্রের সহিত অবিকল মিলিয়া যাইতেছে। সুতরাং, তাঁহার সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণিত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। ভ্যান্ ডেন্ ব্রুকের মানচিত্র হইতেই বেভারিজের অনুমান সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া যায়।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর।

প্রতিজ্ঞা যৌগন্ধরায়ণ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তৃতীয় অঙ্ক

ভিণ্ডিকবেশী বিদূষকের প্রবেশ।

বিদূ। (চতুর্দ্দিকে দেখিয়া) তাইত, শূন্য শিবালয়ের অলিন্দে মোদকমল্লকটি রেখে, স্বর্ণখণ্ডগুলি গুণে বেঁধে রেখে, এইত ফিরে আসছি, এর ভেতরেই মোদকটি উড়ে গেল! (চিন্তা করিয়া) তাওত বটে—একটা মোদক পেয়েই তাতেই মজে রয়েছে, আমার পেছন ধরে নি। দেয়াল এত উচু যে কুকুরের বাবারও সাধ্য নেই যে এখানে ঢুকতে পারে। পথিকের সঙ্গে খাবার থাকে প্রচুর, কোন পথিকও যে আমার গোটা মোদকটি নিয়ে চম্পট দেবে এও তো মনে হয় না। আচ্ছা, এটা তবে খাই। খেলুম ত; এখন তবে উদ্গার করা যা'ক। উদ্গার কল্লে কি হবে? শূকরের মূত্রাশয়-চর্ম্ম বাজা'লে বাতাস ছাড়া আর কিছুই বেরোয় না—উদ্গার কল্লে'ও ঠিক তাই। ভদ্রকালীর জিনিষ আমারই জিনিষ মনে ক'রে শিবঠাকুর ত মোদকটি হস্তগত করেন নি? লোকে বলে শিবঠাকুর বৈরাগী, কিন্তু হ'লে কি হয়, অনেক বিষয়ে ত তার উল্টো দেখছি। আচ্ছা, দেখা যা'ক। এই যে আমার মোদকমল্লক। একেবারে শিবের পা'র কাছে কেন বাবা? যাবে কোথায়? এই নিচ্ছি তু'লে। শিব ঠাকুর দাও বাবা, আমার মোদকটি। শেষে তুমিই আমার মোদকটি চুরি কল্লে? হায়! হায়! এ ত মোদক নয়। এ যে মোদকের ছবি আঁকা রয়েছে। মনের দুঃখে চোখ জলে ভরে গেছে, তাই দেখতে পাচ্ছি না ঠিক। আচ্ছা, একটু ঘসেই দেখা যা'ক না! সাবাস! সাবাস! খাসা ছবি এঁকেছ বাবা! একেবারে চোস্ত! যেখানেই ঘস্‌ছি, সেখানেই রং ফুটে বেরুচ্ছে! খাসা রং ফলিয়েছ বাবা। এবার জল দিয়ে ধোব। তাই ত, জল পাই কোথা! বাঃ! এই যে খাসা তড়াগ রয়েছে এখানে! শিব ঠাকুর, মোদক-মল্লকে আমি যেমন নিরাশ হ'য়েছি, তুমিও তেমনি নিরাশ হবে। (নেপথ্যে) মোদক! মোদক! মোদক গেলি কোথা?*

---

* দেবকুল পীঠিকায়াং = শিবালয়ের অলিন্দে। গূঢ়ার্থ—মহাসেনের বংশের অলঙ্কাররূপিণী বাসবদত্তায়।

মোদক মল্লকং = নারিকেল ও গুড়ের প্রস্তুত মিষ্ট দ্রব্য

বিদু! হায়! হায়! বর্ষাকালের কাদামাখা ঘোলা জল যেমন পথ দিয়ে হু হু শব্দে চলে যায়, ঐই পাগলা আমার মোদকটি চুরি করে হাসতে হাসতে দৌড়ে পালাচ্ছে। ওরে পাগলা, থাম, থাম। এই লাঠি দিয়ে তোর মাথা

বিশেষ। গূঢ়ার্থ—বাসবদত্তার প্রতি অনুরক্ত মহারাজ উদয়নকে (জানিয়ে)।

দক্ষিণামাসকাণি=মাসের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বর্ণখণ্ড। গূঢ়ার্থ—(১) রাজা মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণকে যে সকল উপদেশ-বাক্য বলে দিয়েছেন। অথবা (২) বিশাখাদি সুহৃদ্বর্গ।

গণিয়ন্তা=গ'ণে। গূঢ়ার্থ—(১)মনে গেঁথে। (২) আমরা আগামী কল্যই কৌশাম্বী যাব স্থির করেছি, ইহা সুহৃদ্বর্গকে তাহাদের থাকার যায়গায় গিয়ে জানিয়ো।

মোদকং ন পশ্যামি=মোদকটি দেখ্‌ছি না। গূঢ়ার্থ—সমস্ত সুহৃদের সন্তোষের পাত্র মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণকে দেখছি না।

একমোদকপরিতোষিতঃ অবলগ্নঃ=এক'টা মোদক লাভ করেই সন্তুষ্ট; গূঢ়ার্থ—বৎসরাজকে বন্দী করে তাঁকে বশে রাখবার জন্যই চেষ্টিত।

ন মাং অনুসরতি=সুতরাং (অবলগ্ন) প্রচ্ছন্ন-প্রয়োজন-নিপুণ মহাসেন কেবল বৎসরাজকে অধীনে রাখবার জন্যই ব্যস্ত। তিনি আর কিছুই কত্তে উৎসুক ন'ন। (তবে যৌগন্ধরায়ণ এলেন না কেন?)

প্রাকারস্য উচ্চতয়া অগতিঃ কুক্কুরাণাং=গূঢ়ার্থ—প্রদ্যোতের মন্ত্রীরা প্রাকারের ন্যায় যৌগন্ধরায়ণের উন্নত বুদ্ধি অতিক্রম কত্তে অসমর্থ (সুতরাং তাঁরাও আমাদের উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন নাই। তবে যৌগন্ধরায়ণ এলেন না কেন?)

অক্ষত-ভক্ষ্যতাং গোভর্নীয়ঃ পথিকানাম=গূঢ়ার্থ—(তবে কি) চরগণ (পথিকেরা) আমাদের উদ্দেশ্য অবগত হ'ল? না, তাও সম্ভব নহে; কারণ মহাসেন বৎসরাজকে বন্দী করে এত সন্তুষ্ট হয়েছেন যে, তৎপ্রদত্ত বস্ত্রালঙ্কার গন্ধ-লেপন প্রভৃতির উপভোগ নিয়েই এখন তাঁরা ব্যস্ত।

অথবা অপ্যেনং খাদামি। ভবতু উদ্গারয়িষ্যে তাবদহম্। হী-হী বৃদ্ধ ইব সুকরবস্তিঃ শুন্যান্তরেব লিপামি=গূঢ়ার্থ—(তবে কি) আমাদের পক্ষের সকলেই বিনষ্ট হয়েছে? আচ্ছা চিন্তা করা যা'ক (উদ্গারয়িষ্যে)। কৈ, এই নগরে আসা অবধি সকলই ত বাতাসের মত হু-হু করে ঘুরে বেড়াচ্ছি; (কোথাও ত আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধির প্রতিকূল কোনও কথা শুনি নি!)

অথবা লোহিত কার্ত্যায়ন্যাঃ সম্বন্ধী মম সম্বন্ধীতি কৃত্বা শিবেন প্রতিহস্তীকৃতো ভবেৎ=গূঢ়ার্থ- অথবা (উদয়ন) বাসবদত্তার (=লোহিতকার্ত্যায়ন্যাঃ) অনুরাগবদ্ধ হয়েছেন; যৌগন্ধরায়ণ (=শিব) তা জানেন না, সুতরাং নিজের অসাবধানতায় সমস্ত নষ্ট করে ফেলেছেন!

যদ্যপ্যেষ ব্রহ্মচারী বহুকে রূপৈর্বিনয়ং করোতি=গূঢ়ার্থ—কিন্তু ব্রহ্মচারী (প্রবল যৌগন্ধরায়ণ) সামাদি উপায় দ্বারা কারারুদ্ধ উদয়নকে উদ্ধার কত্তে সমর্থ বটেন।

ভবতু দ্রক্ষ্যামি তাবদহম্=গূঢ়ার্থ—আচ্ছা,গর্ভগৃহে প্রবেশ করে দেখা যা'ক।

হা! হী! সাধু রে চিত্রকর! ভাব! সাধু। যুক্তলেপতয়া বর্ণানাং যথা যথা প্রমার্জ্জি তথা তথোজ্জ্বলতরং ভবতি=গূঢ়ার্থ—হে বিচিত্র কর্ম্মকুশল যৌগন্ধরায়ণ, আপনি প্রভু উদয়নের মুক্তির পক্ষে বিশাখাদি সুহৃদ্বর্গের যে যে বেশাচ্ছাদন প্রতিকূল বলে প্রকাশ করেছিলেন, শেষে তাহাদিগের যথোপযুক্ত পরিবর্ত্তন দ্বারা বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। (আপনার মত মন্ত্রী পৃথিবীতে দুর্লভ!)

ভবতু উদকেন প্রমার্জিষ্যামি=গূঢ়ার্থ—অনবদ্যাঙ্গী বাসবদত্তা দ্বারাই প্রভু উদয়নের মনোভাবের শোধন করিতে হইবে।

অহমিব শিবোঽপি তাবৎ এতস্মিন্ মোদকমল্লকে নিরাশো ভবতু=গূঢ়ার্থ……যৌগন্ধরায়ণও আগামী কল্য কৌশাম্বী-গমনে নিরাশ হ'ক; আর বাসবদত্তাকেও কৌশাম্বী নিয়ে যাওয়ার যে পরামর্শ হয়েছে, তাতেও মন্ত্রীরা অকৃতকার্য্য হ'ক।

ভাঙ্গব।

উন্মত্তকের প্রবেশ।

উন্মত্তক। মোদক, মোদক, হায় রে মোদক, হা হা হা!

বিদূ। ওরে পাগলা, আন আমার মোদক!

উন্ম। মোদক! কি মোদক, কোথায় মোদক? কার মোদক? মোদক দিয়ে কি করে—দান করে, ভালবাসে, না, খায়? মোদক দিয়ে করে কি?

বিদূ। দানও করে না, খায়ও না।

উন্ম। কিন্তু, এই দেখ, আমার জিভ খেতে চাচ্ছে।

বিদূ। ওরে পাগলা, শীগ্‌গির আমার মোদক এনে দে। দেখ, পরের জিনিষে লোভ ক'রে মজিস্ নি।

উন্ম। সব বেটারাই আমায় জ্বালাতন করে। কিন্তু, সত্যি বলছি—মোদকগুলিই আমায় বাঁচিয়ে রাখে, বাবা। নানা রকম করে তৈরি গুড়নারকেলের মোদক খেতে ভারি মজা। কোথায় পথে অনেক জিনিয দিয়ে কিনেছি—কিন্তু অনেক দিন ধরে সাথে ছিল তাই বাঁধটা একটু আল্‌গা হয়েছে।

বিদূ। ওরে পাগলা, এখনও বলছি, আমার মোদক আন। এই মোদকের জোরেই আমায় গুরু মশায়ের বাড়ী যেতে হবে।

উন্ম। আর এই মোদকের জোরে আমার এক শ যোজন পথ চল্‌তে হবে।

বিদূ। বেটা তুই কি ঐরাবত যে এক শ যোজন যাবি?*

উন্ম। আমি ঐরাবত না ত কে? তবে দেবরাজ ইন্দ্র আমার পিঠে চড়েন, আমি তেমন ঐরাবত নই। দেখ, আমি শুনেছি, বৃষ্টি-ধারার নিগড় দিয়ে ইন্দ্র একবার পাশে বাঁধা পড়েছিল। তারপর বিদ্যুৎ-কশা মেরে আর ঘূর্ণিবায়ু তুলে ইন্দ্র মেঘের বাঁধন ভেঙ্গে দিয়েছিল।

বিদূ। দেখ পাগলা, যদি মোদক না দিস, তবে আমি কাঁদব।

উন্ম। কাঁদ, কাঁদ, কে তোকে বারণ কচ্ছে? চীৎকার করে কাঁদ্।

বিদূ। ওগো, কে কোথা আছ। অধর্ম্ম হ'ল, অধর্ম্ম হ'ল।

উন্ম। বেশ, তা হ'লে আমিও কাঁদব—ও গো ইন্দ্রকে বেঁধেছে,

---

* অনেন দণ্ডকাষ্ঠেন শীর্ষং তে ভিনদ্মি = গূঢ়ার্থ = এই জিহ্বার সাহায্যে তোমার অভিপ্রায় বুঝব।

মোদকাঃ মোদকাঃ = গূঢ়ার্থ—হে সুহৃদ্বর্গ।

আনেহি মম মোদক-মল্লকং = গূঢ়ার্থ—হে যৌগন্ধরায়ণ, আপনি কি মন্ত্রণা করেছেন, বলুন।

কিং মোদকাঃ। কুত্র মোদকাঃ। কস্য মোদকাঃ। কিমিমে মোদকা উৎসৃজ্যন্তে, অথবা প্রণীয়ন্তে উতাহো খাদ্যন্তে = গূঢ়ার্থ—আমি সুহৃদ্বর্গের সহায়ে অসিহস্তে বদ্ধ-পরিকর হয়ে মহাসেনকে বধ করব।

ন খাদ্যন্তে ন খাদ্যন্তে ন উৎসৃজ্যন্তে চ = গূঢ়ার্থ—মহাসেনকে নিগৃহীত করা আপনার ইচ্ছা, আমারও তাই।

মোদকাঃ খলু মাং রক্ষন্তি = গূঢ়ার্থ—সুহৃদেরাই আমাকে রক্ষা করে।

নেপথ্যবিশেষমণ্ডিতাং প্রীতিমুৎপাদয়িতুমপস্থিতা = গূঢ়ার্থ—যা'তে শত্রুর মনে সন্দেহ না হ'তে পারে, এরূপ পরিচ্ছদে ভূষিত, এবং রাজার (উদয়নের) প্রীতি উৎপাদনে সমর্থ।

রাজগৃহদত্ত মূল্যা কালবশেন মুহূর্ত্ত-দুর্ব্বলা = গূঢ়ার্থ—এরা রাজগৃহে মাইনে পেয়ে থাকে, মুনির শাপে এখন একটু দুর্ব্বল, কিন্তু আমি যখন তাদের নিযুক্ত করেছি, তখন ক্ষমতাশালী।

ভো উন্মত্তক, আনয় মম মোদক-মল্লকং। অনেন প্রত্যয়েন উপাধ্যায়কুলং গন্তব্য = গূঢ়ার্থ—হে যৌগন্ধরায়ণ নির্জ্জন স্থানে চলুন। মহারাজ তাঁর অভিপ্রায় জানাইবার যে সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন ঠিক সেই সময়ে তাঁর গৃহে যেতে হবে।

* কিমৈরাবণস্ত্বম = গূঢ়ার্থ, আপনি আগামী কল্য শত্রুহস্তে বন্দী মহারাজকে উদ্ধার কর্ত্তে পার্‌বেন।

আম ঐরাবণোঽহম্ = গূঢ়ার্থ—হাঁ, সামাদি উপায় দ্বারা আমি উদ্দেশ্য সিদ্ধি কর্ত্তে সমর্থ।

ইন্দ্রকে বেঁধেছে।

বিদূ। হায়! অধর্ম্ম হ'ল—অধর্ম্ম হ'ল!

(নেপথ্যে)

ব্রাহ্মণ, ভয় নেই, ভয় নেই।

বিদূ। চাঁদ দেখা দিলে নক্ষত্রও সব দেখা দেয়। বামুনদের থিক্? এই শ্রবণকই আমাকে অভয় দিল!

*শ্রমণকের প্রবেশ

শ্রম। ওহে ব্রাহ্মণ, ভয় নেই, ভয় নেই। এখানে কে? কি হয়েছে? কাঁদ্‌ছ কেন?

বিদূ। হায়! হায়! এই শ্রমণক কি পাহাড়া-ওয়ালার কাজ কচ্ছে নাকি? দেখ শ্রমণক মশায়, এই পাগলা আমার মোদক নিয়েছে—দিচ্ছে না।

শ্রম। দেখি, কেমন মোদক।

উন্ম। শ্রমণক মশায়, দেখ, এই দেখ।

শ্রম। থুথু!

বিদূ। হায়! হায়! ধিক্ আমাকে! এই শ্রমণক পাগলের হাঁতে পথ্য ক'রেই অমনি ঐই কপাল-পোড়ার মোদক দেখতে পেলে।

শ্রম। দেখ পাগলা, মোদক বের কর। এই মোদক দেখ্‌তে কণ্ডুরীর ফেনার মত পাণ্ডুর, খেঁতে মদের মত মধুর, আর মেয়ের শব্দ করে চুষে খেয়েছে ব'লে বড় উপাদেয়! যদি তুই খাস্, যক্ষ্মা হবে।

বিদূ। হায়! মোদক মোদক ক'রে আমার মোদকটি নিয়ে নিল!

শ্রম। পাগলা, বের কর মোদক। না বের করবি ত, তোকে শাপ দেব।

উন্ম। শ্রমণক মশায়, রাগ ক'রো না, রাগ ক'রো না। আমায় শাপ দিও না। এই দিচ্ছি মোদক।

শ্রম। ওহে ব্রাহ্মণ, দেখলে আমার তেজ?

বিদূ। কি! শ্রমণকের শাপের কথা শোনা মাত্রই পাগলা ভয়ে ভয়ে আঙ্গুলের আগা দিয়ে মোদকটি ধ'রে হাত বাড়িয়ে রয়েছে!

শ্রম। যাও যাও, ঠাকুর, এই মোদকগুলি আমায় দান কর।

বিদূ। হা! হা! আমার মোদক দান করব? আমার কুটুম্ব আমাকে এই মোদক দান করেছে। আচ্ছা, এগুলি আপনাকেই উপহারস্বরূপ দিচ্ছি, এতে তার অবস্থা ভাল হবে।

এই পাগলা অগ্নিগৃহের দিকে যাচ্ছে—দুপুরও হ'য়েছে। দুপুর বেলায় এখানে কেউ থাকে না। আমিও এই স্বর্ণ-খণ্ডগুলি মার্গ-গৃহে রেখে ওদিক পানেই যাই। একজনে চায় সাড়ী, আর একজনে চায় দাঁড়ী!

(সকলের অগ্নিগৃহে প্রবেশ)

যৌগন্ধরায়ণ। বসন্তক, এই অগ্নিগৃহে এখন কেউ নাই।

বিদূষক। হাঁ, এখন কেউ নাইই বটে।

যৌগ। তা'হলে দুজনে একবার কোলাকুলি ক'রে নিন।

উভয়ে। বেশ কথা (আলিঙ্গন)।

---

* ন খলু তাবৎ দেবরাজো মামাসনমারোহতি=গূঢ়ার্থ—প্রভু উদয়নের বুদ্ধি আমার প্রয়াসকৃত কর্ম্মের উদ্দেশ্য অনেক সময় বুঝ্‌তে পারে না, (তখন আমি কৃতকার্য্য হই না), কিন্তু প্রভু উদয়ন আমার উদ্দেশ্য বুঝ্‌তে পার্লে আমি অবশ্যই কৃতকার্য্য হ'ব।

বিলপিষ্যমি তাবদহম্=গূঢ়ার্থ—আমি রোদনের ছলে রুমণ্বানের নিকট আমাদের আগমন প্রকাশ করে দেব।

সোঽপি সমৃদ্ধো ভবতু=গূঢ়ার্থ—মহারাজ বাসবদত্তাকে লাভ করুন।

যাবদহমপীর্ধানি দক্ষিণামাষকাণি মার্গ-গেহে নিক্ষিপ্য গচ্ছামি=গূঢ়ার্থ—রাজা কারাগারে থেকে আমায় যা বলে দিয়েছেন তা মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের নিকট বলে আমি চলে যাব।

একস্য শাটিকয়া কার্য্যমপরস্য মূলেন=গূঢ়ার্থ—রাজার প্রয়োজন বাসবদত্তাপ্রাপ্তি, আর মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের প্রয়োজন রাজার মুক্তি।

যৌগ। আপনাদের দু জনেরই সমান পরিশ্রম হ'য়েছে। আপনি বসুন; আপনিও বসুন।

উভয়ে। হাঁ, তাই; বসছি।

(সকলের উপবেশন)

যৌগ। বসন্তক ঠাকুর, রাজার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে কি?

বিদু। হাঁ, হ'য়েছে।

যৌগ। যা হ'ক, রাত এখন কেটে গেছে; দিনের আশায় ব'সে আছি।

দিন কেটে গেলে লোকে রাত্রির অপেক্ষা করে। শুভ প্রভাত বেলায় দিনের চিন্তা আসে। যারা ভবিষ্যতে অমঙ্গল আশঙ্কা করে, তারা অতীতের কথা ভেবেই সুখ লাভ করে।

রুমণ্বান। আপনি ঠিক কথা বলেছেন। সময়ের হিসাবে দিন-রাতের কোনও প্রভেদ না থাকলেও, বন্ধনাদিতে রাত্রিটা বিপদজনক। যে সকল শত্রুর সঙ্গে ব্যবহার করা অসাধ্য, যারা অননুরক্ত, দিনের বেলায় যাদের সব দোষ দেখা গিয়েছে, রাত্রিকালেই সেই সকল শত্রুর ভয়।

যৌগ। মহারাজের সঙ্গে আপনার আলাপ হ'য়েছে, বসন্তক ঠাকুর!

বিদু। হাঁ, অনেকক্ষণ তাঁর কাছ থেকে বিদায় হয়েছি। আজ চতুর্দ্দশীতে স্নান কর্‌লে পর তাঁর সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল।

যৌগ। কি, মহারাজ স্নান করেছেন!

বিদূ। হাঁ, মহারাজ স্নান করেছেন।

যৌগ। স্নানের পর দেবকার্য্য করেছেন?

বিদূ। হাঁ, মাত্র প্রণাম করেই দেবার্চ্চনা ক'রেছেন।

যৌগ। মহারাজ এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন! হায়, স্নানান্তে দেবকার্য্যের সময় যাঁর পুণ্যাহ বাক্য শেষ হওয়া মাত্রই ঢাকঢোল বেজে উঠত, আজ দুঃসময় বলে প্রণাম মাত্রে দেবারাধনা করার সময় তাঁর হস্ত-শৃঙ্খলগুলি বেজে ওঠে!

রুম। আপনার যত্নে মহারাজ আবার চিরাভ্যস্ত তিথি পূজা শীঘ্রই কর্ত্তে পাবেন।

যৌগ। বসন্তক, আবার গিয়ে মহারাজের সঙ্গে দেখা করুন। মহারাজকে বলবেন, পূর্ব্বে যে পরামর্শ স্থির হয়েছিল, কালই সেইমত কার্য্য কর্ত্তে হবে। নলাগিরি হস্তী যেখানে নানাভাবে অবস্থান করে, যেখানে স্নান করে, যেখানে শয়ন করে, যেখানে চরে বেড়ায়, যেখানে আশ্রয় গ্রহণ করে, সে সকল স্থানেই ওষধি প্রয়োগ করা হয়েছে এবং মন্ত্র, ওষধি, এবং পুরাণোক্ত যে সকল কর্ম্মদ্বারা হস্তী বশীভূত হয়, বিধি অনুসারে সমস্ত ক'রে নলাগিরিকে আয়ত্ত করা হয়েছে। এরূপভাবে ধূপ সাজিয়ে রাখা হ'য়েছে যে, নলাগিরি অনুকূল বায়ুচালিত ধূপগন্ধ পেতে পারে। আর যদি নলাগিরি ক্ষেপে যায়, তা'হলে তার প্রতিবিধানের জন্যও প্রতিদ্বন্দ্বী গজের মদগন্ধের বন্দোবস্ত করা হ'য়েছে। হাতী সাধারণতঃ আগুন দেখলে ভয় পায়; তাই আমাদের আড্ডাঘরের কাছে সামান্য উপকরণ দিয়ে তৈয়ারি একটি ঘর করা হয়েছে, যেন দরকার হলে তাতে আগুন দেওয়া যায়। হাতীর চিত্ত বিভ্রান্ত করার জন্য দেবমন্দিরে শঙ্খ দুন্দুভি স্থাপিত হয়েছে। সেই শঙ্খ দুন্দুভির তুমুল বাদ্য শুনলে মহারাজ প্রদ্যোত সসৈন্যে আত্মসমর্পণ কর্ত্তে বাধ্য হবেন। তা'হলেই মহারাজ মহাসেনের অনুমোদন পেয়েই প্রভু বৎসরাজ কারাগার হতে মুক্ত হয়ে, একসঙ্গে বিপন্না বীণা ঘোষবতীকে হস্তগত ক'রে নলাগিরিকেও বশীভূত কর্ত্তে পারবেন। তার পর নলাগিরি বশীভূত হ'লে, তখনই তার পিঠে চড়ে তাকে সৈন্যগণের সঙ্গে মনের ন্যায় দ্রুতবেগে চলতে বাধ্য করবেন, এবং সিংহগর্জ্জন শেষ হ'তে না হ'তেই (অতি প্রত্যুষে) বিন্ধ্য পর্ব্বত ও তাহার মূলদেশস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশ ছাড়িয়ে এবং একদিনের মধ্যেই বিপদ ও বন অতিক্রম ক'রে স্বীয় রাজধানীতে উপস্থিত হবেন। মহারাজকে আরও বলবেন, যেমন তাঁকে হাতীর ছলে বন্দী করেছিল, আমরাও তেমনি হাতীর ছলে তাঁকে মুক্ত করব।

বসন্ত। বসন্তক ঠাকুর, ভাবছেন কি ?

বিদূ। আমি ভাবছি যে আপনাদের এত চেষ্টা সব ব্যর্থ হবে।

উভয়ে। তা কি ক'রে আগে বলব, বলুন।

বিদূ। আমি বলছি, আপনারা পরে দেখবেন।

যৌগ। আমাদের চেষ্টা নিষ্ফল হওয়ার কারণ ?

বিদূ। কারণ, বৎস-রাজের নিজের দোষ।

যৌগ। কি রকম ?

বিদূ। তবে শুনুন।

উভ। শুনছি, বলুন।

বিদূ। কৃষ্ণাষ্টমীর পরদিন রাজকুমারী বাসবদত্তা শিবিকায় চ'ড়ে যক্ষিণীর মন্দিরে পূজা দিতে গিয়েছিলেন। সঙ্গে শুধু দাসী ছিল, আর কেউ ছিল না। কুমারী ব'লে রাজকুমারীর শিবিকা কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল না। আর, নগরের জলনালীর জল ছুটে সমস্ত রাজপথ ভাসিয়ে দিয়েছিল; কাজেই কুমারী বাসবদত্তার শিবিকা কারাগারের সম্মুখ দিয়ে গিয়েছিল।

যৌগ। তার পর।

বিদূ। তখন কারারক্ষী শিবকের সম্মতি পেয়ে মহারাজ কারাগারের দরজায় এলেন।

উভয়ে। তার পর।

বিদূ। তার পর শিবিকা-বাহকেরা যখন কাঁধ বদলাচ্ছিল, তখন রাজা বাসবদত্তাকে বেশ ক'রে দেখে নিলেন।

যৌগ। দেখলেন, তার পর।

বিদূ। তার পর আর কি—কারাগার প্রমদবন হ'ল,—রাজা প্রেমালাপে প্রবৃত্ত হ'লেন।

যৌগ। তা ব'লে রাজা বাসবদত্তার প্রতি অনুরক্ত হন নি।

বিদূ। মন্ত্রী মশায়, অনর্থ একলা আসে না, এটা ধ্রুব।

যৌগ। সখা রুমণ্বান, এবার মন স্থির কর—এই পোষক নিয়েই বুড় হতে হ'বে।

বিদূ। আর মহারাজ আমাকেও ব'লে দিয়েছেন আপনাকে বলতে যে, যে পরামর্শ আপনারা স্থির করেছেন, সেটা তিনি ভাল মনে করেন না। যদি সসম্মানে যাওয়া যায়, তবেই প্রদ্যোতের অপমান হবে ; সেটা আপনারা ভেবে দেখুন। রাজা আরও বললেন, তাই ব'লে তোমরা আমাকে কামুক মনে ক'র না। যাতে অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া যায়, সেটাই আমার একান্ত ইচ্ছা।"

যৌগ। এই কথা শুনলে আমাদের শত্রুরাও সব হাসবে। কি নির্লজ্জতা ! এটা বন্ধু-বান্ধবেরই বিষম পরিতাপের বিষয় হ'ল। শেষে দেখছি, অস্থানে অকালে মহারাজ প্রেমে পড়লেন। নিজের হাতে তৈয়ারি মাদুর দিয়ে ঢাকা ভূমি-খণ্ডের উপর বসলেও লোকের মনে একটা দর্পের ভাব আসে। চরণলগ্ন শৃঙ্খল-ধ্বনিও কন্দর্প-ভাব জাগাতে পারে। এটা মানুষের স্বভাব। মুষ্টিমেয় কারারক্ষিগণের মুখে 'মহারাজ' 'মহারাজ' এই সম্বোধন শুনে, কারাগারেও লোক মদন-পীড়িত হবে, এতে আর বিচিত্র কি ?

বিদূ। আমাদের রাজভক্তি আমরা দেখিয়েছি, চেষ্টারও ত্রুটি করিনি। এখন এঁকে ছেড়ে যাওয়াই উচিত।

যৌগ। বসন্তক ঠাকুর, আপনিও এ কথা বলছেন ? এমন কথা বলবেন না।

যিনি সন্তপ্ত, মদন-পীড়িত, যিনি সুহৃদ্গণের আশ্রয়ে থেকেও অকাল সুকাল বুঝলেন না, তাঁকে ছেড়ে যাব ?

বিদূ। তা হ'লে এমনি ভাবেই এখানে বুড়ো হ'তে হবে।

যৌগ। সেটাও ভাল।

বিদূ। ভাল হবে, যদি লোকে জানতে পারে।

যৌগ। লোকে জানুক বা না জানুক, তাতে আমাদের কিছু এসে যায় না—আমরা মহারাজের জন্য এই কাজে লিপ্ত হয়েছি।

বিদূ। মহারাজও জানেন না।

যৌগ। সময় হ'লে জানবেন।

বিদূ। সময় আর হবে কখন ?

যৌগ। যখন কাজের ফল হবে, তখন।

বিদূ। তা হ'লে আপনাকে দুটো কাজ কত্তে হবে—মহারাজকে কারাগার থেকে মুক্ত কত্তে হবে, আর রাজকুমারীকে অন্তঃপুর থেকে হস্তগত কত্তে হবে।

রুম। বসন্তক ঠাকুর, এটা আপনি ঠিক বুঝেছেন।

যৌগ। হাঁ, এ দু কাজই কত্তে হ'বে এ কথা ঠিক। বসন্তক ঠাকুর, আর একটা প্রতিজ্ঞা কচ্ছি শুনুন—

যদি রাজাকে, আর রাজার সঙ্গে ঘোষবতী বীণাকে উদ্ধার কত্তে না পারি, আর সেই সঙ্গে নলাগিরি ও বিশালনয়না বাসবদত্তাকে হস্তগত কত্তে না পারি, তবে আমি যৌগন্ধরায়ণ নই।

(উৎকর্ণ হইয়া) একটা শব্দ শুনছি না? দেখুন ত কিসের শব্দ!

বিদূ। হাঁ, শব্দই শুনছি বটে। (প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ) দিনের কাজ শেষ ক'রে দলে দলে লোক সব এই পথে ফিরে যাচ্ছে। এখন কি করা যাবে?

রুম। কেন, অগ্নি-গৃহের ত চারটা দরজাই আছে। আমরা এখন ভেগে পড়ি।

যৌগ। আমরা ভেগে পড়ব কি? ওরাই সব ভেগে পড়ুক্।

প্রস্থান ও উন্মত্তকের বেশে পুনঃ প্রবেশ

উন্ম। হী—হী; রাহু চাঁদ গিল্‌ছে যে—দেখ, বেটা রাহু, চাঁদ ছেড়ে দে বলছি—যদি না ছাড়বি, তবে তোর মুখ হা করিয়ে বের করব। এই পাগলা ঘোড়াটা ছুটে আসছে! এই যে চৌমাথায় এল! এই ঘোড়াটা চড়েই পূজো খাব। ওগো, কুমার মশায়রা, আমার ঘোড়াটাকে ঠেঙ্গাও ত—না, না, ঠেঙ্গিওনা।—কি বলছ'—তোমাদের সামনে নাচব? এই দেখ নাচছি। আবার—ঠেঙ্গাও ত লাঠি দিয়ে—না, না, ঠেঙ্গিও না—না আমিই ঠেঙ্গাচ্ছি।

(সকলের প্রস্থান)

প্রবেশক

ভটের প্রবেশ

ভট। রাজকুমারা জলকেলি কত্তে যাবেন, এদিকে ভদ্রবতীর মাহুতের সঙ্গে দেখা নাই—বেটাকে খুঁজে হয়রাণ হলুম। পুষ্পদন্তক, গাত্র-সেবককে দেখ নি? কি বলছ? গাত্র-সেবক শুঁড়িনীর ঘরে মদ খাচ্ছে! আচ্ছা, যাও তুমি। এই যে শুঁড়িনীর ঘর—আচ্ছা বেটাকে ডাকি—গাত্র-সেবক! গাত্র-সেবক!

(নেপথ্যে)

কে বেটা সদর রাস্তায় গাত্র-সেবক, গাত্র-সেবক বলে হাঁকাহাঁকি কচ্ছে!

ভট। ঐ বেটা গাত্র-সেবক! মদ খেয়ে চোক দুটা জবাফুলের মত লাল হয়েছে—উন্মাদের মত হাসতে হাসতে এই দিকেই আসছে। এ বেটার সামনে থাকব না।

গাত্র-সেবক। কে হে সদর রাস্তায় গাত্র-সেবক, গাত্র-সেবক ব'লে হাঁকাহাঁকি কচ্ছ। মদের দোকান থেকে বেরুলেই সবে দেখবে এখন। আমার রুষ্ট শ্বশুর মশায় ঘিয়ে ভাজা আর মরিচ-লবণ মাখা এক টুকরা মাংস মুখে ফেলে দিলেন!

যারা মদের পাগল, যারা গায়ে মদ মাখতে পায়, যারা মদে স্নান কত্তে পায়, তারাই ধন্য। এমন কি যারা মদ খেয়ে প্রাণ দেয়, তারাও ধন্য। যে বেটাদের কিছুর পয়সা আছে, সে বেটারা আমাদের মত গরীবের মাগ ছেলের কষ্ট শুনেও, মদের একটা পুকুর (তড়াগ) করে দেয় না গা?

ভট। (সামনে আসিয়া) ওরে গাত্র-সেবক, তোকে কতক্ষণ খুঁজছি। কুমারী বাসবদত্তা জলকেলি কত্তে যাবেন, এদিকে ভদ্রবতীর সঙ্গে দেখা নেই—আর তুইও ঘুরে বেড়াচ্ছিস্!

গাত্র। তাত বটেই। সে মাগীও পাগল, মিন্‌সেও পাগল, আমি পাগল, তুমিও পাগল—আগাগোড়া সব পাগল!

ভট। সকলের কথা এখন রেখে দে! তুই বেটা ভদ্রবতীকে না এনে, কোথায় ঘুরছিস?

গাত্র। এখানে ঘুরছি, ওখানে এটা দিয়ে মদ খাচ্ছি—রাগ করো না ভাই। কি করব?

ভট। পাগলামো রাখ, ভদ্রবতীকে শীগ্‌গির আন।

গাত্র। ভদ্রবতী, আয়, আয়—এই আমি ভদ্রবতীর মাথায় অঙ্কুশ নিলুম।

ভট। ভদ্রবতী নিজেই এত ঠাণ্ডা, অঙ্কুশ দিয়ে কি হবে? শীগ্‌গির আন্ ভদ্রবতীকে।

গাত্র। আয়, ভদ্রবতী, আয়। এই ভদ্রবতীর পায়ের শিকল দিলুম।

ভট। ভদ্রবতীকে ফুলের মালা দিয়ে বেঁধে রাখা যায়, শিকল দিয়ে কি হবে? ভদ্রবতীকে আন্ শীগগির।

গাত্র। ভদ্রবতী, আয়, আয়। এই ভদ্রবতীর ঘণ্টা এনেছি।

ভট। জলকেলিতে ঘণ্টার কি কাজ! ভদ্রবতীকে আন্ শীগ্‌গির।

গাত্র। আয় ভদ্রবতী, আয়, শীগ্‌গির আয়। এই ভদ্রবতীর কশিকা এনেছি।

ভট। কশিকা দিয়ে কি হবে। ভদ্রবতীকে আন্ শীগগির।

গাত্র। ভদ্রবতী, আয় আয়। হায়!

ভট। হায় কি?

গাত্র। আমার হায়!

ভট। তোর আবার হায় কি?

গাত্র। হায় ভদ্রবতী!

ভট। ভদ্রবতী কি!

গাত্র। এই ভদ্রবতীকেও এনেছি।

ভট। তোমার দোষ নেই গাত্র-সেবক! শুঁড়িনীরই সব দোষ—এই মাগী রাজবাড়ীর চাকরদের সঙ্গে মদ খায়।

গাত্র। হায়,আমিই ত ব'লেছি—সব সুদে-মূলে নষ্ট করো না বাবা।

ভট। 'হা' শব্দের মত একটা শব্দ শুন্‌ছি না!

গাত্র। ওঙ্গো, বুঝেছি, বুঝেছি—শুঁড়িনীর ঘর ভেঙ্গে ভদ্রবতী বুঝি পালাল!

ভট। কি বলছ (আকাশে) বৎসরাজ বাসবদত্তাকে নিয়ে পালিয়েছেন?

গাত্র। (সহর্ষে) মহারাজের যেন কোন বিঘ্ন না হয়।

ভট। থাও মদ—এখনও পাগলের মত ঘুরে বেড়াও।

গাত্র। কে পাগল! কে পাগলামি কচ্ছে! আমরা সব আর্য্য যৌগন্ধরায়ণের চর; জায়গায় জায়গায় রয়েছি। তাই আমিও বন্ধুজনের নির্দ্দেশ মত কাজ কচ্ছি। যৌগন্ধরায়ণের লোক সব চারদিকে ছুটছে—যেন কাল সাপ বন্ধনমুক্ত হয়েছে। বন্ধুগণ, আপনারা সবে শুনুন—যে অন্নদাতার জন্য যুদ্ধ না করে তার জলপূর্ণ নূতন সরা সংস্কৃত দর্ভময় উত্তরীয় লাভ হয় না। আর সে নিরয়গামী হ'য়ে থাকে।

আর্য্য যৌগন্ধরায়ণ গেলেন কোথায়? এই যে যৌগন্ধরায়ণ! তাঁর হাতে তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল খড়্গ, উন্মত্তের পোষাক পরিত্যাগ করেছেন, বাম হস্তে সুবর্ণের ঢাল, গলায় অগণিত মুক্তার মালা, মাথায় শুভ্র বস্ত্রের পাগড়ি; দেখে বোধ হয় যেন বিদ্যুন্ময় মেঘ থেকে পূর্ণচন্দ্র একটু মাত্র প্রকাশিত হয়েছে।

ওগো কি ভীষণ যুদ্ধ হচ্ছে!

যৌগন্ধরায়ণ কত হাতী, কত ঘোড়া, কত মাহুত, কত অশ্বারোহী বিনাশ কল্লেন, সমস্ত অক্ষৌহিণীর গতি মুহূর্ত্ত কাল একাই রোধ কল্লেন, শেষে হাতীর দাঁতের ভীষণ আঘাতে বাহু ভগ্ন হওয়াতে অসি হস্তচ্যুত হল, তবু তিনি যুদ্ধ ছেড়ে পলাচ্ছেন না!

হায়! হায়! এইবার আর্য্য যৌগন্ধরায়ণ বন্দী হ'লেন! তবে এখন আমি তাঁর সঙ্গে যোগ দিই গিয়ে!

[প্রস্থান।

ভট। একি আশ্চর্য্য কাণ্ড! দুর্গের তোরণ ছাড়া সব জায়গাই যে কৌশাম্বীর লোকে ছেয়ে গিয়েছে। যাই, অমাত্যকে এই খবর দিই গিয়ে। [প্রস্থান।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য

উত্তর ব্রহ্ম ভ্রমণ

(২)

ছেগাইঙ্গ হইতে প্রাতে দশটার সময় গাড়ীতে উঠিলে, ঐ দিবস বৈকালে সোয়েবো (Shwebo) উপস্থিত হওয়া যায়। আমরা দুই দিবস সোয়েবো ছিলাম। তখন মার্চ্চ মাস ; প্লেগের ভয়ঙ্কর উপদ্রব হইতেছিল। ডিপুটী কমিশনার সাহেব সহরের এক প্রান্তের লোককে অন্য প্রান্তে যাতায়াত করিতে নিষেধ করিয়া হুকুম জারি করিয়াছিলেন। সুতরাং ঘুরিয়া ফিরিয়া সহরের চতুর্দ্দিক ভালরূপ দেখিতে পারি নাই।

ব্রহ্মভাষায় সোয়েবো সহরটীর পাঁচটী নাম আছে ; নিম্নে তৎসমুদয়ের উল্লেখ করিতেছি।

(১) যাতানা-থিঙ্গা (Yatana-theinga) = দশটী মূল্যবান জিনিসের প্রাপ্তিস্থান।

(২) কং-বৌং (Kon-baung)। এই জিলার উত্তর ও দক্ষিণ দিকস্থ বহুমাইলব্যাপী পাহাড়শ্রেণীর চূড়াগুলিকে পূর্ব্বে কং-বৌং (Kon-baung) বলা হইত। ইহাদের বর্ত্তমান নাম ম্বি-ইউলান্ (Mwe yolan.)

(৩) মোট্‌সোবো-লাং (Motsobo-lan) = রাজা অলঙ্গ-প্রার জন্ম-স্মৃতি উপলক্ষে এই নাম প্রদত্ত হইয়াছে।

(৪) ইয়াং-সি-ওয়াং (Yan-syi-aung) = তেলাঙ্গদের পলায়ন ও অবশেষে রাজা অলঙ্গ-প্রার বশে আসায়, এই নাম দেওয়া হইয়াছে।

(৫) সোয়েবো (Shwebo) = বোধ হয়, মোট্‌সো (Motso) অথবা শিকারী এই শব্দটী লুকাইবার জন্য সোয়েবো নাম দেওয়া হইয়াছে। শিকারীদিগেকে বর্ম্মারা বড়ই ঘৃণার চক্ষে দেখে। এই শব্দটী তাহাদের প্রিয় নহে।

পূর্ব্বে সোয়েবো সহরের চতুর্দ্দিকে দেয়াল ছিল। এখানে যে একটী দুর্গ ছিল, ইহা হইতেই তাহার অনুমান করা যায়। সহরের উত্তরপূর্ব্ব কোণে পৌংদ্দা-উ (Paungdaw-u) নামক মন্দিরটী বিখ্যাত। শ্বিতাজা (Shwetaza) নামক মন্দিরটী অতি বৃহৎ। ডিপুটী কমিশনারের আফিস ও পূর্ত্তবিভাগের আফিসের মধ্যস্থানে রাজা অলঙ্গ-প্রার সমাধিস্তম্ভ স্থাপিত। সার্কিট হাউস (Circuit house)টী রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে এক, কি দেড় মাইল দূরে। কাচারী হইতে প্রায় এক কি দেড় মাইল দূরে একটী পুকুরের ধারে সুযোগ্য কণ্ট্রাক্টার রায় বাহাদুর গিরিধারী লাল মহাশয় একটী নূতন পাঠাগার স্থাপন করিয়াছেন। আমি যখন গিয়াছিলাম, তখন এই পাঠাগারে আন্দাজ ২০০ শত পুস্তক ও কয়েকখানা প্রসিদ্ধ ইংরাজী খবরের কাগজ পাঠকবর্গের জন্য সংগ্রহ করা হইয়াছিল। বোধ হয়, আজকাল নূতন সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ লাইব্রেরীর উপকারিতা শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতেছেন। লাইব্রেরীর দালানটী বেশ সুন্দর। উপরে উঠিয়া বসিলে, পুকুরের শীতল বায়ুর স্পর্শে শরীর স্নিগ্ধ হয়। কণ্ট্রাক্টার মহাশয় জনসাধারণের ব্যবহারার্থে একটা বাগান ও মিউনিসিপালিটীর হাসপাতালের নানাপ্রকার উন্নতি সাধন ও কূপ খনন করিয়া দিয়া, ও স্বর্গীয় সম্রাট এডওয়ার্ডের স্মৃতিরক্ষার্থ বহু অর্থব্যয়ে একটী নাট্যমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া, সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। তিনিই এখানকার মিউনিসিপাল কমিশনার ও অনারারী মাজিষ্ট্রেট।

বর্ত্তমান শ্বি-গিথো (Shwe-gyetho) নামক মন্দিরটীর নিকট মুসোবো (Musobo) নামক গ্রামে রাজা অলঙ্গ-প্রা জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবাবস্থায় তাহার নাম ওং-জেয়া (Aungzeya) ছিল। তিনি প্রথমতঃ তেলাইঙ্গদিগের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, এই সহরে তাঁহার রাজধানী প্রস্তুত করেন। তখন তেলাইঙ্গরা উত্তর ব্রহ্মদেশে তাহাদের রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল। রাজা অলঙ্গ-প্রা বোধ হয় প্রথমতঃ মুসোবো গ্রামের পঞ্চায়ৎরূপে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হন। তিনি ১৭৫২ হইতে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। অসীম সাহস ও কার্য্যকুশলতার ফলে সামান্য গ্রাম্য পঞ্চায়ৎ হইতে কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি রাজ সিংহাসন অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অলঙ্গ-প্রা শ্যামদেশ ও মণিপুরও

আক্রমণ করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার রাজত্বের সময়েই রেঙ্গুন সহরটী ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে; কারণ ১৭৫৫ খৃঃ অব্দে তিনি তেলাইঙ্গদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করায় ইয়াং-কোন্ (Yankon) বা যুদ্ধাবসান, এই নামে রেঙ্গুন সহর স্থাপিত করেন। কালক্রমে উচ্চারণ বদ্‌লিয়া রেঙ্গুন হইয়াছে। তখন রেঙ্গুন একটী ক্ষুদ্র স্থান ছিল। এই সময় হইতেই ব্রিটীশ ও ফরাসীগণ বাণিজ্য বিস্তারের জন্য এদেশে বাস করিতে থাকে। তৎপর কিরূপে ব্রহ্মদেশ ইংরাজশাসনের অধীনে আসে, তাহা ঐতিহাসিক পাঠকবর্গ অবগত আছেন। নিম্নে ইহার একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

ইংরাজদের সহিত ১৮২৪, ১৮৫২, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে মোটের উপর তিনটী যুদ্ধ হয়। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে বর্ম্মারা আসাম আক্রমণ করিয়া, উহা ব্রহ্মসাম্রাজ্যের সামিল করিয়া লয়। আরাকান এবং আসামে বর্ম্মাদের অত্যাচারে ভারতবাসীরা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে। ইহারই ফলে ১৮২৪ খৃঃ অব্দে প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রথমতঃ, আসাম সীমান্তে কতকগুলি ক্ষুদ্র যুদ্ধ হয়। তখন আভাসহর ব্রহ্মদেশের রাজধানী ছিল। ইংরাজ সেনাপতি সার আর্চিবোল্ড ক্যাম্বেলের সৈন্যগণ ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ১০ই মে তারিখে ঐরাবতী নদীমুখে প্রবেশ করে; রেঙ্গুন হইতে এপর্য্যন্ত কেহই তাহাদিগকে বাধা দেয় নাই। তখন বর্ষাকাল; ইংরাজ সৈন্যের মধ্যে নানা রকম ব্যারাম পীড়া উপস্থিত হওয়ায়, তাহারা বেশী দূর অগ্রসর হইতে না পারিলেও, অল্পদিনের মধ্যেই পেগু,মার্ত্তাবান, টেভয়,মাগুই এবং টেনাসেরিম উপকূল ব্রিটিশদের অধীনে আসে। বর্ম্মা সেনাপতি বান্দুলা (Bandula) রাজাদেশে আরাকান হইতে ফিরিয়া আসিয়া ৬০,০০০ সৈন্যসহ রেঙ্গুন ও কেমেন-ডাইন আক্রমণ করে। ইংরাজদের এসময়ে এদিকে মাত্র ৫,০০০ সৈন্য ছিল; তথাপি ৭ই ডিসেম্বর তারিখের যুদ্ধে ব্রিটিশ পক্ষেরই জয়লাভ হয়। অতঃপর আরও কিছুদিন নানাস্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধের পর আভার নিকটবর্ত্তী য়ান্দাবু (Yandaboo) নামক স্থানে সন্ধি ও প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের অবসান হয়।

বর্ম্মারা ব্রিটিশদের একখানি যুদ্ধ জাহাজ নষ্ট করায়, দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধের আরম্ভ হয়। ১৮৫২ সালের ৫ই এপ্রিল বর্ম্মারা মার্টাবান, ও এক সপ্তাহ পরে, রেঙ্গুন দখল করে, ও বাসিন আক্রমণ করে। ইংরাজ পক্ষ হইতে গড্‌উইনকে (General Godwin) সেনাপতি নির্ব্বাচিত করিয়া পাঠান হয়। জুলাই মাসে ঐরাবতী নদীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলযুদ্ধ হয়। বর্ম্মারা পরাস্ত হইয়া প্রোমের নিকটে হটিয়া যায়। ২৭এ সেপ্টেম্বর ব্রিটীশ সেনাগণ প্রোম আক্রমণ করে এবং ১২ই অক্টোবর উহা ইংরাজের দখলে আসে। ১৮৫২ সালের শেষভাগে পেগু সম্পূর্ণরূপে ব্রিটীশ শাসনাধীনে আসে। ১৮৫৩ সালে রাজা পেগান্-মিন্ (Pagan Min) বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মিণ্ডন্-মিন্ (Mindon Min) কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হয়। রাজা মিণ্ডন্-মিন পেগু সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন উত্থাপন না করায়, ইহা এই সময় হইতেই ব্রিটীশ অধিকারে থাকে। ১৮৭৮ সালে রাজা মিণ্ডন-মিনের মৃত্যু হইলে, তাহার পুত্র রাজা থিবো সিংহাসনে আরূঢ় হন। সহধর্ম্মিণীর পরামর্শে ও কুমন্ত্রণায় থিবো রাজপরিবারের অনেককে গুপ্তভাবে হত্যা করেন। মান্দালয়ের প্রজাবর্গ ইহাতে অতিশয় দুঃখিত হয়। ক্রমে ১৮৭৯ সালে ইংরাজদের সহিত রাজকীয় (Political) সম্বন্ধ শিথিল হইয়া পড়ে। ১৮৮০ ও ১৮৮২ সালে পুনরায় ইংরাজদের সঙ্গে সন্ধি করার প্রস্তাব হয়। ১৮৮৩ সালে রাজা থিবো পাশ্চাত্য শিল্প-পদ্ধতি শিক্ষার ভাণ করিয়া, কতিপয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে ইউরোপে পাঠান। ইংরাজদের সঙ্গে গোলমাল নিষ্পত্তি না হওয়ায়, গুপ্তভাবে কোনও প্রকারে ফরাসীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ১৮৮২ হইতে ১৮৮৪ সালে মণিপুরের সীমানা লইয়া ইংরাজদের সঙ্গে অনেক বাদানুবাদ ও গোলমাল হইতেছিল। পূর্ব্বের সন্ধি অনুসারে "বোম্বাই-ব্রহ্ম-বণিক-সমিতি" (Bombay Burma Trading Corporation) উত্তর ব্রহ্মদেশের বন হইতে কাষ্ঠ কর্ত্তন করিবার স্বত্ব লাভ করেন। এই বণিক সম্প্রদায় নানারূপ

গোলমাল করিয়া বর্ম্মা গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি করিয়াছে, এই অজুহাতে মান্দালয় দরবার ইহাদের নিকট হইতে ২৩ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায়ের আদেশ দেন। ইংরাজ পক্ষ হইতে চিফ কমিশনার এ বিষয়ে আপোষে নিষ্পত্তি করার জন্য চেষ্টা করেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এদিকে রাজা থিবো গোপনে গোপনে সৈন্য সংগ্রহ করিতে থাকেন। ১৮৮৫ সালের ১১ই নবেম্বর ইংলণ্ড হইতে মান্দালয় আক্রমণ করার জন্য টেলিগ্রাফে আদেশ আসে। অবিলম্বেই যুদ্ধ আরম্ভ হয়। জেনারেল প্রেন্ডারগাষ্ট (Prendergast) এক দল সৈন্যসহ নদীপথে অগ্রসর হইতে থাকেন। প্রথমেই তিনি অত্যন্ত ক্ষিপ্রতা সহকারে মিন্‌হ্‌লার (Minhla) ইষ্টকনির্ম্মিত দুর্গ দখল করেন। তখন নদীর অপর পারের দুর্গটী বর্ম্মারা শীঘ্রই বিনাযুদ্ধে ছাড়িয়া দেয়। সামান্য যুদ্ধেই নৌংগু (Nyaungu) ও মিংগিয়ান্ (Myingyan) ইংরাজের দখলে আসে। ইংরাজ সেনাগণ ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকে। আভা ও ছেগাইঙ্গের নিকটবর্ত্তী নদীতে উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বেই মান্দালয় হইতে সন্ধির এক প্রস্তাব আসে ; কিন্তু তদনুসারে সন্ধিস্থাপন অসম্ভব হওয়াতে, রীতিমত যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ব্রিটীশ সৈন্য অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলেই আভা ও ছেগাইঙ্গ আত্ম-সমর্পণ করে। এই দুই স্থানের বর্ম্মা সৈন্যদিগকে নিরস্ত্র করিবার পর, ইংরাজসৈন্য ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে ২৮শে নভেম্বর তারিখে মান্দালয়ে উপস্থিত হয়। তৎপর দিবস প্রাতে রাজা থিবো বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করেন। তিনি বর্ত্তমান সময়ে রত্নগিরিতে রাজবন্দীরূপে বাস করিতেছেন।*

রাজা অলঙ্গ-প্রার মৃত্যুর পর তাঁহার বংশধরগণ কেহই সোয়েবোর উন্নতির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখেন নাই। ইহার পর রাজা মিণ্ডনের সময়ে (১৮৫৩—১৮৭৮ খৃঃ অঃ) সোয়েবোর কতিপয় অধিবাসী ব্রহ্মেতিহাসে পুনরায় কথঞ্চিৎ খ্যাতি লাভ করেন। রাজা মিণ্ডনের পুত্র ব্রহ্মদেশের শেষ রাজা থিবো রাজা অলঙ্গ-প্রার ষষ্ঠ বংশধর। তিনি ১৮৭৮ হইতে ১৮৮৫ সাল পর্য্যন্ত মান্দালয়ে রাজত্ব করেন। অবশেষে কেইং-উন্ (Kayaing Wun) নামক শাসনকর্ত্তার সাহায্যে ইংরাজ সেনা সোয়েবো দখল করিয়া লয়।

রাজা বোডাপেগানের (Bodapagan) রাজত্বকালে সোয়েবো সহরে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় ও হাজার হাজার নরনারী অন্নাভাবে মানবলীলা সংবরণ করে। এই দুর্যোগের দিনে সুযোগ পাইয়া ডাকাতগণ দেশের চতুর্দ্দিকে ডাকাতি করিতেছিল।

রাজা অলঙ্গ-প্রার পূর্ব্বে কেহই এই জেলার পূর্ত্ত বিভাগের উন্নতির জন্য চেষ্টা করে নাই। অবশেষে সোয়েবো সহরে রাজধানী স্থাপিত হইলে এদিকে সকলের বিশেষ দৃষ্টি পড়ে। রাজা মিণ্ডনের তাম্রলিপিতে মহানন্দ হ্রদের উল্লেখ আছে। এই জিলার দক্ষিণ দিকে আরও কয়েকটী হ্রদ আছে! রাজা অলঙ্গ-প্রা প্রথমতঃ লিটল্-মু ("Little Mu") নামক ৬০ মাইল দীর্ঘ একটী খাল কর্ত্তন করান। এই খাল কাটার পর কৃষিকার্য্যের অনেক উন্নতি হইয়াছে ; এবং দুর্ভিক্ষও আর হয় নাই। এই জেলার উত্তরদক্ষিণ দিকে মু ও ঐরাবতী নদীর নিকটবর্ত্তী স্থানে লম্বাভাবে এই খাল কাটা হইয়াছে। এক্ষণে এই স্থানে ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মু উপত্যকা রেল লাইন (Mu Valley Railway) নির্ম্মিত হইয়াছে।

এখানকার অধিবাসীর শতকরা ৭৫ জনই কৃষক, কিন্তু সাধারণতঃ বর্ষাকালে বৃষ্টির অল্পতাহেতু জীবিকার্জ্জনের জন্য অনেককেই আরও ২।১টী ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হয়। মাদুর, ঝুরি (Basket) চিরুণী ও গাড়ীর চাকা প্রচুর পরিমাণে আমদানী হয়। স্থানীয় মাটীর কলসী অতি প্রসিদ্ধ।

এই জিলার দক্ষিণভাগে লবণ ও কয়লার খনি আছে। এই স্থানে ভাল পাথর চুণাও পাওয়া যায়। পূর্ব্বে "হুয়ো" রাণীদের ব্যবহারের জন্য স্থানে স্থানে নয়টী বাগান ছিল। রাজারাই বাগানের মালী নিযুক্ত করিতেন। প্রত্যেক মালীকে

* এই যুদ্ধাদির বিশেষ বিবরণ Burma Imperial Gazetteer, Vol I. (সংস্করণ ১৯০৮) ২০২৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

একজন বুজির * ক্ষমতা দেওয়া হইত; তাহারা প্রত্যেক ঋতুতে উৎপন্ন ফলফুলাদির কতক অংশ রাণীদিগকে উপহার দিত। বাগানের শস্যব্যতিরেকে তাহারা অন্য কোন বেতন পাইত কিনা, তাহার কোন সঠিক নিদর্শন নাই।

গভর্নমেণ্টের আফিসাদি ও একটী বড় বাজার থাকা সত্বেও, সুদৃশ্য পাকা বাড়ী বা পাকা রাস্তার অভাবে ও সহরের তুলনায় জনসংখ্যা কম হওয়ায় সহরটী বেশী সুন্দর নয়। প্রথম দর্শনে পাকা রাস্তাগুলিও কাঁচা পথ বলিয়াই ভ্রম হইয়াছিল। অধিকাংশ স্থানেই পথের দুই ধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঠের বাড়ী বর্ত্তমান। মাঝে মাঝে নানা জাতীয় বৃক্ষ থাকায়, ইহা আদৌ সহরের মতই বোধ হয় না। সোয়েবোর লোকসংখ্যা ১০,৬২০ (পুরুষ ৬,০৫০; স্ত্রীলোক ৪,৫৭০)।

২০ শে তারিখ সোয়েবো হইতে রাত্রি নয় ঘটিকার সময় রওয়ানা হইয়া, তৎপর দিবস অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় মিচিনায় (Myikyina) উপস্থিত হইলাম। এই সহরে ৭।৮ দিন ছিলাম। এখানে রেলওয়ে লাইনের শেষ হইয়াছে। কয়েকটী ছোট ছোট পাহাড় কাটিয়া এই সহর নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সহর ব্রহ্মদেশের উত্তর সীমানারূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই সময়ে বেশ ঠাণ্ডা বোধ হইতেছিল। তবে এখানে মেমিও অপেক্ষা শীত কম। স্থানটী স্বাস্থ্যকর। ক্ষুদ্র সহর, বিশেষ কিছু দেখিবার নাই। নানা জাতীয় পাহাড়ীরা নিকটবর্ত্তী পাহাড় হইতে প্রায়ই দ্রব্যসম্ভার বেচা কেনা করিতে সহরে আসে।

১৮৯২ সালে এক দল ছেনা কাচিন (Sana Kachin) হঠাৎ মিচিনা আক্রমণ করিয়া ফৌজ পুলিশের সুবাদারকে হত্যা করে ও মহকুমা হাকিমের বাড়ী পোড়াইয়া দেয়। পূর্ব্বে মিচিনা ভামোর সামিল ছিল। ১৮৯৫ সাল হইতে এই সহর ও অন্যান্য স্থান একত্র করিয়া একটী ভিন্ন জিলা স্থাপিত হইয়াছে।

এই জিলার মধ্যে ইনডজি (Indawgyi) নামক হ্রদটী বিশেষ দ্রষ্টব্য। ব্রহ্মদেশের মধ্যে এই হ্রদটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ; ইহা দৈর্ঘ্যে ১৬ মাইল ও প্রস্থে ৬ মাইল। ১৮৮৫ সালের হাউ-সেইং (How Saing) এর বিদ্রোহের সময় অনেকেই নিহত হওয়ায়, ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানে জনসমাগম অতি কম। ইনডজি হ্রদে নানাজাতীয় মৎস্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, কিন্তু নিকটে কোন হাট বাজার না থাকায় মৎস্যের ব্যবসা চলে না।

মিচিনা সহরটী ক্ষুদ্র হইলেও, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। রাস্তাগুলি ছোট ছোট। সার্কিট হাউসের (Circuit house) নিকট একটী মাঠ আছে; তাহার অন্যদিকে মিলিটারি লাইন। বাঙ্গালী ও মান্দ্রাজীরা মিলিয়া একটী সমিতি (Club) স্থাপন করিয়াছেন। উহার নাম হিন্দু সামাজিক সমিতি (Hindu Social Club)। এত দূর দেশেও ২।৪ জন বাঙ্গালী আছেন। এই সময়ের (মার্চ্চ মাসের) জ্যোৎস্নালোক বিশেষ উপভোগ্য। মেমিও ও মিচিনায় পূর্ণিমার রাত্রিতে নির্ম্মল জ্যোৎস্নালোকে বাহির হইলে বড়ই আনন্দানুভব হয়। বৈশাখ মাসে অপর্য্যাপ্ত বেলি ফুলের সুগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হয়। সহরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাগানেও বেলি ফুলের গাছ দেখিতে পাইয়াছি।

কয়েকটী আফিস, ইংরাজদের সমিতি বা ক্লাব ও হাঁসপাতাল ইত্যাদিতে সহরের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। এক দিন নদীতে স্নান করিতে নামিয়াছিলাম; ঐরাবতীর জল বড়ই শীতল, প্রায় বরফের মত; অতি কষ্টে ২।১টী ডুব দিয়া তাড়াতাড়ি নদী হইতে উঠিতে হইয়াছিল। নদীর পারের বালুকণাতে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বর্ণকণার আভাস পাওয়া গেল। কয়েক মাইল দূরে একটী সুবর্ণ খনি আছে। স্বর্ণোত্তলনকারী কোম্পানি (Gold Dredging Company) প্রতি বৎসর কিছু কিছু স্বর্ণ ঐ খনি হইতে উঠাইয়া ব্যবসা চালায়। কয়েক জায়গায় নানা প্রকারের মূল্যবান প্রস্তরের ছোট ছোট খনি আছে।

সহরে সুডঙ্গ-পি (Sudaung pyi) নামক একটী পুরাতন

* বুজি = মোড়ল (A village headman.)

বৌদ্ধমন্দির আছে; শালুডিপা (Saludipa) নামক দ্বীপের শাসনকর্ত্তা থিরি-ধম্ম-থোকা (Thiri-dhamma-thawka) কর্ত্তৃক এই মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া জনসাধারণ ইহাকে অতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত দর্শন করে। ১৮৯৮ সালে এই সহরের লোক সংখ্যা ১০২৩ ছিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীনলিনীকান্ত দাশগুপ্ত।

সোসিয়ালিজম্

(২)

ফরাসী সোসিয়ালিজম্ (১৮১৭—১৮৪৮ খৃ অঃ)

সাঁ-সিমেঁ।—আমরা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, জনসমাজে নিম্নলিখিত কয়েকটী অবস্থার একত্র সংঘটনেরফলে সোসিয়ালিজ্মের আবির্ভাব সম্ভব হয়;—(১) শ্রমজীবীগণের পরস্পরের মিলামিশা করিবার সুযোগ ও স্বাধীনতা; (২) প্রভু-ভৃত্যের পরস্পর সম্পর্কের মধ্যে অনতিক্রমনীয় পার্থক্য; (৩) যুদ্ধবিগ্রহাদির প্রশমনপূর্ব্বক সমাজে শান্তিস্থাপন; (৪) একস্থানে বহু-সংখ্যক শ্রমজীবীর সমাবেশ, এবং (৫) শ্রমজীবীগণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার ও চিন্তাশীল লোকের আবির্ভাব। এই কয়েকটী অবস্থার একত্র সমাবেশ হইলে, সমাজে যেমন অসহনীয় অসামঞ্জস্য উপস্থিত হয়, সেইরূপ শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের শিক্ষিত চিন্তাশীল নেতৃগণ আপনাদের শোচনীয় অবস্থার বিস্তারিত বর্ণন পূর্ব্বক শ্রমজীবীগণের মনে অসন্তোষের সৃষ্টি করিতে পারে ও তাহাদিগকে আত্ম-অবস্থার উন্নতিসাধন-কল্পে উৎসাহিত ও উত্তেজিত করিতে পারে।

রাজনীতির ক্ষেত্রে ইংলণ্ড চিরদিনই সামঞ্জস্য ও সম্প্রসারণ-শক্তির পরিচয় দিয়া আসিয়াছে, যখনই যে সম্প্রদায় শক্তিশালী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখনই তাহাকে বিস্তৃততর রাজনৈতিক ক্ষমতাপ্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ইংলণ্ডে যে "শিল্প-বিপ্লবের" অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে সামাজিক সমতা একেবারেই ওলটপালট হইয়া যায়। অর্থলোভে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া শক্তিসম্পন্ন মূলধনী ও জমিদারসম্প্রদায় অসহায় নিরন্ন মজুরগণকে খাটাইয়া লইতে লাগিল। ইহারই প্রতিবাদ স্বরূপে রবার্ট ওয়েন্ ও ব্রিটিশ সোসিয়ালিজ্মের আবির্ভাব হয়।

ফরাসীদেশে কিন্তু কোনদিনই কোনওরূপ সামঞ্জস্য ও সম্প্রসারণ ক্ষমতা দেখা যায় নাই। সামন্ত প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিতে যাইয়া, অনিয়ন্ত্রিত ও স্বেচ্ছাচারদুষ্ট রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইল;আবার তাহারাই প্রতিবাদ স্বরূপে ফরাসী বিপ্লবের তাণ্ডব নৃত্যের অভিনয় দেখা গেল। এক চরম হইতে অন্য চরমে যাওয়াই যেন ফরাসীজাতির প্রকৃতি। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই ফরাসী বিপ্লবের উৎপত্তি ঘটে; কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, নানাকারণেই এই উদ্দেশ্য সম্যকরূপে সফল হয় নাই। সেইজন্য ফরাসী বিপ্লবের অবসান ও ওয়াটার্লুক্ষেত্রে নেপোলিয়ানের পরাভবের পর সামাজিক সমতা সংস্থাপনের জন্য ফরাসী সোসিয়ালিজ্মের উৎপত্তি হয়।

১৮৬০ খৃ অব্দে ফরাসী সোসিয়ালিজমের প্রথম প্রবর্ত্তক কম্‌টে হেন্‌রী ডি সাঁ সিমোঁর (Comte Henri de Saint-Simon) জন্ম হয়। কিন্তু ১৮১৭ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে তিনি সোসিয়ালিজ্‌ম সম্বন্ধে কোনও মতবাদ প্রচার করেন নাই। ঐ সালেই সোসিয়ালিজম্ সম্বন্ধে তাহার প্রথম গ্রন্থ L'Industrie বা'শ্রম-শিল্প'প্রকাশিত হয়। ইহার পর L'Organisateur বা 'সংগঠন কর্ত্তা' (১৮১৯), Du Systeme industrial বা 'শ্রমশিল্প প্রথা' (১৮২১), Catechisme des Industriels বা 'শ্রমজীবীর সংক্ষিপ্তসার' (১৮২৩) প্রভৃতি আরও কয়েক খানি গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ১৮২৫ সালে তাঁহার শেষ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ Nouveau Christianisme বা "নব খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম" প্রকাশিত হয়।

এই সমুদয় গ্রন্থে একটী বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য-গোচর হয়। ফরাসী বিপ্লববাদীদিগের মত তিনিও বিশ্বাস করিতেন যে মানুষের উন্নতি সাধিকা শক্তি অনন্ত এবং সমাজে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা সাধনই তদীয় মতবাদেরও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি প্রচলিত সমাজব্যবস্থার এককালীন উচ্ছেদের পক্ষপাতী ছিলেন না। পুরাতনের ভিত্তির উপরে দেশকালোপযোগী নূতন প্রাসাদের নিম্মাণ করাই তাহার মতলব ছিল। এক চরম

হইতে আরম্ভ করিয়া বিপ্লব-বাদীগণ কিরূপে অপর চরমে উপস্থিত হইয়াছিল, সাঁ-সিমোঁ তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন; পক্ষান্তরে সমাজের তৎকালীন অবস্থার পরিবর্ত্তনও যে নিতান্ত আবশ্যক তদ্বিষয়েও তাঁহার কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। সাঁ-সিমোঁর কল্পিত সমাজ-ব্যবস্থায় আমরা এই উভয় প্রকার মতবাদেরই প্রভাব বিলক্ষণ ভাবে দেখিতে পাই।

সাঁ-সিমোঁ বলেন যে, স্থান, কাল, ও আশপাশের অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্য সমাজেরও অনুরূপ পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী ও নিতান্ত আবশ্যক। মধ্যযুগে যখন সকলকেই মারামারি কাটাকাটি করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হইত, তখন সমাজ-রক্ষার জন্য সামন্ত প্রথার (Feudalism) প্রয়োজন ছিল। সামন্ত-প্রথা না থাকিলে, তখন সবলের হস্ত হইতে দুর্ব্বলের রক্ষা সাধন সম্ভবপর হইত না। কিন্তু সমাজের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সামন্ততন্ত্রের প্রয়োজনীয়তাও অন্তর্হিত হইল। কিন্তু মানুষের একটা স্বভাবই এই যে, সে অর্জ্জিত অধিকার ও ক্ষমতা সহসা ছাড়িতে চায় না। তাই, সামন্ত-তন্ত্রের উচ্ছেদ সাধনের জন্য অনিয়ন্ত্রিত ও স্বেচ্ছাচার রাজ-তন্ত্রের ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে উহাও আবার আর এক চরম সীমায় গিয়া উপস্থিত হইল। সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদের জন্য অনিয়ন্ত্রিত রাজ-শক্তির আবশ্যক হইলেও, উহার বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে ইহার প্রয়োজনীয়তাও বিদূরিত হইয়া পড়িল। তখন আবার পরিবর্ত্তিত অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য সমাজব্যবস্থার পুনর্গঠনের আবশ্যক হইল, এবং এই আবশ্যকতার পরিণামেই—"ফরাসী-বিপ্লব"।

সাঁ-সিমোঁ বলেন, যত দিন সমাজ রক্ষার জন্য এক শক্তির প্রয়োগ দ্বারা আর এক শক্তির দমন করার দরকার ছিল, তত দিন সামন্ততন্ত্র, অনিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্র প্রভৃতিরও উপযোগিতা ছিল। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই; মারামারি কাটাকাটির যুগ চলিয়া গিয়াছে, এখন আসিয়াছে, শিল্পবাণিজ্য ও বিদ্যাশিক্ষার যুগ। সুতরাং এই নূতন প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই ভবিষ্যৎ সমাজ গঠন করিতে হইবে। শুধু টাকাকড়ি, রাজদত্ত পদমর্য্যাদা বা বিস্তৃত ভূসম্পত্তির অধিকারী হইলেই, অতঃপর কেহ ভবিষ্যৎ সমাজের নেতা হইতে পারিবেন না। পরন্তু, শিল্পবাণিজ্যে বা বিদ্যাবত্তায় যাঁহারা শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিবেন, ভবিষ্যৎ সমাজে তাঁহাদেরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহাই নৈসর্গিক বিধান। রাজারা পূর্ব্বেও পৃথিবীজয়ের অভিলাষী ছিলেন, এখনও পৃথিবীজয়ের আবশ্যকতা পূর্ণ মাত্রাতেই বিদ্যমান আছে। কিন্তু এই অভিনব জয়ব্যাপার অস্ত্রশস্ত্র সহকারে যুদ্ধবিগ্রহ দ্বারা অনুষ্ঠিত হইবে না। এ জয়ের অর্থ মানুষের সমবেত শক্তির প্রয়োগ দ্বারা পৃথিবীর ধনরত্নের আহরণ। এই কার্য্যে যাঁহারা সমর্থ হইবেন, তাঁহারাই ভবিষ্যৎ সমাজের শীর্ষ দেশে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। আর যাঁহারা ইহা পারিবে না, নৈসর্গিক বিধানানুসারে তাহাদিগকে কোণ ঠাসা হইতেই হইবে।

L'Organisateur নামক গ্রন্থে এইরূপ ভবিষ্যৎ সমাজের একটী সুন্দর চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। সাঁ-সিমোঁ তৎ-কল্পিত আদর্শ সমাজকে তিনটী শ্রেণীত বিভক্ত করিয়াছেন;—(১) উদ্ভাবক সম্প্রদায় (Chamber of Invention) (২) পরীক্ষক সম্প্রদায় (Chamber of Examination), এবং (৩) শাসক সম্প্রদায় (Executive Chamber)। ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক, কলাবিদ্ এবং পণ্ডিতমণ্ডলী প্রভৃতি প্রথম ও দ্বিতীয় পর্য্যায়ভুক্ত হইবেন। যোগ্যতানুসারে ইহাদের বেতন ও পুরস্কারের যথোচিত ব্যবস্থা সরকার হইতে করা হইবে। ইঁহারা রাজপুরুষগণের পরামর্শদাতা হইলেও, শাসন সংরক্ষণ প্রভৃতি কার্য্যে ইঁহাদের কোনও হাত থাকিবে না। তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত বড় বড় শিল্পী, মূলধনী ও ব্যাঙ্কার বা মহাজনগণই করাদি নির্দ্ধারণ ও উহাদের ব্যয়ব্যবস্থা প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্য করিবেন। ফলতঃ, সাঁ-সিমোঁর কল্পিত সমাজে তৃতীয় পর্য্যায়ের জন্যই সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদত্ত হইয়াছে।

১৮২১ খৃঃ অব্দে তাঁহার Systeme industrial গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে সমাজ-গঠন সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত মতের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে দেখা যায়। প্রথম ও দ্বিতীয় সম্প্রদায়দ্বয়কে পূর্ব্বে যে সমস্ত ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছিল, এই গ্রন্থে তাহার অধিকাংশেরই প্রত্যাহার করা হইয়াছে।

এই আদর্শ কার্য্যে পরিণত করা যে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার সাঁসিমোঁ তাহা বিলক্ষণ রূপেই অবগত ছিলেন। এই জন্য তিনি প্রস্তাব করেন যে, এতদনুসারে সমাজ-গঠনের জন্য রাজাকে কিছুদিনের জন্য অনিয়ন্ত্রিত যথেচ্ছাচার ক্ষমতা (Dictatorship) প্রদান করিতে হইবে; এমন কি তদানীন্তন ফরাসী নৃপতির নিকট তিনি এই মর্ম্মে আবেদনও করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হয় নাই।

সোসিয়ালিজ্‌ম্‌ বলিতে এক্ষণে সাধারণতঃ যাহা বুঝা যায়, ফরাসী সোসিয়ালিজ্‌মের প্রথম প্রবর্ত্তক সাঁ-সিমোঁর মতবাদে এ পর্য্যন্ত তাহার কিছুই দেখিতে পাইতেছি না; বরং অনেক স্থলে তাঁহাকে বর্ত্তমান সোসিয়ালিজ্‌মের বিরুদ্ধমতাবলম্বী বলিয়াই মনে হইবে। শ্রমজীবি সম্প্রদায়ের সমবেত শক্তি প্রয়োগে মূলধনীগণের ক্ষমতার বিনাশ-সাধনই, আধুনিক সোসিয়ালিষ্টগণের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু সাঁ-সিমোঁর কল্পিত আদর্শ সমাজে এই মূলধনী সম্প্রদায়ের জন্যই শ্রেষ্ঠ স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বাহ্য দৃষ্টিতে ইহা নিতান্ত বিসদৃশ বোধ হইলেও, ইহার কারণ নির্ণয় করা কঠিন নহে। ফরাসী বিপ্লবের অবসান ও নেপোলিয়নের পরাভবের পর ফ্রান্সদেশে, অপিচ সমগ্র ইউরোপে অনিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্র শাসন-প্রথারই প্রাধান্য পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সাঁ-সিমোঁ এই শক্তিকে খর্ব্বীকৃত করিতে উদ্যত হন, এবং সেই অভিপ্রায়ে রাজ-পরিচালিত শাসনক্ষমতা প্রভৃতি তিনি মূলধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভক্ত করিয়া দিতে প্রস্তুত হন। ইঁহারাই তখন দেশের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। মূলধনী ও মজুরে এক্ষণে যে পার্থক্য দেখা যায়, তখন তাহার সবেমাত্র সূচনা হইয়াছিল। উহার পরিণাম সম্বন্ধে অনেকেই তখন কল্পনাও করিতে পারেন নাই, বরং তখন মূলধনীদের দ্বারা দরিদ্র লোকদের যথেষ্ট উপকারই হইত। সুতরাং এমতাবস্থায় সাঁসিমোঁ যে মূলধনী সম্প্রদায়কেই তদীয় কল্পিত সমাজের নিয়ন্তা বানাইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। বিশেষতঃ, সাঁ-সিমোঁ সোসিয়ালিজ্‌মের প্রথম উদ্ভাবক,—সুতরাং তাঁহার মতবাদ যে অনিন্দ্য ও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইবে, এরূপ আশা করা সঙ্গত নয়।

এতদিন তাঁহার দৃষ্টি সমাজের উপরের দিকেই নিবদ্ধ ছিল; সুতরাং নিম্নশ্রেণীর দুঃখ-দুর্দ্দশা সম্বন্ধে তাঁহার ভাবিবার বিশেষ একটা অবসর বা সুযোগ ঘটে নাই। কিন্তু এক্ষণে নিরন্ন নিম্নশ্রেণীর প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। সাঁসিমোঁ দেখিতে পাইলেন যে, নিম্নশ্রেণীর অনেক লোকেরই সুস্থশরীর ও যথেষ্ট কার্য্যকুশলতা থাকা সত্বেও, উপযুক্ত পরিমাণ কার্য্যের অভাবে উদরান্নের সংস্থান করিতে পারিতেছে না এবং উহাদের পরিবারবর্গেরও কষ্টের একশেষ হইতেছে। সমগ্র সমাজের জনসমষ্টির তুলনায় এইরূপ দারিদ্রক্লিষ্ট নিরন্ন লোকের সংখ্যাই অধিক। সুতরাং যতদিন ইহাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধিত না হইবে, ততদিন সমাজের স্থায়ী ও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করা আদৌ সম্ভবপর নহে। অতএব সমাজের হিতকামী ব্যক্তিমাত্রেরই এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হওয়া উচিত। ইহাদের অবস্থার উন্নতির জন্য সাঁ-সিমোঁ দুইটী প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রথমতঃ, উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া যাহাতে ইহারা স্বীয় অবস্থার উন্নতি করিতে পারে, তাহার সম্যক্ ব্যবস্থা করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, যাহাতে কাজের অভাবে বেগার বসিয়া থাকিতে না হয়, তাহারও বিহিত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। এই দুইটী ব্যবস্থা সরকার বা গবর্ণমেণ্ট হইতেই করিতে হইবে। আজকাল যে কিয়ৎপরিমাণে ইহা না করা হয়, তাহা নহে; কিন্তু তাহাতে যেন একটা অনুগ্রহের ভাব আছে। এই ভাবটী দূরীভূত করিতে হইবে,—মনে রাখিতে হইবে যে, এই দুইটী বিষয়ে সমাজভুক্ত বা রাজ্যান্তর্গত ব্যক্তি মাত্রেরই জন্মগত দাবী ও অধিকার আছে।

সাঁ-সিমোঁ প্রবর্ত্তিত এই শেষোক্ত মতবাদটী বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। আমরা দেখিতে পাইব যে, ইহা হইতেই আধুনিক "ষ্টেট্ সোসিয়ালিজমের" (State Socialism) উদ্ভব হইয়াছে, এবং এই মতবাদের প্রচার হেতুই সাঁসিমোঁ আধুনিক সোসিয়ালিজ্‌মের প্রথম প্রবর্ত্তকরূপে পরিগণিত হইয়া থাকেন।

কিন্তু শুধু আর্থিক অবস্থার উন্নতি ও সমন্বয় সাধন

করিলেই, সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও স্থায়িত্ব সাধিত হইতে পারে না। এজন্য ধর্ম্ম ও নীতির বন্ধনও অত্যাবশ্যক। সাঁ-সিমোঁ এ বিষয়েও কিছুমাত্র উদাসীন ছিলেন না। তিনি বলিতেন যে, মানুষে মানুষে ভ্রাতৃ-সম্পর্ক এবং নিম্ন-শ্রেণীর অবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা করাই সমাজের উপরিতম ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। খৃষ্টধর্ম্মেরও ইহাই মূলনীতি, ও সাঁ-সিমোঁর মতে এই ভিত্তির উপরেই ভবিষ্যতের সমাজ-সৌধ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

সাঁ-সিমোঁর জীবদ্দশায় তাঁহার মত জনসমাজের তাদৃশ মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে নাই। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরে তদীয় শিষ্য-প্রশিষ্যের হাতে উহার বিস্তর পরিবর্ত্তন ও বিবৃতি সাধিত হয়। শিষ্যদের মধ্যে ব্যাজার্ড (Bazard) ও এঁফেঁতিই (Enfantin) সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। সাঁ-সিমোঁর মৃত্যুর পর ইঁহারাই নেতৃপদ গ্রহণ করেন। ১৮৩০ খৃঃ অব্দের জুলাই মাসে ফ্রান্সে ইতিহাস-বিশ্রুত প্রজা-বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। এই বিদ্রোহ উপলক্ষেই সাঁ-সিমোঁ-সম্প্রদায়ের মতবাদ জনসমাজে বিশেষভাবে প্রচারিত ও আলোচিত হইতে থাকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে অনেক নূতন মতেরও প্রবর্ত্তন হয়। ব্যাজার্ড ও এঁফেঁতি কিছুদিন সম্মিলিত ভাবেই কাজ চালাইয়াছিলেন; কিন্তু কিছুদিন পরে উভয়ের মধ্যে বিষম মত-ভেদ উপস্থিত হওয়াতে, সাঁ-সিমোঁ-সম্প্রদায় দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। বলাই বাহুল্য, ইহাতে উভয় পক্ষেরই যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল।

এঁফেঁতি বলেন, ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, অতি প্রাচীন কালে দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল; তারপর মধ্যযুগে নফর প্রথার (Serfdom) প্রবর্ত্তন হয়, এবং বর্ত্তমান সময়ে এই নফর সম্প্রদায়ই জোত ও জমীবিহীন অর্থ-সম্পদ-শূন্য মজুররূপে দেখা দিয়াছে। ইহাদের নামগত পার্থক্য থাকিলেও, অবস্থাগত পার্থক্য বিশেষ কিছুই নাই। পূর্ব্বেও যেমন, এখনও তেমনি শক্তিমান ধনী-সম্প্রদায় ইহ দিগকে অতি নির্ম্মম ভাবে খাটাইয়া লইতেছে, কিন্তু এত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়াও ইহারা দুবেলা দুমুঠা অন্ন জুটাইতে পারে না। বর্ত্তমান শিল্প-ব্যবসা-প্রথা বা বিপুল মূলধন ও প্রকাণ্ড কারখানা-সমূহের অধিকৃত ক্যাপিট্যালিজম্ ও ফ্যাক্টরী সিষ্টেম্ই এই সব অনর্থের আদি কারণ। ইহাতে এক দিকে ধনীসম্প্রদায়-যেমন ক্রমেই অধিকতর অর্থসম্পদ লাভ করিয়া আরও ধনী এবং সঙ্গে সঙ্গে বিলাসী ও অত্যাচারী হইয়া পড়িতেছে, নির্ধন সম্প্রদায়ের অবস্থাও তেমনি উত্তরোত্তর আরও খারাপই হইতেছে। এই প্রথার একটী ভয়ানক দোষ এই যে সাম্প্রদায়িক সুখৈশ্বর্য্য এবং দুঃখ দারিদ্র ক্রমেই বংশানুক্রমিক হইয়া পড়িতেছে। ভবিষ্যতে সমাজের মঙ্গলের জন্য ইহার প্রতিবিধান করা দরকার এবং বর্ত্তমানে প্রচলিত দায়ভাগ ও উত্তরাধিকার প্রথার আমূল পরিবর্ত্তন না করিলে, এই প্রতিকার সাধন সম্পূর্ণ অসম্ভব।

এঁফেঁতি বলেন, পূর্ব্বে যখন দেশে সর্ব্বদাই যুদ্ধবিগ্রহাদি চলিত, তখন সবল জমীদারগণ দুর্ব্বল প্রজার রক্ষা করিতেন। ইহারই প্রতিদান স্বরূপ খাজানা দেওয়া হইত। কিন্তু এক্ষণে আর জমীদারগণের এ কাজ করিতে হয় না; সুতরাং খাজানাতে আর তাঁহাদের কোনও ন্যায্য দাবী থাকিতে পারে না। আবশ্যক খরচাদি বাদে জমীদারদের যাহা উদ্বৃত্ত হইবে, তাহা তাহাদের নিজ সম্পত্তিরূপে গণ্য না করিয়া, জন-সাধারণের ব্যবহারার্থ সরকারী বা জাতীয় তহবিলে গচ্ছিত রাখা কর্ত্তব্য।

মূলধন সম্বন্ধেও এই দলের মত সম্পূর্ণ নূতন রকমের। ইঁহারা বলেন যে, সমাজের ধন-বৃদ্ধির জন্য যে সমস্ত যন্ত্রপাতি ও অর্থের (Capital) প্রয়োজন, তাহা কোনও ব্যক্তি-বিশেষের নিজস্ব সম্পত্তিরূপে বিবেচনা করা উচিত নহে;—উহাতে সমস্ত জাতিরই সমান অধিকার; কাজ কর্ম্মের সুবিধার জন্য তৎসমুদয় মূলধনীদের কাছে গচ্ছিত থাকে মাত্র। যে পর্য্যন্ত তাঁহারা উহার সদ্ব্যবহার করিবেন, ততদিন তাঁহাদের নিকট গচ্ছিত থাকিতে পারে, কিন্তু সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, উহা সমগ্র জাতির সম্পত্তি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজকালকার মূলধনীসম্প্রদায়ের প্রায়

সকলেই এত বড় মোটা কথাটী একেবারেই ভুলিয়া যান, এবং সেই জন্যই সমাজে এত অশান্তি ও অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রয়োজনীয় খরচ-পত্র বাদে মূলধনীদের যাহা লাভ দাঁড়াইবে, তাহা সরকারী তহবিলে জমা দিতে বা সকল লোকের মধ্যে ন্যায্যরূপে ভাগ করিয়া দিতে হইবে।

ব্যক্তিগত যোগ্যতারূপ ভিত্তির উপরেই সাঁ-সিমোঁ তদীয় সমাজ প্রতিষ্ঠার কল্পনা করেন। কিন্তু যোগ্যতা প্রদর্শনের ক্ষেত্র বিস্তৃত করিতে হইলেই, বর্ত্তমানে প্রচলিত দায়ভাগ ও উত্তরাধিকার প্রথার বিলোপ-সাধন আবশ্যক। ভবিষ্যতের সমাজে প্রত্যেককে সামর্থ্যানুরূপ কাজ করিতে হইবে, এবং কৃত কার্য্যের উপকারিতা ও পরিমাণ অনুসারে পুরস্কার বা পারিশ্রমিকের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইবে, ইহাই সাঁসিমোঁ সম্প্রদায়ের একটী প্রধান মত। বড় লোকের ঘরে জন্মিলেই যে কাহাকেও কোনও কাজ করিতে হইবে না, বা পূর্ব্বপুরুষের অর্জিত অর্থ যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করিতে পারিবে, ইহাদের মতে বর্ত্তমান সময়ের এই নিয়ম অত্যন্ত দূষণীয়। সমাজের মঙ্গলের জন্য এই প্রথার উচ্ছেদ নিতান্ত আবশ্যক এবং ভবিষ্যৎ সমাজ হইতে উত্তরাধিকার প্রথা একেবারে তুলিয়া দিতে হইবে। কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে, যত ইচ্ছা মজুদ করিতে পারিবেন, কেহই তাঁহাকে বাধা দিবে না। কিন্তু ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর পর সঞ্চিত অর্থ তাঁহার উত্তরাধিকারীর হাতে না যাইয়া, সমাজভুক্ত সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ সরকারী তহবিলে গচ্ছিত হইবে। অতএব এই দলের মতে, উত্তরাধিকারী উঠাইয়া না দিলে, সমাজে কিছুতেই প্রকৃত সমতা রক্ষিত হইতে পারে না। অনেকে বলেন যে উত্তরাধিকার উঠাইয়া দিলে, কেহই সঞ্চয় করিতে চাহিবে না। তদুত্তরে সাঁ-সিমোঁ সম্প্রদায় বলে যে, সরকার হইতেই যখন সকলের ভরণ-পোষণাদির ব্যবস্থা করা হইবে, তখন যক্ষের মত সঞ্চয় করিবারই বা দরকার কি? তবে প্রকৃতিদত্ত প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ এই প্রথায় সাধারণ লোক অপেক্ষা অধিক লাভবান ও অর্থশালী হইবে। সাঁ-সিমোঁ বলেন যে স্বয়ং প্রকৃতিই যখন এইরূপ পার্থক্য বিধান করিয়াছেন, তখন তাহা নির্ব্বিবাদে মানিয়া লওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। বিশেষতঃ, এরূপ লোকের সংখ্যা অতি সামান্য ও উহাদের মৃত্যুর পরেই সমস্ত সঞ্চিত অর্থ সাধারণ তহবিলে আসিবে।

উত্তরাধিকার উঠিয়া গেলে, গবর্ণমেণ্টকেই দেশের যাবতীয় ধন ও ভূ-সম্পত্তির মালিক হইতে হইবে। তখন গবর্ণমেণ্টকেই সমাজের হিতজনক যাবতীয় বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতে হইবে। আজকাল গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সৈন্য প্রভৃতি অনেক বিষয়ই নিজে তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। শুধু শিল্প-বাণিজ্যই সাধারণ লোকের হাতে আছে। অতঃপর সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ গবর্ণমেণ্টকে উহাও নিজ হাতে লইতে লইবে। ফলতঃ, ইহাই সাঁ-সিমোঁ সম্প্রদায়ের মত।

ফুরিয়ে—ফ্রান্সের অন্তঃপাতী বেসাঁকোঁ (Besancon জেলায় ১৭৭২ খৃঃ অব্দে ফুরিয়ের (Francois Marie Charles Fourier) জন্ম হয়। তাঁহার পিতা বিশেষ সঙ্গতিপন্ন ছিলেন। বাল্যকালে বিদ্যালয়ে বিশেষ শিক্ষা লাভ না হইলেও, ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, ও জার্ম্মাণির নানাস্থানে পরিভ্রমণ করায়, ঐ বিষয়ে ফুরিয়ের বিশেষ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। তৎকাল প্রচলিত ব্যবসা-বাণিজ্যের অনিষ্টকারিতার প্রতি অতি অল্প বয়সেই তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এ সম্বন্ধে দুইটী সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে। কথিত হয়, যখন তাঁহার বয়স সবেমাত্র পাঁচ বৎসর, তখন একদিন তাঁহার পিতার দোকানে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে জনৈক ভদ্রলোক ঐ দোকান হইতে একটী জিনিস কিনিয়া লইয়া যাইতেছিলেন। জিনিসটীর একটা সাংঘাতিক দোষ ছিল, কিন্তু ঐ ব্যক্তি তাহা ধরিতে পারেন নাই। ফুরিয়ে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে উহা দেখাইয়া দেন। এ জন্য তাঁহাকে পিতার হস্তে বিশেষ শাস্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল। আর একবার দুর্ভিক্ষের সময় প্রচুর পরিমাণে খাদ্য দ্রব্য রাখি করা হয়। মূল্য আরও বাড়িবে এই আশায় শেষ পর্য্যন্ত তাহা ছাড়িয়া দেওয়া হয় না। শেষে দেখা গেল, সমস্তই একেবারে ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া গিয়াছে। তখন সেগুলি পোড়াইয়া ফেলা হয়। এই দু'টী অতি সাধারণ ঘটনা হইতেই

প্রচলিত ব্যবসা-বাণিজ্য প্রথার উপর তাঁহার আন্তরিক ঘৃণা জন্মে। তিনি মনে মনে সিদ্ধান্ত করিলেন, যাহাতে সর্ব্বদাই এইরূপ অপকর্ম্ম করিতে হয়, তাহা নিশ্চয়ই নীতি-বিগর্হিত ও পরিণামে সমাজের পক্ষেও বিষম অমঙ্গল-জনক। সমাজের হিতের জন্য এই নিন্দনীয় প্রথার দূরীকরণ অবশ্যকর্ত্তব্য। কি উপায়ে ইহার নিরাকরণ করা যাইতে পারে, অতঃপর তিনি তাহারই উপায় উদ্ভাবনে মনোনিবেশ করেন, এবং তাহারই ফলে ১৮০৮ খৃঃ অব্দে তদীয় প্রথম গ্রন্থ (Theorie des Quatre Movements) প্রকাশিত হয়।

সুতরাং গ্রন্থ-প্রকাশ হিসাবে ফুরিয়ে সাঁ-সিমোঁর অগ্রবর্ত্তী। কিন্তু ১৮৩০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তদীয় মতবাদ জনসমাজে কিছুমাত্র আদৃত হয় নাই। এই সময়ে ফরাসী দেশে সাঁ-সিমোঁর মতবাদই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্তৃতি লাভ করে, এবং উহারই ফলে ফুরিয়ের মতবাদের প্রতি ফরাসী জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

ফুরিয়ে বলিতেন যে বর্ত্তমানে সমাজে লোকসংখ্যার কোনও সীমা নির্দ্দিষ্ট নাই। ইহাতে অনেক রকম অসুবিধা হইয়া থাকে। এই সমস্ত অসুবিধার দূরীকরণ জন্য ভবিষ্যতে ৪০০ পরিবার বা ১৬০০ হইতে ২০০০ হাজার লোক লইয়া এক একটী সঙ্ঘ (Phalange) স্থাপিত করিতে হইবে। জীবন-ধারণ ও সুখে স্বচ্ছন্দে বসবাসের জন্য মানুষের যাহা যাহা আবশ্যক, সমস্তই প্রত্যেক সঙ্ঘে নির্ম্মিত হইবে। প্রত্যেক সঙ্ঘই স্বয়ং-সম্পূর্ণ ও অনন্য-নিরপেক্ষ হইবে। আজকাল লোকে পৃথক পৃথক পরিবারভুক্ত হইয়া বিভিন্ন বাড়ীতে অবস্থান করায়, গৃহাদি-নির্ম্মাণ ও পৃথক পৃথক চাকর-বাকর প্রভৃতির জন্য যথেষ্ট খরচ হয়। ফুরিয়ের মতে এই সমস্ত খরচ যে কেবল অনাবশ্যক তাহাই নহে, পরন্ত এতদ্বারা সমাজে উচ্চ নীচ ধনী নির্ধন, ছোট বড় এইরূপ ভেদনীতির অত্যধিক মাত্রায় প্রশ্রয় দেওয়া হইয়া থাকে। এতদ্বারা সামাজিক সমতা রক্ষা আদৌ সম্ভবপর নহে। অতঃপর পৃথক পৃথক বাড়ীঘর নির্ম্মাণ না করিয়া, সমস্ত সংঘের জন্য একটী মাত্র প্রকাণ্ড বাড়ী প্রস্তুত হইবে। সঙ্ঘভুক্ত সকলকেই এই বাড়ীতে বাস করিতে হইবে। ইচ্ছা করিলে, সকলে একই টেবিলে খাওয়া দাওয়া করিতে পারিবে, কিন্তু এ বিষয়ে কোনও বাধ্যবাধকতা থাকিবে না; কেহ ইচ্ছা করিলে নিজের ঘরেও খাইতে পারিবে। সঙ্ঘে প্রভু ভৃত্য বা উচ্চ নীচ সম্বন্ধ থাকিবে না—এখানে সকলেই সমান। রন্ধনাদি প্রভৃতি সংঘভুক্ত সর্ব্বসাধারণের কাজ সকলকেই পর্য্যায়ক্রমে করিতে হইবে। অন্যান্য কাজ সকলে নিজ নিজ যোগ্যতা ও রুচি অনুসারে করিবে। অনিচ্ছাসত্ত্বে কাহাকেও কোনও অপ্রীতিকর কাজ করিতে বাধ্য করা হইবে না। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ নিকর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিতে, বা অপ্রয়োজনীয় জিনিস উৎপন্ন করিতে পারিবে না। সকলকেই নিজ নিজ শক্তি অনুসারে সংঘের হিতজনক কোন না কোন কাজ করিতেই হইবে। প্রত্যেক সংঘে ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি সম্প্রদায় থাকিবে। সঙ্ঘভুক্ত লোকেরা আপনাদের পছন্দ অনুসারে এই সমস্ত সম্প্রদায় গঠন করিয়া লইবে, এবং এক সম্প্রদায়ের লোক ইচ্ছা করিলে, অন্য সম্প্রদায়েও যাইতে পারিবে; তাহাতে কোনও বাধা থাকিবে না। সাঁ-সিমোঁর মতাবলম্বীগণ যেমন ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার প্রথার এককালীন উচ্ছেদের পক্ষপাতী, ফুরিয়ের মতাবলম্বীগণ তাহা নহেন। ইহারা বলেন, সম্ভবপর হইলে, লোকে ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি অর্জ্জন করিতে পারে এবং পুত্রপৌত্রাদিগণ উত্তরাধিকার-সূত্রে তাহা পাইতে পারিবে। শ্রম-শিল্পাদির দ্বারা সঙ্ঘের সাধারণ তহবিলে যে ধনাগম হইবে, তাহা হইতে প্রথমতঃ সকলকেই গ্রাসাচ্ছাদনোপযোগী অর্থ প্রদান করিতে হইবে শিল্প-ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য মূলধন বাড়াইবার দরকার হইলে, তাহাও করিতে হইবে। তদ্বাদে যে টাকা বাঁচিবে, তাহা শ্রম, মূলধন, ও পারদর্শিতা অনুসারে যথাক্রমে $\frac{5}{12}$, $\frac{4}{12}$ ও $\frac{3}{12}$ অংশে ভাগ করিয়া দিতে হইবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সঙ্ঘে কোনও চাকর থাকিবে না। যাহা সকলেরই সমান দরকার, সকলকেই তাহা পর্য্যায়ক্রমে করিতে হইবে। কাহারও কোনও ব্যক্তিগত কাজের

দরকার হইলে, তাহাকে নিজে বা তাহার পরিবারস্থ লোকের তাহা করিতে হইবে। ফুরিয়ে বলিতেন যে, আজকাল সমাজের ধনশালী শ্রেণীর স্ত্রীলোকদের মধ্যে হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি ব্যারামের অত্যন্ত আধিক্য দেখা যায়। আলস্য-পরায়ণতাই অধিকাংশ স্থলে এই সমস্ত ব্যারামের মূল কারণ। তাঁহার ব্যবস্থায় চাকর-বাকর না থাকার ফলে অধিকাংশ কাজ নিজ হাতে করিতে হইলে এই সমস্ত ব্যারামের হ্রাস হওয়ারই সম্ভাবনা।

সঙ্ঘে কোনও অপ্রয়োজনীয় বা বিলাসের দ্রব্যও প্রস্তত হইতে পারিবে না। আজকাল এই সমস্ত জিনিসই অধিক মাত্রায় তৈয়ারী হয়, এবং সেই জন্যই শ্রমজীবিগণকে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতে হয়। এই সমস্ত জিনিস যদি আদৌ তৈয়ারী করা না হয়, তাহা হইলে আর তাহাদিগকে প্রাণান্ত-কর পরিশ্রমও করিতে হইবে না। তবে সর্ব্বসাধারণের জন্য এমন অনেক কাজের দরকার হইতে পারে, যাহা অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য। এরূপ অবস্থায় পর্য্যায়ক্রমে সকলকেই উহা করিতে হইবে।

ফুরিয়ে বলিতেন যে আমরা বর্ত্তমান সমাজে সাধারণতঃ যে সমস্ত অসন্তোষ ও অশান্তি দেখিতে পাই, তাহার অধিকাংশই আমাদের সহজাত প্রবৃত্তি-নিচয়ের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি ও বিকাশে প্রতিবন্ধক হইতে জন্মিয়া থাকে। ভবিষ্যৎ সমাজ হইতে এই সমস্ত অন্তরায় সম্পূর্ণ ভাবে দূর করিতে হইবে। ইচ্ছা করিলে, লোকে পরিবার-বদ্ধ হইয়া থাকিতে পারিবে বটে, কিন্তু এ জন্য কোনও বাঁধাবাঁধি নিয়ম থাকিবে না। যে কেহ ইচ্ছা করিলেই পারিবারিক বন্ধন ভঙ্গ করিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন হইতে পারিবে। কাহাকেও জোর করিয়া অন্যের মুখাপেক্ষী করা হইবে না। স্ত্রী-পুরুষনির্ব্বিশেষে সকলেই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিবে ; এমন কি, সন্তানের বয়স পাঁচ বৎসর হইলেই, সাধারণ তহবিল হইতে তাহার ভরণ-পোষণাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

উপরে সাঁ-সিমোঁ ও ফুরিয়ের মতবাদের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল, তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে উভয়ের প্রায় একই উদ্দেশ্য—তৎকাল-প্রচলিত সামাজিক সমতার অভাব দূরীকরণের জন্য উভয়েই অতিমাত্র ব্যগ্র। কিন্তু দুই জন দুই উপায়ে এই উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। উপায় দুটী পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাক্রান্ত না হইলেও, ইহাদের পরস্পরের সাদৃশ্য অতি কম বা নাই বলিলেই হয়। সাঁ-সিমোঁর মতে ব্যবসা বাণিজ্যাদি ব্যক্তিগত লাভের বিষয় হইয়া পড়াতেই যত অনর্থের উৎপত্তি হইতেছে—লোক সমাজের হিতাহিতের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না রাখিয়া শুধু নিজের লাভের দিকেই মন দেয়। ইহাতে তাহারা ব্যক্তিগত ভাবে অত্যন্ত অর্থশালী হয় বটে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত নির্ধন সম্প্রদায়ের অবস্থা আরও খারাপ হইয়া পড়ে। ইহার সম্যক্ প্রতিকার করিতে হইলে গবর্ণমেণ্টকেই সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধানের ভার নিজ হাতে লইতে হইবে, নতুবা সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে সমতা রক্ষিত হওয়া সম্ভবপর নহে।

ফুরিয়ে কিন্তু সমস্ত ক্ষমতা গবর্ণমেণ্টের হাতে দেওয়া পছন্দ করিতেন না। তিনি বলিতেন যে, ভবিষ্যৎ সমাজ হইতে উচ্চ নীচ, প্রভুভৃত্য সম্বন্ধই একেবারে উঠাইয়া দিতে হইবে, নতুবা সমতা রক্ষিত হইবে না। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক লোক লইয়া এক একটী অনন্য-নিরপেক্ষ সঙ্ঘ স্থাপন করিতে হইবে। সেখানে সকলেরই সমান অধিকার থাকিবে, কোনও উচ্চ নীচ ভেদ থাকিবে না।

এই দুইটী মতবাদ হইতে ভবিষ্যতে দুইটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। সাঁসিমোঁর অনুবর্ত্তীগণ 'ষ্টেট সোসিয়া-লিজ্‌মের' পক্ষপাতী—ফুরিয়ের মতাবলম্বীগণ 'কমিউনিষ্ট' বা সঙ্ঘবাদী বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

সাঁ-সিমোঁ ও ফুরিয়ে উভয়েই সোসিয়ালিজমের প্রথম প্রবর্ত্তক। সুতরাং তাঁহাদের প্রচারিত মতবাদ যে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ও সর্ব্বকালোপযোগী হইবে এরূপ আশা করা অসঙ্গত। বস্তুতঃ, ইহাদের উভয়েরই মতে এমন অনেক বিষয়ই দেখিতে পাই, যাহা কার্য্যে পরিণত করা আদৌ সম্ভবপর নহে, বা কার্য্যে পরিণত হইলে, শৃঙ্খলার পরিবর্ত্তে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা ও অশান্তিরই সৃষ্টি করিবে। উভয়েরই জন্ম ফরাসী-বিপ্লবের

যুগে, এবং উভয়েই সেই যুগ-ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত ছিলেন। সরলতা ও বিশ্বাস-প্রবণতা এই দুইটী গুণই তাঁহাদের জীবনের প্রধান বিশেষত্ব ছিল। তাঁহারা নিজে যেমন ভাল মানুষ ছিলেন, বিশ্বসংসারকেও সেইরূপই বিবেচনা করিতেন। ভাবিতেন, মানুষকে মঙ্গলের কথা বুঝাইয়া বলিলেই বুঝি সকলে হিংসাদ্বেষ প্রভৃতি সমস্ত ভুলিয়া পরস্পরের হিত-সাধনে আত্ম-নিয়োগ করিবে। ইহা তাঁহাদের মতবাদের সর্ব্বপ্রধান দোষ।

তাঁহারা যে যুগে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সময়ে মূলধন ও মজুরীর মধ্যে সবেমাত্র প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে—তখনও বর্ত্তমান সময়ের মত সুস্পষ্ট ও ভীষণ আকার ধারণ করে নাই। ফুরিয়ের মতবাদ ১৮০৮ খৃঃ অব্দে কার্য্য পরিণত করা সম্ভবপর হইতে পারিত বটে—কিন্তু ১৮৩০ খৃঃ অব্দে যখন উহা সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তখন দেশের অবস্থা বহুল পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং ঠিক ঐ অবস্থায় উহা কার্য্যে পরিণত করা আর সম্ভবপর ছিল না।

তথাপি সোসিয়ালিজমের অগ্রদূতের স্বরূপ ইহাদিগকে সম্মান করিতেই হইবে। আমরা পরে দেখিব যে পরবর্ত্তী সোসিয়ালিজমের নেতাগণ ইহাদিগকেই আদর্শ ধরিয়া স্ব স্ব দেশ কাল ও আশপাশের অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

সোসিয়ালিজমের ইতিহাসে ১৮৩০ খৃঃ অব্দ অতি স্মরণীয় বৎসর। এতদিন মধ্যবিত্ত ও শ্রমজীবী সম্প্রদায় উভয়েই সামাজিক হিসাবে প্রায় সমাবস্থাপন্ন ছিল। উভয়েই ধনী ও অভিজাতবর্গ কর্ত্তৃক নানা রকমে প্রপীড়িত হইয়া আসিতে-ছিল। কিন্তু ঘটনা-চক্রের বিচিত্র আবর্ত্তনে ঐ বৎসরে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বিস্তৃততর রাজনৈতিক অধিকার প্রাপ্ত হওয়াতে তাহারাও দেশের মধ্যে প্রভাবশালী হইয়া দাঁড়ায়। চিরকাল যাহাদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিয়া আসিতেছিল, এক্ষণে অচিন্তিতপূর্ব্ব উপায়ে তাহাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখিয়া শ্রমজীবীগণ আপনাদিগের অবস্থার শোচনীয়তা অতি তীব্র ভাবে অনুভব করিতে লাগিল, এবং অবস্থার উন্নতি-কল্পে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইল। সাঁ-সিমোঁ যে মতের প্রচার করেন, তাহা এতদিন নির্দ্দিষ্টসংখ্যক লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ১৮৩০ সালের জুলাই মাসের ফরাসী বিদ্রোহের পর হইতেই উহা সমধিক ভাবে জন-সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ফুরিয়ের মতও এতদিন অনাদৃতই ছিল; কিন্তু এক্ষণে উহা লইয়া চারিদিকে আন্দোলন আলোচনা চলিতে লাগিল। ১৮৩১ খ্রীঃ অব্দে লিয়ঁ (Lyons) সহরে প্রথম শ্রমজীবী-বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। "হয় উপযুক্ত পরিমাণ কাজ দিবে, নতুবা যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিব" (Live working or die fighting)—ইহাই এই বিদ্রোহী দলের মূলমন্ত্র ছিল। পরিণামে রাজশক্তি কর্ত্তৃক এই বিদ্রোহ দমিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু উহারা তাহাতে ও নিরস্ত হয় নাই। ঠিক এই সময়েই ইংলণ্ডেও শ্রমজীবী-সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান হয়। রবার্ট ওয়েন প্রচারিত সোসিয়ালিজমের বর্ণনা প্রসঙ্গে এই বিষয় বিস্তৃত ভাবে বিবৃত হইবে।

১৮৩০ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮৪৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ফ্রান্সের রাজধানী প্যারী নগরীতে সোসিয়ালিষ্টগণের প্রধান আড্ডা ছিল। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ হইতে বিতাড়িত সোসিয়ালিষ্ট মতাবলম্বীগণ প্যারীতে আশ্রয় গ্রহণ করে। উত্তরকালে জার্ম্মাণ সোসিয়াল ডিমক্র্যাটদলের প্রতিষ্ঠাতা ফার্ডিন্যাণ্ড ল্যাসেল (Ferdinand Lassalle), আন্তর্জ্জাতিক শ্রমজীবী-সম্প্রদায়ের নেতা কার্ল মার্ক্স (Karl Marx), রুশীয় এনার্কিষ্ট দলের অগ্রদূত বাকুনিন্ (Bakunin) প্রভৃতি এই সময়েই এবং প্যারী নগরীতেই সোসিয়ালিজম্ মন্ত্রে দীক্ষিত হন।

লুই ব্লাঁ।—সাঁসিমোঁ ও ফুরিয়ে যে মতের প্রচার করেন, তাহা সর্ব্বাংশে কার্য্যে পরিণত করা সম্ভবপর ছিল না। বিশেষতঃ তাঁহারা যে সময়ের সমাজের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, ১৮৩০ খৃঃ অব্দে তাহার বিস্তর পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু ঘটনাক্রমে এই সময়েই উহাদের মতের বিস্তারিত আলোচনা আরব্ধ হয়। তখন উভয়ের মতকে আদর্শ ধরিয়া, পরিবর্ত্তিত অবস্থার উপযোগী ব্যবস্থার

উদ্ভাবনের আবশ্যকতা উপলব্ধি হয়, এবং ইহার পরিণামেই সুপ্রসিদ্ধ লুই ব্লাঁর (Louis Blanc) আবির্ভাব হয়।

স্পেন দেশের রাজধানী মাড্রিড (Madrid) সহরে ১৮১১ খৃঃ অব্দে লুই ব্লাঁর জন্ম হয়। তাঁহার পিতা সেখানে তখন রাজস্ব-বিভাগের পরিদর্শক কর্মচারী ছিলেন। লুই ব্লাঁ অল্প বয়সেই সংবাদ-পত্রের সম্পাদকরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে রিভিউ ডি প্রোগ্রেস (Revue de Progres) নামে একখানি সংবাদপত্র বাহির করেন। এই পত্রিকাতেই তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ Organisation due travail বা 'শ্রম-ব্যবস্থা' প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়। ১৮৩০ খৃঃ অব্দ হইতেই সোসিয়ালিজ্‌ম্ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আন্দোলন আলোচনা হইতেছিল। সুতরাং লুই ব্লাঁর গ্রন্থ প্রকাশিত হইবামাত্র শ্রমজীবী-সম্প্রদায়ের মধ্যে উহার বিশেষ আদর হইল। ঠিক এই সময়েই প্রুধোঁ (Proudhon) রচিত "সম্পত্তি কি" ? (Qu' est-ce que la propriete ? What is Property ?) নামক যুগ-পরিবর্ত্তক গ্রন্থও প্রকাশিত হয়। (১৮৪০ খৃঃ অঃ)। এই দুই গ্রন্থাধিকৃত মতবাদের প্রচার ফলেই ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে ফরাসী-বিদ্রোহ ও দ্বিতীয় সাধারণ তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।

লুই ব্লাঁ বলিতেন যে, জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য সাঁ-সিমোঁ গবর্ণমেণ্টের হস্তেই যাবতীয় ক্ষমতা প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাতে কিছুদিন ভাল ফল দেখা যাইতে পারে বটে, কিন্তু পরিণামে ইহার ফল ভাল না হইবারই সম্ভাবনা। গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ভাবে ন্যস্ত হইলে, গবর্ণমেণ্ট যদি কালক্রমে স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠে, তবে তাহার অত্যাচারের প্রতিরোধে সমর্থ কোন শক্তিই দেশে থাকিবে না, এবং প্রায়ই দেখা যায় যে বাধা পাইবার আশঙ্কা না থাকিলে গবর্ণমেণ্ট প্রায়ই স্বেচ্ছাচারী হইয়াই উঠে। সুতরাং অভিজাত ও মূলধনী-বর্গের অত্যাচর হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ষ্টেট্‌কে (State) অসীম ক্ষমতাপন্ন করিয়া তুলিলে, পরিণামে তদ্বারা প্রজা-সাধারণের অনিষ্ট বই ইষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই বলিলেই হয়। শ্রমজীবী-সম্প্রদায়ের অবস্থার উন্নতি-সাধনই যে একমাত্র সমস্যা, এ বিষয়ে সাঁ-সিমোঁর সহিত তাঁহার কিছুমাত্র মতদ্বৈধ ছিল না। কিন্তু লুই বলেন যে, উন্নতিকে সর্ব্বব্যাপক ও চিরস্থায়ী করিতে হইলে, গবর্ণমেণ্টকে সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন না করিয়া, বরং শাসন সংরক্ষণাদি যাবতীয় বিষয়ে জনসাধারণের আধিপত্য প্রতিষ্ঠাপিত করিতে হইবে। রাজনৈতিক ক্ষমতালাভব্যতীত সামাজিক ও নৈতিক উন্নতির কোনও মূল্য নাই। শেষোক্ত বিষয়টি উদ্দেশ্য বটে,কিন্তু প্রথমটির সাহায্য ব্যতীত ইহা লাভের উপায়ান্তর নাই। স্বীয় মতের পরিপোষক দৃষ্টান্তের জন্যও তাঁহাকে বেশী দূর যাইতে হয় নাই। মধ্যবিত্ত ও শ্রমজীবী সম্প্রদায় এতদিন প্রায় একই রূপ অবস্থাপন্ন ছিল ; কিন্তু সম্প্রতি বিস্তৃততর রাজনৈতিক অধিকার লাভ করার ফলে, উহাদের অবস্থার ও রীতি-নীতির অভূত-পূর্ব্ব উন্নতি হইয়াছে। সুতরাং শ্রমজীবী সম্প্রদায়েরও আর্থিক ও নৈতিক অবস্থার উন্নতি-সাধন করিতে হইলে, পূর্ব্বে শাসন-সংক্রান্ত বিষয়ে ক্ষমতা লাভ করিতে হইবে,—প্রচলিত রাজতন্ত্রকে গণতন্ত্রের আদর্শে প্রয়োজনানুরূপ পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতে হইবে।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, সাঁসিমোঁ ও ফুরিয়েব অনেক মতই দেশকালোপযোগী ছিল না, অথবা উহা কার্য্যে পরিণত হইলে, সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলার পরিবর্ত্তে ভয়ানক অশান্তিরই উৎপত্তি হইত। লুই এই সমস্ত অসম্ভব সিদ্ধান্তের পরিহার করিয়া উভয়ের মত হইতে দেশকালোপযোগী বিষয়গুলি বাছিয়া লইয়া স্বীয় মতবাদ সংগঠিত করেন। ইহাই তাঁহার প্রধান কৃতিত্ব।

তিনি বলেন যে, পূর্ব্বে ব্যবসা-বাণিজ্য যখন অতি অল্প পরিসরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, তখন অল্প মূলধনে বা কুটীর-শিল্প প্রভৃতির দ্বারা ব্যবসায় চলিত বটে ; কিন্তু এখন ব্যবসার ক্ষেত্র সমস্ত পৃথিবীময় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে,এবং পৃথিবী শুদ্ধ লোক খরিদ্দার হইয়াছে। সুতরাং বাজারে মাল জোগান দিতে হইলে, পূর্ব্বের মত অল্প মূলধনে বা কুটির-শিল্পে চলিবে না ;—মূলধনও বেশী চাই, কল কারখানা প্রভৃতিও চাই ;

চাই না শুধু বর্ত্তমান সময়ের আত্মসর্ব্বস্ব মূলধনী-সম্প্রদায়, আর, তাহাদের 'স্বচ্ছন্দানুবর্ত্তন নীতি' (Laisser-faire) ও অবাধ প্রতিযোগিতা। এগুলিই যত অনর্থের মূল। শিল্প-বাণিজ্যাদি সমস্তই ইহাদের হস্তগত থাকায় ইহারা সমাজের হিতাহিতের দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি না রাখিয়া শুধু নিজেদের লাভেরই চেষ্টা করিয়া থাকে। বড় বড় মূলধনীদের প্রতিযোগিতায় ছোট ছোট মূলধনীদের বাঁচিয়া থাকাই এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। কেন না, অগাধ অর্থ থাকাতে, ছোট ছোট মূলধনীদের সর্ব্বনাশ না হওয়া পর্য্যন্ত ইহারা অনায়াসেই তাহাদের অপেক্ষা অনেক কম দামে জিনিস ছাড়িয়া দিতে পারে; কিন্তু ছোট মূলধনীরা 'ফেল' পড়িলেই বাজারে একচেটিয়া সরবরাহকার হওয়ায় অমনি দামও চড়াইয়া দেয়। এই অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে ইহাদের নিজেদেরও যে সর্ব্বনাশ না হইতেছে, তাহা নহে। কারণ, বাজারে কোনও মালের টান্ পড়িলেই, কি পরিমাণ মালের কাটতি হইতে পারে তাহার কিছুমাত্র হিসাব না করিয়াই, প্রতিদ্বন্দী ব্যবসায়ীর পূর্ব্বেই যে যত পারে বাজারে মাল উপস্থিত করে। মালের উৎকর্ষাপকর্ষের দিকে কোনও লক্ষ্য থাকে না; সস্তায় ও সকলের পূর্ব্বে প্রচুর পরিমাণে মাল হাজির করিতে পারিলেই হইল। ফলে বাজারে প্রয়োজনাতিরিক্ত মাল জমিয়া যায়, দরও কমিয়া যায়, ও মালগুলি গুদামে পচিতে থাকে। তখন কাজে কাজেই ইহাদিগকে বাধ্য হইয়া কারখানার শ্রমজীবীর সংখ্যা কমাইয়া দিতে হয়, এবং যাহারা অবশিষ্ট থাকে, তাহারাও পুরা মাহিনা পায় না। ইহাতে যে শুধু শ্রমজীবী সম্প্রদায়েরই প্রাণান্তকর কষ্ট উপস্থিত হয়, তাহা নহে; পরন্তু, মূলধনীদেরও অনেকে এই ধাক্কা সামলাইতে না পারিয়া একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান শিল্প-ব্যবসায় প্রথায় পরিণামে কাহারও লাভ হইতেছে না। অতএব সর্ব্বসাধারণের উন্নতির জন্য এই প্রথার উচ্ছেদ সাধন অবশ্য কর্ত্তব্য।

লুই ব্লাঁ প্রস্তাব করেন যে, অতঃপর প্রত্যেক জেলাতেই কয়েকটী যৌথ সমিতির (Co-operative Societies) প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তিনি এই সমিতির নাম দিয়াছিলেন —Social workshops বা 'সামাজিক কারখানা'। গবর্ণমেণ্ট হইতেই বিনা সুদে প্রত্যেক সমিতির মূলধন সরবরাহ করা হইবে। প্রথম বৎসরে গবর্ণমেণ্টই জনসাধারণের মত গ্রহণ করিয়া সমিতির কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগ ও নিয়মাবলী প্রস্তুত করিয়া দিবেন। পরে শ্রমজীবিগণ যৌথ কারবারের পদ্ধতি ও উপকারিতা জানিতে পারিলে, গবর্ণমেণ্টকে আর বিশেষ কিছুই করিতে হইবে না। সমিতির সদস্যগণই কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগ প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্য করিবে; গবর্ণমেণ্টকে শুধু তত্ত্বাবধান করিলেই চলিবে। গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত অর্থ ছাড়া আরও মূলধনের দরকার হইতে পারে। বর্ত্তমান মূলধনীদের নিকট হইতে তাহা সংগ্রহ করিতে হইবে। অবশ্য সে জন্য তাহাদিগকে প্রচলিত হারে সুদ দিতে হইবে, এবং সেই সুদ ও আসলের জন্য গবর্ণমেণ্ট জামিন থাকিবেন।

লুই ব্লাঁ বলেন যে, প্রত্যেক জেলাতে এইরূপ কতকগুলি সামাজিক কারখানা স্থাপিত হইলে, তত্তৎস্থানের মূলধনীগণ নিজেরাই আসিয়া উহার সহিত সম্মিলিত হইবেন, অথবা তাহাদের ব্যবসায়প্রথার আর তত অপকারিতা থাকিবে না। সুতরাং কিছুমাত্র অশান্তির সৃষ্টি না করিয়াও শ্রমজীবিগণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

প্রত্যেক সমিতির বৎসরে যে লাভ দাঁড়াইবে, তাহা তিন ভাগে বিভক্ত হইবে। প্রথম ভাগ সমিতির শ্রমজীবিগণের মধ্যে তুল্যাংশে ভাগ করিয়া দিতে হইবে। ইহাতে প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির উপর কিছু অন্যায় করা হইবে বটে, কিন্তু উপায়ান্তর নাই। মানুষের হিতসাধনেই প্রতিভার যথার্থ পুরস্কার। অন্যথা পৃথিবীতে এমন কোনও ধনরত্ন নাই যদ্দ্বারা মহাত্মা নিউটনের ন্যায় প্রতিভাবান ব্যক্তির প্রতিভাকে সম্যক্রূপে পুরস্কৃত করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ প্রকৃত প্রতিভাসম্পন্ন লোকের সংখ্যা অতি নগণ্য। সুতরাং উহা না করিলেও চলে লুই ব্লাঁ বলেন যে, প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি

[illegible] সকল লোকই প্রায় সমাবস্থাপন্ন। তবে এখন যে [illegible] দেখা যায়, তাহা নানা কারণে ঘটিয়াছে। 'সামাজিক কারখানায়' সকলেই সমান সুবিধা ও ক্ষেত্র পাইলে এই পার্থক্য আর থাকিবে না।

লাভের দ্বিতীয় অংশ দরিদ্র, অসমর্থ ও পীড়িত লোকের ভরণ-পোষণার্থ ব্যয়িত হইবে। তৃতীয় অংশ সমিতির তহবিলে মজুদ থাকিবে। কোনও নূতন ব্যক্তি সমিতির সদস্য হইতে চাহিলে, এই সঞ্চিত তহবিল হইতে তাহাকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি প্রভৃতি কিনিয়া দিতে হইবে।

গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে একটী কেন্দ্রসমিতি থাকিবে। বিভিন্ন সমিতি যাহাতে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করিয়া উৎসন্ন না হয়, কেন্দ্রসমিতি সর্ব্বদা তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। কোনও কারণে এক সমিতির অত্যন্ত অর্থাভাব হইলে, কেন্দ্রসমিতি অন্য সমিতি হইতে আবশ্যক পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করিয়া উহার রক্ষাসাধন করিবেন।

সংক্ষেপে ইহাই লুই ব্লাঁর মত। ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে আমরা ইহার ফল দেখিতে পাই। ঐ সালে শ্রমজীবীসম্প্রদায় গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্থিত হয় এবং তাহার ফলে ফ্রান্সে দ্বিতীয় সাধারণ তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। এই প্রজাবিদ্রোহ যে শুধু ফ্রান্সেই সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা নহে। পরন্তু ইউরোপের উত্তর ও পশ্চিমাংশের প্রায় সকল দেশেই উহা অল্পাধিক পরিমাণে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ইতিহাসের দিক হইতে দেখিতে গেলে ইহাই বলিতে হয় যে, ফরাসীবিপ্লবের অবসান ও ওয়াটার্লু-ক্ষেত্রে নেপোলিয়ানের পরাভবের পর ইউরোপীয় রাজন্যবর্গ ভিয়েনা-কংগ্রেসে অষ্ট্রীয়ার রাজমন্ত্রী মেটার্নিকের (Meternick) প্ররোচনায় ইউরোপীয় অনিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্র (Monarchy) পুনঃ প্রতিষ্ঠার্থ যে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হন, ১৮৪৮ খৃঃ অব্দের প্রজাবিদ্রোহ তাহারই প্রতিক্রিয়া মাত্র এবং ইহা হইতেই মেটার্নিক-কল্পিত অনিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে [illegible] হয়।

লুই ব্লাঁ এই প্রজাবিদ্রোহে বিশেষভাবে যোগদান করিয়াছিলেন এবং উহার পরে যে অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট (Provisional Government) স্থাপিত হয়, তাহাতে তিনিও শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের একজন প্রতিনিধি ছিলেন। এই সুযোগে তিনি গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে ফ্রান্সের সর্ব্বত্র 'সামাজিক কারখানা' প্রতিষ্ঠা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। ২।১টী কারখানা যে প্রতিষ্ঠিত না হইয়াছিল, তাহা নহে। কিন্তু সহযোগীগণের প্রতিকূলাচরণ বশতঃ তাহা ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখার আদৌ সুবিধা হয় নাই।

শ্রীমন্মথনাথ মজুমদার।

তাজ

কোন্ লক্ষ্মী পূর্ণিমায় সারা নিশি জাগি
নিঙারি নিটোল শশী, হে গুণী সম্রাট্!
মমতা মোমের লতা—"মমতাজ" লাগি,
গড়িলে এ জ্যোতির্ম্ময় জ্যোছনার খাট?

কে বলে কবর?—এ যে কবির কাহিনী,
মর্ম্মরের মর্ম্মগাথা—সৌধ স্মিরিতির,
সাজাহার স্বপ্ন এ যে—মানস-মোহন
মাণিক্যের মহাকাব্য!—অর্ঘ্য পীরিতির!

নিশিগন্ধা [illegible] শুভ্র দল দিয়া
রচিলে যুগল শয্যা—হে মোগল-রাজ!
তোমার ও হিয়াফাটা আঁখি-নীর পিয়া,
অঙ্কুরি উঠিল শিলা—চির তাজা তাজ!

ঢালিলে যমুনাকূলে পুষ্প অশ্রু-জল
মরিয়া অমর, তুমি নিবিয়া উজল!

শ্রীকুলচন্দ্র দে।

মিত্রকবি হরিশচন্দ্র *

(সাহিত্যিক কর্ম্মজীবনের সংক্ষিপ্ত কথা)

প্রকৃত কাব্য কবি-হৃদয়ের আলেখ্য—কাব্যে কবি-হৃদয় প্রতিফলিত হয়। পূর্ব্ববঙ্গের গৌরব কবিবর ৺হরিশ্চন্দ্র

* ঢাকা সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

... [illegible] সাহিত্যিক কর্ম্ম-জীবনের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিব।

পূর্ব্ববঙ্গে কেন, সমগ্র বঙ্গদেশে মিত্র-কবির স্থান [illegible] উচ্চে। বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্য ও ঢাকার সংবাদপত্র-[illegible] মূলে, মিত্রকবির প্রভাব বিরাজমান। বর্ত্তমান প্রবন্ধে, সংক্ষেপতঃ আমরা তাহারই আলোচনা করিব।

দেশের দুর্ভাগ্য, মিত্রকবির কোন জীবনীগ্রন্থ আজিও প্রকাশিত হয় নাই। আমরা ইতঃপূর্ব্বে মিত্রকবির অন্তরঙ্গ সুহৃৎ পরলোকপ্রস্থিত দীনবন্ধু সেন মহাশয়ের লিখিত কবির এক জীবনী (পাণ্ডুলিপি) পাঠ করিয়াছি। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধ-রচনার স্থানে স্থানে তাহার সাহায্য লইয়াছি।

কবির বাল্য-জীবন

নির্ব্বাসিতা-সীতার গ্রন্থকার কবি ৺ হরিশ্চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের পৈত্রিক বাসভূমি ছিল হাওড়া শালকিয়ায়; কিন্তু বিষয়কর্ম্মানুরোধে [illegible] পিতা ৺ অভয়াচরণ মিত্র মহাশয় † আমরণ ঢাকা-প্রবাসী রহিয়াছিলেন। তিনি ঢাকা বাবুরবাজার অঞ্চলে বাস করিতেন। সেই স্থানেই তাঁহার তৃতীয় বা সর্ব্বকনিষ্ঠ [illegible] মিত্র ভূমিষ্ঠ হন। মিত্রমহাশয়ের অবস্থা স্বচ্ছল [illegible] না—যৎসামান্য আয়ে, তাঁহাকে একটী নাতিবৃহৎ পরিবার কায়-ক্লেশে প্রতিপালন করিতে হইত। সুতরাং অর্থাভাবে মিত্র কবির বাল্যজীবনে যথোচিত শিক্ষা লাভ ঘটিয়া উঠে নাই। পাঠশালার সামান্য বিদ্যাতেই তাঁহার প্রথম শিক্ষা পরিসমাপ্ত হয়। প্রথম জীবনের শিক্ষা-প্রযত্নের ফলে, মিত্রকবি রামায়ণ-মহাভারত পাঠ করিতে শিখিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী ঘটনায়, তাঁহার কাব্য-জীবন-বিকাশের [illegible], প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাই কার্য্যকারী হইয়াছিল।

মিত্রকবির বাস-ভবনের সম্মুখভাগে এক মুদীর দোকান ছিল। দোকানের স্বত্বাধিকারীর নাম কেবল মুদী। কেবল মুদীর বাড়ী ছিল ত্রিপুরা জিলায়। সংসারে তাহার স্ত্রী-পুত্র কেহই ছিল না। প্রতিবেশী হরিশ্চন্দ্র [illegible] তাহার হৃদয় আকর্ষণ করিল। কেবল মুদী লেখা-পড়া জানিত না। মিত্রকবি অবসরসময়ে মধ্যাহ্নে বা রাত্রিতে তাহাকে রামায়ণ বা মহাভারত পাঠ করিয়া শুনাইতেন। রামায়ণ মহাভারত শ্রবণে তাহার অগাধ শ্রদ্ধা ছিল—ভক্তি প্রবণ হৃদয়ে বৃদ্ধ কেবল মুদী কৃত্তিবাস বা কাশীরাম দাসের পুণ্য কথা শুনিতে শুনিতে তন্ময় হইয়া পড়িত—হৃদয়-মন তাহাতে একেবারে ঢালিয়া দিত। উজ্জ্বল গৌরকান্তি মিত্রকবি হরিশ্চন্দ্র যখন সুর করিয়া পুঁথি পাঠ করিতেন, তখন অনেকেই ঘরে বাহিরে ভিড় করিয়া তাঁহার পুথি পাঠ শুনিত। সে সময় কেবল মুদীর দোকানে সত্য সত্যই একটা ক্ষুদ্র বৈঠক বসিত। কিছুদিন পরে, কেবল মুদীর দোকানের হিসাব-পত্র লিখিয়াও মিত্রকবি কিছু কিছু পাইতেন। সাংসারিক ব্যয়-নির্ব্বাহে অভাবক্লিষ্ট পরিবারের ইহাতে অনেকাংশে আনুকূল্য ঘটিত। সুতরাং অবাধেই তিনি কেবল মুদীর সংশ্রবে রহিতে পারিতেন। ইহাতে তাঁহার পিতৃ-পরিজন কেহই বাধা দিতেন না বা কেহ রুষ্টও হইতেন না।

কবি-হৃদয়ের প্রথম পরিচয়

কেবল মুদীর 'পুথি' দোকানঘরের 'ধাপে' সযত্নে রক্ষিত হইত-প্রত্য; কিন্তু পুথি দুইখানি, বারংবার টানাটানিতে, ক্রমে ক্রমে জীর্ণশীর্ণ হইয়া উঠিল;—একদিন দেখা গেল, রামায়ণের শেষ কয়েক পৃষ্ঠা ছিঁড়িয়া হারাইয়া গিয়াছে। ইহাতে গ্রন্থপাঠের পরিসমাপ্তির পক্ষে এক নূতন বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইল। কেবল মুদী নূতন বই কিনিবার আবশ্যকতা অনুভব করিল—যে বই দিবারাত্র শুনিলেও তাহার হৃদয়ের ক্ষুধা মিটিত না—যে গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে তাহার কর্ণে অমৃতধারা বর্ষণ করিত: কেবল মুদী তাহার সমগ্র গ্রন্থ না শুনিতে পারিলে ব্যথিতচিত্ত হইবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি! মিত্রকবি নূতন গ্রন্থক্রয়ের [illegible]; তিনি 'ছেঁড়া'পাতার সকল কথাই—সকল [illegible]—[illegible] আবৃত্তি করিয়া ফেলিলেন। বৃদ্ধ কেবল মুদী [illegible] হইয়া

† ইঁনি কলিকাতা শোভাবাজারের বাবুদের ঢাকার [illegible] ছিলেন।

... শত শত বর্ষে কিশোরবয়স্ক হরিশ্চন্দ্রের তীক্ষ্ণ স্মৃতি-শক্তির প্রশংসা রটিল। এই ব্যাপারে অনেকেই তাঁহার অন্তর্নিহিত কবি-হৃদয়ের ক্ষীণ আভাষ বা পূর্ব্বাভাষ পাইলেন।

এই সময়ে সুপণ্ডিত কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার * মহাশয় সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন।

মনোরঞ্জিকা-প্রচার, সঞ্জীবন ও কবিযশ লাভ

তাঁহারই সম্পাদকতায় প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে ঢাকার প্রথম মাসিক পত্র 'মনোরঞ্জিকা' প্রচারিত হয়। এই সাহিত্যিক ব্যাপারে মিত্রকবিও অন্যতর অগ্রণী ছিলেন। তিনি 'মনোরঞ্জিকা'র কম্পোজিটারের কাজ করিতেন। এই সুকর্ম্মে তাঁহার ভরণ-পোষণের পূর্ণ সংস্থান না হইলেও, সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশলাভের পক্ষে তাঁহার প্রকৃত সুযোগ লাভ ঘটিল; এই ব্যাপারে মজুমদার মহাশয়ের অতুল্য সৌহার্দ্দলাভেরও তিনি অধিকারী হইলেন। বস্তুতঃ, ইহাতে সাহিত্য-ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে প্রীতির একটা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধও সংস্থাপিত হয়। অধিকন্তু মিত্রকবির কাব্য-প্রতিষ্ঠা লাভেও পরবর্ত্তীকালে ইহা যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছিল। একদিন মজুমদার মহাশয় মনোরঞ্জিকার কাপি (লেখা) লিখিতেছিলেন, কম্পোজিটার

হরিশ্চন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্র

মিত্রকবি (কম্পোজিং) ষ্টিকহস্তে কেসের (case) সম্মুখে উপবিষ্ট রহিয়াছেন—উদ্দেশ্য, কাপি লেখা শেষ হইলে, তিনি কম্পোজ ধরিবেন। কিন্তু মজুমদার মহাশয় হয়ত তখন ভাব-সমুদ্রের কোন্ অতলস্পর্শ তলে ডুবিয়া গিয়াছেন, তাহা কে জানে। কাপি লিখিতে বিলম্ব ঘটিতেছে,—বিলম্বে মিত্রকবির হৃদয়ে একটা নূতন আকাঙ্ক্ষা জন্মিল। কাপির কথা চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার ভাবপ্রবণ হৃদয়ে কি যেন একটা সৌন্দর্য্য বোধ হইল—ভাবী কবি অননুভূত-পূর্ব্ব কাব্য-সৌন্দর্য্যের ধ্যানে কিয়ৎকাল যেন তুষ্ণীভাব ধারণ করিলেন, তৎপরে কবি প্রাণের কথা নীরস অক্ষরেই (টাইপে) গাঁথিয়া তুলিতে লাগিলেন,—মিত্রকবির ... কবিতা কম্পোজ চলিতে লাগিল। কি যে কম্পোজ হইতেছে, তাহা আর কেহ জানিতেও পারিল না,—আর কেহ বুঝিতেও চাহিল না। ইতোমধ্যে মজুমদার মহাশয় কাপি লেখা শেষ করিয়া ফেলিয়াছেন; কাপি দিতে আসিয়া মিত্রকবির পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তিনি দেখিলেন, নীরব কবি হরিশ্চন্দ্র আপন মনে কবিতা কম্পোজ ধরিয়াছেন। প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় তিনি জানিতে পারিলেন, এ কবিতা কোন পুথিরও নহে, অথবা ইহা কাহারও লিখিত কাপিও নহে। কবিতাটী পড়িতে মজুমদার মহাশয়ের লোভ হইল; তাঁহার অনুরোধে, (কম্পোজিং) ষ্টিকের প্রুফ তখনই উঠিল। তিনি মিত্রকবির প্রথম কবিতা * পড়িয়াই, বিস্ময় মানিলেন। এই ঘটনাতেই মিত্রকবি সাধারণ্যে তাঁহার কবি-হৃদয়ের প্রথম পরিচয় প্রদান করিলেন। পরবর্ত্তী কালে, হরিশ্চন্দ্রই মনোরঞ্জিকার সর্ব্বপ্রধান লেখক হইয়াছিলেন। কালক্রমে সাহিত্য-ক্ষেত্রে মিত্র-মজুমদারের প্রীতি-বন্ধন অটুট হইয়া গেল;—উভয়েই ভাবী জীবনে অক্ষয় যশের অধিকারী হইলেন।

মিত্রকবির বড় একটা শিক্ষাভিমান নাই; ... জীবনে, কেবল মুদীর ...

কেবল মুদী ও ভাবুক কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

প্ররোচনায় রামায়ণ মহাভারত পাঠে তাঁহার কবি-হৃদয়-বিকাশের পক্ষে সর্ব্বপ্রথম সুযোগ ... ঘটে। নিবিষ্টচিত্তে সাধকের মত তিনি বিচিত্র সুরে কখনও রামায়ণ, কখনও বা মহাভারত পড়িতেন—ইহাতেই একটু একটু করিয়া তাঁহার কবি-হৃদয় ফুটিয়া উঠিয়াছিল। অবশেষে সুপণ্ডিত ভাবুক কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সংশ্রবে আসিয়া তিনি ... কাব্যজীবনের সূত্রপাত করেন। শৈশবের শিক্ষায় ... ফল ফলিতে লাগিল। মিত্র কবি কবিতা লিখিতেন,—মজুমদার মহাশয় তাহা প্রায়শঃই পরীক্ষা বা সংশোধন করিয়া ...

* ইঁহার নিবাস ছিল যশোহর—সেনহাটী গ্রামে। ইনি ... জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পূর্ব্বে যশোহরে ছিলেন।

* মনোরঞ্জিকার সঙ্গে সঙ্গে, বহুকাল হইল, এই কবিতাটী লোপ পাইয়াছে; বহু অনুসন্ধানে ইহা আমরা পাই নাই।

ইহার ফলে মিত্রকবির লেখায় কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য সমভাবে বর্ত্তমান। সদ্ভাব-শতকের অনেক কবিতাই মিত্রকবি লিখিয়া দিয়াছেন। এজন্য তিনি প্রথমতঃ ইহার লভ্যাংশও লইতেন; কিন্তু মজুমদার মহাশয়ের দুরবস্থার কালে তিনি 'লাভের কড়ি' গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন। *

ঢাকার অবস্থা ও কাব্য-জীবন-গঠনে সাময়িক বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব

ইংরাজীতে একটা কথা আছে—Man is as the time is. বস্তুতঃ, সাময়িক ঘটনায় বা পারিপার্শ্বিক অবস্থায়, মানুষের জীবন অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়। এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে কাব্য-জীবন-গঠনের উপযোগী কয়েকটী প্রয়োজক কারণের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(১) তৎকালে ঢাকায় অধিকাংশ মুদীর দোকানে নিত্যই রামায়ণ মহাভারত পাঠ হইত। (২) ঢাকায় রামায়ণগান, রামযাত্রা, ও কথকতা প্রভৃতি খুব প্রচলিত ছিল। (৩) ঢাকায় স্থানে স্থানে সঙ্গীতের বৈঠক বা সঙ্গীত-সভা বসিত;—এখনও তাহার চিহ্ন লোপ পায় নাই। মিত্রকবিও সাময়িক প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তাঁহার সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ নির্ব্বাসিতা সীতা প্রণয়নেও ইহা প্রমাণিত হইতেছে। তাঁহার কাব্যের বিষয়—রামায়ণের সীতা নির্ব্বাসন; কবিতা—সঙ্গীতময়ী ("সেই নির্ব্বাসিতা সীতার সম্পূর্ণ সঙ্গীত গাইয়ে আজি" ইত্যাদি)। বাঙ্গলায় তখন মিশ্রছন্দঃ ব্যবহৃত হইত। নির্ব্বাসিতা সীতাতেও মিশ্রছন্দের অভাব ঘটে নাই।

সাহিত্য চর্চ্চা

সম্ভবতঃ ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে কবির, সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ 'নির্ব্বাসিতা সীতা' প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত—(১) (শ্রাব্য) কাব্য ও (২) অভিনয় (দৃশ্য কাব্য), নাটক বা প্রহসন। সখের যাত্রা বা নাটকের দলে গান বাধিতে গিয়াই প্রহ্লাদনাটক, জানকী নাটক, ও রাম-বনবাস নাটক রচিত হয়। 'শুভস্য শীঘ্রং অশুভস্য কালহরণম্' ও 'ঘর থাক্‌তে বাবুই ভিজে' প্রভৃতি প্রহসন সাময়িক ঘটনা অবলম্বনে রচিত। সর্ব্বসাকুল্যে ইঁহার ৪১ খানা গ্রন্থ আছে। কৌতুহলী পাঠকের কৌতুহল পরিতৃপ্তির মানসে, তৎপ্রণীত গ্রন্থাবলীর একটা লিষ্ট প্রদত্ত হইল।

পুস্তকের নাম

✓ ১।	চারুকবিতা	১ম ভাগ।
২।	"	২য় "
৩।	"	৩য় "
৪।	কবিতাবলী	১ম ভাগ।
৫।	"	২য় "
✓ ৬।	"	৩য় "
৭।	কীচক বধ কাব্য	
৮।	প্রহ্লাদ নাটক	
৯।	জানকী "	
১০।	জয়দ্রথ বধ "	
১১।	রামায়ণ মহাকাব্য (আদি কাণ্ড)	
১২।	কীর্ত্তিবাসের পরিচয়	
১৩।	কবিতা কলাপ	
১৪।	কবি কৌতুক	
১৫।	মেও ধরে কে?	
✓ ১৬।	রাক্ষসের উপর খেক্কস।	

* মিত্রকবির অন্তরঙ্গ বন্ধু দীনবন্ধু সেন মহাশয়ের পাণ্ডুলিপিতে ইহা লিখিত আছে। এতদ্ব্যতীত এ সম্বন্ধে পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত রাধারমণ ঘোষ মহাশয় এবং ধর্ম্মপ্রাণ প্রচারক শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয় এখনও সাক্ষ্য দিতে পারেন। ঘোষ মহাশয় মিত্রকবির সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ নির্ব্বাসিতা সীতার পাণ্ডুলিপি স্বহস্তে লিখিয়াছেন। ঐ সময় মিত্রকবি রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন, সুতরাং নিজহস্তে কিছু লিখিতে পারিতেন না। নির্ব্বাসিতা সীতার শেষ দুই পংক্তিও ঘোষ মহাশয়ের রচনা।

১৭। আত্মছিদ্রং ন জানামি পরছিদ্রং অনুসরামি।
১৮। আদর্শ লিখন
১৯। কৃষি রহস্য
২০। ছাত্রসখা
২১। বীরবাক্যাবলী
২২। সপত্নী কলহ
২৩। রাম বনবাস (নাটক)
২৪। বঙ্গবাল
২৫। নির্ব্বাসিতা সীতা
২৬। কবিতা-কৌমুদী ১ম ভাগ
২৭। " ২য় "
২৮। " ৩য় "
২৯। প্রমদা পাঠ (স্ত্রী শিক্ষা পুস্তক)
৩০। পদ্য কৌমুদী
৩১। সরল পাঠ
৩২। বর্ণমালা
৩৩। কৌতুক শতক
৩৪। শুভস্য শীঘ্রং অশুভস্য কালহরণম্
৩৫। হতভাগ্য শিক্ষক
৩৬। পেটুক পঞ্চানন
৩৭। আগমনী
৩৮। কুসুমলতা
৩৯। ঘর থাক্‌তে বাবুই ভিজে
৪০। হাস্যরস তরঙ্গিনী
৪১। বিধবা বঙ্গাঙ্গনা।

বর্ত্তমান সময়ে ইহার অনেক গ্রন্থই দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। তন্মধ্যে আমরা অতি কষ্টে রামায়ণ মহাকাব্য ও প্রহ্লাদ নাটক সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। সম্প্রতি রামায়ণ মহাকাব্য পুনর্মুদ্রিত ও পুনঃ প্রচারিত হইয়াছে। নির্ব্বাসিতা সীতা ও অন্যান্য কয়েকখানা গ্রন্থ বহুকাল বিদ্যালয়পাঠ্য গ্রন্থরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। এখনও বিদ্যালয়পাঠ্য বহু গ্রন্থে মিত্রকবির একটী না একটী কবিতা উদ্ধৃত হইতে দেখা যায়।

সংবাদ-পত্র-সাহিত্যে কবি-মিত্র

মিত্রকবি 'ঢাকা প্রকাশ' প্রকাশেও অন্যতর কর্ম্মী ছিলেন। ঢাকার সর্ব্বপ্রথম মাসিক-পত্র 'মিত্র-প্রকাশেরও' তিনি সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন। আমরা এস্থলে, মিত্র-প্রকাশের ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠা অবিকল নিম্নে তুলিয়া দিতেছি। অনুসন্ধিৎসু পাঠক ইহাতেও ঢাকার সংবাদ-পত্র-সাহিত্যের কিঞ্চিৎ উপকরণ পাইবেন।

মিত্র-প্রকাশ পত্রের প্রথম পৃষ্ঠা।

"মিত্র-প্রকাশ

সাহিত্য বিষয়ক পত্র

২য় ভাগ ৪র্থ সংখ্যা

মিত্র প্রিয়ানন্দ-বিধানদক্ষো মিত্রাপ্রিয়োল্লাস-নিরাশ শূরঃ।
নানারসৈ র্মিত্রগুণপ্রকাশো মিত্রপ্রকাশোঽয় মুদেত্যুদারঃ॥

সূচিপত্র।

বিষয়			পৃষ্ঠা	স্তম্ভ
বঙ্গেশ রহস্য	...	...	৮১	১
প্রণয়-পত্রাবলী	...	...	৮৮	২
পেটুক পঞ্চানন	...	...	৯০	১
প্রেরিত পদ্যমালা	...	...	৯৩	২
কৌতুককণা	...	...	৯৫	১
সমালোচন	...	...	৯৬	১

শ্রীহরিশ্চন্দ্র মিত্র সম্পাদিত।

ঢাকা গিরিশ যন্ত্র

এই সাহিত্য-বিষয়ক পত্র এক্ষণ হইতে প্রতিমাসে দুইবার প্রকাশিত হইতে থাকিবে। ২৪ খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ৫৲ টাকা। ডাকমাশুল ৷৵০ আনা। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ।০। সম্পাদকের নিকট প্রাপ্তব্য।

১২৭৮। ৩রা মাঘ।—১৮৭২। ১৫ই জানুয়ারী।"

একখানা মাসিকপত্রে কি কি বিষয় তৎকালে আলোচিত হইত, সূচীপত্রপাঠে পাঠক তাহার একটা আভাষ পাইবেন। বস্তুতঃ, ঢাকার সংবাদ-পত্র-সাহিত্যের তিনিই জনক—এ হিসাবে সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিবে।

মিত্র-কবির সকল গ্রন্থের আলোচনা এস্থলে অসম্ভব।

রামায়ণ মহাকাব্য ও নির্ব্বাসিতা, সীতা

আমরা ইচ্ছা করিয়াই সে চেষ্টায় বিরত রহিব। তবে, তাঁহার দুইখানি গ্রন্থ—রামায়ণ মহাকাব্য ও নির্ব্বাসিতা-সীতা সম্বন্ধে দু'একটী কথা না বলিলে, কবিকে বুঝিতে পারা যাইবে না।

দারিদ্র্য

অপরাশিনাশী দারিদ্র্যদোষের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে করিতে, মিত্রকবি আমরণ কবিতা-দেবীর সেবায় তন্ময় রহিয়াছিলেন। রামায়ণ-মহাকাব্যের উপসংহার-ভাগে তিনি লিখিয়াছেন—

ওহে প্রিয় রামায়ণ,—অতি যাতনার ধন,
খণ্ড এক সমাপন, আজি তব হইল।
রামলীলা পারাবার, বরণিনু বিন্দু তার,
সিন্ধুসম ছয়কাণ্ড পুরোভাগে রহিল।
তোমায় হে সাজাইতে, যত সাধ ছিল চিতে,
নিদারুণ দৈন্যদোষে, পূর্ণ নাহি হইল।
বিশেষ বিবিধ রোগ, উদ্যমে করিয়া যোগ,
আশালতা অভাগার অঙ্কুরেই দহিল।
দিনেক দুদিন নয়, প্রায় হয় বর্ষত্রয়,
করিয়াছি শয্যা সার নানামত ব্যাধিতে।
দারুণ উদরাময়, কিছুতে না দূর হয়,
উপসর্গ কত তায়, নাহি পারি কহিতে।
কখন উপজি কাস, হৃদয়েতে বাঁধে বাস,
ফেলিতে পারি না শ্বাস, মরি প্রাণে গুমরি।
পা দু'খানি করি স্ফীত, কভু শোথ উপস্থিত,
কভু অর্শ-রক্ত ক্ষরে, কিবা দিবা শর্ব্বরী।
যেরূপ রোগের কোপ, কোন দিন নাম লোপ
হ'ত যাইতাম চলে, কৃতান্তের গারদে।
কালীর করুণা-বলে আজিও অবনী-তলে,
বেঁচে আছি, মরি নাই তাঁরি কৃপা-ঔষধে।
যা' হোক হে রামায়ণ, সয়ে নানা বিড়ম্বন,
একখণ্ড সমাপন, করিলাম যতনে।
'রোগার' চিন্তার ফলে, কি জানি কি ফল ফলে,
পণ্ডিতমণ্ডলে বলে কি জানি কি শ্রবণে।
শুন হে স্বরূপ কই, যদি প্রাণে বেচে রই—
যদি রোগমুক্ত হই, পরমেশ কৃপাতে,—
যদি বিজ্ঞ আঢ্যগণ, করি তোমা আলোচন,
করেন সাহায্য দান নিজ গুণে দয়াতে।
তবেইত অনুরাগে, তোমার অন্যান্য ভাগে,
রামলীলা সমুদয় যথাক্রমে গাথিব।
নহে পরিচয় মাত্র তুমিই রহিলে মাত্র,
আমি দুঃখে ক্ষোভে লাজে লেখনীকে ত্যজিব।

কি মর্ম্মভেদী বর্ণনা! এই মহাকাব্যের কাব্যাংশ আলোচনা না করিয়া, যে স্থলে কবি আত্মকথার ইঙ্গিত করিয়াছেন, আমরা কেবল তাহাই এস্থলে উদ্ধৃত করিয়াছি। কাব্য-সাহিত্যামোদী ব্যক্তিমাত্রকেই আমরা ইহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। দ্রুত রচনায় মিত্রকবি পূর্ব্ববঙ্গের ৺ রাজকৃষ্ণ; ছন্দের অবাধ গতিতে, আধুনিক কাব্য-সাহিত্যে অনেকাংশে তিনি কবি নবীন সেন। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে, বাঙ্গালায় এমন শক্তিশালী লেখক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, একথা ভাবিলেও প্রাণে আনন্দ জন্মে।

উপরি-উদ্ধৃত কয়েক পংক্তিতে আমরা যে তাঁহার দারিদ্র্যের বিষয়ই জানিতে পারিতেছি শুধু তাহা নহে; সূক্ষ্মদর্শী পাঠক ইহাতে কবিসম্পর্কে কয়েকটী প্রয়োজনীয় কথাও জানিতে পারিবেন।

রামায়ণ ও নির্ব্বাসিতা-সীতার রচনাকাল

রুগ্নশয্যায় উত্থান-শক্তিরহিত হইয়াও, মিত্রকবি কিরূপ প্রাণের টানে কবিতার সেবা করিয়াছেন, ইহা তাহারই ক্ষুদ্র ইতিহাস। রামায়ণ ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হয়; সুতরাং প্রায় ১৮৬৬ সালে তাঁহার নানা ব্যাধি জন্মে। ইহার প্রায় দুই বৎসর পরে, 'নির্ব্বাসিতা-সীতা' রচিত হয়। এ সময় তাঁহার রোগের প্রকোপ বাড়িয়া যায়; কবিরাজের মতে, তৎকালে কাব্যরচনায় বিরত থাকাই বিধি ছিল; নতুবা তাহাতে তাঁহার জীবনের আশঙ্কাও ছিল। এরূপ অবস্থায়, কোন প্রকার মানসিক শ্রম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইলেও,

মিত্রকবির শেষ পরীক্ষা

মিত্রকবি নীরব থাকিতে পারিলেন না। কবিরাজ কালীদাদার (তিনি কালী কবিরাজমহাশয়কে দাদা বলিয়াই ডাকিতেন) আদেশে বড়ই বিপন্ন হইলেন; তাঁহার চখে জল আসিল। একদিকে জীবনের মায়া, আর একদিকে কাব্যরচনা-প্রবৃত্তির তাড়না। শেষে প্রাণের মায়া ছাড়িয়াও, তিনি কাব্য রচনায় কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এ পক্ষে, মিত্রকবি যে সাহিত্য-প্রীতির পরিচয় দিয়াছেন,

তাহা বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্যে একান্তই দুর্লভ। নানারূপ ব্যাধিতে এ সময়ে কবি একেবারে উত্থানশক্তিরহিত। দৃষ্টিশক্তিও ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং নিজ হস্তে তিনি পাণ্ডুলিপি লিখিতেও পারিলেন না—কবির ঐকান্তিক অনুরোধে, নানা বাধাবিঘ্নের পরে, শ্রীযুক্ত রাধারমণ ঘোষমহাশয় পাণ্ডুলিপি লিখিবার ভার গ্রহণ করিলেন। কবি কবিতা বলিয়া যাইতেন—ঘোষমহাশয় তাহাই লিখিয়া লইতেন। এইরূপে তিন দিনে বাঙ্গালার অপূর্ব্ব সাহিত্য-সম্পদ 'নির্ব্বাসিতা-সীতার' পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইল। শেষ দুই পংক্তি অবশিষ্ট থাকিতেই, চখের জলে কবির কপোল দেশ ভাসিয়া গেল—তিনি আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। ঘোষমহাশয় নিজে ঐ দুই পংক্তি সংযোগ করিয়া দিলেন। নির্ব্বাসিতা-সীতার শেষ শ্লোক দুইটী এইরূপ :—

হায় হায় হায় হায় কি হইল!
বলিতে নয়ন ভাসিছে জলে,
রঘুকুল-লক্ষ্মী প্রবেশ করিল
কার অভিশাপে অতল তলে!!
"নির্ব্বাসিতা-সীতা"-বিলাপ সঙ্গীত
গাইতে 'হরিশ' পারে না আর!
কল্পনার বীণা হইল স্থগিত,
সীতা শোকে তার ছিঁড়িল তার!

নির্ব্বাসিতা-সীতায় কবি আপনার জীবনের অনেক কথাই ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

রোগের শয্যায় পোড়ে অহর্নিশ,
দুঃখে তাপে হোয়ে ব্যথিত প্রাণ,
আত্মশান্তি কহিতে লাগিল হরিশ!
কোকিয়ে কাকিয়ে যে নব গান
সেই নির্ব্বাসিতা সীতার বিলাপ
সম্পূর্ণ সঙ্গীত গাইয়ে আজি
বিদূরিতে নিজ হৃদয়-সন্তাপ
বড় সাধ করি বসিল সাজি॥

* * * *

কোথায় কবিত্ব? শৈশব বান্ধব!
কল্পনার বীণা দাও হে করে;
গাও তো খুলিয়ে সুমধুর রব
মম স্বর সহ সকল স্বরে।
নির্ব্বাসিতা-সীতা-বিলাপ-সঙ্গীত
মনোসাধে আজ 'হরিশ' গায়।
শুনি শ্রোতা সবে হয়ে একচিত
দোষো, রোষো, তোষো, যা ইচ্ছা যার।

এমন সাহিত্য-সাধনা না থাকিলে, কবির সিংহাসনে কেহ বসিতে পারেন না।

প্রাচীন সাহিত্যে, কবির একাগ্রতা প্রদর্শন করিতে হইলে জরাজীর্ণ কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজের কথা মনে পড়ে। বৈষ্ণবসাহিত্যের অপূর্ব্বরত্ন শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের লেখক কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী মহাশয় ৯৭ বৎসর বয়সে গ্রন্থরচনায় হস্তক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন—

বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির
হস্ত কাঁপে, মন বুদ্ধি নহে মোর স্থির;
নানা রোগগ্রস্ত চলিতে বসিতে না পারি। ইত্যাদি

বস্তুতঃ, প্রাণে একটা দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে—ভাবের পাগল না হইলে, প্রকৃত কবিত্ব বাহির হয় না।

নির্ব্বাসিতা-সীতা খণ্ডকাব্যে গীতি কবিতা। একজন লেখক ইহাকে করুণ রসের উৎস বলিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গে ইহাই প্রথম গীতি-কবিতা।

আমরা এখন—মিত্রকবির গদ্য-রচনার একটী মাত্র নমুনা প্রদর্শন করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

গদ্য-রচনা

রামায়ণ-মহাকাব্যের বিজ্ঞাপন।

"মৎসঙ্কলিত রামায়ণের আদিকাণ্ড (সম্পূর্ণ) এই খণ্ডে নিবেশিত এবং মুদ্রিত হইল। পূর্ব্বের প্রকাশিত দুই সংখ্যায় যে সকল কবিতা গ্রথিত হইয়াছিল, এবারে তত্তাবতের অধিকাংশ নূতন রচিত হইয়াছে। ফলতঃ, আদ্যোপান্ত সুসঙ্গত ও সুসংলগ্ন করিতে বিশেষ যত্ন পাইয়াছি; এমন কি, তন্নিমিত্ত আমাকে সময় ২ মহাকাব্যকারদিগের রচিত-পথ হইতে স্খলিতপদ হইয়া আলঙ্কারিক সমাজে অপরাধী হইতে হইয়াছে। বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যপাঠকগণের—রুচির পক্ষপাতী হইয়া এরূপ স্বৈরাচর করত কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, বঙ্গীয় সাহিত্যরসজ্ঞ অভিজ্ঞ বিজ্ঞ বুধগণের বিচার সাপেক্ষ।

এই রামায়ণ-রচনা বিষয়ে মহর্ষি বাল্মিকী-প্রণীত রামায়ণই [illegible] অবলম্বন। যদিচ এই কাণ্ডে ঋষি-প্রণীত রামায়ণের আদ্যোপান্ত গ্রহণ না করা হউক, তথাপি উহা হইতেই বিশেষ সাহায্য লওয়া হইয়াছে। কেবল প্রোক্তকাণ্ডে যে সকল আনুসঙ্গিক উপাখ্যান বাহুল্যরূপে বর্ণিত আছে, বর্তমান সময়ের পাঠকগণের পাঠ-বৈরক্তি-শঙ্কায় সেগুলি গ্রহণ করা হয় নাই; ভবিষ্যতেও এই প্রণালী অবলম্বিত থাকিবে। কিন্তু এস্থলে সাহস সহকারে এরূপ বলা যাইতে পারে যে ঋষিপ্রণীত রামায়ণের সারাংশ ও সদ্ভাবগুলির সঙ্কলনে কখনই উপেক্ষা প্রদর্শিত হইবে না; মহর্ষি শ্রীরামচন্দ্রের চরিত যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহারও কোন অংশে অন্যথা হইবে না। যে গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে, তাহার সমাপ্তি-সম্পাদনে গ্রন্থকার সমর্থ কিনা, এস্থলে এই প্রশ্ন পাঠকমাত্রেরই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, অতএব তদুত্তরে সে যদ্যপি এরূপ কহে যে 'সক্ষম' তবে তাহার অহঙ্কার প্রকাশ হয়। পণ্ডিতেরা অহঙ্কৃত জনের বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। যদি এরূপ উত্তর করে যে, 'না' সে নিতান্ত অক্ষম', তাহা হইলে [illegible] অপলাপের সহিত মূর্খতার পরিচয় দেওয়া হয়, কারণ মূর্খেরাই ক্ষমতার অসদ্ভাবেও গুরুতর বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া উপহসিত হইয়া থাকে। ফলতঃ, এই মহাকাব্যের সুচারুরূপ সমাপ্তি-সাধনে গ্রন্থকারের সম্যক সামর্থ্য থাকুক না থাকুক, তাহার প্রচুর উৎসাহ এবং যত্ন আছে। নীতিজ্ঞেরা কহিয়াছেন, উৎসাহ ও যত্নপরায়ণ জনেরা অতি দুঃসাধ্য বিষয়েও কৃতার্থতা লাভ করিয়া থাকে। গ্রন্থকারের দুর্ভাগ্য বশতঃ কৃতার্থতা না ঘটিলেও, "যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ" এই শ্লোকার্দ্ধ তাহার চিত্তপ্রবোধনে প্রচুর হইবে। এক্ষণে এতৎকাব্যপাঠে বঙ্গীয় সাহিত্য-প্রিয়গণ প্রীত হন, তথা [illegible] চির-[illegible] বিদ্যোৎসাহী ধনাঢ্য বিজ্ঞ মহাত্মগণ [illegible] উৎসাহ ও অর্থ সাহায্য করেন, তবেই গ্রন্থকার আপনাকে কৃতার্থ মন্যমান করিয়া ইহার অন্যান্য খণ্ড প্রচারণে প্রয়াস পাইতে পারে।

ঢাকা, বাবুরবাজার
৫ই আশ্বিন, বঙ্গাব্দ ১২৭৬
শকাব্দা ১৮৯১

শ্রীহরিশ্চন্দ্র মিত্র।"

এই 'বিজ্ঞাপনে' কবি কাব্য-রচনায় যে 'স্বৈরাচার-পদ্ধতি' বা কবি-কল্পনার কথা বলিয়াছেন, 'নির্ব্বাসিতা-সীতাতে'ও তাহাই অনুসৃত হইয়াছে। নির্ব্বাসিতা-সীতায় সীতার পাতাল-প্রবেশ নাই, আছে ভাগীরথী প্রবেশ। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'সীতার বনবাস' রচিত হয়। তিনিও [illegible] ভাবাতিশয্যে, এরূপ 'স্বৈরাচার-বিধিতে', সীতা-জীবনের পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সীতা "শ্রবণমাত্র বজ্রাহতপ্রায় হতচেতনা হইয়া প্রচণ্ড-বাতাহত লতার ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন" এবং "কিয়ৎক্ষণ পরেই" সকলে "বুঝিতে পারিলেন, সীতা মানব-লীলা সংবরণ করিয়াছেন।" [illegible] অনুরূপ।

কবির 'স্বৈরাচার' ও নির্ব্বাসিতা-সীতা

মিত্রকবির সীতার শেষজীবন আরও বৈচিত্র্যময়। তাহার মতে

"বলিতে বলিতে বাম-বিনোদিনী
উন্মাদিনী মত অমনি ধেয়ে,
হইলেন গঙ্গা-সলিল-শায়িনী,
জননীর কোলে ঘুমালো মেয়ে।
রাঘবের প্রেম-সুখ নিরবভরা
সুবর্ণ তরী ডুবিল জলে,
নিরখিয়ে শোকে ফেটে যায় ধরা।
বিষম বিবাদে [illegible] গলে।

পারিবারিক দুর্ঘটনা ও মিত্র-কবি

সম্ভবতঃ ১৮৭৫ বা ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে, মিত্র-কবি মৃত্যুমুখে পতিত হন। সেই সময় তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা কালিদাস মিত্র ও মধুসূদন মিত্র মহাশয় জীবিত ছিলেন। ইহাদেরও আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। ইহারা মিত্র-কবির প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থের কপিরাইট্ (গ্রন্থস্বত্ব) বিক্রয় করিয়াই, দৈন্যদশা কতকাংশে দূর করেন। [illegible] কবি [illegible] করেন নাই।

শ্রীগিরিজাকান্ত ঘোষ।

পূর্ব্ববঙ্গের মেয়েলী শ্লোক

১। না আছে নাই পেটে ভাত।
কোচাটা চাই পুরা তিন হাত ॥

২। হাতে নাই কানা কড়ি।
পেটে করে মোড়ামুড়ি ॥

৩। ক্ষুধায় চায় না সুধা।
পীরিতে বাছে না জাতি।
ঘুমে চায় না খাট পালঙ্ক,
বাহ্যে চায় না বাতি ॥

৪। ভীম পদাঘাতে ভাঙ্গে টাক্কা।

৫। ঘরে যাওনী সইরা পড়ে।
দুয়ার ধরণী পইড়া মরে ॥

৬। বামনে চায় চাঁদ ধরতে।

৭। ব্যাং এর আশা,
পাহাড় ডিঙ্গায়।

৮। ভীষ্মকর্ণ হত হৈল, শল্য হৈল রথী।
চন্দ্র সূর্য্য ডুবে গেল, জোনাকীর পাছে বাতি ॥

৯। ক্ষুধায় কি আর অভাব বোঝে।

১০। রাজার লগে হাজা।
ভাতারের লগে মজা ॥

১১। এত এত মহারাণী,
তারাই পায় না এক রত্তি।
তিনি এমন এক ভূইয়া,
আইছেন একটা গামলা লইয়া ॥

১২। হাতা লড়ী পাতা লড়ী।
এইত চোরের হাতে খড়া ॥

১৩। হাতীরও পিছলে পাও।
সুজনেরও ডোবে নাও ॥

১৪। [illegible]লবণ।

১৫। ঢাকের বাওয়া।

১৬। অনেক বোঝে,
অল্প বোঝে না।

১৭। অল্পে অল্পে করে অভ্যাস।
তয় হয় ভাগ্যের প্রকাশ ॥
তয়—তবে।

১৮। সকল গাছ কাটী কুটি।
কাঠাল গাছে দেও মাটী ॥

১৯। অজাত পুত্রের নামকরণে কাম কি?

২০। ভাত খাইতে খেতা নাই।
বর্গা পালে বিলাই ॥
বিলাই—বিড়াল।

২১। কদ্দিন বা বাইমু হাল।
আবার নাঙ্গল আর জোয়াল ॥
নাঙ্গল—লাঙ্গল।

২২। যার কড়ি তার সম্বল।
চান বদনে হরি হরি বল ॥

২৩। বাঙ্কা গরুর টাটা ঘাস।

২৪। খায় লয় চাঁদ রায়ের।
নাম লয় কেদার রায়ের ॥

২৫। ভাতারে না বলে মাউগ।
তার নাম হোয়াগী থাউক ॥
হোয়াগী—সোহাগী।

২৬। আপনা দোষে হারাইলাম কাঁথা,
যাত্রায় কাটলাম শির।
পরের কান্দনে নাক কাটাইল,
তার ব্যবস্থা কি? (১)

---

(১) এক ব্যক্তি একটা ঝুলিকাঁথার ভিতরে কিছু টাকা লইয়া এক খেয়া নৌকায় পার হইল। পাটুনী পয়সা চাহিলে, সে তাহাকে ফাঁকি দিবার জন্য বলিল, 'আমার যে কিছুই নাই, কেবল এই ঝুলিকাঁথাই মাত্র সম্বল, অতএব আমি আর তোমাকে কি দিব?' পাটুনী বলিল, 'ঐ ঝুলি কাথাটাই দেও। না হইলে, তোমাকে ছাড়িব না।' লোকটী 'আচ্ছা, এই নে ঝুলি কাঁথা' বলিয়া উহা নৌকায় ফেলিয়া দিয়া তীরে নামিল। পাটুনী নৌকা বাহিয়া অপর

২৭। কোঁদ ক্যান্—লড়াই করমু।
পাদ ক্যান্—ডর করে ॥

২৮। এ গ্রামের মাদ্বর কে ?
আছিলাম ত আমিই।
এ গ্রামে নিকাম্লা পাওয়া যায়।
পয়সা পাইলেই ত আমিই যাই ॥
মাদ্বর—মাতব্বর।
কাম্লা—দৈনিক চুক্তিতে মজুর।

পাড়ে পৌছিয়া কাঁথায় হাত দিয়া বুঝিতে পারিল যে, উহাতে টাকা আছে ; তাই তাড়াতাড়ি কাঁথা সহ বাটী গেল। তখন বেলা প্রায় দুপুর ; রান্নার বিলম্ব দেখিয়া ক্ষুধার্ত্ত পাটুনী কথায় কথায় স্ত্রীর সহিত ঝগড়া করিয়া রাগের মাথায় তাহাকে প্রহার করিল—তার পর কাচি হাতে মাঠে চলিয়া গেল।

পাশের বাড়ীর এক রমণী আসিয়া পাটুনীর স্ত্রীকে বলিল, 'ওলো বউ! তোকে এত মারন্টাই মারল, আর তুই কি না একটুও কান্দলি না।' পাটুনীর স্ত্রী বলিল 'না, বইন, কাঁদবার সময় দূরে থাউক, আমার যে খাইবার সময়ও নাই। যতক্ষণ বসিয়া কাঁদব ততক্ষণে ভাত হইবে। যদি আসিয়া আবার ভাত না পায়, তবে যে আর পিঠের চামই থাক্বে না। তবে [illegible] যদি তোমার সময় থাকে, তুমি আমার ভাত দুগা খাও, আর কাঁদ [illegible] রমণী তাহাই করিল। লম্বা এক ঘোম্টা টানিয়া ভাত খাইতে খাইতে কাঁদিতে লাগিল। এদিকে ঐ ঝুলিকাঁথাওয়ালার হুঁস হইলে পর, সে নদী পার হইয়া আসিয়া পাটুনীর বাড়ীর সকল ব্যাপার দেখিতেছিল।

দুপুর বেলা পাটুনী বাড়ী আসিলে লম্বা ঘোম্টা টানিয়া তাহার স্ত্রী খাইতেছে আর কাঁদিতেছে মনে করিয়া, রাগে হস্তস্থিত কাচি দিয়া নাকটা কাটিয়া দিল।

তখন ঐ স্ত্রীলোকের স্বামী যাইয়া পাটুনীর নামে জমিদারের নিকট নালিশ করিল। জমিদার বলিল, তোমার সাক্ষী কে ? তখন ঐ ঝুলিকাঁথাওয়ালার খোঁজ পড়িল [illegible] সে হাজির হইলে জমিদারের প্রশ্নের উত্তরে এই শ্লোক [illegible]

২৯। বইয়া কই, ডুবাইয়া চ্যাক্ড্যাগা।
বইয়া—বসিয়া।
কই—মৎস্যবিশেষ।

৩০। রাজার আঙ্গুল বড় মোটা।
তাই দেয় ফোটা ফোটা ॥

৩১। কার লইগ্গা করলাম তৈয়ার,
কেবা আইয়া খাইল।
জামাইর লইগ্গা বানাইলাম পিঠা,
পুত্রার মরা খাইল ॥
লইগ্গা—লইয়া।
আইয়া—আসি।

৩২। হুতাতে যায় বুকের বল।
ক্রমে ক্রমে রসাতল ॥

৩৩। গোসাই, দণ্ডবৎ।
গরু চুরি কল্লে দক্ষিণমুখী পথ।

৩৪। মরার উপর খাড়ার ঘা।
মরারে আর মারিছ না ॥

৩৫। মরছিলাম দেইখা বাঁচ্ছিলাম।
বাঁচলে আর বাঁচতাম না ॥

৩৬। হাছুতাশে পরাণের ক্ষয়।
ধীরে সুস্থে লভে জয় ॥

৩৭। বান চোরা পাতলা।

৩৮। এক কান দিয়া যায়।
আর কান দিয়া বাইরয় ॥
বাইরয়—বাহির হয়।

৩৯। [illegible] হইলেই রাসী হয়।

৪০। সাঁ[illegible]র খাইয়া বইছে ঘর।
তার ভাত আগে বাড়ু ॥

৪১। মর্দ্দে আছাড় খায়।
নিমর্দ্দে কয় ভূমিকম্প যায় ॥

৪২। হাত খুড়খুড়ি কপাল দোষ।

৪৩। শুইয়া শুইয়া ল্যাজ নাড়ে।
সেই বাঘেই মানুষ মারে॥

৪৪। সুঁচ চলে না,
কুড়াল হান্দায়।
হান্দায়—ঢুকায়।

৪৫। মরণ বাঁচন গাইল না।
গাইল—গালি।

৪৬। যাউক বা না যাউক।
চিড়া কলা খাউক॥

৪৭। খাইতে বইলে কিসের দায়।
পাকা ধান কি জলে যায়?

৪৮। পাপ কল্লে স্নান, পরাণের ভয়।
শুধা পরাণ আর কে লয়?

৪৯। আত্মা রাখ্যা ধর্ম্ম।
পাছে কর কর্ম্ম॥

৫০। হরি দাস্যারা ছয় ভাই
অংশ মোটে তিন আনী॥

৫১। সকল গাছই আর চৈ না।

৫২। আজাইরা খায়।
গজাইরা গায়॥
আজাইর—অবসর।

৫৩। সাপের মাথায় ধূলা পড়া।

৫৪। কি দৌড়। কি লাফ।
যেন ঘাউয়াল বাঘ॥
ঘাউয়াল—আঘাতেপ্রাপ্ত।

৫৫। যার আদা লবণ জ্ঞান নাই।
সেও আবার দাদা ভাই॥

৫৬। সরিসার বাড়ী শনির সেবা,
আর সরিলুটের নিমন্ত্রণ।
খাইতে দিল কতগুলি উল্‌পা।
উল্‌পায় আছিল পিল্‌বা,
পিলবায় দিল জিল্‌বায় কামড়,
সরিঠাকুর আইল লড়াইয়া,
বাড়ীত আইয়া পল্লাম্ দৌড়াইয়া।

৫৭। ফেরারে ফেরা,
করমটা আন্‌ত আমি ফরা রেখি।

৫৮। ছাগলের কর্ণ লাড়া,
গরুর কাশ।
বিড়ালের হাঁচিতে,
করে সর্ব্বনাশ॥

৫৯। আম গাছের টুকটুকী,
নিম গাছে যায়।
এমন কইরা ঝাইড়া দিমু,
যেন সর্ব্বভূতে পায়॥

৬০। সবই ত হইয়া গেছে।
বিলাই খাচানীটাই বাকী আছে॥ (১)

৬১। কুকুরে মানুষ কামড়ায় দেইখ্যা,
মাইন্‌ষে আর কোন্ কুকুর কামড়ায়।

৬২। শিয়াল বাও কইরা আইছিলি,
তাই এত পাইলি।

(১) শ্বশুরের শ্রাদ্ধে পুত্রবধূ সব আয়োজন করিয়া দিতেছে। শ্রাদ্ধের সবই প্রস্তুত হইয়াছে, এখন মন্ত্র পড়িতে বসিলেই হয়। স্বামী মন্ত্র পড়িতে কেবল সুরু করিবে, এমন সময় পুত্রবধূ ডাকিয়া বলিল, "ওগো, একটু থাম, বিলাই খাচানীটা এখনও হয় নাই। এখন বিড়াল কোথায় পাই?" সে দিদিশাশুড়ীর শ্রাদ্ধের দিন স্বীয় শাশুড়ীকে 'পল' দিয়া বিড়ালগুলিকে আটক করিয়া রাখিতে দেখিয়াছিল। তখন তাহারা বিড়াল পালিত—বিড়ালগুলির অত্যাচারে অস্থির হইয়া শাশুড়ী ঐরূপ করিয়াছিল। বধূ মনে করিয়াছিল যে, তাহার স্বামীর বংশের বুঝি শ্রাদ্ধকালীন ঐ একটী প্রথা। কাজেই বিড়াল না খাচাইলে যে কর্ম্মের অঙ্গহানী ঘটিবে, তাই সে এই কথা বলিয়াছিল।

৬৩। চৌদ্দ পুরুষে লাউপাতা বিলাইছিল,
তাই সাইরা গেল।
সাইরা—সারিয়া, বিপদগ্রস্থ না হইয়া।

৬৪। মস্তুতেও অবসর নাই।

৬৫। মুঠ চাউলে আর কম পড়ে না।

৬৬। সোম[illegible]খাইছ্যা।
কাপড় পড় নাইচ্যা॥

৬৭। যে খাইছে তারে গিয়া খাওয়া।
যে না খাইছে তারে নিয়া শোয়া॥

৬৮। কানে জল গেলে,
জল দিয়াই তা' খোলে।
মিছা হাত পা ভাঙ্গে লাফাইলে॥

৬৯। আঠার চোট্টার মেল্।
কেম্‌নে কেম্‌নে গেল॥
অথন কি না হত্তর দ্বিনে কয় পরশ্বু॥
হত্তর—সতের।
পরশ্বু—পরশ্ব।

৭০। চোকের সাম্‌নে যা' পড়ে।
তারেই অগ্নি গিল্লা ধরে॥
গিল্লা—গিলিয়া।

৭১। হাতীর শুড়ার মা[illegible]চকে,
ত্রিভূজী[illegible] তলে,
প্রভুরে বানাইয়া থুইছে,
বাইয়া কস পড়ে। (১)

৭২। ঘি খায় পোলা ওনে।
কুড়া খায় পোলা ফোলে॥
ওনে—উণা হয়।

৭৩। কোড়াইলা, আর করিছ না কো—কো—র আশা।
আগুন দা পোড়াইছি তোর কো—কো—র বাসা।

৭৪। মানুষ কি মানুষ,
তেলা চোরার হাড়ি।

৭৫। কথা কয় যেন মা-গোসাই
পদপুরাণ কিছুই নাই॥

৭৬। ঠাকুর মশয়? পোলাপান কি?
ঠাইরাইনের লগেই দেখা নাই,
আবার পোলাপান।

৭৭। সৈন্যা কর, বন্ধু কর,
টাকা কড়ি ক্ষয়।
কড়ি দিয়া ইষ্টি কল্লে,
চির যুগের হয়॥

৭৮। সাপে কাটলেও আশা থাকে।
কালে খাইলে কি আর আশা থাকে?

৭৯। চৈরে চৈরের বল দেয়।
গায়ের বল কে দেয়?
চৈর—লগ্‌গি।

৮০। না আছে নাই আয়োজন।
পাড়া ভইরা কর নিমন্ত্রণ॥

৮১। দাদা ভাইরে, দাদা ভাই?
বউ ঠাইনের ত হাদা নাই॥
হাদা—তামাক পাত্তা।

৮২। নিত্য ভিক্ষা,
তনু রক্ষা।

---

(১) গুরুশিষ্য পথ চলিতেছিল। রাস্তায় ডাকাতে দুর্গার চকের মধ্যে বেলগাছের তলে গুরুকে কাটিয়া ফেলে, আর রক্ত পড়িতে থাকে। শিষ্য বৈরাগী, তাই দুর্গানাম নিবে না, বেলগাছ বলিবে না, কাটন কোটন বলিবে না, রক্ত বলিবে না; অথচ না বলিলেও নয়; কাজেই ওরূপ বলিল।

ঢাকা সাহিত্য পরিষদের কার্য্য-বিবরণী

পঞ্চম বর্ষ

প্রথম মাসিক অধিবেশন

স্থান—ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ কার্য্যালয়

বঙ্গাব্দ ১৩২২। ৯ই জ্যৈষ্ঠ, রবিবার

সময়--অপরাহ্ন ৬।টা

আলোচ্য বিষয়—

১। নূতন সভ্য-নির্ব্বাচন।

২। প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর মহাশয়ের "পূর্ব্ববঙ্গের কতিপয় বিস্মৃত জনপদ"।

৩। বিবিধ।

উপস্থিত—

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর

,, চিন্তাহরণ দে

,, যোগেশচন্দ্র দাসবর্ম্মা

,, মহেন্দ্রচন্দ্র দাস

,, অক্ষয়ভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়

,, উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ বি, এ, বি, টি

কবিরাজ শ্রীযুক্ত সুধাংশুভূষণ সেন কাব্যতীর্থ

ডাক্তার শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন দাস

,, পরিমলকুমার ঘোষ এম, এ

,, নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম, এ

,, যতীন্দ্রমোহন দাস

ও অন্যান্য

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ এম এ, বি, এল, (সম্পাদক)

,, অতুলচন্দ্র চৌধুরী বি, এল, (সহঃ সম্পাদক)

১। সভাপতি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস, ব্যারিষ্টার-এট-ল মহাশয় উপস্থিত না থাকায়, সর্ব্বসম্মত-ক্রমে শ্রীযুক্ত অক্ষয়ভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

২। তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন ;—

নূতন সভ্য	প্রস্তাবক	সমর্থক
১। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ রায়।	সম্পাদক	শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী
২। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন বসু।	”	”

৩। অনন্তর সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর মহাশয়কে প্রবন্ধ পাঠ করিতে আহ্বান করিলে, বীরেন্দ্র বাবু "পূর্ব্ব-বঙ্গের কতিপয় বিস্মৃত জনপদ" নামক প্রবন্ধ সভাসমক্ষে পাঠ করিলেন। প্রবন্ধে "দ্বাদশ ভূঁঞার" গৌরবময় যুগের সবিশেষ আলোচনা করা হইয়াছিল এবং ঐ যুগের বহু নূতন ও অপরিজ্ঞাত তথ্য উহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। প্রবন্ধে বীরেন্দ্র বাবুর ঐতিহাসিক গবেষণার যথেষ্ট পরিচয় ছিল। উপস্থিত সকলেই প্রবন্ধ শ্রবণে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন।

তৎপর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম, এ, প্রমুখ কতিপয় মহোদয় প্রবন্ধের বিস্তর আলোচনা ও উহার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন, এবং বীরেন্দ্রবাবু যাহাতে ঐ যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ অধ্যবসায়ের সহিত আলোচনা করিতে রত থাকেন, তজ্জন্য যথেষ্ট উৎসাহিত করিলেন।

তৎপর সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-পাঠকের যথেষ্ট গুণানুবাদ করিলেন।

অতঃপর, সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সভাভঙ্গ করা হইল।

(স্বাক্ষর) শ্রীদেবেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্ন,
সভাপতি।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

স্থান—ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ কার্য্যালয়

৯ই শ্রাবণ, রবিবার, অপরাহ্ন ৭টা

আলোচ্য বিষয়—

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ।

২। নূতন সভ্য নির্ব্বাচন।

৩। পুস্তকোপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন।

৪। প্রবন্ধপাঠ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় বি, এ, মহাশয়ের "বঙ্গ-সাহিত্যে কবিকঙ্কণ।"

৫। বিবিধ।

উপস্থিত—

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যারত্ন, এম্ এ, (সহকারী সভাপতি)
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুখরঞ্জন রায় এম্ এ,
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় বি, এ,
শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র রায়
শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মজুমদার
শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার সেন, এম্ এ, বি, এল্
শ্রীযুক্ত অক্ষয়ভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দাস
শ্রীযুক্ত অদ্বৈতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
ও অন্যান্য

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ এম্ এ, বি এল (সম্পাদক)

২। সভাপতি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস ব্যারিষ্টার এট-ল মহাশয় উপস্থিত না থাকায়, অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রকুমার বন্দোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, এম এ মহাশয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

৩। অতঃপর গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

৪। তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

সভ্য—	প্রস্তাবক—	সমর্থক—
১। শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ চৌধুরী এম্‌.এ ডিমনেষ্ট্রেটার, ঢাকা কলেজ।	শ্রীদেবেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্ন	সম্পাদক—
২। শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন গুহ এম্‌.এ, বি এল উকীল, জজকোর্ট, ময়মনসিংহ।		

৫। অতঃপর নিম্নলিখিত পুস্তকোপহারদাতাকে উপহৃত পুস্তকের জন্য যথারীতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল.—

উপহারদাতার নাম	উপহৃত পুস্তক	গ্রন্থকারের নাম
শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র সেন	ভারতে সপ্তামর	শ্রীআনন্দচন্দ্র সেন।

৬। অনন্তর সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় বি,এ মহাশয়কে তদীয় "বঙ্গসাহিত্য কবিকঙ্কণ" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন। প্রবন্ধলেখক কর্ত্তৃক প্রবন্ধ পঠিত হইলে পর, শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার সেন এম এ, বি এল মহাশয় কবিকঙ্কণ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করেন, এবং প্রবন্ধের প্রশংসা করেন। কামিনীবাবু বলেন, অতীত যুগের বাঙ্গালীর ঘর, গৃহস্থালী, ও সামাজিক আচার ব্যবহারের নিখুঁত চিত্রাঙ্কনে কবিকঙ্কণের যে অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, ভাড়ুদত্তেই তাহার পরিচয়।

তৎপর সম্পাদক মহাশয়ও আলোচনায় যোগদান করেন। তিনি কবিকঙ্কণের সহিত মাইকেল ও বর্ত্তমান যুগের কবিগণের তুলনামূলক সমালোচনা করেন। তাঁহার মতে কল্পনাবৈভবে মাইকেল শ্রেষ্ঠ, কিন্তু জাতীয় চরিত্রের অভিজ্ঞতা ও তাহার বর্ণননৈপুণ্যে কবিকঙ্কণ শ্রেষ্ঠ। কবিকঙ্কণ খাঁটি বাঙ্গালী কবি। মাইকেলপ্রমুখ কবিগণ জীবন্ত জাতীয় আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া, পুস্তকের আদর্শ গ্রহণ করিতেই বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন। কারণ, তাঁহারা ঘরের কথা অপেক্ষা পরের কথাই জানিতেন বেশী। জাতীয় জীবনের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক অতি অল্পই ছিল। তাঁহারা কবি বটে, কিন্তু বাঙ্গালী কবি কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে।

পরিশেষে সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখককে ধন্যবাদ দেন এবং সম্পাদক মহাশয়ের মন্তব্যের প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন, বাঙ্গালা কাব্য যে চিরকালই একভাবে রচিত হইবে, এরূপ সঙ্গত নহে। পূর্ব্বকালে বাঙ্গালা কাব্যে জাতীয় আদর্শের প্রাবল্য ছিল। কিন্তু এখনও কি তাহাই থাকিবে? বৈদেশিক আদর্শ গ্রহণ করিলে বরং বাঙ্গালা কাব্য আরও সজীব হইয়া উঠিবে এবং উহার সম্পদ বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং বর্ত্তমান যুগের কবিগণ যে বৈদেশিক আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্ষতি না হইয়া বরং লাভই হইয়াছে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদান্তে সভার কার্য্য শেষ হইল।

(স্বাক্ষর) শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সরকার

সভাপতি।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

স্থান—জেনারেল্ পোষ্টাফিস্, ঢাকা।

সময়—২৬ ভাদ্র, রবিবার, সন্ধ্যা ৬॥টা

আলোচ্য বিষয়,—

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ।

২। নূতন সভ্য নির্ব্বাচন।

৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন।

৪। প্রবন্ধপাঠ—শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্ এ, মহাশয়ের "কান্ত-নামা" বা "রাজ-ধর্ম্ম"।

৫। বিবিধ।

উপস্থিত।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র সরকার, এম্ এ; পি,আর্ এস্, পি এইচ, ডি; এফ্ সি, এস্।

শ্রীযুক্ত পরিমলকুমার ঘোষ এম এ,

,, নিবারণচন্দ্র গুহ

,, সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়

,, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়

,, ধীরেন্দ্রচন্দ্র রায়

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মজুমদার

,, রাজেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

,, অক্ষয়ভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়

,, নলিনীকুমার দত্ত

,, জ্যোতিশচন্দ্র নন্দী

কবিরাজ শ্রীযুক্ত সুধাংশুভূষণ সেনগুপ্ত

ও অন্যান্য

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ এম্ এ, বি এল (সম্পাদক)

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত (সহঃ সম্পাদক)

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল (সম্পাদক, প্রতিভা)

২। সভাপতি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস ব্যারিষ্টার এট্ ল মহাশয় উপস্থিত না থাকায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাক্তার অনুকূলচন্দ্র সরকার এম্ এ, পি আর্ এস্, পি এইচ্ ডি, এফ্ সি, এস্ মহোদয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

৩। অতঃপর গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

৪। তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন,

সভ্য—	প্রস্তাবক—	সমর্থক—
১। শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়, ডিষ্ট্রিক্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট, পাবনা।	শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার	সম্পাদক
২। শ্রীযুক্ত ভূপতিমোহন সেন, এম্ এস্ সি (কলিকাতা) বি, এ, (ক্যাণ্টাব) অধ্যাপক, ঢাকা কলেজ, ঢাকা।		
৩। শ্রীযুক্ত কামদাচরণ চক্রবর্ত্তী এম এ, অধ্যাপক, ঢাকা কলেজ।		

প্রতিভা

৫ম বর্ষ | পৌষ ১৩২২ | ৯ম সংখ্যা

নদীয়ায় কুরুক্ষেত্র।*

(ঐতিহাসিক গবেষণা)

বহুশতাব্দী ধরিয়া বহু নৈয়ায়িক ও স্মার্ত্ত, কবি ও সাধক পণ্ডিতের খনি' নবদ্বীপে আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের প্রতিভালোকে নবদ্বীপ 'ভারতীর রাজধানী, ক্ষিতির প্রদীপ' বলিয়া কীর্ত্তিত। আবার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের উদয়ে 'সপ্তদ্বীপমধ্যে সার নবদ্বীপধাম।' ৺দীনবন্ধু মিত্র উচ্ছ্বাসভরে গাহিয়াছেন, 'সুবিখ্যাত নবদ্বীপ কত মহাজনে। যাদের সুকীর্ত্তি শোভে ভারতীভবনে।' নবদ্বীপের এই গৌরব-ভাস্কর সমগ্র নদীয়া জেলাকে উদ্ভাসিত করিয়াছে। কিন্তু ইহাতেও অনেক নদীয়াবাসীর মনস্তৃপ্তি হয় না,—মনোরথানাং ন সমাপ্তিরস্তি। তাই দেশপ্রীতির আতিশয্যে কেহ বা নবদ্বীপকে কালিদাসের জন্মভূমি ও সাধনাক্ষেত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়া নদীয়ার প্রাচীনত্বসংস্থাপনে উদ্‌যোগী, কেহ বা বল্লালসেনের জয়স্কন্ধাবার বিক্রমপুরকে নদীয়া জেলার একখানি ক্ষুদ্র নগণ্য গ্রামের সহিত অভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া নদীয়া জেলার লুপ্তগৌরব উদ্ধারে বদ্ধপরিকর। কিন্তু বল্লালসেনের কাল বা বিক্রমাদিত্যের কাল প্রাচীনকাল হইলেও, অতিপ্রাচীন কাল নহে। অতএব প্রকৃতপক্ষে নদীয়ার গৌরবজ্ঞাপন ও প্রাচীনত্বখ্যাপন করিতে হইলে, আরও সুদূর অতীতের ইতিহাস উদ্‌ঘাটন করিতে হয়। আজকাল রাঢ়, বরেন্দ্র, পূর্ব্ববঙ্গ, কামরূপ, সর্ব্বত্র প্রত্নতত্ত্ব উদ্ধারকল্পে অনুসন্ধান-সমিতি বসিয়াছে, চারিদিকে গভীর গবেষণার সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। নদীয়া 'শুধুই ঘুমা[illegible] এই ক্ষোভে নদীয়ার তরফ হইতে সামান্য একটু গবেষণার সূত্রপাত করিলাম। উপযুক্ত উৎসাহ ও অধিকতর অবসর পাইলে এবিষয়ে আরও অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিব।

ভূগোলের হিসাবে ধরিতে গেলে, নবদ্বীপের গৌরবে সমগ্র নদীয়া জেলার গৌরব-বোধের তাদৃশ প্রবল কারণ নাই,কেননা অধুনা নবদ্বীপ গঙ্গার ওপারে—সুতরাং রাঢ়ে। ক্ষুদ্র গ্রাম বিক্রমপুরের নবোদ্ভাবিত গৌরবেও নদীয়া জেলার গৌরব-বৃদ্ধি হয় না, কেননা গবেষণা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে বল্লালের আমলে এই স্থান গঙ্গার ওপারে, অর্থাৎ রাঢ়ে অবস্থিত ছিল। অতএব প্রকৃতপক্ষে নদীয়া জেলার প্রাচীন গৌরব ঘোষণা করিতে হইলে, বেশ একটু-সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। যে সকল অংশ রাঢ়ের সীমানা হইতে সুদূরে সংস্থিত, পরন্তু যে সকল অংশের মুর্শীদাবাদ, চব্বিশ-পরগণা, যশোর, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলার তৌজিভুক্ত হইবারও তিলমাত্র সম্ভাবনা সুদূরপরাহত, সেই সকল অংশ সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও গবেষণা করিতে হইবে। আমি নদীয়া জেলার লোক, সুতরাং নদীয়া জেলার গৌরব-বর্দ্ধন ও প্রাচীনত্ব প্রকটনের জন্য সমুৎসুক। তজ্জন্য অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, অনেক মস্তিষ্ক-চালনা করিয়া, বিস্তর গবেষণা করিয়া, নদীয়া জেলার প্রাচীন গৌরবের প্রকৃত কেন্দ্র আবিষ্কার করিয়াছি। এই গৌরব একেবারে মৌরুসী-স্বত্বে নদীয়াবাসীরা ভোগ করিতে পারিবেন, কস্মিন্‌কালে খারিজ হইবার আশঙ্কা নাই। কেহ কেহ সন্দেহ করিতে পারেন যে,আমি নিজের বাসগ্রামের নিকটবর্ত্তী স্থানের মাহাত্ম্যখ্যাপন করিতে বসিয়াছি। কিন্তু সে সন্দেহ সম্পূর্ণ

* রাস-পূর্ণিমায় দীনধামে পূর্ণিমামিলন উপলক্ষে পঠিত (৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩২২)।

অমূলক। আমি হলপ করিয়া বলিতে পারি যে এই জেলার **প্রকৃত** প্রাচীন গৌরবকেন্দ্র আমার বাসগ্রাম হইতে দূরে **অবস্থিত, অধিকন্তু** মধ্যে একাধিক নদীর ব্যবধান। অতএব **আমার** এই সিদ্ধান্ত স্বার্থ-প্রণোদিত বা পক্ষপাতদোষদুষ্ট নহে। **ঐতিহাসিক তত্ত্বপ্রকটনে** নিরপেক্ষতা অবলম্বন করা অবশ্য-**কর্ত্তব্য,** গত সাহিত্য সম্মিলনের ইতিহাসশাখার সভাপতি **মহাশয়ের** প্রকটিত এই মূলসূত্র মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হই নাই।

'নদীয়ার কুরুক্ষেত্র' এই শব্দদ্বয় উচ্চারিত হইবামাত্র হয়ত **অনেকে** মনে করিবেন যে, নদীয়ায় সোনার গৌরাঙ্গ,'কই কৃষ্ণ, **কোথা কৃষ্ণ,'** বলিয়া আকুল ক্রন্দন করিয়া যে স্থলস্থুল কাণ্ড **বাধাইয়াছিলেন**—যাহাতে রক্তের স্রোত বহে নাই, অস্ত্রের **ঝনঝনা** বাজে নাই, কেবল প্রেমভক্তির নয়নাসার বহিয়া **ছিল,** আর হরিসঙ্কীর্ত্তনের রোল উঠিয়াছিল, আমি বুঝি ভাষার **কৌশলে** তাহাকেই **'কুরুক্ষেত্রকাণ্ড'** বলিয়া ইঙ্গিত করিতেছি। **কিন্তু** আমি সে প্রসঙ্গ তুলিতেছি না। আবার হয়ত অনেকে **মনে করিবেন** যে, বখ্‌তিয়ার খিলিজির নবদ্বীপজয় অথবা **ক্লাইভের পলাশীজয়কে** আমি অতিশয়োক্তির আশ্রয় লইয়া **কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সহিত** এক পর্য্যায়ে ফেলিতেছি। কিন্তু **ইহাও আমার অভিপ্রেত নহে।** এ কার্য্য বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র **যখন চূড়ান্ত করিয়া** কাব্যের মারফত করিয়া গিয়াছেন, তখন **'মদ্বিধাঃ ক্ষুদ্রজন্তবঃ'** ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হয় না। **পক্ষান্তরে,**আমি বলিতে চাহি যে 'সপ্তদশ অশ্বারোহীর' সাহায্যে **বখ্‌তিয়ারের** কীর্ত্তি বা 'সংখ্যায় অল্প সৈনিকের দলের' পৃষ্ঠ-পোষকতায় ক্লাইভের কীর্ত্তি নহে—অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীর **রণতাণ্ডবের রঙ্গভূমি** অর্থাৎ মহাভারত-বর্ণিত কুরুক্ষেত্রের মহা-**যুদ্ধের ঘটনাস্থল** এই নদীয়া জেলা।* অতএব নদীয়ার **প্রাচীনত্বগৌরব** সুদূরকালব্যাপী।

এই অভিনব প্রাচীন গৌরবের আবিষ্কারে আমার একমাত্র **সহায়—ভাষাতত্ত্ব।** আজকাল অনেকে খন্তা কোদাল লইয়া **মাটী খুঁড়িয়া** শিলালিপি তাম্রশাসন খুঁজিয়া প্রত্নতত্ত্ব বাহির ও **জাহির করিতেছেন,** কিন্তু আমি পূর্ব্বাহ্নেই খোলসা বলিতেছি **যে, ও সব কাম** সদ্‌ব্রাহ্মণের করণীয় নহে। কুলীন ব্রাহ্মণের **ছেলে, আমাদের** বিদ্যা—শস্ত্রঘ্ন নহে, শাস্ত্রঘ্ন। তাই ছুরি **দিয়া কখন** আম কাটি নাই (প্রকৃতিদত্ত অস্ত্র দন্ত দ্বারা **ছাড়াইয়াছি**), নিজের কাপড় নিজে সেলাই করিতে, নিজের **দাড়ি নিজে কামাইতে,** দর্জ্জির মত ছুঁচ বা নাপিতের মত ক্ষুর কখনও ধরি নাই; আয়স অস্ত্রের মধ্যে কেবল ষ্টীল পেন ও আলপিন ব্যবহার করি; কিন্তু একদিন পিন দিয়া কাগজ আঁটিতে পিন ফুটিয়া অঙ্গুলিতে রক্তপাত হইয়াছিল, সেই অবধি কলমে নিব পরাইতে বা কাগজে পিন লাগাইতে অন্য লোক ডাকি, কদাচ স্বহস্তে স্পর্শ করি না। তাই বলিতেছি, মজুরের মত মাটি কাটিয়া কোহিনূর পর্য্যন্ত লাভ করিতে চাহি না, শিলালিপি তাম্রশাসন ত দূরের কথা। এক কোদাল মাটিও কাটিব না, অথচ প্রত্নতত্ত্বের উদ্ধার হইবে—যেমন গঙ্গার জল গঙ্গায়ই থাকে অথচ পিতৃপুরুষের উদ্ধার হয়। সেরেফ ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে যদি আর্য্যদিগের আদিবাসস্থান সম্বন্ধে লম্বা লম্বা প্রবন্ধ ও ভারী ভারী কেতাব লেখা হইতে পারে, তবে এ ক্ষেত্রেই বা না হইবে কেন? ভূতত্ত্বে জীবাশ্ম ও জীব-কঙ্কালের ন্যায় ভাষাতত্ত্বেও শব্দকঙ্কাল অতীতের সাক্ষ্যদান করে। তবে চক্ষুষ্মানই কেবল তাহা দেখিতে পায়—ষণ্ড নাস্ত্যন্ধ এব সঃ।

প্রথমেই বলিয়া রাখি, কুরুক্ষেত্রনামক একটি স্থান উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে আছে বটে। কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না। যেমন ত বিক্রমপুর একটা প্রকাণ্ড পরগণা পূর্ব্ববঙ্গে রহিয়াছে; তথাপি নদীয়া জেলার একটি ক্ষুদ্র গ্রাম তাহার গৌরব হরণ করিতে বসিয়াছে। আসল কথা, এক সময়ে—সম্ভবতঃ বৌদ্ধপ্রভাববিধ্বংসী শঙ্করাচার্য্যের সময়ে—উত্তরপশ্চিম প্রদেশে সমস্ত তীর্থস্থান এককেন্দ্রীকরণের প্রবল চেষ্টা হয়, তাহারই ফলে কাশীধামে কামাখ্যা-জগন্নাথ-বৈদ্যনাথের আবির্ভাব। ইহারই জের—মোগল-রাজধানী দিল্লীর নিকট কুরুক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা। আসল কুরুক্ষেত্র নদীয়া জেলায়। ক্রমে সে কথা বলিতেছি।

আসল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যে বাঙ্গালা মুল্লুকে হইয়াছিল, তাহার বহু প্রমাণ বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যে সঞ্চিত রহিয়াছে।* প্রণিধান করিয়া দেখিলেই বোঝা পড়ে। 'কেঁদে কুরুক্ষেত্র', 'কুরুক্ষেত্র কাণ্ড' প্রভৃতি চলিত কথা বাঙ্গালা ভাষায় আসিল কি করিয়া, ইহা কি কখন কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছেন? শুধু তাহা কেন, মহাভারতোক্ত বহু ঘটনা বা বিষয়ের স্মারক শব্দ ও শব্দসমষ্টি বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত রহিয়াছে।.. যথা 'কীচকবধ' 'ভীষ্মের শরশয্যা', 'সপ্তরথীতে ঘেরা', 'বিদুরের খুদ', 'পাণ্ডববর্জ্জিত দেশ', ইত্যাদি। মহাভারতে উল্লিখিত বহু ব্যক্তির নামে

---

* যেমন ট্রয়যুদ্ধের ঘটনাস্থল আধুনিক ফরাসী দেশ, প্যারিস নামেই তাহার অকাট্য প্রমাণ রহিয়াছে।

* যেমন কালিদাসের বহু স্মৃতি বাঙ্গালা ভাষায় জড়িত রহিয়াছে। যথা, কহে কবি কালিদাস পথে যেতে যেতে। অধুনাও একজন তরুণ কবি ঐ নামে পরিচিত।

আজিও বাঙ্গালীর নামকরণ হয়। যথা, যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, দুর্য্যোধন,ভীষ্ম,সাত্যকি ইত্যাদি। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, মহাভারতের আমল হইতে একটা ধারাবাহিক অবিচ্ছিন্ন পরম্পরা বাঙ্গলাদেশে সুরক্ষিত আছে। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য যেরূপ প্রাচীন আজকাল গবেষণা দ্বারা সাব্যস্ত হইতেছে, তাহাতে এরূপ অনুমানও অসঙ্গত নহে যে, মূল মহাভারত বাঙ্গলা ভাষায়ই রচিত হইয়াছিল, পরে তাহা পশ্চিমের পণ্ডিতসংসদ্ সংস্কৃতভাষায় অনুবাদ করিয়া অধম-তারণ বেদব্যাসের নামে চালান; কাশিদাসী মহাভারত সেই মূল বাঙ্গালা মহাভারতের পুনঃ-সংস্কারের ফল এবং কালীসিংহ প্রভৃতি,ধরিতে গেলে, অনুবাদের অনুবাদ করিয়াছেন। এইটুকু দেখুন, 'মহাভারত' বাঙ্গালা দেশের এমন নিজস্ব জিনিস যে, আমরা স্থানে অস্থানে শব্দটি উচ্চারণ করি। ভারতের অন্য কোন প্রদেশের লোক এরূপ করে কি? আবার দেখুন,'মহাভারতের কথা,অমৃত সমান' আমাদের এমন মজ্জাগত হইয়াছে যে এই ইউরোপীয় সাহিত্যের অনুকরণ ও অনুসরণের মরসুমেও মহাভারত-অবলম্বনে বহু কাব্য নাটক প্রবন্ধ আখ্যায়িকা শিশুপাঠ্য ও স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইতেছে অন্য পরে কা কথা, প্রতিভাশালী নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্র-লাল পর্য্যন্ত এই পথের পথিক,—প্রমাণ 'কুরুক্ষেত্র' 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'ভীষ্ম'। যাহা হউক, সাহিত্যের ধারা আবিষ্কারের চেষ্টা আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া ভাষাতত্ত্বের উপরই ভরাভর করি।

এক্ষণে নদীয়া জেলার কতকগুলি স্থানের নাম লইয়া গবেষণা করিলে এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অনেকটা কিনারা হইবে। যাঁহারা তথাকথিত পূর্ব্ববঙ্গ * রেলপথে যাতায়াত করিয়াছেন, তাঁহারা চাকদহ, রাণাঘাট, বগুলা, জয়রামপুর, প্রভৃতি ষ্টেশনের নামের সহিত পরিচিত। আবার নারায়ণপুর, মাঝদিয়া, কুড়ুলগাছি, কৃষ্ণগঞ্জ প্রভৃতি গ্রাম এই সকল ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী। ইহা ছাড়া শান্তিপুর, বীরনগর, কৃষ্ণনগর, স্বরূপগঞ্জ, প্রভৃতি স্থানের নামও অনেকের সুপরিচিত। প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, মহাভারতের কাল হইতে ভাষার ক্রমিক বিবর্ত্তন-পরিবর্ত্তনে নদীয়া জেলার অবস্থিত এই সকল স্থানের নামগুলি বিকৃত হইলেও, ইহারা আজও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ও মহাভারত-বর্ণিত অন্যান্য ঘটনার স্মৃতিচিহ্ন অঙ্গে বহন করিতেছে।

(১) প্রথমে নদীয়া নামটাই ধরুন না কেন? বহু-তথ্যভাণ্ডার "নদীয়াকাহিনী" নামক গ্রন্থপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, কেহ নয়টি দীপ অর্থাৎ প্রদীপ, কেহ নয়টী দ্বীপ, কেহ নূতন দ্বীপ ইত্যাদি রূপে নামটির ব্যাখ্যা করেন। 'নদীবহুল' বলিয়া নদীয়া জেলার এইরূপ নাম এই মতবাদও শুনিয়াছি। বাস্তবিক কিন্তু মূল নাম 'নদী আয়া!' অর্জ্জুন ভীষ্মকে গঙ্গাজল পান করাইবার জন্য যখন ভূমিতে শরপ্রয়োগে পাতালগঙ্গা ভোগবতীর ধারা প্রবাহিত করান, তখন তদ্দর্শনে সকলে সবিস্ময়ে হিন্দীতে বলিয়া উঠেন 'নদী আয়া'! বিস্ময় প্রভৃতির প্রভাবে হিন্দী বাৎ বাহির হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক ইহা বাঙ্গালীমাত্রেই জানেন। দর্পণ-কারও বলিয়াছেন,'বিষাদে বিস্ময়ে ক্রোধে হিন্দিরুক্তির্ণদূষ্যতি!' পাতালে চন্দ্রের অদর্শনে ভোগবতীর জলে জোয়ারভাটা হয় না; তজ্জন্য নবদ্বীপতলবাহিনী গঙ্গায় জোয়ারভাটা নাই।

(২) এইরূপ, স্বরূপগঞ্জ বিশ্বরূপগঞ্জের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। অর্থাৎ এইস্থানে ভগবান্ অর্জ্জুনকে স্বীয় বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়াছিলেন। অনেক বাহূদরবক্ত্রনেত্র অনন্ত রূপ বহুদূর ব্যাপিয়াছিল, সুতরাং রণক্ষেত্র হইতে কয়েক ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্বরূপগঞ্জ পর্য্যন্ত বিরাট পুরুষের দেহ স্পর্শ করিয়াছিল, ইহা বিচিত্র নহে। অজ্ঞলোকে আদিস্থিত 'বি' উপসর্গ বিবেচনায় বর্জ্জন করে। তখন নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ বেগতিক বুঝিয়া দন্ত্য 'স' দিয়া বানান প্রবর্ত্তন করেন। এই স্থানের

---

* কলিকাতা হইতে কাঁচরাপাড়া পর্য্যন্ত ২৪ পরগণা, ও কাঁচরাপাড়া ছাড়াইয়া দামুকদিয়া ঘাট পর্য্যন্ত নদীয়া জেলা, অথচ লাইনের নাম পূর্ব্ববঙ্গ। জানিনা, ভবিষ্যতে কোন প্রত্নতাত্ত্বিক বলিয়া বসিবেন কিনা, রেলস্থাপনার সময়ে এসকল স্থান পূর্ব্ববঙ্গে ছিল, পদ্মার গতিপরিবর্ত্তনে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

পবিত্রতা স্মরণ করিয়াই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য 'স্বরূপগঙ্গস্ত দক্ষিণে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ' বলিয়া অঙ্গীকার করেন।

(৩) শান্তিপুরের মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের সহিত নিবিড় সম্পর্ক কি আর বুঝাইতে হইবে? নতুবা ঘোর কলিকালেও কি এই পুণ্য ভূমিতে নদীয়ার নিমাইএর শুভাগমন হয় এবং ভীষ্মের তুল্য জ্ঞানী ও পূতচরিত্র অদ্বৈতাচার্য্য ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জন্ম হয়?

(৪) চাকদহ=চক্রহ্রদ। এইখানে কর্ণের রথচক্র বসিয়া যায়। হ্রদ প্রাকৃত উচ্চারণে হদ,ও পরে বর্ণবিপর্য্যাসের (metathesis) নিয়মে হদ=দহ হইয়াছে, যেমন সংস্কৃতভাষায় হিন্‌স্ ধাতু হইতে সিংহ ও খন্ ধাতু হইতে নখ!, এবং বাঙ্গালায় বাদাত, বাসাতা, বাক্স, ডেক্স প্রভৃতি উচ্চারণ।

(৫) রাণাঘাট=রণবট। এইখানে ঘটোৎকচের রণাসন। বাঙ্গালায় অকার অনেক স্থানে আকার হইয়া যায়, যথা অমাবস্যার সাধারণ উচ্চারণ আমাবস্যা। সম্ভবতঃ, আড়ংঘাটারও হিড়িম্ব-হিড়িম্বার সহিত ঐতিহাসিক সংযোগ আছে।

(৬) বগুলা। ইহার সংস্কৃত আকার বক-কুল্যা। সংস্কৃতজ্ঞমাত্রেই 'কুল্যাল্পা কৃত্রিমা সরিৎ' ইত্যমরবচন জানেন। বেশ বুঝা যাইতেছে যে এই কুল্যা বা জলাশয়ে বকরূপী ধর্ম্ম যুধিষ্ঠিরাদিকে নানা প্রশ্ন করিয়াছিলেন। উক্ত সরিৎ আজও এখান হইতে লোপ পায় নাই, বগুলার অদূরে হাঁসখালিতে ইহা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। সম্ভবতঃ, এখানে তখনও এখনকার মত বহু হংস বিচরণ করিত, বকরূপী ধর্ম্ম তন্মধ্যে 'হংস মধ্যে বকো যথা' হইয়া বিরাজ করিয়াছিলেন। 'বক' 'বগ' হইয়া যায়, তাহা এই নবান্নের সময় 'কাগারে বগারে নবান্ন খাওরে' বলিলেই ধরা পড়িবে, শাগের ক্ষেত আর দেখাইবার দরকার নাই।

(৭) নারায়ণপুর। এইখানে নারায়ণী সেনার সমাবেশ হইয়াছিল।

(৮) কৃষ্ণগঞ্জ। এইখানে শ্রীকৃষ্ণের তাম্বু বা পটমণ্ডপ অবস্থিত ছিল। সম্ভবতঃ, কৃষ্ণনগরে (হিন্দী কিষণগড়ে) শ্রীকৃষ্ণ গড়খাই করিয়াছিলেন। আধুনিক কালের নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের নামে ইহার নামকরণ হয় নাই। ইহা বর্দ্ধমানের ন্যায় অতি প্রাচীন সহর।

(৯) বীরনগর। এইখানে কুরুক্ষেত্র-সমরের বাছা বাছা বীর বা মল্লগণ কুচকাওয়াজ করিতেন। সম্প্রতি কিছুকাল হইতে এই স্থান জ্বরে উৎসন্নপ্রায়; এইজন্য উক্ত জ্বরের নাম ম্যালেরিয়া=মল্ল+অরি। এই স্থানের জলহাওয়ার গুণে চুঁচুড়ার সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র বালককালে অমিতবলে মুষ্ট্যাঘাতে বাক্স ভাঙ্গিয়াছিলেন। এখনও সেই 'ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ' পুরুষ 'মরা হাতী লাখ টাকা' প্রবাদবাক্য স্মরণ করাইয়া দেন।

নদীয়া জেলায় জলাঙ্গীর তীরবর্ত্তী বীরপুর গ্রামেও এই বীরগণের আর একটি বারিক ছিল। তাই সেখানকার মাটীর গুণে সেদিনও কয়েকজন যুবক অদ্ভুত বীরপণার পরিচয় দিয়াছে। এমনি স্থান মাহাত্ম্য!

(১০) মাঝদিয়া। এই গ্রামটি কৌরব ও পাণ্ডব সৈন্যসংস্থানের ঠিক মাঝামাঝি স্থান ছিল। এইখানে 'সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে' (গীতার ১ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অর্জ্জুনের রথ রক্ষিত হইয়াছিল। লর্ড কর্জ্জনের আমলে এই তথ্য আবিষ্কৃত হইলে এখানে একখানি স্মৃতিফলক বসাইবার ব্যবস্থা হইত।

(১১) জয়রামপুর। এই গ্রামের নামে একটি বিষম গলদ আছে। ইহার প্রকৃত নাম জয়দ্রথপুর, লিপিকরপ্রমাদে জয়রামপুর হইয়াছে, যথা সিঙ্গিগ্রাম বনাম সিদ্ধিগ্রাম। দ্রৌপদীহরণ-প্রয়াসী, বালক-অভিমন্যু-হত্যাকারী, শ্যালকের আজ্ঞাকারী প্রতিপাল্য পাষণ্ড জয়দ্রথের নামে এই গ্রামের নাম বলিয়াই ইহার নাম লইলে সেদিন অন্ন হয় না, এইরূপ অখ্যাতি আছে। নতুবা যে 'রামনামে কোটিব্রহ্মহত্যা হরে,' সেই রামনামভক্ত হনুমানের মুখে 'জয়রামে' রূপান্তরিত হইয়া ভোজন-ব্যাঘাত ঘটাইবে, ইহা অবিশ্বাস্য। আর তাহা যদি

হইত,-তবে অদূরবর্ত্তী রামনগরের নামেই বা সে ব্যাঘাত হয় না কেন ? ইতি সুধীভির্বিভাব্যম্ ।

(১২) কুড়ুলগাছি। ইউক্লিডের দ্বাদশ স্বতঃ-সিদ্ধের ন্যায় এই দ্বাদশ গৌরবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই গ্রামেই প্রাচীন কুরুক্ষেত্র, বা অসমস্তভাবে কুরুর ক্ষেত্র। পরে প্রথম র=ড় হইয়া (যথা মরা=মড়া, পার=পাড়) ও দ্বিতীয় র=ল হইয়া (যথা প্রাচীর=পাঁচীল, রলয়োরৈক্যং) কুড়ুল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। (ইহা কঠোর কুঠারের অপভ্রংশ নহে) যুদ্ধক্ষেত্রের মৃত্তিকায় বহু রক্তপাত হওয়ায় ও বহু মৃতদেহ প্রোথিত থাকায়, উহা কালক্রমে উৎকৃষ্ট সারে পরিণত হয় ; এই সমস্ত উর্ব্বরা ভূমিতে বহু বৃক্ষের উদ্ভব হওয়াতে 'ক্ষেত্র' 'গাছি'তে পরিণত হইয়াছে। এখন পর্য্যন্তও এই অঞ্চলে আম-কাঁঠালের আওলাত যথেষ্ট। অতএব ভাষাতত্ত্বের অভ্রান্ত সাক্ষ্যে সপ্রমাণ হইল যে আধুনিক কুড়ুলগাছিই প্রাচীন ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র। Q. E. D.

ইংরাজীতে Words and Places নামে একখানি উপাদেয় পুস্তক আছে ; তাহাতে গ্রন্থকার গ্রাম-নগর প্রভৃতির নাম হইতে বহু ঐতিহাসিক তথ্য নিষ্কাশিত করিয়াছেন। আমাদের ভাষায় অদ্যাপি এরূপ পুস্তক প্রণীত হয় নাই। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে এ বিষয়ে সামান্য একটু চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহা আমাদের ভাষা ও সাহিত্যে উক্ত প্রণালীর প্রথম চেষ্টা বলিয়া ক্রটি-বিচ্যুতি একটু অনুকম্পার দৃষ্টিতে দেখিবেন, সুধীবর্গের নিকট আমার এইমাত্র বিনীত প্রার্থনা।*

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

* ভাগলপুর তেজনারায়ণ জুবিলি স্কুলের ভূতপূর্ব্ব সহকারী প্রধান শিক্ষক আমার পরমাত্মীয় ৺ দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবন্ধে প্রকটিত তথ্যের আবিষ্কর্ত্তা। তিনি ইহা অসম্পূর্ণ রাখিয়া অকালে পরলোকে প্রয়াণ করিয়াছেন। আমি তাঁহার খাঁটি সোনায় কিঞ্চিৎ পাইন ও রসান দিয়া সাহিত্যের প্রদর্শনীতে দাখিল করিলাম।

চন্দ্রকান্ত প্রসঙ্গ

(১৩)

বিবিধ কথা—"কাতন্ত্রচ্ছন্দঃপ্রক্রিয়া"

সংস্কৃত কলেজে কার্য্যকালেই (বোধ হয়, ১৩০১-২ সাল) তর্কালঙ্কার মহাশয় একবার 'কামলা' রোগে গুরুতর কাতর হইয়াছিলেন। তিনি যদিও চিরজীবনই একরূপ অসুস্থ-দেহই ছিলেন, তবু সেবারকার কাতরতা তাঁহাকে একান্ত 'কাহিল' করিয়াছিল। তিনি শয্যাগত হইলে, স্বনামধন্য ডাক্তার 'সাণ্ডার্স' তাঁহার চিকিৎসা-ভার গ্রহণ করিলেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপনা কএকদিনের জন্য স্থগিত রহিল। তর্কালঙ্কার মহাশয় পীড়িত হইয়াছেন শুনিয়া তাঁহার সকল শ্রেণীর বন্ধুবান্ধব তাঁহার কাছে সর্ব্বদা যাতায়াত করিতে লাগিলেন, তাঁহার রুগ্নশয্যা সুশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত বন্ধুবর্গ ও আত্মীয়-বর্গে সর্ব্বদা পূর্ণ থাকিত। তিনি সেই জন্য বন্ধুবর্গের কাছে কত বিনয়, কত সৌজন্য প্রকাশ করিতেন, তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিয়াছেন; তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বিনয়, সৌজন্য, ও সুহৃদ্ব্যবহার ভাষায় প্রকাশ করিবার শক্তি আমাদের নাই। সেইরূপ অসাধারণ বিনয়মধুর সৌজন্য, সেইরূপ অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিবার সামগ্রী,—উহা কাহাকেও বলিয়া বুঝাইবার জিনিস নহে। তাঁহার সমস্তই যেন অসাধারণ রকমের ছিল। আমরা অনেক সময়ে অতি সামান্য ব্যক্তির কাছে তাঁহার অনাড়ম্বর সৌজন্য ও নম্রতা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িতাম। এবং যাহারা যত বড় বিদ্রোহই লইয়া আসুক না কেন, তাঁহার প্রশান্ত গম্ভীর চরিত্রমাধুর্য্যে ও অকৃত্রিম বিনয়সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধাভক্তির পুষ্পাঞ্জলি দিয়া নতমস্তকে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছে। আমরা এসকল কথার আলোচনা প্রসঙ্গান্তরে করিব। এখানে অন্য একটী প্রসঙ্গের উল্লেখ করিব। আমরা বলিয়া আসিয়াছি, তর্কালঙ্কার মহাশয় 'কামলা' রোগে শয্যাশায়ী হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার রুগ্নশয্যা শুধু হতোৎসাহ মরণমুখাপেক্ষীর রোগক্ষীণ পাণ্ডুদেহভার

বুকে লইয়া বন্ধুবর্গের হৃদয়ে আশঙ্কার সঞ্চার করিতেছিল এমন নহে;—সেই দুর্দ্দিনের মধ্যে, সেই জীবনমরণের সমস্যাময় সময়ের মধ্যেও একটা কর্ম্মের প্রেরণা ও অনুষ্ঠানচঞ্চল প্রাণ এবং মূর্ত্তিমতী প্রতিভার আশ্রয়স্থল হইয়া ধন্য হইতেছিল। তর্কালঙ্কার মহাশয় সে সময়ে তাঁহার "কাতন্ত্রচ্ছন্দঃ প্রক্রিয়া" নামক বৈদিক ব্যাকরণের অবশিষ্ট অংশ সম্পূর্ণ করিতেছিলেন। তাঁহার বড় সাধের 'কাতন্ত্রচ্ছন্দঃ প্রক্রিয়া' তখনও শেষ হয় নাই, শেষ হইতে অনেকটা বাকি ছিল। তর্কালঙ্কারমহাশয় প্রাণপণ পরিশ্রমে উহা শেষ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার রচনাকার্য্য প্রায় সর্ব্বদাই চলিত, তবে বন্ধুবান্ধবগণের অনুপস্থিতিকালেই উহা বিপুল বেগে অগ্রসর হইত। তাঁহার রোগক্ষীণ দেহে এইরূপ অক্লান্ত পরিশ্রমের আভাস পাইয়া চিকিৎসকগণ ভীত ও বন্ধুগণ বিস্মিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে এরূপ পরিশ্রম হইতে অন্ততঃ কিছুকালের জন্য বিরত থাকিতে অনুরোধ করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। সমবয়স্ক বন্ধুগণ মৃত্যুভয় দেখাইলে তিনি বলিতেন, মৃত্যু তো সুনিশ্চিত, আজ না হইলেও কাল হইতে পারে—"অদ্যবাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবং"—কিন্তু আরব্ধ কাজটা সম্পন্ন করিয়া মরিতে পারিলে সুখে মরিব।" এতদুত্তরে বন্ধুগণের নীরবতা ও দীর্ঘশ্বাস, তর্কালঙ্কার মহাশয়ের রোগপাণ্ডু অধরে ঈষৎ হাসির সঞ্চার করিত মাত্র। তিনি কখনও বা খাতাপত্র রাখিয়া দিতেন, বন্ধুগণ হয়ত ভাবিতেন, এইবার উহা স্থগিত রহিল; কিন্তু কর্ম্মের প্রেরণা তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিত, তিনি তাহাদের অসমক্ষে বৈদিক ব্যাকরণখানা পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিতেন। "কাতন্ত্রচ্ছন্দঃ প্রক্রিয়ার" প্রায় অর্দ্ধভাগ তাঁহার রুগ্নশয্যাতেই বিরচিত হয়। তর্কালঙ্কার মহাশয় কেন যে এই ব্যাকরণখানি পূর্ণ করিবার জন্য এত প্রয়াস—শুধু প্রয়াস নহে, মৃত্যুভয় উপেক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাহার কারণ চিন্তা করিলে আমাদিগকে বিস্মিত হইতে হয়। যশোলিপ্সা মানুষমাত্রেরই আছে, সুতরাং তর্কালঙ্কার মহাশয়েরও তাহা ছিল। কিন্তু তিনি জীবনে ইতঃপূর্ব্বে আরও যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা তাঁহার প্রভূত যশঃ উপার্জ্জিত হইয়াছিল। শুধু একটা শুষ্ক যশের জন্য—তাহাও আবার যাঁহার জীবনে যথেষ্ট রূপেই উপার্জ্জিত হইয়াছে—এমন মহাত্মা কখনও জীবন পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিতে পারেন না। তাঁহার তৎকালিক পরিশ্রম প্রকৃত পক্ষেই কিছু অস্বাভাবিক হইয়াছিল। আমাদের মনে হয়, কাতন্ত্র ব্যাকরণের প্রতি তর্কালঙ্কার মহাশয়ের যে পুরুষপরম্পরাপ্রাপ্ত অসামান্য শ্রদ্ধা ছিল, সেই শ্রদ্ধাস্পদকে বৈদিকাংশশূন্যতার জন্য বৈয়াকরণ-সমাজে দেশান্তরীয়গণের গ্লানি হইতে মুক্ত করিবার নিমিত্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের এই প্রাণপাত সংকল্প! কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতে চেষ্টা করিতেছি।

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সর্ব্বত্র চিরকালই কাতন্ত্র ব্যাকরণের অধ্যয়ন চলিয়া আসিতেছে। তর্কালঙ্কার মহাশয়ও কাতন্ত্র ব্যাকরণই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন,—সুতরাং কাতন্ত্রের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট প্রাণের টান ছিল।

তা ছাড়া, সুসম্বদ্ধ দার্শনিকরীত্যনুসারিণী রচনার গুণে, এবং সংক্ষেপে সারগ্রাহকতাগুণে 'কাতন্ত্র' পাণিনির পরেই আসন পাইবার যোগ্য। কাতন্ত্র ব্যাকরণের রচয়িতা অর্থাৎ সূত্রকার আচার্য্য শর্ব্ববর্ম্মা সন্ধি, শব্দ, কারক, সমাস, তদ্ধিত ও আখ্যাত সূত্রসকল প্রণয়ন করেন, তিনি কৃৎপ্রকরণীয় সূত্র সকল প্রণয়ন করেন নাই। তাঁহার মতে "বৃক্ষাদিবদমীরূঢ়াঃ"—অর্থাৎ কৃদন্ত শব্দসকল, বৃক্ষাদি শব্দের ন্যায় রূঢ়, উহাদের যৌগিকার্থ অনুসন্ধানের কোন প্রয়োজন নাই,—অভিধান-দ্বারা উহাদের শক্তি বা তাৎপর্য্য নিরূপিত হইবে। কিন্তু পরবর্ত্তী 'কাত্যায়ন' কৃৎপ্রকরণের সূত্র প্রণয়ন করিয়া কাতন্ত্রের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন। কাতন্ত্রের বৃত্তিকার পরমপণ্ডিত আচার্য্য দুর্গসিংহ সমগ্র কাতন্ত্রের একখানি সুন্দর টীকা রচনা করিয়া কাতন্ত্রের অধিকাংশ অপূর্ণ অংশ পরিপূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। আচার্য্য দুর্গসিংহ কাত্যায়ন-প্রণীত কৃৎসূত্রাবলীরও বৃত্তি এবং টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। দুর্গসিংহ প্রণীত বৃত্তি ও টীকা অতি উপাদেয় গ্রন্থ। আচার্য্য শর্ব্ববর্ম্মা যে সকল প্রয়োগের জন্য সূত্র করেন নাই,

বৃত্তি ও টীকাকার দুর্গসিংহ সেই সকল প্রয়োগসাধনমানসে নানাপ্রকার 'মন্তব্য' ও বিচার প্রণালীর অবতারণা করিয়া গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এমন কি, আচার্য্য দুর্গসিংহ অনেক স্থানেই পাণিনীর ব্যাকরণের অতিভাষিতা এবং পৌনরুক্ত্যাদির জন্য তাঁহার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছেন, এবং আচার্য্য শর্ব্ববর্ম্মার মিতভাষিতার জন্য প্রকারান্তরে তাঁহাকে প্রশংসা করিয়াছেন।

সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার ত্রিলোচন, কাতন্ত্রের কৃৎপ্রকরণের দুর্গসিংহ-প্রণীত বৃত্তির উপরে একখানি অতি সুন্দর টীকা রচনা করিয়া উহাকে আরও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন। এই টীকার নাম "পঞ্জী"। পরবর্ত্তী আচার্য্য সুষেণ—যাঁহার প্রচলিত নাম "কবিরাজ"—তিনি বৃত্তি ও পঞ্জীর উপরে "কলাপচন্দ্র" নামে একখানি সুবিস্তৃত টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন; তা ছাড়া 'বিদ্যাসাগর', 'বিবেশ্বর' বা 'বিশ্বেশ্বর' প্রভৃতি টীকাকারগণও কাতন্ত্রের উপর টীকা করিয়াছেন। একটু প্রণিধান করিলে দেখা যায় যে, আচার্য্য শর্ব্ববর্ম্মার সম্প্রদায়—কি বৃত্তিকার, কি বা টীকাকারগণ, সকলেই যেন 'কাতন্ত্রকে' সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে, পাণিনীর প্রভৃতি নিবন্ধের তুল্য করিয়া তুলিতে, বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছেন। পাণিনীয় নিবন্ধ অপেক্ষা 'কাতন্ত্র' নিবন্ধ যে কোন অংশেই ন্যূন নহে এই এক ধারণা লইয়া, সেই ধারণাকেই বিদ্বৎসমাজে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সকলে সমস্বরে কাতন্ত্রের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন, এবং যেখানেই সুবিধা পাইয়াছেন, সেই খানেই পাণিনীর তন্ত্রকে আক্রমণ করিয়াছেন। এই কাতন্ত্রপক্ষপাতের মূলে যে বীজ নিহিত ছিল, আমাদের মনে হয় তর্কালঙ্কারমহাশয়ের বৈদিকাংশ পূরণের অসামান্য প্রয়াসের মূলেও সেই একই বীজ নিহিত। আরও দেখা যায় যে কাতন্ত্রের অসম্পূর্ণ অংশ, যাহা টীকাকারগণ পরিপূর্ণ করিয়াছেন,—সেইগুলি এবং কতিপয় নূতন বিষয় সংযোজনা করিয়া পরমপণ্ডিত শ্রীপতিদত্ত 'কাতন্ত্র-পরিশিষ্ট' প্রণয়ন করেন,—আচার্য্য গোপীনাথ তাহার উপরে একখানি সুবিস্তৃত সুন্দর টীকা রচনা করিয়াছেন। কাতন্ত্রের এই পরিশিষ্ট ভাগ অতি উপাদেয় সামগ্রী। গোপীনাথের টীকাও গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। শ্রীপতিদত্ত কাতন্ত্র-পরিশিষ্টের সূত্রমাত্র প্রণয়ন করিয়াই নিবৃত্ত হন নাই, তিনি সেই সকল সূত্রের বৃত্তিও রচনা করিয়াছেন। তাঁহার কাতন্ত্র-পরিশিষ্টে সন্ধি, শব্দ, কারক, সমাস, তদ্ধিত, ষত্ব, ণত্ব, ও স্ত্রীত্বপ্রকরণ স্থান পাইয়াছে। তিনিও বৈদিক অংশ পূরণের জন্য কোনও চেষ্টা করেন নাই, তবে এমন কতকগুলি প্রয়োগ সিদ্ধির জন্য তিনি সূত্র করিয়াছেন যে তাহাদের প্রয়োজন ভাষাতে বড় দেখা যায় না, সেগুলি প্রায়শঃ বেদেই প্রসিদ্ধ। অবশ্য তাহাও অতি সামান্য।

উক্ত কাতন্ত্র-পরিশিষ্টকার শ্রীপতিদত্ত এবং টীকাকার গোপীনাথ অতি কর্কশভাবে স্থানে স্থানে পাণিনীয় নিবন্ধের প্রতি আক্রমণ করিয়াছেন, এবং ইহাও বলা সঙ্গত যে তাঁহারা এমন কতকগুলি সুপ্রণালীর আবিষ্কার করিয়াছেন যে তাহা বাস্তবিকই পাণিনীয় তন্ত্রের বহুআয়াসপ্রদ আড়ম্বরবাহুল্য-দোষ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত, পরন্তু সুখবোধ্য। কাতন্ত্রের এইরূপ অঙ্গপরিপুষ্টি চেষ্টা দীর্ঘকাল যাবৎ চলিয়া আসিয়াছে। তদ্ধিতপ্রত্যয় সম্বন্ধে কাতন্ত্রের ন্যূনতা দূর করিবার জন্য আধুনিক পণ্ডিতগণের মধ্যেও একটা প্রচেষ্টা দেখা গিয়া থাকে; তদ্ধিতপরিশিষ্টনামে একখানি অনতিপ্রসৃত গ্রন্থ যে আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে তাহাও ঐ প্রচেষ্টারই ফল। যাহা হউক কাতন্ত্র ব্যাকরণের অঙ্গপুষ্টির জন্য এ যাবৎ যত প্রকারের চেষ্টা চলিয়া আসিয়াছে আমরা সংক্ষেপে তাহার বিবরণ প্রদান করিলাম। এই বিবরণীর মধ্যে কোনও আচার্য্যেরই বৈদিকাংশ পরিপূরণের চেষ্টার আভাস পাওয়া যায় না। আচার্য্য কাত্যায়ন, কতকগুলি বৈদিক কৃদন্ত শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার সংখ্যা অতি সামান্য, পরন্তু যে সকল বৈদিক শব্দ লৌকিক ভাষাতেও কালক্রমে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, কাত্যায়ন তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। কাত্যায়নপ্রণীত কৃৎপরিশিষ্ট প্রকৃতপক্ষেই অতি সুন্দর গ্রন্থ হইয়াছে। এই সকল পরিশিষ্ট ও মূল কাতন্ত্র একত্র হইয়া উহা সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গে অধীত হইয়া আসিতেছে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, যে সময়ে আচার্য্য শর্ব্ববর্ম্মা কাতন্ত্র প্রণয়ন করেন, তখনও ভারতবর্ষের আর্য্যজাতি হইতে বেদভাগ বহিষ্কৃত হয় নাই—তখনও বৈদিক যাগযজ্ঞে, মধুরস্বরসমন্বিত সামগানে আর্য্যভবন পরিপূর্ণ থাকিত;—সেই সময়ে আচার্য্য শর্ব্ববর্ম্মা বৈদিকাংশ পরিত্যাগ করিয়া কেবল লৌকিক-প্রয়োগ সিদ্ধির জন্য কাতন্ত্র প্রণয়ন করিলেন কেন? আচার্য্য কি বৈদিক প্রয়োগে অনভিজ্ঞ ছিলেন? অবশ্য এই প্রশ্ন নূতন নহে,—আচার্য্য দুর্গসিংহ এই প্রশ্নের কতকটা সমাধান করিয়াছেন। তিনি এতৎ প্রসঙ্গে আরও কতিপয় প্রশ্নের উত্থাপন ও সমাধান করিয়াছেন। প্রথমতঃ, আচার্য্য শর্ব্ববর্ম্মারই হৃদয়ে এই প্রশ্নের উদয় হইয়াছিল,—তিনি সন্ধিপ্রকরণে এই জন্য একটী সূত্র করেন, উহা তাঁহার আশঙ্কিত প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ। সূত্রটী এই—"লোকোপচারাদ্ গ্রহণ-সিদ্ধিঃ"। দুর্গসিংহ উহার বৃত্তি করিয়াছেন—"লোকানামুপচারো ব্যবহারঃ তস্মাদনুক্তস্যাপি গ্রহণস্য সিদ্ধিঃ বেদিতব্যা ইতি"। অর্থাৎ নিপাত ও অব্যয় প্রভৃতির জন্য কোন সূত্র করা হয় নাই, তাহা লোকব্যবহার হইতে অবগত হইবে। এই সূত্রে বৃত্তিকার বলিয়াছেন, 'নিপাত' 'অব্যয়' 'উপসর্গ' 'কারক' 'কাল' 'সংখ্যা' ও 'লোপ' প্রভৃতির পরিচয়ের জন্য পাণিনীয় নিবন্ধে যে সকল সূত্র আছে, তাহা হইতে এবং লৌকিক ব্যবহার হইতে সে গুলি জানিয়া লইবে। ইতঃপর তিনি কতকগুলি প্রয়োগ প্রদর্শন করেন, এবং বৈদিক প্রয়োগ সম্বন্ধে প্রশ্ন উপস্থিত করেন। আমরা বলিতে চাই, এই প্রশ্নের উত্তরের ইঙ্গিতটীও সূত্রকারেরই সূত্রানুমত,—যেহেতু ব্যাকরণ বেদাঙ্গ। বৈদিকপ্রয়োগসম্বন্ধ-শূন্য ব্যাকরণের বেদাঙ্গতা রক্ষা করা কঠিন, অপিচ তাহা হইলে উহার প্রতি লোকের আস্থা থাকিবে না; সুতরাং আচার্য্য শর্ব্ববর্ম্মা বলিতে চাহেন যে বৈদিকশব্দগুলিও লৌকিকজ্ঞ পণ্ডিতগণের নিকট হইতেই অবগত হইবে। ইহার জন্য সূত্র করা নিষ্প্রয়োজন।—কেন যে নিষ্প্রয়োজন, তাহা বৃত্তিকার বলিতেছেন,—

বৈদিকা লৌকিকজ্ঞৈশ্চ যে যথোক্তা স্তথৈব তে।
নির্ণীতার্থাস্তু বিজ্ঞেয়া লোকাত্তে নামসংগ্রহ॥

ত্রিলোচন ইহার ব্যাখ্যাবসরে বলিতেছেন—

"যে বৈদিকাঃ শব্দাঃ তু লৌকিকজ্ঞৈঃ পুরুষৈঃ 'যথা' যেন প্রকারেণ উক্তাঃ প্রকৃতি-প্রত্যয়বিভাগেন বেদে প্রতিপাদিতাঃ, তথৈব তেন প্রকারেণৈব তে নির্ণীতার্থাঃ প্রকৃতিপ্রত্যয়বিভাগোহনদ্বারেণ নিশ্চিতার্থাঃ বিজ্ঞেয়া মন্তব্যাঃ। এতদুক্তং ভবতি বেদেহি লৌকিকা এব শব্দা বহবঃ প্রযুজ্যন্তে, তেন তেষাং ব্যুৎপত্ত্যনুসারেণ ইতরেষামপি বৈদিকানাং লৌকিকজ্ঞত্বাৎ প্রকৃতিপ্রত্যয়বিভাগোহনসামর্থ্যোঃ শক্যতে বুৎপত্তিঃ কর্ত্তুমিতি। তর্হি লৌকিকা অপি সর্ব্বে শব্দা লোকত এব বিজ্ঞাস্যন্তে, কিমনেন ইত্যাহ লোকাদিতি। 'তু' কিন্তু, লোকাদবধে রেষাং লৌকিকানাং শব্দানামসংগ্রহঃ সম্যগ্ গ্রহণং নভবতি ইত্যর্থঃ। যস্মাৎ লৌকিকানাং শব্দানাং ব্যাকরণমেব সম্প্রদায়ঃ তদভাবে বহু প্রক্রিয়াবিষয়াঃ শব্দা বৃদ্ধপরম্পরয়া কথমবধারয়িতুং শক্যন্তে ইতি। বৈদিকানাং পুনঃ শব্দানাং যুগমন্বন্তরাদিষ্বপি অনবচ্ছিন্নক্রমেণ সম্প্রদায়ত্বাৎ লৌকিকজ্ঞৈরবধারয়িতুং পার্য্যন্তে ইতি।"

ইহার ভাবার্থ এই যে—লৌকিক শব্দ ব্যবহার বিষয়ে সমধিক অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ, লৌকিক শব্দসমূহের ব্যুৎপত্তি অনুসারে, বৃদ্ধপরম্পরাপ্রচলিত বৈদিক শব্দসমূহের যেরূপ প্রকৃতিপ্রত্যয় নির্দ্দেশপূর্ব্বক ব্যুৎপত্তি নিরূপণ করিয়াছেন, সেগুলি সেইরূপেই বুঝিতে হইবে। বৈদিক শব্দগুলির কোন কালেও পরিবর্ত্তন হইবে না,—সুতরাং চিরকাল একই রূপে বৃদ্ধগণ উহাদের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু লৌকিক শব্দের সাধন বা ব্যুৎপত্তি প্রণালী অতিশয় বিস্তৃত বলিয়া তাহা কেবল লোকব্যবহার দ্বারা অবগত হওয়া যায় না। সুতরাং লৌকিক শব্দ ব্যুৎপাদনের জন্য লৌকিক ব্যাকরণের প্রয়োজন দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ, বেদে লৌকিক শব্দই বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে, সুতরাং লৌকিকশব্দসমূহের ব্যুৎপাদক ব্যাকরণকেও ফলাফলে বেদাঙ্গ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে।

আচার্য্য শর্ব্ববর্ম্মা, টীকা ও বৃত্তিকার দুর্গসিংহ ও ত্রিলোচন প্রভৃতির মতে দেখা যাইতেছে যে, কাতন্ত্র ব্যাকরণ লৌকিকশব্দ-

ব্যুৎপাদক হইলেও,উহা দ্বারা বৈদিক পদসাধনকার্য্যও চলিতে পারে, যেহেতু লৌকিক শব্দরাশিদ্বারাই অধিকাংশ বেদভাগ পরিপূর্ণ। পরন্তু, অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ যুগযুগান্তর একরূপ বৈদিক শব্দসকলের পুরুষপরম্পরাপ্রাপ্ত ব্যুৎপত্তি অনুসারে অর্থাবগম করিতে পারেন। বৈদিক শব্দসকলের কোনওরূপ পরিবর্ত্তন নাই বা হইতে পারে না,—কাজেই গতানুগতিকতা দ্বারা কোনরূপে কাজ চলিয়া যাইতে পারে।

এদিকে লৌকিক প্রয়োগের বিস্তৃতি এবং বোধ হয় কালভেদে উহার বহুবিধ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনাদিজনিত দুরধিগমতাই, সাময়িক ব্যাকরণ অর্থাৎ লৌকিক ব্যাকরণ প্রণয়নের হেতু। আচার্য্যগণের এই সিদ্ধান্ত বোধ হয় তর্কালঙ্কার মহাশয়কে পরিতৃপ্ত করিতে পারে নাই। তাই তাঁহার এই প্রয়াস। যদিও অধিকাংশ বৈদিক শব্দেরই প্রকৃতিপ্রত্যয় লৌকিক ব্যাকরণ-সম্মত সন্দেহ নাই, তথাপি সে সকলের পরস্পর যোগে—সন্ধি সমাস ষত্ব ণত্ব প্রভৃতি ও বাক্য-মহাবাক্যগত পার্থক্য এত অধিক যে লৌকিক ব্যাকরণ দ্বারা তাহার কিছুমাত্র মীমাংসা হইতে পারে না। সেই সকল অভাব দূরীকরণ-মানসে, মহাত্মা তর্কালঙ্কার মহাশয় 'কাতন্ত্রচ্ছন্দঃ প্রক্রিয়া' প্রণয়ন করেন।

মূল কাতন্ত্রের উল্লিখিত সংক্ষিপ্ততার আরও একটী বিশিষ্ট কারণ আছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। কথঞ্চিৎ অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, আমরা এখানে সে কথাটীর আলোচনা করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না; আশা করি ধৈর্য্যশীল পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন। 'কলাপচন্দ্র'কার সুষেণাচার্য্য তাঁহার টীকা 'কলাপচন্দ্রে' কাতন্ত্র ব্যাকরণ রচনার একটী আখ্যায়িকা প্রদান করিয়াছেন। এই আখ্যায়িকাটীর মূল বহুপ্রাচীন "বৃহৎ কথা" নামক গ্রন্থের সার-সংকলন 'সোমদেবভট্টের' "কথাসরিৎসাগর" নামক কথাগ্রন্থে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কথিত আছে, মহারাজ শালিবাহন, ("শালবাহন" অথবা 'সাতবাহন',) একদিন মহিষীর সহিত জলক্রীড়া করিতে করিতে বিদুষী রাণীকে জল-সেক দ্বারা একান্ত প্রপীড়িত করিয়া তুলেন; তখন রাণী বলিলেন,"দেব, মোদকং দেহি"—অর্থাৎ মা উদকং দেহি—মহারাজ! আমায় (আর) জল দিবেন না। রাজা শালিবাহন মনে করিলেন, রাণী বোধ হয় 'মোয়া' খাইতে চাহিতেছেন, অমনি রাজার আদেশে 'মোয়া' আনীত হইল। বিদুষী রাণী মহারাজের মূর্খতা দর্শনে ঈষৎ হাসিলেন। মহারাজ সেই হাসির মর্ম্ম অবগত হইয়া একান্ত লজ্জিত এবং মর্ম্মাহত হইলেন, পরন্তু প্রতিজ্ঞা করিলেন, অতি অল্পকালের মধ্যেই লৌকিক ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া তবে রাণীর সঙ্গে কথা কহিবেন। তখনকার পাণিনীয় প্রভৃতি নিবন্ধের দুরূহতা এবং সময়সাধ্যতা অবলোকন করিয়া মহারাজ শালিবাহন ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, "যিনি যত অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহাকে ব্যুৎপন্ন করিয়া দিতে পারিবেন, তাঁহাকেই তিনি সমধিক পুরস্কার প্রদান করিবেন"। আচার্য্য শর্ব্ববর্ম্মা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প সময়ের মধ্যে মহারাজকে ব্যুৎপন্ন করিয়া দিবেন এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া একখানি অভিনব ব্যাকরণ প্রণয়ন মানসে ভগবান্ কার্ত্তিকেয়ের উপাসনায় প্রবৃত্ত হন, এবং সিদ্ধিলাভ করত, কাতন্ত্র রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। অল্প সময়ের মধ্যে কাতন্ত্র রচিত ও অধ্যাপিত হইল, এবং মহারাজ শালিবাহনও লৌকিক ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

এই ত সংক্ষিপ্ত আখ্যায়িকা। ইহা দ্বারা বেশ বুঝা যায় যে, আচার্য্য শর্ব্ববর্ম্মা মহারাজ শালিবাহনকে কেবল লৌকিক ভাষায় ব্যুৎপন্ন করিবার জন্যই কাতন্ত্র বা কলাপ ব্যাকরণ রচনা করেন। সুতরাং উহাতে বৈদিকংশ বা অন্যান্য পরিত্যক্ত অংশের বিষয়ে তিনি সূত্র করেন নাই বলিয়া তাঁহার অক্ষমতা প্রতীত হয় না। বরং সংক্ষেপে সকল তত্ত্ব ও সাধনপ্রণালীর উল্লেখ এবং দিক্ প্রদর্শন করাতে তাঁহার সমধিক ক্ষমতারই পরিচয় পাওয়া যায়। যাহা হউক, আমরা আগামী সংখ্যায় তর্কালঙ্কার মহাশয়ের "কাতন্ত্রচ্ছন্দঃ প্রক্রিয়া" বা কাতন্ত্র বৈদিক পরিশিষ্টের সমালোচনা ও তৎপ্রসঙ্গে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতামত ব্যক্ত করিতে ইচ্ছুক রহিলাম। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের 'কাতন্ত্রচ্ছন্দঃ প্রক্রিয়া' 'কাতন্ত্র'কে এবং কাতন্ত্রসেবী বৈয়া

ঋষিগণ ও তাঁহার দেশবাসীকে কত গৌরবান্বিত করিয়াছে, তাহা সকলের ভাষাবিৎগণ অবগত আছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তর্কালঙ্কার মহাশয়ের এই অমূল্য ব্যাকরণখানি বেদ আলোচনারই মত সাধারণের কাছে একরূপ উপেক্ষিত অবস্থায় বর্ত্তমান আছে। অবশ্য, যাঁহারা তত্বজিজ্ঞাসু ও গবেষণাকারী, তাঁহাদের কাছে এ সকল গ্রন্থের যথেষ্ট সমাদর আছে, এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীকৃষ্ণ সিদ্ধান্তশাস্ত্রী।

প্রতিরূপা

১

শঙ্খ নদীর বুকে মোরা লহরী।
আকাশের সুখে মোরা জীবন ধরি।
হেসে হেসে কুলুকুল
এলাইয়া কালো চুল
নাহি নিতি আকাশের আমরা পরী!
ঊর্দ্ধ হইতে নামি' কিরণ-চুমে
জমিয়াছি মোরা এই ধরার বুকে,
জীবন মোদের মাখা' মধুর ঘুমে
অশ্রু ঝলকে যেন মোদের সুখে!
কানে কহে চুপি-কথা মিঠা বাতাসে,
ঊর্দ্ধে কহে জানালা খুলি তারারা হাসে!
গেয়ানী গাছেরা যত উপুড় মুখে
মাথা গুঁজি শুয়ে থাকে মোদের বুকে!

২

শঙ্খ নদীতে এই নাচে-আবেশে
বুকের আড়াল যদি কখন খসে,
যদি বা বসন ঠেলি'
তনু উঠে ঝলমলি'—
ক্ষতি কি? মোদের তাহে কি যায় আসে!
নিদাঘ স্বপন আসে আকাশ হতে
স্নিগ্ধ স্বপন-মাখা তারা-কিরণে,
ঘুমের ভিতর-পুরী জ্যোৎস্না মতে
রঙাইয়া রহে তারা হিয়া-শয়নে!
দিনে আকাশের হতে কিরণমালা
উজালে মোদের বুকে জীবন-জ্বালা,
আকাশের জীবন সে, জ্যোতি-সুরতে
জড়াইয়া রহে দেহে প্রতি পরতে!

৩

শঙ্খ নদীর বুকে ছায়া-আবাসে
মোদের জীবন-রবি নাচে ও হাসে!
ক্ষতি কি মোদের তায়—
কি মোদের আসে যায়
কেও যদি দেখে যায় দূর হতে সে?
বিশ্বভবের এই কবিতা-পুরে
ছন্দে জীবন শুধু গানের সুরে।
কটাক্ষে বাঁচি মোরা ঊর্দ্ধ হতে
জীবন মোদের গাঁথা রসের সূতে!
রসের জীবন এই কেমন ধারা!
জড়ের আড়ালে যেন ভাব-ইশারা!
অশ্রু মুরতি মাখা' হাসির পারা!
ঢাকার ভিতরে ঢাকা' হিয়ার সাড়া!

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন।

সোসিয়ালিজম্

(৩)

ইংলণ্ডীয় সোসিয়ালিজম্—(১৮১৭—১৮৫২)

রবার্ট ওয়েন্।—ওয়েল্‌সের অন্তঃপাতী মণ্টগোমারী জেলায় ১৭৭২ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডে সোসিয়ালিজমের প্রথম

প্রবর্ত্তক রবার্ট ওয়েনের (Robert Owen) জন্ম হয়। তাঁহার পিতার সাংসারিক অবস্থা তত ভাল ছিল না ; সুতরাং বাল্যকালে বিদ্যালয়ে তিনি বিশেষ শিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই। নয় বৎসর বয়সের সময়েই বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া তিনি চাকুরীর অন্বেষণে বহির্গত হন এবং অনেক স্থানে ঘুরিয়া ফিরিয়া অবশেষে ম্যাঞ্চেষ্টারে একটী কাপড়ের কলের ম্যানেজার নিযুক্ত হন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ১৯ বৎসর; কিন্তু তাঁহার অনন্যসাধারণ কার্য্যকুশলতা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রভাবে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ঐ কারখানা দেশের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বস্তুতঃ, বস্ত্রবয়ন প্রভৃতি বিষয়ে ওয়েনের সমকক্ষ লোক তৎকালে ইংলণ্ডে আর কেহ ছিল কি না সন্দেহ।

কিছু দিন পরে গ্লাসগো সহরের নিউ ল্যানার্ক মিলের (Mill) স্বত্বাধিকারী মিঃ ডেলের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ইহার পরেই তিনি ম্যাঞ্চেষ্টার ত্যাগ করিয়া, আরও কয়েক জন অংশীদারের সহিত নিউ ল্যানার্ক মিল খরিদ করিয়া সেই খানেই বসতি স্থাপন করেন। এখানেও তিনিই ম্যানেজার নিযুক্ত হন। এই কলে অন্যূন দুই হাজার মজুর কাজ করিত—তন্মধ্যে প্রায় পাঁচ শতেরও বেশী ৫।৬ বৎসরের অনধিকবয়স্ক বালকবালিকা ছিল। মিঃ ডেল্ ইহাদের সহিত বেশ ভাল ব্যবহারই করিতেন বটে, কিন্তু আশপাশের অবস্থা নিতান্ত খারাপ ছিল। মজুরদের অধিকাংশই অতি ছোট লোক শ্রেণীর ছিল ;—চুরি, মাতলামি, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি ইহাদের নিত্যকর্ম্ম ছিল। শিক্ষা প্রদান বা স্বাস্থ্যরক্ষার কোনও বন্দোবস্ত ছিল না ;—এমন কি, দুই, তিন, বা ততোধিক পরিবারকে অনেক সময়ে একই কামরাতে বাস করিতে হইত।

ম্যানেজার হইয়া ওয়েন্ প্রথমেই এই সমস্ত বিষয়ের প্রতিকারে মনোনিবেশ করিলেন। শ্রমজীবীগণের আহার ও বাস-স্থানের যথাসম্ভব সু-ব্যবস্থা করা হইল। পরিচ্ছন্নতা, মিতব্যয়িতা, শৃঙ্খলা প্রভৃতি শিক্ষা দিবার ভার ওয়েন্ নিজেই গ্রহণ করিলেন। নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবহারের জিনিস সরবরাহের জন্য একটী দোকানও খোলা হইল। এই দোকানে শ্রমজীবীগণ সামান্য কিছু লাভ দিয়াই খাঁটী ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট জিনিস পাইত। এই সমস্ত কাজে অনেক ব্যয়-বাহুল্য হইত ; অংশীদারগণ কিন্তু ইহা আদৌ পছন্দ করিতেন না। তাঁহারা ঠিক ব্যবসায়ের হিসাবে কল চালাইতে চাহিতেন। তখন ওয়েন্‌কে বাধ্য হইয়া এই কলের সহিত সংস্রব ত্যাগ করিতে হইল, এবং আরও কয়েকজন অংশীদার জুটাইয়া নিজেই একটি নূতন কলের প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই অংশীদারদের সহিত ওয়েনের বন্দোবস্ত হইল যে, তাঁহারা লাভের শতকরা পাঁচ টাকা মাত্র লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিবেন,—অবশিষ্ট টাকা ওয়েন্ নিজের ইচ্ছামত কলের ও শ্রমজীবীগণের উন্নতিকল্পে ব্যয় করিতে পারিবেন।

এইরূপে স্বাধীনতা পাইয়া ওয়েন্ স্বীয় সিদ্ধান্ত কার্য্যে পরিণত করিতে অগ্রসর হইলেন। শ্রমজীবীদের সন্তান-সন্ততিদের জন্য শীঘ্রই একটী স্কুল খোলা হইল। এই উপলক্ষেই ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রথম গ্রন্থ 'অভিনব সমাজবিধান' বা 'মানব-চরিত্রগঠনবিষয়ক প্রস্তাব' (A New View of Society ; or Essays on the Principles of the Formation of Human Character) প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে ওয়েনের শিক্ষানীতি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলেন যে, চরিত্রগঠনবিষয়ে মানুষের নিজের কোনও হাত নাই ; ছোট বেলা হইতে সে যেরূপ শিক্ষা পায় ও আশপাশের যেরূপ অবস্থার মধ্যে থাকে, তাহার চরিত্রও ঠিক সেইরূপই হইয়া উঠে। সুতরাং সন্তানসন্ততিগণের চরিত্র গঠন করিতে হইলে, বাল্যকাল হইতেই উপযুক্ত শিক্ষা ও অনুকূল প্রতিবেশসংস্থানের বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। ইহা না করিয়া শেষে কাহাকেও

অসচ্চরিত্রতার জন্য দোষ দেওয়া কথনই উচিত নহে। শিক্ষাবিষয়ক এই নীতি যে ওয়েনের মৌলিক উদ্ভাবন তাহা বলা যায় না। তাঁহার পূর্ব্বেও অনেকে এ বিষয়ে নানা মতামত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তবে তিনিই ইহা সর্ব্বপ্রথম জাতীয় হিসাবে কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন। ইহাতেই ওয়েনের কৃতিত্ব। ওয়েন্ মনে করিতেন যে উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হইলেই, লোকের সামাজিক, আর্থিক প্রভৃতি সকল সমস্যার সমাধান হইবে। তিনি বলিতেন যে, দেশের বর্ত্তমান বালকবালিকাগণকে যথোচিত শিক্ষা প্রদান করিলে, বড় হইয়া তাহারা তাহাদের সন্তান-সন্ততিদিগকে শিক্ষা প্রদান করিবে এবং এইরূপে ক্রমে ক্রমে একটী সম্পূর্ণ 'নূতন নৈতিক জগতের' (The New Moral World) সৃষ্টি হইবে। সংক্ষেপে ইহাই ওয়েনের শিক্ষানীতি।

এই উপলক্ষে গ্রেট ব্রিটেনে, অপিচ ইউরোপের সর্ব্বত্র ওয়েনের নাম প্রচারিত হইয়া পড়িল। তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী লর্ড লিভারপুল (Lord Liverpool) প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের সহিত সর্ব্বদাই তাঁহার এ সম্বন্ধে পত্রালাপ ও দেখা-সাক্ষাৎ চলিত। এমন কি, রুশিয়ার সম্রাট নিকোলাসও (Nicholas I) তাঁহার প্রতিষ্ঠিত স্কুল ও কারখানা পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। ওয়েনের তত্ত্বাবধানে তৎপ্রতিষ্ঠিত স্কুলের ছাত্রদের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার প্রভৃতির অভূতপূর্ব্ব উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। অসচ্চরিত্রতা, চুরি, মাতলামী প্রভৃতি ইহাদের মধ্যে ছিল না বলিলেই হয়। মজুরদের স্বাস্থ্যও যেমন ভাল ছিল, সুখসন্তোষও তেমনি প্রচুর পরিমাণেই ছিল। ওয়েনের দৃষ্টান্তে সকলেই মিতব্যয়ী হইতে শিখিয়াছিল। ইহাতে কারখানার কাজও যেমন সুচারুরূপে চলিত, মোটের উপর লাভের পরিমাণও সেইরূপ বেশী হইত।

ওয়েনের কার্য্য কলাপের এই বিবরণ হইতে তাঁহার লোকহিতৈষিণী প্রবৃত্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গেলেও, ইহাতে সোসিয়ালিজমের কোনও চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয় না। এই সময়ে ঘটনাচক্রে তিনি স্বীয় মতের যে ব্যাখ্যা প্রদান করেন, তাহাতেই তাঁহার সোসিয়ালিজম্ তন্ত্রের প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহাকে ও তৎপ্রবর্ত্তিত সোসিয়ালিজম্-বাদ বুঝিতে হইলে, তাঁহার সমসাময়িক ও অব্যবহিতপূর্ব্ববর্ত্তী কালের ইংলণ্ডের সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক অবস্থার স্থূল বিবরণগুলি অবগত থাকা বিশেষ আবশ্যক।

রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময় হইতে ইংলণ্ডে যে বাণিজ্যনীতি অনুসৃত হইয়া আসিতেছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে তাহার পূর্ণপরিণতি সাধিত হয়। এই সময়ে ইংরাজজাতি বাণিজ্যব্যপদেশে এসিয়া ও আমেরিকায় বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়া বসে এবং সমস্ত পৃথিবীর সরবরাহকার হইয়া পড়ে। শিল্পবাণিজ্য প্রভৃতি যখন সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, তখন কুটীরশিল্প দ্বারাই সমস্ত চলিত। কিন্তু এক্ষণে পৃথিবীশুদ্ধ লোক খরিদ্দার হওয়ায়, প্রভূত মূলধন ও বিস্তৃত কলকারখানা দ্বারা প্রচুর পরিমাণে বাণিজ্যদ্রব্য উৎপন্ন করার প্রয়োজন উপস্থিত হইল। এই প্রয়োজনের পরিণামেই ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লব ও কৃষিবিপ্লবের আবির্ভাব হয়। অল্প মূলধনে পরিচালিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারবারের পরিবর্ত্তে চারিদিকে প্রভূতমূলধন যোগে বিস্তৃত কারখানার প্রতিষ্ঠা ও নিত্য নূতন কলের উদ্ভাবন হইতে লাগিল। কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃততর হইয়া পড়াতে মূলধনের পরিমাণও যেমন বেশী হইল, ব্যবসায়ীদের মধ্যে তেমনি তীব্র প্রতিযোগিতাও উপস্থিত হইল।

পূর্ব্বে যখন কুটীর-শিল্পাদির প্রচলন ছিল, তখন সমাজের সমস্ত কাজই কতকগুলি বাঁধাবাঁধি সামাজিক নিয়মে পরিচালিত হইত। মজুর ও মুনীবে কোনও গোলমাল উপস্থিত হইলে, স্থানীয় বিচারকই প্রধান প্রধান ব্যক্তির সহিত পরামর্শপূর্ব্বক উহার মীমাংসা করিয়া দিতেন। যখন কর্ম্মক্ষেত্র সংকীর্ণ ছিল, তখন এইরূপ ব্যবস্থায় সমাজের সকল লোকের সুবিধা অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখা সম্ভবপর ছিল। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্র যখন পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িল, তখন সকলের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখিয়া ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি করা

এক্ষরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। যাঁহারা বৈদেশিক বাণিজ্যাদি ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন, তাঁহারা এই সমস্ত প্রাচীন আইনকানুন উঠাইয়া দিয়া যাহাতে স্বাধীনভাবে কাজকর্ম্ম করিতে পারেন, তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই প্রচেষ্টারই অভিব্যক্তিস্বরূপ ১৭৭৬ খৃঃ অব্দে আডাম স্মিথের (Adam Smith) "জাতীয় সম্পদ" (The Wealth of Nations) নামক যুগ-প্রবর্ত্তক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে এডাম স্মিথ 'স্বচ্ছন্দানুবর্ত্তন-নীতি' (Laisser-faire) ও 'চুক্তি-স্বাধীনতার' (Freedom of Contract) মহিমা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। আডাম স্মিথ বলেন যে সকলেই যদি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে স্ব স্ব স্বার্থের অনুসরণ করিতে পারে, তাহা হইলে পরিণামে তদ্দারা সমগ্র জাতিরই মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে। তিনি আরও বলেন যে, লোকে ইচ্ছাপূর্ব্বক যে চুক্তি করিবে, যাহাতে সেই চুক্তি সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালিত হয়, তজ্জন্য আইনানুসারে তাহাকে বাধ্য করা উচিত। কেন না, তাহা না হইলে, বড় বড় কারবার আদৌ চলিতে পারে না।

আডাম স্মিথ অবশ্য ধনী-নির্ধন সকলের জন্যই এই নীতির প্রচার করেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে তাহার সদুদ্দেশ্য হইতে নির্ধন শ্রেণী পক্ষে বিষময় ফল প্রসূত হইল। নিত্য নূতন কলকারখানা স্থাপিত হওয়াতে, এবং জমীদার ও মহাজনগণ গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে প্রজাদের জোতজমী কিনিয়া লওয়াতে, কৃষক ও হস্তশিল্পিগণ জীবিকানির্ব্বাহের সনাতন পন্থা হারাইয়া, উদরের জ্বালায় দলে দলে কলকারখানার মজুরবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইল। মজুরের সংখ্যা প্রয়োজনাতিরিক্তভাবে বাড়িয়া যাওয়াতে, মজুরীর হারও সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত কমিয়া গেল। কলকারখানার অধিস্বামীগণ ইহাদের দুঃখদুর্দ্দশার প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি না করিয়া, শুধু নিজেদের অর্থাগমের প্রতিই মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহারা মনে করিতেন যে, যতদূর সম্ভব কম মজুরী দিয়া যত অধিক পারা যায় কাজ আদায় করিতে পারিলেই তাঁহাদের লাভ হইবে। স্বজাতি ও স্বদেশবাসী মজুরদের প্রতি তাঁহাদের যে কোনও প্রকার নৈতিক দায়িত্ব থাকিতে পারে, ইহা তাঁহারা কল্পনাও করিতে পারিলেন না।

এই সময়ে দেশের শাসন-সংরক্ষণাদি বিষয়ক রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রধানতঃ জমীদারদের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। কিন্তু জমীদারদের অবস্থা তাদৃশ স্বচ্ছল ছিল না। সাবেক সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি বজায় রাখিবার জন্য অনেককেই এই নূতন ধনী সম্প্রদায়ের নিকট শরণাপন্ন হইতে হইত। জমীদারের সাহায্যে আইন-কানুনাদির পরিবর্ত্তন করিয়া ব্যবসাবাণিজ্যের সুবিধা করিয়া লইবার জন্য ইঁহারাও জমীদারদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। ফলে, নামে না হইলেও কার্য্যকলাপে ইঁহারাই দেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী হইয়া দাঁড়াইলেন, এবং মজুরদিগকে যেরূপ ইচ্ছা সেই ভাবেই খাটাইয়া লইতে লাগিলেন। জমীদার-পরিচালিত গবর্ণমেণ্ট দরিদ্র শ্রমজীবীগণের করুণ আর্ত্তনাদে কিছুমাত্র কর্ণপাত না করিয়া, একেবারে ধ্যানস্তিমিত-নেত্র যোগীর মত নীরব নিস্পন্দ হইয়া রহিল। এই সময়ে ফরাসীবিপ্লব, ও তৎপরে নেপোলিয়নের সহিত সমগ্র ইউরোপের তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া উঠাতে, ইউরোপে সর্ব্বত্র ইংলণ্ডের শ্রমশিল্পের আদর যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িল বটে, কিন্তু ইহাতে শ্রমজীবীগণের অবস্থা ভাল না হইয়া আরও খারাপ হইল। ইংলণ্ডের শাসনকর্ত্তাগণ তখন সর্ব্বত্রই ফরাসী-বিপ্লবের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। তাঁহারা মনে করিতেন যে, শ্রমজীবীসম্প্রদায়ই যত অনর্থের মূল; ইহারাই ফ্রান্সে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়াছে, এবং ইহাদিগকে দমনে রাখিতে না পারিলে, ইংলণ্ডেও প্রজাবিদ্রোহ উপস্থিত হইবে। এই আতঙ্কের ফলেই ১৭৯৯ ও ১৮০০ খৃঃ অব্দের Combination Act বা 'জোটবন্দির' বিরুদ্ধে আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই আইন দ্বারা নিয়ম করা হয় যে মজুরী বৃদ্ধি বা অন্য উপায়ে শিল্পবাণিজ্যের প্রতি হস্তক্ষেপ করিবার জন্য দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একত্র সম্মিলিত হইলে, তাহাদিগকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে।

এই আইন পাশ হওয়াতে শ্রমজীবীদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িল। আদালতের দ্বারও তাহাদের পক্ষে

বন্ধ হইয়া গেল। ফ্রান্সিস্ প্লেস্ (Francis Place) বলেন যে,ইহারা যে শুধু আদালতেই সুবিচার পাইত না কেবল তাহা নহে ; পরন্তু, রায় প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই বিচারকগণ ইহাদিগকে নিরতিশয় লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিতেও ছাড়িতেন না। সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক জেফ্রী (Jeffrey) বলেন যে কলকারখানার মালিকগণ হাজারে হাজারে শ্রমজীবীগণকে মুহূর্ত্তমধ্যে ছাড়াইয়া দিলেও তাহাদের কোনই দোষ হইত না, কিন্তু শ্রমজীবীগণ মূলধনীদের প্রদত্ত যৎসামান্য মজুরী গ্রহণে অসম্মত হইলে, আইনানুসারে তাহাদের দণ্ড হইত।

এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পরেই চারিদিক হইতে শ্রমজীবীগণের বিরুদ্ধে সত্যমিথ্যা নানাবিধ অভিযোগ উপস্থিত হইতে লাগিল। ১৮১০ খৃঃ অব্দে সুপ্রসিদ্ধ টাইম্স্ পত্রিকার কতিপয় কর্ম্মচারী ধর্ম্মঘট করায়, পুলিশের প্রধান কর্ম্মচারী সার্ জন্ সিল্ভেষ্টারের (Sir John Sylvester) বিচারে তাহারা কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। এই বিচারের ফলে জনসাধারণের নিকট তিনি অতঃপর 'রক্ত-পিপাসু বর্ব্বর জ্যাক্' (The Bloody Black Jack) আখ্যা প্রাপ্ত হন।

আইনানুসারে অবশ্য শ্রমজীবী ও নিয়োগকর্ত্তাগণ—সকলেরই জোটবদ্ধ হওয়া নিষেধ ছিল। কিন্তু নিয়োগকর্ত্তাগণই তখন দেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। সুতরাং তাহাদের কার্য্যে বাধা দিবার কেহই ছিল না। জোটবদ্ধ হওয়ার অপরাধে শ্রমজীবিগণ দলে দলে দণ্ডিত হইতে লাগিল বটে, কিন্তু নিয়োগকর্ত্তাগণ এক সমিতি গঠন করিয়া স্থির করিলেন যে, অতঃপর কেহই শ্রমজীবিগণকে নির্দ্ধারিত মজুরীর বেশী দিতে পারিবে না।

১৮১৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এইরূপই চলিতে লাগিল। ঐ সালে নেপোলিয়ানের সহিত যুদ্ধের অবসান হয়। ইহাতে ইউরোপে শান্তি স্থাপিত হইল বটে, কিন্তু ইংলণ্ডের শ্রম-শিল্পের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িল। যুদ্ধের সময়ে ইউরোপের সকল দেশকেই প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহের জন্য ইংলণ্ডের উপর নির্ভর করিতে হইত। কিন্তু এক্ষণে ঐ সমস্ত দেশে ব্যবসাবাণিজ্যাদির পুনঃ প্রতিষ্ঠা হওয়াতে ইংলণ্ডীয় মালের কাটতি একেবারে কমিয়া গেল। কলকারখানার মালিকগণ তখন শ্রমজীবিগণের মজুরী কমাইয়া দিতে বাধ্য হইলেন। কোনওরূপে উদরান্নের সংস্থান করিতে না পারিয়া চারিদিকে শ্রমজীবিগণ বিষম গোলমাল উপস্থিত করিতে লাগিল। তখন কর্ত্তৃপক্ষ ব্যবস্থা করিলেন, কলকারখানার মালিকগণ বেশী মজুরী দিবেন না, তবে দরকার হইলে, পল্লী-সমিতি (Parish) প্রভৃতি হইতে দুঃস্থ লোকদিগকে যথাসাধ্য অর্থসাহায্য করা যাইবে। কিন্তু দারিদ্র্য যেরূপ বহুব্যাপক ও গভীর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে এই ব্যবস্থাতে বিশেষ কোনই ফল হইল না। তখন একটী নূতন 'দরিদ্র আইন' (Poor Law) প্রবর্ত্তনের জন্য পার্লামেণ্টে আন্দোলন আলোচনা চলিতে লাগিল; এবং এই উপলক্ষে রবার্ট ওয়েন্ পার্লামেণ্টের জনসাধারণের সভায় এক মন্তব্য দাখিল করেন। এই মন্তব্যেই আমরা সর্ব্বপ্রথম তাঁহার সোসিয়ালিজম্ মতবাদের পরিচয় পাই।

এই মন্তব্যে ওয়েন্ বলেন যে নেপোলিয়ানের সঙ্গে ইউরোপের যুদ্ধবিগ্রহাদি শ্রমজীবীগণের বর্ত্তমান দুঃখদুর্দ্দশার অন্যতম কারণ সন্দেহ নাই;—কিন্তু উহা একমাত্র বা মুখ্য কারণ নহে। কলকারখানার শক্তি ও মানুষের শ্রমশক্তির অবাধ প্রতিযোগিতাই ইহার প্রধান কারণ। এই প্রতিযোগিতা বিদূরিত করিতে না পারিলে, সমাজে পুনরায় শান্তি ও সমতার প্রতিষ্ঠা একেবারে অসম্ভব। এজন্য শ্রমজীবিগণকে সমবেত ভাবে কাজ করিতে শিক্ষা দিতে হইবে, এবং যাহাতে তাহারা কলকারখানার অধীন না হইয়া বরং কলকারখানাই তাহাদের অধীন হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ওয়েন্ বলেন যে যতদিন ইহা করিতে পারা না যাইবে, ততদিন দেশের বারো আনারও বেশী লোকের দুঃখদারিদ্র্য ঘুচিবে না।

ওয়েন্ শুধু উপায় নির্দ্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই—পরন্তু কি ভাবে উহা কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধেও একটা খসড়া প্রস্তাব দাখিল করিয়াছিলেন। ফুরিয়ের ন্যায় তিনিও বলেন যে আজকাল সমাজে লোকসংখ্যার একটা কোনও নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। কিন্তু অতঃপর এক হাজার হইতে দেড়

হাজার পর্য্যন্ত লোক লইয়া এক একটী সমাজ বা সংঘ গঠিত করিতে হইবে। প্রত্যেক সংঘের ব্যবহারের জন্য ১০০০ বা ১৫০০ একর জমি থাকিবে। (১ একর = তিন বিঘা অর্দ্ধ কাঠা)। সংঘভুক্ত লোকদের জন্য পৃথক পৃথক ঘরবাড়ীর বন্দোবস্ত থাকিবে না। সকলের জন্য একটী মাত্র প্রকাণ্ড বাড়ী নির্ম্মিত হইবে। রন্ধনাদিকার্য্য ও আহার সকলকে একসঙ্গে করিতে হইবে। তবে প্রত্যেক পরিবারের জন্য স্বতন্ত্র কামরা নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। তিন বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বালকবালিকাগণ পিতামাতাকর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইবে। কিন্তু তৎপরে সংঘকর্ত্তৃক উহাদের তত্ত্বাবধানের ভার গৃহীত হইবে। অবশ্য, আহারের সময়ে ও প্রয়োজনমত অন্য সময়েও পিতামাতা সন্তানদের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিতে পারিবে। কোনও ব্যক্তিবিশেষ বা স্বয়ং গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এইরূপ সংঘ স্থাপিত হইতে পারিবে, কিন্তু সর্ব্বত্রই উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিয়া যথোচিত তদ্বির তদারকের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ওয়েন্ বলিতেন যে ক্রমে ক্রমে এই সমস্ত সংঘ পরস্পর সম্মিলিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া অবশেষে পৃথিবীময় একটী বিরাট সংঘের সৃষ্টি করিবে।

টাইম্‌স্, মর্ণিংপোষ্ট প্রভৃতি প্রধান প্রধান সংবাদপত্র ও মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পিতা ডিউক্ অব কেণ্ট্ (Duke of Kent) প্রমুখ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ ওয়েনের মতের সমর্থন করেন। কিন্তু এই সময়ে হঠাৎ একদিন কোনও প্রকাশ্য সভাতে প্রচলিত খ্রীষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধে একটী বক্তৃতা করাতে দেশশুদ্ধ লোক তাঁহার উপর চটিয়া যায়, এবং ইহার ফলে তাঁহার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। ওয়েন্ কিন্তু কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইবার লোক ছিলেন না। ১৮২৫ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার প্রধান শিষ্য এব্রাম ক্রম্বি (Abram Crombe) ইংলণ্ডে একটী আদর্শ সংঘ স্থাপন করেন এবং ওয়েন্ নিজেও আমেরিকার নিউ হার্ম্মনি (New Harmony) নামক স্থানে আর একটী সংঘ স্থাপন করেন। কিছুদিন উভয়ের কাজই বেশ চলিয়াছিল,—কিন্তু দুই বৎসর পরে দুইটিই উঠিয়া যায়।

এই সময়ে তাঁহার অংশীদারগণের সহিত মনোমালিন্য উপস্থিত হওয়ায়, তিনি নিউ ল্যানার্ক মিলের সহিত সকল সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া ১৮২৮ খ্রীঃ অব্দে লণ্ডনে উঠিয়া আসেন। নিউ হার্ম্মনীর সংঘ-পরীক্ষাতেই তাঁহার সকল অর্থ নিঃশেষিত হওয়াতে, অতঃপর তিনি আর কোনও পরীক্ষা-কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিয়া, স্বীয় মতের প্রচারের জন্য একটী বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি করিতে মনোনিবেশ করেন।

শ্রমজীবীগণের অবস্থা সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্টই অনুমিত হইবে যে তদ্রূপ অবস্থা আর বেশী দিন স্থায়ী হইতে পারিত না। বস্তুতঃ, শীঘ্রই ইহার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়। ফ্রান্সিস্ প্লেস্ (Francis Place), হিউম্ প্রভৃতি সহৃদয় ব্যক্তিগণ শ্রমজীবীসম্প্রদায়ের দুর্দ্দশা দর্শনে ব্যথিত-চিত্ত হইয়া প্রতিকারকল্পে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কলকারখানার মালিকেরা যেরূপ ক্ষমতাশালী হইয়াছিল, তাহাতে তাহাদের করাল কবল হইতে শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের উদ্ধার-সাধন বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। তথাপি ইঁহাদের অক্লান্ত চেষ্টায় ১৮২৫ সালে পার্লামেণ্ট মহাসভায় একটী আইন বিধিবদ্ধ হয়। এতদ্দ্বারা প্রাগুক্ত ১৮০০ খ্রীঃ অব্দের 'জোটবন্দি আইনের' কড়াকড়ি অনেকটা কমাইয়া দেওয়া হয়। নিয়ম করা হয় যে কোনওরূপ শান্তিভঙ্গের বা বলপূর্ব্বক কাহাকেও স্ব-মতে আনয়নের চেষ্টা না করিয়া, শুধু মজুরী প্রভৃতির নির্দ্ধারণের জন্য শ্রমজীবীগণ পরস্পর মিলিত হইতে পারিবে; তজ্জন্য তাহাদিগকে দণ্ডনীয় হইতে হইবে না।

এই আইন দ্বারা মজুরদের অবস্থার বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন সাধিত না হইলেও, ইহার নৈতিক ফল বড় কম হয় নাই। শ্রমজীবীগণের আন্দোলন বাস্তবিক ন্যায়ানুমোদিত কি না এ সম্বন্ধেই এত দিন অনেকের মনে বিশেষ সন্দেহ ছিল। এক্ষণে সে সন্দেহ দূর হইল। তাহারা বুঝিতে পারিল যে, একবার যখন আন্দোলন করিয়া পার্লামেণ্ট হইতে কিছু আদায় করা গিয়াছে, তখন আরও কিছুদিন এই আন্দোলন চালাইলে, হয়ত আরও বিস্তৃততর অধিকার পাওয়া যাইবে। মূলধনীসম্প্রদায়ই যে তাহাদের পরম শত্রু, এতদুপ-

...ফলে এই ধারণাও তাহাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া গেল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে জমীদার ও অভিজাতবর্গই এ সময়ে শাসন-সংরক্ষণাদি সমুদয় ক্ষমতার পরিচালনা করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের দিন শেষ হইয়া আসিয়াছিল। ধনে, জ্ঞানে, ...কার্য্যতৎপরতায় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় অর্থাৎ মূলধনী-গণই এক্ষণে দেশের মধ্যে প্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু তথাপি ইঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার রাজনৈতিক-ক্ষমতাহীন করিয়া রাখিতে জমীদারগণ চেষ্টার কিছুমাত্র ক্রটী করেন নাই। কিন্তু শেষ রক্ষা করা তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইল না। ১৮৩২ খৃঃ অব্দে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে বিস্তৃততর রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রদান করিতেই হইল।

ইংলণ্ডের ইতিহাসে ১৮৩২ খৃঃ অব্দ অতি স্মরণীয় বৎসর। ঐ সালে পার্লামেণ্টের সাধারণ সভায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

পার্লামেণ্টের সংস্কার দ্বারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভাব অসুবিধা অনেকটা দূরীভূত হইল বটে, কিন্তু ইহাতে শ্রমজীবী-সম্প্রদায়ের কোনই লাভ হইল না। তাহারা আশা করিয়াছিল যে, এতদুপলক্ষে তাহারাও পার্লামেণ্টের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন-কার্য্যে ভোট দিবার অধিকার প্রাপ্ত হইবে। তাহাদের সে আশা পূর্ণ তো হইলই না; বরং রক্ষকের আসনে ভক্ষকসম্প্রদায়কে উপবিষ্ট দেখিয়া তাহাদের হৃদয়ে বিষম আতঙ্কের উদয় হইল। ১৮৩২ খৃঃ অব্দের 'সংস্কার আইন' (Reform Bill) বিধিবদ্ধ হইবার পুর্ব্বে রাজনৈতিক হিসাবে তাহারা ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রায় সমাবস্থ ছিল। কিন্তু এক্ষণে মধ্যবিত্ত শ্রেণী একটা স্বতন্ত্র ক্ষমতাশালী সম্প্রদায়ে পরিণত হইল। ইহাতে শ্রমজীবী সম্প্রদায় আপনাদের অবস্থার শোচনীয়তা হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতে লাগিল। তাহারা বেশ বুঝিতে পারিল যে রাজনৈতিক অধিকার না পাইলে, তাহাদের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন আদৌ সম্ভবপর হইবে না।

এই সময়ে উপযুক্ত সুযোগ বুঝিয়া রবার্ট ওয়েন্ আবার পুনরুদ্যমে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। যাহাতে শ্রমজীবী-মাত্রেই উপযুক্ত মজুরী পায়, কাহাকেও 'বেকার' অবস্থায় বসিয়া থাকিতে বা প্রাণান্তকর পরিশ্রম করিতে না হয়, তজ্জন্য আন্দোলন করিবার জন্য তিনি শ্রমজীবীসম্প্রদায়কে যথাসাধ্য উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। তিনি শ্রমজীবী-গণকে স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিলেন যে এই সমস্ত অধিকার লাভ করিতে হইলে, তাহাদিগকে সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করিতে হইবে;—বিচ্ছিন্ন শক্তিপ্রয়োগে কোনই ফল লাভ হইবে না। শ্রমজীবীগণের সমুদয় শক্তি কেন্দ্রীকৃত করিবার অভিপ্রায়ে ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে তিনি "সর্ব্ব-জাতি-বর্ণ-সমবায়-সমিতি" (The Association of All Classes of All Nations) নামে একটী সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই সূত্রেই সোসিয়ালিজম্ শব্দের প্রথম ব্যবহার হয়।

দ্রব্যের মূল্য সম্বন্ধে ওয়েন্ এক সম্পূর্ণ অভিনব মতের প্রচার করেন। তিনি বলেন যে, শ্রমের পরিমাণ দ্বারাই দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। যে জিনিস তৈয়ারী করিতে যত অধিক সময়ব্যাপী পরিশ্রমের আবশ্যক, তাহার মূল্যও তত অধিক হওয়া উচিত। এক্ষণে দ্রব্যবিনিময়ের জন্য মুদ্রার প্রচলন আছে; ভবিষ্যতে তাহা উঠাইয়া দিয়া শ্রমের পরিমাণানুসারে দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারিত করিতে হইবে। নতুবা শ্রমজীবীগণের প্রতি ন্যায়-বিচার করা হইবে না। এই প্রথা 'শ্রম-বিনিময়-প্রথা' (Labour Exchange বা Labour Notes) নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

ইহার কিছুপূর্ব্বে প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ্ ম্যাল্থাসের (Malthus) জনসংখ্যা-বিষয়ক প্রসিদ্ধ পুস্তক (Theory of Population) প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে ম্যাল্থাস্ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে পৃথিবীর ধন ও স্থানের পরিমাণের তুলনায় জনসংখ্যা অত্যধিক ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে—এমন কি শীঘ্রই স্থানাভাব ও ধনাভাববশতঃ মানুষকে বিষম বিব্রত হইতে হইবে। অতএব যাহাতে লোকসংখ্যা আর বাড়িতে না পারে, সকলেরই সে বিষয়ে চেষ্টা করা উচিত।

রবার্ট ওয়েন্ এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে দেশবিশেষে লোকসংখ্যার আধিক্য উপস্থিত হইলেও,

পৃথিবীর অনেক স্থান এখন পর্য্যন্তও জনশূন্য অবস্থাতেই পড়িয়া রহিয়াছে। সুতরাং জনসংখ্যাবৃদ্ধির পরিমাণ না কমাইয়া, বরং যাহাতে প্রয়োজনাতিরিক্ত লোকসমূহ জনশূন্য স্থানে যাইয়া বসবাস আরম্ভ করে, তাহার ব্যবস্থা করাই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। তিনি আরও বলেন যে পৃথিবীর ধনের পরিমাণও কিছুমাত্র কমে নাই—বরং নিত্য নূতন কলকারখানাদির সৃষ্টি হওয়াতে বহুশতগুণ বাড়িয়াই গিয়াছে।

সংক্ষেপে ইহাই ওয়েনের সোসিয়ালিজম্-বাদ। ইহাতে অনেক ভুল-ভ্রান্তি, অনেক অসম্পূর্ণতা আছে সন্দেহ নাই; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে এ বিষয়ে ওয়েন্ই প্রথম প্রবর্ত্তক ও প্রথম প্রবর্ত্তকের ভুলভ্রান্তি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ওয়েনের মতগুলি ঠিক অবিকলভাবে কার্য্যে পরিণত হইয়াছে কি না, তাহা দেখিয়া তাঁহার স্থান নির্দ্দেশ করিতে চাহিলে চলিবে না;—দেখিতে হইবে শ্রমজীবী-সম্প্রদায় তৎকর্ত্তৃক কি ভাবে প্রণোদিত হইয়াছিল। এই হিসাবে দেখিতে গেলে নিঃসন্দেহে বলিতে হয় যে ওয়েনের চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে; ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে তিনি যে অগ্নি প্রজ্বলিত করেন, আজও তাহা কিছুমাত্র ম্লান না হইয়া, বরং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হইতেছে।

সোসিয়ালিজমের প্রবর্ত্তন ছাড়া ওয়েন্ আরও অনেক কাজ করিয়াছিলেন। তিনিই ইংলণ্ডে শিশু-বিদ্যালয়ের প্রথম স্থাপয়িতা; তাঁহার চেষ্টাতেই প্রথম কারখানা-আইন (Factory laws) বিধিবদ্ধ হয়। তিনিই চেষ্টা করিয়া শ্রমজীবীগণের দৈনিক কার্য্যের সময় কিছু কমাইয়া দেন। আজ যে আমরা চারিদিকেই সমবায়-সমিতি (Co-operative Societies) দেখিতে পাইতেছি, ইহার মধ্যেও রবার্ট ওয়েন্‌কেই দেখিতে পাই,—তিনিই সর্ব্বপ্রথম এই আন্দোলনের সূত্রপাত করেন।

নানা কারণেই তাঁহার প্রস্তাবিত সোসিয়ালিজম্-বাদ কার্য্যে পরিণত করা সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার চেষ্টা কিছুমাত্র বিফল হয় নাই। তদীয় মতবাদেরই অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ ইংলণ্ডে চার্টিজমের (Chartism) আবির্ভাব হয়।

চার্টিজম্ (Chartism)—রবার্ট ওয়েনের চেষ্টার বিফলতা হইতেই চার্টিজম্ বা 'সনন্দ-আন্দোলনের' উৎপত্তি হয়। শ্রমজীবীগণ স্পষ্টই বুঝিতে পারিল যে যেমন করিয়াই হউক, রাজনৈতিক অধিকার লাভ করিতে না পারিলে তাহারা কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারিবে না। চার্টিজমের মূলে আমরা এই ধারণাই দেখিতে পাই। সনন্দ-প্রার্থীগণ প্রধানতঃ ৪টী বিষয়ে অধিকার পাইবার জন্য পার্লামেণ্ট হইতে সনন্দের দাবী করে—(১) প্রাপ্ত-বয়স্ক পুরুষমাত্রকেই পার্লামেণ্টের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে ভোট দিবার অধিকার দিতে হইবে। (২) প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের জন্য সমগ্র গ্রেট ব্রিটেনকে কতিপয় সমায়তন জেলায় ভাগ করিতে হইবে। (৩) "ব্যালট" (Ballot) দ্বারা ভোট গ্রহণ করিতে হইবে। (৪) পার্লামেণ্টের মেম্বরগণকে বেতন দিতে হইবে।

বাহ্য দৃষ্টিতে চার্টিজম্‌কে খাঁটী রাজনৈতিক আন্দোলন বলিয়াই বোধ হইবে। কিন্তু ইহার উৎপত্তির বিবরণ ও উদ্দেশ্যের দিকে প্রণিধান করিলে দেখা যাইবে যে ইহা মূলতঃ অর্থনৈতিক ব্যাপার মাত্র;—রাজনৈতিক অধিকার না পাইলে, সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা যাইবে না, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই চার্টিষ্টগণ প্রাগুক্ত রাজনৈতিক সনন্দ পাইবার জন্য দাবী উপস্থিত করে। শুধু বিনীত আবেদন নিবেদনে মূলধনী-সম্প্রদায়কর্ত্তৃক অধিকৃত পার্লামেণ্টের নিকট হইতে কোনও অধিকার আদায় করা যাইবে না সিদ্ধান্ত করিয়া, চার্টিষ্টগণ চারিদিকে ধর্ম্মঘট প্রভৃতি অশান্তির সৃষ্টি করিতে প্রয়াসী হয়। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। ১৮৪৮ খ্রীঃ অব্দে চার্টিষ্টগণ শেষ আন্দোলন উপস্থিত করে। তাহাতে অকৃতকার্য্য হওয়ায় এই আন্দোলন ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইয়া যায়। ১৮৪৮ খৃঃ অব্দের পর এ সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছুই শোনা যায় নাই।

খৃষ্টান্ সোসিয়ালিজম্ (Christian Socialism)—চার্টিজমের পরেই খৃষ্টান্ সোসিয়ালিজমের আবির্ভাব হয়। মরিস্ (Maurice) কিংস্‌লি (Kingsley)

এবং লাড্‌লো (Ludlow) এই সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন। শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের দুঃখ-দুর্দ্দশা ও বৃথা আন্দোলন দেখিয়া মরিস্ প্রভৃতির মনে করুণার সঞ্চার হয়। এই সময়ে (১৮৪৯ খৃঃ অব্দে) মর্ণিং ক্রণিকল্ (The Morning Chronicle) নামক পত্রে লণ্ডন সহরের দরিদ্র শ্রমজীবীগণের দুরবস্থার বর্ণনাসম্বলিত কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই সমস্ত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া মরিস্ প্রভৃতি শ্রমজীবী ও দুঃস্থ লোকদের আর্থিক, সামাজিক, ও নৈতিক অবস্থার উন্নতি-সাধনের জন্য সচেষ্ট হন। ইহার পূর্ব্বেই লাড্‌লো কিছুদিনের জন্য ফ্রান্সে গিয়াছিলেন এবং সেখানে ফুরিয়ে, প্রুধোঁ প্রভৃতির সোসিয়ালিজ্‌ম্ মত বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেন। এক্ষণে ইংলণ্ডে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া লাড্‌লো এই সমস্ত মত কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন।

খৃষ্টান্ সোসিয়ালিষ্টগণ বলেন যে ধর্ম্মের ও নীতির বন্ধন না থাকিলে সমাজে শান্তি, সাম্য বা শৃঙ্খলা থাকিতে পারে না। এক্ষণে অর্থের মোহে এই বন্ধন নিতান্ত শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং খৃষ্টধর্ম্মের মূলতত্ত্বের পুনঃ প্রচার নিতান্ত আবশ্যক।

কিংস্‌লি বলেন যে ম্যাঞ্চেষ্টারের কলকারখানাসমূহের মালিক ও শক্তিশালী মূলধনী সম্প্রদায় শুধু আপনাদের লাভের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য (Individualism) ও অবাধ প্রতিযোগিতার উপকারিতা ঘোষণা করেন। ইহাতে তাঁহাদের ব্যক্তিগত লাভ যথেষ্ট হইলেও, দেশের অধিকাংশ লোকেরই সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে। সুতরাং এই 'ম্যাঞ্চেষ্টার-নীতিই'—(Manchesterism) যত অনর্থের মূল। সমবেত শক্তির প্রয়োগে এই নীতির ধ্বংস সাধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

কিংস্‌লি-প্রণীত ইয়াষ্ট্ (Yeast) এবং অ্যাল্‌টন্ লক্ (Alton Locke) নামক দুইখানি অতি প্রসিদ্ধ উপন্যাসে খৃষ্টান্ সোসিয়ালিজ্‌ম্-বাদীগণের তৎকালীন মত অতি সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু এই আন্দোলনে শ্রমজীবীগণের আশু বিশেষ কোনও উপকার হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না।

শ্রীমন্মথনাথ মজুমদার।

দীপান্বিতা

সান্ধ্য-অন্ধকার ঘন ভেদিয়া নীরবে
হাসিছে উজল কিবা অযুত দেউটী,
হাসে যথা গাঢ় নীল আকাশের গায়
উদ্ভাসিয়া দশ দিক্ নক্ষত্রের কোটি।
ভূ-স্বর্গের নৈশ শোভা করি নিরীখন
লাজে আজি তারারাজি রাজে না তেমন।
গোষ্ঠে, বাটে, মাঠে, ঘাটে, প্রাসাদের গায়,
কুটীরপ্রাঙ্গনে, পথে, দেবতা-মন্দিরে,
প্রদীপের সারি শোভে বনে, উপবনে,—
পারিজাত—মালা যেন নন্দন কাননে।
মহোল্লাসে নিমগন বালকের দল
হর্ষবিস্ফারিত নেত্রে নেহারে সুষমা—
দেউটী-শোভিত দেহ ধরণী-রাণীর,—
অনন্ত কুসুমে যেন শরৎ প্রকৃতি,
শত শত-পত্রে যেন সরসীর নীর।
প্রদীপের সারি ধরি' ঘোর অন্ধকারে
আসিবেন বুঝি আজ চিদানন্দময়ী,
করাল-বদনা শ্যামা ভীমা মুক্তকেশী,
মূর্ত্তিমতী শক্তি বিশ্বে শক্তি প্রদানিতে
করবাল-করা মোহ-অসুর নাশিতে।
ধ্যানে নিমগন-চিত্ত ভক্ত পুরোহিত
নেহারিছে লক্ষ দীপ অন্তরে বাহিরে ;—
জ্বলিয়া উঠিল দীপ দ্বিগুণ বিভায়,
নিশাকালে মহারোলে বাজিল দামামা,
সহসা ভাতিল দীপ্তি ভকত আননে
লুঠিয়া পড়িল ভক্তি মুক্তির চরণে॥

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন কাব্যতীর্থ।

প্রতিজ্ঞা যৌগন্ধরায়ণ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

চতুর্থ অঙ্ক

দুইজন সাধারণ লোকের প্রবেশ

উভয়ে। মশায়রা, পথ ছেড়ে দিন, পথ ছেড়ে দিন।

প্রথম। গলা ছিঁড়ে গেল, তবু হাঁক ত কম্‌ছে না!

দ্বিতীয়। হায়! রাজকুমারী বাসবদত্তাকে চুরি ক'রে নিয়ে গেল—কি করব' কিছুই বুঝিতে পাচ্ছি না—আবার আমার চীৎকারও কেউ শুন্‌ছে না।

কি বল্‌ছ? লোক সরিয়ে দিচ্ছে কেন তাই জিজ্ঞাসা কচ্ছ? তুমি জান না মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ বন্দী হ'য়েছেন!

কি বল্‌লে? কেমন করে বন্দী হ'লেন?: বল্‌ছি, শুনুন আপনারা; মাত্র অসি নিয়ে আর্য্য যৌগন্ধরায়ণ সমস্ত অক্ষৌহিণীর প্রথম আক্রমণে বাধা দিলেন। পরে বিজয়সুন্দর হাতীর দাঁতের আঘাতে অসি ভেঙ্গে গেল। অসি ছিল না ব'লে বন্দী হ'লেন,—তাঁর কোন দোষ নেই।

প্রথম। আপনারা সকলে সাবধান হ'ন। শুধু দুর্গের তোরণ ছাড়া সর্ব্বত্রই কেবল কৌশাম্বীর লোক!

উভয়ে। মশায়, নেবে আসুন, নেবে আসুন।

ফলক-শয়নে বদ্ধাবস্থ যৌগন্ধরায়ণের প্রবেশ

যৌগ। এই আমি নিজেই নাব্‌ছি।

বৎস-রাজকে শত্রুর হাত থেকে উদ্ধার করেছি,—অস্ত্রের-দোষে যুদ্ধে বন্দী হ'য়েছি;—মহারাজের আর এখন দুঃখ নেই;—সুতরাং পরাজিত হ'লেও মনের সুখে শত্রু-নগরে প্রবেশ কচ্ছি। যারা বিপত্নীক, তাদের বনবাসে দুঃখ নেই; যাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'য়েছে, তাদের মরণেও সুখ। যারা চিরকাল ধর্ম্মপথে চলেছে, তাদের পরে আর অনুতাপ কত্তে হয় না। আমারও সবই হয়েছে,—মরণে আর দুঃখ কি?

এখন আমার আর শত্রুর ভয় নেই, পরিভবের আশঙ্কা নেই—নীতি দ্বারা, বিনয় দ্বারা, ও যুদ্ধ দ্বারা অভীষ্ট সাধন করেছি। শত্রুর যশ নষ্ট করেছি, বন্ধুবর্গের অযশ দূর করেছি,—মহারাজকে পেয়েছি,—জয়ী হয়েছি,—আর যশও লাভ করেছি।

উভয়ে। মশায়রা, পথ ছেড়ে দিন, পথ ছেড়ে দিন।

যৌগ। যারা আমাকে দেখতে এসেছে, তাদের সরিয়ে দিও না।

যে ব্যক্তি রাজার প্রতি অনুরাগ-বশে বিপদে পড়েছে, এই রাজ্যের সাধু প্রজাগণ সকলেই তাকে দেখুক। যারা মন্ত্রী হতে চায়, আমার অবস্থা দেখে এখন স্থির করুক, তারা মন্ত্রীত্ব চায় কি না।

উভয়ে। সরে যাও, সব সরে যাও; তোমরা কি আগে আর্য্য যৌগন্ধরায়ণকে কখনও দেখ নি?

যৌগ। দেখেছে বটে, কিন্তু এমন ভাবে দেখে নি।

হীনবেশে উন্মত্তের ন্যায় রাজপথে ঘুরে বেড়াতে যাকে পূর্ব্বে দেখেছে, এখন সকলে তার কাজ দেখুক।

ভটের প্রবেশ

ভট। আর্য্য, আপনাকে একটা সু-খবর দিচ্ছি;—শুনছি, বৎস-রাজ বন্দী হয়েছেন।

যৌগ। হ'তে পারে না।

মহারাজ এই শত্রু-নগরে অনেকক্ষণ বন্ধন-মুক্ত হয়েছেন, ভদ্রবতীতে চ'ড়ে নিমেষ-মধ্যে বহু যোজন পথ অতিক্রম ক'রে এখন বনে পৌছেছেন;—তিনি কি ক'রে আর বন্দী হবেন?

বাপু হে, কেমন ক'রে বন্দী হলেন কিছু শুনেছ?

ভট। হা, শুনেছি;—নলাগিরিতে চ'ড়ে অনুসরণ ক'রে তাঁকে ধরেছে।

যৌগ। বটে! নলাগিরিতে চ'ড়ে যাওয়া সম্ভব,—কিন্তু তার যে

মাহুৎ নেই! তাকে চালাবে কে? হাতীর মাহুৎ থাকলে, আর ভাল শিক্ষা পেলে, তবে হাতী তাড়াতাড়ি চল্‌তে পারে। বৎস-রাজ ছেড়ে দিলে পর তাকে চালাল কে?

ভট। আর্য্য, অমাত্য আদেশ করেছেন,—আপনাকে আয়ুধাগারে থাকতে হবে। এই যায়গায় অনেক গুপ্তচর রয়েছে।

যৌগ। অহো, এই কথা শুনে আমার হাসি পাচ্ছে। যখন বৎস-রাজের মত অগ্নিকে বেঁধে রেখেছিলেন, এবং যখন চারিদিকই রক্ষা করা উচিত ছিল, তখন ছিলেন সব ঘুমিয়ে;—টাকাই চুরি হয়ে গেল, এখন আর খালি বাক্‌সটি আট্‌কিয়ে লাভ কি?

(উভয়ের পরিক্রমণ)

ভট। এই-ই আয়ুধাগার। আর্য্য, প্রবেশ করুন।

আর একজন ভটের প্রবেশ

ভট। অমাত্য আর্য্য যৌগন্ধরায়ণের বন্ধন খুলে দিতে আদেশ করেছেন।

যৌগ। হাঁ, আমার বন্ধন খুলে দাও। শুন্‌ছি, অমাত্য ভরত-রোহক আমাকে দেখ্‌তে চান; আমিও ভরত-রোহককে দেখ্‌তে চাই। রোষের বশে অনেক কঠোর বাক্য ব'লে তাঁর হৃদয় বিদ্ধ ক'রেছি; নীতি প্রয়োগে, কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনে, আমার সঙ্গে তিনি এঁটে আসেন নি; শাস্ত্রবিহিত উক্তির বলে এবং বুদ্ধি-বলে আমি তাঁকে বঞ্চনা করেছি। এখন দুষ্কর্ম্মে অবনত-মস্তক ও লজ্জায় অধোমুখ সেই বীর-পুরুষকে আমারও দেখ্‌তে ইচ্ছা হচ্ছে।

ভরতরোহকের প্রবেশ

ভরত। কোথায়, কোথায় যোগন্ধরায়ণ! যিনি স্বীয় কার্য্য সাধন করেছেন, যিনি তীক্ষ্ণ বঞ্চনা-বুদ্ধির তেজপ্রভাবে দুর্নিরীক্ষ্য, যিনি প্রভুর হিতের জন্য বিপন্ন, যিনি সর্ব্বদাই কূটবুদ্ধি, যাঁর মন্ত্রণার মূলে নীতিশাস্ত্রবিহিত সূক্ষ্ম যুক্তি, ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় ধর্ষিত হয়েও যিনি উন্নত-মস্তক,—সেই যৌগন্ধরায়ণ কোথায়?

ভট। আর্য্য যৌগন্ধরায়ণ আয়ুধাগারে আপনার আগমন প্রতীক্ষা কচ্ছেন।

ভরত। বেশ, ভাল কথা;—মিথ্যা নীলহস্তীর ছল ক'রে তাঁকে বঞ্চনা করেছি; সেই শত্রুতা পরিশোধ করার জন্য তিনি এখন আমার প্রতীক্ষা কচ্ছেন।

ভট। আর্য্য, মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ এখানে।

ভরত। (অগ্রসর হইয়া) যৌগন্ধরায়ণ!

যৌগ। কি!

ভট। কি গম্ভীর স্বর! এই একটি অক্ষরই যেন সমস্ত স্থানটাকে পূর্ণ ক'রে ফেল্‌লে।

ভরত। (উপবেশন করিয়া) এতদিন শুধু যৌগন্ধরায়ণ এই শব্দমাত্র শোনা ছিল,—ভাগ্যে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল।

যৌগ। ভাগ্যে আপনার সঙ্গেও সাক্ষাৎ হ'ল। আমাকে ভাল ক'রে দেখুন—রুধিরাক্ত কলেবর, সর্ব্বদা শত্রুদ্বেষী, পিতৃহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্নের বিনাশকারী শান্তমূর্ত্তি অশ্বত্থামার ন্যায় আমাকে বেশ ক'রে দেখুন।

ভরত। হাতী দিয়ে যিনি আমাদিগকে প্রবঞ্চিত ক'রে কার্য্য সিদ্ধি করেছেন, তাঁর মুখেই এরূপ অহঙ্কারের কথা শোভা পায় বটে।

যৌগ। আপনিও আবার বঞ্চনার কথা বল্‌ছেন! বঞ্চনার কথা আপনার মুখে শোভা পায় না! শালবনে মিথ্যা হাতী রেখে কে বঞ্চনা করেছিল? আমাদের মহারাজকে বাহুমাত্র উপাধান ক'রে এতদিন ভূ-শয্যায় শয়ন কত্তে হ'য়েছিল কেন! তিনি বীণার সাহায্যে হস্তী বশ কত্তে জান্‌তেন বলেই আপনারা তাঁকে বঞ্চনা কল্‌লেন। আমি মাত্র আপনাদের অনুকরণ করেছি, আমার দোষ কি মশায়!

ভরত। অগ্নি সাক্ষী ক'রে যিনি রাজকুমারীকে শিষ্যারূপে গ্রহণ কল্‌লেন, বিয়ে না হ'তেই তাকে নিয়ে চোরের মত

পালিয়ে যাওয়াটা কি ভাল হ'য়েছে !

যৌগ। এমন কথা বল্‌বেন না—মহারাজের পক্ষে শিষ্যারূপে গ্রহণ, আর বিবাহ একই কথা।

যাঁর ভারতবংশে জন্ম, যিনি প্রবল পরাক্রমশালী, বৎস-রাজ্যের কর্ত্তা, তিনি অপরিণীতা রমণীকে কখনও শিষ্যত্বে গ্রহণ করবেন না।

ভরত। আজ পর্য্যন্তও মহাসেন বৎসরাজের প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শনে ক্রুটি করেন নাই, এটাও তিনি একটু ভাবলেন না!

যৌগ। এমন কথা বল্‌বেন না,—দেখুন, এখনও নলাগিরি মহারাজ মহাসেনের অধীন রয়েছে; এখনও নলাগিরি মাহুতের আদেশ পালন কচ্ছে! স্বীয় দেহ-রক্ষার জন্য, সুহৃদগণের জীবন-রক্ষার জন্য ও মহারাজ উদয়নের যশ বর্দ্ধন করার জন্য তিনি বৎসরাজ কর্ত্তৃক বিমুক্ত হয়েছেন!

ভরত। যদি নলাগিরি বশীভূত করার জন্যই মহাসেনকে মুক্তি দেওয়া হ'য়ে থাকে, তবে মহাসেন পুনরায় বৎস-রাজকে বন্দী কল্লেন না কেন ?

যৌগ। লোক-নিন্দার ভয়ে তা করেন নি।

ভরত। রাজ্য-নীতি-ব্যাপার আপনার সম্যক বিদিত নাই দেখ্‌ছি। যুদ্ধে বন্দী শত্রুর প্রতি শাস্ত্রের কি বিধান ?

যৌগ। কেন, বধ!

ভরত। বৎসরাজ যদি বধার্হই হন, তা হ'লে আমরা তাঁর প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন ক'রেছি কেন ?

যৌগ। বৎসরাজ উদয়ন রাজা মহাসেনের দেহপাত করেন নি, এটা দেখেই আপনারা তাঁর প্রতিও শিষ্টাচার দেখিয়েছেন।

ভারত। আপনি এটাও সম্ভব মনে করেন যে উদয়ন প্রভু মহাসেনের জীবন নাশ কত্তে পাত্তেন ?

যৌগ। হাঁ, তাতে আর সন্দেহ কি ?

বৎসরাজ নিতান্ত সদাশয়, করতলগত শত্রুকেও তিনি হত্যা করেন নাই। হাতীর পিঠে না চড়ে পতাকা নষ্ট করা যায় না।

ভরত। বেশ, বেশ; মহাসেনের সঙ্গে বিরোধ ঘটিয়ে কি ক'রে আপনি কৌশাম্বী রক্ষা করবেন ?

যৌগ। আপনার কথা শুনে হাসি পেল।

আপনাদের সাম্‌নে থেকে পালিয়ে গেলুম, পরের কথা আর কি ? গাছ যদি সমূলেই উপ্‌ড়াতে পারা যায়, তা হ'লে ডাল কাটতে আর কষ্ট কি ?

কাঞ্চুকীয়ের প্রবেশ

কাঞ্চু। (কানে কানে) এ রকম।

ভরত। প্রকাশ্যেই বলুন।

কাঞ্চু। অনেক কারণ থাক্‌তেও আপনি অপকার করেন নি; আমি সর্ব্বদা গুণের আদর করে থাকি; ভৃঙ্গার গ্রহণ করুন। রাজা এই কথা বল্‌লেন।

যৌগ। হায়, ধিক্ আমাকে।

যে সকল ঘরে আগুন দেওয়া হয়েছে, সে ঘরগুলি এখনও জ্বলে শেষ হয় নি—মন্ত্রীদের হৃদয়ের আগুনও এখনও নিবে যায় নি। আমাকে দেওয়া উচিত ছিল দণ্ড, তা না দিয়ে পূজার ব্যবস্থা! অপরাধীর পূজাই তাহার বধ।

(নেপথ্যে হাহাকার ধ্বনি)

ভরত। রাজ-প্রাসাদের উপরতালা হতে শ্যেনপক্ষী-নিপীড়িত কুররীর করুণ ক্রন্দনের ন্যায় এই বিলাপ-ধ্বনি হঠাৎ উঠল কেন ? কাঞ্চুকী, দেখুন ত কিসের শব্দ।

কাঞ্চু। যে আজ্ঞা আর্য্য। [প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ।

রাণী অঙ্গারবতী শোকার্ত্ত হ'য়ে প্রাসাদের উপরিতল থেকে লাফিয়ে পড়ে প্রাণ বিসর্জ্জন কত্তে উদ্যত হ'য়েছিলেন;—মহাসেন তাঁকে বাধা দিয়ে বল্‌লেন, "রাণি, তোমার মেয়ের বিয়ে ক্ষত্রধর্ম্মানুসারেই সম্পন্ন হবে স্থির হয়েছিল;—তবে আনন্দের সময় শোক কেন ? সুতরাং বৎসরাজ ও বাসবদত্তার যে ছবি আছে, তাদেরই বিয়ে দিয়ে দাও। যে বিয়েতে কেবল আনন্দ, কেবল হর্ষ, সেই মঙ্গল-কার্য্যে স্ত্রীলোকের কি চোখের জল ফেলা উচিত ?

যৌগ। মহাসেন যদি এরূপ সম্বন্ধই আকাঙ্ক্ষা ক'রে থাকেন, তা হ'লে ভৃঙ্গার নিয়ে এস।

কাঞ্চু। গ্রহণ করুন (ভৃঙ্গার প্রদান)।

ভরত। মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ, মহাসেন জানতে চাচ্ছেন, আপনার প্রীতির জন্য আমরা আর কি কর্ত্তে পারি।

যৌগ। যদি আমার 'পর মহাসেন সন্তুষ্ট হ'য়ে থাকেন, তবে আমার আকাঙ্ক্ষার বস্তু আর কি আছে?

(ভরতবাক্য)

পৃথিবী হইতে রাজসিক ভাব দূরীভূত হউক, শত্রুমণ্ডলী প্রশমিত হউক—আমাদের একচ্ছত্র অধিপতিরূপে মহারাজ সমগ্র মহী-মণ্ডল শাসন করুন।

(সমাপ্ত)

শুভং ভূয়াৎ। শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

ভারতীয় সঙ্গীত

বিগত বৎসরের নবেম্বর মাসের "নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরী" (The Nineteenth Century) পত্রিকায় শ্রীমতী হেইগ (Mrs. Haigh) নাম্নী জনৈক ইংরাজ মহিলা ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে একটী অতীব মনোজ্ঞ প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। নিম্নে অতি সংক্ষেপে ঐ প্রবন্ধের মর্ম্মানুবাদ প্রদত্ত হইল।

নিজের ব্যক্তিগত বা জাতিগত অভিজ্ঞতালব্ধ বিশেষ বিশেষ সিদ্ধান্তগুলি বর্জ্জন করত কিয়ৎ পরিমাণে আত্ম-সমর্পণ না করিলে, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে, অথবা এক-জাতি অপর জাতিকে সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারে না। স্বদেশীয় কোনও শিল্প-কলার অনুশীলনের ফলে, অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির মনে যে রুচি বা অরুচি জন্মিয়া থাকে, তাহা মন হইতে বিদূরিত করিতে না পারিলে, ঐ শিল্পকলায় অপর জাতি কিরূপ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, সম্যক্‌রূপে তাহার নির্দ্ধারণ করা ঐ ব্যক্তির পক্ষে আদৌ সম্ভবপর হয় না।

স্বদেশের সুপরিচিত বিধিব্যবস্থা এবং স্ব-সমাজে বহুকাল-প্রচলিত আচারব্যবহারগুলিকে মানদণ্ডরূপে গ্রহণকরতঃ তৎসাহায্যে বৈদেশিক রীতি-নীতির বিচার করা এবং সেই প্রণালী অবলম্বনে কেবলমাত্র বিশ্লেষণ করা যে নিরর্থক, অতীত সভ্যতার ইতিহাস আলোচনাক্ষেত্রেই তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত হইয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে এক্ষণে আর কিছুমাত্র মতদ্বৈধ নাই। ধীরে ধীরে অতীতের দিকে যতদূর সম্ভব অগ্রসর হইয়া, এক সাধারণ উৎপত্তিস্থলে উপনীত হওয়াই আধুনিক ঐতিহাসিক গবেষণার মূল রীতি। নিজের শিক্ষা-লব্ধ সংস্কার দূরে রাখিয়া, বিভিন্ন সভ্যতার তুলনামূলক পরীক্ষা করতঃ আমরা এরূপ এক মানসিক অবস্থা লাভ করিতে পারি, যাহার সাহায্যে বিভিন্ন ও বিপরীতধর্ম্মাক্রান্ত আচারব্যবহার-সমূহের প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ করা অনেকটা সহজসাধ্য হইয়া পড়ে। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, যে ভারতীয় সভ্যতার মূল গ্রীস বা তন্নিকটবর্ত্তী দেশসমূহের অতীত সাম্রাজ্যাদির ন্যায় প্রাচীন, তাহার আলোচনায় এই তুলনা-মূলক পরীক্ষাপদ্ধতি প্রায়ই অবলম্বিত হয় না। সেকেলে সমালোচকদিগের সংস্কার ছিল যে, একমাত্র তাঁহাদের নিজের দেশের আচারব্যবহারপ্রভৃতিই স্বাভাবিক ও সার্ব্বভৌমিক নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া এই শ্রেণীর সমালোচকগণ স্বদেশীয় আচারব্যবহারের সহিত সাদৃশ্য বা পার্থক্য অনুসারে অপর দেশের আচারব্যবহারাদির উৎকর্ষাপকর্ষ নির্ণয় করিতেন। ইউরোপ হইতে এক্ষণে এই প্রথার তিরোধান হইলেও, ভারতীয় শিল্প প্রভৃতির আলোচনা-প্রসঙ্গে আজ পর্য্যন্তও কিন্তু এই পদ্ধতিই অনুসৃত হইয়া আসিতেছে।

খ্রীষ্টিয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতীয় নাটক ও মহাকাব্যাদি ইউরোপীয় ভাষায় প্রথম অনূদিত হয়;—এই দূরবর্ত্তী সময়েও উহারা ইউরোপের ক্ষুদ্র একদল লোকের আদর লাভে সমর্থ হইয়াছিল; তাহার একমাত্র কারণ এই যে অন্যান্য ললিত-কলা অপেক্ষা সাহিত্য অধিকতর সার্ব্বভৌমিক নিয়ম-ভিত্তির উপর সংস্থাপিত এবং অপেক্ষাকৃত অধিক-সংখ্যক লোকের চিত্তাকর্ষণে সমর্থ। অতি অল্পদিন মাত্র (১২ বৎসরের অধিক হইবে না) ভারতীয় ভাস্কর্য্য ও চিত্রবিদ্যা ইউরোপীয় মনীষিগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। ভারতীয় সঙ্গীত বুঝিবার চেষ্টা এখনও প্রকৃত প্রস্তাবে আরম্ভও হয় নাই বলিলেই হয়, যদিও সম্প্রতি এ বিষয়ে

কিছু কিছু কৌতূহলের লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

ইউরোপীয়গণের দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায় যে চিরকাল তাঁহারা ভারতীয় সঙ্গীতের যে মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া আসিতেছেন, তাহা নিতান্ত অযৌক্তিক নহে। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে,যতই উৎকৃষ্ট হউক না কেন, ভারতীয় গীতবাদ্য কখনই ইউরোপীয়দিগের সঙ্গীতবোধ-শক্তিকে আকর্ষণ বা তাহাদিগকে আমোদ প্রদান করিতে পারে না। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাই যে কতিপয় সৌভাগ্যশালী স্থান ব্যতীত অন্যত্র ভারতীয় সঙ্গীতবিদ্যার বিশেষত্বজ্ঞাপক গীতাদি শ্রবণ অত্যন্ত কঠিন। দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় সঙ্গীতবিষয়ক পুস্তকাদির এতই অভাব যে এ সম্বন্ধে গবেষণা করিবার উৎসাহই থাকে না। তৃতীয়তঃ, ভারতীয় গীতবাদ্যে সাঙ্কেতিক চিহ্নব্যবহারের প্রণালী মোটেই উন্নত বা দোষশূন্য নহে। চতুর্থতঃ, সাধারণ্যে প্রচলিত ও ভারতীয় নাটকাদির গান ইত্যাদিতে পাশ্চাত্য নিকৃষ্ট সুরের অনুকরণ ও মিশ্রনদোষ এত অধিক যে উহাতে খাঁটী ভারতীয় সুর অতি নিম্নস্থান অধিকার করিয়া থাকে,এবং অনেক সময়েই তাহা বাছিয়া বাহির করাও অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার হইয়া পড়ে। প্রধানতঃ এই সমস্ত কারণেই ইউরোপীয়দিগের মনে একটা ধারণা জন্মিয়াছে যে ভারতীয় সঙ্গীতবিদ্যা এখনও অন্যান্য ললিতকলার অনেক পিছনেই পড়িয়া আছে—এমন কি, উহা কখনও প্রাথমিক অবস্থাও অতিক্রম করিয়াছিল কি না সে সম্বন্ধেও গভীর সন্দেহ আছে; এবং বর্ত্তমান সময়ে উহা জীবনীশক্তি হারাইয়া ক্রমে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে। ধীরভাবে বিবেচনা ও বিশ্লেষণ করিয়াই ইউরোপীয় মনীষিগণ পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন এবং যে সমস্ত প্রমাণের বলে তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, আপাতঃদৃষ্টিতে তাহা বিশেষ সন্তোষজনক বলিয়াই বোধ হয়। তথাপি আমার কিন্তু বোধ হয় যে ভারতীয় সভ্যতার দ্বারা যাহারা পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহাদের নিকট ভারতীয় সঙ্গীতের মূল উদ্দেশ্য, অর্থ ও মূল্য প্রভৃতি সরল-ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিলে, উপরোক্ত প্রমাণাবলী ও সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ অন্যায় ও অসঙ্গত বলিয়াই অনুমিত হইবে।

মিঃ ই, সি, ক্লিমেণ্ট (E. C. Clement) 'ভারতীয় সঙ্গীতানুশীলনের ভূমিকা' (Introduction to the Study of Indian Music) নামে যে গ্রন্থ লিখিয়াছেন, ডাক্তার আনন্দ কুমারস্বামী তাহার এক অতি মূল্যবান্ মুখবন্ধ লিখিয়া দিয়াছেন। ডাক্তার কুমারস্বামী লিখিয়াছেন,—"সুদূর অতীতে ভারতীয় সঙ্গীতের সুবর্ণ-যুগের অভ্যুদয় হইয়াছিল। যে সময়ে কালিদাসের হাতে ভারতীয় নাটক উন্নতির উচ্চতম চূড়ায় আরোহণ করে, সেই সময়েই সম্ভবতঃ ভারতীয় সঙ্গীতেরও চরমোন্নতি সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার বহু পূর্ব্বেও ভারতবর্ষে সঙ্গীতশাস্ত্রের যথেষ্ট চর্চ্চা ছিল; এমন কি, ললিতকলার অন্য কোনও বিভাগে এত চর্চ্চা ছিল কি না সন্দেহ। বর্ত্তমানকালেও সঙ্গীতে যেরূপ অবিচ্ছিন্ন জীবনীশক্তির প্রবাহ দেখিতে পাওয়া যায়, অন্য কুত্রাপি তাহা দেখা যায় না;—আজও সঙ্গীতশাস্ত্রই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমাদর পাইয়া থাকে। যাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং এখনও যাহা আছে, তাহা ধরিলে, বলিতে হয় যে সঙ্গীতেই ভারতীয় আত্মা বা প্রতিভার পূর্ণ অভিব্যক্তি হইয়াছে,—সঙ্গীতদর্পণেই ভারতবাসীর অন্তর্জীবন যথাযথ-রূপে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।" এই দৃঢ় অথচ প্রামাণিক উক্তির দ্বারা ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে ইউরোপের প্রচলিত ধারণা যে নিতান্ত অমূলক, তাহা বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। ভারতীয় জীবন ও অভিজ্ঞতা দ্বারা উপরোক্ত সিদ্ধান্ত কতদূর সমর্থিত হয়, তাহা কি আমাদের পক্ষে স্বাধীন ভাবে আবিষ্কার করা একেবারেই অসম্ভব?

ভারতীয় কিম্বদন্তীর আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, অন্যান্য শিল্প অপেক্ষা সঙ্গীতশিল্পকেই ভারতবাসীগণ সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ আসন প্রদান করিয়াছে, এমন কি উহাতে অমানুষিক শক্তিরও আরোপ করা হইয়াছে। কথিত হয়, মোগলসম্রাট আকবরের অন্যতম সভাসদ্ সঙ্গীতবিশারদ তানসেন মিঞা একদিন মধ্যাহ্নে রাত্রিকালের একটী রাগ গাহিয়াছিলেন। রাজপ্রাসাদের যতদূর পর্য্যন্ত তাঁহার গলা

শোনা গিয়াছিল, তানসেনের সঙ্গীতের প্রভাবে ততদূর পর্য্যন্ত অন্ধকারের আবির্ভাব হইয়াছিল। মেঘমল্লার রাগে গান করিয়া প্রাচীনকালের কোনও বাঙ্গালী গায়িকা দুর্ভিক্ষের সময় রৌদ্রদগ্ধ শস্যের উপর বারিবর্ষণ করাইয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়। পাপাত্মা রাবণ এরূপভাবে সামগান করিয়াছিলেন যে, মহাদেব করুণাপরবশ হইয়া তাহার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়াছিলেন।

এমন কি, যন্ত্রগুলিকেও ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতাসম্পন্ন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে। আরব্যোপন্যাসে ভারতীয় বীণার এক বর্ণনা আছে; উহার তার স্পর্শ করা মাত্রই উহা নিজের জন্ম, শিক্ষা ও গঠন, ভ্রমণ, ও কার্য্যকলাপের আদ্যন্ত বিবরণ ব্যক্ত করিত। রামপ্রসাদের একটী গান আছে; তাহার ভাবার্থ এইরূপ;—"সঙ্গীত এই যন্ত্রে প্রবেশ করিয়াছে, এবং সেই সুরের একটী গান আমি শিখিয়াছি। এই গানটী সর্ব্বদাই আমার সম্মুখে নিনাদিত হইতেছে, কারণ একমাত্র ধ্যানের দ্বারাই তাহা শিক্ষা করা যায়"।

সাধারণ লোকের এই সরল বিশ্বাসগুলি তাহাদের কল্পনা শক্তিরই প্রতিবিম্ব মাত্র; এগুলির মূল্য এই যে ইহা দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে সাধারণের নিকট এই সকল ঘটনা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও বিশ্বাসযোগ্য বলিয়াই প্রতিভাত হইয়া থাকে। মানুষের চিত্তকে অতি গভীরভাবে আলোড়িত করিতে পারে বলিয়াই, লোকে সঙ্গীতের শক্তিকে এমন সভয় বিস্ময়ের চক্ষে দেখিয়া থাকে। ইচ্ছা বা কারণ না থাকিলেও শুধু রাগিণীবিশেষের আলাপের অনুরোধে মানবমন কার্য্যবিশেষের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। ইহা হইতেই সাধারণ লোকের মনে বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে সঙ্গীত প্রাকৃতিক শক্তির উপরেও প্রভুত্ব করিতে পারে। ভারতীয় সঙ্গীতবিদ্যাবিশারদগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট রাগিণীব্যতীত অন্য রাগিণীর আলাপ করিতে সহসা সম্মত হয় না। কারণ, ইহারা আশঙ্কা করে যে, ঐরূপ করিলে ঈশ্বরাদিষ্ট প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম করা হইবে।

কিম্বদন্তী ছাড়িয়া দিয়া, ইতিহাসের আলোচনা করিলেও দেখা যায় যে, কি রাজদরবারে, কি সাধারণ লোকের নিকট, সর্ব্বত্রই সর্ব্ববিধ কলাবিদ্যা মধ্যে সঙ্গীতকেই সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদত্ত হইয়াছে। নাটকীয় অভিনয় ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে সঙ্গীত একটী অত্যাবশ্যক অঙ্গবিশেষ। মানুষের নৈতিক চরিত্রগঠনেও ইহার প্রভাব বড় কম নয়, এবং শিক্ষা ক্ষেত্রেও ইহার স্থান সযত্নে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

উনবিংশ শতাব্দীতে অন্যান্য শিল্পের ন্যায় সঙ্গীতশিল্পেরও যে অবসাদ দেখা যাইতেছে, কোনও আভ্যন্তরিক দুর্ব্বলতা বা ধ্বংসপ্রবণতা তাহার কারণ নহে। পাশ্চাত্য প্রভাবকে ভারতবাসীরা আজিও আপনাদের প্রকৃতির অঙ্গীভূত করিয়া লইতে পারে নাই,—অথচ, হিতাহিত-বিবেচনাশূন্য হইয়া শুধু অনুকরণই করিতেছে। এই পাশ্চাত্য প্রভাবের আধিপত্য, ভারতে প্রতীচ্যজগতের বণিকপ্রকৃতির প্রবেশলাভ, এবং পারিবারিক শিল্পপ্রথার পরিবর্ত্তে ফ্যাক্টারী প্রথার প্রবর্ত্তন প্রভৃতি এতাবৎ ভারতীয় সঙ্গীতপ্রতিভাকে দমিত করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি ভারতের সর্ব্বত্র নবজাগরণের যে লক্ষণ দেখা যাইতেছে, তাহাতে আশা হয় যে ভারতীয় ললিতকলা আবার স্বীয় স্বাভাবিক প্রকৃতি অনুসারে ক্রমোন্নতি লাভে সমর্থ হইবে।

ভারতীয় জীবনের সহিত সঙ্গীত এরূপ ঘনিষ্টভাবে জড়িত হইয়া গিয়াছে যে, চিরাগত প্রথা হইতে উহা কখনই স্থায়ীভাবে স্খলিত হইবে না। প্রকৃত জাতীয় সঙ্গীত আজিও কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নাই। রাজোচিত সম্মান বা অধিকার হইতে উহাকে বিচ্যুত করা কখনই সম্ভবপর নহে। প্রকৃত জাতীয় সঙ্গীতই আমাদের বিবেচ্য বিষয়,—সাধারণতঃ বৈদেশিকগণ মিশ্রিত ও পাশ্চাত্য প্রভাবে কলুষিত যে এক প্রকার গান বা চীৎকার শুনিয়া থাকেন, তাহা আমাদের বিচার্য্য নহে। এই শিল্প এতকাল বৈদেশিকগণের দৃষ্টি হইতে আত্মগোপন করিয়াছিল। এতদিন এ সম্বন্ধে কিছুই শোনা যায় নাই বা লেখা হয় নাই; কোনও

সমিতিকর্তৃক ইহার প্রণালী বা নিয়মাদির আলোচনা করা হইয়াছে বা ইহার রক্ষার জন্য কোনও চেষ্টা করা হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। তথাপি ইহা এক গৌরবময় অবিচ্ছিন্ন অতীত লইয়া আজ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। কিরূপে ইহা হইতে পারে, ইউরোপীয়দের কাছে তাহা প্রহেলিকাবৎ প্রতীয়মান হওয়া বিচিত্র নয়; কিন্তু প্রাচ্যদেশে এরূপ ঘটনা আদৌ অসম্ভব বা অসাধারণ নহে। আমাদের গ্রীককাব্যগুলি পূর্ব্বে মুখে মুখেই প্রচারিত হইত; এক্ষণে তৎসমুদয় লিখিবার প্রথা হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে এই মৌখিক প্রচার কার্য্য লিখিবার প্রথার সহিত একত্র বর্ত্তমান থাকিয়া এযাবৎকাল স্বীয় স্বতন্ত্র উদ্দেশ্যসাধনে তৎপর ছিল। বরং বড় বড় গ্রন্থগুলির এইরূপভাবে প্রচার করাই সুসঙ্গত বিবেচিত হইত। মনোভাবের ব্যাখ্যা করাই যে শিল্পের একমাত্র কার্য্য বা উদ্দেশ্য, মৌখিক প্রচারের অধিকতর স্বাধীনতাদ্বারাই অধিকতর স্বাধীনভাবে সেই শিল্পের অনুশীলন সম্ভবপর। এই কারণেই সাহিত্য অপেক্ষা সঙ্গীতেই মৌখিক প্রচারের অধিকতর প্রয়োজনীয়তা বিবেচিত হইত এবং এই জন্যই ভারতীয় সঙ্গীতজ্ঞেরা লেখা দেখিয়া মুখস্থ করিতে অসম্মত ছিল। এই জাতীয় শিল্পের একনিষ্ঠ সেবকেরা আজিও এই মৌখিক প্রচারেরই সমর্থন করিয়া থাকে এবং বিশ্বাস করে যে, ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রে প্রচুর পরিমাণ সাঙ্কেতিক চিহ্নের ব্যবহারের জন্য যে ধূয়া উঠিয়াছে, উহা যথার্থই কার্য্যে পরিণত হইলে, ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্র অচিরেই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।

পূর্ব্বোদ্ধৃত কথার পর ডাক্তার কুমার-স্বামী আরও বলিয়াছেন যে "প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও শিক্ষাসংস্কারকগণ যে পরিমাণে ভারতীয় সঙ্গীত অবহেলা করিয়াছেন, তাঁহারা ঠিক সেই পরিমাণে ভারতবাসী ও ভারতবর্ষকে বুঝিতে অক্ষম হইয়াছেন।"

অভিযোগটী এতই গুরুতর যে উহা অবহেলা করিলে চলিবে না। বাস্তবিকই যদি ইহা সত্যই হয়, তবে প্রকারান্তরে এতদ্দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে ইউরোপীয়েরা তাঁহাদের সঙ্গীতের গুরুত্ব সম্বন্ধে বাস্তবিক যতটা দাবী করিতে পারেন, ভারতবর্ষীয়দিগের তাহাদের নিজ সঙ্গীতশাস্ত্রসম্বন্ধে দাবী তদপেক্ষা অনেক বেশী। পাশ্চাত্য-দেশীয়েরা সঙ্গীতবিষয়ে যতই বাক্যাড়ম্বর করুন না কেন, ইহা ঠিক যে এক মুষ্টিমেয় বিশেষজ্ঞগণ ব্যতীত অপর কেহই তাঁহাদের সঙ্গীতের প্রকৃত ভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না; মুষ্টিময় বিশেষজ্ঞ ছাড়া অসংখ্য লোকের নিকট বর্ত্তমান ইউরোপীয় সঙ্গীতের মূল্য অতি সামান্য। সঙ্গীতের দ্বারা ইহাদের দৈনন্দিন জীবন কিছুমাত্র প্রভাবান্বিত নহে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কিন্তু ভারতবাসীগণের জীবনে সঙ্গীতের প্রভাব এতদপেক্ষা অনেক বেশী। যেরূপ প্রণালীবদ্ধভাবে ইউরোপীয় সঙ্গীতের অনুশীলন হইয়াছে, ভারতবর্ষে সেরূপ কিছুই হয় নাই বটে—কিন্তু তাই বলিয়া ভারতীয় জীবনে সঙ্গীতের প্রভাব বা কার্য্য কিছুমাত্র কম নহে।

আজিও সঙ্গীত আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশবিশেষ বলিয়া স্বীকৃত হইবার সম্মান প্রাপ্ত হয় নাই;—এখনও উহা আমাদের নিত্য কর্ম্মের বাহিরেই পড়িয়া আছে। যাহার যেরূপ রুচি বা বুঝিবার ক্ষমতা, সঙ্গীতালোচনায় সে সেইরূপ আমোদ পাইয়া থাকে। কিন্তু সঙ্গীতের দ্বারা চরিত্র গঠিত বা আচারব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হোক, কেহই ইহা আশা করে না। সঙ্গীত আমাদের উচ্চ শিক্ষার একটা আবশ্যক অঙ্গবিশেষ বটে,—কিন্তু উচ্চ শিক্ষাকে আমরা দৈনন্দিন জীবনের আবশ্যক অন্তরঙ্গরূপে ধরি না। কেবলমাত্র বিশেষজ্ঞগণই সঙ্গীতরসম্ভোগের অধিকারী, ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা একবাক্যে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াই নিশ্চিন্ত আছেন। সঙ্গীত বিষয়ে স্বাভাবিক রুচি বা প্রবৃত্তি আছে, এমন কি প্রতিভাও আছে—সঙ্গীতজ্ঞ বলিতে ইউরোপে এমন লোককে বুঝায় না। সেখানে সঙ্গীতজ্ঞের অর্থ—এসম্বন্ধে যার একটু বেশ ব্যবসাদারী জ্ঞান বা চা'লচলন আছে।

কিন্তু ভারতবর্ষীয়গণের জাতীয় জীবন ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া,সেখানে সঙ্গীত ধর্ম্মেরই সহচর,এবং সঙ্গীতানুশীলন যেমন একটা আমোদপ্রদ ব্যাপার, সেইরূপ একটা ধর্ম্মানুষ্ঠানও বটে। বেদ হইতেই সঙ্গীতের উৎপত্তি এবং ইহা অতি প্রাচীনকাল হইতেই ধর্ম্মকর্ম্মের সাহায্যকল্পে নিয়োজিত হইয়া আসিতেছে।

এমন কি, আজিও প্রত্যেক ধর্ম্মানুষ্ঠান, ক্রিয়াকলাপবহুল প্রত্যেক উৎসব এবং অনেক নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য পর্য্যন্তও তাল মান শুদ্ধ সঙ্গীত বা নৃত্যের সাহায্যে সম্পাদিত হইয়া থাকে।

শ্রীমতী এন্নি বি, ম্যাক্লিয়ড লিখিত 'হিন্দু-সঙ্গীত-পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ' (A Short Account of the Hindu System of Music by Annie B. Mcleod) নামক এক কৌতূহলোদ্দীপক ক্ষুদ্র পুস্তকে লিখিত হইয়াছে,—

"ভারতবাসীরা অত্যন্ত সঙ্গীতানুরক্ত; তাহাদের জীবনের প্রত্যেক ঘটনার জন্য উপযুক্ত সঙ্গীত নির্দ্দিষ্ট আছে। সঙ্গীতের সহিত তাহাদের জীবনের সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ট যে দিবসের প্রত্যেক প্রহরের এবং বৎসরের প্রত্যেক ঋতুর জন্য পৃথক পৃথক গান নির্দ্দিষ্ট আছে। ইউরোপের মধ্যযুগের কীর্ত্তনিয়াদের (Minstrels) মত পঞ্জাবের মিরাশীগণ আজিও দেশে দেশে গান গাহিয়া বেড়ায়। তাহারা বড়লোকের আশ্রিত; বিবাহে, মেলায়, উৎসবে, আমোদে তাহাদের ডাক খুব বেশী। প্রাত্যহিক জীবনেও তাহাদের প্রাধান্য বড় কম নয়। অনেক কার্য্যেই মিরাসী রমণীগণকে ডাকা হইয়া থাকে। শিশুর পীড়া হইলে শীতলাদেবীর তুষ্টি সাধনের জন্য, কোনও বান্ধব বিদেশে যাওয়ার সময়, বা বিদেশ হইতে কেহ বাড়ী আসিলে, তাহার অভ্যর্থনার জন্য ইহাদিগকে ডাকা হইয়া থাকে।"

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ইউরোপে সঙ্গীত বিশেষজ্ঞগণেরই শিল্পবিশেষ। সৌন্দর্য্যসৃষ্টির বিধি লঙ্ঘন না করিয়াও যে ইহাতে মৌখিক রচনার স্থান থাকিতে পারে, ইউরোপীয়গণ ইহা কল্পনাও করিতে পারেন না। আমাদের কাছে সঙ্গীত প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের উৎকৃষ্ট রচনার অভিধানরূপেই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। কোন একটী গান শুনিলেই আমরা জিজ্ঞাসা করি—'কাহার রচনা?—কিন্তু 'ইহা কিরূপ রচনা,' তাহা প্রায় কেহই জিজ্ঞাসা করে না। সম্প্রদায়বিশেষের নির্দ্ধারিত আদর্শ ও কৃত্রিম নিয়মের ভিত্তির উপর ইউরোপীয় সঙ্গীতবিশারদেরা নিজেদের কল্পনার সাহায্যে একটী রচনা গড়িয়া তুলেন এবং বাঁধাবাঁধি কায়দাকানুনের ব্যবহার করিয়া থাকেন। ফল এই হইয়াছে যে, শ্রোতা সঙ্গীতশাস্ত্রে উত্তমরূপে শিক্ষিত না হইলে, উহার গুণ গ্রহণে আদৌ সমর্থ হয় না।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ।

উত্তর ব্রহ্ম ভ্রমণ

(৩)

৩০ শে মার্চ্চ পূর্ব্বাহ্ন ১০টার সময় রওয়ানা হইয়া ঐ দিবস রাত্রি ৮৷৹ টার সময় কাথা উপস্থিত হইলাম। এখানে আমরা দুই দিন ছিলাম। কথিত আছে, কাচিন 'কাসা' (Kasa) শব্দ হইতে স্থানটীর কাথা নাম প্রদত্ত হইয়াছে। 'কাসা' শব্দটীর অর্থ কোনও পর্ব্বের স্থান। শুনিতে পাওয়া যায়, যে সময় হইতে এই স্থানকে কাথা বলা হইতেছে, তাহার বহু পূর্ব্বেও এখানে কোন কাচিন বাস করে নাই।

১০১৭ খৃষ্টাব্দে পেগানের রাজা অনরটা (Anawratta) চীনদেশে তীর্থযাত্রা করেন। তিনি রাস্তায় ব্রহ্মদেশের সীমানা স্থাপনের চেষ্টা করেন। বহুসংখ্যক কাচিন এ সময়ে এখানে বাস করিত। ক্রমে ক্রমে তাহারা শান ও বর্ম্মাদের দ্বারা উত্তর দিকের পাহাড়ে তাড়িত হয়। এ সম্বন্ধে কোনও সন্তোষজনক প্রমাণ নাই। রাজা অনরটার আগমনের পর এই জিলার জনসাধারণ ব্রহ্মরাজার অধীনে বাস করিতে থাকে। পুনরায় ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে কাচিনরা এই জিলার উত্তর দিক আক্রমণ করে ও অনেক গ্রাম পোড়াইয়া ফেলে। তৎপর মান্দালয় হইতে জাহাজে সৈন্য আসিলে পর তাহারা পলায়ন করে। ইংরাজ সেনাগণ ১৮৮৬ সালে এই জিলা প্রথমতঃ আক্রমণ করে। কয়েক বৎসর পর ধীরে ধীরে শান্তি স্থাপিত হয়।

সহরের মধ্যস্থানে মিয়ারেডী (Myaredi) নামক মন্দিরটী বিখ্যাত। পাটনার রাজা এই মন্দিরটী প্রস্তুত করাইয়াছিলেন বলিয়া জনসাধারণের বিশ্বাস। ব্রহ্মবাসীদের নিকট এই রাজা পটই-পট-পি-রাজ থিন্-ধর্ম্ম-থোকা মিন্ (Thin-dhamma-thawka Min of Patayi-pot-pye) নামে পরিচিত ছিল। এই মন্দিরটী তখন অতি ক্ষুদ্র ছিল।

পাটনার রাজা একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ৮৪,০০০ মন্দির, ৮৪,০০০ কূপ ও ৮৪,০০০ পুকুর কাটাইয়াছিলেন। ব্রহ্মবাসীরা এই স্থানকে রাজা অশোকের বিশাল সাম্রাজ্যের এক অংশ রূপে নির্দ্দেশ করিত। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে রাজা বোডাও-পেগার (Bodaw-paga) রাজত্বের সময় ইউ-পট্টি (U Pathi) নামক কাথার জনৈক মিওবুজি এই মন্দিরটীর পুনরায় সংস্কার ও আয়তন বৃদ্ধি করান। ইহার চতুর্দ্দিকের চূড়াগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিখ্যাত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে বুদ্ধ-যেজার (Buddha-yaza) বিদ্রোহের সময় কাচিনরা এই নগর দখল করিয়া মন্দিরটীর অনেকাংশ নষ্ট করিয়া ফেলে। তৎপরে বর্ম্মাদের শিল্পাদর্শে বর্ত্তমান মন্দিরটী ক্রমে ক্রমে নির্ম্মিত হইয়াছে। সহরের উত্তর দিকে শ্বেগু-গি (Shwegu-gyi) নামে আর একটী মন্দির আছে। রাজা বৌডাও-পেগা (Bodaw-paga) কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে কাথায় খেদা বিভাগ ছিল; কিছু দূরের পাহাড়ে জঙ্গলী হাতী ধরা হইত। সহরটী বেশী বড় নয়। বাজারের নিকটে রাস্তার একধারে হিন্দুদের একটী ছোট ঠাকুর বাড়ী আছে। সহরের পিছন দিকে কয়েকটী ছোট ছোট পাহাড় দৃষ্ট হইল। এই জিলার কিয়াঙ্ক-পেজাং নামক স্বুবর্ণ-খনি হইতে পূর্ব্বে স্বর্ণ উঠান হইত; কিন্তু আজ কাল গভর্ণমেণ্ট এই খনি কাহার নিকট পত্তন করেন না। এই সময়ে (মার্চ্চ মাসে) স্থানীয় বাজারে মৎস্য ও দুগ্ধ একটু সস্তা দরেই পাওয়া যাইত। কাথার লোক সংখ্যা ২,০৮১ (পুরুষ ১,১৭১ ; স্ত্রীলোক ৯১০)।

২রা এপ্রিল পূর্ব্বাহ্ণ দশ ঘটিকার সময় কাথা হইতে রওয়ানা হইয়া, পর দিবস প্রাতে আটটার সময় ভামো (Bhamo) উপস্থিত হইলাম। ঐরাবতী নদী বক্রগতিতে ভামো পর্য্যন্ত গিয়াছে। কাথা হইতে জাহাজে উঠিয়া ভামো যাইতে হয়। পথের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বড়ই মনোমুগ্ধকর। নদীর পার্শ্বের পাহাড়গুলি যেন একটীর গায়ে আর একটী লাগিয়া রহিয়াছে বোধ হইল। নদীর পরিসর সামান্য হইলেও গভীরতা খুব বেশী। কোন কোন পাহাড়ে বড় গাছ একেবারেই নাই; কেবল নীলবর্ণের ঘাস ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বনজ গাছ বর্ত্তমান। নদী-গর্ভের স্থানে স্থানে নীলবর্ণ ঘাস ও ক্ষুদ্র বৃক্ষ পরিশোভিত অনেকগুলি দ্বীপ বা চড়া দেখা গেল।

জাহাজঘাটা হইতে সহর এক মাইল দূর। সার্কিট হাউসে (Circuit house) নামার সময় গাড়ীভাড়া নিয়া বড়ই গোলমালে পড়িতে হইয়াছিল। গাড়োয়ান কিছুতেই এক টাকার কমে গাড়ীভাড়া নিতে রাজি হইল না। সাহেবকে বলা হইলে পর কিছু বকশিসসহ গাড়ীভাড়া চুকাইয়া দেওয়া গেল। সাহেব কিন্তু নিজে কোন বারেই আট আনার বেশী দিতেন না, কিম্বা গাড়ীওয়ালাও তাঁহার সঙ্গে গোলমাল করিতে সাহস করিত না। রাত্রিতে ফিরিয়া যাইবার সময় আবার উপদ্রব ; এবার সাহেব নিকটে না থাকায় গাড়োয়ানকে ১৲ এক টাকা করিয়াই দক্ষিণা দিতে হইল।

পোষ্টাফিস অতিক্রম করিলে একটী সুন্দর মন্দির লক্ষিত হয়। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই খৃষ্টানদের গোরস্থান দেখা যায়। সহরটী বেশ বড়। এখান হইতে চীন দেশে যাইবার রাস্তা আছে। বাজারে প্রচুর পরিমাণে মৎস্য, মাংস ও তরকারী বিক্রয় হয়। দামও খুব সস্তা।

ভামোর সার্কিট হাউসটীই বোধ হয় ব্রহ্মদেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ; মান্দালয় ও অন্যান্য স্থানের তুলনায় ইহার বিশেষত্ব আছে। ইহার এক দিকে জিমখানা ক্লাব ও বামদিকে কিছু দূর গেলেই ডিপুটী কমিশনারের বাড়ী দেখিতে পাওয়া যায়। ৪ঠা তারিখ প্রায় ৫০।৬০ জন সৈন্য বাঁশী বাজাইয়া কুচকাওয়াজ করিয়া নদীর অভিমুখে কোনও সামরিক কর্ম্মচারীকে অভ্যর্থনা করিতে চলিয়া গেল। বাজনা ও তালে তালে সৈন্যদের পদচালনের শব্দে সজীবতা অনুভব করিলাম। সীমান্ত প্রদেশে শান্তি স্থাপনের জন্য দেশী ও বিলাতি দুই দল সৈন্য সহরের দুইটী দুর্গে অবস্থান করে।

রাজা বোডাও শিবো মিন্ (Bodaw Shwebo Min)

জোরসিংকে আসামের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করান। জোর সিংহের ভ্রাতা টবোংযেজা(Tabaung Yeza)পাঁচশত সৈন্যসহ ভামো আসেন। অদ্যাপিও তাঁহার বংশধরেরা ভামোর একটু উত্তরে বাস করিতেছেন। তাঁহারা নিজেদের মধ্যে কেহ কেহ সানদিগের সঙ্গে সম্বন্ধও করিতেছে। টবোং যেজার কন্যার সহিত রাজা মিণ্ডন মিনের বিবাহ হইয়াছিল।

সান-ভাষায় ভামোর নাম মাং (Man) বা ওয়াংমো (Wanmaw)। ইহা কুম্ভকারদের গ্রাম ছিল। বর্ত্তমান সহরের উত্তর প্রান্তে সম্পনগো (Sampanago)বা চম্পনগরের ধ্বংসাবশেষ দ্রষ্টব্য। এইখানে ইংরাজদিগের প্রাচীনতম বাণিজ্য-কুঠীর ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে। পালি চম্পানগর শব্দ হইতে বর্ম্মা-ভাষায় 'সম্পনগো' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। যদিও ভামোর উত্তর ভাগকেই চম্পনগর বলা হইয়া থাকে, তথাপি এখন হইতে আমি সমস্ত সহরটীকেই চম্পনগর বলিয়াই উল্লেখ করিব ; কারণ এই শব্দটা বাঙ্গালী পাঠকবর্গের নিকট অধিকতর শ্রুতিমধুর হইবে।

অতি পুরাতন কালে শেক্‌টু-মিন্ (Sektu Min) নামে চম্পনগরের এক রাজা ছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ ১৩০৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চম্পনগরে রাজত্ব করেন। শেষ রাজার নাম স্ববোয়া-থো-কিংবি (Sawbwa Tho-kyinbwe)। তিনি পূর্ব্বগামী রাজাদের ন্যায় ক্ষমতাসম্পন্ন না হওয়ায়, চম্পনগর হইতে ভামোতে রাজধানী উঠাইয়া আনেন। তৎপরে প্রজা-সাধারণের আবেদনানুসারে শানরাজকর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত আরও দুই বংশ ভামোতে রাজত্ব করেন। সর্ব্বশেষে রাজা অশোকের সময় তাঁহার আদেশানুসারে পুনরায় চম্পনগরে রাজধানী উঠাইয়া আনা হয়। কথিত আছে যে বুদ্ধদেব পূর্ব্বজন্মে যখন কাক-দেহধারী ছিলেন, তখন এখানে সেই কাকের বসতি ছিল ; সুতরাং রাজা অশোক এই স্থান পবিত্র বলিয়া শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, এবং এই স্থানকে পুনরায় সমৃদ্ধিশালী করার ইচ্ছায় রাজধানীর পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। চম্পনগরের নিকটবর্ত্তী শ্বি-কি-না (Shwe-kyi-na) নামক মন্দিরটী রাজা অশোকের তত্ত্বাবধানে নির্ম্মিত হয়। উত্তর ব্রহ্ম গেজেটে লিখিত আছে, তাঁহার রাজ্যে যে ৮৪০০০ সহর ছিল, চম্পনগর তাঁহার মধ্যে একটী। তখন রাজার আদেশ মত প্রতি সহরেই একটী মন্দির, একটী পুকুর ও একটী কূপ খনন করা হয়। এই সময়ে নিম্নলিখিত আরোও তিনটী মন্দির প্রস্তুত হয়।

(১) চম্পনগরের বিপরীত দিকে হাকান্ (Hakan) নামক স্থানে মিয়া-জেদি (Mya-zedi) নামক মন্দির। এই নামের একটী মন্দির কাথাতেও বর্ত্তমান আছে। (২) কোয়াং-টোয়াং পাগোডা (Kaungtaung pagoda); ইহা সাধারণতঃ শ্বি-জিগোন্ (Shwe-zigon) মন্দির নামেই খ্যাত হইয়া থাকে। (৩) ভামোতে অবস্থিত শ্বি-জেদি (Shwe-zedi) মন্দির।

রাজা মিণ্ডনের সময়েও ভামোতে সুশাসনের অভাব ছিল। মিণ্ডনের পুত্র শেষ ব্রহ্ম রাজা থিবোর সময়ে নানা গোলমাল হইতেছিল, এমন কি একজন শাসনকর্ত্তা সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিতে না পারায় অপমানিত হন ও তৎপদে আর একজন নিযুক্ত হয়। শেট-কিন্ (Set-kyin) নামক একব্যক্তি পূর্ব্ব-পদচ্যুত শাসনকর্ত্তার প্রধান বন্ধু ছিলেন। তাঁহার চক্রান্তে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। এই ব্যক্তিকে দমন করিবার জন্য যুদ্ধে অকৃতকার্য্য হওয়ায় তখনকার বর্ম্মা সেনাপতি শেট-কিনের চীন সেনাগণকে ঘুষ দিয়া তাহাকে ধরিয়া যমালয়ে প্রেরণ করে। ভামোতে বহু পূর্ব্ব হইতেই নানা প্রকারের ব্যবসা বাণিজ্য চলিতেছিল। চীনাদের ব্যবসা যাহাতে নষ্ট না হয় ও সহরে শান্তি স্থাপিত হয় তজ্জন্য তাহারা একত্রে মিলিয়া শেট্‌কিন্‌কে সাহায্য করিত। যুক্তপ্রদেশের ভূতপূর্ব্ব মাননীয় লাটসাহেব স্যার চার্লস ক্রসথ্বেটের (Sir Charles Crosthwaite) 'ব্রহ্মদেশে শান্তি-সংস্থাপন' (Pacification of Burma) নামক পুস্তকে ভামো ও উত্তর ব্রহ্মদেশের অন্যান্য স্থান কিরূপে ব্রিটীশ শাসনের অধীনে আসে তাহার অতি বিশদ বিবরণ আছে। ভামো কিরূপে ব্রিটীশ শাসনের অধীনে আসে তাহার অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

১৮৫৫ সালে ভামোর সহিত চীনদেশের বাণিজ্যের পরিমাণ মোটামুটি ৭৫ লক্ষ টাকা ছিল। কিন্তু ইহার পর ১২ বৎসর পর্য্যন্ত য়ুনান (Yunnan) অর্থাৎ চীনদেশে মুসলমান বিদ্রোহের জন্য এবং অন্য কারণে এখানকার ব্যবসাবাণিজ্য বন্ধ ছিল। পুনরায় অবাধ বাণিজ্যের পথ সুগম করিতে এবং বাণিজ্যের অবরোধের সহায়তাকারী কাচিন, সান ও প্যান্থিস্ (Panthis) দিগকে দমন করিতে ও চীনে-যাইবার রাস্তাদি পরীক্ষা করিতে ইংরাজ পক্ষ হইতে কর্ণেল ই, বি, শ্লাডেন্‌কে (Colonel E. B. Sladen) পাঠান হয়। ইহার ফলে ১৮৬৯ সালের মার্চ্চ মাসে কাপ্তান ষ্ট্রোভার (Captain Strover) ব্রিটীশ রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হন এবং এই সময় হইতেই এখানে ইংরাজ শাসনের সূত্রপাত হয়। মং-মিয়েনের (Mang Myen) শাসনকর্ত্তার সঙ্গে ভামোর ব্রিটীশ অধিবাসীগণ কিছু কালের জন্য বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হয়। পুনরায় ব্রিটীশ রেসিডেণ্টদিগের ক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য ও বাণিজ্যবিস্তারের পথ সুগম করিবার জন্য ইংরাজপক্ষ হইতে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল হোরেস্ ব্রাউনকে (Colonel Horace Browne) পাঠান হয়। যাহাতে কোনও গোলমাল না হয়, তজ্জন্য চীনের রাজকর্ম্মচারীদিগকে জানান হয় যে এই মিশনের সভ্যেরা ইংরাজ। পিকিঙ্গের ইংরাজ মন্ত্রী মিঃ অগষ্টস্ রেমণ্ড মার্গারীকে (Mr. Augustus Reymond Margary) এই মিশনের সভ্যদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিবার জন্য চীনসীমান্তে পাঠান হয়। মিঃ মার্গারী ভামোতে আসিয়া ব্রাউনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তৎপর তিনি মান্-ওয়েং সহরে (Man-waing) গমন করেন ও তথায় চীনারা তাঁহাকে খুন করে।

এই জিলার অধিকাংশ অধিবাসীই কৃষক। এখানে ধান্য, তামাক ও ভুট্টা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ভামোর নিকট-বর্ত্তী স্বে-গু (Shwegu) মহকুমায় প্রতি বৎসর বিস্তর মৎস্যের আমদানী হয়। পূর্ব্বে মো-হ্‌নিনের (Mo-hnyin) মিয়োযুজি বাৎসরিক ৪,০০০ টাকা জমায় এই স্থানে মৎস্য ধরিতে পারিত। আজকাল বোধ হয় ইহার আয় ৪।৫ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই মহকুমায় ৬০,০০০ হাজার একার (১ একর = তিন বিঘা অৰ্দ্ধকাঠা) স্থান ব্যাপিয়া সেগুনকাঠের বাগান আছে। আরও অনেক রকম কাঠ এখানে পাওয়া যায়।

ঐরাবতীর উত্তরে মূল্যবান মরকতের (Jades) খনি আছে। প্রতিবৎসর অনেক টাকার প্রস্তর এই খনি হইতে উত্তোলিত হয়। কাচিনরা অহিফেনের ব্যবসা করে। ইহার উপর অন্যান্য জিনিসের আমদানী ও রপ্তানি ত আছেই। ১৮৯০-৯১ খৃষ্টাব্দে মরকতের কারবারে ৫২,৫০০৲ টাকা পাওয়া গিয়াছিল। ভামোর লোকসংখ্যা ৭,৩৫৯ (পুরুষ ৪,৭১৬; স্ত্রীলোক ২,৬৪৩)।

৫ই তারিখ প্রাতে আট ঘটিকার সময় ভামো হইতে রওয়ানা হইয়া ঐ দিবস অপরাহ্ণ ৪॥০ ঘটিকার সময় কাথা পহুঁছিয়া গাড়ীতে উঠিলাম ও ৭ই তারিখ প্রাতে ৮-৪০ মিনিটের সময় রেঙ্গুন পঁহুছিলাম। রাস্তায় গরমে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। (সমাপ্ত)।

শ্রীনলিনীকান্ত দাশগুপ্ত।

সুখ *

বিষণ্ন বদনে ছায়া রুদ্ধ বেদনার,
কেন আজি কাতর নয়ন?
ফুটন্ত হাসির রেখা অধরে তোমার
আর নাহি খেলে কি কারণ?

সুখ-সূর্য্য আজি তব হেরি অস্তমান
হয়েছে কি ব্যথিত হৃদয়?
জান না কি বিধাতার ইহাই বিধান,
চিরদিন কে কোথায় রয়?

---

* W. S. Landor রচিত Why Repine নামক কবিতার ছায়া অবলম্বনে লিখিত।

ইন্দ্রধনু হের অই শোভিয়া গগনে
নিমেষের মাঝে মিশে যায়,
ক্ষণ-প্রভা হাসি ক্ষণ চঞ্চল চরণে
ব্যস্ত হ'য়ে ছুটিয়া পলায়।

উজ্জ্বল কিরণ ঢালি ধরণীর গায়
রবি শশী ক্ষণেকের তরে,
বিধির বিধানে ছোটে আরেক ধরায়
আলোকিতে আপনার করে।

হাসি আসে মধুমাস পিককুল ল'য়ে,
নানাবিধ কুসুম-সম্ভার ;
নৃত্য করে এ জগৎ মদমত্ত হ'য়ে ;—
কতদিন সে সুখ ধরার ?

কেন তবে বৃথা তুমি করিছ রোদন ?
কেন তব বিষণ্ণ বদন ?
যাহার সুখের তরে এত আয়োজন,
কতদিন রবে সে জীবন ?

সুখ দুঃখ বিধাতার অলঙ্ঘ্য শাসন,
সুখী যেই-মানি চলে তায় ;
নিয়তির চক্রে তারা নেমির মতন
ঘুরে আসে ফিরে চলে যায়।

সুখ-রবি কেন তব অদৃষ্ট গগন
চির তরে করিবে উজ্জ্বল ?
চলেছে নিয়মে তার করিতে সাধন
অন্য কোন জীবের মঙ্গল।

লভিয়াছ এতদিন সুখ এ জীবনে
ভাগ্যবান্! যাহার ইচ্ছায়।
ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি দেও তাঁহার চরণে,—
ধন্যবাদ জগৎ-পিতায়।

শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত।

বিক্রমপুর

(প্রতিবাদ)

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এক অভিনব বিক্রমপুর আবিষ্কার করিয়াছেন। এই অভিনব বিক্রমপুর পশ্চিম বঙ্গে অবস্থিত। এই আবিষ্কারের পূর্ব্বে প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব মহাশয় যে যে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে এই অভিনব বিক্রমপুরের কোন উল্লেখ নাই।

যে প্রকার 'গবেষণা' অবলম্বন করিয়া নগেন্দ্রবাবু অভিনব বিক্রমপুর আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার দ্বাবিংশ ভাগের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। 'ঢাকার ইতিহাস' লেখক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয় নগেন্দ্রবাবুর উক্তির প্রতিবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। নগেন্দ্র বাবু প্রতিবাদের প্রতিবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা এই প্রবন্ধে নগেন্দ্রবাবুর 'গবেষণার' সমালোচনা করিতে ইচ্ছুক।

নগেন্দ্রবাবু তাঁহার প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—"তাই বহুকাল হইতে নদীয়া, যশোহর, খুলনা, ঢাকা ও ফরিদপুরের অধিবাসী রাঢ়বাসীর নিকট "বাঙ্গাল" বলিয়া পরিচিত(১)।" এস্থানে নগেন্দ্রবাবু তাঁহার সুরুচির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন।

নগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন যে জাতীয় ইতিহাসের রাজন্যকাণ্ড প্রকাশ করা পর্য্যন্ত তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, সেনরাজধানী বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার পূর্ব্ববঙ্গেরই কোন স্থানে ; সীতাহাটির তাম্রশাসন এবং ধোয়ীকবির পবন-দূতপাঠে তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়।

শ্রীবিক্রমপুর বর্ম্মানরপতিগণের, শ্রীচন্দ্রদেবের, এবং সেনরাজগণের রাজধানী ছিল। বিক্রমপুর যে স্থানেই হউক, ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে বাঙ্গালার ইতিহাসে বিক্রমপুর অতি প্রসিদ্ধ স্থান। নগেন্দ্রবাবু বিশ্বকোষ ও জাতীয় ইতিহাসের বহু খণ্ড প্রকাশ করিয়াছেন; এই সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশ করার পূর্ব্বে বিক্রমপুর কোথায়, তৎসম্বন্ধে কোন প্রকার

(১) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২২ভাগ, ১সংখ্যা, ৭৫পৃষ্ঠা।

নির্দ্ধারণ না করিয়া কেবল 'বিশ্বাস' মূলেই এতগুলি গ্রন্থ রচনা করিলেন। আমরা স্বীকার করি যে গুরুতর কোন প্রমাণ আবিষ্কার হইলে ঐতিহাসিক পণ্ডিত তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। কিন্তু কেবল 'বিশ্বাস' মূলে, কোন প্রমাণ অবলম্বন না করিয়া কি ইতিহাস লেখা যায়? বাঙ্গালীর রচিত ইতিহাসের কি এই প্রকার শোচনীয় পরিণতি? আমরা জানিতে চাই যে নগেন্দ্রবাবু ইতিপূর্ব্বে কি কি প্রমাণে বিক্রমপুর পূর্ব্ববঙ্গের কোন স্থানে ছিল বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। পূর্ব্ব প্রমাণগুলি কি কি নূতন প্রমাণে অপ্রমাণিত হইল, তাহা পরিষ্কার করিয়া প্রকাশ না করিলে, আমরা শুধু নগেন্দ্রবাবুর স্পর্দ্ধাতেই তাঁহার সিদ্ধান্ত প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করিতে নিতান্ত অক্ষম।

নগেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। তিনি লিখিয়াছেন, তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে বিক্রমপুর পূর্ব্ববঙ্গের কোন স্থানে। পূর্ব্ববঙ্গের কোন্ স্থানে বিক্রমপুর ছিল, বোধ হয় এ সম্বন্ধে নগেন্দ্রবাবুর কোন ধারণা ছিল না; থাকিলে, অবশ্য তাহা প্রকাশ করিতেন। পূর্ব্ববঙ্গের কোন্ স্থানে বিক্রমপুর ছিল, এ সম্বন্ধে কোন ধারণা না করিয়া বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিতে চেষ্টা করা কতদূর সঙ্গত তাহা সুধীজনের বিচার্য্য।

আর একটি বিষয়ের আলোচনা করা আবশ্যক। বর্ম্মনরপতিগণের রাজধানী বিক্রমপুর, শ্রীচন্দ্রদেবের বিক্রমপুর, সেনরাজগণের বিক্রমপুর, শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্করের জন্মভূমি বিক্রমপুর এবং ইয়াং চোয়াঙ্গের অধ্যাপক শীলভদ্রের জন্মস্থান বিক্রমপুর অভিন্ন কি না? অথবা তাহা ভিন্ন ভিন্ন বিক্রমপুর? আশা করি, সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় এই প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর প্রদান করিবেন। আমরা তাহা অভিন্ন জ্ঞানেই প্রবন্ধ লিখিলাম।

নগেন্দ্রবাবু রাজন্যকাণ্ডে (২) লিখিয়াছেন যে "দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ মহীপাল দেবের (১ম) সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন; তাঁহার জীবনীলেখকগণ তাঁহাকে বিক্রমপুরের রাজকুমার এবং বজ্রাসনবাসী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীচন্দ্রদেবের সময়ে বিক্রমপুর বৌদ্ধদিগের একটি কেন্দ্র বলিয়া পরিচিত ছিল। ঢাকা জিলার মাণিকগঞ্জ মহকুমাতে যে ধামরাই, শুয়াপুর, এবং বাজাসনের ভিটা বর্ত্তমান আছে, তাহা বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মরাজিকা, সুখাবতীপুর এবং বজ্রাসনের অপভ্রংশ"।

অভিনিবেশসহকারে পূর্ব্ববঙ্গের বৃত্তান্ত পাঠ করিলে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় জানিতে পারিতেন যে, যে বিক্রমপুর শ্রীজ্ঞান অতীশের জন্মভূমি, তাহার একাংশ অদ্যাপি বজ্রযোগিনী বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই স্থানেই শ্রীজ্ঞান অতীশ জন্মগ্রহণ করেন। রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয়ও ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রমণবর ইয়াং চোয়াং প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহার অধ্যাপক শীলভদ্রের জন্মস্থান সমতট। শ্রীবিক্রমজয়স্কন্ধাবার সমতটের একাংশ। মিনহাজও বলিয়াছেন যে লক্ষ্মণ সেনের বংশধরগণ তাঁহার তবকতি নাসিরি গ্রন্থরচনার সময়ে সমতটের অধিপতি ছিলেন। সম্ভবতঃ, এই স্থানে অথবা ইহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে খড়্গবংশীয় নরপতিগণ রাজত্ব করেন। আসরফপুরের তাম্রশাসন দ্বারা প্রদত্ত ভূমি প্রকৃত বিক্রমপুর হইতে দূরবর্ত্তী নহে।

বাস্তবিক প্রকৃত বিক্রমপুরে বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্ম্মাবলম্বীগণ এক সময়ে প্রাধান্য লাভ করেন। হরিবর্ম্মাদেব তাহা দমন করিতে চেষ্টা করেন। ইহার প্রমাণ নগেন্দ্রবাবুর প্রকাশিত ভবভূমিবার্ত্তা। 'জৈনবৌদ্ধাদিবিধর্ম্মি শর্ম্মসম্মর্দ্দনখর্ব্বীকৃত"।

হরিবর্ম্মাদেবের রাজধানী শ্রীবিক্রমপুর কোথায় ছিল, এ বিষয়ের আলোচনা করা আবশ্যক। হরিবর্ম্মা যে ভোজবর্ম্মা এবং শ্যামলবর্ম্মার পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা নগেন্দ্রবাবু অস্বীকার করিবেন না। নগেন্দ্রবাবুর মতানুসারে হরিবর্ম্মা এবং শ্যামলবর্ম্মা যদি বৈমাত্রেয় ভ্রাতাও স্বীকার করা যায়, তথাপি আমাদের মতে হরিবর্ম্মার অভাবের পরে তাঁহার পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করেন; কিন্তু হরিবর্ম্মার পুত্র হইতে শ্রীচন্দ্রদেব বিক্রমপুর অধিকার করেন। শ্রীচন্দ্রদেবের পরে শ্যামলবর্ম্মাদেব এবং

(২) ২৭৪ পৃষ্ঠা।

অনভাবে ভোজবর্ম্মা রাজত্ব করেন। তদনন্তর সেনরাজগণ বিক্রমপুর অধিকার করেন। পশ্চিমবঙ্গ মুসলমানরাজ্য-ভুক্ত হওয়ার পরেও লক্ষ্মণ সেনের বংশধরগণ বিক্রমপুরে প্রায় শতবর্ষ রাজত্ব করিয়াছেন। আমরা এস্থানে যাহা নির্দ্দেশ করিলাম, তাহার সম্বন্ধে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি। এতদ্দারা বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমারা এই দেখাইতে চাই যে হরিবর্ম্মা শ্যামলবর্ম্মার পূর্ব্ববর্ত্তী। পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসনের ৩য় হইতে ৫ম শ্লোকে বঙ্গাধিপ হরিবর্ম্মাদেবের ইঙ্গিত থাকা নগেন্দ্রবাবুকে দর্শাইয়াছেন। নগেন্দ্রবাবুও তাহা স্বীকার করিয়াছেন (৩)।

শ্যামলবর্ম্মার পিতা জাতবর্ম্মা কর্ণের কন্যা বীরশ্রীর পাণি-গ্রহণ করেন; শ্যামলবর্ম্মা বীরশ্রী দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। পালবংশীয় বিগ্রহপাল (৩য়) কর্ণের অন্য কন্যা যৌবনশ্রীর পাণিগ্রহণ করেন। এই বিগ্রহপাল নয়পাল-দেবের পুত্র। সুতরাং হরিবর্ম্মা নয়পালদেবের সমসাময়িক। হরিবর্ম্মাদেব দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছেন।

হরিবর্ম্মাদেব বঙ্গপ্রদেশের অধিপতি ছিলেন। এস্থানে আমরা ভট্টভবদেবপ্রশস্তির আলোচনা করিব। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের উড়িষ্যার পুরাতত্ত্ব নামক গ্রন্থে ইহা মুদ্রিত আছে। ইহাতে লিখিত আছে যে ভবদেব গৌড়াধিপের নিকট হইতে হস্তিনীভট্ট গ্রাম প্রাপ্ত হন। (৭ম শ্লোকে)। ১০ম শ্লোকে 'বঙ্গরাজ-রাজ্য' লেখা আছে। ২৬ শ্লোকে 'অঙ্গলাসু জাঙ্গপথগ্রামোপকণ্ঠস্থলী সীমাসু রাঢ়ায়াং' লেখা আছে। অর্থাৎ রাঢ়, বঙ্গ, এবং গৌড় তিন প্রদেশেরই উল্লেখ আছে। এই প্রশস্তিতে হরিবর্ম্মা বঙ্গাধিপতি ছিলেন, ইহা অবগত হওয়া যায়।

সুতরাং হরিবর্ম্মাদেবের রাজধানী বঙ্গান্তর্গত প্রকৃত শ্রীবিক্রমপুর; নবাবিষ্কৃত বিক্রমপুর নহে। নগেন্দ্রবাবুও তাহা স্বীকার করিয়াছেন:—

"হরিবর্ম্মাদেবের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, বঙ্গান্তর্গত বিক্রমপুরে তাঁহার রাজধানী ছিল। (৩ক)"।

হরিবর্ম্মাদেবের সময়ে নগেন্দ্রবাবুর কল্পিত বিক্রমপুর পাল নরপতিগণের রাজ্যভুক্ত ছিল। পণ্ডিতবর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে রামপাল যখন গৌড় হইতে অধিকারচ্যুত, তখনও ভাগীরথী ও পদ্মাবতীর অন্তর্গত বাগড়ি তাঁহার রাজ্য-ভুক্ত ছিল (৩খ)। অতএব হরিবর্ম্মাদেবের রাজধানী বিক্রমপুর নগেন্দ্রবাবুর কল্পিত বিক্রমপুর হইতে পারে না।

নগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন যে ঈশ্বর বৈদিকের বিবরণী হইতে জানা যায় যে শ্যামলবর্ম্মার রাজধানী বিক্রমপুর ব্রহ্মপুত্র-জল—কল্লোল—কলয়িত ছিল। অতএব শ্যামলবর্ম্মার রাজধানীও নগেন্দ্রবাবুর আবিষ্কৃত বিক্রমপুর হইতে পারে না। যে স্থানে বিক্রমপুরের সংস্থানভূমি, তাহার পূর্ব্বপার্শ্বে অদ্যাপি ব্রহ্মপুত্রনদের প্রাচীন খাত বর্ত্তমান আছে। প্রাচীন কালে ব্রহ্মপুত্র এই খাত দ্বারা দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত ছিল। ব্রহ্মপুত্রনদ এই স্থানে পূর্ব্বদিকে সরিয়া মেঘনাদনদে সম্মিলিত হইয়াছে, এজন্য ব্রহ্মপুত্রের সেই ভাগ এক্ষণে মেঘনাদ বা মেঘনা নামে পরিচিত। মেজর রেনেলের মানচিত্রে ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহ যে ভাবে চিত্রিত আছে, এক্ষণে আর ব্রহ্মপুত্র সে স্থান দিয়া প্রবাহিত হয় না। লর্ড কর্ণোয়া-লিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে ব্রহ্মপুত্রনদ করইবাড়ি পর্ব্বত-মালার নিকট নৈসর্গিক কারণে প্রাচীন খাত পরিত্যাগ করতঃ নূতন স্থান দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এই প্রবাহ এক্ষণ দাওকোবা, যমুনা ইত্যাদি স্থানীয় নামে জনসমাজে পরিচিত। এক্ষণ ব্রহ্মপুত্রের নূতন প্রবাহের পশ্চিমে রঙ্গপুর, বগুড়া এবং পাবনা এবং পূর্ব্বদিকে ময়মনসিংহ ও ঢাকা। ব্রহ্মপুত্রের এই খাত পরিবর্ত্তনের ফলে পদ্মাবতী বিক্রমপুর পরগণার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া প্রথমতঃ কেদার রায়ের রাজধানী শ্রীপুর এবং অবশেষে রাজবল্লভের কীর্ত্তি ধ্বংস করিয়াছে।

(৩) ব্রাহ্মণ কাণ্ড ২৭৮ পৃষ্ঠা।

(৩ক) ব্রাহ্মণ কাণ্ড, ৩য় অংশ, ৬৮৵ পৃষ্ঠা।

(৩খ) বাঙ্গালার ইতিহাস,২৫২ পৃষ্ঠা।

নগেন্দ্রবাবু ব্রাহ্মণকাণ্ডে ভবভূমি-বার্ত্তা নামক গ্রন্থের নানাস্থান উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার প্রসাদেই আমরা ভবভূমিবার্ত্তার বিবরণ অবগত হইয়াছি। উক্ত গ্রন্থে গঙ্গাগতি নামক জনৈক বৈদিক ব্রাহ্মণের বঙ্গদেশে আগমন করার বৃত্তান্ত লিখিত আছে। গঙ্গাগতি হরিবর্ম্মাদেবের বিক্রমপুরে আগমন করার পরে নরপতি তাঁহ'কে ব্রহ্মপুত্রনদ-প্রবাহিত কোটালিপাড়ের মধ্যে স্থান প্রদান করেন (৫)। কোটালিপাড় প্রাচীন বিক্রমপুরের অন্তর্গত (৬)।

নগেন্দ্রবাবু কি এখন ভবভূমি-বার্ত্তা অপ্রামাণিক বলিয়া পরিত্যাগ করিবেন? আমরা জানিতে ইচ্ছা করি, নগেন্দ্রবাবু পূর্ব্বে যে যে গ্রন্থ প্রামাণিক বলিয়া লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে কোন্ কোন্ গ্রন্থ এক্ষণে বর্জ্জন করিতে হইবে?

বাস্তবিক এই সমস্ত প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও বিক্রমপুরের সংস্থান পশ্চিমবঙ্গে স্থাপন করার চেষ্টা পণ্ডশ্রম।

নগেন্দ্রবাবু তাঁহার আবিষ্কৃত বিক্রমপুর 'শ্রীবিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার' ধার্য্য করার জন্য চারিবার স্থানীয় অনুসন্ধান করিয়াছেন বলিয়া লিখিয়াছেন। একবার দেশপূজ্য মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় এবং প্রবীণ পণ্ডিত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন; শেষোক্ত পণ্ডিতমহাশয়দ্বয়ের এ সম্বন্ধে অদ্যাপি কোন মত প্রকাশ করা আমরা অবগত নহি।

নগেন্দ্রবাবু তাঁহার উক্তি এবং যুক্তির সমর্থন জন্য কতিপয় ব্যক্তির স্বাক্ষরিত (?) একখান লেখ্যও প্রকাশ করিয়াছেন। প্রয়োজন হইলে, আমরাও সহস্রাধিক ব্যক্তির স্বাক্ষরিত লেখ্য প্রকাশিত করিতে পারি। এতাদৃশ লেখ্য প্রকাশ না করিলেই ভাল হইত।

নগেন্দ্রবাবু যাহা লিখিয়াছেন, তাহা দেবগ্রাম সম্বন্ধে; দেবগ্রাম হইতে কল্পিত বিক্রমপুর দুরবর্ত্তী।

আমরা ক্রমে নগেন্দ্রবাবুর প্রমাণের পর্য্যালোচনা করিব।

দেবগ্রাম সম্বন্ধে নগেন্দ্রবাবু যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এই :—

১। প্রথম প্রমাণ। গ্রামবাসীগণের বিশ্বাস, গঙ্গানদী দেবগ্রামের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত ছিল।

২। যখন এখান দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত ছিল, তৎকালে নৌকাঘাটা নামক স্থানে বড় বড় বাণিজ্যপোত আসিয়া লাগিত (ক)।

প্রথম প্রমাণের মূল 'গ্রামবাসীগণের বিশ্বাস'। এতাদৃশ প্রমাণ, প্রমাণ নহে। এরূপ প্রমাণ অগ্রাহ্য।

অপর প্রমাণের মূল 'কল্পনা'। বাঙ্গালা দেশে প্রাচীন কালে যে যে 'বন্দর' ছিল, তাহার প্রমাণ প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। দেবগ্রাম কি তাম্রলিপ্ত? অথবা 'গঙ্গে' বা সুবর্ণগ্রাম? কোন্ ইতিহাস, বা কাহার ভ্রমণবৃত্তান্ত, বা কোন্ গ্রন্থে দেবগ্রামে বড় বড় বাণিজ্যপোত গমনাগমনের বৃত্তান্ত লেখা আছে, আমরা তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। তাহা স্পষ্টরূপে প্রকাশ না করা পর্য্যন্ত আমরা দ্বিতীয় প্রমাণের মূল কল্পনা বলিয়াই নির্দ্দেশ করিব।

৩। নগেন্দ্রবাবুর তৃতীয় প্রমাণ 'বহু প্রাচীন ইষ্টকাদির নিদর্শন' এবং 'বহুসংখ্যক মজা পুকুর'।

যে স্থানে প্রকৃত বিক্রমপুর, নগেন্দ্রবাবু বোধ হয়, সে স্থান পরিদর্শন করেন নাই। পরিদর্শন করিয়া থাকিলে, এগুলি প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করিতেন না।

৪। চতুর্থ প্রমাণ মঞ্জুশ্রী।

আমরা বাল্যকালে যখন অধ্যাপক উইল্‌সন্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত মিল সাহেবের ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ করিয়াছিলাম, তখন দেখিয়াছি, অধ্যাপক উইলসন্ স্থানে স্থানে যে পাদটীকা লিখিয়াছেন, তাহা কখন কখন মূলের বিরোধী। আমরা এখানেও তাহাই দেখিতেছি। পত্রিকার পাদটীকায় লেখা আছে যে বৌদ্ধতন্ত্রে মঞ্জুশ্রীর (৬ক) যেরূপ সাধন লিখিত আছে, এই মঞ্জুশ্রীর সহিত তাহার মিল নাই।

এই মঞ্জুশ্রী দ্বারা বিক্রমপুরে বৌদ্ধপ্রভাব প্রমাণের চেষ্টা করা কতদূর সঙ্গত, তাহা সুধীগণের বিচার্য্য। প্রকৃত

(৫) ব্রাহ্মণ কাণ্ড, ৬৷৴ পৃষ্ঠা।

(৬) ঐ ৬৸৵ পৃষ্ঠা।

(ক) 'বড় বড়' শব্দ আমরা নিম্নরেখ করিয়াছি।

(৬ক) ৩১ পৃষ্ঠা।

বিক্রমপুরে বৌদ্ধ প্রভাবের প্রমাণ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি।

৫। দেবগ্রামে মৃত্তিকাগর্ভ হইতে কয়েকটি দেবমূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়া পঞ্চম প্রমাণ। আমরা তৃতীয় প্রমাণ সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি, এস্থলেও তাহাই প্রযোজ্য। বাস্তবিক, প্রকৃত বিক্রমপুর অনুসন্ধান না করিয়া, বিক্রমপুরের সংস্থান সম্বন্ধে অভিনব মত প্রকাশ করা কোন প্রকারেই সঙ্গত হইতে পারে না।

৬। ষষ্ঠ প্রমাণ, লালদিঘি, গোলদিঘি ইত্যাদি। ইহা দ্বারা কিছুরই প্রমাণ হয় না।

৭। মৃত্তিকাগর্ভ হইতে যে ইষ্টক বাহির হইয়াছে, তদ্দ্বারা একটী পাকা কোঠা প্রস্তুত হইয়াছে।

আমরা নগেন্দ্রবাবুর অবগতির জন্য লিখিতেছি, বিক্রমপুরান্তর্গত বজ্রযোগিনীবাসী আমার এক বন্ধু তাঁহার বাটীতে পুকুর খনন করাতে মৃত্তিকাগর্ভে তিনি যে ইষ্টক পাইয়াছিলেন, তদ্দ্বারা তিনি তাঁহার বাটীতে একটি দ্বিতল অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

এক্ষণে তাহার অষ্টম প্রমাণের কথা। তিনি লিখিয়াছেন (৭) যে, রাম-চরিত হইতে অবগত হওয়া যায় যে পালবংশের অধিকারকালে একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে দেবগ্রাম একটি প্রসিদ্ধ স্থান ছিল।

ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, বর্ম্মানরপতিগণের সময়ে দেবগ্রাম এবং তাহার নিকটবর্ত্তী বিক্রমপুর (?) পালনরপতিগণের অধিকারভুক্ত ছিল। সুতরাং বর্ম্মা নরপতিগণের বিক্রমপুর নগেন্দ্রবাবুর আবিষ্কৃত বিক্রমপুর হইতে পারে না!!!

নগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, তাঁহার বিক্রমপুর এবং দেবগ্রাম এখন বাগড়ির মধ্যে; পূর্ব্বে ইহার কতকাংশ রাঢ় প্রদেশের মধ্যে ছিল। এই সমস্ত উক্তির কোন সার নাই। তিনি দেবগ্রামবাসী 'বনিয়াদী', 'কৃষক' ইত্যাদি নানাবিধ ব্যক্তিগণের উক্তির উপরে নির্ভর করিয়া তাঁহার প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, তিনি সত্যের ভিখারী (৮)। কিন্তু তিনি কি প্রকার সত্যের ভিখারী আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম না। যে স্থান স্মরণাতীত কাল হইতে বিক্রমপুর বলিয়া বঙ্গবাসীমাত্রই অবগত আছেন, রাজন্তকাণ্ড প্রণয়ন করা পর্য্যন্ত তিনি যে স্থান বিক্রমপুর বলিয়া পুনঃ পুনঃ প্রকাশ করিয়াছেন, যে বিক্রমপুর মেঘনাদনদের নিকটবর্ত্তী তিনি প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, সীতাহাটীর তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার হইবার পূর্ব্বে যে স্থান তিনি জাতীয় ইতিহাসে বিক্রমপুর বলিয়া লিখিয়াছেন, সেই স্থান পরিদর্শন না করিয়া, তত্রত্য সুবৃহৎ বল্লালদিঘী, বল্লালের বাড়ী একবার নয়নগোচর না করিয়া, সে স্থান হইতে কত প্রকার দেবমূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার কোন প্রকার অনুসন্ধান না করিয়া, সে স্থানের 'বনিয়াদী', 'কৃষক' এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণের বাক্য শ্রবণ না করিয়া নগেন্দ্রবাবু বিক্রমপুরের সংস্থান নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিলেন, ইহা অতীব বিস্ময়কর!

পণ্ডিতবর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাঙ্গালার ইতিহাসে যে চুড়াইন গ্রামে আবিষ্কৃত রজতময় বিষ্ণুমূর্ত্তির চিত্র প্রদান করিয়াছেন, ঐ চুড়াইন 'বজ্রযোগিনীর' একটি পল্লী।

এক্ষণে আমরা সীতাহাটির তাম্রশাসনের আলোচনা করিব। সীতাহাটির তাম্রশাসন সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে (৯)। এই তাম্রশাসন পাঠ করিয়াই নগেন্দ্রবাবুর প্রথম সন্দেহ উপস্থিত হয়, ইহা তিনি প্রকাশ করিয়াছেন।

সেনরাজগণ শৈব ছিলেন। তাঁহাদের তাম্রশাসন 'সদাশিব মুদ্রয়া মুদ্রিত'। সীতাহাটির তাম্রশাসনের প্রথম দুইটি শ্লোক অর্দ্ধনারীশ্বর মহাদেবের বন্দনা। সেনরাজগণ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়; তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোকে চন্দ্রের বর্ণনা। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকে বল্লাল সেনের প্রপিতামহ সামন্তসেনের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজপুত্রগণের বর্ণনা। এই দুই শ্লোকে লিখিত আছে যে:—এতাদৃশ চন্দ্রবংশে জাত

(৭) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ২২ ভাগ, ৩৬ পৃ।

(৮) পত্রিকা ৭৩ পৃষ্ঠা।

(৯) ২৩১ পৃষ্ঠা, ১৭ ভাগ।

"রাজপুত্রাঃ প্রৌঢ়াং রাঢ়াং ভূষয়ন্তঃ", অর্থাৎ চন্দ্রদেবের বংশজাত রাজপুত্রগণ প্রৌঢ় রাঢ়দেশ ভূষিত করিয়াছিলেন। সপ্তম ও অষ্টম শ্লোকে লিখিত হইয়াছে যে সেই বংশে সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং তাম্রশাসনের পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকোক্ত প্রৌঢ়রাঢ়ভূষা রাজপুত্রগণ সামন্তসেনের পূর্ব্ববর্ত্তীগণকেই লক্ষ্য করিতেছে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোক দ্বারা সামন্তসেন, তাঁহার পুত্র হেমন্তসেন, তাঁহার পুত্র বিজয়সেন, এবং তাঁহার পুত্র বল্লাল সেনের প্রৌঢ় রাঢ় ভূষিত করা বুঝা যায় না। এই দুই শ্লোকের অর্থ এই যে, সামন্তসেনের পূর্ব্ববর্ত্তীগণ রাঢ়দেশে বাস করিতেন। কিন্তু তাঁহারা যে তথায় রাজত্ব করিয়াছেন, তাহা বুঝা যায় না। ৭ম শ্লোকে যে 'তেষাং বংশে' লেখা আছে, তাঁহার অর্থ যাঁহারা প্রৌঢ়রাঢ় প্রদেশের ভূষণ ছিলেন, তাঁহাদের বংশে। বাস্তবিক 'প্রৌঢ়াং রাঢ়াং ভূষয়ন্তঃ' বাক্য সামন্ত সেনের পূর্ব্ববর্ত্তী 'রাজপুত্রাঃ' পদকেই লক্ষ্য করিতেছে।

৭ম এবং ৮ম শ্লোকের অনুবাদে অনুবাদকারক বেষ্টনী মধ্যে (নামে রাজা) লিখিয়াছেন, কিন্তু তাম্রশাসনে সামন্তসেন রাজা ছিলেন, এরূপ উল্লেখ নাই। ৯ম শ্লোকে লেখা আছে যে, সামন্তসেন হইতে হেমন্তসেন জন্মগ্রহণ করেন। ১০ম এবং ১১শ শ্লোক হেমন্তসেন সম্বন্ধে রাজকবির স্তাবকোক্তি। তদনন্তর দুই শ্লোক এই :—

তস্মাদভূদখিল পার্থিব চক্রবর্ত্তী
নির্ব্যাজ বিক্রমতিরস্কৃত সাহসাঙ্কঃ।
দিক্‌পালচক্রপুটভেদনকীর্ত্তিঃ
পৃথ্বীপতি বিজয়সেন-পদপ্রকাশঃ॥

অখিল পার্থিব চক্রবর্ত্তী বিজয়সেন তাহা হইতে (হেমন্ত সেন হইতে) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিক্রমে সাহসাঙ্ককেও লজ্জিত করিয়াছিলেন।

এই সাহসাঙ্ক নরপতি কে? অনুবাদক লিখিয়াছেন, বিক্রমাদিত্য।

১৪। ১৫। ১৬ শ্লোক বিজয়সেনের প্রশংসাবাক্য। ১৭শ শ্লোকে লেখা আছে যে বিলাসদেবী বিজয়সেন নরপতির প্রধানা মহিষী ছিলেন। ১৮শ শ্লোক এই যে বল্লালসেন রাণী বিলাসদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং পিতার অভাবে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৯শ ২০শ শ্লোক বল্লালসেনের প্রশংসাবাক্য। ২১ শ্লোকে লিখিত হইয়াছে যে, রাণী বিলাসদেবী সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে গঙ্গাস্নান করেন এবং তজ্জন্য নরপতি ভূমিদান করেন। দানপত্র "শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ" প্রদত্ত হইয়াছিল। তদনন্তর সম্প্রদানের পরিচয়, ভূমির বর্ণনা ইত্যাদি বিষয় লিখিত হইয়াছে।

সীতাহাটীর তাম্রশাসন পরীক্ষা করিলে তদ্দ্বারা বিজয়সেনের রাজধানী 'শ্রীবিক্রমপুরের' সংস্থান সম্বন্ধে কোন ব্যক্তির কোন প্রকার সন্দেহ হইতে পারে না। সেনরাজগণ দক্ষিণাপথ হইতে বঙ্গদেশে আগমন করেন। তাঁহারা কর্ণাটক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত। দক্ষিণাপথ হইতে ভাগ্যপরীক্ষার জন্য প্রথমতঃ রাঢ় দেশে আসিয়া অবস্থান করেন। রাঢ় অতিক্রম না করিলে বঙ্গে আসা যায় না। রাঢ়ের তদানীন্তন অবস্থাদৃষ্টে সেখানে থাকিয়া ভাগ্য পরীক্ষা করা পরামর্শসিদ্ধ বিবেচনায় তথায় বাস করেন।

বিজয়সেনের একখানা তাম্রশাসনের বৃত্তান্ত রাখালবাবুর গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। এই তাম্রশাসন অদ্যাপি অন্য কোন গ্রন্থে প্রকাশিত হয় নাই। ঐ তাম্রশাসন "বিক্রমপুরোপকারিকা মধ্যে" (১০) প্রদত্ত হইয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বিজয়সেনের রাজধানীও শ্রীবিক্রমপুরে ছিল। সীতাহাটির তাম্রশাসনে মহার্ণবে বাত্যা সঞ্জাত হওয়ার কোন কারণ আমরা দেখিতে পাই না।

বা কুলরত্ন সন্ধ্যা[illegible]ীর রাম[illegible]তে লিখিত আছে, —"দেবগ্রামপ্রতিবদ্ধবসুধাচক্রবালবালবলভীতরঙ্গবহল গলহস্ত প্রশস্তহস্ত বিক্রমো বিক্রমরাজঃ।" নগেন্দ্রবাবু এই বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন।

মহার্ণবে পতিত ব্যক্তি যেমন ভাসমান তৃণ দর্শন করিলেও আশ্রয়ের জন্য তাহাই ধরিতে কর প্রসারণ করে, এই বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বিক্রমপুরের সংস্থান নির্দ্দেশ প্রায় তদনুরূপই প্রতীয়মান হয়।

(১০) বাঙ্গালার ইতিহাস, ২৯২ পৃষ্ঠা

কৈবর্ত্তরাজ বরেন্দ্র অধিকার করায় পরে রামপাল যে যে সামন্তরাজগণের সহায়তা গ্রহণ করেন, তন্মধ্যে দেবগ্রামের বিক্রমরাজ এবং নিদ্রাবলের বিজয়রাজ এবং অন্যান্য সামন্তগণ ছিলেন।

রামচরিতের বর্ণিত দেবগ্রাম সম্বন্ধে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন যে, বঙ্গদেশে বহু দেবগ্রাম আছে। রামচরিতের দেবগ্রাম কোথায় তাহা বলা যায় না (১০ক)।

ইহা দ্বারা রামপালের সময় পর্য্যন্ত দেবগ্রাম যে সামন্তরাজের রাজধানী ছিল তাহা প্রমাণিত হয় এবং দেবগ্রামে ইষ্টক প্রাপ্তির কারণ অনুভব করা যায়। অতএব রামচরিতের এই বাক্য নগেন্দ্রবাবুর দেবগ্রাম সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইলে, ইহা দেবগ্রাম-বিক্রমপুর (?) সেনরাজগণের রাজধানী না থাকার প্রমাণ বলা যাইতে পারে। নগেন্দ্রবাবু একবার ইহা চিন্তা করিয়া দেখিবেন যে, তাঁহার লেখ্য তাঁহার বিরুদ্ধ প্রমাণ।

রামচরিতের দেবগ্রাম যদি নগেন্দ্রবাবুর দেবগ্রামই স্বীকার করা যায়, তথাপি তাহাতে বিক্রমপুরের সংস্থান নির্ণয়ের পন্থা আবিষ্কার করা যায় না।

এক্ষণে সীতাহাটি তাম্রশাসনোক্ত "নির্ব্যাজ বিক্রম তিরস্কৃত সাহসাঙ্কঃ" সম্বন্ধে বিচার আবশ্যক। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার তাম্রশাসনপ্রকাশক মহাশয় এই অনুবাদ করিয়াছেন, "তিনি অকপট বিক্রমে বিক্রমাদিত্যকেও লজ্জিত করিয়াছিলেন (১১)।" 'সাহসাঙ্ক' শব্দে বিক্রমাদিত্য বুঝাইলে অনুবাদ ঠিক হইয়াছে। সাহসাঙ্ক পদ দ্বারা যে বিক্রমাদিত্য বুঝায়, তাহা আমরা অস্বীকার করিতেছি না। কিন্তু এই বিক্রমাদিত্য ভারতবিখ্যাত বিক্রমাদিত্য, যাহার প্রভাব ভারতের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এই বিক্রমাদিত্যের দ্বারা দেবগ্রামসামন্ত ক্ষুদ্র ভূস্বামিকে লক্ষ্য করা হয় নাই। রাজকবি দেবগ্রামসামন্তসহ বিজয়সেনের তুলনা করিতে প্রয়াস করেন নাই। দেবগ্রাম-সামন্তসহ বাঙ্গালার অধিপতি বিজয়সেনের তুলনা করিলে সেনরাজেরই অবমান হয়। দেবগ্রামসামন্ত বিক্রমকে পরাস্ত করিলে বিজয়সেনের কি পৌরুষ হইতে পারে? রাজকবি কখন প্রচণ্ড সূর্য্যরশ্মিসহ খদ্যোতালোকের তুলনা করিতে চেষ্টা করেন নাই। সীতাহাটির তাম্রশাসনোক্ত সাহসাঙ্কসহ দেবগ্রামসামন্ত বিক্রমের অভিন্নতা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা সম্বন্ধে আর অধিক কি বলিব? এরূপ চেষ্টার দ্বারা ঐতিহাসিক সত্য নির্ণীত হইতে পারে না।

পরিশেষে নগেন্দ্রবাবু আনন্দভট্টের বল্লালচরিতের প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছেন। বল্লালচরিত হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, যথাঃ—

বসতিস্ম নৃপঃ শ্রীমান্ পুরা গৌড়ে পুরোত্তমে।
কদাচিদ্বা যথাকামং নগরে বিক্রমেপুরে॥
স্বর্ণগ্রামে কদাচিদ্বা প্রাসাদে সুমনোহরে।
রমমাণঃ সহস্ত্রীভি র্দিবীব ত্রিদিবেশ্বর॥

এই দুই শ্লোক হইতে নগেন্দ্রবাবু বলেন যে বিক্রমপুর রাঢ় দেশে বা তন্নিকটে অবস্থিত ছিল। সুধীগণ দেখিতে পাইবেন যে মূল শ্লোকদ্বয়ে 'বিক্রমপুর' রাঢ় দেশে বা তন্নিকটে অবস্থিত থাকার কোন প্রমাণ নাই। প্রত্যুত, বল্লাল-চরিত পাঠে বিক্রমপুর ধবলেশ্বরী অর্থাৎ ধলেশ্বরীর নিকটবর্ত্তী শ্রীবিক্রমপুরে থাকাই দৃষ্ট হয়। কারণ, তৃতীয় অধ্যায়ে লিখিত আছেঃ—

একদারুহ্য জবনমশ্বং রাজা যদৃচ্ছয়া।
প্রযযৌ ধবলেশ্বর্য্যা স্তীরং রুচির কাননম্॥ ১

চতুর্থ অধ্যায়ে

পতিত্বা ধবলেশ্বর্য্যাং নিমজ্জেয়মহং ধ্রুবং। ৩০

অভিনিবেশসহকারে পাঠ করিলে দেখিতে পাইবেন যে, এই সময়ে বল্লালসেন এবং বল্লালচরিতবর্ণিত চর্ম্মার-কোরি-তনয়া বিক্রমপুরের প্রাসাদে অবস্থান করিতেন। নতুবা গৌড় বা নগেন্দ্রবাবুর কল্পিত বিক্রমপুর হইতে ধবলেশ্বরী নদীতে আগমন করার কোন কারণ হইতে পারে না, এবং

(১০ ক) ২৬০ পৃঃ।
(১১) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৭ ভাগ, ২৪০ পৃষ্ঠা।

চর্ম্মকার-তনয়া ধবলেশ্বরী নদীতে ডুবিয়া মরিবার কথাও হইতে পারে না।

ধোয়ীকবির পবনদূত পাঠ করিয়া নগেন্দ্র বাবুর ধারণা হইয়াছে যে, রাঢ়দেশই সেনবংশের পূর্ব্বলীলাস্থলী; গঙ্গাতীরেই বিজয়সেন, বল্লালসেন, ও লক্ষ্মণসেনের রাজধানী ছিল।

ধোয়ীকবির পবনদূতপাঠে রাঢ়দেশ সেনবংশের পূর্ব্বলীলাস্থলী হইলেও তাহাতে বিক্রমপুরের সংস্থান নির্ণয় হয় না। রাঢ়দেশ সামন্তসেনের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজকুমারগণের লীলাস্থলী। সীতাহাটির তাম্রশাসনদৃষ্টে সেনরাজ বিজয়সেনদেবই সেনবংশীয় প্রথম নরপতি অনুমান হয়। ধোয়ীকবির গ্রন্থে রাজধানী গঙ্গাতীরে থাকার কোন প্রমাণ নাই। গঙ্গাতীরে বাস করার জন্য তাঁহারা কখন কখন গৌড়নগরে বাস করিতেন।

ধোয়ীকবির কোন শ্লোক নগেন্দ্রবাবু উদ্ধৃত করেন নাই। সুতরাং এ বিষয়ের অধিক আলোচনা অনাবশ্যক।

যতীন্দ্রবাবুর প্রতিবাদের উত্তরে নগেন্দ্রবাবু যাহা লিখিয়াছেন, তাহা যেন 'তান্ প্রতি নৈষঃ যত্ন' প্রকারের লেখা বলিয়া অনুমান হয়। তাহাতে নূতন কোন প্রমাণ দেখিতে পাইতেছি না।

একস্থানে লিখিয়াছেন যে ঢাকার ইতিহাসলেখক বিক্রমপুর পরগণার মধ্যে বিক্রমপুর নামে কোন সহর বা গ্রামের অস্তিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। এ স্থানে যে যুক্তি অবলম্বন করা হইয়াছে তাহা সত্য হইলে, স্বীকার করিতে হইবে যে হস্তিনাপুর, ইন্দ্রপ্রস্থ, কপিলবস্তু, কুশীনগর, কৌশাম্বী প্রভৃতি বহু ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নগর কোন কালে ছিল না, কারণ এক্ষণে সে সকল 'সহর' বা গ্রাম" কোথায়? নগেন্দ্রবাবু কি তাহা নির্ণয় করিয়া দিবেন? তথাপি সেনরাজগণের 'শ্রীবিক্রমপুরের' ভগ্নাবশেষ দেখিবার ইচ্ছা থাকিলে, অমরাবতীসদৃশ মহানগরীর সুরম্য প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া ভীষণ তরঙ্গমালা-ভূষিত পদ্মাবতী ও 'তটশালিনী যমুনার' জলের ন্যায় জল-বিশিষ্ট মেঘনাদের সঙ্গমস্থলের নিকটবর্ত্তী স্থান পরীক্ষা করিলেই ভাল হইত। যদি বিক্রমপুর পরগণার মধ্যে কোন সহরের ভগ্নাবশেষ না থাকিত, তবে রাজন্যকাণ্ড প্রচার পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসু-বারিধি মহাশয় কোথায় শ্রীবিক্রমপুর বুঝিয়াছিলেন, বলিতে পারেন কি? আমরা তাঁহার অবগতির জন্য লিখিতেছি যে, যে স্থান এক্ষণে রামপাল বলিয়া খ্যাত, সেই স্থান এবং তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান বর্ম্মানরপতিগণের, শ্রীচন্দ্রদেবের, শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্করের, ইহাং চোগাঙ্গের অধ্যাপক শীলভদ্রের এবং সেনরাজগণের শ্রীবিক্রমপুর।

লক্ষ্মণসেনের পরবর্ত্তী কেশবসেন এবং বিশ্বরূপসেন নরপতিদ্বয়ের তাম্রশাসন উল্লেখ করিয়া নগেন্দ্রবাবু বিক্রমপুরের সংস্থান নির্ণয় করিতে যত্ন করিয়াছেন। এই দুইখানা তাম্রশাসনের বৃত্তান্ত 'জাতীয় ইতিহাস' প্রকাশ করার পূর্ব্বেও নগেন্দ্রবাবু অবগত ছিলেন। তখন কি দুইখানা তাম্রশাসন পরীক্ষা করেন নাই?

এই দুই তাম্রশাসন সম্বন্ধে যতীন্দ্রবাবু যে উত্তর দিয়াছেন, তাহাই প্রচুর। কেশবসেনের তাম্রশাসনে লেখা আছে; "বঙ্গে বিক্রমপুরভাগপ্রদেশে"। বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসনে লেখা আছে:—"বঙ্গে বিক্রমপুরভাগে"। বিজয়সেনের তাম্রশাসনে লেখা আছে:—"বিক্রমপুরোপকারিকা মধ্যে" (১১ক) এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে এই তিন উক্তি দ্বারা কি বিক্রমপুর বঙ্গের বাহিরে বুঝা যায়? আমরা কিন্তু তাহা বুঝিতে পারি না। এই তিনখানা তাম্রশাসনের পাঠে বিক্রমপুর বঙ্গের অন্তর্গত "শ্রীবিক্রমপুর" বলিয়াই আমরা বুঝিতে পারিতেছি।

দেবগ্রামে ইষ্টকাবশেষ-প্রাপ্তির কারণ নগেন্দ্রবাবুই এক প্রকারে দর্শাইয়াছেন। এখানে সামন্তরাজের যে প্রাসাদ ছিল, তাহারই ভগ্নাবশেষ সম্ভবতঃ দেবগ্রামে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

নগেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন যে, তত্রত্য অধিবাসীগণ তাহা 'বল্লালের ভিটা' বলিয়া দর্শাইয়া থাকেন। অনেকে মানবধর্ম্ম-শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশের নিকটবর্ত্তী মৎস্যপ্রদেশের অধিপতি

(১১ক) রাখালবাবুর বাঙ্গালার ইতিহাস ২৯২ পৃষ্ঠা।

বিরাজ বাবু এবং উত্তর-গো-গৃহ-রণ-স্থল উত্তর বঙ্গে দর্শাইয়া থাকেন। ইহাতে কি মৎস্য দেশ বগুড়া জিলাতে স্থাপন করা যায়? তাহা হইলে মানবধর্ম্মশাস্ত্রে যে লেখা আছে যে কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পাঞ্চাল, শূরসেন প্রদেশ ব্রহ্মাবর্ত্তের নিকটবর্ত্তী, তাহা অপ্রামাণিক হইয়া উঠে। বল্লালসেন বঙ্গদেশে অতি প্রসিদ্ধ নরপতি ছিলেন। প্রাচীন প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া যদি কেহ 'বল্লালের ভিটা' বলিয়া থাকে এরূপ শ্রুত্যুক্তি ঐতিহাসিক প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না।

দেবগ্রামে যদি প্রকৃতই বল্লালের প্রাসাদ থাকিত, তবে তাহা হইতে দূরবর্ত্তী অকিঞ্চিৎকর বিক্রমপুর গ্রামের নামে রাজধানী কেন প্রসিদ্ধ হইল? সেনরাজগণের কোন তাম্রশাসনে, শিলালিপিতে, অন্ততঃ বল্লাল-চরিতে দেবগ্রামের উল্লেখ নাই কেন?

নগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন যে, কেহ কেহ দেবগ্রামকে দেবল রাজার রাজধানী বলিয়া থাকে। কিন্তু তিনি বিশেষ অনুসন্ধানে অবগত হইয়াছেন, এই 'কেহ কেহ' ব্যক্তিগণের উক্তি ভ্রমসঙ্কুল। তিনি বিশেষ কি অনুসন্ধান করিলেন, তাহা আমরা অবগত নহি, তিনিও তাহা প্রকাশ করেন নাই। আমরা নির্দ্দেশ করিতেছি যে এই বিষয়ে বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিলেই নগেন্দ্রবাবু জানিতে পারিবেন যে দেবগ্রাম বা তাহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে সেনরাজগণের শ্রীবিক্রমপুর ছিল না।

সম্রাট আকবর মুজার সহিত সন্ধি স্থাপন করেন, সেই মুজার রাজধানী ব্রহ্মপুত্রতীরবর্ত্তী সুবর্ণগ্রাম ছিল। মুজা সেনরাজগণের বংশধর দনুজ বা দনুজমাধব। কালে হয় ত, কেহ নির্দ্দেশ করিবেন যে দনুজমাধবের সুবর্ণগ্রাম পশ্চিম বঙ্গে। (খ)

নগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন যে বল্লালসেন পূর্ব্ববঙ্গ হইতে কুলবিধি প্রচার করেন নাই। সেনরাজগণের তাম্রশাসনগুলিতে কুলবিধির কোন উল্লেখ না থাকাতে, ঐতিহাসিকগণ বলেন যে কুলবিধি বল্লালসেনের প্রচলন করার প্রমাণ নাই। প্রত্যুত বল্লালসেন তাহা প্রচলন করিয়া থাকিলে তাম্রশাসনে তাহার উল্লেখ থাকিত। ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণের এই তর্ক যুক্তিসঙ্গত কি না, আমি তৎসম্বন্ধে এক্ষণ কোন মত প্রকাশ করিব না। বল্লালসেনের কুলবিধি-প্রচলন করা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া ধার্য্য হইলে পরে তাহার স্থান নির্ণয় করা যাইবে। এ সম্বন্ধে এখন বাদপ্রতিবাদ করিলে কি ফল?

নগেন্দ্রবাবু অন্যান্য যে যে কথা লিখিয়াছেন, তাহা যদি নগেন্দ্রবাবুর ন্যায় প্রসিদ্ধ ব্যক্তির লেখা না হইত, তবে বোধ হয়, শ্রদ্ধাস্পদ মহামহোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাহা মুদ্রিত করিয়া পত্রিকার কলেবর বৃদ্ধি করিতেন না।

নগেন্দ্রবাবু জাতীয় ইতিহাসে ভবভূমিবার্ত্তার যে যে স্থান উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার একস্থানে লিখিত আছে:—

"বারাণসীশ্বর বিশ্বেশ্বর পাদারবিন্দ সন্দর্শনার্থ সমুদ্যত স্বজননী স্বচ্ছন্দ পবিচারণতে প্রবর্ত্তিত প্রশস্ত বর্ত্মা", অর্থাৎ হরিবর্ম্মাদেবের জননী বারাণসীশ্বর বিশ্বেশ্বরপাদারবিন্দ দর্শন করিতে গমন করাব ইচ্ছা করাতে, তাঁহার গমনের সুবিধার জন্য হরিবর্ম্মাদেব এক প্রশস্ত বর্ত্ম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই বর্ত্মের চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।*

পরিশেষে বক্তব্য এই যে নগেন্দ্রবাবু বাঙ্গালার ইতিহাস উদ্ধারের জন্য বহু গ্রন্থের আলোচনা করিয়াছেন। তিনি যেরূপ অধ্যবসায় এবং যত্নের সহিত কুলশাস্ত্রগ্রন্থের আলোচনা করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। অনেকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অনুরোধে কুলশাস্ত্রগুলি অগ্রাহ্য করিয়া হস্ত প্রক্ষালন করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অনুরোধে কুলশাস্ত্রগুলি অগ্রাহ্য করিলে 'পুরাণ'গ্রন্থগুলিও অগ্রাহ্য করিতে হইবে। ভারতবর্ষের ইতিহাস সঙ্কলনে 'পুরাণ' গুলি অগ্রাহ্য করিলে কি ইতিহাস উদ্ধার করা যাইবে? বাস্তবিক কুলশাস্ত্রগুলিতে যে নানা প্রকার ভ্রম আছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন; কিন্তু ভ্রম থাকা সত্ত্বেও, তাহা হইতে সত্য

(খ) লিপিকার প্রমাদে বোধ হয় আইন আকবরিতে 'দাল' অক্ষর লোপ হইয়া মুজা হইয়াছে।

* শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় বিক্রমপুর নামক পত্রে তাহার আলোচনা করিয়াছেন।

উদ্ধার করার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। বঙ্গবাসী মাত্রই নগেন্দ্রবাবুর নিকট কুলশাস্ত্র উদ্ধার কার্য্য এবং তাঁহার বিশ্বকোষ গ্রন্থের জন্ম কৃতজ্ঞ। কিন্তু এতাদৃশভাবে কৃতজ্ঞ থাকা সত্বেও আমরা এই মাত্র বলিতে ইচ্ছা করি যে—'মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ'

শ্রীরেবতীমোহন গুহ।

পাখীর কথা

বংশ-পরিচয়, পালক-বিন্যাস ও পালকের বর্ণ

প্রতিদিনই আমাদের চক্ষে কত সুন্দর জিনিস পড়িতেছে, কিন্তু আমরা তাহা বিশেষ করিয়া দেখিতেছি কৈ? আমাদের প্রত্যহ দৃষ্ট, অবজ্ঞাত সাধারণ জিনিসগুলির মধ্যেই হয়ত কত আশ্চর্য্য তথ্য নিহিত রহিয়াছে, কিন্তু তাহা ত আমাদের অনুসন্ধিৎসা জাগায় না। এই খানেই বৈজ্ঞানিকের সহিত সাধারণ মানুষের প্রভেদ। বৈজ্ঞানিকের প্রবল অনুসন্ধিৎসা সাধারণ মানুষের নাই। সাধারণ মানুষের উদাসীন চক্ষু যাহা উপেক্ষা করে, বৈজ্ঞানিক তাহা হইতেই কত নূতন নূতন চমকপ্রদ তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। নিউটনের আগে ও পরে কত লোকই গাছ হইতে আতা পড়িতে দেখিয়াছে, হয়ত নিউটনের সহিত তাহার আদরের কুকুর ডায়মণ্ডও সেই আতার পতন লক্ষ্য করিয়াছিল, কিন্তু সেই নিতান্ত সাধারণ ঘটনা অপর কাহারও মনে অন্য কোনও কঠিন সমস্যা উপস্থিত করে নাই।

আমরা প্রত্যহই বিবিধ বর্ণের, বিভিন্ন আকারের পাখী দেখিতে পাই, কিন্তু তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন কিরূপ, তাহাদের জীবন-যাপনের প্রণালী কিরূপ, কিরূপে তাহাদের উৎপত্তি হইল, তাহা জানিবার জন্য কয় জন উৎসুক হইয়া থাকেন? পাখী কি? পাখী উষ্ণরক্তবিশিষ্ট, অণ্ডজ, পালকাবৃত-দেহ দ্বিপদ প্রাণী-বিশেষ। ইহার দুইটি বাহু পাখার আকার প্রাপ্ত হইয়াছে এবং অপর প্রাণীর দন্তের স্থলে পাখীর শৃঙ্গের ন্যায় এক প্রকার কঠিন পদার্থে গঠিত এক জোড়া ঠোঁট আছে। এইটুকু বলিলেই বোধ হয় সাধারণ লোকের কৌতূহল নিবৃত্ত হইবে। কিন্তু প্রকৃত জিজ্ঞাসু বলিবেন, ইহাতে পাখীর সাধারণ একটা বর্ণনা করা হইল বটে, কিন্তু ইহাতে আমার জ্ঞাতব্য শেষ হইল না। আমি জানিতে চাই, কোথা হইতে এই সুন্দর খেচরের উদ্ভব হইল, ইহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠনই বা কিরূপ, ইহার শরীরের পালক-বিন্যাসের প্রণালীই বা কি? গায়ক পক্ষীর গানের কারণ কি, এবং ইহার সুস্বরের উৎপত্তিস্থান কোথায়? ইহাদের গার্হস্থ্য জীবনের সকল কথাই আমি জানিতে চাই। ইহাদের বিবাহের প্রণালী, নীড়-নির্ম্মাণ, সন্তান-পালন, দাম্পত্যপ্রণয় সম্পর্কীয় সকল কথা না জানিলে আমার পক্ষি-জীবন সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য শেষ হইল না। পরবর্ত্তী কয়েক পৃষ্ঠায় আমরা এই সকল বিষয় মোটামুটি বলিতে চেষ্টা করিব।

খুবই সম্ভব অধুনালুপ্ত টিকটিকি-জাতীয় এক প্রকার সরীসৃপ পক্ষি-জাতির আদি পুরুষ। এক সময়

বংশ-পরিচয়

বিহারী সুন্দর পাখিগুলি যে ভূতলচারী [illegible] কার সরীসৃপের বংশধর, এ কথা সহসা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ এই মতের স্বপক্ষে যে সকল প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা উপেক্ষা করাও সহজ নহে। পক্ষী ও সরীসৃপ উভয়ের মধ্যেই এমন কতকগুলি সাদৃশ্য আছে, যাহা অন্য প্রাণীর মধ্যে নাই। পক্ষী ও সরীসৃপ উভয়েই অণ্ডজ; পক্ষীজাতি পশ্চাতের পার উপর শরীরের ভার স্থাপন করে। 'ডায়োনোসরস' নামক অধুনালুপ্ত বিশাল-কায় সরীসৃপও পশ্চাতের পার উপরই দেহভার ন্যস্ত করিত। পক্ষীর সম্মুখের পা দুখানিই পরিবর্ত্তিত হইয়া পাখার আকার ধারণ করিয়াছে। অধুনা-লুপ্ত একজাতীয় টিকটিকিরও (Flying Lizard) উড়িবার নিমিত্ত একপ্রকার পাখা ছিল। এই পক্ষবান সরীসৃপের প্রস্তরীভূত দেহ বা ফসিল পাওয়া গিয়াছে। সরীসৃপেরা এখন বৎসরে একবার করিয়া খোলস পরিবর্ত্তন করে, পাখিরাও বৎসরে এক একবার পালক পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। আপত্তি হইতে পারে যে, পক্ষীর চঞ্চুতে সরীসৃপের দন্তের

অভাব। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে লক্ষ লক্ষ বৎসরের বিকাশ-রীতির (Evolution) প্রভাবে পক্ষিজাতি তাহাদের বর্তমান দেহ প্রাপ্ত হইয়াছে। নিউজীলণ্ড দ্বীপে টটেরা লিজার্ড নামক একপ্রকার দন্তবিহীন সরীসৃপ আছে। আর্কিয়োপ্‌টারিক্স (Acrhacoptoryx) নামক অধুনালুপ্ত পক্ষীর প্রস্তরদেহ ব্যাভেরিয়ার অন্তর্গত ইকষ্টাড্ নামক স্থানে লিথোগ্রাফিক প্রস্তরে পাওয়া গিয়াছে। পক্ষিজাতির মধ্যে এই আর্কিয়োপ্‌টারিক্সই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, অন্ততঃ ইহা অপেক্ষা প্রাচীনতর কোন পক্ষীর কথা এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। এই পক্ষীর চঞ্চুতে দন্তের অস্তিত্ব ও ইহার পুচ্ছের সহিত সরীসৃপ-পুচ্ছের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য উভয় জাতির নিকট-জ্ঞাতিত্ব প্রমাণ করিতেছে। এতদ্ব্যতীত সরীসৃপের ন্যায় কোন কোন পক্ষীর শরীরে শল্কাবরণও দেখিতে পাওয়া যায়। পাখীর বংশ-বিবরণ সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, আপাততঃ তাহাই যথেষ্ট, স্থানান্তরে এ সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনা করা হইবে।

প্রাকৃতিক নির্বাচন ও প্রতিবেশ প্রভাব।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, সরীসৃপ হইতে পক্ষী জাতির উদ্ভব হইল কিরূপে? উত্তরে বলা যায়, এ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ একমত নহেন; তবে ডারউইন্ ও ওয়ালেসের (Darwin and Wallace) প্রাকৃতিক নির্বাচনের ব্যাখ্যাই সমধিক সমাদর লাভ করিয়াছে। ইহাদের মতে জীবন-সংগ্রামে যোগ্যতমেরই উদ্বর্ত্তন ঘটে। অর্থাৎ যাহারা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত আপনাদিগকে মিলাইয়া লইতে পারে, তাহাদেরই জীবন ও বংশ রক্ষা পায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, দুইটি বালককে যদি হিমালয়ের চির-তুষার-সেবিত প্রদেশে রাখিয়া দেওয়া যায়, তবে ইহাদের ভিতরে যে বালকটির দেহ সেখানকার শীত সহ্য করিবার অধিক উপযোগী হইবে, সেই সেখানে জীবিত থাকিতে সমর্থ হইবে এবং তাহার বংশধরগণ কয়েক পুরুষ পরেই সমতলবাসীগণ অপেক্ষা অধিক শীতসহিষ্ণু হইবে। অনেকেই হয়ত নেকড়ে কর্ত্তৃক পালিত মানব-সন্তানের দেহ ও মনের পাশবিক জীবনোপাযোগী বিকারের কথা অবগত আছেন। দেহের গঠনের উপর পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবের ইহা একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। প্রতিবেশ প্রভাবেই একদা ভূচর সরীসৃপের সম্মুখস্থ চরণ দুখানি ডানায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। আবার পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবেই কতকগুলি পক্ষীর পক্ষ ক্রমশঃ তিরোহিত হইয়া, সন্তরণ-কার্য্যের উপযোগী অঙ্গ-বিশেষে পরিণত হইয়াছে। স্তন্যপায়ী তিমি এবং শুশুকের চরণ যেমন তাহাদের সলিল-নিবাসের প্রভাবে অঙ্গুলিহীন মাংসদণ্ডে পরিণত হইয়াছে, সেইরূপ মৎস্যজীবী পেঙ্গুইনের পক্ষ এখন তাহার জলবিহারেরই সহায়তা করিতেছে। উট পক্ষী এবং তাহার নিকট জ্ঞাতি এমু এবং রিয়া প্রভৃতিরও পক্ষের ক্রমশঃ এত অবনতি হইয়াছে যে, ইহারা এখন আর উড়িতেই পারে না। হংসজাতীয় পক্ষিগুলি গগন-পথে বহু সহস্র মাইল বিনা বিশ্রামে ভ্রমণ করিয়া থাকে, কিন্তু আমাদের গৃহপালিত হাঁসগুলির উড্ডয়ন-ক্ষমতা একেবারে তিরোহিত না হইলেও যে অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে তাহা সকলেই জানেন।

Speaicisation বা বিশেষ ক্ষমতার বিকাশ ও পরিণতি

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের উত্থাপন করিতে হইতেছে ইংরেজীতে ইহাকে "স্পেশ্যালাইজেশান" (Specialisation) বলে কতকগুলি জীব কতকগুলি বিশেষ অবস্থার উপযোগী অঙ্গ লাভ বা বিবর্ত্তনের প্রভাবে গঠন করিয়াছে। আমরা ইহাদিগকে "বিশেষ ক্ষমতাপন্ন" বলিব। মালয় দ্বীপের ক্ষুদ্রকায় হামিংবার্ডের (Humming bird) চঞ্চু শরীরের অনুপাতে দীর্ঘ ও পুষ্পকোষ হইতে খাদ্য সংগ্রহের নিমিত্ত সেই দীর্ঘ চঞ্চুর অগ্রভাগ আবার ঈষৎ বক্র। কিন্তু এই হামিংবার্ডেরই শৈশবের চঞ্চু সুইফ্‌ট (Swift—চড়াই জাতীয় পাখী)এর চঞ্চুর ন্যায় ত্রিকোণ; অন্যান্য নানা লক্ষণ হইতেও হামিংবার্ড যে সুইফ্‌টেরই নিকট জ্ঞাতি, তাহা জানা যায়। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে হামিংবার্ড পুষ্প হইতে খাদ্য আহরণে বিশেষ ক্ষমতাপন্ন পাখী। আমাদের

দেশের কাঠ-ঠোকরার ঠোট এইরূপ কাষ্ঠ মধ্য হইতে ভোজ্য সংগ্রহে বিশেষ ক্ষমতাপন্ন। পিপিলিকাভুক্ নীলকণ্ঠের জিহ্বার গঠনও এইরূপ বিশেষ ক্ষমতার পরিচায়ক।

এই বিশেষ-ক্ষমতাপন্ন পাখীগুলি যে অবস্থার মধ্যে ইহা লাভ করিয়াছে, কেবল সেই অবস্থারই জীবন-সংগ্রামে যোগ্যতা প্রদর্শন করে। ইহাদের এক একটি ক্ষমতা যে পরিমাণ, সুপরিণত হইবে, সেই পরিমাণেই ইহারা পরিবর্ত্তিত অবস্থায় জীবনধারণের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িবে। সাধারণ একজন মজুর যেমন সকল দেশে সকল অবস্থায়ই কিছু কাজ জোটাইয়া লইতে পারে, সেইরূপ সাধারণ পাখিগুলিও অনেকটা পরিবর্ত্তিত অবস্থার মধ্যেও জীবন-ধারণের বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারে। কিন্তু মসলিনের কাটতি কমিয়া যাওয়ায় ঢাকার তন্তুবায়দিগের যেরূপ হীনাবস্থা হইয়া পড়িয়াছে, সেইরূপ পারিপার্শ্বিক ক্ষমতার পরিবর্ত্তনে মোয়া (Moa), গ্রেট্ অক (Great Auk), ডোডো (Dodo) প্রভৃতি পক্ষীর বংশ লোপ পাইয়াছে।

অতএব সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, পক্ষিজাতি সম্ভবতঃ কোন বিশেষ ক্ষমতাপন্ন সরীসৃপ জাতীয় জীবের বংশধর এবং বায়ু-মণ্ডলে ভ্রমণ-শক্তিতেই সেই বিশেষ ক্ষমতাটি ক্রমবিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে ও হইতেছে। ইহাদের ও অন্যান্য জীবিত ও লুপ্ত জীবের পক্ষের গঠনের পার্থক্য সম্বন্ধে আলোচনা অন্যত্র হইবে। এখানে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে স্পেশ্যালাইজেশনের ফলে পক্ষীজাতি সূক্ষ্ম গ্রীবা, ঈষৎ দীর্ঘ ও গোলাকার লঘু দেহ, উড়িবার নিমিত্ত পক্ষ, ও গাত্রাবরণের নিমিত্ত নিতান্ত লঘু পালক প্রাপ্ত হইয়াছে। পক্ষিদেহের ইহাই বিশেষত্ব।

পালক বিন্যাস

বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার একখানি শিশুপাঠ্য পুস্তকে লিখিয়াছেন—পক্ষীর সর্ব্বাঙ্গ পালকে আবৃত। বঙ্গবাসীর পঞ্চানন্দ ইহার উপর রসিকতা করিয়া বলিয়াছিলেন—শিশুগণ মনে রাখিবে, ঠোট ও পা পাখির সর্ব্বাঙ্গের বাহিরে। পক্ষীর দেহের প্রায় সকল অংশই পালকে আবৃত বলিলে কোন ভুল হয় না বটে, কিন্তু পক্ষীদেহের সকল অংশেই পালক জন্মে মনে করিলে ভয়ানক ভুল হইবে। কুকুর, বিড়াল বা গরু ও ঘোড়ার ন্যায় পক্ষীদেহ ঘন লোমে আবৃত নহে। ইহাদের দেহের অতি অল্প অংশেই পালক জন্মে। এই সকল অংশকে (Feather Forest) বা পালক-অরণ্য বলা হয়। এক একটি পালক-অরণ্যের কাছে অনেকখানি খালি চামরা থাকে। জর্ম্মান পণ্ডিত নিট্‌স্‌ই (Nitzsch) সর্ব্বপ্রথম পালক-বিন্যাসের এই অপূর্ব্ব প্রণালী লক্ষ্য করেন। প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে এই সম্বন্ধে তিনি একখানি চমৎকার গ্রন্থ রচনা করেন। তাহা হইতে টারিলোগ্রাফি (Pterylography) নামক এক নূতন বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে। এই বিজ্ঞানের আলোচনার ফলে জানা গিয়াছে যে, কেবল যে পক্ষি-দেহের বিশেষ বিশেষ অংশে পালক জন্মিয়া থাকে তাহা নহে, বিভিন্ন পক্ষীর দেহে পালক-অরণ্যের আয়তনও বিভিন্ন হইয়া থাকে। সাধারণতঃ গলা হইতে মেরুদণ্ডের উপর দিয়া পুচ্ছ পর্য্যন্ত একটী, গলার নীচ হইতে বুকের ও পেটের উভয় পার্শ্ব দিয়া দেহের প্রান্ত পর্য্যন্ত একটি, উভয় বাহুর উপরিভাগে দুইটি, ও উভয় জঙ্ঘায় দুইটি, মোট ছয়টি পালকারণ্য পক্ষীদেহে আছে। এই পালকারণ্যের সংস্থান এমন সুনিয়মিত যে পণ্ডিতগণ কোন পক্ষিদেহের যে কোন একটি পালকারণ্যের বিবরণ হইতে পক্ষিটি কোন্ বিভাগের, এমন কি কোন্ জাতীয়, তাহা ঠিক করিতে পারেন।

এইপ্রকার পালক বিন্যাসের কারণ কি, তাহা এখনও ঠিক হয় নাই। কেহ কেহ বলেন, উড়িবার সময় পক্ষ-সঞ্চালনের সুবিধার জন্যই পক্ষী-দেহের নানা অংশ পালক-বিহীন হইয়াছে। কিন্তু এই মত নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যায় না। বোধ হয় ইহাতে প্রকৃতি দেবীর শক্তি-ব্যবহারের মিতব্যয়িতা ও সুবিবেচনারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

পালক-বিন্যাসের কারণ

পালকের সংখ্যা বা পালকারণ্যের আয়তন সাধারণতঃ

পক্ষীর বিশেষ ক্ষমতার পরিমাণ বা জীবন-যাপন-প্রণালী অনুসারে কমবেশী হইয়া থাকে। পক্ষিদিগের মধ্যে বিশেষ ক্ষমতার উৎকর্ষ হিসাবে পেসারাস (Passeres) শ্রেণীর পাখীরাই শ্রেষ্ঠ। কাক এই পেসারাস বিভাগের পাখী।

পক্ষীর বিশেষ ক্ষমতা ও পালক-প্রণালী

কাকের দেহের পালকারণ্য অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও খালি অংশ অত্যন্ত বিস্তৃত। অপর পক্ষে উট পাখির পালকারণ্যের আয়তন এত বড় যে ইহার বিভিন্ন অংশ নির্ণয় করা কঠিন।

এতক্ষণ আমরা যে পালকের কথা বলিয়াছি, বিজ্ঞানের ভাষায় তাহার নাম Contour feather বা গাত্র-পালক। এই গাত্র-পালকের নীচে বহু পক্ষীর আর এক প্রকার পালক থাকে। ইহাকে 'ডাউন' পালক (Down feather) বলে। হংসের গাত্র-পালক তুলিলেই তাহার নীচে ডাউন পালক দেখিতে পাইবেন। ডাউন পালক গাত্র-পালকের ফাকে ফাকে খুব ঘন হইয়া জন্মে। সারস, বাজজাতীয় কোন কোন পক্ষী ও তোতা পাখীর দেহে এক প্রকার ডাউন

পালকের শ্রেণী-বিভাগ

পালক জন্মে। তাহাকে Powder down বা চূর্ণ ডাউন বলে; কারণ ইহা সর্ব্বদাই সূক্ষ্ম ধুলার ন্যায় চূর্ণ হইয়া পড়ে। ইহা ব্যতীত আর এক প্রকার পালক আছে। ইংরাজীতে তাহাকে Filo Plume ফিলো-প্লুম বলে। খালি চক্ষুতে ইহাকে পালক বলিয়া চিনিবার উপায় নাই। হাঁস বা মোরগের মাংস প্রস্তুত করিবার জন্য পালক তুলিয়া নিলে চর্ম্মের উপরিভাগে যে সূক্ষ্ম লোমগুলি দৃষ্ট হয়, তাহাই ফিলোপ্লুম বা ছদ্ম পালক। অনুবীক্ষণ দিয়া দেখিলে ইহাদের পালকত্ব সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ থাকে না। কখন কখন এই সকল ছদ্ম পালক খুব লম্বা হইয়া থাকে। সন্তানোৎপাদন ঋতুতে কর্মোরেণ্ট (Cormorant) নামক মৎস্যাশী পক্ষীর দেহের উভয় পার্শ্বে সুদীর্ঘ ছদ্ম পালকের দুইটি বড় বড় শাদা দাগ দেখা যায়। কখন কখন চক্ষু-রোমের আকারেও এক প্রকার পালক দেখা যায়। 'গোট-সাকার' (Goat Sucker) ও ফ্লাই ক্যাচারদিগের (Fly Catcher) মুখের চতুর্দ্দিকে চুলের ন্যায় এক প্রকার শক্ত পালক জন্মে। উট পাখী ও হর্ণবিলের চক্ষু-রোম হয়। এতদ্ব্যতীত কোন কোন পাখীর চরণেও শল্ক বা চর্ম্মের আবরণের পরিবর্ত্তে পালকের আচ্ছাদন থাকে।

পক্ষী-পালক আমাদের নিতান্ত পরিচিত। বিলাসীর উপাধান ও বসিবার গদি নির্ম্মাণে ইহা ব্যবহৃত হয়। পালক য়ুরোপীয় সুন্দরীর সুন্দর মস্তকের শোভা বর্দ্ধন করে, ভারতের সম্রাটপুত্রের ও সম্রাটের সেনাপতিগণের শিরোভূষণে শোভা পায়। কিন্তু আমাদের মধ্যে কয় জন ইহার গঠন-বৈচিত্র্যের কথা অবগত আছেন? অতএব পক্ষী-পালকের গঠনের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক।

পালকের গঠন

পালক পক্ষী-জাতির একেবারে নিজস্ব। স্তন্যপায়ী জীবদিগের মধ্যে কাহারও দেহ লোমাবৃত, তিমির ন্যায় কাহারও দেহে উন্মুক্ত চর্ম্ম, কাহারও বা শল্কাবরণ, আর্ম্মাডিলোর ন্যায় কাহারও দেহ বা কঠিন বর্ম্মে সুরক্ষিত, কিন্তু সকল পক্ষীর দেহেই পালক আছে। একেবারে পক্ষ-বিহীন পক্ষীও আছে, কিন্তু পালক-বিহীন পক্ষী এ পর্য্যন্ত কেহ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। দেহ-রক্ষা ও শারীরিক তাপের সমীকরণের নিমিত্ত মৎস্য ও সরীসৃপদেহে যেমন শল্কের আবরণ, পক্ষিদেহেও সেই প্রকার পালকের পরিচ্ছদ। আমরা পূর্ব্বেই বিভিন্ন প্রকারের পালকের কথা বলিয়াছি। ইহাদের মধ্যে ডানার সংলগ্ন কতকগুলি গাত্র-পালক খুব লম্বা হয়। তাহাদিগকে চলিত ভাষায় কুইল পালক বলে। ময়ূর ও হাঁসের কুইল আমাদের সকলেরই পরিচিত। ইহাদের গঠন-সম্বন্ধীয় অনেক কথা খালি চক্ষে অনুবীক্ষণ ব্যতিরেকেও জানা যাইতে পারে।

একটি হাঁসের বা ময়ূরের কুইল হাতে লইলে দেখিতে পাইবেন যে মূল কুইলদণ্ড হইতে দুইদিকে অসংখ্য সূক্ষ্ম শাখা বাহির হইয়া গিয়াছে। এই শাখাগুলিকে নাড়িলে দেখা যাইবে যে ইহারা পরস্পরের সহিত

বার্ব্ব ও বার্ব্বিউল,

উপশাখা যোগে সুসংলগ্ন হইয়া তাহাদের সংখ্যা রহিয়াছে। এই শাখাগুলিকে বার্ব্ব ও উপশাখাগুলিকে বার্ব্বিউল বলে। প্রত্যেক বার্ব্ব হইতেই দুইদিকে দুই শ্রেণীর বার্ব্বিউল বাহির হয়। এই বার্ব্বিউলগুলির বিশেষত্ব এই যে উপরের বার্ব্ব-নিঃসৃত বার্ব্বিউলগুলিকে নীচের বার্ব্বের বার্ব্বিউলগুলিতে আঁকরাইয়া ধরে। সেই জন্যই এই বার্ব্বিউল জলে সহজে ছিন্ন করা যায় না। ডাক্তার গেডো (Dr. Gadow) ১৫ ইঞ্চি লম্বা একটি সারসের কুইল পাখায় ৬৫০টি বার্ব্ব গণনা করিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যেকটিতে আবার ৬০০শত জোড়া বার্ব্বিউল ছিল। এই সংখ্যাগুলিকে অতিরঞ্জিত বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। কারণ পক্ষীর শারীর-তত্ত্বে ডাক্তার গেডো অদ্বিতীয় পণ্ডিত।

মোল্টিং বা পালক পরিবর্ত্তন

বংশ-পরিচয় প্রসঙ্গে বলিয়াছি সরীসৃপেরা যেরূপ চর্ম্ম পরিবর্ত্তন করে, পাখীরাও সেইরূপ বৎসরে একবার করিয়া পালক পরিবর্ত্তন করে। তবে সরীসৃপের চর্ম্ম-পরিবর্ত্তনের সহিত পাখীর পালক-পরিবর্ত্তনের একটু পার্থক্য আছে। সাপ ও টিকটিকি তাহাদের সমগ্র পুরাতন চর্ম্মটিকে একেবারে পরিত্যাগ করে, কিন্তু পাখীরা সাধারণতঃ ক্রমে ক্রমে পালকগুলিকে পরিবর্ত্তন করিয়া লয়। বোধ হয় তাহাদের জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহের প্রণালীর পার্থক্যই ইহার কারণ। কিন্তু হংস-জাতীয় পক্ষীরা (Swan, Geese, Ducks) তাহাদের সরীসৃপ জ্ঞাতিদের ন্যায় একেবারেই সকল পালক পরিবর্ত্তন করে। এই নিমিত্ত ইহারা কিছু দিনের জন্য উড়িতে একেবারে অক্ষম হইয়া পড়ে। এই সময় ইহাদিগকে প্রাণরক্ষার জন্য লুকাইয়া থাকিতে ও অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল বর্ণের স্ত্রীবেশ ধারণ করিতে হয়। সাধারণতঃ পাখীরা সন্তানোৎপাদন শেষ হইলে পালক পরিবর্ত্তন করে। কোন কোন পাখী এই সময় পায়ের নখ অথবা ঠোট পর্য্যন্ত বদলাইয়া লয়। ইংলণ্ডের পাফিন নামক পক্ষী (Puffin) প্রতি বৎসরই নবীন চঞ্চু লাভ করে

আপাতঃ দৃষ্টিতে আশ্চর্য্য বোধ হইলেও, বহু পালকের আমরা যে বর্ণ দেখি, তাহা উহার প্রকৃত রং নহে। পালকের রং সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; ইহার

পালকের বর্ণ ও রঞ্জন পদার্থ

প্রথম শ্রেণী রাসায়নিক রং। পালকের উপাদানে মিশ্রিত বা অংশ-বিশেষে সঞ্চিত রঞ্জন-দ্রব্য হইতেই প্রথম শ্রেণীর বর্ণের উৎপত্তি। এই শ্রেণীর বর্ণ আলোক ও ছায়ার পরিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তিত হয় না। প্রথম শ্রেণীর রঙের মধ্যে টুরীকিন নামক রঙের আশ্চর্য্য প্রকৃতি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। আফ্রিকার টুরাকু (Touracon) নামক পাখীর লাল পালকে এই রঞ্জন-দ্রব্যটি পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত টুরাকুর পালকে শতকরা ৫ হইতে ৮ ভাগ তাম্র থাকে। বৃষ্টির জলে ভিজিলে এই পাখীর লাল বর্ণ থাকে না, কিন্তু রৌদ্রে পালক শুকাইলেই আবার স্বাভাবিক লালবর্ণ ফিরিয়া আইসে।

রঞ্জন-দ্রব্য ও পালকের বহির্ভাগের বিশেষ প্রকারের গঠনের ফলে দ্বিতীয় শ্রেণীর বর্ণের উদ্ভব। সুতরাং আলোক ও ছায়ার পরিবর্ত্তনে এই শ্রেণীর বর্ণেরও পরিবর্ত্তন হয়। ভায়োলেট, নীল ও সবুজ রঙ্গ এই প্রকারে উৎপন্ন হয়। তোতা পাখীর গাঢ় নীলবর্ণ পাখা আলোকে ধরিলে, ধূসর অথবা হলদে দেখায়। এমাজন তোতার সবুজ পাখা ভিজিলে বাদামী রং ধারণ করে। এ পর্য্যন্ত কোন পাখীর দেহেই নীল-বর্ণের রঞ্জন-পদার্থ পাওয়া যায় নাই। পালকের গঠনের ফলেই আলোছায়ার প্রভাবে কোন কোন পাখীকে নীলবর্ণ দেখায়।

ময়ূর ও বার্ড অব প্যারাডাইজের (Bird of Paradise) অত্যুজ্জ্বল বর্ণ তৃতীয় শ্রেণীর রঙ্গের বিশিষ্ট উদাহরণ। অনুবীক্ষণ যোগে এই সকল পক্ষীর দেহে অতি সূক্ষ্ম গহ্বর ও তাহার মধ্যে অতি সূক্ষ্ম মাংস-বিন্দু দেখা যায়। এইগুলি ত্রিকোণ কাচের (Prism) ন্যায় বর্ণের ঔজ্জ্বল্য সাধন করে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে সরীসৃপের দশন-পংক্তির স্থানে পাখীদের চঞ্চু লাভ হইয়াছে। এই চঞ্চু শৃঙ্গের ন্যায় কঠিন পদার্থে গঠিত একটি খোসা ব্যতীত আর কিছুই নহে। কোন কোন পাখীর ঠোঁট দুইখানি খোসায় নির্ম্মিত, আবার কোন কোন পাখীর ঠোঁট অনেকগুলি খোসার সমবায়ে গঠিত।

চঞ্চুর গঠন

বিভিন্ন পাখির নখরও বিভিন্ন প্রকারের। কোন কোন পাখির মধ্যম অঙ্গুলিতে একটি ক্ষুদ্র চিরুণির ন্যায় পদার্থ থাকে, ইহার ব্যবহার আজ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। কোন কোন পাখীর পায়ে ও পাখায় তীক্ষ্ণ অস্ত্র (Spur) থাকে। যুদ্ধের সময় এই অস্ত্র কাজে আসে।

নখর

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন।

গ্রন্থ সমালোচনা

(১) মাহিষ্য বিবৃতি—৺বসন্তকুমার রায় এম, এ, বি, এল, বিরচিত। গ্রন্থ খানিতে বঙ্গের মাহিষ্য কৈবর্ত্তজাতি উচ্চশ্রেণীভুক্ত এবং জালিক কৈবর্ত্ত হইতে বিভিন্ন ইহাই প্রমাণের জন্য বহু পণ্ডিতের মত, পুরাণ শাস্ত্র ও কুলগ্রন্থাদির শ্লোক এবং অন্য ঐতিহাসিক তত্ত্ব গ্রন্থমধ্যে নিবদ্ধ হইয়াছে। এজাতীয় প্রমাণ সর্ব্বাংশে ঐতিহাসিক মর্য্যাদার যোগ্য কিনা তাহা বিচারের বিষয়; তথাপিও ইহার উপর নির্ভর করিয়া বঙ্গের খর্ব্বমর্য্যাদাধিকার জাতিগুলির আত্মোন্নতির চেষ্টা দেশপক্ষে মঙ্গলপ্রসূ বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু, এক্ষেত্রে আন্তর্জ্জাতিক বিদ্বেষ ও অসংযত আচরণ বিপরীত ফল না ঘটায়, সেজন্য সকল সমাজের সুধীগণেরই সাবধানতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। আলোচ্য গ্রন্থের স্থলবিশেষে ভাষা সংযম ও শিষ্টাচারের গ্রাম ছাড়াইয়া গিয়াছে; এ জাতীয় গ্রন্থে এরূপ ভাষা সযত্নে পরিহার করা কর্ত্তব্য।

(২) বিজয়াবসান-কাব্য—উল্লিখিত গ্রন্থকার বিরচিত। কাব্যখানি রঘুবংশাদি সংস্কৃত কাব্যের অনুসরণে রচিত এবং মুসলমানী আমলের ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। গ্রন্থখানির শব্দ-সম্পদ ও ভাষা-প্রবাহ অসাধারণ; কিন্তু, ভাষার কাঠিন্য হেতু ইহার ভাব বা গল্পাংশ প্রস্ফুট হইতে পারে নাই। গ্রন্থকার শক্তিমান্ লেখক ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই,—কিন্তু, বর্ত্তমান যুগের পাঠকগণ অনভ্যস্ত সাহিত্যিক ব্যায়াম সম্পাদন করিয়া তাঁহার কাব্যের রস উপভোগ করিতে ইচ্ছুক হইবেন; সে ভরসা আমাদের হয় না।

হংসরাজ

---

* W. P, Pycroftএর Bird Life অবলম্বনে।

সভ্যের নাম	প্রস্তাবক	সমর্থক
৪। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল জয়নগর, বরিশাল।	শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার	সম্পাদক
৫। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ [illegible]রী, বি এ, সহকারী প্রধান শিক্ষক, রাজকুমার এড্‌ওয়ার্ড ইন্‌ষ্টিটিউশান, বাজিতপুর, (ফরিদপুর)	”	”
৬। শ্রীযুক্ত গোপীনাথ দত্ত, শিক্ষক, পোঃ দিঘীরপাড়, রাজাবাড়ী, ঢাকা।		
৭। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, বি, এ ১০ মালিটোলা, ঢাকা।	”	
৮। শ্রীযুক্ত সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়, ৫৯ মালাকারটোলা, ঢাকা।	”	”
৯। শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এল, উকীল, জজকোর্ট, পাবনা।	শ্রীমন্মথনাথ মজুমদার	”
১০। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত, সব্‌-এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন, চাটমোহর, (পাবনা)।	”	
১১। শ্রীযুক্ত সুধাংশুনারায়ণ আচার্য্যচৌধুরী, ১৩ মালিগলি, ঢাকা।	”	”

৫। অতঃপর নিম্নলিখিত পুস্তকোপহারদাতাকে উপহৃত পুস্তকের জন্য যথারীতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল,—

উপহারদাতার নাম	পুস্তক
শ্রীযুক্ত রাজকুমার চক্রবর্ত্তী	মহাভারত

৬। তৎপর প্রবন্ধলেখক শ্রীযুত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম এ মহাশয় কোনও অপ্রতিবিধেয় কারণবশতঃ অনুপস্থিত থাকাতে, সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম, এ, বি, এল, মহাশয়কে তদীয় প্রবন্ধ "কান্তনামা বা রাজধর্ম্ম" পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন। কান্তনামা পুঁথিতে কাশীমবাজারের রাজবংশের বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়; সঙ্গে সঙ্গে কান্তবাবুর সমসাময়িকগণেরও অনেক তথ্য অবগত হওয়া যায়। প্রবন্ধ শ্রোতৃবর্গের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। প্রবন্ধপাঠ শেষ হইলে, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলিলেন যে, এই গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায় যে, অতি অল্পকাল পূর্ব্বেও হিন্দু মুসলমানে বিশেষ সম্প্রীতি ছিল। গ্রন্থকার মুসলমান হইয়াও হিন্দু দেবদেবীর নাম যেরূপ শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, সে সময়ে ধর্ম্মদ্বেষ বঙ্গদেশ হইতে বহুল পরিমাণে অন্তর্হিত হইয়াছিল। তৎপর সম্পাদক মহাশয়ও উক্ত মর্ম্মে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন যে, একজন মুসলমান যে কান্তবাবুর জীবনচরিত লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতেই উভয় সম্প্রদায়ের সম্প্রীতি সূচিত হইতেছে।

অনন্তর সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন এবং প্রবন্ধসম্বন্ধে সংক্ষেপে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন।

পরিশেষে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তর সভাভঙ্গ হইল।

(স্বাক্ষর) শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য
সভাপতি।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

স্থান—জেনারেল পোষ্টাফিসের পোষ্ট মাষ্টার মহাশয়ের বাসা, ঢাকা।

সময়—বঙ্গাব্দ ১৩২২।১৬ই আশ্বিন, রবিবার, সন্ধ্যা ৭টা।

আলোচ্য বিষয়,—

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ।

২। নূতন সভ্য নির্ব্বাচন।

৩। পুস্তকোপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন।

৪। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "মুক্তারাম নাগের দুর্গাপুরাণ"।

৫। বিবিধ।

উপস্থিত—

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র সরকার, এম্ এ; পি আর, এস্; পি এইচ্ ডি, এফ্ সি এস্।

" শ্রীযুক্ত গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য বিএ; বি, টি।

" যোগেশচন্দ্র দাসবর্ম্মা।

" পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

" অশ্বিনীকুমার শর্ম্মা।

" সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় বি এ,

" হরিপদ চট্টোপাধ্যায়।

" অক্ষয়ভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়।

" সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়।

" প্রসন্নকুমার পাল।

" নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্ এ।

" সুধাংশুনারায়ণ আচার্য্যচৌধুরী।

" রজনীকান্ত দাস।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ এম্ এ; বি, এল, (সম্পাদক)

" যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত
" অতুলচন্দ্র গুপ্তচৌধুরী বি এল
} (সহঃ সম্পাদক)

অধ্যাপক " অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ; বি এল, (সম্পাদক, প্রতিভা)

ও অন্যান্য।

২। সভাপতি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস ব্যারিষ্টার-এট-ল মহাশয় উপস্থিত না থাকায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য বি এ, বি টি মহোদয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

৩। অতঃপর গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

৪। তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন;—

সভ্য—	প্রস্তাবক—	সমর্থক—
১। শ্রীযুক্ত প্রিয়গোবিন্দ দত্ত এম্ এ, বি এল, ঈশ্বর দাসের লেন, শঙ্করটোলা, ঢাকা।	শ্রীযুক্ত সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়,	সম্পাদক
২। শ্রীযুক্ত ফজলল রহিম চৌধুরী ঢাকা কলেজ হোষ্টেল, রমনা।	,,	,,
৩। শ্রীযুক্ত ধরণীমোহন সেন, শান্তিকুটীর, সোনারং, ঢাকা।	শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী	[illegible]
৪। শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার বি এল, ২৩নং উত্তর নবাবপুর, ঢাকা।	,,	,,

৫। অতঃপর নিম্নলিখিত পুস্তকোপহারদাতৃগণকে উপহৃত পুস্তকের জন্য যথারীতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল,—

উপহৃত পুস্তক—	গ্রন্থকারের নাম—	উপহারদাতা নাম—
১। প্লেগ-সংহিতা	শ্রীযুক্ত তারিণীপ্রসাদ জ্যোতিষী।	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র সরকার
২। রুষ-জাপান যুদ্ধ		,,
৩। হরিনামামৃত রস	,,	,,
৪। দুর্গাপুরাণ	৺ মুক্তারাম নাগ	শ্রীযুক্ত পীতা[illegible]
৫। রামায়ণ মহাকাব্য (আদিকাণ্ড)	৺ হরিশ্চন্দ্র মিত্র	শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

৬। অনন্তর সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে তদীয় "মুক্তারাম নাগের দুর্গাপুরাণ" শীর্ষক প্রবন্ধপাঠ করিতে অনুরোধ করিলে, প্রবন্ধ-লেখক কর্ত্তৃক উহা পঠিত হইল। প্রবন্ধে দুর্গাপুরাণের সুন্দর সমালোচনাসহ গ্রন্থ-পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছিল। প্রবন্ধটী বিশেষ সারগর্ভ ও কৌতূহলোদ্দীপক হইয়াছিল। প্রবন্ধপাঠ শেষ হইলে, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম, এ, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম, এ, বি এল এবং সম্পাদক মহাশয় প্রবন্ধোক্ত গ্রন্থের বিস্তারিত আলোচনা করিলেন। শ্রীযুক্ত অবিনাশবাবু বলিলেন যে এই জাতীয় কয়েকখানা প্রাচীন গ্রন্থ ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু সংগ্রহ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। সংগ্রহ সম্পূর্ণ হইলে, কোন কোন গ্রন্থ প্রকাশিত করিতে ঢাকা সাহিত্য পরিষদের ইচ্ছা আছে। সম্পাদক মহাশয় বলিলেন, দুর্গোৎসবের অব্যবহিতপূর্ব্বে দুর্গাপুরাণ সম্বন্ধে প্রবন্ধপাঠ ও আলোচনা অতি সুসঙ্গত ও সময়োচিত হইয়াছে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা ও প্রবন্ধ লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। অনন্তর শ্রীযুক্ত অক্ষয়ভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় পোষ্টমাষ্টারমহাশয় ও সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদে প্রদানান্তর সভাভঙ্গ হইল।

(স্বাক্ষর) শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ
সম্পাদক।

(স্বাক্ষর) শ্রীরমণীকান্ত দাস
ব্যারিষ্টার এট্ ল,
সভাপতি।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

স্থান—জেনারেল পোষ্টাফিসের পোষ্টমাষ্টার মহাশয়ের গৃহ, ঢাকা।

সময়—১২ই অগ্রহায়ণ, সন্ধ্যা ৭টা

আলোচ্য বিষয়,—

১। গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পাঠ।
২। নূতন সভ্য নির্ব্বাচন।
৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন।
৪। প্রবন্ধপাঠ,—শ্রীযুক্ত গিরিজাকান্ত ঘোষ মহাশয়ের "মিত্রকবি হরিশ্চন্দ্র।"
৫। বিবিধ।

উপস্থিত—

শ্রীযুক্ত রমণীকান্ত দাস বি, এ,
ব্যারিষ্টার য়্যাট্-ল।
শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার সেন এম, এ, বি, এল
„ বিশ্বেশ্বর রায়চৌধুরী
„ কামিনীকুমার বসু রায়চৌধুরী
„ অশ্বিনীকুমার শর্ম্মা
„ যাদবচন্দ্র মজুমদার
„ শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এল

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মজুমদার
„ মনোরঞ্জন ঘোষচৌধুরী বি, এল্
„ অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় বি, এ
„ সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়
„ মহেন্দ্রকুমার ঘোষ এম এ, বি এল্
„ প্রিয়গোবিন্দ দত্ত এম, এ, বি এল
„ অক্ষয়ভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়
„ সুখরঞ্জন রায় এম এ
„ উপেন্দ্রনাথ সাহা বণিক

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ এম, এ, বি, এল (সম্পাদক)
„ যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত } সহঃ সম্পাদক
„ উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ বি এ, বি, টি }
„ অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম, এ, বি এল (সম্পাদক, প্রতিভা)

প্রতিভা

৫ম বর্ষ | মাঘ ১৩২২ | ১০ম সং

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব*

১। কণিষ্ক (৩)

বৈশাখ সংখ্যার 'প্রতিভায়' আমি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে,কণিষ্ক কডফিসের পরবর্ত্তী ; এই কডফিস খ্রীঃ অঃ ২৪ বর্ষের পরে বর্ত্তমান ছিলেন, সুতরাং কণিষ্ক খ্রীষ্টের প্রথম শতের পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারেন না।

গণ্ডোফারিস্ নামে একজন পার্থিয় রাজার লিপি তকৃতি বাহাই নামক স্থানে পাওয়া গিয়াছে। এই লিপির তারিখ ১০৩ বর্ষ, এবং ইহা উক্ত রাজার রাজ্যের ২৬শ বর্ষে, উৎকীর্ণ হইয়াছিল। অক্ষরতত্ত্ববিৎ বুলার ইহাকে কণিষ্কের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্তবাবু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই মত গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু তিনি যে সকল যুক্তি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে এইমাত্র প্রমাণিত হয় যে, গণ্ডোফারিস্ ও কণিষ্ক, এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী কালের ব্যবধান বড় বেশী নহে। সুতরাং বুলারের নির্দ্দেশ অনুসারে গণ্ডোফারিসকে কণিষ্কের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া ধরিয়া লইব (১)।

মথুরা ও তক্ষশিলায় ক্ষত্রপ ও মহাক্ষত্রপ উপাধিধারী কয়েকজন রাজার মুদ্রা ও লিপি পাওয়া যায়। ইতিহাসে ইহারা 'উদীচ্য ক্ষত্রপ' (Northern Satraps) বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাদের নাম রজুবুল, সোডাস, লিয়ক ও পটিক। কানিংহাম (৩), ভগবান লাল ইন্দ্রজী (৪), ফ্লিট (৫) ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (৬) প্রভৃতি প্রত্নলিপিজ্ঞগণের মতে ইঁহারা কণিষ্কের পূর্ব্ববর্ত্তী।

সুতরাং কণিষ্ক, কডফিস, গণ্ডোফারিস্ ও উদীচ্য ক্ষত্রপগণের পরবর্ত্তী।

উদীচ্য ক্ষত্রপগণের মধ্যে সোডাস ও পটিকের এই দুই জনের তারিখযুক্ত লিপি আছে। মথুরায় প্রাপ্ত সোডাসের লিপির তারিখ ৭২ বর্ষ ;তক্ষশিলায় প্রাপ্ত পটিকের লিপির তারিখ ৭৮ বর্ষ। গণ্ডোফারিসের লিপির তারিখ ১০৩ বর্ষ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, এই তিনখানি লিপিতে যে অব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা কোন্ অব্দ অনুসারে গণনা করিতে হইবে। এই প্রশ্নের তিনটি উত্তর হইতে পারে।

(ক) মালব অব্দ অথবা বিক্রম-সংবৎ
(খ) শকাব্দ
(গ) অপর কোনও অব্দ

* গত আষাঢ় মাসের 'প্রতিভায়' কণিষ্ক নামক প্রবন্ধে ৮ পৃঃ ৩য় পংক্তিতে যে দাঁড়িটি দেওয়া হইয়াছে, উহা ভুল। ঐখানে কোন চিহ্নই হইবে না, এবং উক্ত পংক্তির 'কণিষ্ক' শব্দটির পর "যে" এই কথাটি যোগ করিতে হইবে।

(১) Indian Palaeography, P. 25. Indian Antiquary, 1908. P. 47.

(২) Epigraphia Indica II P. 196.
Oriental Journal V.,P. 177.

(৩) Archaeological Report III. P 30.

(৪) Journal of the Royal Asiatic Society 1894.

(৫) Journal of the Asiatic Society of Bengal Lxvii Part I.

(৬) Indian Antiquary, 1908 P. 50.

[illegible]বাব্দ এবং শকাব্দ ব্যতীত অপর কোনও প্রাচীন [illegible] কুশানগণের পূর্ব্বে পঞ্জাব প্রদেশে ব্যবহৃত হইত এরূপ কোনও প্রমাণ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই (১)। অবশ্য ইহা হইতে এমন কথা প্রমাণিত হয় না যে [illegible]বাব্দ বা অপর কোন অব্দ প্রচলিত থাকা অসম্ভব। কিন্তু [illegible] অভিনব অজ্ঞাত অব্দ কল্পনা করিবার পূর্ব্বে দেখিতে

(১) শ্রীযুক্তবাবু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পঞ্জাবে ব্যবহৃত হইতে পারে, এরূপ দুইটি অব্দের উল্লেখ করিয়াছেন (J. R. A. S. 1908. P. 40)

(১) মৌর্য্যাব্দ, (২) সিলিউকিডান্ অব্দ।

(১) ডাক্তার লুডার্স ও ফ্লিট উভয়ে খারবেলের উদয়গিরি-লিপির যে নূতন পাঠোদ্ধার করিয়াছেন, তাহাতে মৌর্য্যাব্দের কোন উল্লেখ নাই; সুতরাং বর্ত্তমানে মৌর্য্যাব্দের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই।

(২) সিলিউকিডান—ইহা পঞ্জাবে এবং আফগানিস্থানে প্রচলিত ছিল কিনা বিশেষ সন্দেহের বিষয়, অন্ততঃ এ বিষয়ে কোন স্পষ্ট প্রমাণ নাই। আর সোডাস, পটিকের বা [illegible]গোফারিসের লিপির তারিখ যে এই অব্দ অনুসারে গণনা করা যাইতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য। কুশানগণের উল্লেখযুক্ত পাঞ্জাটার, কালডারা ও তক্ষশিলা লিপির তারিখ যে এই অব্দ অনুসারে গণনা করা যাইতে পারে না, তাহাও এক প্রকার স্থির; কারণ তাহা হইলে কুশানগণের তারিখ ১৯৯ খৃঃ পূঃ ধরিতে হয়। এই সময় ইউচিগণ চীনদেশের পশ্চিম প্রদেশস্থিত যাযাবর জাতি মাত্র। (J. R. A. S. 1913. P. 984. ff)

শ্রীযুক্ত মার্শাল সাহেব প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে সোডাস ও পটিকের লিপিতে ব্যবহৃত অব্দ বিভিন্ন। (J. R. A. S. 1914, p985)। এই মত আর কেহ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া জানি না। অন্ততঃ, ফ্লীট ও টমাস্ ইহা স্বীকার করেন [illegible] এ বিষয়ে কোন সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

হইবে যে, যে অব্দের অস্তিত্ব আমরা জানি তাহা দ্বারা গণনা করিলে যে ফল পাওয়া যায়, তাহা সুসঙ্গত কি না। যদি এই ফল সুসঙ্গত হয়, ও প্রমাণিত সিদ্ধান্তের বিরোধী না হয়, এবং অন্যবিধ প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হয়, তবে ইহা গ্রহণ করা যাইতে পারে।

বাদামীগুহালিপি অনুসারে কোন শক নরপতি কর্ত্তৃক শকাব্দ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শকগণ মথুরায় ও ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। সুতরাং মথুরায় ও উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে ব্যবহৃত অব্দকে শকাব্দ বলিয়া ধরিয়া লইতে কোন আপত্তি হইতে পারে না। এতদ্ব্যতীত, ইহার সমর্থক অন্যবিধ প্রমাণও আছে। কাথিয়াবাড় অঞ্চলে ক্ষত্রপ উপাধিধারী আর একদল রাজার মুদ্রা ও লিপি পাওয়া যায়, ইতিহাসে ইহারা পাশ্চাত্য ক্ষত্রপ (Western Satraps) বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই পাশ্চাত্য ক্ষত্রপের অন্যতম রুদ্রদমনের গির্ণারলিপি শকাব্দের ৭২ বর্ষে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। এই লিপির লিপির সহিত সোডাসের ৭২ বর্ষে উৎকীর্ণ মথুরালিপির তুলনা করিয়া দেখা যায় যে এই উভয় লিপির অক্ষরভঙ্গী প্রায় একরূপ,—যে একটু প্রভেদ লক্ষিত হয়, তাহা স্থানীয় বিশেষত্ব বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। গির্ণারলিপির ৭২ বর্ষ যে শকাব্দের, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং অনুমান করিতে পারি যে সোডাস ও পটিকের লিপির ৭২ ও ৭৮ বর্ষ ও শকাব্দের বর্ষ, সুতরাং সোডাস ও পটিকের [illegible] ১৫০ ও ১৫৬ খৃঃ অব্দ।

[illegible] ও [illegible], এ উভয়ের মধ্যবর্ত্তী কালের ব্যবধান [illegible] বেশী নহে তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। উদীচ্য ক্ষত্রপগণের ও [illegible]গণের মধ্যবর্ত্তী কালের ব্যবধানও যে বড় বেশী নহে, ইহাই প্রত্নলিপিবিদ্‌গণের মত।

এ বিষয়ে বুলার বলেন, "সোডাসের লিপির অক্ষর ও কণিষ্কের লিপির অক্ষর এ দুয়ের প্রভেদ অতি সামান্য"। (Vienna Oriental Journal V. P. 177). ভোগেল বলেন, "উদীচ্য ক্ষত্রপ ও কণিষ্কের রাজ্যকালের প্রথম ভাগের লিপির অক্ষর সাদৃশ্য এত অধিক যে, এ দুয়ের কাল-ব্যবধান

এক শতাব্দীর অধিক হইতেই পারে না"। (Epigraphia Indica VIII. P, 175)

এই সাদৃশ্যহেতু ব্লক সাহেব শ্রাবস্তীর বুদ্ধমূর্ত্তিগাত্রে উৎকীর্ণ কুশানলিপিকে উদীচ্য ক্ষত্রপগণের লিপি বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন। (J. A. S. B. LXVII. Part 1.)

সুতরাং উদীচ্য ক্ষত্রপগণ কনিষ্কের অনতিকালপূর্ব্বে রাজত্ব করিয়াছিলেন, এইরূপ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। অতএব উদীচ্য ক্ষত্রপগণ ও গণ্ডোফারিসের কালব্যবধানও বড় বেশী নহে।

গণ্ডোফারিসের লিপির তারিখ ১০৩ বর্ষ ও উদীচ্যক্ষত্রপ পটিকের লিপির তারিখ ৭৮ বর্ষ; সুতরাং গণ্ডোফারসের ১০৩ বর্ষকে শকাব্দের বর্ষ ধরিয়া ১৮১ খৃঃ অব্দে গণ্ডোফারিসের কাল নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

ইহার বিরুদ্ধে একটি আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। খৃষ্টীয় কিম্বদন্তী অনুসারে যীশুখৃষ্টের শিষ্য সেণ্ট টমাস গণ্ডোফারিস নামক ভারতবর্ষীয় রাজার সভায় আসিয়াছিলেন, সুতরাং গণ্ডোফারিস খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু এই কিম্বদন্তী খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ হয় নাই; ঘটনার দুইশত বৎসর পরে লিখিত আখ্যায়িকায় সুদূর ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। অসম্ভব নহে যে, গণ্ডোফারিসের সমকালে কোন খৃষ্টীয় মিশন এদেশে আসিয়াছিল এবং তাহাই পরে সুপরিচিত সেণ্ট টমাসের নামের সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অথবা ইহাও সম্ভব, যে সময়ে উক্ত কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়, সেই সময়ে কোন কারণে অনতিপূর্ব্বকালবর্ত্তী রাজা গণ্ডোফারিসের নাম সুপরিচিত থাকায়, তাহাই সেণ্ট টমাসের মিশনের সহিত যুক্ত হইয়াছে। যাহাই হউক, আমরা এই কাহিনীকে সর্ব্বথা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে অক্ষম।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে কণিষ্ক, গণ্ডোফারিস ও উদীচ্য ক্ষত্রপগণের পরবর্ত্তী। সুতরাং তিনি ১৮১ খৃঃ অব্দের পরবর্ত্তী।

কুশানগণের যে সকল শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে যেগুলির বর্ষসংখ্যা ৩ হইতে ৯৮, তাহা কণিষ্ক, বাসিষ্ক, হুবিষ্ক ও বাসুদেব প্রভৃতির রাজত্বে উৎকীর্ণ,তাহা এক প্রকার ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। কারণ,

কণিষ্কের ৩ (৭ক), ও ১৮ (৮)(?), বাসিষ্কের ২৪ (৯), ও ২৮ (১০), হুবিষ্কের ২৯ (?) (১১) ও ৬০ (১২) এবং বাসুদেবের ৭৪ (১৩) ও ৯৮ (১৪) বর্ষের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। কেবলমাত্র 'আরা'-লিপিতে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। এই লিপি কণিষ্কের নামযুক্ত ও ৪১শ বর্ষে উৎকীর্ণ; ইহার সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব।

এতদ্ব্যতীত, কুশানগণের উল্লেখযুক্ত আর কয়েকখানি লিপিতে নিম্নলিখিতরূপ তারিখ আছে,—

(১) কালদার লিপি—(১৬), তারিখ—১১৩ বর্ষ

(২) পঞ্জ্‌টার লিপি (১৭), তারিখ—১২২ বর্ষ

(৭ক) Luder's List No 925.

(৮) J. R. A. S. 1914 (641).

(৯) Luder's List, No 149 A.

(১০) Do " No 161.

(১১) Do " No 35.

(১২) Do " No 56.

(১৩) Do " No 60.

(১৪) Do " No 76.

(১৫) I. A. 1908 (P. 58.) এবং E. I. Vol X.

(১৬) Buhler,—Vienna Oriental Journal, pp. 55 and 327.
Journal Asiatique 9e Serie tom XIII. p. 526.
Ind. Ant. 1896 (p. 41.)

(১৭) Cunningham's Archaeological Survey Report Vol. V. p 61.

(৩) তক্ষশিলা লিপি (১৮), তারিখ—১৩৬ বর্ষ

এই তিনখানি কুশানলিপির অক্ষরসাদৃশ্যহেতু ইহাদিগকে একই শতাব্দীতে উৎকীর্ণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। সুতরাং ইহাদিগের তারিখগুলিও একই অব্দের তারিখ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

কালদারালিপির অক্ষর কণিষ্কের লিপির অক্ষরের পূর্ব্ববর্ত্তী, বিখ্যাত প্রত্নলিপিবিৎ বুলার সাহেব এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন (১৯)। শ্রীযুত রাখালবাবু ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় তিনি যে সমস্ত যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহা তাদৃশ প্রবল নহে। সুতরাং বুলারের নির্দ্দেশ অনুসারে আমরা কালদারালিপিকে কণিষ্কের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া গ্রহণ করিতেছি।

অতএব যে অব্দের তৃতীয় বৎসরে কণিষ্কের লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছে, এবং কণিষ্ক, বাসিষ্ক, হুবিষ্ক ও বাসুদেবের শিলালিপিতে যে অব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, কালদারা, তক্ষশিলা ও পঞ্জতার লিপির অব্দ তাহা হইতে পৃথক। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, শকাব্দ ব্যতীত কণিষ্কের পূর্ব্বে অপর কোন অব্দ পঞ্জাবে ব্যবহৃত হইত, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। সুতরাং এই তিনখানি লিপির তারিখ শকাব্দ অনুসারে গণনা করা যাইতে পারে। ইহা হইতে দেখা যায় যে ১৯১ খৃঃ অব্দ হইতে ২২৪ খৃঃ অব্দের মধ্যে তিনখানি লিপিতে কুশানরাজের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার কোনখানিতেই কুশান রাজার নাম নাই,—কেবল রাজোপাধি ব্যবহৃত হইয়াছে। একপ্রকার প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে তাহাতেও এই প্রকার রাজার উপাধিমাত্র ব্যবহৃত হইয়াছে,—কুত্রাপি রাজার নাম পাওয়া যায় নাই; পেশওয়ার হইতে মথুরা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে এই মুদ্রা পাওয়া যায়। মুদ্রাতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে এই মুদ্রাগুলি ওয়েম কাডফিসের (দ্বিতীয় কডফিস) ভারতীয় প্রতিনিধি কর্ত্তৃক প্রচলিত হইয়াছিল (২০)। সুতরাং অসম্ভব নহে যে, উপরোক্ত লিপি তিনখানিও ঐরূপ কুশানরাজগণের ভারতীয় প্রতিনিধিদিগের শাসনকালে উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে কণিষ্কপ্রভৃতির লিপির অক্ষর এই সকল লিপির অক্ষরের পরবর্ত্তী,—সুতরাং কণিষ্কের তারিখ ২১৪ খৃঃ অব্দের পরবর্ত্তী।

চীনদেশীয় গ্রন্থ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, এ পর্য্যন্ত শিলালিপির সাহায্যে আমরা যে সমুদয় সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তৎসমুদয়ের সহিত উক্ত গ্রন্থোক্ত বর্ণনার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে।

ফ্যান ই দ্বিতীয় হ্যান বংশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন (২১)। ২৫ খৃঃ অঃ হইতে ২২০ খৃ অঃ পর্য্যন্ত যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, কেবলমাত্র তাহাই তিনি আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থারম্ভে তিনি বলিয়াছেন যে পাশ্চাত্য দেশ (বাহ্লীক, ভারতবর্ষ প্রভৃতি) সম্বন্ধে যে বিবরণ দেওয়া হইল, তাহা আমুল প্যান্ ইয়ং এর রিপোর্ট হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই রিপোর্ট সম্রাট গ্যানের রাজত্বের শেষভাগে প্যান ইয়ং কর্ত্তৃক লিখিত হয়। সম্রাট গ্যান ১০৭ হইতে ১২৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

ফ্যান-ই কুশানগণ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ অধিকার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্তসার নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"য়ুয়েচিগণ পঞ্চশাখায় বিভক্ত হইবার শতাধিক বর্ষ পরে কুশানগণের দলপতি কুজুল-কডফিস অন্য চারি শাখার দলপতিকে পরাজিত করিয়া রাজা উপাধি গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি পার্থিয়া ও কাবুল অধিকার করিয়া অশীতি-

(১৮) J. R. A. S 1914 (p 973), J R A S 1915 (pp 155 ff, 191ff, 314 ff, 531 ff)

(১৯) Ind. Ant 1908 (31)

(২০) "But it is well-known .. ....the coins of the nameless king were issued by the Satraps of Hima Kadphisa"—R D Banerjea I. A 1908 (p 44) এবং J R A S '13 (661). White-head—Catalogue (161).

(২১) T'oung Pao নামক ফরাসী পত্রিকায় ইহার আংশিক অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। (T'oung Pao Ser. II Vol VIII No 2 pp 153 ff).

বর্ষ বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। পরে তাঁহার পুত্র বিম কডফিস রাজা হন। তিনি ভারতবর্ষ জয় করিয়া ইহার শাসনের জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন।

* * * * *

সিন্ধুদেশ (ভারতবর্ষ) একটি বৃহৎ নদীর তীরে অবস্থিত। ইহাতে শত শত নগরী আছে,—প্রত্যেক নগরী একজন শাসনকর্ত্তার অধীন। মূল রাজ্য ব্যতীত ইহাতে আরও কতকগুলি রাজ্য আছে। এই রাজ্যসমূহ সিন্ধুনামে পরিচিত। বর্ত্তমান কালে এই সমুদয় রাজ্যই ইয়ু-চি (কুশান)-গণের অধীন। ইয়ু-চিগণ ইহার রাজাকে নিহত করিয়া, স্বীয় প্রতিনিধি দ্বারা রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে।"

ফ্যান-ই যে 'বর্ত্তমান কালে' কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে সাধারণতঃ ২২০ খৃঃ অব্দ বুঝান উচিত; কারণ তিনি পূর্ব্বেই বলিয়াছেন যে, যে সমুদয় ঘটনা ২৫ হইতে ২২০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ঘটিয়াছে,মাত্র তাহাই তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তবে ফ্যান-ই বলিয়াছেন যে, পাশ্চাত্যদেশ সম্বন্ধে তিনি যাহা কিছু লিখিয়াছেন, সে সমুদয়ই প্যান-ইয়ংএর রিপোর্ট হইতে গৃহীত। সুতরাং 'বর্ত্তমান কালে' এই কথাটি 'প্যান-ইয়ং' যে সময় রিপোর্ট লিখিয়াছিলেন,তাহাই বুঝাইতেছে; ফ্যান-ইর ইতিহাসের অনুবাদক ফরাসী পণ্ডিত শ্যাবানে ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, ১২৬ খৃঃ অব্দের অনতিকালপূর্ব্বে দ্বিতীয় কডফিসের প্রতিনিধি ভারতবর্ষ শাসন করিতেছিলেন। যাঁহারা কডফিসের বংশধর কণিষ্ককে শকাব্দের প্রবর্ত্তক বলিতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে চীনদেশীয় এই ঐতিহাসিক বিবরণী বিষম অন্তরায়স্বরূপ। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহারা কেহই এ বিষয়ে বাদপ্রতিবাদ কিছুই করেন নাই। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কণিষ্ককে শকাব্দপ্রবর্ত্তক বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন,—তৎপরে টমাস প্রভৃতি অনেকেই উক্ত মত সমর্থনের চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু কেহই চীনদেশীয় ইতিহাসোক্ত এই ঘটনাবলীর উল্লেখ মাত্র করেন নাই। চীনদেশীয় ইতিহাস বিশ্বাস করিলে, কণিষ্ককে কদাপি শকাব্দপ্রবর্ত্তক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, এবং চীনদেশীয় এই ইতিহাস অবিশ্বাস করিবার কোনই কারণ নাই।

চীনদেশীয় আর একখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থে কুশানগণের সম্বন্ধে কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের নাম উই-লিও (২২)। ২৩৯ ও ২৬৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থে লিখিত আছে যে, "বাহ্লীক, কাবুল, কাশ্মীর ও ভারতবর্ষ, এ সমস্তই কুশানগণের অধীন। কুশানেরা মগধ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছে এবং ঐ প্রদেশ হইতে কর গ্রহণ করিতেছে।"

ইহা হইতে দেখা যায় যে, খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে বাহ্লীক হইতে মগধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটি বিরাট কুশান সাম্রাজ্য অবস্থিত ছিল। আমরা পূর্ব্বে শিলালিপির সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, কণিষ্কের কাল ২১৪ খৃষ্টাব্দের পরবর্ত্তী। সারনাথে কণিষ্কের লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং মগধ, কোশল প্রভৃতি প্রদেশে কণিষ্কের ও তাঁহার বংশধরগণের বহুসংখ্যক মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং কণিষ্কের ও তাঁহার বংশধরগণের রাজ্য মগধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, ইহা এক প্রকার ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। অন্ততঃ,আর কোন কুশান রাজার রাজত্ব এতদূর বিস্তৃত ছিল, ইহার কোন প্রমাণই এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। এই সকল পর্য্যালোচনা করিলে সহজেই অনুমিত হয় যে, কণিষ্ক-প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যই খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে বাহ্লীক হইতে মগধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এইরূপে শিলা-লিপি হইতে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, চীনদেশীয় ইতিহাসও তাহার সম্পূর্ণ সমর্থন করে।

বর্ত্তমানে কণিষ্কের কাল সম্বন্ধে যে দুইটি মত প্রচলিত আছে, তাহার কোনটির সহিতই উক্ত চীনদেশীয় ইতিহাসের বর্ণিত ঘটনাবলীর সামঞ্জস্য নাই। ফ্লীট ও টমাসপ্রমুখ উভয় দলের মতেই খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ব্বেই কুশান সাম্রাজ্যের

(২২) T'oung Pao, 1905

ধ্বংস হইয়াছিল। ফ্লীট প্রভৃতি বিচক্ষণ ঐতিহাসিকগণ কিন্তু ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন যে, উই-লিওবর্ণিত ঘটনার সহিত তাঁহাদের মতবাদের বিশেষ অসামঞ্জস্য। এই অসামঞ্জস্য দূর করিবার জন্য তাঁহারা "পরবর্ত্তী কুশান" নামে এক নূতন কুশান সম্রাটবংশ কল্পনা করিয়াছেন। ফ্লীটের মতে উই-লিও এই "পরবর্ত্তী কুশান" সম্রাটগণেরই রাজ্য বর্ণনা করিয়াছেন।

কিন্তু কণিষ্ক, বাসিষ্ক, হুবিষ্ক ও বাসুদেব প্রভৃতির পরও যে কুশানবংশের অপর কেহ বাহ্লীক হইতে মগধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ কি? বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত এত বড় একটা কথা স্বীকার করা যায় না। ফ্লীটের মতে আরা-লিপিতে উল্লিখিত কণিষ্ক, এই পরবর্ত্তী কুশান সম্রাটগণের অন্যতম। কিন্তু ইহা অনুমান মাত্র; আর এ অনুমান সত্য হইলেও, কেবলমাত্র ইহাই প্রমাণিত হয় যে উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে কুশানগণের রাজ্য ছিল। ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে এক জাতীয় মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে;—ইহা কণিষ্ক প্রভৃতির মুদ্রার অনুরূপ, কিন্তু গঠন-পারিপাট্যে তদপেক্ষা বহুগুণে নিকৃষ্ট। এই হেতু মুদ্রাতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন যে, এই মুদ্রাগুলি 'পরবর্ত্তী কুশান রাজগণের মুদ্রা;" কিন্তু এই সকল মুদ্রা সিস্টান ও ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম অঞ্চল ব্যতীত অন্য কোথায়ও পাওয়া যায় নাই। আর, কণিষ্ক প্রভৃতির মুদ্রার তুলনায় এই সকল মুদ্রার গঠন-প্রণালী এতই নিকৃষ্ট যে, ইহা কোন তুল্যপ্রবলপ্রতাপশালী সম্রাটের মুদ্রা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। সুতরাং কেবলমাত্র এই মুদ্রার উপর নির্ভর করিয়া, বাহ্লীক হইতে মগধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত সাম্রাজ্য কল্পনা করা একেবারেই অসম্ভব। আর, এই সকল মুদ্রায় কণিষ্ক, বাসু (দেব) প্রভৃতি দুই তিনটি মাত্র নাম পাওয়া যায়। যদি ইহাদিগকে মূল কণিষ্ক, বাসুদেব প্রভৃতি হইতে ভিন্ন বলিয়াও কল্পনা করা যায়, তথাপি একথা প্রমাণিত হয় না যে, বাসুদেবের পর হইতে এক পরাক্রান্ত কুশানবংশ তৃতীয় শতাব্দীর মধ্য পর্য্যন্ত বাহ্লীক হইতে মগধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাজ্য শাসন করিত।

আমরা দেখিয়াছি, উই-লিওর অনুসারে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে বাহ্লীক হইতে মগধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিরাট কুশান সাম্রাজ্য অবস্থিত ছিল। কণিষ্ক, বাসিষ্ক, হুবিষ্ক ও বাসুদেবের পরে আর কোন কুশানরাজবংশ উত্তরপশ্চিমাঞ্চল ব্যতীত ভারতবর্ষের অপর কোনও স্থানে আধিপত্য করিয়াছিলেন, এরূপ কোন প্রমাণই অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং উই-লিওবর্ণিত কুশানসাম্রাজ্য কণিষ্ক প্রভৃতিরই সাম্রাজ্য, ইহা আমরা অনায়াসে ধরিয়া লইতে পারি। আর, শিলালিপি প্রভৃতি হইতে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহা যে সর্ব্বাংশে এই চীনগ্রন্থোক্ত বিবরণের অনুকূল, তাহাও পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি।

এক্ষণে চীনদেশীয় গ্রন্থ ও শিলালিপি প্রভৃতির সাহায্যে আমরা যে সমুদয় তথ্যে উপনীত হইয়াছি, তারিখ অনুসারে তাহা পর পর সাজাইয়া গেলেই, এই উভয়ের সামঞ্জস্য ও তৎ-সাহায্যে এই সময়কার ভারতবর্ষের ইতিহাস কি ভাবে গঠন করা যায়, তাহা উপলব্ধি হইবে। যে সমুদয় তথ্য চীনদেশীয় গ্রন্থ হইতে লব্ধ, তাহা 'চীন', ও যে সমুদয় তথ্য শিলালিপি হইতে লব্ধ, তাহা 'শিলা' এই কথা দ্বারা চিহ্নিত করা গেল; যে সমুদয় বিষয় গত বৈশাখ ও আষাঢ় মাসের প্রতিভায় আলোচিত হইয়াছে, তাহার পৃষ্ঠাঙ্ক দেওয়া হইল।

খৃঃ অব্দ

২৪— বাহ্লীক প্রদেশে ইয়ু-চি জাতির পাঁচ শাখা রাজত্ব করিতেছে। ('চীন' পৃঃ ৪)

১২৫— দ্বিতীয় কডফিসের প্রতিনিধি ভারতবর্ষ শাসন করিতেছে। ('চীন')

১৫০— মথুরায় রাজপ্রতিনিধি (ক্ষত্রপ)-বংশের অন্যতম সোণ্ডাশ (সোডাশ) রাজত্ব করিতেছে। ('শিলা')

১৫৬— তক্ষশিলায় রাজপ্রতিনিধি (ক্ষত্রপ)-বংশের অন্যতম পটিক রাজত্ব করিতেছে। ('শিলা')

১৮১— তকতি বাহাই অঞ্চলে গণ্ডোফারিস রাজত্ব করিতেছে। ('শিলা')

১২১ ২০০ ২১৪ } কালদারা, তক্ষশিলা ও পঞ্জাব অঞ্চলে অর্থাৎ ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে কুশান রাজগণের নামে (তাঁহাদের প্রতিনিধিগণ কর্তৃক) রাজ্য শাসিত হইতেছে। ('শিয়া')

২৫০ (আনুমানিক) (২০৯-২৬৫ এর মধ্যে কোন সময়ে } বাহ্লীক হইতে মগধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত সাম্রাজ্য (কণিষ্কবংশের) কুশানগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইতেছে। ('চীন'

উল্লিখিত তালিকাটি হইতে এই সময়কার ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা করা যাইতে পারে। অনুমান হয় যে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রথম ভাগে কুশানরাজ দ্বিতীয় কডফিস কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ বিজিত হয়। কিন্তু তিনি নিজে ভারতবর্ষে রাজত্ব করেন নাই, প্রতিনিধি বা শাসনকর্তা-গণ দ্বারা ভারতবর্ষ শাসন করেন। মথুরা ... শকরাজগণের ... এবং শকরাজ ... কুশান ... অধীনতা স্বীকার করিতে ... গণ্ডোফারের এই সময় ... ভারতবর্ষে কুশানগণের ... পরেও কুশান ... পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে ... উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে কিছুকাল পরেই পুনর্ব্বার ... থাকে। এই সময়ে কুশানবংশে কণিষ্ক নামে একজন পরাক্রমশালী রাজার অভ্যুদয় হয়। ... হইতে প্রমাণিত হয় যে, সম্ভবতঃ কডফিসের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ ছিল না, তিনি সামান্য অবস্থা হইতে নিজ প্রতিভাবলে বিস্তৃত কুশান সাম্রাজ্যের অধিপতি হইয়াছিলেন। ২১৪ খৃঃ অব্দের পরে কোন সময়ে ... ও গান্ধারে স্বীয় প্রাধান্য দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, ... ভারতবর্ষের প্রাচীন কুশান সাম্রাজ্য অধিকার করিতে অগ্রসর হন; ক্রমে ২৬৫ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে অন্ততঃ বারাণসী পর্য্যন্ত সমুদয় ভূভাগ তাঁহার হস্তগত হয়।

ভারতবর্ষজয় অথবা বৌদ্ধধর্ম্মসভার অধিবেশন-প্রভৃতি তাঁহার রাজত্বের কোন একটি স্মরণীয় ঘটনা হইতে একটি অব্দ প্রতিষ্ঠিত হয়; এই ... প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে এবং তাহার কিছুদিন পর পর্য্যন্তও, ... প্রজাগণ তাঁহার রাজ্যসম্বৎসর ব্যবহার করিত। ... আর ... ৪১শ বর্ষ ... প্রতিষ্ঠিত ... ধরা না লইলে, তাঁহার রাজত্বের ৪১শ বর্ষ ধরিলেই ... থাকে না, কারণ বাহ্লীকে তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তি ... তিনি মোট ৪১শ বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন—ইহা কিছু ... নহে, এবং তাঁহার নবপ্রতিষ্ঠিত অব্দ প্রচলিত হইবার ... কেহ কেহ পূর্ব্ব ... অনুযায়ী তাঁহার ... করিয়া থাকিবে, ইহা কিছু বিচিত্র ... বিরুদ্ধে তর্ক উঠিতে পারে যে, কণিষ্কের ... টংকারী লিপিতে 'রাজ্যসম্বৎসরে' এইরূপ ... হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার রাজ্যলাভ ... সম্বৎসরের উল্লেখ (২৩)। কিন্তু মথুরায় প্রাপ্ত ... পঞ্চাশৎ বর্ষে টংকারী হুবিষ্কের লিপিতেও ... ব্যবহৃত হইয়াছে (২৪)। সুতরাং 'রাজ্য ... সম্বৎসরে' কোন বিশেষ রাজত্বের বর্ষপরিমাণ ... 'রাজ্যসম্বৎসরের' প্রকৃত অর্থ 'রাজ্যের ... অর্থাৎ অমুক রাজার রাজত্বকালে ... সম্বৎসর। যতদূর স্মরণ হয়, ফ্লীট সর্ব্বপ্রথম ... রূপ ব্যাখ্যার যাথার্থ্য প্রমাণিত করেন। অতএব ... হইতে একথা প্রমাণিত হয় না যে, কুশানদিগের ব্যবহৃত অব্দ তাঁহার রাজ্যলাভ হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল।

উপরে কণিষ্ক ও কডফিস প্রভৃতি সম্বন্ধে যে বিবরণ দেওয়া হইল, তাহার অনেকাংশ আনুমানিক, একথা সত্য। কিন্তু কণিষ্কের কালনির্ণয় সম্বন্ধে যে প্রমাণাবলী পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে এইরূপ আনুমানিক মতবাদ ব্যতীত কোন

(২৩) J R A S 1913 P 649.

(২৪) Luders List No 51 Ep Ind. Vol X App.

স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব। কেবল মাত্র দেখিতে [illegible] যে, উপস্থিত প্রমাণাবলীর সাহায্যে কোন্ মতটি অধিক-[illegible] বলিয়া বোধ হয়। সমস্ত তথ্য আলোচনা করিয়া [illegible] যাহা প্রকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইয়াছে, তাহা উপরে [illegible]লাম।

[illegible] দেখাইয়াছি যে, আমার এই মত অনুসারে [illegible] হইতে ২৬৫ খৃঃ অব্দের মধ্যবর্ত্তী কোন সময়ে [illegible] রাজ্যকাল ধরিতে হইবে। প্রাচীন ভারতবর্ষে [illegible] ত্রৈকূটক অব্দ নামে একটি অব্দ প্রচলিত ছিল। [illegible] কাল ২৪৯ খৃঃ অব্দ, কিন্তু কোন্ রাজা বা [illegible] ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়, তদ্বিষয়ে নিশ্চয়রূপে [illegible] যায় নাই। অসম্ভব নহে যে, কণিষ্কই এই অব্দের [illegible]। কিন্তু এ বিষয়ে বিশেষ প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত [illegible] কিছু বলা যায় না।

[illegible] রাজ্যকাল সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছি, তাহা [illegible] বিরুদ্ধবাদী নহে। ফ্লীট ও কেনেডিপ্রমুখ [illegible] খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর পরবর্ত্তী হইতে [illegible] এই মন্তব্যের অনুকূলে যে সকল যুক্তি দেখাই-[illegible] টমাস প্রভৃতি পণ্ডিতগণ খণ্ডন করিয়াছেন; [illegible] পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। টমাস প্রভৃতির মতে [illegible] প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। এ [illegible] তাঁহাদের প্রধান যুক্তি তিনটি,

([illegible]) চীনদেশীয় গ্রন্থ হইতে প্রমাণিত হয় যে প্রথম-[illegible] ৪০ খৃ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন, সুতরাং কুশান বংশের [illegible]তীয় রাজা কণিষ্ক খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন।

(২) মুদ্রাতত্ত্বের প্রমাণ

(৩) লিপিতত্ত্বের প্রমাণ

প্রথম যুক্তি সম্বন্ধে বিশেষ বলিবার আবশ্যক নাই। পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, চীনগ্রন্থ হইতে প্রমাণিত হয় যে কডফিস ২৪ খৃঃ অঃ হইতে ১২৫ খৃঃ অব্দের মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং তাঁহার তারিখ ৪০ খৃঃ অব্দ ধরিয়া লইবার কোনই কারণ নাই।

অপর, কণিষ্ক দ্বিতীয় কডফিসের মৃত্যুর পরই ভারতবর্ষে রাজা হইয়াছিলেন, প্রচলিত সংস্কার ব্যতীত এ বিশ্বাসের কোনই কারণ নাই। টমাস একস্থলে কণিষ্ক এবং প্রথম ও দ্বিতীয় কডফিসকে আকবর ও বাবর-হুমায়ুনের সহিত তুলনা করিয়াছেন (২৬)। সুতরাং এই তিন জনের মধ্যেই অন্য রাজার রাজ্যের সম্ভাবনা এক প্রকার স্বীকার করিয়াছেন। কণিষ্ক দ্বিতীয় কডফিসের পুত্র ছিলেন না, এবং তাঁহার পিতাও রাজা ছিলেন না, সুতরাং কণিষ্ক দ্বিতীয় কডফিসের পরেই রাজা হইয়াছিলেন, বিনা প্রমাণে ইহা বিশ্বাস করা যায় না।

(২) মুদ্রাতত্ত্ব।—মুদ্রাতত্ত্ব ও লিপিতত্ত্ব দ্বারা যে কণিষ্কের কাল নিরূপণের চেষ্টা হয়, তাহার মধ্যে একটু রহস্য আছে। সকলেই জানেন যে, তারিখবিহীন লিপি বা মুদ্রা দ্বারা কোন্ রাজা কোন্ রাজার পরে বা আগে ছিলেন, তাহার নিরূপণ হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তিনি কোন্ বর্ষে বা শতাব্দীতে ছিলেন, এরূপ নির্ণয় করা কঠিন। যদি কোন রাজার তারিখ ঠিক জানা থাকে, তাহা হইলেই অন্য রাজা লিপি বা মুদ্রাতত্ত্বের প্রমাণ অনুসারে এই রাজার কত আগে বা কত পরে ছিলেন, তাহা মোটামুটি ধারণা করিয়া লইয়া, তাহার শতাব্দী নির্ণয় করা সম্ভব হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পণ্ডিতগণ একবাক্যে কণিষ্ককে শকাব্দের প্রবর্ত্তক বলিয়া ধরিয়া লইয়া, তাহার জানা তারিখের (৭৮ খ্রীঃ অব্দ) সহিত তুলনা করিয়া, মুদ্রা-প্রচলনকারী অপর রাজগণের কাল নির্ণয় করিতেন। এইজন্যই উদীচ্য ক্ষত্রপগণের কাল

(২৫) J. R. A. S. 1913, 625—650, 911—1042.

(২৬) "Kaniska in relation to Kadphises and Wema Kadphises may be compared to Akbar as successor of Babar and Humayun" (J. R. A. S. 1913. P. 650)

(২৭) On the dates of Ancient Indian Inscriptions and Coins. I. A. 1881. P. 213 ff.

প্রথম খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে ইত্যাদি কয়েকটি মত মুদ্রাতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে—কিন্তু কণিষ্কের কাল নির্ণয় লইয়াই যখন গোলমাল, তখন ঐ সব মতবাদের উপর কোন নির্ভর করা যায় না।

এ কথা সর্ব্ববাদীসম্মত যে, কণিষ্ক প্রভৃতির স্বর্ণমুদ্রা হইতেই গুপ্তগণের স্বর্ণমুদ্রা অনুকৃত হইয়াছে। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ডাক্তার ওল্‌ডেনবার্গ (২৭) * 'কণিষ্ক শকাব্দের প্রবর্ত্তক' এই মত প্রকাশ করিয়াও নিম্নলিখিতরূপ মন্তব্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন,—

"কণিষ্ককে শকাব্দের প্রবর্ত্তক ধরিয়া লইলে, কণিষ্ক ও গুপ্তগণের মধ্যে ২০০ বৎসরের ব্যবধান হয়; কিন্তু কণিষ্ক ও গুপ্তগণের মুদ্রার সাদৃশ্য এত অধিক যে, ২০০ বৎসরের ব্যবধান কিছু বেশী বলিয়া মনে হয়।"

গুপ্তগণের মুদ্রা ও কুশান মুদ্রা, এ উভয়ের মধ্যে যে ওজন, ঢং (Type), ও অক্ষরলিখনপ্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ সাদৃশ্য আছে, ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ তাহা স্বীকার করিয়াছেন। এমন কি, যে সময়ে তিনি ১২৫ খ্রীষ্টাব্দ কণিষ্কের কাল বলিয়া নির্ণয় করিয়াছিলেন, তখন এ বিষয়ে তাঁহার একটি প্রধান যুক্তি ছিল এই যে, তদ্দ্বারা কণিষ্ককে গুপ্তগণের অধিকতর নিকটবর্ত্তী করা হয়।

পারস্যের শাসনবংশীয় রাজা দ্বিতীয় হোর্‌মজ্‌দ্‌ কোন কুশান রাজার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই বিবাহে তিনি এতদূর গৌরব বোধ করিয়াছিলেন যে, স্বীয় মুদ্রায় নিজেকে 'প্রসিদ্ধ কুশানরাজবংশ'-সম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এই শাসনবংশীয় রাজগণের মুদ্রার সহিত কণিষ্ক প্রভৃতির মুদ্রার বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

(১) শাসনবংশীয় রাজগণের মুদ্রায় "মরকান্ মরকা" (রাজগণের রাজা) ও "মিনুছত্রী মিন্ যজদান" (দেববংশজাত), এই দুই উপাধির সহিত কুশানমুদ্রার "শাওনানো শাও" ও কুশানলিপির "রাজতিরাজ দেবপুত্র" সর্ব্বাংশে তুলনীয়। অবশ্য, প্রাচীনতর মুদ্রায়, 'রাজাধিরাজ' এর অনুরূপ উপাধি দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু "রাজাধিরাজ দেবপুত্র" এই উপাধি কেবলমাত্র শাসনবংশীয় মুদ্রায় ও কণিষ্কবংশের লিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

(২) ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ ও হোয়াইট্‌হেডের মুদ্রা-তালিকায় একপ্রকার মুদ্রা দেখিতে পাওয়া যায় (২৮)। এই মুদ্রার উভয় পার্শ্বের মূর্ত্তিগুলি ঠিক কুশানরাজ বাসুদেবের মুদ্রার মূর্ত্তির অনুরূপ। বাসুদেবের মুদ্রার উভয় পার্শ্বে যে কথাগুলি লিখিত আছে, ইহাতেও ঠিক সেই কথাগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে, ইহা কুশান সম্রাট বাসুদেবের মুদ্রা। কিন্তু এই মুদ্রায় রাজার পোষাক-পরিচ্ছদ, ও মূর্ত্তির গঠনপ্রণালী প্রভৃতিতে স্পষ্টতঃ পারস্যের শাসনরাজবংশের প্রভাব বিদ্যমান, মুদ্রাতত্ত্ববিদ্‌মাত্রেই এ কথা স্বীকার করিয়াছেন।

(৩) সিস্টান প্রদেশে শাসনবংশীয় পারস্যরাজ দ্বিতীয় হোর্মজ্‌দ্ এর নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে; এই মুদ্রার 'ডিজাইন্' (design) বা ঢং সম্পূর্ণরূপে পূর্ব্বোল্লিখিত কুশানসম্রাট বাসুদেবের মুদ্রার অনুরূপ, মুদ্রাতত্ত্ববিদ্ হোয়াইট-হেড্ এ কথা স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন (২৯)।

দ্বিতীয় হোর্মজ্‌দ্ কোন কুশানসম্রাটের কন্যার পাণি-গ্রহণ করিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করিয়াছিলেন, এই কথাটি মনে রাখিয়া উল্লিখিত সিদ্ধান্ত তিনটির বিষয় আলোচনা করিলে, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে,

* এই ফুটনোট ভুলক্রমে পূর্ব্বপৃষ্ঠায় গিয়াছে। প্র, স।

(২৮) V. Smith's Catalogue of Coins in the Indian Museum P. 91—Pl. XIV—12. P. 84—Pl. XIII—8; Whitehead's Catalogue of Coins in the Punjab Museum P. 212, Pl. XX—No. 238. P. 208—Pl. XIX—209 etc.

(২৯) Whitehead,—Ibid—P213.Pl.XX—No.240; also cf. V. Smith,—Ibid—P. 92, Pl. XIV—13 Cunningham—Numismatic Chronicle, 1893. P p. 179, 181.

দ্বিতীয় হোর্মজ্‌দ্‌ যাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি কুশানসম্রাট বাসুদেবের কন্যা। দ্বিতীয় হোর্মজ্‌দ্‌'এর রাজ্যকাল ৩০১ হইতে ৩১০ খ্রীষ্টাব্দ। কণিষ্কের কাল সম্বন্ধে আমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তদনুসারে বাসুদেবও এই সময়ে জীবিত ছিলেন।

গুপ্ত রাজবংশ ও পারস্যের শাসন রাজবংশ, এই উভয়ের রাজ্যকাল নির্দ্দিষ্টরূপে জানা যায়। পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে দেখা যায় যে,এই উভয় রাজবংশের মুদ্রার সহিত কণিষ্কবংশের মুদ্রার তুলনা করিলে (৩০), কণিষ্কের রাজ্যকাল সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়, তাহার সহিত, শিলালিপি প্রভৃতির সাহায্যে আমি কণিষ্ক সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে।

এইবার লিপিতত্ত্বের আলোচনা করা যাউক। কুশান-মুদ্রার অক্ষরের সহিত যে গুপ্তরাজগণের মুদ্রার অক্ষরের বিশেষ সাদৃশ্য আছে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এবং সে বিষয়ে ভিন্‌সেণ্ট স্মিথের মতের উল্লেখ করিয়াছি। এই উভয় রাজবংশের শিলালিপির তুলনা করিলেও যে এই সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে, এক্ষণে তাহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব।

সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ-লিপি গুপ্তরাজগণের প্রাচীনতম লিপি। রুদ্রদামের গির্ণার-লিপির তারিখ ১৫০ খ্রীষ্টাব্দ। এই দুই লিপির অক্ষরের সহিত কুশানলিপির অক্ষরের তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, কুশানলিপির অক্ষর রুদ্রদামের লিপির অক্ষরের পরবর্ত্তী ও গুপ্ত-অক্ষরের পূর্ব্ববর্ত্তী। বুলারের'ইণ্ডিসে পেলিওগ্রাফি'পুস্তকে যে প্লেট (plate)দেওয়া আছে, তাহাই অবলম্বনে আমি এই তুলনা করিব। রুদ্রদামের অক্ষর, কুশান-অক্ষর, ও গুপ্ত-অক্ষর যথাক্রমে রুং, কুং, ও গুং এই চিহ্নদ্বারা সূচিত হইবে।

অক্ষর

'ক'— অশোকের সময় এই অক্ষরের আকৃতি একটি যোগচিহ্নের ন্যায় ছিল। এই চিহ্নের উভয় রেখাই সরল ছিল। গুং 'ক' এ কিন্তু সামন্তরাল (Horizontal) রেখাটি বৃত্তাকার হইয়া আসিয়াছে; রুং ক-এও এই রেখাটি সরল; সোডাশ, 'উষভদাত' ও অন্ধ্রগণের মুদ্রায়ও এই রেখাটি সরল দেখা যায়। কিন্তু কোন কোন কুং ক-এ এই রেখাটি গুং'র অনুরূপ বৃত্তাকার হইয়া আসিয়াছে দেখা যায়।

'ড'— কুং ড ও গুং ড ঠিক এক প্রকার; রুং ড প্রাচীন 'ড' এর অনুরূপ, কারণ ইহার নীচাংশ বৃত্তাকার।

'ণ'— এই অক্ষরটি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। রুং ণ প্রায় অশোকের 'ণ' এর তুল্য,অর্থাৎ একটি দাঁড়ির রেখা এবং তাহার উপরে ও নীচে মাত্রা দেওয়া। গুং 'ণ' সম্পূর্ণ বিভিন্ন; ইহাতে দুইটি বক্র রেখা নীচে একটি সামন্তরাল মাত্রা দ্বারা যুক্ত। কুং ণ সর্ব্বাংশে ইহার অনুরূপ।

ন— এই অক্ষরটিও বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। রুং 'ন' অশোকের 'ন' এর অনুরূপ, অর্থাৎ একটি দাঁড়ি রেখা ও তাহার নীচে মাত্রা;গুং ন সম্পূর্ণ বিভিন্ন,--ইহাতে 'ন' এর নীচের মাত্রাটা অর্দ্ধবৃত্তাকারে পরিণত হইয়াছে। কুং 'ন' ঠিক গুং 'ন' এর অনুরূপ।

য— এই অক্ষরটিও বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। রুং 'য' অনেকটা অশোকের 'য' এর অনুরূপ। গুং 'য' সম্পূর্ণ বিভিন্ন। একশ্রেণীর কুং য হুবহু গুং 'য' এর অনুরূপ।

---

(৩০) টমাস এক স্থানে লিখিয়াছেন, "the coins of the Kanishka group leading up directly as they do to Sassanian types struck at the beginning of the fourth century A. D." (J. R. A. S. 1913, P. 913. ইহা সম্পূর্ণরূপে আমার সিদ্ধান্তের অনুকূল।

শ— এই অক্ষরটিও বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। অশোকের 'শ' এর ন্যায় রু° 'শ' এর মধ্যের টানটি দুই বাহুর সামন্তরাল। গু° ও কু° 'শ' এর মধ্যের টানটি দুই বাহুর সহিত সমকোণবিশিষ্ট।

স গু° 'স' ও একশ্রেণীর কু° 'স' ঠিক একই প্রকার; রু° 'স' প্রাচীন 'স' এর অনুরূপ।

এতদ্ব্যতীত, রুদ্রদামের লিপিতে কেবলমাত্র পূর্ণ 'য' ফলার (Tripartite) ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কুশানলিপিতে আধুনিক 'অর্দ্ধ য ফলা'ও (Bipartite) দেখা যায়।

উপরে যে তুলনা করা হইল, তাহাতে প্রমাণিত হয় যে কুশানলিপির অক্ষর, রুদ্রদামের লিপির অক্ষর ও গুপ্ত অক্ষর, এ দুয়ের মধ্যবর্ত্তী। সুতরাং কণিষ্ক প্রভৃতির তারিখ ১৫০ খ্রীষ্টাব্দের পরে ও ৩৫০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে। কণিষ্কের কাল সম্বন্ধে আমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহা সর্ব্বাংশে ইহার অনুকূল।

তর্ক উঠিতে পারে যে, গির্ণার ও মথুরা বহু দূরে অবস্থিত; সুতরাং রুদ্রদামের লিপির সহিত কুশানলিপির যে প্রভেদ দেখা যায়, তাহা স্থানীয় বিশিষ্টতা হইতে উৎপন্ন। দুই একটি অক্ষরের বিভিন্নতা হইলে এইরূপ ব্যাখ্যা সম্ভব। কিন্তু যে আটটি কুশান অক্ষরের সহিত রুদ্রদামের অক্ষরের বিভিন্নতা, সে আটটি অক্ষরই গুপ্ত অক্ষরের অনুরূপ। এ অবস্থায় কেবলমাত্র স্থানীয় বিশিষ্টতা দ্বারা এই প্রভেদ ব্যাখ্যা করা সঙ্গত নহে। প্রথম রুদ্রসিংহের গুণ্ডা-লিপি (১৮১ খ্রীঃ অব্দ) ও প্রথম রুদ্রসেনের যশধন-লিপি (২০৪ অথবা ২০৫ খৃঃ) তুলনা করিলে দেখা যায় যে, গির্ণার-লিপির অক্ষর অপেক্ষা এই লিপিদ্বয়ের অক্ষরগুলির সহিত গুপ্তলিপির অক্ষরের অধিকতর সাদৃশ্য বিদ্যমান। সুতরাং গির্ণার অঞ্চলেও, মথুরা ও এলাহাবাদের ন্যায়, অক্ষরের ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন হইয়া আসিতেছিল। পূর্ব্বে তুলনা করিয়া দেখাইয়াছি যে, গির্ণার-লিপির অক্ষর অপেক্ষা কণিষ্ক-লিপির অক্ষর অপেক্ষাকৃত আধুনিক। গুণ্ডা ও যশধন লিপির সহিত কুশানলিপির তুলনা করিলে দেখা যায় যে, এই লিপিদ্বয়ের অক্ষর ক্রমশঃ কুশানলিপির অনুরূপ হইয়া আসিতেছে। সুতরাং প্রত্নলিপিতত্ত্বের প্রমাণ অনুসারে কণিষ্ককে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমে স্থাপন করাই সঙ্গত। মথুরায় প্রাপ্ত 'মহারাজ রাজতিরাজ' এই উপাধিযুক্ত একখানি লিপিতে ২৯৯ এই তারিখটি দেখিতে পাওয়া যায়। 'মহারাজ রাজতিরাজ' এই উপাধি ও লিপির অক্ষর পর্য্যালোচনা করিলে ইহা যে কুশানলিপির সমসাময়িক, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় এই লিপিকে কুশানলিপির সমসাময়িক বলিতে প্রস্তুত নহেন(৩১)। এ বিষয়ে তিনি প্রধানতঃ তিনটি কারণ দেখাইয়াছেন,—

(১) সারনাথ-লিপি ভিন্ন অন্য সমস্ত কুশান-লিপিতেই অর্দ্ধ য ফলা (Bipartite) ও পূর্ণ 'য' ফলা (Tripartite) উভয়েরই ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু উক্ত মথুরা-লিপিতে কেবলমাত্র পূর্ণ য ফলারই ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

(২) কুশান-লিপিতে যেখানে প্রাচীন 'শ' ব্যবহৃত হইয়াছে, সেইখানেই সঙ্গে সঙ্গে 'অর্দ্ধ য ফলা' ব্যবহৃত হইয়াছে; কিন্তু উক্ত মথুরা-লিপিতে প্রাচীন 'শ' ও কেবল পূর্ণ 'য'ফলা ব্যবহৃত হইয়াছে।

(৩) কুশান-লিপির 'য' এর বাম দিকে একটী বৃত্ত (loop) এবং দক্ষিণ দিকে একটী কোণ (angle) দেখিতে পাওয়া যায়। মথুরা-লিপির 'য'তে এই দু'য়ের কোনটিই নাই। বস্তুতঃ, মথুরা-লিপির 'য'এর অনুরূপ 'য' কুশান-লিপিতে দেখা যায় না।

কিন্তু ইহার কোন যুক্তিই সমীচীন বোধ হয় না। (১) ও (২)—রাখালবাবুর প্রবন্ধে মথুরা-লিপির যে প্রতিকৃতি (Plate III) দেওয়া হইয়াছে, তাহাতেই দেখা যায় যে, এই লিপিতেও অর্দ্ধ 'য' ফলা ব্যবহৃত হইয়াছে; দৃষ্টান্ত-

(৩১) I. A. 1908, P. 39—40.

ব্রাহ্মণ, দ্বিতীয় পংক্তির 'মহাবীরস্য' এই শব্দের 'স্য' এর উল্লেখ করিতে পারি।

(৩)—রাখালবাবুর মতে কুশান-লিপির 'ষ' মাত্রেই বাম দিকে বৃত্ত ও দক্ষিণ দিকে কোণ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। মথুরা-লিপির 'ষ'এর অনুরূপ 'ষ'ও কুশান-লিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়। (Buhler's Indische Palaeographie—Tafel III, 31—V)

সুতরাং মথুরা-লিপিকে কুশান-লিপির সমসাময়িক বলিয়া লইতে কোন আপত্তি হইতে পারে না; বলা বাহুল্য যে, ভাণ্ডারকর প্রভৃতি অনেকেই এই লিপিকে কুশান-লিপির সমসাময়িক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এখন প্রশ্ন এই যে, এই লিপির তারিখ, ২৯৯ বর্ষ, কোন্ অব্দ অনুসারে গণনা করিতে হইবে? এ পর্য্যন্ত কেহই ইহার সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নাই। রাখালবাবু ইহাকে এক অজ্ঞাত অব্দের তারিখ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমার বিবেচনায়, প্রত্নলিপির প্রমাণ অনুসারে ইহা মালব-বিক্রম-সংবৎ ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। এই সংবৎ অনুসারে ইহার তারিখ ২৪২ খৃঃ অব্দ। আমার মত অনুসারে ইহাই কুশান-রাজগণের প্রকৃত কাল। সুতরাং এই লিপি সম্বন্ধে আর কোন গোলই থাকে না। বস্তুতঃ, কণিষ্ক যে তৃতীয় খৃষ্টাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন, এই লিপিখানকে তাহার অন্যতম প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে।

উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, কণিষ্কের কাল সম্বন্ধে আমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, প্রত্নলিপিতত্ত্ব ও মুদ্রাতত্ত্বের প্রমাণ তাহার বিরোধী নহে, বরং সম্পূর্ণ সমর্থক। নূতন প্রমাণ আবিষ্কৃত না হইলে, কণিষ্কের কাল সম্বন্ধে শেষ মীমাংসার সম্ভাবনা নাই। বর্ত্তমানে যে সকল প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহার সাহায্যে একটি মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এইরূপ মতবাদের প্রতিষ্ঠা ব্যতীত প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্যের নিরূপণ দুরূহ। আমার এই মতবাদ কতদূর বিচারসহ, পাঠকগণ তাহা বিচার করিবেন। তর্ক, আলোচনা, ও পরস্পরের ভ্রমভ্রান্তি প্রদর্শন ভিন্ন ঐতিহাসিক সত্য উদ্ধার করা কঠিন। কেহ আমার ভ্রমভ্রান্তি প্রদর্শন করিলে বা এ বিষয়ে তর্ক আলোচনা করিলে বিশেষ বাধিত হইব। (সমাপ্ত)

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার।

চন্দ্রকান্ত-প্রসঙ্গ

(১৪)

বিবিধ কথা—"কাতন্ত্রচ্ছন্দঃপ্রক্রিয়া"

আমরা গতবারে "কাতন্ত্রচ্ছন্দঃপ্রক্রিয়া" রচনার ইতিহাস-টুকু যথাসম্ভব, প্রিয় পাঠকমণ্ডলীর গোচর করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। ইংরাজী ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে "কাতন্ত্রচ্ছন্দঃ-প্রক্রিয়া" পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। তর্কালঙ্কারমহাশয় উহার উপক্রমণিকাভাগে লিখিয়াছেন যে, "কাতন্ত্রে ছান্দস প্রক্রিয়া উপেক্ষিত হওয়ায় কাতন্ত্রানুসারিণী এই "কাতন্ত্রচ্ছন্দঃপ্রক্রিয়া" প্রণয়ন করিলাম।*"

"কাতন্ত্রচ্ছন্দঃপ্রক্রিয়া" অষ্টাদশ পাদে বিভক্ত। সন্ধি, নাম, আখ্যাত ও কৃৎ এই চারিটী প্রকরণ উহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সন্ধিপ্রকরণ চারি পাদে, নামপ্রকরণ ছয় পাদে, আখ্যাত ও কৃৎপ্রকরণ যথাক্রমে চারি চারি পাদে প্রবিভক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক পাদশেষে "ইতি চান্দ্রকান্ত্যাং কাতন্ত্রচ্ছন্দঃপ্রক্রিয়ায়াং সন্ধৌ প্রথমঃ পাদঃ" ইত্যাদিরূপ সমাপ্তি-বাক্য উল্লেখ করা হইয়াছে, বলা বাহুল্য, কাতন্ত্র-বৃত্তিকার আচার্য্য দুর্গসিংহও এই রীতি অবলম্বন করিয়া গিয়াছিলেন। আমরা বলিয়া আসিয়াছি, তর্কালঙ্কারমহাশয় "কাতন্ত্রচ্ছন্দঃ-প্রক্রিয়ার' সূত্র ও বৃত্তি, দুইই প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি আচার্য্য দুর্গসিংহের রীতিক্রমে বৃত্তি রচনা করিয়াছেন, অনেক স্থলে প্রয়োজনবোধে দুর্গসিংহের বৃত্তির অংশবিশেষ, নিজ বৃত্তি মধ্যে উদ্ধৃতও করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে; প্রসিদ্ধ

---

* তদেবং কাতন্ত্রে ছান্দস প্রক্রিয়ায়া উপেক্ষিতত্বাৎ কাতন্ত্রানুসারিণী কাতন্ত্রচ্ছন্দঃপ্রক্রিয়েয়মস্মাভির্বিরচিতা। (কাতন্ত্রচ্ছন্দঃ প্রক্রিয়া,—উপক্রমণিকা)।

স্মৃতিকাদি স্মৃতি হইতেও স্থানে স্থানে কিছু কিছু আহৃত হইয়াছে। এই প্রণালী অতীব সমীচীন; পরন্তু ইহা দ্বারা গ্রন্থকারের বহুদর্শিতা ও উদারতাই প্রকাশ পাইয়া থাকে,—কদাচ অক্ষমতা নহে! যাহা হউক, তর্কালঙ্কার মহাশয় তাঁহার কাতন্ত্রচ্ছন্দঃ প্রক্রিয়ায় প্রধানতঃ পাণিনীয় সূত্র, পাতঞ্জল মহাভাষ্য, কাত্যায়ন-প্রণীত বার্ত্তিক, কাশিকা এবং সিদ্ধান্ত কৌমুদীর অনুসরণ করিয়াছেন, এবং "ভাষ্যপ্রদীপোদ্যোত" লঘুশব্দেন্দুশেখর ও মনোরমা প্রভৃতি পরিদৃষ্ট সন্দিগ্ধ স্থলের মীমাংসা করিয়াছেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় উপক্রমণিকাভাগে মহামহোপাধ্যায় ৺ গোবিন্দ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় ৺ সত্যব্রত সামশ্রমী, এবং কাশীধামস্থিত কোন কোন প্রখ্যাত বৈদিক পণ্ডিত, ও পণ্ডিতপ্রবর অগ্নিহোত্রী মদীয় অন্যতম অধ্যাপক পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী মহাশয়দের নিকট হইতে উক্ত গ্রন্থ প্রণয়ন বিষয়ে সাহায্য প্রাপ্তির কথা অতি কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। সন্দিগ্ধ স্থলে সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক গোবিন্দ শাস্ত্রী মহাশয়ের পরামর্শ গৃহীত হইয়াছে; তা ছাড়া,তিনি প্রুফ্ পত্রও অনেকটা দেখিয়া দিয়াছেন। সামশ্রমী মহাশয় ও সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট হইতে কতকগুলি শ্রুতোদাহরণ সংগৃহীত হইয়াছে। যাহা হউক, তর্কালঙ্কার মহাশয় গুরুতর পরিশ্রম করিয়া কাতন্ত্রচ্ছন্দঃপ্রক্রিয়াখানি রচনা করিয়াছেন সন্দেহ নাই। বঙ্গদেশে বেদ, সংহিতার রীতিমত পঠনপাঠন না থাকাতে, অনেক বিষয়ে তাঁহাকে বেগ পাইতে হইয়াছিল; তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভার বলেই কাতন্ত্রচ্ছন্দঃপ্রক্রিয়া সুসম্পন্ন হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

কাতন্ত্রচ্ছন্দঃ প্রক্রিয়ার প্রথম শ্লোকটী এইরূপ,—

"শব্দব্রহ্ম নমস্কৃত্য পিতরৌ চ গুরূংস্তথা।
ছান্দসী চন্দ্রকান্তেন কাতন্ত্র প্রক্রিয়োচ্যতে॥"

অর্থাৎ শব্দস্বরূপ ব্রহ্ম, পিতামাতা এবং গুরুগণকে নমস্কার করিয়া চন্দ্রকান্ত ছান্দসী "কাতন্ত্রপ্রক্রিয়া"—অর্থাৎ "কাতন্ত্রচ্ছন্দঃপ্রক্রিয়া" প্রণয়ন করিতেছেন। এই শব্দব্রহ্ম নমস্কারের উদ্দেশ্য আছে। এখানে শব্দব্রহ্ম সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আমার পাঠকমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই শব্দব্রহ্ম কথাটার তাৎপর্য্য অবগত আছেন সত্য, তথাপি সংক্ষেপেই দু'একটী কথা বলিব।

আপাততঃ দেখিতে গেলে এদেশের প্রাচীন পণ্ডিতগণ 'শব্দব্রহ্ম' এই কথাটীকে দুই ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় †। প্রথমতঃ, শব্দব্রহ্ম অর্থাৎ শব্দরূপ ব্রহ্ম। একমাত্র পাণিনীয় দর্শন শব্দকে ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন,—তাঁহাদের দর্শনে শব্দই ব্রহ্ম। সেই শব্দ বা 'স্ফোট' বর্ণাতিরিক্ত; পরন্তু বর্ণাভিব্যঙ্গ অর্থাববোধক নিত্য পদার্থ। পাণিনীয় মহাভাষ্যে ভগবান্ পতঞ্জলি "চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়োঽস্য পাদাঃ দ্বে শীর্ষে, সপ্তহস্তাসোঽস্য ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি মহোদেবো মর্ত্ত্যাঃ আবিবেশ" এই শ্রুতি বাক্যটী উদ্ধৃত করিয়া শব্দপক্ষে অতি চমৎকার একটী ব্যাখ্যা করিয়াছেন; উক্ত ব্যাখ্যা সর্ব্বদর্শনসংগ্রহনামক গ্রন্থে মাধবাচার্য্যও সমুদ্ধৃত করিয়াছেন। সেই ব্যাখ্যার উপসংহারে বলা হইয়াছে যে, মহোদেব অর্থাৎ মহাদেব শব্দ, মর্ত্ত্য কিনা মরণধর্ম্মা মনুষ্যগণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; ইহা দ্বারা সেই মহতী দেবতার অর্থাৎ পরমব্রহ্মের সহিত শব্দের সমতা কথিত হইতেছে। সুতরাং জগতের নিদান স্ফোটস্বরূপ নিরবয়ব, নিত্য শব্দ ব্রহ্মই বটেন।*

† যদিও তন্ত্রে এবং মীমাংসকগণের মধ্যে 'শব্দব্রহ্ম' বা 'মন্ত্রময়দেবতা'বাদ প্রচলিত আছে, এমন কি পুরাণেরও স্থানে স্থানে 'শব্দব্রহ্ম' 'মন্ত্রব্রহ্ম' ইত্যাদিতত্ত্বের বিশেষ আভাষ রহিয়াছে, আমাদের এই সংক্ষিপ্ত প্রস্তাবে সে সকল আলোচনার যদিও সম্ভাবনা নাই, তথাপি প্রধানতঃ দু'টী মতেরই উল্লেখ করিয়াছি। অন্যগুলিরও প্রণালী প্রায় একই মত। আশা করি, পাঠকগণ স্বয়ং অনুশীলন করিবেন।
—প্রবন্ধলেখক।

* বর্ণাতিরিক্তো বর্ণাভিব্যঙ্গ্যোঽর্থপ্রত্যায়কো নিত্যঃ শব্দঃ স্ফোট ইতি" সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ।

পরমপণ্ডিত ভর্তৃহরি "বাক্যপদীয়" গ্রন্থের ব্রহ্মকাণ্ডে লিখিয়াছেন—

"অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরং।" ইত্যাদি। সুতরাং এ সকল পর্য্যালোচনা করিলে শব্দ ও ব্রহ্মের প্রভেদই আপাততঃ প্রতীত হইয়া থাকে। পাণিনীয় দর্শনে মাধবাচার্য্য বৈদান্তিকগণেরই মতানুসরণপূর্ব্বক অভেদবাদে উপনীত হইয়াছেন, তিনি শব্দব্রহ্মেরও বিবর্ত্ত স্বীকার করিয়াছেন।

পাণিনীয় ভাষ্যকারের বহুপরবর্ত্তী খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মহাকবি ভবভূতি তাঁহার উত্তরচরিতে আত্রেয়ীর মুখ দিয়া সেই শব্দব্রহ্মেরই বিবর্ত্তের কথা অতি সুন্দররূপে বলাইয়া লইয়াছেন। বনদেবতা বাসন্তীর প্রশ্নোত্তরে আত্রেয়ী বলিতেছেন,—

"তেন খলু পুনঃ সময়েন তং ভগবন্তমাবির্ভূতশব্দব্রহ্ম-প্রকাশং ঋষিমুপগম্য ভগবান্ ভূতভাবনঃ পদ্মযোনিরবোচৎ-ঋষে! প্রবুদ্ধোহসি বাগাত্মনি তদ্ ব্রূহি রাম-চরিতম্, অব্যাহত-জ্যোতিরার্ষং তে প্রাতিভং চক্ষুঃ। আদ্যঃ কবিরসি ইত্যুক্ত্বা তত্রৈবান্তর্হিতঃ। অথ ভগবান্ প্রাচেতসঃ প্রথমং মনুষ্যেষু শব্দব্রহ্মণস্তাদৃশং বিবর্ত্তং ইতিহাসং রামায়ণং ঋষিঃ প্রণিনায়"। ইহার অনুবাদ অনাবশ্যক।

এই ত গেল শব্দব্রহ্মের একভাবে গ্রহণের কথা। ইহাকে অন্যভাবেও গ্রহণ করা হইয়াছে। তাহার বিবরণ সমস্ত উপনিষদ, বেদান্ত, ও গীতাদি শাস্ত্রে অতি সুন্দররূপে বিবৃত রহিয়াছে। আমরা সংক্ষেপে দু'একটি মাত্র কথা বলিব। ছান্দগ্যোপনিষদের প্রারম্ভে উক্ত হইয়াছে,—

"ওঁ মিত্যেদক্ষরং উদ্গীথ মুপাসীত।
ওঁ মিতিহ্যুদ্গায়তি তস্যোপব্যাখ্যানং"॥ ১

† "মহাদেবঃ শব্দঃ মর্ত্ত্যাঃ মরণধর্ম্মাণঃ মনুষ্যাঃ তান্ আবিবেশ ইতি মহতাদেবেন পরেণ ব্রহ্মণা সাম্যমুক্তং স্যাদিতি জগন্নিদানং স্ফোটাখ্যো নিরবয়বঃ নিত্যঃ শব্দ ব্রহ্মেবেতি" সর্ব্বদর্শনসংগ্রহঃ।

অর্থাৎ ওঁ এই অক্ষরটী ব্রহ্মের প্রিয়তম নাম, এই ওঁকারকে কর্ম্মাঙ্গ 'উদ্গীথ'রূপে উপাসনা করিবে। অর্থাৎ ওঁকার, পরমাত্মার 'প্রতীক' স্বরূপ*, সুতরাং ওঁকারে দৃঢ়তর একাগ্রতা সম্পাদন করিবে। আচার্য্য শঙ্কর ছান্দোগ্যভাষ্যে এই শ্রুতিটীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা বলিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়। এখানে কিয়দংশ মাত্র উদ্ধৃত হইল,—

***"তদিহ 'ইতি'পরং প্রযুক্তমভিধায়কত্বাৎ উদ্গীথ-শব্দবাচ্যং উপাসীত, কর্ম্মাঙ্গাবয়বভূতে ওঁকারে পরমাত্ম-প্রতীকে দৃঢ়াং ঐকাগ্র্যলক্ষণাং মতিং সন্তনুয়াৎ।"

অর্থাৎ যদিও ওঁকার পরমাত্মার বাচক,—তথাপি এখানে 'ইতি'শব্দ সহকারে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া, সেই ওঁকার, বাচকভাব হইতে ব্যাবৃত্ত হইয়া, কেবল 'ওঁ' এই শব্দস্বরূপমাত্র প্রতিপাদন করিতেছে। ফলে, ওঁকার প্রতিমাদির ন্যায় পরমাত্মার প্রতীকভাব প্রাপ্ত হইতেছে। *** অতএব বর্ণাত্মক সেই অক্ষর বা ওঁকারই উদ্গীথ ভক্তির অবয়ব বা অংশভূত বলিয়া উদ্গীথপদবাচ্য, সুতরাং উদ্গীথরূপে ইহার উপাসনা করিবে। কর্ম্মাঙ্গভূত উদ্গীথের অবয়বস্বরূপ, পরমাত্মপ্রতীক ওঁকারে, একাগ্রতাবুদ্ধি বাড়াইবে।

উপরি উদ্ধৃত শাঙ্করভাষ্যের টীকাকার আনন্দগিরিও ওঁকারকেই উপাস্যরূপে নির্দেশ করিয়া ভাষ্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভগবদ্গীতার অষ্টম অধ্যায়ে—

ওঁমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিং॥

(১৩শ শ্লোক)

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামীও 'ওঁ' এই অক্ষরকেই ব্রহ্ম-রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন; যথা,—

**"ওঁ মিত্যেকং যদক্ষরং তদেব ব্রহ্মবাচকত্বাৎ ব্রহ্ম, প্রতিমাদিবৎ ব্রহ্মপ্রতীকত্বাদ্বা ব্রহ্ম," অর্থাৎ 'ওঁ' এই যে

*কোন একটী সামান্য বস্তু যদি ধ্যেয়রূপে কল্পিত হয়, তবে তাহাকে 'প্রতীক' কহে।

অক্ষরটী, উহা ব্রহ্মের বাচক বলিয়া ব্রহ্ম-স্বরূপ, অথবা প্রতিমাদি যেমন উপাসনার আলম্বন, তেমনি উহাও ব্রহ্মের প্রতীক অর্থাৎ ধ্যেয় ব্রহ্মরূপে কল্পিত বলিয়া ব্রহ্মস্বরূপ। টীকাকার মধুসূদন সরস্বতীও শ্রীধরস্বামীরই কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। আমরা আর অধিক দূরে যাইব না। এই স্থলে শ্রুতি ও স্মৃতিতে দেখা যাইতেছে যে, ওঁকাররূপ অক্ষরকে ব্রহ্মরূপে ধ্যান করিবে, উহা ব্রহ্মের প্রতীক বা প্রতিমাতুল্য। এই ধ্যানের তাৎপর্য্য, এই উপাসনার ফল, শ্রুতিতে নানারূপই বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে ওঁকার-উপাসকগণ দেহত্যাগের পর দেবযানে গমন করতঃ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানোদয়ে পরম ব্রহ্ম লাভ করেন। ফলতঃ, ওঁকারকে অর্থাৎ ওঁ এই অক্ষর বা বর্ণাত্মক শব্দকে যে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, তাহা বাচ্য বা বাচকের অভেদমূলেই বলা হইয়াছে। ওঁকার পরম ব্রহ্মের বাচক বা সংজ্ঞা। যোগসূত্রে পতঞ্জলি বলিয়াছেন, "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ"—প্রণব বা ওঁকার ঈশ্বরের বাচক। এখানে একটী শব্দকে অর্থাৎ ওঁকারকে ব্রহ্ম বলা হইতেছে, তা যে ভাবেই হউক;—আর পাণিনীয় দর্শনে শব্দ বা স্ফোটমাত্রকেই 'ব্রহ্ম' বলা হইয়াছে। এখানে কোন আরোপের উল্লেখ দেখা যায় না। অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্বই সকল শব্দের বিষয় বা প্রতিপাদ্য বলা হইয়াছে। এই আপাতপ্রতীয়মান ভেদের মূলেও অভেদই রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। যেহেতু, মাধবাচার্য্য "পাণিনীয় দর্শনের" উপসংহারে বলিয়াছেন,—

"শব্দ ব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ইত্যভিযুক্তোক্তেঃ"—অর্থাৎ যেহেতু আপ্তপণ্ডিতগণ বলিয়াছেন—শব্দরূপ ব্রহ্মে যাঁহারা নিষ্ণাত, বা কুশল, তাঁহারা পরমব্রহ্ম লাভ করিয়া থাকেন। এই পরম ব্রহ্মলাভ যে পাণিনীয় শব্দব্রহ্মের বা উপনিষদাদির পরমব্রহ্মপ্রতীক ওঁকাররূপ 'শব্দব্রহ্মে'র উপাসনা-প্রসূত, তাহাতে বোধ হয় সন্দেহ থাকে না। যাহা হউক, আমরা অতি সংক্ষেপে এই গুরুতর বিষয়ের একটু আভাষ প্রদান করিয়া গেলাম, অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ এ বিষয়ে সামান্য চেষ্টা করিলেই বিশেষ জানিতে পারিবেন।

যে প্রসঙ্গে কথা উঠিয়াছিল—সেই শব্দ ব্রহ্ম নমস্কৃত্য"। তর্কালঙ্কার মহাশয় শব্দব্রহ্মের নমস্কার করা দুটী কারণেই সঙ্গত বোধ করিয়াছিলেন,—প্রথমতঃ, পাণিনীয় মতানুসরণে ব্যাকরণ শাস্ত্র প্রণয়ন করিতে গিয়া, বৈয়াকরণদর্শনপ্রসিদ্ধ শব্দব্রহ্মের নমস্কার অতীব আবশ্যক, পরন্তু রীতিসিদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ, শব্দব্রহ্মপদে সেই বেদান্ত ও উপনিষদাদি কথিত পরম ব্রহ্মের প্রতীক ওঁকারাদিরূপ শব্দ ব্রহ্মের নমস্কারও পরম উপাদেয় সন্দেহ নাই। তর্কালঙ্কার মহাশয় নানা দর্শনাদিতে বিশেষ প্রাজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার প্রত্যেক শাস্ত্র ও দর্শনের গ্রন্থে সেই সকল শাস্ত্র বা দর্শনপ্রসিদ্ধ দেবতার নমস্কারাদি উপনিবদ্ধ হইয়াছে। এ বিষয়ে তাঁহার সূক্ষ্ম-দৃষ্টি বিশেষ প্রশংসার্হ। যাহা হউক, কাতন্ত্রচ্ছন্দঃপ্রক্রিয়ায় তর্কালঙ্কার মহাশয় গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থে যদিও তর্কালঙ্কার মহাশয় প্রধানতঃ পাণিনীয় নিবন্ধকেই উপজীব্য করিয়াছিলেন, তথাপি স্থানে স্থানে পাণিনীয় তন্ত্রের রীতির অনুসরণ না করিয়া, প্রয়োগানুসারিণী রীতিরই অবলম্বন করিয়াছেন; তাহাতে প্রয়োগও সুসিদ্ধ হইয়াছে, পরন্তু কল্পনারও সুগমতা হইয়াছে।

কোন কোন স্থানে তর্কালঙ্কার মহাশয় পাণিনির উপেক্ষিত পদরাশিরও ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, যেহেতু বেদে সে সকল প্রয়োগের বহু উল্লেখ পাওয়া গিয়া থাকে, অথচ মহামতি পাণিনী তাহাদের নামও করেন নাই।

তা ছাড়া, তর্কালঙ্কার মহাশয় আরও একটু নূতন করিয়াছেন। কাতন্ত্রচ্ছন্দঃপ্রক্রিয়াতে বৈকল্পিক প্রয়োগগুলি, এবং যে অর্থে যেরূপ প্রয়োগ ব্যুৎপাদিত হইয়াছে, তদতিরিক্ত অর্থে যেরূপ প্রয়োগটী হইবে তাহাও নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে পাঠার্থীর পক্ষে বড়ই সুবিধা হইয়াছে। এখানে যদৃচ্ছাক্রমে একটী সূত্র উঠাইয়া উদাহরণ দিতেছি,—

"আত্মনশ্চাকারো মন্ত্রে" ইহা সূত্র; ইহার বৃত্তি এইরূপ,—

"আকারো পরে আত্মন্ ইত্যেতস্যাদের্লোপো ভবতি, মন্ত্রবিষয়েপ্রয়োগে।" প্রয়োগ এইরূপ, "অবত্মনা ভরতে কেতবেদা, অবত্মনা ভরতে ফেনমুদন"। ঋ ১। ১০৪। ৩॥ "অবত্মনা দৃংহা শংবরং ভিনৎ ঋ ১। ৫৪। ৪॥

বিশ্বংলোক মৃতত্মনা ঋ ১। ৪১। ৬॥ "আত্মন" ইতিকিং শংপ্রজয়া সমায়ুষা ঋ ১। ২৩। ২৪॥

"আকারে" ইতিকিং বলং দধান আত্মনি ঋ ৯। ১১৩। ১॥ ইত্যাদি।

সূত্রস্থ 'মন্ত্রে' এই পদের ব্যাবৃত্তি দেওয়া হইতেছে; যথা—

'মন্ত্রে' ইতিকিং ব্রহ্মণে মাভূৎ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরিষক্তঃ বৃঃ উঃ ৪। ৩। ২১॥ ভবত্যাত্মনা প্রপ্রজয়া পশুভি র্জায়তে য এবং বেদ ঐঃ ব্রাঃ ৪। ২৩॥

বাস্তবিকই গ্রন্থখানি অতি সুপ্রণালীবদ্ধ হইয়াছে। তর্কালঙ্কার মহাশয় উক্ত গ্রন্থের কৃৎপ্রকরণে কতকগুলি ছান্দস উণাদিক প্রয়োগও ব্যুৎপাদিত করিয়াছেন, এবং দিক্ দর্শনার্থ কতিপয় নৈঘণ্টুক পদেরও ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন। যাহা করিয়াছেন, তাহা প্রকৃত পক্ষেই শ্লাঘনীয় হইয়াছে।

এইবার আমরা বর্ত্তমান গ্রন্থ প্রণয়নে তাঁহার ভাষার সম্বন্ধে দু' একটা কথা বলিব।

কাতন্ত্রচ্ছন্দঃ প্রক্রিয়ার ভাষা অতি প্রাঞ্জল ও প্রাচীন রীতিসংবাদিনী; তিনি যে বিষয়ে যেরূপ ভাব প্রকাশ করিবার জন্য ভাষার সাহায্য লইয়াছেন, ভাষা সেই বিষয়েই সম্পূর্ণ উপযোগিনী হইয়া তাঁহার মনোগত ভাব প্রকাশের সাহায্য করিয়াছে। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ভাষাবিন্যাস-চাতুর্য্য প্রকৃতপক্ষেই বিশেষ ক্ষমতার পরিচায়ক। সংস্কৃত নাটক ও মহাকাব্যে যাঁহার চটুলরসভাবমুখরা রচনারীতি একটি দ্রুতমন্থর গতিভঙ্গিতে লীলায়িত, গভীর দর্শনাদি শাস্ত্রের সারমর্ম্ম উদ্ঘাটিত করিতে যাইয়া সেই রীতিকেই আমরা বিশেষ শালিনতাময়ী প্রসন্নগম্ভীরা ও লীলামন্থরগামিনী-রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে দেখিতে পাই। যাহাকে এইমাত্র 'কৌমুদীসুধাকর' 'চন্দ্রবংশ' ও 'সতীপরিণয়ে' হাস্যে লাস্যে, বিলাসে বিভ্রমে মৃদুমধুর কলোচ্চকণ্ঠে নিখিল-রসজ্ঞহৃদয়ের অবনত মস্তকের প্রান্তে একটুমাত্র মৃদুচঞ্চল অঞ্চলাগ্র ছোঁয়াইয়া যাদুমন্ত্রে মনপ্রাণ কাড়িয়া লইয়া চলিয়া যাইতে দেখিয়াছি, সেই তাহাকেই "গোভিল", "বৈশেষিকাদি" শাস্ত্রের ভাষ্যে, "ন্যায়কুসুমাঞ্জলি" প্রভৃতির টীকায়, "অলঙ্কারসূত্র" ও "কাতন্ত্রচ্ছন্দঃপ্রক্রিয়া" প্রভৃতি মৌলিক গ্রন্থে এবং "চন্দ্রালোক" প্রভৃতি নিবন্ধে কি মনোহর প্রৌঢ়কমনীয় বেশে, কি প্রসন্নহাস্যসমুজ্জ্বল কান্তিতে, কি ছায়াতপসংমিশ্র নাতিকোমল নাতিকঠোর রূপে ভাগ্যবতী প্রৌঢ়া গৃহিণীরই ন্যায় সমস্তটা গ্রন্থ যেন আপনার আয়ত্ত গৃহস্থালীটারই মত স্নেহে ও প্রভুত্বে মণ্ডিত করিয়া আগুলিয়া রাখিয়াছে দেখিতে পাই। তর্কালঙ্কার মহাশয় অভিমান প্রকাশ করিতে জানিলে, হয়ত কোথায়ও মহাকবি ভবভূতিরই মত বলিতেন—"যংব্রাহ্মণমিয়ংদেবী বাক্ বশ্যেবানুবর্ত্ততে"। ভগবতী বাণী তর্কালঙ্কার মহাশয়ের একান্তই বশীভূতা ছিলেন সন্দেহ নাই। আমরা এখানে বাঙ্গালার গৌরব, "এসিয়াটিক সোসাইটীর" ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের একটী মন্তব্য উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। ডাক্তার মিত্র বলিয়াছিলেন, "চন্দ্রকান্তের বৈশেষিক ভাষ্য নামক গ্রন্থ, শঙ্কর, কুমারিল, উদয়ন, ও বাচস্পতি মিশ্রের হাতে যে ভাষা সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতি লাভ করিয়াছিল. সেইরূপ সহজবোধ্য সুন্দর ওজস্বিনী প্রসন্নগম্ভীর ভাষায় লিখিত হইয়াছে। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ভাষা ঐ সকল প্রাচীন দার্শনিকদিগের ভাষার সহিত তুলিত হইলে, কোন অংশেই ন্যূন বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে না। আমরা এখানে কাতন্ত্রচ্ছন্দঃ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে কএকজন ইউরোপীয় পণ্ডিতের মতামত সংকলিত কএকখানি পত্র

উদ্ধৃত করিলাম। পাঠকগণ দেখিবেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তর্কালঙ্কার মহাশয় ও তাঁহার গ্রন্থকে কোন্ চক্ষে দেখিতেন।

(১)

প্রফেসার অফ্রেট্ সাহেবের পত্র।

মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার।

মহাশয়,

আমি আপনার কাতন্ত্রচ্ছন্দঃপ্রক্রিয়া পাঠ করতঃ অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। ইহা আপনার বেদজ্ঞানের, বিশেষতঃ ঋগ্বেদে বিশেষাধিকারের পরিচায়ক।

আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, আপনার বহু সতীর্থ এই গ্রন্থ হইতে বিশেষ উপকার লাভ করিবেন।

(স্বাক্ষর) ডি অফ্রেট্।

রাইন্ নদীর তীরস্থ বন্।

৩১ শে জুলাই, ১৮৯৬

(২)

সার্ আলফ্রেড্ ক্রফ্ট্ সাহেবের পত্র।

মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার

প্রিয় পণ্ডিত মহাশয়,

আপনি কলাপব্যাকরণবিষয়ক যে নূতন গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা আমার নিকট প্রেরণ করিয়া বাধিত করিয়াছেন। যদিও আমি নিজে ইহার গুণোপলব্ধি করিতে অক্ষম, তথাপি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, আপনার যশই আপনার গ্রন্থকে উক্ত বিষয়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠগণের প্রণীত গ্রন্থের সমকক্ষ করিয়া তুলিবে।

আমি দ্বিতীয় কপিখানা সার্ এ ম্যাকাঞ্জি সাহেব মহোদয়ের অধ্যয়নের নিমিত্ত প্রাইভেট সেক্রেটারী মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিলাম।

(স্বাক্ষর) এ ক্রফ্ট

শিক্ষাবিভাগীয় ডিরেক্টর মহোদয়ের

আফিস।

দার্জ্জিলিং, ২১ শে জুন, ১৮৯৬

(৩)

এম্ সেনার্ট সাহেবের পত্র

মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার।

মহাশয়,

আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনার প্রণীত "কাতন্ত্রচ্ছন্দঃপ্রক্রিয়া" প্রেরণ করিয়া অতিশয় বাধিত করিয়াছেন। পুরাতন কাতন্ত্রে যাহা অসম্পূর্ণ ছিল, আপনার গ্রন্থ তাহা সম্পূর্ণ করিতে সক্ষম হইবে। কাত্যায়নের পালি ব্যাকরণ প্রকাশ বিষয়ে পুরাতন কাতন্ত্রে আমার বিশেষ স্বার্থ বিজড়িত ছিল। কাত্যায়নের পালি ব্যাকরণ ও পুরাতন কাতন্ত্র একই প্রণালীতে লিখিত। আপনি অবশ্য অবগত আছেন যে, ব্যাকরণসম্বন্ধীয় বিষয়গুলির যেরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, সেরূপ ব্যাখ্যায় আমাদের ইউরোপীয়দিগের শিক্ষার কোনও সুবিধা হয় না, এবং আমাদের বিশেষ অভাবগুলিরও পূরণ হয় না। কিন্তু আপনি হিন্দু ছাত্রদিগের জন্য লিখিয়াছেন; আপনার বৈদিক-ব্যাকরণবিষয়ক বিশদ গ্রন্থ তাহাদের পক্ষে নিশ্চয়ই অত্যন্ত মূল্যবান হইবে। আপনার এই গ্রন্থপ্রণয়নবিষয়ে আন্তরিকতার সহিত আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। এই গ্রন্থ আপনার ঐকান্তিক চেষ্টা ও গভীর বিদ্যার পরিচায়ক।

(স্বাক্ষর) এমাইল সেনার্ট

ল্যা পেলাইছ, পাচলা কার্ট, বেনার্ড,

ছার্থ

৯ই জুলাই, ১৮৯৬

(৪)

ওয়েবার সাহেবের পত্র

মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার।

মহাশয়,

আপনার ১৬ই জুন তারিখের পত্রখানা ও কাতন্ত্রচ্ছন্দঃপ্রক্রিয়া গ্রন্থখানা পাইয়া ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আমি অল্প দিনের মধ্যেই আপনার নিকট (Bibliotheca Indica) পাঠাইব, এরূপ আশা করি। তাহাতেই আপনার সাধু চেষ্টার ও সংস্কৃত সাহিত্যক্ষেত্রে কৃতিত্বের

আপনার অভিমত দেখিতে পাইবেন। Bibliotheca ... Eggeling (ইগেলিং) প্রণীত কাতন্ত্রের ... যে অসম্পূর্ণ রহিয়াছে, তাহা পূর্ণ করিবার জন্য ... আপনাকে উপযুক্ত মনে করি। ইহা অতিশয় সুখের ... যে কলিকাতাতেও বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু পণ্ডিতমণ্ডলী ... পণ্ডিতগণের সহিত যোগদান করিতেছেন।

(স্বাক্ষর) এ ওয়েবার

বার্লিন, ৫৬

৩১শে জুলাই, ১৮৯৬

(৫)

অধ্যাপক বেণ্ডেল সাহেবের পত্র।

ব্রিটিশ মিউজিয়াম্

লণ্ডন ; ডব্লিউ, সি

৭ই জুলাই ১৮৯৬

মহাশয়,

আপনার প্রেরিত এক খণ্ড কাতন্ত্রচ্ছন্দঃপ্রক্রিয়া এই মাত্র ... । সেজন্য আপনাকে বহু ধন্যবাদ দিতেছি।

ইহা অত্যন্ত সুখের বিষয় যে প্রকৃত বেদাধ্যায়ন বঙ্গে ...বিত হইতেছে।

... বৎসর পূর্ব্বে বেদ বলিতে বঙ্গদেশে দুই একখানা ... ব্যতীত আর কিছুই বুঝাইত না। বৈয়াকরণিক ... প্রাচীন ভাষার সহিত তাহাদের সম্বন্ধ বিচার অতীব ...দীপক। আমি আশা করি, আপনি অধ্যয়নের ... বর্ত্তমান যে অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থখানা রচনা ... তাহার একখানা সংক্ষিপ্ত ইংরাজী প্রবন্ধ বেঙ্গল ...র্ণাল অথবা "ইণ্ডিয়ান্ এণ্টিকুয়েরী"তে প্রকাশিত

... কি এতদূরও আশা করিতে পারি না যে, আপনি ...বেকানন্দের (কাতন্ত্রবিদ্যালয়ের দেশের) কোন ... সেই বিদ্যালয়ের জন্য, ডাক্তার বোথলিঙ্কের ... সর্ব্বদা ব্যবহারোপযোগী সংস্করণের ন্যায়, ইংরেজীতে এবং সংস্কৃতে সূত্র, টীকা এবং সম্পূর্ণ সূচিপত্রসহ উহার একখানা সংস্করণ করিবেন ? সুতরাং পুস্তকখানা ইগেলিঙ্গ সাহেবের বিব্লিউথিকা ইণ্ডিকার অনুরূপই হইবে।

আশা করি, আপনার পণ্ডিতবন্ধুবর্গের সহিত এ বিষয় আলোচনা করিবেন। আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

আপনার বিশ্বস্ত

সি বেণ্ডেল

(৬)

অধ্যাপক মেক্স্ মুলার সাহেবের পত্র।

নরহাম গার্ডেন্স্

অক্স্ফোর্ড

১২ই জুলাই, ১৮৯৬।

মহাশয়,

ভারতবর্ষ হইতে এত অধিকসংখ্যক পুস্তক আমার নিকট প্রেরিত হয় যে, সকগুলি পাঠ করা কিংবা তাহাদের প্রাপ্তি স্বীকার করা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমি আশা করি, ভারতীয় বন্ধুগণ আমার বয়সাধিক্য (৭২) এবং কার্য্য-বাহুল্যের কথা বিস্মৃত হইবেন না। তাঁহাদের অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ, কিন্তু তাঁহাদের প্রত্যেককে আমার বাসনানুরূপ ধন্যবাদ দেওয়া কার্য্যতঃ অসম্ভব।

কিন্তু আপনার পুস্তক সম্বন্ধে অন্য কথা। আপনার 'কাতন্ত্রচ্ছন্দঃ প্রক্রিয়া' মৌলিক গ্রন্থ, ইহার জন্য আপনি অবশ্যই যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। কেবল ভারতে নহে, ইংলণ্ডেও ইহা প্রত্যেক সংস্কৃতজ্ঞ, বিশেষতঃ বৈদিক পণ্ডিতগণের প্রয়োজনীয়। বৈদিক ব্যাকরণের জন্য ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ অনেক করিয়াছেন। কিন্তু সমস্তেই পাণিনি-কাত্যায়ন-প্রভৃতির ন্যায় একজন দেশীয় পণ্ডিতের অভিমত পাইতে ইচ্ছা করেন। দুঃখের বিষয়, পাণিনি ছান্দস নিয়মগুলির অতি অল্প আলোচনা করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস, তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, 'প্রাতিশাখ্য' হইতেই আবশ্যক বৃত্তান্ত

সংরক্ষিত হওয়া যাইবে। কিন্তু সেগুলিকে ব্যাকরণ না বলিয়া বরং শিক্ষা বলা যাইতে পারে। আমি স্বয়ং জার্ম্মাণ অনুবাদসহ একখানা "ঋক্‌প্রাতিশাখ্য" প্রকাশিত করিয়াছি। তখনও আপনার গ্রন্থের ন্যায় একখানা গ্রন্থের অভাব ছিল। আমি মনে করি বিদ্যাচর্চ্চায় আমি ইহা হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইব।

আশা করি, আপনাদের প্রাচীন ভাষার প্রতি আমাদের ইউরোপীয় আর্য্যদের যে অনুরাগ আছে, তাহা দুর্ভাগ্য বা কলিযুগের চিহ্ন বলিয়া মনে করিবেন না। ইহাতে বরং আপনারা সন্তুষ্টই হইতে পারেন। আমরা সাহিত্যের প্রজাতন্ত্র রাজ্যে বাস করি, এখানে কর্ম্ম দ্বারা তাহাদের উচ্চনীচ বিবেচনা করা হয়, জাতি বা বর্ণদ্বারা নহে। সংস্কৃতভাষাশিক্ষায় আপনারা অবশ্যই আমাদের অপেক্ষা অধিক সুযোগ প্রাপ্ত হন। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদেরও কতক সুযোগ আছে। কারণ, আপনারা যে সমস্ত বদ্ধমূলসংস্কার সহজে পরিত্যাগ করিতে পারেন না, আমরা সেগুলি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত।

আপনি নিশ্চয় জানিতে পারেন যে, আপনার গ্রন্থের ন্যায় মৌলিক গ্রন্থ ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর অত্যন্ত আদরণীয় হইবে। ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ডেও অনেক পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি আছেন। তবে, আপনার গ্রন্থের ন্যায় গ্রন্থ সমালোচনার ভয় হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত।—"পরগুণ লেশৈর্মিণাং মুদে ভবিতা।"

আপনি কি আমার পুরাতন বন্ধু এবং সংবাদদাতা "শব্দকল্পদ্রুমের" রাধাকান্তের পুত্র?

আপনার বিশ্বস্ত
মেক্স্‌মুলার

অধ্যাপক মেক্স্‌মুলারের ভারতীয় 'ষড়দর্শন' হইতে কিয়দংশ।—

ক্রমেই আমরা একটী শোকপূর্ণ সত্যের বিষয় অবগত হইতেছি যে, বৌদ্ধযুগের আগেকার সাহিত্যের অতি অল্পাংশই আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এমন কি, সেগুলিও হয়ত কোন কোন স্থলে,—যেমন সাংখ্যসূত্রে—নষ্টমূলের পুনরুৎপাদন মাত্র। আমরা এখন জানিতে পারিতেছি যে, এইরূপ সূত্র যে কোন সময়েই রচিত হইতে পারে। আমাদের ইহা ভুলিয়া যাওয়া উচিত নহে যে, এমন কি বর্ত্তমানেও, সংস্কৃত পণ্ডিতগণের অভাবের দিনেও, ভারতে এমন পণ্ডিত আছেন, যাঁহারা, রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় কাব্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও, কালিদাসের অনুকরণ এরূপ কৃতকার্য্যতার সহিত করিতে পারেন যে, অতি অল্পসংখ্যক পণ্ডিতই তাহার পার্থক্য অনুভব করিতে সমর্থ। অল্পদিন পূর্ব্বে সূত্রাকারে লিখিত, 'বৃত্তি'সমন্বিত, ভারতের একজন জীবিত পণ্ডিতের লিখিত একখানা গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা ইউরোপীয় অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের ভ্রান্তি জন্মাইতে পারে।

এই পুস্তকখানা চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে লিখিত। ইহার নাম 'কাতন্ত্রচ্ছন্দঃ-প্রক্রিয়া'; ইহাতে বৈদিক ব্যাকরণের অতিরিক্ত সূত্রগুলি সমাবেশিত হইয়াছে। তিনি ইহা গোপন রাখেন নাই যে "সূত্রম্ বৃত্তি উভয়মপি ময়ৈব ব্যরচি" (সূত্র এবং টীকা দুইই আমার রচিত)।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীকৃষ্ণ সিদ্ধান্তশাস্ত্রী।

সোসিয়ালিজ্‌ম্

(৪)

ফার্ডিন্যাণ্ড ল্যাসেল্ ও জার্ম্মাণ সোসিয়াল্ ডিমক্রেসী

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের পরে কিছুদিন পর্য্যন্ত ইউরোপের কোথায়ও সোসিয়ালিজ্‌ম্ সম্বন্ধে কোনও সাড়াশব্দ শুনিতে পাওয়া যায় নাই। অনেকেই মনে করিয়াছিলেন, এইবার বুঝি সোসিয়ালিজ্‌মের অস্তিত্ব পর্য্যন্তও বিলুপ্ত হইল; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। বহু শতাব্দী যাবৎ ইউরোপীয় সভ্যতা যে রূপে বিকশিত হইয়া আসিতেছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীর সোসিয়ালিজ্‌ম্‌বাদ তাহারই অবস্থাবিশেষের পরিচায়ক মাত্র। যে সমস্ত কারণ-পরম্পরার সমবায়ের ফলে এই অবস্থা সংঘটিত হইয়াছিল, তৎসমুদয়ের বিলোপসাধন না হওয়া পর্য্যন্ত

ইউরোপীয় সমাজব্যবস্থা হইতে সোসিয়ালিজ্‌মের তিরোধান সম্ভবপর ছিল না। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সেই ইহার প্রথম আবির্ভাব হয় বটে, কিন্তু ঐ দেশের তাৎকালিক অবস্থা ইহার প্রচার ও বিস্তৃতির পক্ষে তাদৃশ উপযোগী না হওয়াতে, ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের পর এই আন্দোলন অনেকটা স্তিমিত ভাব ধারণ করে, কিন্তু সমাজ-হৃদয় হইতে একেবারে বিদূরিত হয় নাই; বরং লোকনয়নের অন্তরালে থাকিয়া ধীরে ধীরে আত্মশক্তি সংগ্রহ করিতে থাকে, এবং প্রায় দশ বৎসর পরে অনুকূল আবহাওয়া পাইয়া, সম্পূর্ণ নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পুনরাবির্ভূত হইল। এতদিন ইংলণ্ড ও ফ্রান্সই সোসিয়ালিজ্‌ম্-আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল; ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ হইতে জার্ম্মাণি ও রুশিয়া ইহার নেতৃত্ব গ্রহণ করে। তদবধি আজ পর্য্যন্ত ইহা ক্রমশঃ বর্দ্ধমান হইয়া নিরবচ্ছিন্ন গতিতে প্রবাহিত হইতেছে।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ফ্রান্সের প্রজাবিদ্রোহ ও ইংলণ্ডের 'চার্টিজ্‌ম্' আন্দোলনের কথা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। প্রজামহলের এই অশান্তি শুধু ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সীমারেখার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, পরন্তু ইউরোপের প্রায় সর্ব্বত্রই উহা অল্পাধিক পরিমাণে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। এই বিদ্রোহকে সাধারণতঃ অনিয়ন্ত্রিত শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় প্রজাশক্তির অভ্যুত্থান ও শেষ বিজয়লাভ বলা যাইতে পারে। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ওয়াটার্লুক্ষেত্রে নেপোলিয়নের পরাভবের পর অষ্ট্রীয়-রাজমন্ত্রী মেটার্নিকের বুদ্ধিচাতুর্য্যে ইউরোপে অনিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইলে, উহার বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়, ১৮৪৭-৪৮ খৃষ্টাব্দের প্রজাবিদ্রোহে তাহারই শেষ পরিসমাপ্তি; ইহার ফলে ইউরোপীয় রাজশক্তি প্রজাশক্তি কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। রাজনৈতিক অবস্থার এইরূপ বিপর্য্যয় সাধিত হইলেও, জনসাধারণ সহসা ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় নাই; ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সোসিয়ালিজ্‌ম্‌বাদ তাহাদের তাদৃশ মনোযোগ লাভ করিতে পারে নাই। এই সময়ে কার্‌ল্ মার্ক্স্ (Karl Marx), ফ্রিডারিক এন্‌জেল্‌স্ (Friederich Engels), রডবার্টাস্ (Rodbertus), ফার্ডিন্যাণ্ড ল্যাসেল্ প্রভৃতি জার্ম্মাণিতে সোসিয়ালিজ্‌ম্-বাদের পুনঃ প্রচারে প্রবৃত্ত হন। এই নেতৃচতুষ্টয়ের মধ্যে ফার্ডিন্যাণ্ড ল্যাসেল্ জার্ম্মাণ সোসিয়াল্ ডিমক্রেশীর (The German Social Democracy) উদ্ভাবক বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

ফার্ডিন্যাণ্ড ল্যাসেল (Ferdinand Lassale)—১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ফার্ডিন্যাণ্ড ল্যাসেলের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ইহুদীবংশীয় ছিলেন; তাঁহার একটি প্রকাণ্ড কারবারও ছিল। পুত্রকেও সেই কারবারে প্রবৃত্ত করাইবার অভিপ্রায়ে তিনি অল্প বয়সেই ল্যাসেল্‌কে এক বাণিজ্য বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করাইয়া দেন। কিন্তু ল্যাসেলের ইহা পছন্দ না হওয়াতে, তিনি উক্ত বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পাঠসমাপ্তি হয়। শুধু লেখাপড়ার চর্চ্চাতেই অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিবেন বলিয়া তিনি সঙ্কল্প করেন। কিন্তু ঘটনাবৈচিত্রে তাঁহার জীবনের স্রোত অন্য দিকে প্রবাহিত হয়।

১৮৪৭-৪৮ খৃ. অব্দের প্রজাবিদ্রোহের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কল-কারখানা-বহুল রাইন্ প্রদেশেই (The Rhine Provinces) এই অশান্তির মাত্রা কিছু বেশী হইয়াছিল। উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া কার্‌ল্ মার্ক্স প্রভৃতি সোসিয়ালিষ্ট নেতৃগণ এই অশান্তিপূর্ণ রাইন্ প্রদেশকেই কেন্দ্র করিয়া সোসিয়ালিজ্‌মের প্রচারকল্পে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে থাকেন। অনতিবিলম্বে ল্যাসেল্‌ও তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত হন। এই আন্দোলনে কিছুমাত্র প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে না পারিলেও, সরকারী কর্ম্মচারীর কার্য্যে বাধা দেওয়ার অপরাধে এই সময়ে ল্যাসেলের তিন মাসের কারাদণ্ড হইয়াছিল।

অতঃপর ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি বিষয়ান্তরে লিপ্ত ছিলেন। ১৮৫৯ অব্দে ইতালীর অধিকার লইয়া ফ্রান্স ও

অষ্ট্রিয়াতে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে প্রাশিয়ার কোন্‌ পক্ষ অবলম্বন করা উচিত, ল্যাসেল্‌ তৎসম্বন্ধে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। এই পুস্তকে ল্যাসেল্‌ বলেন যে, প্রাশিয়ার শ্রীবৃদ্ধি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জার্ম্মাণ ষ্টেটসমূহের মধ্যে ঐক্যবন্ধন স্থাপিত করিতে হইলে, অষ্ট্রিয়ার শক্তি খর্ব্ব করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। কিন্তু যত দিন ইতালি অষ্ট্রিয়ার করতলগত থাকিবে, তত দিন তাহার শক্তিহানি করা নিতান্ত সহজসাধ্য হইবে না। ঐশ্বরিক বিধানানুসারে ইতালি লইয়া ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়ায় যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং এই যুদ্ধে ফ্রান্সের পক্ষাবলম্বন করিয়া যাহাতে ইতালি অষ্ট্রিয়ার হস্তচ্যুত হয়, তাহার চেষ্টা করাই প্রাশিয়ার পক্ষে সর্ব্বোতোভাবে বিধেয়। ল্যাসেলের এই উপদেশবাণী তাৎকালিক প্রাশিয় রাজপুরুষগণের সম্যক্‌ দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয় নাই বটে, কিন্তু ইহার পর দশ বৎসর যাইতে না যাইতেই, কূটনীতি-বিশারদ বিস্‌মার্ক এই নীতিরই অনুসরণ করিয়া বর্ত্তমান জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

১৮৬১-৬২ খৃষ্টাব্দ জার্ম্মাণীর ইতিহাসে অতি স্মরণীয় বৎসর। ১৮৬১ অব্দে বর্ত্তমান জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের প্রথম সম্রাট উইলিয়ম্‌ (William I) প্রাশিয়াব সিংহাসনে আরোহণ করেন; ১৮৬২ অব্দে জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা অটো ভন্‌ বিস্‌মার্ক (Otto Von Bismark প্রাসিয়রাজের প্রধান মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত হন। বিস্‌মার্ক ও উইলিয়াম্‌ যখন জার্ম্মাণসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ়পদবিক্ষেপে অগ্রসর হন, ধনশালী মধ্যবিত্তসম্প্রদায় তখন তাঁহাদের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হইয়া দাঁড়ায়। এই সম্প্রদায়ের সহিত ল্যাসেলের মতের তাদৃশ মিল না থাকিলেও, আপাততঃ উহাদের সহিতই সম্মিলিত হইয়া স্বীয় মত প্রচারের চেষ্টা করিতে থাকেন। এই উপলক্ষে ল্যাসেল্‌ কয়েকটী বক্তৃতাও দিয়াছিলেন। ইহাতেই তাঁহার গণতান্ত্রিক (Democratic) মতের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। ল্যাসেল্‌ বলেন যে, রাজ্যে যখন যে সম্প্রদায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী হইয়া দাঁড়ায়, সেই সম্প্রদায়ের মতিরতি ও রীতি-প্রকৃতিই ঐ রাজ্যের তদানীন্তন শাসনতন্ত্রে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। রাজা, অভিজাতবর্গ, মধ্যবিত্তসম্প্রদায় ও শ্রমজীবীসাধারণ, এই চারি শ্রেণীর লোক লইয়াই প্রাশিয়া রাজ্য গঠিত; কিন্তু এতন্মধ্যে রাজার শক্তিই অন্য তিন শ্রেণীর সম্মিলিত শক্তি অপেক্ষাও অনেক বেশী, কারণ সমস্ত সমরবিভাগ একমাত্র রাজারই আজ্ঞাবহ। এমতাবস্থায় শুধু মৌখিক প্রতিবাদ দ্বারা রাজপুরুষগণের ইচ্ছার প্রতিকূলে প্রজাসাধারণের কোনও প্রতিকার পাইবার আশা নিতান্ত সুদূরপরাহত। ল্যাসেল্‌ বলেন যে, এইরূপ অবস্থায় গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে প্রতিকার লাভের একটী মাত্র উপায় আছে। যখনই রাজপুরুষগণ কোনও অন্যায় কার্য্য করেন, বা করিবার প্রস্তাব করেন, তখনই প্রজাসাধারণের প্রতিনিধিগণের রাজদরবারে উপস্থিত হইয়া প্রস্তাবিত কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করতঃ তৎক্ষণাৎ সভাস্থল পরিত্যাগ করা উচিত। কারণ, এমতাবস্থায় শেষ পর্য্যন্ত সভাস্থলে উপস্থিত থাকিলে, গবর্ণমেণ্ট হয় তো সরলবিশ্বাসী জনসাধারণের মনে এই বিশ্বাস জন্মাইবার চেষ্টা করিতে পারেন যে, প্রস্তাবিত কার্য্যে প্রতিবাদীকারীগণের সম্মতি না থাকিলেও একেবারে অমতও নাই; সভাস্থলে শেষ পর্য্যন্ত উপস্থিতিই তাঁহাদের এই গৌণ সম্মতির প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। কিন্তু সকলেই যদি একবাক্যে সভাস্থল পরিত্যাগ করে, তবে পরিণামে গবর্ণমেণ্টকে প্রজাশক্তির নিকট হার মানিতেই হইবে; কারণ, ইউরোপীয় সভ্যতা আজকাল এমন এক অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, তাহাতে প্রজাশক্তির সহিত নিরন্ত প্রতিযোগিতা করিয়া কোনও গবর্ণমেণ্টের পক্ষেই দীর্ঘকাল নিরাপদে অবস্থান সম্ভবপর নহে। বলাই বাহুল্য, এইরূপ বক্তৃতার ফলে তৎকালীন প্রাশীয় রাষ্ট্রনীতির কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই, বরং গবর্ণমেণ্ট ও মধ্যবিত্তসম্প্রদায়, উভয়ের সহিতই ল্যাসেলের বিষম মতান্তর উপস্থিত হয়, উভয়েই তাঁহাকে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিতে থাকে।

পক্ষান্তরে, বিস্‌মার্ক ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মনোমালিন্যও বিশেষ তীব্রভাব ধারণ করিতে থাকে। প্রাশিয়ার সামরিক

শক্তির বৃদ্ধি করাই বিস্‌মার্কের সর্ব্বপ্রধান মতলব ছিল; এই কার্য্যের জন্য বিস্তর অর্থের প্রয়োজন। কাজেকাজেই ধনশালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বিস্‌মার্কের উদ্দেশ্যের বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়। যখন উভয়পক্ষে এইরূপ গোলযোগ চলিতেছিল, তখন এই সুযোগে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে শ্রমজীবীগণের অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়া লইবার আশায়, ল্যাসেল "শ্রমজীবীগণের কার্য্য-পদ্ধতি ও বর্ত্তমান যুগের সহিত উহাদের বিশেষ সম্বন্ধ" (The Working-Men's Programme; On the Special Connection of the Present Epoch of History with the Idea of the Working Class) নামে আর একটী বক্তৃতা দেন। গবর্ণমেণ্টকে সন্তুষ্ট করা তো দূরের কথা, এই বক্তৃতাতে ধনশালীগণের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী-গণকে উত্তেজিত করা হইয়াছে বলিয়া তিনি রাজদ্বারে অভিযুক্ত ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন।

রাজবিচারে ল্যাসেলের শাস্তি হইল বটে, কিন্তু এই উপলক্ষে তাঁহার নাম সমগ্র দেশময় ছড়াইয়া পড়িল। যে সকল শ্রমজীবিগণের অন্য উপায়ে ল্যাসেলের নামগন্ধও জানিবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না, তাহারাও জানিতে পারিল যে, তাহাদেরই পক্ষ সমর্থন করিতে যাইয়া ল্যাসেল্ রাজদ্বারে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হইয়াছেন। ফলে, এই একটী ঘটনাতেই শ্রমজীবীমহলে ল্যাসেলের গৌরব ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া গেল।

যে সমস্ত শ্রমজীবী ১৮৪৭-৪৮ খৃঃ অব্দের প্রজা-বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল, বিদ্রোহ-প্রশমনের পর তাহারা অনন্যগতিক হইয়া মধ্যবিত্তসম্প্রদায়ের সহিত যোগদান করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এই ধনশালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় আপনাদিগকে 'উদার-নৈতিক' (Liberal) 'উন্নতিপন্থী' (The Progessist Party) প্রভৃতি নামে অভিহিত করিলেও, শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের সহিত তাহাদের স্বার্থের কোনও ঐক্য ছিল না, বরং অনেক সময়ে উভয়ের স্বার্থ পরস্পরবিরোধীই ছিল। জনসাধারণকে উপলক্ষমাত্র করিয়া নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক সুখসুবিধা করিয়া লওয়াই এই 'উদারনৈতিক' সম্প্রদায়ের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। শ্রমজীবীগণ যে ইহা বুঝিতে পারিত না তাহা নহে, কিন্তু অনন্যোপায় হইয়া এত দিন চুপ করিয়া বসিয়াছিল। এক্ষণে ল্যাসেল্‌কে প্রকাশ্যভাবে তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিতে দেখিয়া, উন্নতিপন্থীদের প্রতি তাহাদের অসন্তোষ ক্রমশঃ পরিস্ফুট আকার ধারণ করিতে লাগিল।

স্যাক্‌সনি (Saxony) প্রদেশেই এই অসন্তোষের মাত্রা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইয়াছিল। অবশেষে সেখানকার শ্রমজীবীগণ উদারপন্থীদের সহিত সর্ব্বপ্রকার সংস্রব ছিন্ন করতঃ শ্রমজীবীসাধারণের একটী মহতী সভা আহ্বানের জন্য লাইপ্‌জিক্ (Leipsic) সহরে একটী কমিটীর স্থাপন করে, এবং কি উপায়ে এই কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে, তজ্জন্য কমিটীর পক্ষ হইতে ল্যাসেলের উপদেশ চাহিয়া পাঠান হয়। তদুত্তরে ল্যাসেল্ একখানি 'খোলা চিঠি' (The Open Letter) প্রকাশিত করেন। এই চিঠিতে শ্রমজীবীগণের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। ল্যাসেলের এই চিঠি সাধারণতঃ জার্ম্মাণ সোসিয়ালিজ্‌মের সনন্দপত্র (The Charter of German Socialism) নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই চিঠি প্রকাশের পর হইতেই লিবারেল্ সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার সকল সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া যায়।

লাইপ্‌জিক্-কমিটী ল্যাসেলের উপদেশ গ্রহণ করে এবং শ্রমজীবিগণের একটী সভা করিয়া, স্বীয় বক্তব্য স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া বলিবার জন্য ল্যাসেল্‌কে সেই সভাতে আহ্বান করা হয়। ল্যাসেল্ এই আহ্বান সাদরে গ্রহণ করেন। তাঁহার বক্তৃতা এতই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে, সভায় উপস্থিত ১৩০০ জনের মধ্যে মাত্র ৭জন তাঁহার বিরুদ্ধে মত দিয়াছিল। অতঃপর তিনি আরও কয়েক স্থানে এই সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন ও সর্ব্বত্রই তাঁহার মত সাদরে পরিগৃহীত হয়।

এইরূপ অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব সাফল্যে উৎফুল্ল হইয়া, ল্যাসেল্ অবশেষে স্বীয় সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে

অগ্রসর হইলেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মে তারিখে প্রাগুক্ত লাইপ্‌জিক্‌ সহরে "নিখিল-জার্ম্মাণ-শ্রমজীবী-সমিতির (The Universal German Working Men's Association) প্রতিষ্ঠা হয় এবং ল্যাসেল্‌ই প্রথম পাঁচ বৎসরের জন্য সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। সমিতির কার্য্যপ্রণালী ও উদ্দেশ্য যতদূর সম্ভব সরল করা হইয়াছিল। "শ্রমজীবী-সাধারণের উন্নতিসাধনের জন্য প্রাপ্তবয়স্ক লোক মাত্রেরই ভোটপ্রদানের অধিকার থাকা আবশ্যক; সমিতি বিবেচনা করেন যে উহাদের উন্নতি সাধনের ইহা ছাড়া উপায়ান্তর নাই। এই অধিকার প্রাপ্ত হইবার জন্য বিধি-সঙ্গত উপায়ে আন্দোলন করিয়া জনমতের সংগঠন করাই এই সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য।" সংক্ষেপে ইহাই জার্ম্মাণ শ্রমজীবী সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

সমিতির উদ্দেশ্য সুচারুরূপে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ল্যাসেল্‌ অতঃপর অদম্য উৎসাহে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। এই সময়ে তিনি যেরূপ পরিশ্রম করিতেন, তাহা শুনিলে অবাক্‌ হইতে হয়। মুহূর্ত্তের জন্যও বিশ্রাম না করিয়া, ক্রমাগত ১০।১৫ দিন যাবৎ তিনি স্থানে স্থানে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেন। এই উপলক্ষেই তাঁহার অর্থনীতিসম্বন্ধীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বাষ্টিয়ট্‌ সুলজ্‌ (Bastiat-Schulze) প্রণীত ও প্রকাশিত হয়। এই সময়ে তিনি যেখানেই গিয়াছেন, সেখানেই বিজয়ী বীরের ন্যায় সাদরে অভিনন্দিত হইয়াছেন, এবং তাঁহার বক্তৃতাশ্রবণে মুগ্ধ হইয়া জার্ম্মাণির শ্রমজীবীগণ দলে দলে তাঁহার পতাকাতলে আসিয়া সমবেত হইয়াছে। ল্যাসেলের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তির সীমা ছিল না।

জার্ম্মাণির অতীত ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, শ্রমজীবীগণের এই অভূতপূর্ব্ব মহোল্লাসের কারণ সহজেই অনুমিত হইতে পারে। জার্ম্মাণি বলিতে আমরা এক্ষণে যে বিস্তৃত ভূভাগ বুঝিয়া থাকি, বর্ত্তমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে তাহা বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। অষ্ট্রিয়ার সম্রাট ইহাদের অধিনায়ক হইলেও, ইহাদের নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটির বিরাম ছিল না। লাঠির জোরই সে সময়কার জার্ম্মাণির একমাত্র আইন আদালত ছিল। শুধু তাহাই নয়; ইউরোপের যেখানেই রাজায় রাজায় লড়াই বাধিয়াছে, তাহারই ঢেউ জার্ম্মাণির বুকের উপর দিয়া গড়াইয়া গিয়াছে। যাহাদের শক্তি-সামর্থ্য ছিল, তাহারা এই গোলমালের সুযোগে সময়ে সময়ে নিজেদের সুখ-সুবিধা করিয়া লইতে পারিলেও, জার্ম্মাণ প্রজাসাধারণের দুঃখদুর্দ্দশার অবধি ছিল না। যে পারিত, সেই তাহাদিগকে বেশ করিয়া দু'ঘা লাগাইয়া দিত; উহাদের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহে, এত বড় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে এমন একটী লোকও ছিল না। এমতাবস্থায় ল্যাসেল্‌ যখন দূরাগত বীণার শব্দের মত তাহাদিগকে আশার বাণী শুনাইলেন, তখন তাহাদের যুগ-যুগান্ত-প্রপীড়িত অবসন্ন হৃদয় একেবারে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সোসিয়ালিজ্‌ম্‌বাদ জার্ম্মাণিতে যে এত প্রসারলাভে সমর্থ হইয়াছিল, তত্রত্য শ্রমজীবীগণের অতীত দুরবস্থাই তাহার অন্যতম কারণ।

কিন্তু এদিকে ল্যাসেলের আয়ুষ্কালও পূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল। এই সময়ে তিনি কোন এক সুন্দরী রমণীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছিলেন,—সুন্দরীরও তাঁহার প্রতি আসক্তি জন্মিয়াছিল, এবং উভয়ে গোপনে গোপনে বিবাহ করিতে সঙ্কল্প করেন। যুবতীর পিতা ইহা জানিতে পারিয়া প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইলেন এবং অন্য এক ব্যক্তির সহিত কন্যার বিবাহসম্বন্ধ স্থির করিলেন। ল্যাসেল্‌ ইহাতে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ভাবী প্রণয়িনীর প্রেমাকাঙ্ক্ষীকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেন। কিন্তু এই যুদ্ধে ল্যাসেল্‌ই সাংঘাতিকরূপে আহত হন এবং সেই আঘাতের ফলেই কিছুদিন পরে তাঁহার জীবন-লীলার অবসান হয়। (১৮৬৩ খৃঃ অব্দ)।

এতক্ষণ আমরা শুধু ল্যাসেলের জীবনকথাই বলিয়াছি,—তৎপ্রচারিত সোসিয়ালিজ্‌ম্‌বাদ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলা হয় নাই। তিনি যে সমস্ত পুস্তক ও বক্তৃতা প্রকাশিত করিয়াছিলেন, পৌর্ব্বাপর্য্যক্রমে সেইগুলির আলোচনা করিলেই তাঁহার সোসিয়ালিজ্‌ম্‌-মতের ক্রমবিকাশ সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে

যাইবে। এই পুস্তক ও বক্তৃতাসমূহের মধ্যে তিনখানিই প্রধান,—"শ্রমজীবীগণের কার্য্য-পদ্ধতি" (The Working Men's Programme), খোলা চিঠি (The Open Letter) এবং বাষ্টিয়াট্-সুল্‌জ (The Bastiat-Schulze)। নিম্নে উহাদের স্থূল বক্তব্য বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

১। "শ্রমজীবিগণের কার্য্য-পদ্ধতি"—এই পুস্তিকাতে ল্যাসেল্ বলেন যে, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যে যুগের আরম্ভ হইয়াছে, শ্রমজীবীগণই তাহার একমাত্র নিয়ামক ও পরিচালক। তাঁহার এই সিদ্ধান্ত সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি ইতিহাসের সাহায্যে ইউরোপীয় সমাজব্যবস্থার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ধারা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ল্যাসেল বলেন যে, মধ্যযুগে ভূ-স্বামীগণই সমাজের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। তখন সমাজের যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহাতে সমাজরক্ষার জন্য এই ব্যবস্থা অবশ্যপ্রয়োজনীয় ছিল। মধ্যযুগের ইউরোপে "লাঠি যার, মাটী তার" এই নীতির অবাধ প্রচলন ছিল; সুতরাং সে সময়ে প্রবলপ্রতাপশালী জমীদারগণ সমাজের শীর্ষদেশে প্রতিষ্ঠিত না থাকিলে, জনসাধারণের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইত, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু সভ্যতার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জমীদারদের আবশ্যকতা ক্রমে ক্রমে দূর হইতে লাগিল, অল্পসংখ্যক জমীদারদের ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক মধ্যবিত্তসম্প্রদায়ের মধ্যে বিস্তৃত হইতে লাগিল। এই ক্ষমতা-বণ্টন ব্যাপার কোনও একজন ব্যক্তিবিশেষ বা ঘটনাবিশেষ দ্বারা সংসাধিত হয় নাই। বহুকার্য্যকারণ-পরম্পরার সমবায়েই ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। দিক্‌নির্ণয় যন্ত্র ও বারুদের উদ্ভাবন, আমেরিকা ও ভারতবর্ষে যাইবার পথের আবিষ্কার, রাজশক্তি কর্ত্তৃক সামন্ত-শক্তির (Feudalism) বিনাশসাধন, সর্ব্বত্র যাতায়াতের অভূতপূর্ব্ব সুবিধা, দীর্ঘকাল-স্থায়ী শান্তিরক্ষা প্রভৃতি ঘটনাপুঞ্জের সমবেত ফলেই বাণিজ্য-প্রাণ মধ্যবিত্ত মূলধনীসম্প্রদায়ের সৃষ্টি সম্ভবপর হইয়াছে, এবং নিত্য নূতন কলকারখানার আবিষ্কার ও অত্যধিক প্রচলনহেতু সমাজে উহাদের ক্ষমতা দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হইয়াছে।

অর্থের শক্তি বড় কম নয়। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় দেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনশালী হওয়ায়, প্রায় যাবতীয় রাজনৈতিক ক্ষমতাও ধীরে ধীরে উহাদের করতলগত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এই উভয়বিধ ক্ষমতা তাহারা মানবসাধারণের হিতার্থে না লাগাইয়া, শুধু ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায়গত ক্ষুদ্র স্বার্থ-সাধনেই অপব্যয়িত করিতেছে। ইহাদের প্ররোচনায় অর্থই সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক পদগৌরবের একমাত্র মাপকাঠি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভোটপ্রদানের ক্ষমতা খর্ব্বীকৃত হইয়াছে। ইহারা সংবাদপত্রের উপর মাশুল বসাইয়া স্বাধীনমত প্রকাশে বাধা জন্মাইতেছে এবং নিঃসম্বল প্রজাসাধারণকে দুঃসহ করভারে নিপীড়িত করিয়া নিজেদের সুখসুবিধার ব্যবস্থা করিয়া লইতেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসীবিপ্লব ইহারই প্রতিক্রিয়া মাত্র, কিন্তু ঘটনাবিপর্য্যয়ে উহা সম্যক্ সফলতা-লাভে সমর্থ হয় নাই। এই হিসাবে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারী শ্রমজীবীগণের ইতিহাসে এক অতি স্মরণীয় দিন। কারণ, ১৮৪৭-৪৮ অব্দের ফরাসী প্রজা-বিদ্রোহের পর ফ্রান্সে যে অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট (The Provisional Government) স্থাপিত হয়, তাহাতে ঐ দিনে সর্ব্বসাধারণের ভোটাধিকারসূত্রে শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের জনৈক প্রতিনিধি স্থান প্রাপ্ত হন। ইতঃপূর্ব্বে পৃথিবীর কোন গবর্ণমেণ্টই সাধারণের এই জন্মগত দাবী স্বীকার করে নাই। সুতরাং ঐ তারিখ হইতে শ্রমজীবীগণের ইতিহাসের এক অভিনব যুগের আরম্ভ হইয়াছে। যুগযুগান্তব্যাপী সাধনার ফলে যে অমূল্য অধিকার সমাগত হইয়াছে, ঐকান্তিক যত্ন ও চেষ্টার অভাবে যাহাতে তাহার অসদ্ব্যবহার না হয়, তজ্জন্য শ্রমজীবীমাত্রকেই সমবেতভাবে চেষ্টিত হইতে হইবে। অভিজাত ও মধ্যবিত্তশ্রেণী শুধু সাম্প্রদায়িক স্বার্থ-সংরক্ষণেই ব্যস্ত ছিলেন—কিন্তু শ্রমজীবীগণকে তাহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলে চলিবে না। মানব-সাধারণের স্বার্থের সহিত তাহাদের স্বার্থের কোনও অনৈক্য নাই, একথা তাহাদিগকে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। পুস্তকের শেষে ল্যাসেল্ নিম্নলিখিত ভাবে শ্রমজীবীগণকে কর্ত্তব্য সম্পাদনে উৎসাহিত করিয়াছেন,—

"সম্প্রদায়বিশেষের স্থায়ী ও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করিতে হইলে, উহার মনে আপনার উচ্চতম উদ্দেশ্য ও আদর্শের চিত্র সুস্পষ্টরূপে অঙ্কিত করিয়া দিতে হইবে। 'আমার ইচ্ছাতেই শাসনযন্ত্র পরিচালিত হইতেছে, আমিই বর্ত্তমান যুগের নিয়ামক ও ভবিষ্যতের প্রবর্ত্তক, আমার ধ্যান-ধারণাই বর্ত্তমান যুগের যুগধর্ম্ম এবং আমারই আদর্শানুসারে ইহা পরিবর্ত্তিত ও পুনর্গঠিত হইতেছে', সমাজ-হৃদয়ে এইরূপ আত্মসম্মান ও আত্মনির্ভরতা-জ্ঞান স্থায়ীরূপে মুদ্রিত করিয়া দিলে, তদ্দ্বারা মানবসমাজের যেরূপ সর্ব্বতোমুখী উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে, এমন আর অন্য কিছুতেই হয় না। নিঃসহায় অত্যাচারিতের করুণ ক্রন্দন, ভোগ-বিলাসীর অসার আরামপ্রিয়তা ও ক্ষুদ্রাশয়তা, উনবিংশ শতাব্দীর শ্রমজীবীগণের পক্ষে আর শোভা পায় না। তাহাদের সম্মুখে মহা কর্ত্তব্যের কঠোর পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে। শ্রমজীবীরূপ পর্ব্বতশিখরেই ভবিষ্যতের ধর্ম্মমন্দির প্রতিষ্ঠাপিত করিতে হইবে।"

ষ্টেট্ (State) বা রাষ্ট্র সম্বন্ধে ল্যাসেলের কিরূপ ধারণা ছিল,এই প্রসঙ্গে তাহারও কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। সমসাময়িক উদার-নৈতিক বা ধনশালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বলিতেন যে, রাজ্যান্তর্গত প্রজাসাধারণের ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি ও কার্য্য-স্বাধীনতার রক্ষণাবেক্ষণের সম্যক্ ব্যবস্থা করাই গবর্ণমেণ্টের একমাত্র কর্ত্তব্য কার্য্য। এতদ্ব্যতীত অন্য কোনও কার্য্যে হস্তক্ষেপে গবর্ণমেণ্টের কোনও অধিকার নাই। মধ্যবিত্তসম্প্রদায়-পরিচালিত ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টেও আমরা এই নীতির বহুল প্রয়োগ দেখিয়াছি। সেখানে ইহা সাধারণতঃ "ম্যাঞ্চেষ্টার-নীতি" (Manchesterism) নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ল্যাসেল্ বলেন, এই নীতি ধনশালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়েরই উদ্ভাবন এবং ইহাতে একমাত্র তাহাদেরই লাভ। সমাজে তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী, সুতরাং গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কোনও রূপ বাধা পাইবার সম্ভাবনা না থাকিলে, তাহারা নিঃসম্বল জনসাধারণকে যদিচ্ছভাবে খাটাইয়া লইতে পারে। এই নীতির কার্য্য-স্বাধীনতার অর্থ শুধু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কার্য্য-স্বাধীনতা— ইহারা ছাড়াও সমাজে যে আরও মানুষ আছে, এই নীতির পরিপোষকগণ তাহা আদৌ কল্পনাই করিতে পারেন না। ল্যাসেল্ বলেন, ষ্টেট বা রাষ্ট্র-বিধান এমন একটী লোকায়ত্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে হইবে যে, তাহাতে মানবোচিত ধর্ম্মমাত্রেরই পূর্ণ-বিকাশ ও পরিণতি সাধিত হইতে পারে। তাঁহার মতে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতীত মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভব নহে। ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে দুঃখ, দুর্দ্দশা, দরিদ্রতা প্রভৃতির সহিত নিয়ত সংগ্রাম করিয়াই মনুষ্য বর্ত্তমান সভ্যতা-সোপানে আরোহণ করিতে পারিয়াছে। কেন্দ্রীকৃত গবর্ণমেণ্টশক্তির সহায়তা না পাইলে, মানুষ শুধু নিজের বাহুবলে কখনই এত করিয়া উঠিতে পারিত না। আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তি-নিচয়ের পরিস্ফুটনের জন্য গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজন ;—যে গবর্ণমেণ্টের দ্বারা এই কার্য্য যত অধিক সম্পন্ন হয়, তাহার সার্থকতা তত বেশী। অবশ্য মানুষকে নিজ শক্তির উপর নির্ভর করিয়াই কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে—কিন্তু যেখানে তাহার শক্তিতে কুলাইয়া উঠিবে না, সেখানে গবর্ণমেণ্টকে তাহার যথাসম্ভব সাহায্য করিতে হইবে। এই হিসাবে গবর্ণমেণ্টের শক্তি মানুষের ব্যক্তিগত শক্তির অনুপূরক মাত্র।

২। খোলা চিঠি—ইহাতে শ্রমজীবীগণের অর্থনৈতিক, ও তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ সামাজিক দুরবস্থার কথা বিস্তৃতরূপে বিবৃত হইয়াছে। ল্যাসেল্ বলেন যে, এক্ষণে যে নিয়মানুসারে শ্রমজীবীদের মজুরীর পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে, তাহাতে উহাদের প্রতি অত্যন্ত অবিচার হইয়া থাকে। উহাদের মজুরীর গড়পড়তা হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে শুধু গ্রাসাচ্ছাদনেই সমস্ত অর্থ নিঃশেষিত হইয়া যায়। উহাদের মজুরী এই নির্দ্দিষ্ট সীমারেখার বেশী উপরে বা নীচে প্রায় উঠানামা করে না। ইহার কারণ নির্ণয় বেশী কঠিন নহে। মজুরীর পরিমাণ বাড়িলেই, অবস্থার স্বচ্ছলতাপ্রযুক্ত অনেকেই বিবাহ করে—সুতরাং শীঘ্র তাহাদের পোষ্যসংখ্যাও বাড়িয়া যায়। ইহাদিগকে যে শুধু নিজেদের মজুরীর টাকা

ভাজাইয়া খাওয়াইতে পরাইতে হয়, তাহা নহে; পরন্তু ইহারা বড় হইয়া মজুরের সংখ্যাই বৃদ্ধি করে। তখন মোট মজুরের সংখ্যা প্রয়োজনের অপেক্ষা বেশী হওয়াতে, মজুরীর পরিমাণ কমিয়া আবার সাবেক সীমায় দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে, মজুরীর পরিমাণ ঐ নির্দ্দিষ্ট সীমার বেশী নীচেও স্থায়ীভাবে নামিতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে দেশে থাকিয়া গ্রাসাচ্ছাদন চালাইতে না পারাতে, অনেকেই বিদেশে চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়; বিবাহের সংখ্যা, সুতরাং সন্তানের সংখ্যাও কম হয়। অধিকন্তু, নানাবিধ ব্যারামে অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত বা অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। সুতরাং পরিণামে দেশে মজুরের সংখ্যা খুব কমিয়া যাওয়ায়, কলকারখানাওয়ালাদের মধ্যে প্রতিযোগিতাবশতঃ মজুরীর পরিমাণ বাড়িয়া আবার সাবেক মত হয়। যে নিয়মের ফলে মজুরী এই নির্দ্দিষ্ট সীমা ছাড়াইয়া বেশী উপরে উঠিতে বা নীচে নামিতে পারে না, ল্যাসেল্ তাহার নাম দিয়াছেন,—"মজুরী-সংক্রান্ত লৌহ নিয়ম" (The Iron Law of Wages)। তাঁহার মতে শ্রমজীবীদের পক্ষে ইহাতে দুইটী খারাপ ফল ফলিয়াছে। প্রথমতঃ, হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খাটিয়া শ্রমজীবীগণ যাহা আনে, তাহাতে উহাদের সকল অভাবের পূরণ হয় না; দিন আনিয়া দিন খাইতেই সমস্ত ফুরাইয়া যায়। সুতরাং ভবিষ্যতের দুর্দ্দিনের জন্য কিছুই রাখিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, শ্রমজীবীগণ প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া যাহা উৎপন্ন করিতেছে, তাহার লাভের প্রায় ষোল আনাই মূলধনীরা অবাধে আত্মসাৎ করিয়া লইতেছে। সুতরাং বর্ত্তমান যুগের পৃথিবী-ব্যাপী ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা শুধু তেলা মাথাতেই তেল ঢালা হইতেছে মাত্র। ইহাতে সামাজিক অসামঞ্জস্যের পরিমাণ দিন দিনই বাড়িয়া চলিতেছে এবং যে পর্য্যন্ত এইরূপ মূলধনী-প্রথা বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন আর ইহার কোনও প্রতিকারের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং জন-সাধারণের উন্নতি করিতে হইলে, প্রথমতঃ বর্ত্তমান মূলধনী-প্রথা উঠাইয়া দিতে হইবে, এবং দ্বিতীয়তঃ, শ্রমজীবীগণকে শুধু মজুরীর অধিকারী না করিয়া লভ্যাংশেরও ভাগী করিতে হইবে।

৩। বাষ্টিয়াট-শুল্জ্*—উপরের লিখিত উদ্দেশ্যসমূহ কি প্রণালীতে কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে, এই গ্রন্থে তাহাই বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের ভূমিকায় উনবিংশ শতাব্দীর শ্রমজীবী-সমস্যা ও সোসিয়ালিজম্-বাদের মূল তথ্য অতি সুন্দররূপে ও সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। ল্যাসেল্ বলেন যে, সত্য বটে মানুষ আর এক্ষণে সাক্ষাৎভাবে অপর মানুষের অধীন বা দাস নহে। বাহ্যদৃষ্টিতে ইহা সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও, বাস্তবিক জগতে কি তাহাই প্রকৃত সত্য? আমরা অনবরতই দেখিতে পাইতেছি যে, অর্থশালী, সুতরাং পরাক্রমশালী মূলধনীগণ নিঃসম্বল শ্রমজীবীগণকে যদিচ্ছভাবে খাটাইয়া লইতেছে; সাক্ষাৎভাবে শ্রমজীবীগণ তাহাদের অধীন না হইলেও, কার্য্যতঃ তাহাদের অবস্থা কি ক্রীতদাসের চেয়েও শোচনীয়তর নহে? যদি তাহাই হয়, তবে সভ্যতার বর্ত্তমান অবস্থাতে এইরূপ ভাব আর কত দিন স্থায়ী হইবে, ইহাই বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বপ্রধান সমস্যা। মূলধনীগণ শুধু অর্থের জোরে সমস্ত শ্রমজীবীসম্প্রদায়কে ইচ্ছামত খাটাইয়া লইতে পারিবে কি না, এবং তাহারা কারবারে যে মূলধন খাটায় ও বুদ্ধিবৃত্তির ব্যবহার করে,

---

* ১৮০৮ খৃঃঅব্দে স্যাক্সনির অন্তঃপাতী ডেলিজ্ (Delitzsch) নামক স্থানে শুল্জের (Schulze) জন্ম হয়। ইনি বলিতেন যে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য না লইয়া শুধু আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া সমবায়-সমিতির প্রতিষ্ঠা করিলে শ্রমজীবীদের উন্নতি হইবে। শুল্জের এই আন্দোলন জার্ম্মাণিতে বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। ল্যাসেল্ বলেন যে, শুল্জের এই মত তাঁহার মৌলিক উদ্ভাবন নহে। তিনি ফরাসী অর্থনীতিবিদ্ পণ্ডিত বাষ্টিয়াটের (Bastiat) মতসমূহ নিজের নামে চালাইতে চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র। শুল্জের প্রচারিত মত খণ্ডনের জন্যই এই গ্রন্থ লিখিত এবং বাষ্টিয়াট্ ও শুল্জ্ উভয়ের নামানুসারে ইহার নামাকরণ করা হয়।

তজ্জন্য লাভের একটা ন্যায্য অংশ ব্যতীত অবশিষ্টাংশ তাঁহাদের, কি শ্রমজীবীদের প্রাপ্য, এই দুইটী প্রশ্নের সমাধানের উপরেই শ্রমজীবীগণের সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। আমরা সোসিয়ালিজ্‌ম্ সম্বন্ধে এযাবৎ যাহা বলিয়া আসিয়াছি, তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, ইহাই সোসিয়ালিজ্‌ম্-বাদের সারতত্ত্ব।

গ্রন্থের প্রথমভাগে জার্ম্মাণ সমবায়-আন্দোলনের প্রবর্ত্তক শুল্‌জের মত খণ্ডনের চেষ্টা করা হইয়াছে। শুল্‌জ্ বলেন যে, শ্রমজীবীদের উন্নতি করিতে হইলে, তাহাদিগকে নিজের পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইতে হইবে; গবর্ণমেণ্টের বা অন্য কাহারও সাহায্যপ্রার্থী হইলে তাহাদের কোনই লাভ হইবে না। যদি তাহারা আপনাদের উন্নতি করিতেই সংকল্প করিয়া থাকে, তবে নিজেদের মধ্যে দোকানাদি খুলিয়া নিজেদের যাবতীয় অভাবমোচনের চেষ্টা করুক। ল্যাসেল্ বলেন, শুল্‌জের এই মত আদৌ সমীচীন নহে। মনে করুন, হস্তশিল্পীদের সুবিধার জন্য স্বাবলম্বন-প্রথাতে কাঁচা মাল সরবরাহের জন্য এক দোকান খোলা হইল। ইহাতে প্রথম প্রথম হস্ত-শিল্পীদের কিছু লাভ হইতে পারিবে বটে, কিন্তু আধুনিক কলকারখানার সহিত প্রতিযোগিতায় উহারা কয়দিন টিঁকিয়া থাকিতে পারিবে? নিত্যব্যবহার্য্য জিনিস সরবরাহের জন্য দোকান খুলিলেই বা কি লাভ হইবে? জিনিসের দাম তো সর্ব্বত্রই প্রায় একরূপ? দোকানদারেরা তো ইতরভদ্র-বিশেষে দামের তারতম্য করে না। তবে দোকান খুলিয়া লাভ কি? বস্তুতঃ সমস্যা ইহা নহে। আসল সমস্যা হইতেছে শ্রমজীবীদের নিতান্ত অর্থাভাব। তাহারা যে রোজগার করে, তাহাতে তাহাদের সমস্ত অভাবের কুলান হয় না। ইহার প্রতিবিধান করাই বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বপ্রধান ও জটিলতম সমস্যা। একটী মাত্র উপায়ে এই দারিদ্র-সমস্যার সমাধান হইতে পারে। শ্রমজীবীরা এক্ষণে মজুরী মাত্র পাইয়া থাকে। তাহার ফল তো চক্ষের উপরেই দেখা যাইতেছে। অতঃপর তাহাদিগকে মজুরী মাত্রের অধিকারী না রাখিয়া, লাভের ভাগী করিয়া লইতে হইবে এবং তাহাদিগকে ক্রমে ক্রমে মূলধনীশ্রেণীতে পরিণত করিতে হইবে।

কিন্তু কিরূপে ইহা সংঘটিত হইতে পারে? মূলধনীগণ তো সূচ্যগ্রভূমিও ছাড়িবার পাত্র নহে। নিঃসম্বল শ্রমজীবীগণের পক্ষে ধনকুবের মূলধনীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা, আর খালি হাতে কামান-বন্দুকের সম্মুখীন হওয়া, একই কথা। সুতরাং অন্য উপায়ে ইহার প্রতিবিধান করিতে হইবে। এবং ইহা একমাত্র গবর্ণমেণ্টের দ্বারাই সাধিত হইতে পারে। ল্যাসেল্ প্রস্তাব করেন যে গবর্ণমেণ্ট হইতে শ্রমজীবী সম্প্রদায়কে টাকা দাদন দিতে হইবে। শ্রমজীবীগণ এক একটী সমিতি গঠন করিয়া এই টাকা গ্রহণ করিবে এবং তদ্দ্বারা আধুনিক ব্যবসায়ীদের মত কলকারখানা প্রভৃতি স্থাপন করিয়া ব্যবসাবাণিজ্যাদি করিবে। ল্যাসেল্ অনুমান করিতেন যে, আপততঃ দেড় কোটী পাউণ্ড বা সাড়ে বাইশ কোটী টাকা হইলেই এই কাজ চলিতে পারে। তিনি ইহাও মনে করিতেন যে, গবর্ণমেণ্ট যদি শ্রমজীবী-সমিতি-সমূহের জামিন হইতে স্বীকার করেন, তবে হয়ত নিজ তহবিল হইতে এত টাকা দেওয়ার দরকার না হইতেও পারে।

গবর্ণমেণ্টকে শুধু টাকা সরবরাহ করিলেই হইবে না। যাহাতে সমিতির নিয়মাদি যথারীতি প্রতিপালিত হয়, গবর্ণমেণ্টকে তাহারও সম্যক ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু এতদ্ব্যতীত গবর্ণমেণ্ট আর কিছু করিবেন না। সমিতি-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য সমিতির সদস্যগণকেই করিতে হইবে। কারণ, সদস্যগণের স্বাধীন ইচ্ছা ও দায়িত্বজ্ঞানের উপর নির্ভর না করিয়া, কোনও কাজ উপর হইতে তাহাদের ঘাড়ে চাপাইয়া দিলে, তদ্দ্বারা বিশেষ কোন স্থায়ী ফল লাভের আশা করা যায় না।

কিন্তু এক্ষণে জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট যে ভাবে গঠিত, তাহাতে উহাকে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত করান বড় সহজসাধ্য নয়। গবর্ণমেণ্ট বলিতে যাহাদিগকে বুঝায়, শ্রমজীবীগণের সহিত তাহাদের স্বার্থসংস্রব নাই বলিলেই হয়। সুতরাং শ্রমজীবীদের অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে, জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্টের গঠন-প্রণালীরও আবশ্যক মত পরিবর্ত্তনেরও নিতান্ত দরকার।

এ জন্য রাজ্যান্তর্গত প্রাপ্তবয়স্ক লোকমাত্রেরই ভোটপ্রদানের অধিকার থাকা উচিত। কেন না, সর্ব্বসাধারণের ভোটক্রমে যে গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইবে, তাহা সর্ব্বাংশে জনসাধারণের মতিগতিরই মুকুর-সদৃশ হইবে। সুতরাং তাহার দ্বারা জনসাধারণের যথেষ্ট উন্নতি-সাধন করা যাইতে পারিবে। অতএব যাহাতে এই সার্ব্বজনীন ভোটাধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, শ্রমজীবীগণকে সর্ব্বাগ্রে তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে।

ইহাই সংক্ষেপে ল্যাসেল্-প্রচারিত সোসিয়ালিজম্-মত। শ্রমজীবীগণের অবস্থোন্নতির জন্য তিনি যুগপৎ সোসিয়ালিজম্ ও গণতন্ত্র শাসন-প্রথার (Democracy) আবশ্যকতা অনুভব করিতেন। এইজন্য তদীয় মতবাদ সাধারণতঃ জার্ম্মাণ সোসিয়াল্ ডিমক্রেশী (German Social Democracy) নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

শ্রীমন্মথনাথ মজুমদার।

একজন পুরাতন পর্ত্তুগীজ লেখক

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার সম্পাদিত বিশ্বকোষ গ্রন্থে বাঙ্গালা সাহিত্যশীর্ষক প্রবন্ধে বেণ্টোসাহেব রচিত, প্রশ্নোত্তর-মালা নামক পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি এই বেণ্টোসাহেব সম্বন্ধে কোনও বিবরণ দেন নাই, এবং বঙ্গসাহিত্যের অন্য কোনও সমালোচক ইহার কোনও উল্লেখ করেন নাই। দীনেশ বাবু তাঁহার "বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে" (History of Bengali Literature, Calcutta, 1911.) ইঁহার বা ইঁহার পুস্তকের নাম পর্য্যন্তও করেন নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি এই অজ্ঞাতবৃত্তান্ত পুরাতন পর্ত্তুগীজলেখক সম্বন্ধে যাহা কিছু তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিব।

বেণ্টোসম্বন্ধে যাহা কিছু বিবরণ পাওয়া যায়,তাহা এইচ.বি. হাইড (H. B. Hyde) সাহেব বহু আয়াস ও অনুসন্ধানপূর্ব্বক মেয়রের কাছারীর নথীপত্র (Mayor's Court Records), সেণ্ট জন্স্ গির্জ্জার রেজেষ্টারী (St. Johns' Church Parish Register) ও অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য কাগজপত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া তাঁহার প্যারোকিয়াল্ য়্যানাল্স্ অব্ বেঙ্গল (Parochial Annals of Bengal, Calcutta, 1901.) নামক গ্রন্থে প্রকাশিত করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে কার্ণ (Carne) তাঁহার 'খ্যাতনামা পাদরীগণের জীবনবৃত্তান্ত' (Lives of Eminent Missionaries, London, 1833 নামক পুস্তকের প্রথম খণ্ডে কিয়েরনাণ্ডারের (Kiernander) প্রসঙ্গে বেণ্টোর উল্লেখ করিয়াছেন, এবং কেরী সাহেব (W. H. Carey) তাঁহার 'প্রাচ্যদেশীয় খ্রীষ্টানগণের জীবনীগ্রন্থে' (Oriental Christian Biography, Calcutta 1850, vol. II) বেণ্টো সম্বন্ধে অনেক কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া ব্যাপ্‌টিষ্ট মিশন্ প্রেসে জন্ জ্যাকেরিয়া কিয়েরন্যাণ্ডার (John Zachariah Kiernander, 1877) নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকায় দু'একটি কথা জানিতে পারা যায়। এই সমস্ত পুস্তকাদি হইতে যাহা কিছু বৃত্তান্ত পাওয়া যায়, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

বেণ্টোর পুরা নাম কি ছিল,তাহা জানিতে পারা যায় না এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত স্থলে বেণ্টোর উল্লেখ আছে, সর্ব্বত্র মিঃ বেণ্টো (Mr. Bento), রেভারেণ্ড মিঃ বেণ্টো (Rev. Mr. Bento),অথবা ফ্রায়ার (Friar) বা পাদরী বেণ্টো (Padre Bento) এইরূপ পাওয়া যায়। তাঁহার খ্রীষ্টীয়ান্ নাম অজ্ঞাত। তবে তিনি বেণ্টো ডি সিল্ভেষ্টার (Bento De Silvestre, D' Silvestre) ওরফে ডি সুজা (*alias* de Souza) এইরূপ আখ্যায় পরিচিত ছিলেন।

প্রায় ১৭২৮ খ্রীঃ অঃ গোয়া (Goa) নগরীতে বেণ্টো ডি সিল্ভেষ্টর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পিতামাতা ইউরোপীয় ছিলেন এইরূপ উল্লিখিত আছে! তিনি প্রায় চল্লিশ বৎসর কাল অগষ্টীনিয়ান্ সম্প্রদায় (Order of St. Augustine) ভুক্ত রোমান্ ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজক (Friar) ছিলেন। তাঁহার জীবনের তের বৎসর,(কেরী বলেন ১৫ বৎসর) বাঙ্গালা দেশে, বিশেষতঃ কলিকাতায় ও ব্যাণ্ডেলে,কাটিয়াছিল।

পরে রোমান্ ক্যাথলিক ধর্ম্মবিশ্বাসে অনাস্থা হওয়ায়, তিনি প্রটেষ্টাণ্ট হইয়াছিলেন। পুরাতন মিশন-চার্চ্চের স্থাপয়িতা বিখ্যাত পাদরী কিয়েরনাণ্ডার (Kiernander) তাহাকে দীক্ষিত (baptise) করেন ও সমাদরপূর্ব্বক আপন বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন। তাঁহার ধর্ম্মমতপরিবর্ত্তনের তারিখ, হাইড্ লিখিয়াছেন, (P. 155) ৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৬৬ খৃ; কিন্তু কেরীর মত অন্যবিধ। কেরী একস্থলে (Vol. II, P. 182) লিখিয়াছেন, জুলাই, ১৭৬৯; কিন্তু আবার উক্ত গ্রন্থের অন্য স্থলে (Vol. II, P. 200) ১৭৬৮ এইরূপ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। হাইডের তারিখই ঠিক বলিয়া বোধ হয়। এই ঘটনা সম্বন্ধে কেরী এইরূপ বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন।

১৭৬৯ খৃঃ অব্দের জুলাইমাসে গোয়ানগরী হইতে কলিকাতায় একজন ধর্ম্মযাজক আসেন। নবগৃহীত ধর্ম্মমত পরিত্যাগ না করিলে মিঃ বেণ্টোকে সংঘচ্যুত বা একঘরে করিবার অধিকার প্রদান করিয়াই ইহাকে পাঠান হইয়াছিল। ইনি কলিকাতায় পৌছিবার অব্যবহিতপরেই বেণ্টোর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ-সমূহের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উত্তর প্রদানের জন্য এক চিঠি পাঠান হয়। বেণ্টো তৎক্ষণাৎ উত্তর প্রেরণ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অনুরোধ করেন যে, তাঁহার চিঠি যেন রোমান্ ক্যাথলিক গির্জ্জায় প্রকাশ্যভাবে পাঠ করা হয়। কিন্তু অনুরোধ রক্ষিত হইবে না এইরূপ আশঙ্কা করিয়াই, তিনি কি জন্য ধর্ম্মমত পরিত্যাগ করিলেন, তাহা পত্রাকারে সহরের লোকের মধ্যে বিতরণ করেন; ইহাতে মস্ত একটা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছিল।*

* "In the month of July 1769, a priest arrived in Calcutta from Goa, authorised to excommunicate Mr. Bento de Silvestre unless he could recant. A letter was sent to him demanding an answer within twentyfour hours to the several charges laid against him. He returned an immediate answer requesting that it might be read publicly in the Roman Catholic Church, but aware that this request would not be complied with, he distributed copies of it to the people in the town; and thus his reason for leaving their Communion being made public much discussion was excited and some good produced among those of better understanding"-Vol. II., P. 182.

ইহার পরে বেণ্টো বাৎসরিক কুড়ি পাউণ্ড (প্রায় ৩০০৲ টাকা) বেতনে কিয়েরনাণ্ডারের সহকারী ধর্ম্মযাজক ও খৃষ্ট-ধর্ম্ম-প্রচার-সমিতির ক্যাটিচিষ্ট (Catechist) নিযুক্ত হইলেন। খুব একজন উদ্যোগী ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া তাঁহার বেশ খ্যাতি ছিল এবং কিয়ের্‌-নাণ্ডারও তাঁহার সহিত বিশিষ্ট বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন। ফরাসী, পর্ত্তুগীজ, বাঙ্গালা ও হিন্দুস্থানী, এই কয়েকটি ভাষায় তাঁহার দখল ছিল এবং খৃষ্টীয় নিত্য-প্রার্থনা-পুস্তক (Book of Common Prayer) ও ধর্ম্মজিজ্ঞাসা-গ্রন্থ (Catechism) বাঙ্গালা ভাষায় তর্জ্জমা করিয়াছিলেন। এই দুইখানি পুস্তকের নাম প্রশ্নোত্তরমালা ও প্রার্থনামালা। ১৭৭০ খ্রীঃ অঃ ১৭ই ডিসেম্বর তিনি উর্সুলা গার্ডিন্ (Ursula Gardin) নাম্নী কোন মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। ১৭৭৭ খ্রীঃ অব্দের ৬ই আগষ্ট তাঁহার পত্নীবিয়োগ হয়। কিন্তু ১৭৭৮ খ্রীঃ অব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারি তিনি পুনরায় য়ানি পিটার্স (Annie Pieters) নাম্নী মহিলাকে বিবাহ করেন। ১৭৮৬ খ্রীঃ অব্দে ৫৮ বৎসর বয়সে বেণ্টোর মৃত্যু হয়।

নগেন্দ্রবাবু বেণ্টোর পুস্তককে ইংরাজ আবির্ভাবের পর প্রথম বাঙ্গালা গদ্যগ্রন্থ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। ইহার তারিখ তাঁহার মতে ১৭৬৫। কিন্তু উল্লিখিত জীবনবৃত্তান্ত হইতে দেখা যাইতেছে যে বেণ্টো, (হাইডের মতে) ১৭৬৬, বা (কেরীর মতে) ১৭৬৮।১৭৬৯ খৃঃ অব্দে তাঁহার পূর্ব্বমত পরিত্যাগপূর্ব্বক Catechist নিযুক্ত হইলে এই পুস্তক লিখিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি যে ১৭৬৫ সালে এই পুস্তক লিখিয়াছেন বলিয়া নগেন্দ্রবাবু কিরূপে নির্দ্ধারণ করিলেন তাহা বুঝিতে পারি না। যাহা হউক, এ গ্রন্থ যে ইংরাজ আবির্ভাবের পর প্রথম মুদ্রিত বাঙ্গালা গদ্য গ্রন্থ নহে, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। সম্প্রতি আমি এসিয়াটিক্ সোসাইটির পুস্তকাগারে ম্যানোয়েল্ ডা য়্যাসাম্‌চাও (Manoel da Assumpcao) রচিত "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ" (Crepar Xaxtrer Ortho-bhed or Cathecismo da Doutrina Christaa) নামক একখানি অতিপ্রাচীন পর্ত্তুগীজ-রচিত পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু অধ্যাপক

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্‌ এ মহাশয় এই পুস্তকখানির প্রতি প্রথম আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমার ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। এই দুষ্প্রাপ্য পুস্তকখানির প্রকাশ-কাল ১৭৩৪ খ্রীঃ অঃ। ইহার পূর্ব্বের কোন মুদ্রিত পুস্তকের উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না; সুতরাং এ পর্য্যন্ত ইংরেজ আবির্ভাবের পর প্রাচীন মুদ্রিত পুস্তক যত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে ইহাই প্রাচীনতম। এই পুস্তকের বিস্তারিত পরিচয় সহিত মল্লিখিত প্রবন্ধ শীঘ্রই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় মুদ্রিত হইবে। এই পুস্তকের পরে নয় বৎসরের মধ্যে (১৭৪৩ খ্রীঃ অঃ) উক্ত ম্যানোয়েল্‌ ডা য়্যাসাম্‌চাও (Vocabulario em Idioma Bengalla e Portuguez, divido duas partes) নামক বাঙ্গালা-পর্ত্তুগীজ ব্যাকরণ ও অভিধান গ্রন্থ লিস্‌বোয়া (Lisboa) নগরী হইতে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। গ্রিয়ার্সন্‌ (Grierson, Linguistic Survey, Calcutta 1903, Vol V., Pt. 1., p. 3.) এই পর্ত্তুগীজ ব্যাকরণ-অভিধানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন, এবং ব্রিটিস মিউজিয়ম পুস্তকালয়ের তালিকাতেও এই গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। গ্রিয়ার্সন্‌ আর একখানি পুস্তকের নাম করিয়াছেন। জন্‌ ফ্রিডারিক্‌ ফ্রিট্‌জ্‌ (Johann Friedrich Fritz) রচিত ওরিয়েণ্টালিজম্‌-য়াণ্ড-স্প্রাক্‌মিষ্টার (Orientalism-und-Sprachmeister Leipzig, 1748) নামক পুস্তকে তিনি জর্জ্জ জ্যাকব কার্‌ (Georg Jacob Kehr) প্রণীত অরেংক্‌ জেব্‌ (Aurenck Szeb) নামধেয় একখানি প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থের উল্লেখ পাইয়াছেন। কিন্তু এই অপূর্ব্ব আউরঙ্গজেব-চরিত এখন একেবারে দুষ্প্রাপ্য এবং ইহার কোনও বিবরণও পাওয়া যায় না। যাহা হউক, ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, বেণ্টোর পুস্তকাবলী ইংরাজ আবির্ভাবের পর বাঙ্গালায় প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ, নগেন্দ্রবাবুর এই অনুমান নিতান্ত অমূলক।

শ্রীসুশীলকুমার দে।

পাখীর কথা

(২)

বেশভূষা ও তাহার উদ্দেশ্য

বঙ্গীয় কবি ধনীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,

হে ধনিন্‌! বৃথা তুমি হ'তে'ছ গর্ব্বিত,
বহুমূল্য পরিচ্ছদে হইয়া সজ্জিত!

কারণ, কবির মতে শোভার হিসাবে ময়ূরের বিচিত্র বর্ণের পুচ্ছের (বাস্তবিক ময়ূরের পেখম তাহার পুচ্ছ নহে; এ বিষয়ের আলোচনা অন্যত্র করা হইবে।) সহিত ধনীর বহুমূল্য পরিচ্ছদের তুলনাই হইতে পারে না। কবি কেবল শোভার কথাই ভাবিয়াছেন, প্রয়োজনের কথা তো ভাবিবার অবকাশ তাঁহার হয় নাই। কিন্তু বহু প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌ই বিভিন্ন পক্ষীর পালকের বর্ণের পার্থক্যের উদ্দেশ্য লইয়া গবেষণা করিয়াছেন। পরলোকগত বিখ্যাত ইংরেজ পণ্ডিত চার্লস্‌ ডারউইন ইঁহাদের অগ্রণী। সুগায়ক কোকিলের পালক কালো, নিষ্ঠুর শিক্রের বর্ণ পেচকের বর্ণের অনুরূপ; আবার টিয়া পাখীর পালকের বর্ণ সবুজ। এই বর্ণবিভেদ নিরর্থক নহে।

পুরুষ ও স্ত্রী-পক্ষীর বর্ণ-বিভেদ ও তাহার ব্যাখ্যা

মানুষের মধ্যে নাকি স্ত্রীজাতিই সমধিক অলঙ্কারপ্রিয়; পক্ষিজাতির স্বভাব অনেকক্ষেত্রেই ইহার বিপরীত। অবশ্য অনেক পক্ষীর স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে সৌন্দর্য্যের কোনই তারতম্য দেখা যায় না। কিন্তু যেখানে এই তারতম্য ঘটে, সেখানে প্রায়ই দেখা যায় যে পুরুষ পক্ষীই পক্ষিণী অপেক্ষা বেশী সুন্দর। গৃহপালিত পক্ষীর মধ্যে মোরগ ইহার অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত। মোরগের উজ্জ্বল লালবর্ণের চূড়া, ও পশ্চাৎভাগের উজ্জ্বল বর্ণের পালক তাহার অঙ্গসৌষ্ঠব বহুপরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছে, কিন্তু মুরগীর দেহে এই দুটি অলঙ্কারেরই অভাব। ময়ূর তাহার পেখমের জন্যই বিখ্যাত, কিন্তু ময়ূরীর পেখম থাকে না। পণ্ডিতগণ বলেন, এই ভূষণ-পার্থক্যের বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। যে সকল পাখীর স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে এইরূপ শোভার তারতম্য থাকে,

তাহাদের মধ্যে কেবলমাত্র স্ত্রীজাতিই ডিমে তা দেয়। সুতরাং জনন-ঋতুতে, (Breeding Season) আত্ম-রক্ষার ও অণ্ডরক্ষার নিমিত্ত তাহাদের আত্মগোপন করিতে পারা বিশেষ প্রয়োজন। ময়ূরীর যদি ময়ূরের মত উজ্জ্বল বর্ণের পেখম-পালক থাকিত, তাহা হইলে তাহার পক্ষে শত্রুর দৃষ্টি এড়াইয়া থাকা কখনই সম্ভব হইত না। ভারতবর্ষের কোয়েইল ও স্নাইপ জাতীয় কোন কোন পক্ষীর পুরুষেরাই ডিমে তা দেয়। ইহাদের মধ্যে সৌন্দর্য্যের হিসাবে স্ত্রীজাতিই শ্রেষ্ঠ। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বংশরক্ষার জন্যই এই প্রকার শোভার তারতম্যের প্রয়োজন। এইজন্যই পক্ষিশাবকেরাও আত্ম-রক্ষায় সক্ষম না হওয়া পর্য্যন্ত স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে একই প্রকারের পালক-সজ্জা ধারণ করে। যাঁহারা কোকিলের শাবক দেখিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, বাল্যাবস্থায় কেবলমাত্র পালক দেখিয়া ইহাদের স্ত্রীপুরুষ চিনিবার সাধ্য নাই। ময়ূরশাবককেও বাল্যাবস্থায় জননীর অপেক্ষাকৃত হীন বেশেই পরিতৃপ্ত থাকিতে হয়।

প্রাকৃতিক প্রতিবেশ প্রভাব।

অতএব দেখা গেল যে, আত্মরক্ষার প্রয়োজন অনুসারে পক্ষী ও পক্ষিণীর সজ্জার তারতম্য হইয়াছে। কিন্তু এই প্রয়োজন সাময়িক। মরুভূমির কতক-গুলি পাখী ঠিক এই কারণেই স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে তাহাদিগের বাসভূমির প্রাকৃতিক দৃশ্যানুরূপ বর্ণ লাভ করিয়াছে। যেখানে গাছপালা জন্মে না, লুকাইবার প্রয়োজন থাকিলেও, সেখানে লুকাইবার জায়গা মিলে না। সুতরাং সাধারণ পাখিদের ন্যায় উজ্জ্বল বর্ণের পালক থাকিলে, মরু-ভূমির পাখীরা কখনই শত্রুর দৃষ্টি এড়াইতে পারিত না, জীবন-সংগ্রামে টিকিয়া যাইত না। এইজন্যই তাহাদের পালকের বর্ণ মরুভূমির সাধারণ দৃশ্যের অনুরূপ হইয়াছে। দূর হইতে এই সকল ধূসর বর্ণের পক্ষীকে পক্ষী বলিয়াই চিনিবার উপায় নাই। এইপ্রকার বর্ণকে ইংরেজীতে (Protective colouration) বা রক্ষক বর্ণ বলে।

Protective Colouration বা রক্ষক-বর্ণ।

ঋতু-পরিবর্ত্তন ও বর্ণ-পরিবর্ত্তন।

শীতপ্রধানদেশবাসী কোন কোন পক্ষী আবার ঋতু-পরিবর্ত্তনের সহিত বর্ণ পরিবর্ত্তন করে। ঐ সকল দেশে শীতকালে অবিশ্রান্ত তুষারপাতে প্রাকৃতিক দৃশ্যের একেবারে পরিবর্ত্তন হয়; সুতরাং এই সকল পক্ষীও চতুর্দ্দিকের দৃশ্যানুরূপ ধবল বেশ ধারণ করে। ইংলণ্ডে টারমিগান নামক একপ্রকার পক্ষী আছে; গ্রীষ্মকালে ইহাদের স্ত্রীপুরুষের বিভিন্ন বর্ণের পালক থাকে। কিন্তু শীতাগমে পক্ষী ও পক্ষিণী উভয়ে পুরাতন পালক ত্যাগ করে, এবং এই সময়ে ইহাদের বরফের মত শাদা পালক জন্মে।

বিবর্ত্তনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

এদিকে ভক্ষ্যেরা যেমন ক্রমবিকাশ-নীতির সাহায্যে আত্মগোপন করিবার শক্তি বাড়াইয়া লইতেছে, ভক্ষকেরাও সঙ্গে সঙ্গেই অলক্ষ্যে আসিয়া শিকার ধরিবার নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়া লইতেছে। না হইলে তাহারা খাদ্যাভাবেই মরিয়া যাইত। তাই ভক্ষ্য ও ভক্ষকের মধ্যে নিয়তই বিবর্ত্তনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে। দুই দলেই এইরূপে বিশেষ বিশেষ শক্তির উৎকর্ষ সাধন করিয়া, ধ্বংসের সন্নিহিত হইতেছে।

উজ্জ্বল পালকে রক্ষাসাধক বর্ণ।

সকল পক্ষী কিন্তু ঋতুপরিবর্ত্তনের সহিত রক্ষাসাধকবর্ণ পরিবর্ত্তন করে না। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কোন কোন পাখীর রক্ষাসাধক বর্ণ অতি উজ্জ্বল। খালি মাঠে ইহাদিগকে দেখিলে কখনই মনে হয় না যে ইহাদের গাঢ় উজ্জ্বল বর্ণ কখনও কাহারও দৃষ্টি এড়াইতে পারে। আমাদের নিতান্ত পরিচিত টিয়া পাখীর কথাটাই একবার ভাবিয়া দেখুন। ইহাদের গায়ের রং গাঢ় সবুজ; পরিণত বয়সের পাখীর গলায় রামধনুবর্ণের দাগ থাকে। কিন্তু এই পাখীটিই যখন ধানের ক্ষেতে

টিয়া-পাখী

পড়িয়া কৃষকের সর্ব্বনাশ করিতে থাকে, তখন ধানের সবুজের সহিত ইহাদের গায়ের সবুজ এমনভাবে মিশিয়া যায় যে, কৃষক বড় সহজে তাহার অস্তিত্ব অনুমান করিতে পারে না। ঝাউয়ের বীজ টিয়াপাখীর আর একটি প্রিয় খাদ্য। টিয়াপাখীর ঠোট, ঝাউফলের কঠিন আবরণ ভাঙ্গিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। দলে দলে টিয়া-পাখীকে ঝাউয়ের বীজ খাইতে দেখিয়াছি, কিন্তু ঝাউয়ের সবুজের সহিত ইহারা এমনভাবে মিলাইয়া যায় যে, নিতান্ত নিকটে যাইয়াও বিশেষরূপে লক্ষ্য না করিলে ইহারা কিছুতেই ধরা পড়ে না। গায়ক পাখীদের মধ্যে বুলবুল আমাদের নিতান্ত পরিচিত। খয়েরী রঙ্গের বুলবুলকে সর্ব্বদাই ঘরের আশেপাশে বেড়াইতে দেখা যায়। আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয় যে, ইহাদের উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণের ঝুটি ও তাহার নীচের লাল দাগগুলি লইয়া কিছুতেই লুকাইয়া থাকিবার উপায় নাই। বুলবুল লোকালয়ে থাকিতেই ভালবাসে; মানুষের বাসগৃহের অতি নিকটেই নিতান্ত ছোট ছোট গাছে ইহারা বাসা বাঁধে। সুতরাং অন্ততঃ মানুষের দৃষ্টি এড়াইতে না পারিলে দুষ্ট ছেলেদের উৎপাতে ইহাদের বাসা, ডিম, ও ছানা রক্ষা করা কঠিন হইত। কিন্তু খয়েরী বুলবুল প্রায়ই পাতাবাহারের ঝোপের মধ্যে বাসা করে। ডিমে তাঁ দিবার সময় ইহারা ঝুঁটি নীচু ও লেজ উঁচু করিয়া বসিয়া থাকে। তখন পাতাবাহারের বিচিত্র বর্ণের সহিত আলো ও ছায়ার প্রভাবে ইহাদের দেহের উজ্জ্বল অংশ এমন ভাবে মিলিয়া যায় যে বড় সহজে চক্ষে পড়ে না।

খয়েরী বুলবুল

হুপু

এই প্রসঙ্গে একটি বিদেশী পাখীর নাম করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। ইহার নাম হু-পু, (Hoo-poo)। ইহার কয়েকটি জাতি ভারতবর্ষেও আছে। ইহাদের পক্ষের উপর শাদা ও কালো বর্ণের বিচিত্র দাগ ও মাথার ঝুটি দেখিয়া কিছুতেই মনে হয় না যে, খোলা মাঠের মধ্যেও ইহারা লুকাইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু শত্রুর আগমন অনুমান করিবামাত্র ইহারা অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত মাটির উপর উবুর হইয়া পড়িয়া, ঝুটি নীচু করিয়া পাখা ছড়াইয়া দেয়; তখন ইহাদিগকে দেখিলে মনে হয় এক খণ্ড ন্যাকড়া মাটির উপর পড়িয়া রহিয়াছে। অনুজ্জ্বল বর্ণের পাখীদের মধ্যেও রক্ষক বর্ণের অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যায়, ডাহুক, কাল বক প্রভৃতির বাসস্থান ও গায়ের রঙ্গ লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায়, প্রকৃতিদেবী ইহাদিগকে কিরূপে লুকাইবার সহায়তা করিতেছেন।

পাখীদের মধ্যে খাদ্যসংগ্রহের ও আত্মরক্ষার আরও এক প্রকার উপায় আছে। কোন কোন পাখী অন্য পাখীর বেশ অনুকরণ করিয়া থাকে। এই ক্ষেত্রে যে কেবল চোরই সাধুর বেশ ধারণ করে তাহা নহে, সাধুও তস্করের বেশ ধারণ করিয়া থাকে। মধ্য আমেরিকায় কুরাসো নামক এক প্রকার পাখী আছে, ইহাদের মাংস অতি সুখাদ্য বলিয়া শিকারীরা প্রতিবৎসরই বহু কুরাসোর প্রাণবিনাশ করিয়া থাকেন। ঐ প্রদেশেই এক প্রকার বাজ আছে, কুরাসোর সহিত ইহাদের খাদ্য-খাদক সম্পর্ক। কিন্তু ইহাদের আকৃতিগত সাদৃশ্য এমন যে, অনেক শিকারী কুরাসো ভ্রমে কুরাসো-বাজের গায়ে গুলি করিয়া বসেন। নিতান্ত নিকট হইতেও নাকি এই বিপরীত প্রকৃতির দুইটী পক্ষীর পার্থক্য নির্ণয় করা যায় না। এই প্রকার বেশ অনুকরণের ফলে কুরাসোবাজের শিকার-সংগ্রহের খুবই সুবিধা হইয়াছে। কারণ, একেবারে নিকটে যাওয়ার আগে কুরাসো বুঝিতেই পারে না যে আগন্তুক তাহারই জাত ভাই, না তাহার ভক্ষক। আততায়ীর চোকে পড়িলে আর পলাইবার সময় থাকে না।

বেশ অনুকরণ

কুরাসো ও কুরাসো বাজ

এই গেল শঠের সাধুবেশ অনুকরণের দৃষ্টান্ত। আমাদের দেশের পাপিয়া বিপরীত শ্রেণীর অনুকরণের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। পাপিয়ার নাম জানে না, এমন ব্যক্তি বোধ হয় বঙ্গদেশে নাই, কিন্তু সহস্রের মধ্যে একজনও পাপিয়া চেনেন কি না সন্দেহ। এই পাখী স্বভাবতঃই পাতার আঁড়ালে লুকাইয়া থাকিতে ভালবাসে। ফিন্ সাহেব (Frank Finn) বলেন যে

পাপিয়া ও শিক্‌রে

য়ুরোপীয়েরা গ্রীষ্মকালে পাপিয়ার চীৎকারে এমন বিরক্তি বোধ করেন যে, ইহার অবস্থিতি-স্থান নির্ণয় করিতে পারিলে বোধ হয় তাঁহারা বন্দুকের গুলিতে পাপিয়ার উচ্চ সঙ্গীত চিরদিনের মত থামাইয়া দিতেন। সাধারণতঃ, অনেকেই স্ত্রী-কোকিলকে পাপিয়া বলিয়া ভুল করেন। কোকিলের স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই চক্ষু লাল, কিন্তু পাপিয়ার চক্ষু পীতাভ। প্রকৃত পক্ষে পাপিয়া ও শিক্‌রের আকৃতিগত এমন আশ্চর্য্য সাদৃশ্য রহিয়াছে যে, সাধারণ পাখীরাও ইহাদের পার্থক্য নির্ণয় করিতে পারে না। এই সাদৃশ্যের নিমিত্তই ইংরেজীতে পাপিয়াকে (Hawk-Cuckoo) বা বাজ-কোকিল বলে।

• আমরা দেখিয়াছি, কুরাশো বাজ তাহার নিরীহ খাদ্যের বেশ অনুকরণ করিয়া শিকারের সুবিধা করিয়া লইয়াছে।

পরভৃত ও বেশ অনুকরণ

পাপিয়ার শিক্‌রের বেশ অনুকরণের উদ্দেশ্য অন্য প্রকার। সকলেই জানেন, আমাদের দেশের কোকিল, পাপিয়া, ও ইহাদের বিলাতী জ্ঞাতি কুকু পরভৃত, অর্থাৎ বাসা তৈয়ারী ও সন্তানপালনের ক্লেশ ভোগ না করিয়া ইহারা অপর কোন এক পাখীর বাসায় ডিম পাড়িয়া তাহার ঘাড়ে সন্তানপালনের দায় চাপাইয়া দেয়। বলা বাহুল্য, জ্ঞাতসারে কোন পাখী এই দায় গ্রহণ করে না; এইজন্য পরভৃতদিগকে নানাপ্রকার কৌশল অবলম্বন করিতে হয়। পাপিয়া ও শিক্‌রের চেহারার এমন আশ্চর্য্য সাদৃশ্য যে পাখীরাও অনেক সময় ইহাদের পার্থক্য নির্ণয় করিতে পারে না। তাই শিক্‌রের মত পাপিয়া দেখিলেও তাহারা তাড়া করে। সাধারণতঃ, "সাত ভাই" এর বাসায় পাপিয়ার শাবক জন্মে। কুলায় নির্ম্মাণের সময় পক্ষি-দম্পতী যে কিরূপ সতর্ক থাকে, তাহা যিনি কখনও কাক বা চিলের বাসার নিকট গিয়াছেন, তিনিই উত্তমরূপে অবগত আছেন। তাই, প্রথমতঃ পুরুষ পাপিয়া "সাতভাই" এর বাসার কাছে যায়; এই দুষ্ট পাখীদিগকে দেখিবামাত্রই "সাতভাই" দম্পতী তাহাকে তাড়া করিয়া যায়। সেই সুযোগে স্ত্রী-পাপিয়া তাহাদের শূন্য বাসায় ডিম পাড়িয়া আসে। বিলাতের 'কুকু'র চেহারাও সেখানকার শিক্‌রের (Sparrow Hawk) মত। ইহারাও ঠিক পাপিয়ার কৌশল অবলম্বন করিয়াই থ্রাস (Thrush), পিপিট (Pippit) ও রবিন (Robin) প্রভৃতির বাসায় ডিম পাড়িয়া আসে।

কোকিল, কাক, কাল-ফিঙ্গে

কাকের বাসায় কোকিলের ছানা জন্মে, কিন্তু কোকিলের সহিত কাকের চেহারার এমন সাদৃশ্য নাই, যাহাতে বায়সী তাহাকে তাহার সহচর বলিয়া ভুল করিতে পারে। স্ত্রী-কোকিলের চেহারা কতকটা শিক্‌রের মত বটে, কিন্তু তাহাতে তাহারই তাড়িত হইবার সম্ভাবনা বেশী। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কাকের সন্দিগ্ধস্বভাবই কোকিলের প্রতারণার সহায়তা করে। কোকিল দেখিলেই কাক তাহাকে তাড়া করে, সেই সুযোগে কোকিল-পত্নী কাকের শূন্য বাসায় ডিম পাড়িয়া রাখে। পিক্রেফট্‌ (W. P. Pycraft F.F.S.) বলেন যে, ভারতীয় কোকিল সাধারণ কালো ফিঙ্গের বাসাতেও ডিম পাড়ে। পুরুষ-কোকিলও কালো ফিঙ্গের চেহারা প্রায় এক রকম; কেবল লেজের গঠনে ও আয়তনে সামান্য পার্থক্য আছে। ফিঙ্গেও কাকের মত সন্দিগ্ধস্বভাব, আবার অনেক সময় না-কি স্ত্রী-ফিঙ্গে পুরুষ-কোকিলকে আপনার সহচর বলিয়া ভুল করে। এ কথা কত দূর সত্য বলিতে পারি না। কেহ কেহ বলেন যে, ময়নাও কোকিলের প্রতারণায় অন্যের সন্তান প্রতিপালন করিয়া থাকে।

পৃষ্ঠের ও পেটের রঙ্গের পার্থক্য ও তাহার উদ্দেশ্য

অনেকেই হয় ত লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, বহুপক্ষীর ও অনেক পশুরই পিঠের রং বুকের রং অপেক্ষা গাঢ়; এই পার্থক্য তাহাদিগকে প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে মিলাইয়া যাইতে সাহায্য করে। আমেরিকার প্রাণি-তত্ত্ববিদ্ থেয়ার সাহেব (Thayer) ব্রিটিশ মিউজিয়মে একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এই

কথাটি অতি সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি প্রথম একটি চৌকা বাক্সের ভিতরের দিক ধূসর ফ্লানেলে মুড়িয়া দিলেন। তার পর ঐ ফ্লানেল দিয়াই দুইটি পাখী তৈয়ার করিয়া একটি পাখীর বুকে সাদা রং মাখাইয়া দিলেন। বাক্সের ভিতরে পাখী দুইটি রাখিলে দেখা গেল যে, যে পাখীটির সর্ব্ব শরীরই ধূসর, সেইটিই ধূসর বর্ণের আবেষ্টনের মধ্যেও আপনাকে মিলাইয়া ফেলিতে পারে নাই; কিন্তু যাহার বুকের রং শাদা, সেই পাখীটিই আলো-ছায়ার প্রভাবে চতুর্দ্দিকের ধূসর আবেষ্টনের মধ্যে একেবারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পক্ষীর রং উজ্জ্বলই হউক, বা নিতান্ত সাধারণ রকমেরই হউক,—পক্ষীদেহে এক বর্ণের পালকই থাকুক, বা তাহাতে বিবিধ বর্ণের সমাবেশ হউক, তাহা প্রকৃতির নিরর্থক খেয়ালমাত্র নহে। পক্ষীর পালক-সন্নিবেশে ও তাহার বর্ণ-সমাবেশে ভগবানের গূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে।

পক্ষিশাবকের
পালকের বর্ণ

প্রবন্ধের প্রারম্ভেই বলিয়াছি যে, যে সকল পাখীর স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে সৌন্দর্য্যের তারতম্য আছে, তাহাদের শাবকেরা স্ত্রী-পুরুষনির্ব্বিশেষে স্ত্রীবেশ প্রাপ্ত হয়। স্ত্রী-শাবক চিরকালই এই বেশ ধারণ করে, কিন্তু পুরুষ-শাবক বিভিন্ন জাতির রীতি অনুসারে অল্প বা অধিককাল পরে পুরুষোচিত সৌন্দর্য্যের অধিকারী হয়।

কিন্তু যে সকল পাখীর স্ত্রী-পুরুষের বেশ একই প্রকার, অথবা যেখানে উভয়ের পার্থক্য কেবল বর্ণের ঔজ্জ্বল্যের তারতম্যে, তাহাদের শাবকেরা কোন কোন ক্ষেত্রে মাতাপিতা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বেশ লাভ করিয়া থাকে। আমাদের দেশের দয়েলের শাবক ইহার অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত।

যাঁহারা ইংরেজী পড়িয়াছেন, তাহারা সকলেই 'লালবুক-ওয়ালা' রবিনের (Robin-Redbreast) নাম জানেন। লালের ছিটাফোটা না থাকিলেও, আমাদের কালো বুকওয়ালা দয়েল লালবুকওয়ালা রবিনেরই নিকটতম জ্ঞাতি। মন্দাগাস্কার হইতে চীন পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই দয়েল দেখিতে পাওয়া যায়। পুরুষ-দয়েল স্ত্রী-দয়েল অপেক্ষা আয়তনে একটু বড় ও তাহার শরীরের শ্বেত ও কৃষ্ণ পালক স্ত্রী-দয়েলের পালক অপেক্ষা অধিক উজ্জ্বল। দয়েল-শাবকের ডানায় কিন্তু লালচে বাদামী রঙ্গের দুইটি দাগ থাকে। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে এই দাগ আর থাকে না। দয়েলের বিলাতী জ্ঞাতি রবিনের শাবকও নাকি বাল্যে এইরূপ পৃথক বেশ ধারণ করে।

দয়েল ও তাহার শাবক

আবার কোন কোন পাখীর শাবক মাতাপিতার ন্যায় বেশই ধারণ করে, কেবল তাহাদের পালকের বর্ণ বয়ঃপ্রাপ্ত পাখীর পালকের ন্যায় তত উজ্জ্বল নহে। 'হলদে' পাখী, মাছরাঙ্গা ও বনবুলের শাবক ভাল করিয়া দেখিলেই এই কথা বুঝিতে পারিবেন।

শাবকেরা কতদিনে বয়ঃপ্রাপ্ত পাখীর অনুরূপ পালক প্রাপ্ত হয়, তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। কোন কোন পাখী দুই সপ্তাহের মধ্যেই জনকজননীর ন্যায় উজ্জ্বল পালক লাভ করে, আবার কাহারও কাহারও ইহাতে তিন বৎসরেরও অধিক সময় লাগে।

পালকের বর্ণ
পরিবর্ত্তন

পাখীর পালকের বর্ণ ত্রিবিধ উপায়ে পরিবর্ত্তিত হয়—(১) পালক পরিবর্ত্তন দ্বারা (২) যৌবন-প্রাপ্তির পরে পালকের কিয়দংশ ক্ষয় বা নষ্ট করিয়া, এবং (৩) বর্ণ-পরিবর্ত্তনের দ্বারা পালকের স্থানে স্থানে রঞ্জন-দ্রব্যের সমাবেশে। এতদ্ব্যতীত কৃত্রিম উপায়েও পাখীর পালকের রং-পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে। বুলফিঞ্চ (Bull-Finch) নামক পাখীকে শণের বীজ খাওয়াইলে ইহার স্বাভাবিক বর্ণ দূর হইয়া কালো হইয়া যায়। ডার্‌উইন্ (Darwin) বলেন যে, এমাজন নদীর তীরবাসীরা তথাকার সবুজ তোতাকে এক প্রকার মাছের চর্ব্বি খাওয়ায়; তাহার

কৃত্রিম-উপায়ে
পালকের বর্ণ
পরিবর্ত্তন

ফলে ইহারা লাল ও পীত বর্ণের পালকের বিচিত্র সজ্জা লাভ করে। মালয় দ্বীপপুঞ্জের জিয়োলো দ্বীপবাসিরাও এই প্রকারে অন্য একজাতীয় তোতার বর্ণ পরিবর্ত্তন করে। এই সকল কৃত্রিম উপায়ে পালকের বর্ণ এমন আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত হয় যে, অনেক সময় পাখীর জাতি নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে।

ব্যাঙের লালায় বর্ণ-পরিবর্ত্তন

আলফ্রেড ওয়ালেস্ (Alfred Wallace) পালকের বর্ণ পরিবর্ত্তনের অন্য এক প্রকার উপায়ের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, দক্ষিণ আমেরিকার লোকেরা তোতা ও অন্য কয়েক জাতীয় পাখীর দুই একটি পালক তুলিয়া ফেলিয়া ঐ স্থানে এক প্রকার ছোট ব্যাঙের লালা লাগাইয়া দেয়। তার পরে এই সকল স্থানে উজ্জ্বল পীতবর্ণের পালক জন্মে। ওয়ালেস্ বলেন যে, এই নবজাত পালকগুলি তুলিলা ফেলিলেও আবার তাহাদের স্থানে স্বতঃই উজ্জ্বল পীতবর্ণের পালক গজাইয়া থাকে।

বয়স ও সৌন্দর্য্য

সাধারণতঃ, একবার যে পাখী উজ্জ্বল বেশ প্রাপ্ত হইয়াছে, সে আর কখনও অনুজ্জ্বল সজ্জা ধারণ করে না এবং বয়োবৃদ্ধির পরই পাখীরা তাহাদের সকল প্রকারের ভূষণ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই নিয়মের যে ব্যতিক্রম ঘটে না, তাহা নহে। পূর্ব্ব প্রবন্ধেই বলিয়াছি যে, বন্য পুরুষ-হংস পক্ষ-পরিবর্ত্তনের সময় শত্রুর দৃষ্টি এড়াইবার জন্য স্ত্রীবেশ ধারণ করে। আবার অষ্ট্রেলিয়ার গুল্ডিয়ান উইভিং ফিঞ্চ (Gouldian Weaving Finch) ও বিলাতের কুট (Coot) বাল্যকালের দুই একটি সুন্দর অলঙ্কার হারায়।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন।

অন্নপূর্ণা

অমৃতের ভাণ্ড লয়ে নিরন্নের দেশে
জগৎ জননী যদি এসেছ আবার,
অন্ন বিতরিয়া তবে অন্নদার বেশে
সার্থক করিয়া যাও সে নাম তোমার।

গৃহে গৃহে ওই তব ক্ষুধিত সন্তান
হা অন্ন, হা অন্ন করি করিছে চীৎকার,
বিষম দুর্দ্দিনে আজি তুমি বিনে তার
কে মুছিবে নয়নের তপ্ত অশ্রুধার ?

তব মুখপানে চাহি কাতর নয়নে
বসে আছি হেথা মোরা আশায় আশায়,
শুষ্ক মুখে হাসি আজি তব আগমনে
উঠেছে ভাসিয়া, মাগো, হেরিয়া তোমায়।

লহ দর্ব্বী, অন্নরাশি কর, শিবে, দান
জগতের তরে আজি, জগৎ জননী,
কঙ্কালে এ দেশ যে গো হয়েছে শ্মশান,
অশিবে গিয়াছে ভরি নিখিল ধরণী।

দেশে দেশে শিব তব করুক নর্ত্তন
শ্মশানের গৃহে গৃহে অন্ন বিতরিয়া,
করুক ক্ষুধিত দেশ ক্ষুধা নিবারণ
সে অন্নে, অশিব-রাশি যাউক ঘুচিয়া।

অমৃতের গন্ধ পেয়ে মিলিয়াছে আজি
তোমার চরণ-তলে বুভুক্ষু সন্তান,
পূর্ণ হউক তার পুণ্য-কামনার রাজি
সিদ্ধিরূপী অমৃতের কণা কর দান।

শ্রীনলিনীনাথ দাস গুপ্ত।

অবিমারক

(মহাকবি ভাসরচিত সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ)

স্থাপনা

নান্দ্যন্তে সূত্রধারের প্রবেশ

সূত্র। (শূকররূপী) ভগবান্ প্রলয়পয়োধিজল থেকে অনুগ্রহপূর্ব্বক (উদ্ধার করে) একটি দাঁতের উপর যে পৃথিবীকে তুলে ধরেছিলেন, যে পৃথিবীতে যুদ্ধক্ষেত্রে (নরহরিরূপী) ভগবান্ দৈত্য (হিরণ্যকশিপুকে) সংহার করেছিলেন, (বামনরূপী) ভগবান্ এক পা বিস্তার ক'রে যে পৃথিবী পরিব্যাপ্ত করেছিলেন, (কৃষ্ণরূপী) ভগবান্ (প্রেমাধীনা-গোপিনী-লীলা দ্বারা) যে পৃথিবী সম্ভোগ করেছিলেন, ভগবান্ (বিষ্ণু) নারায়ণ চক্রের সাহায্যে যে পৃথিবী রক্ষা ক'রে থাকেন, ভগবান্ নারায়ণ সেই বসুধা যাহাতে একচ্ছত্রা ও আপনার (মহারাজের) অধীন হয়, তাহা করুন।*

(নেপথ্যের দিকে তাকাইয়া) আর্য্যে, এ দিকে।

নটীর প্রবেশ

নটী। আর্য্য, এই যে আমি।

সূত্র। আর্য্যে, তোমার মুখে কৌতূহলপূর্ণ হাসি দেখেই তোমার মনের ভাব বুঝা যাচ্ছে। তুমি কি কিছু বল্‌বে না কি?

নটী। আর্য্য যে ভাবজ্ঞ, এতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে?

সূত্র। তা' হ'লে, স্বচ্ছন্দে মনের কথাটা বল।

নটী। আর্য্যের সঙ্গে আমার প্রমোদবনে যাওয়ার ইচ্ছা হয়েছে। সেখানে আমার স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য কিছু ব্রত কত্তে হবে।

(নেপথ্যে)

ভূতিক, কুরঙ্গীকে রক্ষা করার জন্য তুমিও প্রমোদবনে যাও।

অঞ্জনগিরি হাতীটা ক্ষেপেছে।

সূত্র। আর্য্যে, শুনলেন্ ত? রাজকুমারী প্রমোদবনে গিয়েছেন। কাজেই প্রমোদবনের চারিদিকে এখন পাহারা বসেছে। রাজকুমারী ফিরে এলে আমরা নিশ্চিন্ত হ'য়ে সেখানে যাব।

নটী। যে আজ্ঞা, আর্য্য।

[প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক

সপরিবারে রাজার প্রবেশ

রাজা। অনেক যজ্ঞ করেছি। ব্রাহ্মণেরা আমার প্রতি প্রসন্ন। গর্ব্বিত রাজগণের মনে ভয়ের সঞ্চার ক'রে

* এই শ্লোকটির আর একটি গূঢ় অর্থ আছে—

সমুদ্রপ্রান্ত থেকে আরম্ভ করে যে পৃথিবী আপনার (মহারাজের) অনুগ্রহাধিকারভুক্ত, যে মঙ্গলরূপিণী (একদংষ্ট্রাগ্ররূঢ়া) পৃথিবী আপনার অধিকৃত, যে পৃথিবীতে যুদ্ধ ক'রে আপনি বহু অনার্য্যের বিনাশ-সাধন করেছেন, যে পৃথিবীতে একমাত্র আপনার প্রভাব পরিব্যাপ্ত হয়েছে (সমুদ্র থেকে সমুদ্র পর্য্যন্ত যে পৃথিবীতে আপনার প্রভাব বিস্তৃত), স্বীয় বাহুবলে অধীন ক'রে যে পৃথিবী আপনি আনন্দের সহিত ভোগ কচ্ছেন, যে পৃথিবী আপনার অধীনে একচ্ছত্রা, ভগবান্ নারায়ণ সেই একচ্ছত্রা পৃথিবীর শাসনকার্য্যে আপনার সহায় হ'ন।

"আজিমধ্যে নিহতদিতিসুতাং" এই অংশটুকু বিষ্ণুসেনের পক্ষেও ব্যাখ্যাত হইতে পারে। সমভূমির উপর (আজিমধ্যে) যে পৃথিবীতে বিষ্ণুসেন কর্ত্তৃক অবি নামক অসুর নিহত হয়েছে।

রাজপক্ষের অন্যান্য বিশেষণগুলিও বিষ্ণুসেনের পক্ষে প্রযোজ্য।

দিয়েছি। তবু আমার মনে আনন্দ হচ্ছে না। কন্যা সর্ব্বদাই পিতার চিন্তার কারণ। কেতুমতি, যাও রাণীকে ডেকে আন।

প্রতীহারী। যে আজ্ঞা, মহারাজ [প্রস্থান।

সপরিবারে দেবীর প্রবেশ

দেবী। মহারাজের জয় হ'ক।

রাজা। দেবি, সর্ব্বদাই তোমার মুখে হাসি লেগে আছে। আজ যেন তোমার মুখখানি আরও প্রফুল্ল দেখছি। এর কারণ কি ?

দেবী। মহারাজই ত বলেছেন, "কুরঙ্গীর বিবাহের জন্য দূত এসেছে, শীগ্গীরই জামাই দেখাব।"

রাজা। হাঁ, বলেছি বটে। কিন্তু বিবাহ এখনও ঠিক হয় নি। এস, বস।

দেবী। যে আজ্ঞা, মহারাজ। [উপবেশন।

রাজা। দেবি, অনেক দেখে শুনে তবে বিয়ে ঠিক কত্তে হয়। দেখ, যদি পিতা জামাইর রূপ না দেখে নিজের ইচ্ছামত মেয়ের বিয়ে দেন, তা'হলে খরস্রোতা, কর্দ্দমজলা নদী যেমন দুই কূলই ভেঙ্গে দেয়, তেমনি মেয়েও নিজের রূপ-গর্ব্বে মত্ত হয়ে দু'ই কূলই (পিতার কুল, শ্বশুরের কুল) কলঙ্কিত করে। এ কি ! একটা শব্দ শুন্ছি না ? নানা কারণে শব্দ হ'তে পারে। এ শব্দটা গভীর ব'লে, দূরে হলেও নিকটে ব'লে বোধ হচ্ছে। যদিও কুরঙ্গীর রক্ষার জন্য বন্দোবস্তের ত্রুটি হয় নি, তবুও তার জন্যই মনে শঙ্কা হচ্ছে।

দেবী। তাই ত, কুরঙ্গী যে প্রমোদবনে গিয়েছে।

রাজা। এখানে কে আছে ?

ভটের প্রবেশ।

ভট। মহারাজের জয় হ'ক। আর্য্য কৌঞ্জায়ন কি সংবাদ নিয়ে এসেছেন।

রাজা। তাঁকে শীগ্গীর নিয়ে এস।

ভট। যে আজ্ঞা, মহারাজ। [প্রস্থান।

কৌঞ্জায়নের প্রবেশ

কৌঞ্জা। (সখেদে) হায় ! মন্ত্রীর জীবন বড়ই কষ্টের ! কোন একটা কাজ হয়ে গেলে, লোকে রাজার বলেরই প্রশংসা করে। আর, কোন বিপদ ঘটলে, সকলেই মন্ত্রীর বুদ্ধির নিন্দা করে। অমাত্য কথাটি শুন্তে বেশ ভাল, কিন্তু রাজারা বুদ্ধিবলহীন কুপুরুষের মত মন্ত্রীগণকেও গুপ্তভাবে দণ্ড দিয়ে থাকেন।

জয়সেন, মহারাজ কোথায় ? কি বল্ছ ? সভাগৃহে ! এস্থানে আর শঙ্কার কোন কারণ নেই।

(উদ্বেগের সহিত প্রবেশ করিয়া)

প্রভু, প্রসন্ন হউন, প্রসন্ন হউন।

রাজা। ভয়ের কোন কারণ নেই। নিশ্চিন্তে বসে সব কথা বলুন।

কৌঞ্জায়ন। শুনুন মহারাজ। মহারাজই আমাকে রাজকুমারীর সঙ্গে প্রমদবনে যেতে আদেশ দিয়েছিলেন।

রাজা। হাঁ, দিয়েছিলুম বটে। কি হয়েছে ?

কৌঞ্জায়ন। রাজকুমারী প্রমদবনে গিয়ে ইচ্ছানুরূপ খেলে' বিশ্রাম কচ্ছেন, আর দাসদাসীরা হাস্ছে, গল্প কচ্ছে। এ সকল গোলমাল শুনে' (অঞ্জন-গিরি) হাতীটার মদস্রাব বেশী হতে লাগ্ল। অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাতে যেমন দুর্দ্দিন হয়, হাতীর মুখটাও তখন সেইরূপ দুর্দ্দিনের মত হয়ে উঠল। হাতীটা মাহুতকে মেরে মাটিতে ফেলে দিল। সমস্ত গায়ে ধূলা মেখে দেখ্তে এমন ভীষণ হয়ে উঠল যে, তা বলে বুঝান যায় না। আর মূর্ত্তিমান পবনের মত এত তাড়াতাড়ি চলতে লাগল যে, কখন দেখা গেল, আবার কখন দেখা গেল না। মহারাজের অমাত্যদের নিন্দা করবার জন্য এবং একজন লোককে সকলের সমক্ষে প্রকাশ করার জন্যই যেন মত্ত হাতীটা সেখানে এসে উপস্থিত হ'ল।

রাজা। বাজে কথা থাক্। কুরঙ্গী কুশলে আছে ত।

কৌঞ্জা। প্রভুর সৌভাগ্যে কুমারীর অমঙ্গল হওয়ার কোনই আশঙ্কা নেই।

রাজা। বেশ। এখন যা ইচ্ছা বল।

কৌঞ্জা। তখনই সমস্ত বাজে লোক চারিদিকে ছুটে পালাল। স্ত্রীলোকেরা মাত্র হাহাকার ক'রেই বিপদের প্রতীকার কত্তে লাগল; তারা যে সকল বলবান লোকের আশ্রয় নিয়েছিল, তা'দিগকেও হাতীই মেরে ফেলল; আমি প্রমদবনের জিনিস-পত্রগুলি পরীক্ষা কত্তে গিয়ে খানিকক্ষণ কি করব কিছুই ঠিক কত্তে না পেরে কৌশল ক'রে লুকিয়ে আছি, এমন সময় হাতীটা রাজকুমারীর পাল্কীর কাছে এসে উপস্থিত হ'ল।

দেবী। এর পরে না জানি কি হ'ল;

রাজা। কুরঙ্গীকে তখন কে সাহায্য কল্লে?*

কৌঞ্জা। একজন—দেখতে ভারি সুন্দর—

রাজা। অসঙ্কোচে বলুন। বিপদ কেউ বাধা দিয়ে রাখতে পারে না।

কৌঞ্জা। তখন একজন ভারি সুন্দর যুবা পুরুষ হস্তী কর্ত্তৃক আক্রান্ত রাজকুমারীকে তৎকালোচিত অভয় দিয়ে নিঃশঙ্কচিত্তে সেই হাতীটার সামনে এসে উপস্থিত হলেন। যুবকের মুখে একটুও বিস্ময়ের ভাব দেখা গেল না। যুবক হলেও তাঁর অহঙ্কার ছিল না, বীরপুরুষ হলেও তিনি পরোপকারী ছিলেন, আর তরুণবয়স্ক হলেও তাঁর শরীরে যথেষ্ট বল ছিল।

রাজা। এই করুণার ঋণশোধ করা অসম্ভব। তার পর।

কৌঞ্জা। তার পর যুবক বিলাসবশে হাতীটাকে খুব জোরে একটা চড় দিলেন। দুষ্ট হাতীটাও রাজকুমারীকে ছেড়ে যুবককে বেগে আক্রমণ কল্লে।

দেবী। মঙ্গল হ'ক।

রাজা। তার পর।

কৌঞ্জা। তখন ভূতিক এসে পড়ল। আমরা দু'জনে আবার তাড়াতাড়ি রাজকুমারীকে পাল্কীতে করে কন্যাপুরে নিয়ে এসেছি।

রাজা। কি ভীষণ বিপদ। ভূতিক এলেন না কেন?

কৌঞ্জা। ভূতিক আমাকে বল্লেন "রাজার কাছে গিয়ে আপনি তাকে এই ঘটনা বলুন। আমি সেই লোকটির বংশ ও অন্যান্য বিবরণ জেনে শীঘ্রই ফিরে আস্‌ছি।"

রাজা। তাই! ভূতিক সব জেনে আসবে। কৌঞ্জায়ন, পরের বিপদে সাহায্যকারী সেই লোকটি কোন্ বংশে জন্মেছে?

কৌঞ্জা। মহারাজ, লোকটি নিজকে অন্ত্যজ বলে পরিচয় দিচ্ছে—এই পরিচয় কিন্তু অবিসংবাদী নয়।

দেবী। মহারাজ, অকুলীন কি কখনও এত কোমলচিত্ত হতে পারে?

রাজা। ব্যাপারটা না জানি কি!

ভূতিকের প্রবেশ

ভূতিক। (সবিস্ময়ে) পৃথিবীতে কত রত্ন যে প্রচ্ছন্ন আছে, কে জানে! এই লোকটির ছলনাবিহীন পরাক্রম দেখে মনস্বীদের বিক্রম ও বুদ্ধি লজ্জা পায়! আমার একটা বিষয়ে সন্দেহ দূর হচ্ছে না। নিজ-বংশের পরিচয় গোপন কচ্ছে কেন? কিন্তু হাত দিয়ে সূর্য্যকে কে ঢেকে রাখতে পারে?

কোনও নিগূঢ় কারণে কিংবা গুরুজনের উপদেশে ভাল লোক বেশী দিন লুকিয়ে থাকতে পারে না; বরং পরের বিপদে বিপন্নকে উদ্ধার কত্তে গিয়ে আগেকার প্রতিজ্ঞা ভুলে আত্মপ্রকাশ করে দেয়।

জয়সেন, মহারাজ কোথায়। কি বল্লেন? সভাগৃহে। তা' হলে সেখানে নিঃশঙ্কে যাওয়া যেতে পারে। আচ্ছা যাই, ঢুকে পড়ি। (প্রবেশ করিয়া) মহারাজের সঙ্গে দেবীও রয়েছেন দেখ্‌ছি। (অগ্রসর হইয়া) মহারাজের জয় হ'ক।

রাজা। দেবী, তুমি অন্তঃপুরে গিয়ে কুরঙ্গীকে সান্ত্বনা কর। আমিও তোমার পেছনে পেছনেই আস্‌ছি।

দেবী। যে আজ্ঞা, মহারাজ [প্রস্থান।

রাজা। যে পরের জন্য নিজের প্রাণ দিতে যাচ্ছিল, তার খবর কি?

* "অথ কেন সনাথীকৃতা কুরঙ্গী" ইহার একটি গূঢ়ার্থ আছে,—কুরঙ্গীকে কে নাথযুক্তা কল্লে?

ভূতিক। মহারাজ তবে শুনুন। সেই লোকটি নিরুদ্বেগে ও লীলাবিলাসে বন্ধুর মত হাতীটার সঙ্গে খেলে নিবর্ত্তন অনুবর্ত্তন প্রভৃতি গতিভঙ্গি দ্বারা হাতীটাকে ভুলিয়ে শেষে নিজের এই বীরত্বসূচক কাজে লজ্জিত হ'য়ে এবং লোকের প্রশংসা শুনে নতশিরে ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরে গিয়েছে।

রাজা। সন্তুষ্ট হলেম'। এতে আমার আর একটা লাভ হ'ল।

ভূতিক। ইতিমধ্যে একটা হস্তিনীর সাহায্যে হাতীটার পায়ে শিকল পরিয়ে হাতীটাকে গজ-শালায় বেঁধে রেখে একটা ছল করে আমি সেই লোকটির বংশ-পরিচয় জানবার জন্য খবর নিতে গিয়েছিলুম।

রাজা। কি কি খবর পেলেন! শুনছি, লোকটি নাকি অন্ত্যজ।

ভূতিক। রাম! রাম! কখন নয়। আমার বোধ হয় কোন কারণে নিজের বংশের পরিচয় গোপন কচ্ছে।

রাজা। আপনি পরীক্ষা করে কি স্থির কল্লেন।

ভূতিক। এ ক্ষেত্রে পরীক্ষা করবার কিছু নেই।

তার দেবতুল্য রূপ, ব্রাহ্মণের মত কথা, ক্ষত্রিয়ের মত তেজ, তার শরীরটি সুকুমার ও বলিষ্ঠ। যদি সত্য সত্যই সে অন্ত্যজ হয়, তা হলে এতদিন ধরে আমার শাস্ত্রচর্চ্চার পরিশ্রমই ব্যর্থ হল।

রাজা। তার স্ত্রী আছে কি।

ভূতিক। তার সকলই আছে—সে কিন্তু নিজে বিয়ে করে নি।

রাজা। স্ত্রীলোকের সঙ্গে দেখা করেন নি ভালই, কিন্তু তার পিতাকে ত এ সম্বন্ধে প্রশ্ন কত্তে পাত্তেন।

ভূতিক। যার ছেলে এত ভাল তার সঙ্গে আমার দেখা হ'য়েছে।

তার কাঁধ দুটি ব্যায়ামের ফলে বিস্তৃত ও উন্নত, মণিবন্ধে ধনুর ছিলার আঘাতের দাগ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, যদিও লুকিয়ে রয়েছেন, তথাপি তাকে দেখে রাজার ছেলে বোধ হচ্ছে। তার শরীরের তেজ ঠিক মেঘে ঢাকা সূর্য্যেরই মত।

রাজা। বাজে কথা শুনে আর ফল কি। আর একবার তার খাঁটি পরিচয় জানতে চেষ্টা করুন।

ভূতিক। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

রাজা। আচ্ছা, কাশিরাজের দূতকে কি বলে বিদায় কত্তে হবে, ভূতিক?

ভূতিক। শত শত দূত এসেছে, আসছে, এবং আসবে। এ বিষয়ে আবার কর্ত্তব্য কি? অনেকেই আপনার কণ্যার পাণিগ্রহণপ্রার্থী। পলোয়ানেরা যেমন (শরীরের বল দেখিয়ে) মোহরের থলি পেতে চায়, সকল রাজারাও (সেরূপ) রাজকুমারীকে লাভ করে সৌভাগ্যশালী হতে চায়।

রাজা। আপনি কি বলছেন বুঝতে পাচ্ছি না।

ভূতিক। আমি বলছি, সব সময় ভাগমানসিতে কাজ হয় না। গুণ ও বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ বিবেচনা করে দেশ ও কালের অনুযায়ী হয়ে কাজ কত্তে হয়। তাড়াতাড়ি করা যেমন ভাল নয়, তেমন আবার দীর্ঘসূত্রী হওয়াও ভাল নয়।

রাজা। হাঁ, ভূতিক ঠিক কথাই বলেছেন। কৌঞ্জায়ন, আপনি যে চুপ করে আছেন?

কৌঞ্জায়ন। মহারাজ, রাজাদের মধ্যে সৌবীররাজ আর কাশিরাজের সঙ্গে আপনার আগেকার সম্বন্ধ রয়েছে। দু'জনেই আপনার ভগিনী, পতি সুতরাং দুজনেই সমান; সুতরাং তাঁদের সঙ্গে সম্বন্ধ কত্তে বাধা নেই। কিন্তু সৌবীররাজ তাঁর ছেলের জন্য আগে দূত পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তখন রাজকুমারীর বিয়ের বরণ হয় নি, এই বলে মহারাজ দূতকে যথাযোগ্য সম্মান দেখিয়ে বিদায় করে দিয়েছিলেন। এখন আবার কাশিরাজ তাঁর ছেলের জন্য দূত পাঠিয়েছেন। এখন মহারাজই এ সকল বিষয় বিচার করে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করুন।

রাজা। কৌঞ্জায়ন ঠিক কথাই বলেছেন। আচ্ছা ভূতিক, অন্য রাজাদের কথা ছেড়ে দিয়ে এই দু'জনের মধ্যে কার সঙ্গে সম্বন্ধ করা ভাল?

ভূতিক। ভৃত্যের কি প্রভুর দোষ দেখান উচিত? সমস্ত রাজাই মন্ত্রীর প্রভু।

রাজা। এ ক্ষেত্রে শিষ্টাচার দেখাবার প্রয়োজন নাই। বলুন, আপনার কি অভিপ্রায়।

ভূতিক। (স্বগত) এখন আর না বলাটা উচিত নয়। মহারাজ, দু'জনেই আপনার ভগিনীপতি, সুতরাং দুজনেই সমান'। তবে দেবীর ভাই সৌবীররাজ গুণবান।

রাজা। তা'হলে আপনি আমার মতই সমর্থন কচ্ছেন দেখ'ছি।

ভূতিক। দুই ভাবেই অনুগৃহীত হলেন।

রাজা। আচ্ছা, সৌবীররাজ দূত পাঠালেন না কেন, মন্ত্রী?

তুতিক। এ বিষয়ে আমারও একটা সন্দেহ আছে। বেশ জেনে শুনে বলব বলেই এখন কিছু বলছি না।

রাজা। আচ্ছা, সৌবীররাজ ভাল আছেন ত?

তুতিক। গুপ্তচরেরা বললে, সৌবীররাজ ও তাঁর পুত্রকে তারা দেখতে পায় নি। মন্ত্রীরা রাজ্যের কাজ চালাচ্ছে। মন্ত্রীরা রাজবাড়ীতে ঢুকতে পায় না, কিন্তু কেউ তার কারণ জানে না।

রাজা। তবে ব্যাপারটা কি?
রাজা কি কোনও রমণীর প্রতি অনুরক্ত হয়েছেন? দুষ্ট মন্ত্রীরা কি তাঁকে কারারুদ্ধ করেছে? তিনি কি রোগে ভুগছেন? রাজপরিবারের কি কেউ পীড়িত হয়েছে? ব্রাহ্মণেরা কি তাঁকে শাপ দিয়েছেন? রাজা কি কোন ব্রত পালন কচ্ছেন? রাজবাড়ীতে রাজা অবরুদ্ধ হয়ে আছেন কেন? শীগ্‌গির এর কারণ জান্‌তে চেষ্টা করুন ত।

তুতিক। যে আজ্ঞা মহারাজ।

রাজা। কৌশায়ন, কাশিরাজের দূতকে কি বলে বিদায় কর্ত্তে হবে?

কৌশায়ন। এ অবস্থায় তাকে সম্মান করে বিদায় দিতে হবে। বলতে হবে, "অনেক কথায় বিয়ে স্থির হয়। (যাতে এ বিয়ে হয় তার) যথাসম্ভব চেষ্টা করা হবে।"

রাজা। মন্ত্রীরা কেবল কাজের জন্যই বুদ্ধি খাটিয়ে থাকে, তারা স্নেহের কথা একটুও ভাবে না।

(নেপথ্যে)

মহারাজের জয়! বেলা দশ দণ্ড হয়েছে।

তুতিক। মহারাজ, অন্তঃপুরে এ বিষয় সম্বন্ধে আরও বিশেষ করে চিন্তা করা যাবে। স্নানের সময় বয়ে যাচ্ছে। রাজকুমারীকেও সান্ত্বনা কত্তে হবে। দেবীও অনেকক্ষণ আপনার প্রতীক্ষা কচ্ছেন। বিশিষ্ট লোকেরাও এই (আকস্মিক) বিপদ-সংঘটনের পর মহারাজের দর্শন প্রার্থী হয়েছেন।

রাজা। হায়, রাজ্যশাসন মহাত্মাদিগেরই কাজ বটে। প্রথমে ধর্ম্মাধর্ম্ম দেখ্‌তে হয়, নিজের বুদ্ধিবলে মন্ত্রীদের বুদ্ধি ও মনের ভাব পরীক্ষা কত্তে হয়। অনুরাগ মৃদুগুণ-সম্পন্ন, আর রোষ পরুষগুণসম্পন্ন; এ দুটাই এরূপ ভাবে সংযত করে রাখতে হয় যেন ভাব দেখে কেউ রাজার অনুরাগ বা বিরাগের পরিচয় না পায়। সব কাজ ঠিক সময়ে কত্তে হয়। লোকের চরিত্র জ্ঞান লাভ কত্তে হয়। খুব ভাল চরই রাজার চক্ষু। এই চক্ষু দিয়ে রাজ মণ্ডলকে দেখ্‌তে হয়। সব সময় সাবধানে আত্মরক্ষা কত্তে হয়। আবার রণক্ষেত্রে (শত্রুর সম্মুখেও) আত্মরক্ষায় অসাবধান হওয়াও উচিত নয়।

[সকলের প্রস্থান।

পাঠান্তরে "রাজা কি স্বজন-স্নেহের বশবর্ত্তী হয়ে রাজবাড়ীর বাহির হচ্ছেন না?"

জীবন-কুঞ্জ

জাগো আমার মোহমুগ্ধ প্রাণ
বিশ্ববীণায় উঠ্‌ছে নূতন তান
খেলাধূলা হেলায় ফেলি
আকাশে দে চিত্ত মেলি
কুহেলিকা ক্রমে অবসান
বিশ্ববীণায় উঠ্‌ছে নূতন তান।
কর্ম্মক্লান্ত ছুটছে আপন নীড়ে
চকাচকি ডাকছে উভতীরে
সোনার আঁচল লুঠ্‌ছে দিকে দিকে
সন্ধ্যামণি চেয়ে অনিমিখে
কতই বরণ নাচছে চরণ ঘিরে
চকাচকি ডাক্‌ছে উভতীরে!
শীতের রাতে কে তুমি গো সাকী?
শিশির ভেজা করুণ দুটী আঁখি!
ঝারি হতে ঢালছ সুধার ধারা
ডাক্‌লে বঁধু দিচ্ছ নাক সাড়া
আপনি সেধে বেঁধে দিলে রাখী
দুয়ারে এসে কত ডাকাডাকি!
মাঘের শীতে কেন এত তাপ?
অঙ্গে নে মা! নয়লা মাটির ছাপ।
দখিন হাওয়ার পরশ লাগি
জমাট্‌ প্রাণ উঠ্‌ছে জাগি
রস-সায়রে পড় না দিয়ে ঝাঁপ্‌
ধুয়ে যাবে মলিন মাটির ছাপ।
আজ্‌কে তোমার কুঞ্জে বিহরি'
উষর চিত্ত উঠ্‌ছে শিহরি
লুকোচুরি খেলবে কত আর?
আপনি এসে বেঁধে দিলে তার
দয়ার ঠাকুর তুমি যে শ্রীহরি
জীবনকুঞ্জ উঠ্‌ছে শিহরি!

শ্রীকুলচন্দ্র দে।

বাৎস্যায়নের কামসূত্র

বাৎস্যায়নের কামসূত্র বহুজ্ঞাতব্যপূর্ণ উপাদেয় গ্রন্থ। এই গ্রন্থে কামপ্রসঙ্গের বাহুল্য আছে বলিয়া ইহাকে উপেক্ষা করিতে হইলে, ত্রিবর্গতত্ত্ববুভুৎসুর জ্ঞান সম্পূর্ণতা লাভে নিতান্তই বঞ্চিত হইবে। বিশেষতঃ, তন্ত্র, কাব্য প্রভৃতি শাস্ত্রের অনেকাংশই কামশাস্ত্রের সহিত এত জড়িত যে, এই শাস্ত্রে সর্ব্বতোভাবে অনভিজ্ঞের পক্ষে সেগুলি একেবারেই বুঝিবার উপায় নাই।

এই শাস্ত্রের আবশ্যকতাজ্ঞান মানবসভ্যতার উন্মেষ সময়েই অনুভূত হইয়াছিল, এবং ইহার পঠনপাঠন ও এতদ্বিষয়ক গ্রন্থপ্রণয়নও চলিয়া আসিতেছিল। কিঞ্চিদধিক চারি শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তিকাল পর্য্যন্ত পণ্ডিতসমাজে রীতিমত কামশাস্ত্রপাঠের পরিচয় পাওয়া যায়। শারদাতিলকের পদার্থাদর্শ-নামক প্রসিদ্ধ টীকাকার রাঘবভট্ট অধীত গ্রন্থের নামকথনপ্রসঙ্গে কামশাস্ত্রেরও নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন—

তস্মাদ্রাঘবভট্ট-এম সমভূদ্বেদান্ত-সন্ন্যায়বিৎ
খ্যাতো ভট্ট-নয়ে সমস্ত-গণিতে সাহিত্য-রত্নাকরঃ
আয়ুর্বেদনিধিঃ কলাসু কুশলঃ কামার্থশাস্ত্রে গুরুঃ
সঙ্গীতে নিপুণঃ সদাগমনিধেঃ পারং প্রয়াতঃ পরম্॥

সেই পূর্ব্ববর্ণিত-ভট্ট-পৃথ্বীধর হইতে এই রাঘবভট্ট জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইনি বেদান্ত এবং নির্দ্দোষ ন্যায়শাস্ত্র, এই উভয়ের অর্থবেত্তা, কুমারিলভট্টসম্মত মীমাংসা-শাস্ত্রে এবং সমস্তগণিতশাস্ত্রে বিখ্যাত, সাহিত্যের সমুদ্রস্বরূপ, আয়ুর্বেদের নিধি, সমস্ত কলাজ্ঞানে কুশল, কামশাস্ত্রে এবং অর্থশাস্ত্রে গুরু (এই সকল শাস্ত্রের অধ্যাপক), সঙ্গীতশাস্ত্রে নিপুণ এবং সমস্ত-নির্দ্দোষ-তন্ত্রশাস্ত্রসমুদ্রের সর্ব্বতোভাবে পারগত।

গ্রন্থকার বাৎস্যায়ন প্রথমতঃ ধর্ম্মার্থকামকে নমস্কার করিয়াছেন, অনন্তর ত্রিবর্গের তত্ত্বপ্রতিপাদক-শাস্ত্রপ্রণেতৃ আচার্য্য-বর্গকে প্রণামপূর্ব্বক শাস্ত্রকারদিগের বিষয় বিভাগ (কে কোন শাস্ত্রবিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন) প্রদর্শন করিয়াছেন "প্রজাপতি প্রজাদিগকে উৎপন্ন করিয়া তাহাদিগের স্থিতির উপায় ত্রিবর্গসম্পাদনোপযোগী লক্ষাধ্যায়াত্মক শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাহারই একদেশ ধর্ম্মশাস্ত্র ভগবান্ স্বায়ম্ভুব মনু পৃথক্ গ্রন্থাকারে প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বৃহস্পতি অর্থশাস্ত্র পৃথক্ শাস্ত্রাকারে প্রণয়ন করিয়াছিলেন, এবং মহাদেবের অনুচর নন্দী সহস্রাধ্যায়াত্মক কামসূত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন"*। অনন্তর এই গ্রন্থ অবলম্বনপূর্ব্বক উদ্দালকপুত্র শ্বেতকেতু পঞ্চাশতাধ্যায়াত্মক ও পঞ্চালদেশবাসী বাভ্রব্য সার্দ্ধশতাধ্যায়-সপ্তাধিকরণ-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাহারই "বৈশিক নামক" চতুর্থাধিকরণ "দত্তক" নামক গ্রন্থকার পৃথক্ গ্রন্থাকারে প্রণয়ন করেন। এই কার্য্য পাটলিপুত্রবাসি বেশ্যাদিগের অনুরোধে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

বাভ্রব্যপ্রণীত গ্রন্থেরই "সাধারণ" নামক অধিকরণটি "চারায়ণ" পৃথক্রূপে বলিয়াছেন। ঘোটকমুখ "কন্যা সংপ্রযুক্তাধিকরণ", "গোনর্দ্দীয়" "ভার্য্যাধিকারিক", গোনিকাপুত্র "পারদারিক", সুবর্ণনাভ "সাম্প্রযোগিক", এবং কুচুমার "ঔপনিষদিকাধিকরণ", পৃথকরূপে বিবৃত করিয়াছেন। অনেক আচার্য্য কর্ত্তৃক এই প্রকারে খণ্ড খণ্ডরূপে কামশাস্ত্র যাহা প্রণীত হইয়াছিল, তাহা প্রায় উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রাপ্ত গ্রন্থের মধ্যেও দত্তকাদি প্রণীত গ্রন্থ শাস্ত্রের একদেশমাত্র; সুতরাং তৎপাঠে কামশাস্ত্রে সম্পূর্ণ জ্ঞান হইতে পারে না; "বাভ্রবীয়" গ্রন্থও অতিবিস্তৃতিনিবন্ধন সাধারণের পক্ষে পাঠের উপযোগী নহে; অতএব (বাৎস্যায়ন কর্ত্তৃক) সমস্ত পূর্ব্বাচার্য্যগ্রন্থের যাবতীয় প্রতিপাদ্য বিষয় সংক্ষেপে সংগ্রহপূর্ব্বক অল্পাক্ষরে এই কামসূত্র প্রণীত হইয়াছে।

*ধর্ম্মার্থকামেভ্যো নমঃ। ১।১। তৎসময়াববোধকেভ্যশ্চাচার্য্যেভ্যঃ। ১।৩। প্রজাপতির্হি প্রজাঃ সৃষ্ট্বা তাসাং স্থিতিনিবন্ধনং ত্রিবর্গস্য সাধনং অধ্যায়ানাং শতসহস্রেণাগ্রে প্রোবাচ। ১।৫। তস্যৈকদেশিকং মনুঃ স্বায়ম্ভুবো ধর্ম্মাধিকারিকং পৃথক্ চকার। ১।৬। বৃহস্পতিরর্থাধিকারিকম্ ১।৭। মহাদেবানুচরশ্চ নন্দী সহস্রেণাধ্যায়ানাং পৃথক্ কামসূত্রং প্রোবাচ। ১।৮।

এই উক্তির দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে; ব্রহ্মার মুখ হইতেই অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় এই শাস্ত্রও বিনির্গত হইয়াছে। পরবর্ত্তিকালেও যে সকল গ্রন্থকার বা মুনি অন্যান্য শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত এবং আচার্য্য ছিলেন, সেই সমস্ত ব্যক্তিই কামশাস্ত্রের আলোচনায়ও আচার্য্যতায় ব্যাপৃত হইতেন। এই স্থলে বাৎস্যায়নকর্ত্তৃক যে কতকগুলি শাস্ত্রকারের নাম কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে উদ্দালক-পুত্র শ্বেতকেতু অধ্যাত্মবিদ্যায় সুপরিচিত; উপনিষদে, বেদান্তদর্শনে এবং মহাভারতে পদে পদে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়।

আচার্য্য গোনর্দীয় একজন বিখ্যাত বৈয়াকরণ, মহাভাষ্যকার ইঁহার মত প্রদর্শিত করিয়াছেন*। চারায়ণও পাণিনি ব্যাকরণে নড়াদিগণে পঠিত হইয়াছেন। সুতরাং ইঁহারও প্রসিদ্ধির অভাব নাই। বাভ্রব্যের নামও বৈদিক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব এই শাস্ত্রের শিষ্টপরিগৃহীততা সম্বন্ধেও প্রমাণের অভাব নাই। টীকাকার মল্লিনাথের গ্রন্থে রতিরহস্য প্রভৃতি কামশাস্ত্রপ্রকরণের প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধাচার্য্য মীননাথের স্মরদীপিকা অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ইহার দুই প্রস্থ পুথি বরেন্দ্র অনুসন্ধানসমিতির সংগ্রহাগারে রক্ষিত হইতেছে। উক্ত সমিতির পুস্তক সংগ্রহকালে মুর্শিদাবাদের সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রামদাস সেন মহাশয়ের পুস্তকালয়ে রাজা চালুক্যের আদেশানুসারে তদাশ্রিত পণ্ডিত কর্ত্তৃক লিখিত একখানা ভোগসাধন গ্রন্থ দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয়।

যে পঞ্চনদেশ ধর্ম্মসংহিতাপ্রভৃতি গ্রন্থে পবিত্রতার আদর্শ ভূমি বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, তত্রত্য আচার্য্য বাভ্রব্যও এই বিষয়ের গ্রন্থপ্রণয়নের আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছিলেন। সুতরাং বিলাসবহুল মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রেই ইহার প্রসার-কল্পনা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

যে বাৎস্যায়ন কৌটিল্যনামে আত্মপরিচয় প্রদানপূর্ব্বক অর্থশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তিনিই বাৎস্যায়ননামে কামশাস্ত্রের রচয়িতা। এই উভয় গ্রন্থ পাঠ করিলে, কামশাস্ত্রকার ও অর্থশাস্ত্রকার, এই উভয়ের বিভিন্নব্যক্তিত্বে অভিজ্ঞের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইবে না। একদেশদর্শিতার ফলে অল্লাক্ষরদৃঢ়গ্রন্থি অর্থবহুল ঈদৃশ গ্রন্থের তাৎপর্য্যজ্ঞানবিধুর কোন কোন ব্যক্তি নানারূপ হাস্যকর অভিমত প্রকাশ করিতেছেন; তদ্দর্শনে অনেকের মনে ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল হইতেছে। কৌটিল্যের সময়ে বেদান্তাদি দর্শন হয় নাই, ইহাও সিদ্ধান্তিত হইয়াছে! যিনি অর্থশাস্ত্রমুদ্রণের সম্পাদক, তিনিও অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, কৌটিল্যের সময়ে অধুনাদৃশ্যমান যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার অস্তিত্বই ছিল না! সুতরাং এই শ্রেণীর লেখকগণের পক্ষে বাৎস্যায়ন-কৌটিল্যের বিভিন্নতাখ্যাপনের প্রয়াস বিস্ময়কর নহে।

সম্প্রদায় বজায় রাখিবার অভিপ্রায়ে প্রাচীন গ্রন্থকারগণ ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বকীয় গ্রন্থে জটিল গ্রন্থি (দুর্বোধ পদ, বাক্য ও ভাব) নিহিত করিতেন। বর্ত্তমান কালের মত না পড়িয়া পণ্ডিত হওয়া তাঁহাদের অভিপ্রেত ছিল না।

দার্শনিক কবি শ্রীহর্ষ নিজের মনের ভাব খুলিয়াই বলিয়া গিয়াছেন—

"গ্রন্থগ্রন্থিরিহ কচিৎ কচিদপি ন্যাসি প্রযত্নান্ময়া
প্রাজ্ঞম্মন্যমনা হঠেন পঠিতী মাস্মিন্ খলঃ খেলতু
শ্রদ্ধারাদ্ধগুরুশ্লথীকৃত-দৃঢ়গ্রন্থিঃ সমাসাদয়
ত্বেতৎ-কাব্যরসোর্ম্মিমজ্জনসুধা ব্যাসজ্জনং সজ্জনঃ"।

আমি এই কাব্যে মাঝে মাঝে যত্নপূর্ব্বক গ্রন্থগ্রন্থি নিহিত করিয়াছি। যে জন ছলপূর্ব্বক পাঠ করে, অর্থাৎ গুরুর নিকট পড়ে না, কেবল দেখিয়া শুনিয়া পণ্ডিত, তাদৃশ অহঙ্কারসর্ব্বস্ব খল জন আমার এই গ্রন্থে খেলা করিতে পারে না। যে সজ্জন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক গুরুকে আরাধনা করিয়াছে, গুরু যাহাকে গ্রন্থের দৃঢ়গ্রন্থি শিথিল করিয়া দিয়াছেন, অর্থাৎ তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিয়াছেন, তাদৃশ মানব এই কাব্যরসতরঙ্গে মজ্জনপীযূষাস্বাদনে সমর্থ হউক।

এমন কি, গুরুপরম্পরাবিহীন পণ্ডিত ব্যক্তিও ভাষ্যাদিতে অনেক সময়েই মূলের ভাব অন্যথা বর্ণনা করেন; এই

*গোনর্দীয়স্ত্বাহ—গোনর্দীয় এই মত বলেন।

জন্য অর্থসূত্রকার কৌটিল্য স্বয়ংই অর্থশাস্ত্রের ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। কামসূত্রের টীকাকার যশোধর অগাধ পাণ্ডিত্যসম্পন্ন ছিলেন। তিনি যে গুরুর নিকট এই শাস্ত্র এবং অন্যান্য বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এবং বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার টীকাই তদ্বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

কোন কোন টীকাকার বাৎস্যায়নের কামসূত্র বিপরীত ব্যাখ্যার দ্বারা বিপর্য্যস্ত করিয়াছিল। এই অসুবিধা দূর করিবার অভিপ্রায়েই যশোধর "জয়মঙ্গল"-নামক টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

কামসূত্রের শঙ্করকৃত একটি টীকা আছে বলিয়া শুনা যায়। তাহা এ পর্য্যন্ত দেখিতে পারি নাই; সুতরাং সেই টীকার গ্রন্থকার কে, টীকাই বা কেমন? তাহা বলিবার উপায় নাই।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য কামশাস্ত্র পাঠ করিয়া মিশ্রপত্নীর সহিত বিচারে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, এ বিষয়ে মাধবাচার্য্য সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং ভগবৎপাদ শঙ্করকর্ত্তৃক কামসূত্রের টীকা প্রণয়ন অসম্ভব নহে। বৃহদারণ্যকের কতক স্থান আধুনিক রুচি অনুসারে নিতান্ত অশ্লীলতাপূর্ণ, কিন্তু আচার্য্য সেই সকল স্থানের ভাষ্য-রচনাতে বিরত হন নাই। যাঁহারা শারীরশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদিগকে তন্ন তন্ন করিয়া নরনারীর সর্ব্বাবয়ব পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়; শাস্ত্রান্তরে সমগ্রজ্ঞানলিপ্সুরও তদ্রূপ অনুশীলনই আবশ্যক। এইজন্যই আমাদের নীতিবিশারদগণ বিদ্যাচর্চ্চাবিষয়ে ত্যক্তলজ্জ হইতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। কারণ, নির্দ্দোষ স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যয়নাধ্যাপনেও অনেক লজ্জাজনক প্রসঙ্গ উঠিয়া পড়ে; সদ্যোগৃহীতগর্ভার লক্ষণ বর্ণনে, যমজ সন্তানের জ্যেষ্ঠত্ব-কনিষ্ঠত্বের যুক্তিপ্রদর্শনে অনেক অশ্লীল কথা বলিতে ও জানিতে হয়। এমন কি, তিথির স্বরূপ বুঝিতে ও বুঝাইতে হইলে চন্দ্রকলার প্রসঙ্গে কামকলার আলোচনা অপরিহার্য্য *।

যিনি মুমুক্ষুর পরম সুহৃদ্ সর্ব্ববিদ্যার প্রদীপস্বরূপ অপূর্ব্ব ন্যায়ভাষ্য রচনা করিয়া জগতের অসীম উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন, যাঁহার অর্থশাস্ত্র লোকযাত্রার পথপ্রদর্শক, তিনি এই কামশাস্ত্রের গ্রন্থপ্রণয়নে প্রবৃত্ত হইলেন কেন? এইরূপ প্রশ্নের নিরাকরণসমর্থ বাক্যাবলি গ্রন্থকার নিজেই গ্রন্থশেষে নিহিত করিতে ভুলেন নাই। তাঁহার অভিপ্রায় অতি উচ্চ, সঙ্কল্প অতীব মহান্, জগতের মঙ্গলকামনাই তাঁহাকে এই কার্য্যে প্রণোদিত করিয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন,—

---

* রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য তিথিতত্ত্বে তিথিনিরূপণপ্রসঙ্গে একটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"অমাদি পৌর্ণমাস্যন্তা যা এব শশিন কলা।
তিথয়স্তাঃ সমাখ্যাতাঃ ষোড়শৈব বরাননে"॥

হে সুমুখি! অমা হইতে পৌর্ণমাসী পর্য্যন্ত চন্দ্রের যে কলা আছে, সেই ষোলটী কলাই তিথি নামে অভিহিত হইয়াছে। এইস্থলে অমাদি পৌর্ণমাসী পর্য্যন্ত যে কলা আছে, এইমাত্র বলিলেই অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে পারে; 'শশিনঃ" (চন্দ্রের) একথা বলিবার প্রয়োজন কি? কারণ, চন্দ্র ব্যতীত অন্যের অমাদি পৌর্ণমাস্যন্ত কলার সম্ভাবনা নাই। এইরূপ প্রশ্নের উত্থাপন করিয়া বহুশাস্ত্রজ্ঞ উপাধ্যায়গণ সমাধান করেন যে, "শশিনঃ" এই পদ না থাকিলে কামকলাও গৃহীত হইতে পারে। কারণ, চন্দ্রের ন্যায় কামেরও অমাদিনামধারিণী ষোড়শ কলা আছে। প্রসঙ্গতঃ, আচার্য্যগণ ইহাও বলেন যে, প্রতিপদাদি তিথির সহিত তত্তন্নামধারিণী কামকলার অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, তিথিবিশেষে শরীরাভ্যন্তরে কামাবস্থানের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। অষ্টমী প্রভৃতি তিথিবিশেষে ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে কামপ্রসঙ্গের যে নিষেধ দেখিতে পাওয়া যায়, কামাবস্থানের সহিত তাহার বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে।

বাভ্রবীয়াংশ্চ সূত্রার্থা নাগমং সুবিমৃশ্য চ
বাৎস্যায়ন শ্চকাবেদং কামসূত্রং যথাবিধি।
তদেতদ্ ব্রহ্মচর্য্যেণ পরেণ চ সমাধিনা
বিহিতং লোকযাত্রার্থং ন রাগার্থোঽস্য সংস্থিতিঃ।
রক্ষন্ ধর্ম্মার্থকামানাং স্থিতিং স্বাং লোকবর্ত্তিনীম্
অস্য শাস্ত্রস্য তত্ত্বজ্ঞো ভবত্যেব জিতেন্দ্রিয়ঃ।

বাভ্রবীয় সূত্রের অর্থ এবং অন্যান্য শাস্ত্র বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত নিয়মানুসারে বাৎস্যায়ন এই কামশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। লোকযাত্রানির্ব্বাহের জন্য ব্রহ্মচর্য্যা-বলম্বনপূর্ব্বক বিশেষ একাগ্রতার সহিত এই কামশাস্ত্র বিহিত হইয়াছে, বিলাসিতাবর্দ্ধনের জন্য ইহার বিধান হয় নাই। এই শাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ মানব লোকযাত্রানুবর্ত্তিনী অর্থাৎ সমাজের অনুকূল ধর্ম্মার্থকামের স্বকীয় মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া জিতেন্দ্রিয় হয়।

এই গ্রন্থের বিস্তৃত টীকা সত্ত্বেও স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তিবিহীন ব্যক্তির পক্ষে ইহার সম্পূর্ণ মর্ম্মাব-বোধ হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ, টীকাকার সূত্রার্থের বিশদীকরণাভিপ্রায়ে শাস্ত্রান্তরের সিদ্ধান্তিত বাক্যাবলিই অল্পাক্ষরে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তদ্দ্বারা সাধারণ পাঠকের তত সুবিধা হইয়া উঠে না।

প্রসাধনক্রিয়ার উপযোগী যে সমস্ত উপকরণের নাম কামসূত্রের মূলে এবং টীকায় দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে অনেকগুলিই বর্ত্তমান সময়ে অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে; সুতরাং ইহাদের স্বরূপ নির্ণয় করা বড়ই কঠিন বলিয়া মনে হয়। তবে আপাততঃ যাহা একান্তই অপরিচিত বোধ হয়, অভিনিবেশসহকারে শাস্ত্রান্তরের পর্য্যালোচনা সাহায্যে তাহারও স্বরূপ অনেকটা বুঝা যাইতে পারে। পরবর্ত্তিগ্রন্থকারদিগের অসাবধানতার ফলে অনেক পদার্থের অর্থান্তরপর্য্যন্তও ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়, তাহা ক্রমে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

গ্রন্থ-সমালোচনা

"অনুপ্রাস" ও "ককারের অহঙ্কার"—পরিহাসরসপটু শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত "অনুপ্রাস' অলঙ্কার বিষয়ে দুইখানি গ্রন্থ। বহি দুইখানারই বহিরাবরণ বেশ মনোরম। প্রথমখানির দ্বাদশ প্রবন্ধে সর্ব্ববিধ রচনে অনুপ্রাসের প্রভাব, ও দ্বিতীয়টির বিংশ অধ্যায়ে অনুপ্রাসে "ককারের" বিস্তৃতি সরসভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। নিপুণ বাক্‌শিল্পীর লিপিকুশলতায় অলঙ্কারের তীক্ষ্ণ ধার মধুমধুর আস্তরণে ঢাকা পড়িয়াছে। অলঙ্কারে যাঁর সাধ আছে, তিনি ললিতবাবুর গ্রন্থ পড়িয়া নিঃশঙ্কচিত্তে সখ মিটাইয়া লইতে পারেন, "অলঙ্কার" পড়ার এমন অপূর্ব্ব সুযোগ আর ঘটিয়া উঠিবে কিনা তাহা সন্দেহস্থল।

সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজী, প্রভৃতি অনেক ভাষারই এক পুরা যুগের সাহিত্যে "অনুপ্রাস"-অলঙ্কার একটা প্রধান শিল্প-চাতুর্য্য মধ্যে গণ্য হইত, বর্ত্তমান যুগের সাহিত্যে কোথায়ও এই প্রাচুর্য্য আর পরিলক্ষিত হয় না। তবুও, ভাষার স্তরে স্তরে অনুপ্রাসের এখনও কত অধিকার বর্ত্তমান, তাহা ললিতবাবু চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। ফরাসী নাট্যকার মলিয়রের জনৈক নায়ক শিক্ষকের নিকট "গদ্য" শিক্ষার প্রয়াসের পর যেমন হঠাৎ টের পাইয়া বসিলেন যে, তিনি নিজ ক্ষমতায় এতকাল কথোপকথনে "গদ্য" ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন, তেমনি ললিতবাবুর এই রচনা পড়িয়া অনেকেরই মনে হইবে তাঁহারাও অজ্ঞাতসারে আজীবন "অনুপ্রাস" অলঙ্কারের বহুল চর্চ্চায় কত কাল কাটাইয়াছেন।

হংসদূত

৮৩। আইজ থাকুম গল্পেসল্পে,
কাইল্ থাকুম শুইয়া।
পরশু করুম্ নাওয়া ধোয়া,
তার পরদিন যাইমু খাইয়া ॥*

৮৪। সাধে ফোড়াইয়া কান।
এখন সূতা দিস্তে যায় পরাণ ॥

৮৫। লক্ষ্মণ মৈল শক্তিশেলে,
বেউলা হ'ল রাড়ী।
পাছ দুয়ারে পইড়া কান্দে,
কুড়ালের আছারী ॥

মৈল—মরিল।
বেউলা—বেহুলা।
রাড়ী—বিধবা।

৮৬। মশা মারতে গালে চড়।
৮৭। সাদা মনে কাদা নাই।
৮৮। জল দিয়া ভাত মাখ্ছি,
বিড়ালের আর ভয় কি?

৮৯। হাটে কলা নবিগ্যায় নমঃ।

নবিগ্যায় = নৈবিগ্যায়

৯০। নায় আর মায় সমান।

নায়—নৌকায়।

৯১। নিড়াইলেও এক ছড়া,
না নিড়াইলেও এক ছড়া।

৯২। নুন্ আন্তেই পান্তা ফুরায়।
৯৩। কীর্ত্তনের পরে দশা।
৯৪। কামের নামে হরে হরে।
শুইয়া শুইয়া ল্যাজ লাড়ে ॥

৯৫। কেটী কুত্তার ঘেউ ঘেউই সার।

কেটী = খেঁকি।

৯৬। মেড়ার দলে রামছাগলই পণ্ডিত।
৯৭। যেম্নি রাম তেম্নি সীতা।
৯৮। যেই রক্ষক, সেই ভক্ষক।
৯৯। চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী।
১০০। যেখানে ঘা
সেখানে ব্যথা।

১০১। হাজার টাকায় অ
বামন ভিকারী।

১০২। পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে,
ভাঙ্গে হীরার ধার।

১০৩। বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।
১০৪। কেটী কুত্তার যত আইট বাড়ীতে।

আইট—সাহস।

১০৫। বাইরের জামাই "শ্যামবাবু"।
আর ঘর জামাই—"মাধব্যা" ॥

১০৬। অধিকন্তু ন দোষায়।
১০৭। সাপ হইয়া কামড়ায়,
আবার ওঝা হইয়া ঝাড়ে।

১০৮। মরা গাঙের ফোপানী সার।
১০৯। ল্যাংটার আর বাট্পাড়ের ভয় কি?

---

* এক বাড়ীতে এক অতিথি উপস্থিত হইল। গৃহিণী তাহাকে কিছুতেই স্থান দিবে না। অতিথি এই শ্লোকটী বলিল। গৃহিনী দেখিল বড় বেগতিক, শেষে কি সত্যই সত্যই এতদিন উপবাসে কাটাইতে হইবে; কাজেই অতিথিকে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া বিদায় করিল। সকল গোল চুকিয়া গেল।

১১০। গাছে কাঠাল,
গোপে তেল।

১১১। মালা টিপ্‌লেই আর
বৈরাগী হয় না।

১১২। ফলেন পরিচিয়তে।

১১৩। পাপের ধন
পরাচিত্তেই যায়।
পরাচিত্ত—প্রায়শ্চিত্ত।

১১৪। পাপের ধন
হাপে খায়।
হাপে—সাপে।

১১৫। তালপাতার সিপাই।

১১৬। অইচেই বা মাইয়া, মরব ক্যান্? হাইট্।
এই-ইত আমার পাঁচশ টাকার মাইট।
অইচেই—হইয়াছেই।
হাইট—ষাট্।

১১৭। ঘাষের ঘরে
ঘোগের বাসা।

১১৮। বাপের ধন কি
হাপে খায়?
হাপে—সাপে।

১১৯। ওর যেন আর
বাপ মা নাই।

১২০। মশা মাইরা
হাত কালা।

১২১। উড়া খই
গোবিন্দায় নমঃ।

১২২। দেবতা বুইঝা নৈবেদ্য।

১২৩। মিষ্টি কথায় কি
আর চিড়া ভিজে?

১২৪। নানা মুনির
নানা মত।

১২৫। বিষে বিষে অমৃত।

১২৬। বাঘ্যা আহে ঝাপা লইয়া।
লড় দে লো তর পোলা লইয়া।
আহে—আসে।

১২৭। ছাইড়া দে মা
কাইন্দ্যা বাচি।

১২৮। গরুপাল্ লেছ্যান্
গোবধের ভয়।

১২৯। কিন্‌তে পাগল।
বেচ্‌তে ছাগল॥

১৩০। একে ত মধুপকের বাটী,
তাতে আবার কাইৎ।

১৩১। নূতন পীরিতে বড় আঠা।

১৩২। আপনা বইনে ভাত না পায়।
শালীর লইগ্যা মণ্ডা যোগায়॥
লইগ্যা—লাগিয়া, জন্য।
বইন—বহিন, ভগ্নী।

১৩৩। পড়্‌ল কথা সভার মাঝে।
যার কথা তার গায় বাজে॥

১৩৪। গতস্য শোচনা নাস্তি।

১৩৫। দশের লাঠী একের বোঝা।

১৩৬। গরজে লোয়া অ বয়।
অগরজে সোনা অ বয় না॥
বয়—বহে, বহিয়া নেয়।
লোয়া—লোহা।

১৩৭। কামারের ক্যান্ কুমার কাম।

১৩৮। এক গুলিতে
অনেক বাঘ মারা।

১৩৯। বসতে পাইলে
শুইতে চায়।

১৪০। বানরের গলায় মুক্তার মালা।

১৪১। হয় এস্পার
নয় ওস্পার।

১৪২। না, না, নিরী।

১৪৩। খায় না,
শোকে।

১৪৪। আগে তিতা,
পরে মিঠা।

১৪৫। জত্ আন্মান ধারা।

১৪৬। মাগ্না মদ বায়েও খায়।
মাগ্না = বিনামূল্যে

১৪৭। বিনা পয়সায় মথুরা পার।

১৪৮। যেমনের ঘরে
তেমনই হয়।

১৪৯। আগুন খাইলে
কয়লাই হাগে।

১৫০। আউস আছে,
রুচ নাই।
দাড়ী আছে
মোচ নাই॥
আউস—হাউস।

১৫১। যাব ঘা,
তার পোড়া।

১৫২। দাত থাক্‌তে কে
দাতের মর্য্যাদা বোঝে।

১৫৩। রৎ ভাতার, রৎ পুৎ।
রৎ না থাকলে অদ্‌ভুত॥
রৎ—শক্তি ; শারীরিক বল।

১৫৪। যার লাগি বেকি বেড়া।
তারেই দেখি দরবারে খাড়া॥

১৫৫। কথায় চোটে।
খাদের কেউচ্ছা মোড়াইয়া ওঠে॥
কেউচ্ছা = কেঁচো।

১৫৬। পরের মন্দ করে যে।
আপনা মন্দ-তার বান্ধা গাইটে॥

১৫৭। শুভস্য শীঘ্রং।
অশুভস্য কালহরণং।

১৫৮। হেলমছাড়ারে নিয়া গাইতে গেলাম।
হেয়অ না জানে, আমিও পায়রিলাম॥
হেলমছাড়া—কাণ্ডজ্ঞানহীন।
হেয়অ—সেও।
পায়রিলাম—পাসরিলাম।

১৫৯। অবস্থা মত ব্যবস্থা।

১৬০। আত্মবৎ মন্যতে জগৎ।

১৬১। খাইলাম বা না খাইলাম।
মালসা ত একটা ভাঙ্‌লাম॥

১৬২। তেতুলে—'কানি।
বাশে—'কুণী॥

১৬৩। হেই দিয়া হেই-ই অইল।
লাউ দা কদু অইল॥
হেই—সেই।
অইল—হইল।

১৬৪। কচুব নামেই গলা চুলকায়।

১৬৫। যেই-ই ধর্‌ল।
ঐ ঠোয়া পড়্‌ল॥
ঠোয়া—ফোস্কা।

১৬৬। খোদার ঘর
সিধা দেখছ ?

১৬৭। অন্নচিন্তা চমৎকার।

১৬৮। অনুবোধে ঢেকি গিলে।

১৬৯। যত ডরাই।
তত লড়াই॥

১৭০। অমৃতে অরুচি কার।

১৭১। আগে না বুঝ্‌লে বাপু
যৌবনের ভরে।
শেষে কিন্তু কান্‌তে হবে
পবনের ঝড়ে॥
কান্‌তে—কান্দিতে।

১৭২। অইলে খাইমু,—'কাইরা।
নইলে খাইমু,—'মাইরা॥
নইলে সহজেই কি দিমু,—ছাইরা?

১৭৩। যার নাই কাম।
সে খাউক গা আম॥

১৭৪। কড়ি, কৃষ্ণ দুই ভাই।
কড়ি হইলে কৃষ্ণ পাই॥

১৭৫। মৌনং সম্মতি লক্ষণং।

১৭৬। অইচিই বা ভোলার বউ-ই।
তিনকাল গেছে,
আমার বুদ্ধি গেছে কই॥

১৭৭। হনুমানের বস্ত্রহরণ।

১৭৮। ঘর পুইড়া খাইলে,
লাকড়ীর আকাল কি?
আর কর্জ্জ কইরা খাইলেই বা
টাকার আকাল কি?

১৭৯। খাইতে খাইতে—ডাইন।
বাজাইতে বাজাইতে—'বাইন॥
আর গাইতে গাইতে—'গাইন॥

১৮০। কলা খাইতে খাইতে
গলা বাড়ছে।

১৮১। ঘুড়্‌নার চোটে,
চউখে সৌর্ষা ফুল ফোটে।
সৌর্ষা = সরিষা

১৮২। পরেরটা খাইতে
কতই আহ্লাদ।
আপ্‌নাটার বেলায় কিন্তু
পরাণে পড়ে হাত॥

১৮৩। যে হালদারী মাত্‌ব্বরী কইরা খায়।
তার হাল-গরু-বেসাত যায়॥
বেসাত—বিত্ত।

১৮৪। চউক্ থাক্‌তে দিন কানা।

১৮৫। এমন বেয়ুস্ দেখ্‌তে পাই।
খোদা কুলু জ্ঞান নাই॥
বেয়ুস—বেহুশ্।

১৮৬। গায়ের জোরে
চায় পাহাড় উল্টাইতে।

১৮৭। বলে-ছলে-কলে-কৌশলে।
বড় হয় লোক কলিকালে॥

১৮৮। রামাই ঢঙ্গীর
গোছায় গোছায় মাপ।

প্রতিভা

৫ম বর্ষ | ফাল্গুন ১৩২২ | ১১শ সংখ্যা

গৌড়াধিপ তৃতীয় গোপাল *

পালবংশীয় ষোড়শ গৌড়াধিপের নাম গোপাল। তিনি রামপাল-নরপালের পৌত্র ও কুমারপালদেবের পুত্র। তৎপূর্ব্বে গৌড়ে গোপাল-নামধেয় আরও দুইজন নরপতি রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া, কুমারপাল-নন্দন গোপালদেব ইতিহাসে তৃতীয় গোপাল বলিয়া অভিহিত। তাহার রাজ্য-সময়ের ঘটনাবলী জানিতে হইলে, বর্ত্তমান সময়ে ঐতিহাসিকের নিকট তিনটি মাত্র প্রমাণ বিচারের জন্য উপস্থাপিত হইতে পারে;—যথা, (১) রামপাল দেবের অন্যতম পুত্র, গৌড়াধিপ মদনপালদেবের বিজয়রাজ্যের অষ্টম সংবৎসরে সম্পাদিত [দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত মনহলি-গ্রামে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনের সপ্তদশ শ্লোক; (২) মদনপালদেবের সমসাময়িক গৌড়কবি সন্ধ্যাকরনন্দি-বিরচিত "রামচরিতম্-" নামক কাব্যের চতুর্থ পরিচ্ছেদের দ্বাদশ শ্লোক; এবং (৩) রাজসাহী জেলার অন্তর্গত মান্দার নিকটবর্ত্তী (নিমদীঘি-নামক) স্থানে বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির ডাইরেক্‌টার শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি এল্ মহাশয়ের আবিষ্কৃত গোপালদেবের নামাঙ্কিত শিলালিপি। বঙ্গের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকগণ এই প্রমাণত্রয়ের মধ্যে প্রথম দুইটিরই সমধিক আলোচনা করিয়াছেন; কিন্তু তৃতীয়টির সম্যক্ আলোচনা হয় নাই, বরং "শিলালিপিটি ভ্রমপরিপূর্ণ" এবং "ইহার অনুবাদ করা অসম্ভব" (৪) ইত্যাদি রূপ উক্তি দ্বারাই উহা উপেক্ষিত হইয়াছে। গোপালদের নামাঙ্কিত এই শিলালিপিখানির প্রকৃত পাঠ, ইহার কতক সংশোধিত পাঠ, ও তাহার সহিত একটি বিচার কলিকাতা যাদুঘরের [Museum] পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যা-বিনোদ মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়, প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত করিয়া, ইহার প্রতি সর্ব্বপ্রথম শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। শিলালিপিতে উল্লিখিত কয়েকটি বিষয়ের সুমীমাংসা কঠিন মনে করিয়া, বিদ্যাবিনোদ মহাশয় স্বপ্রবন্ধের শেষভাগে পাঠকগণকে, লিপিটির প্রতি দৃষ্টিপাত-পূর্ব্বক, উহাতে উল্লিখিত বিষয়গুলির মীমাংসা করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। শিল্পীর বা লেখকের অজ্ঞতা বশতঃ,

* ঢাকা সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

(১) গৌড়-লেখমালা—১৫২ পৃঃ।

(২) Mem. A.S.B. Vol. III, No. 1, p. 51.

(৩) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা উনবিংশ ভাগ, চতুর্থ-সংখ্যার ১৫৬ পৃষ্ঠার সহিত সংযোজিত প্রতিকৃতি দ্রষ্টব্য।

(৪) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'বাঙ্গালার ইতিহাস' [প্রথম ভাগ] ২৮৪ পৃঃ।

বাস্তবিকই, লিপিটিতে বর্ণাশুদ্ধি, বর্ণত্যাগ, ছন্দোভঙ্গ, ব্যাকরণ-বিষয়ক প্রমাদ-প্রভৃতি নানা প্রকারের দোষ বিদ্যমান থাকিয়া বর্ণিত বিষয়ের অর্থবোধে বাধা উৎপাদন করে, সন্দেহ নাই। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় লিপিটির "আংশিক সংশোধিত পাঠও" স্বপ্রবন্ধে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। সমগ্র লিপিটির সংশোধিত পাঠ দেওয়া সম্ভব-পর হয় কি না, এবং সেই পাঠ যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইলে—এই শিলালিপি হইতে তৃতীয় গোপালদেবের বা তদীয় রাজ্যসময়ের কোন ঐতিহাসিক তথ্য, উপরি-উল্লিখিত অপর দুইটি প্রমাণের সাহায্যে, অবগত হওয়া যায় কি না, সেই জন্য আমরা পুনরায় মান্দায় আবিষ্কৃত শিলালিপিটির একটি মূলানুগত পাঠ যোজনা করিয়া, তাহার সহিত যথা-সম্ভব সমগ্র লিপিটির একটি বিশুদ্ধপাঠও সুধীসমাজের গোচরীভূত করিবার চেষ্টা করিতেছি।

যে স্থানে লিপিটি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল, তাহার সন্নিহিত স্থান নিমদীঘি-নামে পরিচিত। বিগত বঙ্গাব্দের চৈত্রমাসে, বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায়, এম্, এ, মহাশয়, মান্দার নিকটবর্ত্তী এই নিমদীঘি অঞ্চল হইতে বহু প্রাচীন মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া, সমিতির প্রতিমা-গৃহের সৌষ্ঠব বর্দ্ধিত করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে বলিয়াছেন যে এই অঞ্চলে প্রাচীন কীর্ত্তির বহু নিদর্শন অদ্যাপি পরিদৃষ্ট হয়,—এক সময়ে যে এই অঞ্চলে রাজা মহারাজ বাস করিতেন, স্থানীয় লোকের মধ্যে এরূপ প্রবাদও আজ পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে।

সমগ্র লিপিটি একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণের শিলা-ফলকে সুন্দর-ভাবে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। লিপিতে নানা প্রকারের অশুদ্ধি থাকিলেও শিল্পীর উৎকীরণ-কার্য্য বড় দূষনীয় বলিয়া অভিযোগ করা যায় না। ফলকটি দেখিলে মনে হয়, ইহা কোন মন্দিরের প্রাচীরে প্রোথিত ছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সর্ব্বপ্রথম বিদ্যাবিনোদ মহাশয় লিপিটির পাঠোদ্ধার করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ মহাশয়ও তাঁহার অচির-প্রকাশিত "বঙ্গের পালরাজগণ"—শীর্ষক ইংরেজী প্রবন্ধে (৫), একটি পাঠ সংযোজিত করিয়াছেন। এই উভয় পাঠ মূলানুগত হইয়াছে বলিয়া প্রতিভাত হয় না। ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে অনেকাংশে বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের সহিত আমরা একমত হইলেও, আবার অনেকাংশে ভিন্ন-মত হইতে বাধ্য হইব। শ্রীযুক্ত রাখালবাবু, কিন্তু, লিপিটিকে "untranslatable" ["অনুবাদের অতীত"] বলিয়াই একরূপ উপেক্ষা করিয়াছেন। পাল-যুগের ইতিহাসের উপাদানগুলি অধিকাংশই সংস্কৃত-ভাষায় রচিত তাম্রলিপি বা পাষাণ-লিপি হইতে সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। মধ্যযুগের গৌড়-কবিগণ অলঙ্কারের আবরণের ভিতর দিয়া সুকৌশলে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে ইঙ্গিতে অনেক পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। কাজেই ঐতিহাসিকের পক্ষে এই জাতীয় উপাদানগুলির বিশ্লেষণ-পূর্ব্বক মর্ম্মোদ্‌ঘাটনই প্রধান করণীয়। এমতাবস্থায়, শ্রীযুক্ত রাখাল বাবুর পক্ষে, লিপিটির বিদ্যাবিনোদ-মহাশয়-কৃত ব্যাখ্যা ও আলোচনার পুনরালোচনা করাই যুক্তিসঙ্গত ছিল। লিপিটির অনুবাদ বা তাহার মর্ম্মার্থ লইয়া আলোচনা না করিলেও, শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু ইহাতে আটটি ব্যক্তি-বিশেষের নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার ইংরেজী প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু, তিনি যাহাকে "দামশূর" নামক ব্যক্তি মনে করিয়াছেন এবং যাহাকে, বাঙ্গালায় শূর-বংশ-নামক এক রাজবংশের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে গিয়া, দৃষ্টান্ত-রূপে উল্লিখিত করিয়াছেন (৬)—তাহা কিন্তু 'দামশূর" বলিয়া প্রতিভাত হয় না। শব্দটিকে "দান শূর" [শ্রেষ্ঠদাতা] বলিয়াই বোধ হয়—'ন' এর বিন্দুটিকে সম্পূর্ণ ভাবে গোলাকৃতি করিতে শিল্পী ভুলিয়া গিয়া থাকিবেন। শব্দটি লিপিতে উল্লিখিত "ভাবকদাস" নামক ব্যক্তির বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। তাঁহার মতে অপর একটি ব্যক্তির নাম

(৫) Mem. A.S.B.—Vol. V, No. 3, p. 102.

(৬) "বাঙ্গালার ইতিহাস" প্রথম ভাগ—পরিশিষ্ট (গ)—২৩৮ পৃঃ।

"সাম্ভাবকদাস"৺—কিন্তু,যাহা "শ্রীমান্‌ভাবক-দাস"-রূপেণ উৎকীর্ণ হওয়া উচিত ছিল—তাহাই "শ্রীমাম্ভাবকদাস" রূপে উৎকীর্ণ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

লিপিটি ১১ পংক্তিতে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে সংস্কৃত-ভাষায় নানাচ্ছন্দে বিরচিত পাঁচটি শ্লোক নিবদ্ধ আছে। লিপি-শেষে কেবল 'রাতোকেন লিখিতম্'—এই অংশটুকু গদ্যে রচিত। গৌড়েশ্বর মদনপালদেবের মনহলি-লিপির ও বিজয়সেনদেবের দেবপাড়া-লিপির অক্ষরের সহিত আলোচ্য লিপির অক্ষরের তুলনা করিলে, ইহাকে দ্বাদশ-শতাব্দীর প্রথমভাগের লিপি বলিয়া নির্দ্ধারিত করা যাইতে পারে। লিপিটিতে কোনও সন-তারিখের উল্লেখ নাই।

অতঃপর, প্রথমতঃ আমরা একটি মূলানুগত পাঠ প্রদান করিয়া, সমগ্র লিপিটির একটি সংশোধিত পাঠ শ্লোকাকারে নিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়া, একটি সটীক বঙ্গানুবাদ প্রদান করিব। সর্ব্বশেষে লিপি হইতে প্রাপ্ত বিবরণ হইতে কি কি ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যাইতে পারে, সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

মূলানুগত পাঠ

১। (১) ওঁ (২) স্বর-সরি ত্তরুবীচাঃ (চী)-সীকরৌ (রৈঃ) কুন্দ-গৌরো (রৈ) র্বিরচিত পরভাগো বাল-চ-

২। ন্দ্রাবতন্স (তং সঃ) [।*] দিশতু সি (শি) বমজস্রাং (জস্রং) শম্ভু (ম্ভু)-কোটীর-ভার (রঃ) কলম-কণিস (শ)-রোচি-

৩। র্ম্মঞ্জং (ঞ্জ) রী-পিঞ্জং ঞ্জ) রীহ্নু (রোবঃ) (৩) ॥ [১*] (৪) শ্রীমদ্গোপাল-দেব-স্ত্রিদী (দি) বমুপরা(গ)তঃ স্বে পু(চ্ছ)-

৪। রা ত্যক্ত-কাস (র) স্তস্যাহং পাদধূলি (লিঃ) প্রং (প্র)ণিত ইতি মি (নি) জং নাঃ। (৫)বৃক্কানস্থীত (? [।*]প্রে(প)-

৫। ত্রাজ্ঞা-[স*]-প্রতিজ্ঞো নিসি (শি) ত-স (শ) র-শবৈ (বৈঃ) পূরসেন- (৬)-সক্রসাষ্ঠৌ (-নেন কৃষ্টঃ) নিম্ন (ম্ন?) জা-দল্লি (পল্লি) রা-

৬। জস্তি (ত্রি) দশ—পুরমগা দৈড়দেবঃ কৃতজ্ঞঃ ॥ [২*] (৭) স্বতস্বতো (তস্ততঃ স্বম) বধূয় সঙ্গরাৎ প্রাপ্য

৭। চন্দ্র-কিরণামল (লং) যশঃ [। *] ক্রীড়তি ত্ (ত্রি) দশ-সুন্দরী-দৃসো (শা) দেব এব শুভদেব-নন্দ ৺

৮। নং (নঃ) ॥ [৩ *] (৯) অথ (থ) তদনুগ-গীত-বিলাসঃ ধর্ম্ম(র্ম্মা)ধ্বরমস্ত ২সার-গণবাসঃ[।*] (১০) দান-শূরস (স) স (সু)

৯। মংবা (সমা) হিত-বেশঃ স য (জ) য়তি শ্রীমাম্ভা (মান্‌ভা) বক-দাসঃ [॥৪*] (১১)দগ্ধা যত্র-মডস্থ (দোদ্ধ) তাঃ শর-শ

১০। ল্যেন(১২)পূরিতা(তাঃ)[।*]য(ত) ত্র ভাবক-দাসেনং (ন) কৃতা কীর্ত্তি (১৩) ব্বি (র্ব্বি) রাজতেঃ (তে) ॥ [৫ *) রাতোকেন লি

১১। খিতব্য (ম্) [। *]

৺ 'ন' এর নীচে 'ভ' সংযুক্ত।

(১) সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা সূচিত।

(২) মালিনী।

(৩) শ্রীযুক্ত রাখালবাবু "পিঞ্জরীযু" পাঠ করিয়াছেন।

(৪) স্রগ্ধরা।

(৫) এইস্থানে উৎকীর্ণ বিসর্গ-চিহ্নটি ও ছেদ (দাঁড়ি)-চিহ্নটির স্থানে একটি বর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। "থ-কার" হওয়ার সম্ভাবনা ছিল কি? "নাথবন্ধাম যাতুম্" এইরূপ পাঠ ধরা যাইতে পারে কি?

(৬) এই শ্লোকের তৃতীয় চরণের তৃতীয়াংশে একটি অক্ষর বেশী উৎকীর্ণ হইয়াছে কিন্তু সেই চরণেরই প্রথমাংশে একটি "স" পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়াও বোধ হয়।

(৭) রথোদ্ধতা।

(৮) উপজাতি।

(৯) "মন্থর" পাঠও সংযোজিত হইতে পারে। "নম্বরি" পাঠ হইলে অর্থসঙ্গতি উত্তম হয়।

(১০) 'ন'-র পুটলিটিতে শিল্পী একটি স্থান সংযোজিত করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন।

(১১) অনুষ্টুভ্‌।

সংশোধিত পাঠ

স্বর-সরিদ্বহুলবীচী-সীকরৈঃ কুন্দ-গৌরৈ
বিরচিত-পরভাগো বাল-চন্দ্রাবতংসঃ।
দিশতু শিবমজস্রং শম্ভু-কোটীর-ভারঃ
কলম-কণিশ-বোচি র্মঞ্জরী-পিঞ্জরো বঃ ॥ ১ ॥

শ্রীমদ্‌গোপালদেব স্ত্রিদিবমুপগতঃ স্বেচ্ছয়া ত্যক্তকায়-
স্তস্যাহং পাদধূলিঃ প্রথিত ইতি নিজং নাথবদ্ধামগন্তুম্ (?)
পিত্রাজ্ঞা-সপ্রতিজ্ঞো নিশিত-শর-শতৈঃ পুরসেনেন কৃষ্টো
নিম্বজা-পল্লি-বাজস(?) ত্রিদশপুরমগাদৈড়দেবঃ কৃতজ্ঞঃ ॥ ২ ॥

তত্বতঃ স্বমবধূয় সঙ্গরাৎ
প্রাপ্য চন্দ্র-কিবণামলং যশঃ।
ক্রীড়তি ত্রিদশ-সুন্দরী-দৃশা।
দেবএব শুভ দেব-নন্দনঃ ॥৩॥

অথ তদনুগ-গীত-বিলাসঃ
ধর্ম্মাধ্বর-মস্করি-গলবাসঃ।
দান-শূরঃ সুসমাহিত বেশঃ
স জয়তি শ্রীমান্ ভাবকদাসঃ॥ ৪ ॥

যত্রা যত্র মদোদ্ধতাঃ শবশল্যেন পূরিতাঃ।
তত্র ভাবকদাসেন কৃতা কীর্ত্তির্বিরাজতে ॥ ৫ ॥

বাতোকেন লিখিতম ॥

বঙ্গানুবাদ।

ওঁ ॥

(১)

সুর-নদীর [গঙ্গার] বিপুল-তরঙ্গ-সম্ভূত কুন্দ-শুভ্র জলকণায় যাহার শ্রেষ্ঠাংশ সুশোভিত, বালচন্দ্রকলা যাহার ভূষণ, কলম-কণিশের প্রভার ন্যায় যাহার প্রভা, পুষ্প-মঞ্জরীর ন্যায় যাহা পিঞ্জর-বর্ণ—শম্ভুর সেই কোটীর-[জটা]-ভার আপনাদের অজস্র মঙ্গল বিধান করুক।

(২)

স্বেচ্ছায় কায়-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শ্রীমান গোপালদেব স্বর্গ-লাভ করিয়াছেন। "আমি তাঁহারই পাদ-ধূলি বলিয়া প্রথিত" —সুতরাং, প্রভুর ন্যায় নিজ ধামে যাইতে ইচ্ছা করিয়া,—পিত্রাজ্ঞায় প্রতিজ্ঞারূঢ়, কৃতজ্ঞ, নিম্বজাপল্লিরাজ (?) (১) ঐড়দেব তীক্ষ্ণ-শর-শত দ্বারা পুরসেন-কর্ত্তৃক বিদ্ধ হইয়া দেবপুরে গমন করিয়াছিলেন।

(৩)

বাস্তবিকই নিজকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সরাইয়া লইয়া, চন্দ্র-কিরণ-নির্ম্মল [শুভ্র] যশঃ প্রাপ্ত হইয়া, শুভদেব-পুত্র [ঐড়দেব] দেবভাবাপন্ন হইযাই (২) স্বর্গ-রমণীগণের দৃক্‌পাত লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন।

(৪)

অনন্তর, তদীয় অনুচর-কর্ত্তৃক গীত-বিলাস, ধর্ম্মযজ্ঞের জন্য ভিক্ষুব্রতধারী (৩) ধৃতগলবস্ত্র, দান-শৌণ্ড, সুসমাহিত-বেশ, শ্রীমান্ ভাবক-দাস জয়যুক্ত হউন।

(৫)

যেস্থানে শর শল্যে বিদ্ধ হইয়া মদোদ্ধত [বীরগণ] দগ্ধ হইয়াছিলেন— সেইস্থানে ভাবকদাস এই কীর্ত্তি[মন্দির] করাইয়া দিয়াছিলেন।

বাতোক কর্ত্তৃক [এই লিপি] লিখিত হইয়াছিল।

---

(১) এই শ্লোকের দ্বিতীয় চরণের শেষাংশের ও তৃতীয়ের প্রথমাংশের পাঠ একবারে সংশয়-শূন্য মনে করি নাই। যেস্থানে প্রস্তর-ফলকখানি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল তাহার সন্নিকটবর্ত্তী স্থানটি 'নিম্ব'-শব্দ-যুক্ত,—"নিমদীঘি"। ঐড়দেব হয়ত সেই স্থানেরই কোন সামন্তরাজরূপে [অথবা, গোপাল-দেবের রাজোপাধিক কোন অমাত্যাদিরূপে] বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া অনুমিত হইতে পারে।

(২) যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ-বিয়োগ ঘটিলে, যোদ্ধার স্বর্গলাভ হয় শাস্ত্রে এরূপ প্রসিদ্ধি আছে।

(৩) "ভিক্ষুঃ পরিব্রাট্ কর্ম্মন্দী পারাশর্য্যপি মস্করী"—ইত্যমরঃ।

---

(১২) শ্রীযুক্ত রাখাল বাবুর "সন্ধান" পাঠ ভ্রমাত্মক।

(১৩) শ্রীযুক্ত রাখালবাবুর "কীর্দ্যা" পাঠও শুদ্ধ নহে।

লিপির মর্ম্ম হইতে যে ঐতিহাসিক তথ্য সংগৃহীত হইতে পারে তাহা এই যে, গোপালদেব স্বেচ্ছায় তনুত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করিলে পর, রাজোপাধিধারী, তাঁহারই স্বপক্ষীয় ঐড়দেব নামক ব্যক্তি, গৌড়েশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতঃ, তাঁহার পরলোক- প্রাপ্তির পরও, গৌড়েশ্বরের পুরসেন-নামক শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে যাইয়া রণক্ষেত্রে প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই ঐড়দেবের পিতার নাম শুভদেব ;—তিনি পুত্রকে, মহারাজাধিরাজের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তদীয় শত্রুর প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন—লিপিমর্ম্ম হইতে তাহারও আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে রণক্ষেত্রে ঐড়দেব প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন—সেখানে তাঁহারই অনুচর ভাবকদাস-নামক এক দানশূর ব্যক্তি—ঐড়দেবের স্মরণার্থ একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। প্রথম শ্লোকের মর্ম্ম হইতে "কীর্ত্তি"কারী ভাবকদাস যে শম্ভু-পাদ-পরায়ণ ছিলেন তাহা অবগত হওয়া যায়। হয়ত, রণক্ষেত্রে উত্থাপিত মন্দিরটিও মহাদেবেরই মন্দির ছিল।

বিদ্যা-বিনোদ মহাশয় দ্বিতীয় শ্লোকের "ইতি"-শব্দের পরে "মিজ্‌ (?)" পাঠ করিয়া—তাঁহাকে গোপালদেবের স্বপক্ষীয় ব্যক্তিবিশেষ মনে করিয়া, ঐড়দেবকে গোপালদেবের পরম শত্রু বলিয়া ধার্য্য করিয়া লইয়াছেন। তিনি এই কল্পিত মিজ্‌ (?) কে "ঐড়দেবের নিধন-কর্ত্তা" বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। এরূপ কল্পনার বশবর্ত্তী হওয়ায় তিনি স্বপ্রবন্ধের শেষাংশে, সংশয়-সহকারে ঐড়দেবকে "কৃতজ্ঞ"-বিশেষণে বিশেষিত বলিয়া গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে "কৃতঘ্নঃ" পাঠ করিবার ইঙ্গিত করিয়াছেন। কিন্তু, আমরা ঐড়দেবকে গোপালদেবের আত্মপক্ষীয় কোন রাজা মনে করিয়া, দ্বিতীয় শ্লোকের তৃতীয় চরণে উল্লিখিত পুরসেনকে তাঁহার শত্রু মনে করিতেছি। গোপালদেবের এই শত্রুকে বিনাশ করিতে যাইয়াই কৃতজ্ঞ "ঐড়দেব" যুদ্ধ-ক্ষেত্রে প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছিলেন। অতএব, পুরসেন ঐড়দেবের "নিধন-কর্ত্তা" ছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

এ স্থলে আরও একটি প্রয়োজনীয় কথার আলোচনা আবশ্যক। দ্বিতীয় শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে যে গোপালদেব ["স্বেচ্ছয়া ত্যক্তকায়ঃ"] স্বেচ্ছায় তনুত্যাগ করিয়াছিলেন। এই বর্ণনার সহিত বিদ্যাবিনোদ মহাশয় "রাম-চরিতের" উপরি-উক্ত শ্লোকের অর্থের সামঞ্জস্য বিধান করিতে যাইয়া মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অমীমাংসার প্রধান কারণ—বিদ্যাবিনোদ মহাশয় "রামচরিতের" সেই শ্লোকে গোপালদেবের "গুপ্তহত্যা রূপ দুরদৃষ্টের" বর্ণনা উপলব্ধি করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাখালবাবুও স্বপ্রণীত ইতিহাসে (১) এইরূপ অনুমানেরই আশ্রয় লইয়া লিখিয়াছেন—"তৃতীয় গোপালদেব বোধ হয় অতি অল্পকাল সিংহাসনে আসীন ছিলেন, এবং শৈশবেই গুপ্তঘাতকের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" তিনি আরও লিখিয়াছেন যে,"মদনপালদেব বোধ হয় শিশু ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করিয়া সিংহাসনের পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন।" এরূপ হওয়া সম্ভবপর মনে হয় যে, গোপালদেব বেশীদিন "উর্ব্বীভুক্‌" থাকিতে পারেন নাই। অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়াই ইহার কারণ। "ধাত্রী-পালনে" [পৃথিবী রক্ষাকার্য্যে] তাঁহার "মহিমা জৃম্ভমান" [প্রকাশমান] হইতে আরম্ভ হইবার পরই,—তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। তৎপর তাঁহার "অচরম-তাত" [খুল্লতাত] মদনপালদেব সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। মনহলি-লিপি হইতে এই বৃত্তান্তমাত্র অবগত হওয়া যায়। কিন্তু, মদনপালদেব "শিশু ভ্রাতুষ্পুত্র" গোপালদেবের গুপ্ত-হত্যা সাধন করাইয়া সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমানের বিষয় কিছুই সেই তাম্রশাসনের কোন স্থানে উল্লিখিত নাই। এই কল্পনার উদ্ভব-ক্ষেত্র "রামচরিতের" সেই শ্লোক। শ্লোকটি এই—যথা,

"অপি শত্রুঘ্নো পাম্রাঙ্গ (গো)পালঃ স্বর্জগাম তৎসূনুঃ।
হন্তু [:*] কুম্ভীনস্যান্তনয়স্তৈতস্য সাময়িকমেতৎ॥"

ইহার পূর্ব্বশ্লোকে সন্ধ্যাকর-নন্দী ভরতের ["তনুত্যাগাৎ"] স্বর্গ-গমনের কথা বর্ণনা করিয়া, এই শ্লোকে তাহার ভ্রাতা ["তৎসূনুঃ"] পৃথ্বীপতি অর্থাৎ মথুরাধিপ ["গো-পাল"]

(১) "বাঙ্গালার ইতিহাস"—[প্রথমভাগ] ২৮৩ পৃষ্ঠা

শত্রুঘ্নও যে ["অপায়াৎ"] দেহ-ত্যাগ বশতঃ স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। লবণাসুরের ["কুম্ভীনস্যাস্তনয়স্য"] হনন-কারী এই মহাপুরুষের [শত্রুঘ্নের] এই স্বর্গারোহণ ব্যাপারটি "সাময়িক" অর্থাৎ রামরূপ বা প্রতিজ্ঞানুযায়ীই হইয়াছিল। রামায়ণেও বর্ণিত আছে যে শত্রুঘ্ন রামানুসরণে "কৃত-নিশ্চয়" হইয়া রামকে তাহা বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন, যথা (১)

"কৃত্বাভিষেকং সুতয়োর্দ্বয়ো রাঘব-নন্দন।
তবানুগমনে রাজন্ বিদ্ধিমাং কৃত-নিশ্চয়ম্॥"

তৃতীয় গোপালদেবের পক্ষে, "রামচরিতের" উপরি-উদ্ধৃত শ্লোকের শ্লিষ্টার্থ এইরূপ হইতে পারে যে "শত্রুঘ্ন" (শত্রুহনন-কারী) কুমারপাল-নন্দন গোপাল ("অপায়াৎ) অসম-সাহসিক কার্য্য করিয়া, "বিপদে" পড়িয়াই স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। "কুম্ভীনসী-তনয়ের" ("সর্পের" (?)) বধ-বিধান-কারী গোপালের মৃত্যুও ("সাময়িক") প্রাপ্ত-কালেই সংঘটিত হইয়াছে। এই সাময়িক শব্দটি 'সময়স্তদস্য প্রাপ্তম্' ৫।১।১০৪, পাণিনির এই সূত্রানুসারে ঠক্‌প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন বলিয়া ধরিতে হইবে। তবে কি তিনি "সর্পাঘাতে" প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছিলেন? এবং সেইজন্য, ইহাকে বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট ব্যাপার মনে করিয়াই কি রাজকবি রাজার মৃত্যুকে "সাময়িকম্" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন? আলোচ্য শিলা-লিপিতে উল্লিখিত "স্বেচ্ছয়া ত্যক্তকায়ঃ"—বিশেষণও কি সেই ঘটনার স্মরণেই ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে? গোপালদেবের সময়ে কি বিজয়সেন বরেন্দ্রীর দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে রাজ্য প্রতিষ্ঠায় এতটা অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন? "পূরসেন" কি বিজয়সেনের স্বপক্ষীয় কেহ হইয়া থাকিবেন?—ইত্যাদি নানা-বিষয়ক প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে। শ্রদ্ধেয় মৈত্রেয় মহাশয় তাঁহার কলিকাতা-বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শেষ বক্তৃতায় এই বিষয়গুলি বিশদ-ভাবে ব্যাখ্যা করিবেন বলিয়া আশা আছে।

শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক।

(১) রামায়ণ—উত্তরকাণ্ড, ১২১ অধ্যায়—১৪ শ্লোক।

পুরাতন গান

(১)

বসন্তবাহার—আড়াঠেকা।

ওলো দেবকি, (তাম) তোরে গোপাল দিব কি,
তুমি আমি ডেঁড়ে থাকি, (গোপাল) কারে মা বলে দেখি।

স্তন-দুগ্ধ দেও না মুখে, দেখি কেমন মা?
নইলে আমি দেই গো মুখে, দেখ মা কি না?
যার ছেলে তার কাছে যাবে, নেচে নেচে ননী খাবে,
ধূলো ঝে'ড়ে কোলে নেবে সবার সম্মুখী।

যজ্ঞসূত্র দিয়ে গোপাল করেছ ব্রাহ্মণ,
তায় না শুন না ব্রজে নন্দেরি নন্দন।
যাহারা জানে না সূত্র, তারা বলে পোষ্যপুত্র,
এতো কেবল কথা মাত্র,—সকলি ফাঁকি।

(২)

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

(আমায়) লিখিতে শিখিতে দিলে কৈ?
(আমি) জন্মাবধি নিরবধি জানি না সে রাধা বই!

সকল জাতের হাতে খড়ি, গোপজাতের হাতে নড়ি, (পাচনবাড়ি)
ফিরি ব্রজের বাড়ী বাড়ী,—চুরি ক'রে খাই দই;
শোন বৃন্দে গুরুমশায়, যে বিদ্যা দিয়েছ আশয়,
সে বিদ্যারই আশাব আশায় অন্য বিদ্যা জল সই!

জানি না কো লেখাপড়া, কেবল জানি চরণ ধরা,
শিখায়েছ পায় ধরা,—দায়পড়া দশা ঐ;
জানি না কলম খত, মাত্র জানি দাসখত,
স্বহস্তেরি দস্তখত,—খাতাখাতক হয়ে রই।

(৩)

মিশ্রবিভাস—একতালা।

কমলিনী রাই, একি শুনতে পাই,
মান ক'রে গেছে সে নাগর কানাই।

এ কি দুর্জ্জয় মান, না হয় সমাধান,
শুনে কাঁদে প্রাণ,—লাজে মরে যাই!

যার মানে মানী, ছিলেম গৌরবিণী,
তার মানে মানী হলেন চিন্তামণি;
আমরা সব গোপিনী হয়েছি দুখিনী,
শ্যামসোহাগিনি, কুঞ্জ ছেড়ে যাই!

(৪)

কালাংড়া—যদ্।

কত কেঁদে মরবি লো সই, শ্যাম অনুরাগে?
ভেবেছিলি যাবে দিন সোহাগে সোহাগে।

নবজলধররূপ যার মনেতে জাগে,
শ্যাম নয় কদম্বমূলে, তার হিয়ার মাঝে জাগে।

(৫)

বেহাগ—আড়াঠেকা।

কপট লম্পট শঠ নটবর নাগর,
শশধররূপ জিনি ব্রজেতে রাই কমলিনী,
(তারে) জিনেছেন কুবুজা যিনি, (তুমি) অধীন হয়েছ তার।

কুঁজেতে হয়েছে বোঝা, এই কি বন্ধুর সেই কুবুজা,
কি গুণ ইহার যায় না বুঝা, বুঝেছ কি অলঙ্কার!

(৬)

ঝংলাট্—একতালা।

বন্ধু, আর কি সে দিন তোমার আছে হে,
আর কি সে দিন তোমার আছে?
দুর্জ্জয় মানে প'ড়ে রাধার চরণ ধরে'
অঝোরে নয়নে ধারা বয়েছে!

বৃন্দাবনে ছিল ধরা'চূড়া সাজ,
এখনে হয়েছ রাজ অধিরাজ;
আহা মরি মরি কি রূপমাধুরি,
কুব্জা নারী বামে আলো ক'রেছে!

সংগ্রহকারক
শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত।

কবি মুক্তারাম নাগের দুর্গাপুরাণ *

পূর্ব্ব ময়মনসিংহের প্রাচীন কবিগণের মধ্যে মাধবাচার্য্য, নারায়ণদেব, কবি কৃষ্ণদাস, দ্বিজ বংশীদাস ও নাগ মুক্তারাম ও আর কয়েক জনের পরিচয় পাইয়া আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। আরও যে কত কবি আমাদের অক্ষম উপেক্ষার দৃষ্টিতলে অন্তর্হিত হইয়াছেন, কে তাহার সংখ্যা করিবে? এই সেদিন শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে ময়মনসিংহের প্রাচীন মহিলা-কবি চন্দ্রাবতীকে পাষাণী অহল্যার মত দুর্গম অরণ্যের মধ্য হইতে মুক্ত করিয়া আনিয়াছেন।

আমরা আজ যে কবিকে লইয়া সাহিত্যিক মণ্ডলীতে উপস্থিত হইতেছি, তিনি দেড় শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। এখানে তিনি নিতান্ত অপরিচিত হইলেও, মায়মনসিংহ এবং ঢাকা জিলার উত্তর ও পূর্ব্বভাগে তিনি সুপরিচিত। ইনি বিখ্যাত দুর্গাপুরাণ-রচয়িতা মুক্তারাম নাগ।

---

* ঢাকা-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

মুক্তারাম আপন গ্রন্থে নিজ পরিচয় দিয়াছেন—

"বিদ্যানন্দ নাগ আইল ছাড়ি রাঢ় দেশ
ধন লইয়া বঙ্গদেশে করিল প্রবেশ।
শ্রীধর ব্রাহ্মণ সঙ্গে কুল পুরোহিত,
বিনোদ বাইরে আর স্বরূপ নাপিত।
বার্ত্তা পাইয়া সঙ্গে আইল জগন্নাথ ধুবি।
ভুঁইমালী নিতাই আইল মনে মনে ভাবি॥
লৌহিত্যের পূর্ব্বভাগে নদী দুরান্তর-
গহন অরণ্য কাটি কৈলা বাড়ী ঘর॥
কতদিন পরে আইলেন শ্রীকান্ত দ্বিজ
গ্রামের উত্তরে আসি মিরাশ কৈলেন নিজ॥
বলবিদ্যাবিশারদ রহিলেন সম্পাশে।
কাশীরাম চক্রবর্ত্তী আছেন সেই বংশে॥
এইমতে আসিলেন নাগ বিদ্যানন্দ।
বঙ্গদেশে রহিলেন করিয়া সম্বন্ধ॥
দিনে দিনে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য আইয়া
মহন্ত লোক বৈসে—গ্রামের নাম মুমুরদিয়া॥
বাসুদেবে করিল কৃপা তান শুভ দশা,
হাজরাদীর মধ্যে কৈলাইন কুড়ি পাইর হিস্‌সা।
পুত্রের ঘরে নাতি হইল দিনে দিনে রঙ্গ।
শিষ্ট লোকে সঙ্গে রইল দুষ্টে দিল ভঙ্গ॥
তিনি আদি সপ্ত পুরুষে স্বর্গ পাইল
অতি বিচক্ষণ লোক সেই বংশে হইল।
রামনারায়ণ নাগ বুদ্ধি বিদ্যাজ্ঞাতা।
পাইল পরম বেদ কণ্ঠেতে গীতা॥
নানাশাস্ত্র বিচার করিলা অতিশয়।
নাগ মুক্তারামে ভণে তাঁহার তনয়॥
পরাশর গোত্র—মঙ্গলকূট গাঁই।
ভবানী ভরসা বিনে অন্য লক্ষ্য নাই॥

মুক্তারাম নাগ ১১৮০ সনের ১০ই আশ্বিন শুক্রবার বেলা দুই প্রহরের সময় নিজ বাটীতে বসিয়া এই গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন। ইঁহার ৯ম পুরুষ ঊর্দ্ধতন বিদ্যানন্দ নাগ। সেকালের দীর্ঘজীবী ব্যক্তিগণের ৩ পুরুষে এক শতাব্দী ধরিলে বিদ্যানন্দ নাগ মুক্তারামের ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে মুমুরদিয়া গ্রামে আগমন করেন।

মুক্তারাম নাগের পূর্ব্ববর্ত্তী কেহ মুমুরদিয়ার তদানীন্তন ভূম্যধিকারী মহাশয়গণের উৎপীড়নে বাস্তুভিটি ত্যাগ করিয়া দুই মাইল উত্তরে যাইয়া গৃহাদি নির্ম্মাণ করেন। ঐ গ্রাম এখনও "নাগের গাঁও" নামে পরিচিত। উহারা অবশেষে পুনরায় মুমুরদিয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

প্রথম বয়সে মুক্তারাম চাকুরী করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। মধ্যবয়সে ধর্ম্মের আকর্ষণে চাকুরী পরিত্যাগ করতঃ ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ করেন। এইখানেই দুর্গাপুরাণের বীজ অঙ্কুরিত হইল। এই গ্রন্থ সমাপ্ত করিতে মুক্তারামের আটমাস মাত্র সময় লাগিয়াছিল। এত বড় একখানি পুঁথি কল্পনাবলে রচনা করিতে আটমাস সময় খুব বেশী মনে হয় না। কবি লিখিয়াছেন—

"শিবের আজ্ঞায় কৈলাম আষ্ট মাস শ্রম।
জীবন জঞ্জালে কত হৈল মন ভ্রম।"

জীবনসংগ্রামে কবির কার্য্যের প্রতিবন্ধকতা হওয়ার ইঙ্গিত অত্যন্ত সুস্পষ্ট। চিরদিনই কবিগণ দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে "জঞ্জালগ্রস্ত"। বাস্তবিকই—

"যে জন সেবিবে ও পদ যুগল, সেই সে দরিদ্র হবে।"

কবি তাহার গ্রন্থখানি রামশরণ নন্দীকে উৎসর্গ করিয়াছেন। এই উৎসর্গের সহিত দৈন্যের কোনও সম্বন্ধ ছিল কি না কে জানে? তিনি লিখিয়াছেন—

"স্ব অক্ষরে লিখি দিল করিতে প্রচার
রামশরণ নন্দীর এই পুস্তকে অধিকার।"

দুর্গাপুরাণের আরম্ভ অতীব সুন্দর। প্রথমেই কবি—

নমো গণেশায়। শ্রীশ্রীদুর্গাচরণের জয়। অথ শ্রীদুর্গা-পুরাণ পাঁচালী লিখ্যতে। শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

সৃষ্টি স্থিতি জগন্মাতা, চন্দ্রকান্ত কান্তি তথা।
পূজিতা শ্রীরামরাজা, বন্দে দেবী দশভুজা॥
আদ্যে আদ্যা সনাতনী, চণ্ডমুণ্ড পাষণ্ড মহিষাসুরমর্দ্দিনী।

শঙ্খচক্রশূল হস্তে, জয় দেবী নমস্তুতে ॥
মল্লার মালবশ্চৈব, শ্রীরাগ বসন্ত স্তথা
হিন্দুল কর্ণাট শ্চৈব, বন্দে ষড়রাগাস্থিতা ॥
কেদার সারঙ্গ শ্চৈব, পিঞ্জরা পটমঞ্জরী,
মালসী ধানসী বন্দো সিন্ধুরী তুরী রবারী ॥
নিদাঘ মুলতাঞ্চৈব ভূপাল গান্ধার তথা।
গয়রা বেগরা আদি বন্দো সে রাগিণী তথা ॥

কবি জগন্মাতাকে বন্দনা করিয়া বাঙ্গালা ও সংস্কৃতের এক অদ্ভুত রকম মিশালে রাগরাগিণীর বন্দনা করিয়াছেন। অতঃপর "মন ভজ ভবানীর চরণ রে" এই "দিশা" ধরিয়া

"পুনঃ বন্দো সরস্বতী, কণ্ঠে কর ভর।
শরৎ মালসী গাই গৌরীর নাইয়র।"

হইতে দুর্গাপুরাণ-গীত আরম্ভ করিয়াছেন। প্রায় প্রত্যেক কবিতা ও 'গীতমাল্‌সী'র পরই নাগ মুক্তারামের ভণিতা আছে। গীতমালসী এবং কবিতাগুলি অতি সরল ভাষায় রচিত—হৃদয়ের অনাবিল ভক্তির একটানা প্রবাহ। যাঁহারা দুর্গাপুরাণ গীত শুনিয়াছেন, তাঁহারা ইহার ভক্তিরস উপভোগে কৃতার্থ হইয়াছেন, করুণ সঙ্গীতে অশ্রুজলপ্লাবিত হইয়াছেন।

জন্মেজয় ব্যাসদেবের নিকট গৌরীর 'নাইয়র' শুনিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলে ব্যাসদেব গৌরীকে কৈলাস হইতে হিমালয়ে আনিবার প্রস্তাব ধরিয়া কহিতে আরম্ভ করিলেন। নারদ মুনি কৈলাসে যাইয়া দুর্গাকে কহিলেন—

"তব লাগি মেনকা কান্দিয়া উদাসীন।"

অনেক দিন পরে মায়ের কথা মনে পড়িল, মায়ের "স্নেহ-বিহ্বল, করুণাছলছল আঁখি, করুণাভরা বুক," মনে পড়িল। আর কি বাধা মানে? মাতৃভক্ত কবি গাহিলেন,—

"নাগ মুক্তারামে বলে মায়ের পদ বন্দি।
শোকানলে ডুবাইলা মা বলিয়া কান্দি।"

এখানে যে মালসীটী রচিত হইয়াছে, তাহা করুণ রসের একটী উৎসবিশেষ।

দুর্গা বাপের বাড়ী যাইবেন। ভগবান্ শঙ্করের অতীত কাহিনী মনে আছে। সুতরাং তাঁহাকে যাইতে দিতে ইচ্ছা নাই। তিনি শ্বশুরকে গালি দিতেছেন; কারণ, সে অচল, পর্ব্বত, তরুলতাবেষ্টিত; আর সবার বাড়া তার অপরাধ—

"ভাঙ্গ ধুতুরা সেই পাপিষ্ঠ দেশে নাই।"

জামাইর জন্য শ্বশুরমহাশয়েরা এখন যদি সিগারেট রাখিতে পারেন, এবং বিবাহের যৌতুক সামগ্রীতে "রূপার বাঁধা গুড়্‌গুড়ি—তার ঘাটহাত লম্বা নল" দিতে পারেন, তবে মহাদেব ভাঙ্গধুতুরার জন্য যে অভিযোগ করিলেন, সেটা অত্যন্ত অসমীচীন হয় নাই।

সতীশোকদগ্ধ শঙ্কর পার্ব্বতীকে নাইয়রে যাইতে দিবেন না, কারণ, "হারাধন পেলে কে না গেঁটে বেন্ধে রাখে।" চণ্ডী সপ্তমী, অষ্টমী, ও নবমী এই তিন দিনের মিয়াদে দুই পুত্র লইয়া পিত্রালয়ে যাইবার অনুমতি চাহিতে লাগিলেন, এবং স্বামীকেও দুই চারিটী চোখা কথা শুনাইয়া দিলেন।

অতঃপর কবি সুমধুর কবিতালহরীলীলায় বিল্বষষ্ঠী অধিবাস, সপ্তমী, অষ্টমী, ও নবমী পূজার গীত গাইয়াছেন। ইহাতে সংসারের কথা, ঘরগৃহস্থালীর কথা, সুখদুঃখের কাহিনী, সমাজচিত্র অত্যন্ত নিপুণ চিত্রকরের মত উজ্জ্বল করিয়া আঁকিয়া কবি আমাদের চক্ষুর সমক্ষে ধরিয়া দিয়াছেন। এই সকল কবিতার পার্শ্বেই "দেবীর নিকট মেনকার পরমার্থ-তত্ত্ব শ্রবণ," "মহাপ্রলয় বর্ণনা" "সৃষ্টির বর্ণনা" প্রভৃতি দার্শনিক তথ্যের সমাধানও অত্যন্ত সরল ভাষায় করিয়াছেন। হিমালয়ে আসিয়া "শিবের সিদ্ধিভক্ষণ," "তাণ্ডব নৃত্য," "নারীগণের শিব নিন্দা" "শিবের ভুবনমোহনরূপ ধারণ" প্রভৃতি কাব্যাংশে বিশেষ উল্লেখযোগ্য না হইলেও, কবির অসাধারণ শক্তিবলে লেখনীমুখে তাহা এতই সুন্দর হইয়াছে যে, দোষগুণ বিচার করিবার অবকাশ পাওয়া যায় না।

আমাদের দেশে নবমী পূজার পর "পঙ্কোৎসব" ও "চৈতাল" গানের একটা রীতি ছিল। তাহাতে বাবা, জেঠা, খুড়া, ভাইপো, ভাই—আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ যোগদান করিতেন। প্রাঙ্গনে জল ঢালিয়া সেই কাদায় সকলে গড়াগড়ি হুড়াহুড়ি করিয়া "নারিকেল কাড়াকাড়ি" খেলিতেন। তার সঙ্গে সঙ্গে ছন্দোবন্ধে গালাগালির গান। সেই

কুৎসিত গান ছেলেবেলায় শুনিতাম, আর লজ্জায় মাথা নুইয়া যাইত। এখনও সে সকল গানের কথা মনে পড়িলে লজ্জার উদয় হয়। ইতরজনদুর্লভ অকথ্য, অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি গাহিতে গাহিতে সেই ষণ্ডামার্কের দল উদ্দাম নৃত্যে আপন মাতা, ভগ্নী, পত্নীর সম্মুখে গ্রামময় ভ্রমণ করিত, আর নারিকেল, কলা, চিড়া, গুড় আদায় করিত। বাড়ীর বৃদ্ধারা ঘরের বাহিরে যথাসাধ্য ভেট রাখিয়া দুয়ার বন্ধ করিতেন; আর বৌ-ঝিরা কাণে আঙ্গুল দিয়া মাথা গুজিয়া ঘরের কোণে বসিয়া থাকিত। বর্ত্তমান সভ্যতার যুগেও নব আলোকবঞ্চিত সুদূর পল্লীতে এই উৎসব "মায়ের পূজার অঙ্গ' বলিয়া অনুষ্ঠিত হয়।

মুক্তারামও তৎকালের 'চৈতাল' গানের রীতি রক্ষা করিয়াছেন।

"শতাবড়ি সিদ্ধি লাড়ু নিয়া কাড়াকাড়ি।"

এবং

"গুরু শিষ্যে গর্ব্বিত (১) এখন ভেদ নাই।
পঙ্ক করি পর্ব্ব গাও বসি রঙ্গ চাই।"

সুতরাং সকলেই কাদায় গড়াগড়ি দিয়া

"নানান অভণ্ড (২) গায় দেবী হরষিত।'

ইহার পর পশুবলি উপলক্ষে মুক্তারাম যুক্তি দিয়া পশু-বলির সমর্থন করিয়াছেন। পশুগণকে স্বর্গপ্রাপ্তির প্রলোভন দেখাইতেও ত্রুটী করেন নাই।

নবমীর দিন নাগ মুক্তারাম রন্ধনের আয়োজন করিয়াছেন। স্বয়ং মেনকারাণী সাক্ষাতে বসিয়া রাঁধাবাড়ার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। তখন অন্তঃপুরে নভেলের আমদানী ছিল না, এসেন্স, সাবান, বডি, জ্যাকেটের ছড়াছড়ি ছিল না। রাণীই হউন, আর যিনিই হউন—রাঁধাবাড়ার প্রশংসাই তাঁহার নিকট "সকলের বাড়া" ছিল। মেনকা উপদেশ দিতেছেন,—

"পূর্ব্বেতে অম্বল রাঁধ হইবে শীতল।
ভাল না বাসিবে কেহ উত্তপ্ত অম্বল।"

কায়স্থ হইলেও মুক্তারাম বর্দ্ধমানের ব্রাহ্মণ রায়মহাশয়কে টেক্কা দিয়াছেন—তাঁহার মজুমদারগৃহিণী পদ্মমুখী রন্ধনে সুদক্ষা হইলেও নিরামিষ, মাছ, মাংস রাঁধিয়া, পরে

"অম্বল রাঁধিয়া রামা আরম্ভিল পিঠা।"

ভোজনলোলুপ বন্ধুগণ মুক্তারামকেই এ ক্ষেত্রে বাহবা দিবেন, এ সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ নাই। মুক্তারাম আশ্বিন মাসে "পার্ব্বতীয় আম, কাঁঠাল, এবং কাসন্দির" বন্দোবস্ত করিয়াছেন; পল্লীগৃহের প্রাঙ্গনে এই অসময়েও "কাঁকরোল" এবং 'কুষ্মাণ্ডের জালি" (১) উৎপন্ন করিয়াছেন। বাস্তবিকই ইহাতে অতিশয়োক্তি কিছু নাই, কিছু দিন পূর্ব্বেও দেশের তেমন দিন ছিল। তবে ঐ সকল দ্রব্য খাস হিমালয়ের বলিয়া মনে হয় না। আমাদের এই 'সুজলা' 'সুফলা' বঙ্গভূমিরই স্নেহের দান।

পূজার আয়োজন, রাঁধাবাড়া প্রভৃতি উপলক্ষে মুক্তারাম নাগের দুর্গাপুরাণে আমরা সামজিক চিত্র ও আমাদের ঘরোয়া কথা সম্বন্ধে যতদূর জানিতে পারি, তাহা বাস্তবিকই সুন্দর, এবং সেকালের নিখুঁত ফটো। আমরা সংক্ষেপে সে সকল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

পূজার আয়োজনে

"কর্পূর, তাম্বুল এল যজ্ঞহেতু ঘৃত।

* * * *

আতপ তণ্ডুল রাখে করিয়া প্রচুর,
নারিকেল কাসিয়ারি বিচিত্র অঙ্কুর।
চিনি ননী ক্ষীর গুড় কলা মধু দধি,
আর যত মিষ্ট রাখে নাহিক অবধি।

(১) সম্মান (লঘুগুরু জ্ঞান)।
(২) অশ্লীল

(১) ছোট কুমড়া। উহা সরু শলাকা দ্বারা শতসহস্র ছিদ্রবিশিষ্ট করিয়া পরে চাক্‌তি করতঃ ভাজা করা হয়। উহা রসনার তৃপ্তিকারক বটে।

তিল যব মসুরী ও মাস আর মুগ,
অদৈন্য (১) করিয়া রাখে যত উপভোগ।

* * * *

শত শত মেষ মৈশ ছাগ কোটী কোটী।"

তখনকার দিনে নিমন্ত্রণ দেওয়ার রীতি ছিল 'পান' প্রেরণ। এখনও আমাদের দেশে অন্নারম্ভ, বিদ্যারম্ভ, উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতিতে নাপিত, ধোপা, মালী, ঢোলী প্রভৃতিকে পান পাঠান হয়। হিমালয়ও

"পান দিয়া সকল দেবেরে দিল জান (২)।"

তখন আলিপনায় "হিঙ্গুল, হরিতাল" ব্যবহৃত হইত। যাত্রা-কালে পূর্ণকুম্ভ বসাইয়া দধি, বদরী দেওয়া হইত। কদলীতরু-রোপণ, শ্বেত ঘট, চন্দন, পতাকা প্রভৃতি যাত্রাকালীন মঙ্গল-সূচক রূপে স্থাপন করা হইত।

গৌরী বাপের বাড়ী যাইবেন। সখিগণ সুন্দা, মেথী, পিঠালী, আমলকী, বিলা দিয়া তাঁহার 'অঙ্গ মাজ্জিয়া' দিল আধুনিক ভিনোলিয়ার অপেক্ষা ঐ সকল দ্রব্যের গুণ বেশী ছিল কি না, বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষার যোগ্য বটে। আমাদের পল্লীগৃহে জননীগণ আজিও শ্রীপঞ্চমীর দিন ছেলেমেয়েদের গায় ঐ সকল দ্রব্য মাখিয়া স্নান করাইয়া থাকেন—উহাকে 'শ্রী উঠান' (ছিরি তোলা) বলে।

অতঃপর সখিগণ "বিষ্ণুতৈল গন্দরাজ সর্ব্ব অঙ্গে" লেপন করিল। মাথায় বিষ্ণুতৈল দিয়া চুল আঁচড়াইয়া দিল। দেবী 'অভ্রের দর্পণে' আপন 'মুখচন্দ্র' দেখিলেন। সম্ভবতঃ, সে সময় আমাদের নিম্নবঙ্গে কাঁচের দর্পণের আমদানী হয় নাই।

সখীরা 'আগর (৩) চন্দনে' দেবীর ললাট সুশোভিত করিয়া 'সিন্দুরে' সাজাইল, তার পর 'শঙ্খসহ নানা অলঙ্কার' পরাইল। আমরা এখানে সে সকল গহনার ফর্দ্দ দেওয়ার আবশ্যক দেখি না। তখন এদেশে মণি, মুক্তা, জহরতের গহনাই প্রস্তুত হইত।

এদিকে কার্ত্তিক গণেশ 'নেতের' কাপড় পরিয়া মায়ের সঙ্গে যাত্রা করিল। দেবী দোলায় উঠিলেন।

মুক্তারাম নাগ সে সময়ের নর্ত্তকীগণের নৃত্যকৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। নর্ত্তকীরা 'কাঁচা সরায় পঞ্চদীপ" রাখিয়া তালে তালে নাচিতে পারিত।

"পঞ্চদীপ শিরে সরা নাহি হিলে।"

সুতরাং নৃত্যকলার হিসাবে তাহা অল্প প্রশংসনীয় ছিল না। সেই নাচের আসরে আমরা 'তবলার চাঁটি' শুনিতে পাই না। "মৃদঙ্গেতে ক্ষুদ্রতালি, পাখোয়াজে তুরী"র সঙ্গে "তিন বিদ্যাধরী মন্দিরা" বাজাইয়াছিল। এইখানে কবি সমাজের রুচির একটী সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়া মৃদু ব্যঙ্গে আপনার মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। নর্ত্তকীর নৃত্যগীতে মুগ্ধ হইয়া দেবী স্বয়ং তাহাকে বহুমূল্য রত্নহার বখশিস্ করিলেন। বিষ্ণু দিলেন 'পীতাম্বর', শঙ্কর 'কৌপীন', ব্রহ্মা 'পটাম্বর', ইন্দ্র শুদ্ধ 'নেত', এবং কুবের রত্ন, অলঙ্কার দিয়া নাচনীওয়ালীকে সন্তুষ্ট করিলেন। হিমালয় ও মেনকা বহু বস্ত্র ও ধন দান করিলেন। এ সকল লক্ষ্য করিয়া কবি লিখিলেন—

"সভাখণ্ডে যত দিল তার নাই অন্ত।
ইহাতে না দিল যেবা সে বড় দুরন্ত।
ধর্ম্ম অর্থে ব্যয় হতে তুষ্ট নহে মন।
সুকার্য্যে কোথায় লাগে কৃপণের ধন?
না খেয়ে সঞ্চয় করে কভু না বিলায়।
সে ধন আপন নহে, পাপ পথে যায়।"

সুখের কথা যে আমাদের কবি কুকার্য্য সমর্থন না করিয়া তাহাকে ব্যঙ্গ করিয়াছেন। সেকালে এ সকল রীতি ছিল—আমরা সাহিত্যে তাহার পরিচয় পাই।

মুক্তারাম নৈবেদ্য সাজাইতেছেন—তাহাতেও আমাদের দেশের পদ্ধতির সুন্দর চিত্র,—

"চাঁপা সবরী আর কলা মর্ত্তমান॥

* * * *

চিনী ননী শর্করা সন্দেশ নানা মতে।

---

(১) অদৈন্য—প্রচুর। খুব বেশী।
(২) জান—সমাচার।
(৩) অগুরু

মধু গুড় দুগ্ধ ক্ষীর যত মিষ্ট জাতে ॥
আম্র কাঁঠাল আদি ফল নানা মত ।
নারিকেল আদি করি কব আমি কত ॥
তণ্ডুল ঢালিয়া দিল করিয়া প্রচুর ।
বুট মুগ আদি করি নানান অঙ্কুর ॥
লক্ষ লক্ষ পাত্র ভরি থালি বারকোশে ।
*   *   *   *
শতাবরী সিদ্ধি দিয়া পুজে ভোলানাথ ।

শতাবরী মোদক তখনকার দিনে বিশেষ প্রচলিত ছিল।

সে কালে এদেশের মেয়েরা রাঁধাবাড়ার তরকারী কুটিতেও স্নান করিয়া লইতেন। স্নান করিয়াই—

"হরিদ্রা মরিচ জিরা কেহ কেহ বাটে ॥
*   *   *   *
তেজপত্র আদা বাটে লঙ্গ জাতি যতি ।
ঘৃততে সম্ভার দিতে চূর্ণ করে মেথী ॥
আর যত বস বাস বাটে তার সঙ্গে ।
ডাইল ব্যঞ্জন তবে ছাল বাটে হিঙ্গে ।
পিষ্টক পায়েস হেতু কেহ আটা ফেঁশে ।
দুগ্ধ আবর্ত্তন হেতু কেহ কেহ বসে ॥
অন্নের তণ্ডুল আনে হেমন্তিয়া শাইল ।
কেহ পাখালিয়া আনে হেমন্তিয়া ডাইল ॥
যত ইতি শাক তোলে তার নাই লেখা ।
অম্বল করিতে আনে যত সব চোকা ॥
এসকল পাখালিয়া আনিলেক পুনি ।"

তখন আমাদের দেশে দুমুখো চুল্লী, পাঁচমুখো চুল্লীতে পাক হইত। আমরাও ছেলেবেলায় দুমুখো চুল্লী দেখিয়াছি।

"পঞ্চজন বসিলেন পঞ্চটী পাকালে (১)।
এক মুখে জ্বাল দিলে পঞ্চমুখ জ্বলে ॥
পাতিল বসা'ল তাতে পঞ্চম বিংশতি ।"

পাঁচটী পাকালে পঁচিশটী পাতিল বসানের বিধান তখন ছিল। জগন্নাথক্ষেত্রে নাকি এই রকম উপর্য্যুপরি পাতিল বসানের নিয়ম আছে।

রাঁধা আরম্ভ হইয়াছে,—

"ঘৃত দিয়া শাক সব ভাজিল প্রথমে ।
নানা তরকারী ভাজা করে অনুক্রমে ॥
*   *   *   *
লঙ্কা তরকারী আদি রাঙ্কলেক ঝাল ॥
*   *   *   *
পঞ্চ প্রকার রান্ধে মনোহর ডাইল ।
ঘৃতেতে সম্ভার দিয়া তারে নামাইল ॥
*   *   *   *   *
আর যত দ্রব্যেতে কারল নানা বর্ণ (১) ।
শতেক ব্যঞ্জন রাঁধি পাক করে অন্ন ॥

দেবগণের আহারাদি হইলে পর "মাঝে ঝিয়ে" বসিয়া খাইলেন। আজ কতদিনে দেখা হইবে—তাই আজ মেয়ের মনে এই সাধ। পঞ্চ শাক, শুকত, [পটল, বাগুন, উচ্ছে, পাটভাজা, ঝিঙ্গা, কাঁচাকলা, বেতশাক, কুষ্মাণ্ডের জালি ভাজা, কাকরোল ও কচুভাজা, অরুয়া (মোচা) ভাজা, গন্ধরাজের ডোগা দিয়া নানা সাজের ঝোল"] বড়া, ব্যঞ্জন, ভাজা, পরমান্ন, পীঠা, বড়াপুলি, চাম্পাপুলি, পাটমোড়াপুলি, রুটী, পুরী, কচুরী, তণ্ডুলচিতল পিঠা, চন্দ্রকাইস্ত (চন্দ্রকান্তি) বড়া, ক্ষীরাপাতি, সূর্য্যমনি, জামাইপাগল পুলি, কানাইবাঁশী পুলি, মিষ্টমধুকলি, মোহনপুলি, কলার বড়া প্রভৃতি রাঁধা হইয়াছিল! ডাইলের মধ্যে ছিল—মাষ, মুগ, বুট, আর খেসারি, অরহর। আমাদের জীবন-সম্বল মুসুরী তখন হিন্দুরা ছুঁইতেন না।

তখন আম, আমলী, করঞ্জা, ডেফল ও চালিতা দিয়া পাঁচ রকম অম্বল রাঁধা হইত—আলুবোখরা ছিল না। ঐ অম্বলের 'অন্তরে' গুড় দেওয়া হইত। কিসমিসের ব্যবহার দেখা যায় না। "আটা মধ্যে ক্ষীরা চিনি দিয়া অতিশয়। ঘৃতে তারে ভাজিয়াছে সুগন্ধিতময়।" অবশেষে ঘন দুধে আম, কাঁঠাল 'এবং কমলার শাস'—দধি ও মধু খাইয়া ভোজন শেষ করিলেন। নানাজাতি জাম্বিরের (লেবু) ঘ্রাণে ভোজ্য দ্রব্যাদি সুগন্ধি করিয়া লওয়া হইয়াছিল।

(১) উনন।

(১) বিভিন্ন রকম।

এই ভোজনব্যাপারে আমাদের দেশের তাৎকালিক একটা চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই সকল দ্রব্য এখনও পাড়াগাঁয়ে, যাঁহার বাড়ীতে সেকালের মানুষ আছেন, তাঁহার অদৃষ্টে জোটে, অন্যেরা কট্‌কী ঠাকুরের অনুগ্রহদত্ত মসুরী ডাইল, তরকারী ও মাছের ঝোলে পেট ভরিয়া কাজে বাহির হইয়া থাকেন। বর্ত্তমান যুগের গৃহিণীদের

"রান্না ঘরে যেতে হলে কান্না আসে রাগে।"

সুতরাং বর্ত্তমান বাঙ্গালীর ঐ সকল সুখাদ্যের তালিকায়ই তৃপ্ত হইতে হইবে। দশমীতে দেবী কৈলাসে চলিয়া যাইবেন। মেনকা রাণী উমাকে কোলে লইয়া বিনাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সে বিলাপে "পাষাণে বুক বান্ধিয়া"ও থাকা যায় না। অতঃপর তিনি সীতার বিবাহ বর্ণন করিয়া উমাকে কিছু দিন থাকিতে বলিলেন। উমা মাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। মেনকা তখন কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন—

"ওরে নবমী নিশি, আইজ প্রভাত হইও না রে।
তুমি গেলে কাইল সকালে মাকে নিয়ে যাবে হরে॥
সবে এক উমা দেখ, এই আমার প্রাণ,
তুমি রইয়া দেহ মোরে উমাধন দান।
ব'ধ না প্রাণে আমারে, নিশি রে বলি তোমারে,
আনন্দ উৎসবকালে নিরানন্দ কর না রে॥
মনে লয় মরিয়া যাই শুনিয়া লাগে ত্রাস,
এমন চাঁদের হাট ভাঙ্গিয়া, আমার মা যাবে কৈলাস।
অকস্মাৎ বজ্রাঘাত পড়িল আমার শিরে,
এসো কোলে দুর্গা ব'লে আর ডাকিব কারে।
শুনি চমকিত প্রাণ মনে হেন লয়,
আমি লুকায়ে রাখিতাম মাকে আপন হৃদয়।
দেখে মুখ জু'ড়ায় বুক, আনন্দ অন্তরে
কেমনে বিদায় দিব, প্রাণে ধৈর্য্য মানে না রে।
বহুভাগ্যে আরাধনে, পাইয়াছি উমা ধনে,
আমার উমা বিনে হবে কা'ল দিবসে আঁধার॥"

এই গানটী এখনও আমাদের দেশে নবমীর আরতি অন্তে প্রাচীনা ও প্রৌঢ়া মহিলাগণের কণ্ঠে শোনা যায়। নবীনাগণের হারমোনিয়মসহ লয়যুক্ত মোলায়েম ও তথাকথিত সাহিত্যরসযুক্ত সঙ্গীত অপেক্ষা ঐ বিদায়ের গানটী অন্ততঃ আমাদের কানে অনেক বেশী ভাল শোনায়। তবে কথা এই—তখন ছিল অকপট ভাব—এখন হইয়াছে উচ্চ অঙ্গের ভাষা ও সাহিত্য।

ঐ সঙ্গীতটীর সঙ্গে অমরকবি মধুসূদনের—

"যেও না রজনী আজি লয়ে তারাদলে,
গেলে তুমি দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে।
উদিলে নির্দ্দয় রবি উদয় অচলে
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে।"

কবিতাটী মনে পড়ে। উভয়ের রচনার আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য।

মুক্তারাম ভবিষ্যৎ জীবন কেবল দুর্গাপুরাণ গাহিয়াই কাটাইয়াছেন। তাঁহার আরও দুই জন সাকরেদ ছিলেন। এখনও আমাদের দেশে "দুর্গাপুরাণ" কীর্ত্তনীয়ার কথা উঠিলে প্রাচীনেরা বলেন—

রাম জগন্নাথ দুই ভাই, কিঞ্চিন্মাত্র কানাই"।

এই দুর্গাপুরাণে জগন্নাথের ভণিতাযুক্ত মালসীও অনেক আছে। জগন্নাথের সাকরেদের সাকরেদ দামোদরও আমাদের দেশে বিখ্যাত কীর্ত্তনীয়া ছিল। সম্প্রতি তাহারও মৃত্যু হইয়াছে। যাত্রা, থিয়েটার প্রভৃতির আমদানীতে আমাদের "দুর্গাপুরাণ" এবং "কবিগান" উঠিয়া যাইতেছে। অসভ্যতার এ সকল চিহ্ন লোপ করিবার জন্য আমাদের যথেষ্ট চেষ্টাই আছে। কিন্তু হায়, এমন দিন আসিবে যখন পুনরায় আমাদিগকে এই "হারামণির" সন্ধান করিতে হইবে।

দুর্গাপুরাণের কীর্ত্তনীয়াগণ হাতে চামর, পায়ে নূপুর পরিয়া গান করে। খোল করতাল যোগে সঙ্গীগণ গানের ধুয়া ধরিয়া থাকে। কীর্ত্তনীয়ার সম্মুখে ছোট চৌকীতে একখানি আসন সাজাইয়া দিতে হয়। গান আরম্ভ করিবার সময় কীর্ত্তনীয়া দেবদেবীর বন্দনার পরেই মুক্তারাম নাগের উদ্দেশে অভিবাদন করিয়া থাকে।

মুক্তারামের মহাদেবের বিবাহের সহিত ভারতচন্দ্রের শিবের বিবাহের সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য আছে। মুক্তারাম এ স্থলে

রায়গুণাকরের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন। মুক্তারাম লিখিয়াছেন—

"মণ্ডপেতে গেলা রাণী হরষিত অঙ্গে।"
পুরবাসী নারীগণ গেল তাঁর সঙ্গে॥
* * * * * *
(শিব) একান্ত ভাবুক হয়ে না চায় উল্লাসে।
* * * * * *
নারদ বলেন গরুড় কিবা রঙ্গ চাও
শিবকটিবন্ধ সাপ সকল খেদাও।
* * * * * *
বাঘছাল পড়ি গেল শিব হৈল লেংটা,
নারীগণ টানি দেয় লম্বা লম্বা ঘোমটা।
পবন পবন বলি ডাকে ঘন ঘন,
পবন আসি উড়াইল ঘোমটার বসন।
ছুটিছে রমণীগণ বস্ত্র দিয়া মুখে।
গরুড় রাখিছে দ্বার আচ্ছাদিয়া পাখে।
সুচতুরা নারীগণ নিবাইল বাতি।
শিবভালে অৰ্দ্ধচন্দ্র আলো করে অতি॥"

অন্নদামঙ্গলের শিবের বিবাহেও নারদঠাকুর এই রকম একটা গণ্ডগোল করিয়াছিলেন।

"গরুড় হুঙ্কার দিয়া উতরিল গিয়া।
মাথা গুঁজি সাপ সব যায় পালাইয়া।
বাঘ ছাল খসিল উলঙ্গ হৈলা হর।
এয়োগণ বলে ওমা এ কেমন বর॥
* * * * * *
দেখিয়া সকল লোক মশাল নিবায়
শিবভালে চাঁদ অগ্নি আলো করে তায়॥"

কিন্তু আমরা অন্যত্র দেখিতে পাই, শিবের আশ্রয়ে সর্প গরুড়কে গর্জ্জন করিতেছে। তদুত্তরে গরুড় বলিতেছে—

"জানামি সর্পঃ তব প্রভাবং।
গর্জ্জসি কণ্ঠস্থিত শঙ্করস্য॥
স্থানে প্রধানং ন বলপ্রধানং।
স্থানস্থিত কাপুরুষোঽপি সিংহঃ॥"

শ্রীযুক্ত পীতাম্বর নাথ মহাশয় মুক্তারাম নাগের দুর্গাপুরাণ-গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়া বঙ্গভাষার একটী অমূল্য সম্পত্তি ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু এই সংগৃহীত পুস্তকখানি সম্পূর্ণ নির্ভুল নহে। বিশেষতঃ, পীতাম্বরবাবু এই পুস্তকে দুর্গাপুরাণ-কীর্ত্তনীয়াদিগের রচিত কতিপয় অতিরিক্ত মালসী সংযোগ করায় পুস্তকের গৌরব হ্রাস পাইয়াছে। ভবিষ্যৎ সংস্করণে সংগৃহীত অতিরিক্ত মালসীগুলি পরিশিষ্টে স্থাপন করিলেই ভাল হয়।

এই প্রবন্ধ লিখিত হওয়ার পর জানিতে পারিয়াছি, মুক্তারামের স্বহস্তলিখিত একখানি জীর্ণ দুর্গাপুরাণ পাওয়া গিয়াছে। উহা আরও বিস্তৃত। আমরা সময়ান্তরে ঐ দুর্গাপুরাণ মুদ্রণের চেষ্টা করিবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেছি।

আমরা কবি মুক্তারামের একটী কবিতাংশ উপহার দিয়া প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করিব। ইহাতে কি মাধুর্য্য ও রচনা-চাতুর্য্য আছে, সমবেত সভ্যমহোদয়গণ তাহার বিচার করিতে পারিবেন।

"সাজিয়াছে দেবী কার ঘরে যাইতে মনোরঙ্গে।
যোগীন্দ্র দেখি মুদ্রিত আঁখি এই রূপতরঙ্গে॥
কোটী জলধর, তাহে বিধুবর, চাঁচর চিকুর ছান্দে।
চকোর ভুকিত (১), দেখিয়া শুকিত, চান্দ পড়িয়াছে ফান্দে।
শঙ্খ কঙ্কণ দশ দরপণ সিন্দুরে অরুণ ঘটা।
অলকা ভরিয়া সুবাসিত করিয়া, ইন্দুবিন্দু রাঙ্গিয়া রঞ্জিত ছটা।
পরি যথোচিত, মণি বিরাজিত, রূপের কি তুলনা আছে?
সেরূপ দেখিয়া অমর ভাঙ্গিয়া, গঙ্গা না রহিল কাছে।
চরণ যুগল, অতি কোমল, নাগ মুক্তারামে গায়।
নূপুর কিঙ্কিণী, রুনু রুনু শুনি, রবে মোর চিত্ত ধায়।"

মুক্তারাম নাগ প্রায় প্রত্যেক কবিতা ও মালসীর পরে আপন নামযুক্ত ভণিতা দিয়াছেন। কোথাও লিখিয়াছেন,

"গজমুণ্ডে জন্ম (২) নাম, তাহার পরেতে রাম,
ভণে সেই 'পন্নগ (৩)' পদ্ধতি।

(১) ক্ষুধিত (২) মুক্তা (৩) নাগ।

আমাদের দেশে চলিত কথায় সাধারণ লোকে পদ্ধতি অর্থে উপাধি ব্যবহার করেন, যথা—আপনার কোন্ পদ্ধতি?

মুক্তারামের রচনায় অশ্লীলতা নাই বলিলেও চলে। ইহাতে মনে হয় তৎকালীন রুচি যে রূপই থাকুক, মুক্তারাম উন্নতচরিত্র ও ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন।

মুক্তারামের সাকরেদ জগন্নাথ গাইনের স্ত্রী শতাধিক বৎসর বয়সেও দুর্গাপুরাণসম্পর্কীয় অনেক গল্প করিতেন। ১৩।১৪ বৎসর পূর্ব্বে সৌরভসম্পাদক কেদারবাবু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অনেক সংবাদ অবগত হন।*

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

সোসিয়ালিজ্ ম্

(৫)

কার্ ল্ মার্জ ও আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী-সমিতি

১৮১৮ খৃঃ অব্দে আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী-আন্দোলনের সৃষ্টিকর্ত্তা কার্ ল্ মার্জের (Karl Marx) জন্ম হয়। ল্যাসেলের মত তিনিও ইহুদীবংশসম্ভূত ছিলেন। কিন্তু মার্জের বয়স যখন মাত্র ছয় বৎসর, তখন তাঁহার পিতামাতা ইহুদীধর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন, এবং মার্জকেও এই নূতন ধর্ম্মেই দীক্ষিত করেন।

ইঁহারা উভয়েই খুব উচ্চশিক্ষিত ছিলেন, ও পুত্রকেও উচ্চশিক্ষা প্রদানের জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়াছিলেন। স্কুলের পাঠ শেষ হইলে মার্জ প্রথমতঃ বন্ (Bonn), ও পরে বার্লিন (Berlin) বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন। ১৮৪১ খৃঃ অব্দে তাঁহার পাঠ সমাপ্ত হয়, এবং তিনি দর্শনশাস্ত্রে "ডাক্তার" (Doctor of Philosophy) উপাধি লাভ করেন। মার্জের পিতার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল যে, তিনি অতঃপর বন্ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। এক সময়ে মার্জের মনেও এইরূপ ইচ্ছাই হইয়াছিল, কিন্তু তৎকালিক প্রাশীয় গবর্ণমেণ্ট বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণের সহিত যেরূপ যথেচ্ছ ব্যবহার করিতেন, তাহা দেখিয়া মার্জ এই বাসনা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। প্রত্যুতঃ, তিনি যেরূপ গণতন্ত্র-মতাবলম্বী ছিলেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অনিয়ন্ত্রিত প্রাশীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে কোনও প্রকার চাকুরী গ্রহণই সম্ভবপর ছিল না।

এই সময়ে রাইন্ নদী তীরস্থ কোলন্ (Cologne) সহর হইতে "রেণিস্ গেজেট" (Rheinische Zeitung —The Rhenish Gazette) নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হইত। ইহাতে চরম গণতান্ত্রিক মতেরই প্রচার করা হইত। মার্জ অবিলম্বে এইখানে আসিয়া হাজির হইলেন, এবং ১৮৪২ খৃঃ অব্দে কিছুদিন ইহার সম্পাদনও করিয়াছিলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের সহিত নিয়তই সংঘর্ষ হওয়াতে তিনি ইহার সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন, এবং ইহার কিছুদিন পরেই কাগজখানাও উঠিয়া যায়। এই সময়েই প্রাশীয় গবর্ণমেণ্টের জনৈক উচ্চ কর্ম্মচারীর ভগ্নীর সহিত মার্জের বিবাহ হয়।

মার্জ যখন 'রেণিস্ গেজেটের' সম্পাদক ছিলেন, তখন উহাতে সোসিয়ালিজ্ম্ সম্বন্ধে কয়েকটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, কিন্তু তখন পর্য্যন্তও সোসিয়ালিজ্ম্ সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ কিছুই ধারণা ছিল না। কাজেকাজেই বিষয়টী বিশেষরূপে জানিবার জন্য তাঁহার মনে বিশেষ আগ্রহ জন্মে এবং তজ্জন্য তিনি ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিতে গমন করেন। তৎকালে প্যারী নগরীই সোসিয়ালিজ্ম্ আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল। ইউরোপের প্রায় সকল দেশ হইতেই সোসিয়ালিষ্টগণ এইখানে সমবেত হইত। মার্জ যখন প্যারীতে উপস্থিত হন, তখন সেখানে সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী সোসিয়ালিষ্ট প্রুধোঁর (Pierre Joseph Proudhon—১৮০৯-১৮৬৫ খৃঃ অব্দ) একচ্ছত্র প্রভাব বিদ্যমান ছিল। মার্জের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব জন্মে ও সোসিয়ালিজ্ম্ বিষয়ে মার্জ তাঁহার নিকট

---

* এই প্রবন্ধ রচনায় আমি সৌরভসম্পাদক শ্রদ্ধেয় সুহৃৎ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ।

—লেখক

অনেক শিক্ষা লাভ করেন। সুপ্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ সাহিত্যিকদ্বয় আর্ণোল্ড রুজ (Arnold Ruge) ও হেন্‌রিক হাঁয়েনেও (Henrich Heine) এই সময়ে নির্ব্বাসিত অবস্থায় প্যারীতেই অবস্থান করিতেছিলেন। ইঁহাদের সহিতও মার্ক্সের আলাপ পরিচয় হয়;—এমন কি, রুজের সহিত সহযোগিতায় তিনি এই সময়ে একখানি খবরের কাগজও প্রকাশিত করিয়াছিলেন। প্যারীতে অবস্থান কালেই তাঁহর একজন আজীবন বন্ধু ও সহকর্ম্মী লাভ হয়;—ইহার নাম ফ্রিড্‌রিক এনজেল্‌স্ (Freidrich Engels)।

ফ্রিড্‌রিক এনজেল্‌স্—১৮২০ খৃঃ অব্দে এনজেল্‌সের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ব্যবসায়ী লোক ছিলেন, এবং পুত্রকেও ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত করাইতে চেষ্টা করেন। এনজেল্‌সের কিন্তু ব্যবসা অপেক্ষা দর্শন ও সাহিত্যালোচনার দিকেই বেশী ঝোঁক ছিল এবং পাঠ্যাবস্থাতেই তিনি 'রেনিস্ গেজেট' প্রভৃতি সংবাদপত্রে নিয়মিতরূপে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। তাঁহার পিতার ম্যাঞ্চেষ্টার সহরে একটা কারখানা ছিল, এবং উহার তত্ত্বাবধানের জন্য এনজেল্‌স্‌কে কিছুদিন ম্যাঞ্চেষ্টারে থাকিতে হয়। এই সময়ে ইংলণ্ডে চার্টিজম্ ও রবার্ট ওয়েনের প্রচারিত সোসিয়ালিজম্ আন্দোলনের স্রোত বহিতেছিল। এনজেল্‌স্ এই দুই আন্দোলনেই বিশেষভাবে যোগদান করেন, এবং ঐ দুই সম্প্রদায়ের পরিচালিত সংবাদপত্রে অনেকগুলি প্রবন্ধও লেখেন। ১৮৪৩ খৃঃ অব্দে এনজেল্‌স্‌কে একবার কার্য্যোপলক্ষে অল্প কয়েকদিনের জন্য প্যারীতে আসিতে হয় এবং সেই সময়েই মার্ক্সের সহিত তাঁহার প্রথম আলাপ পরিচয় হয়। এই প্রাথমিক পরিচয় ক্রমে আজীবন বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল।

জার্ম্মাণী হইতে দূরে থাকিলেও, অনিয়ন্ত্রিত প্রাশীয় গবর্ণমেণ্টের কার্য্য-পদ্ধতির তীব্র সমালোচনা কার্য্যে মার্ক্সের লেখনী এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিরত ছিল না। প্রাশীয় গবর্ণমেণ্ট ইহা চুপ করিয়া সহ্য করিবার পাত্র ছিলেন না। ফলে, প্রাশীয় গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট দলবলসহ মার্ক্সকে ফ্রান্স হইতে নিষ্কাশিত করিয়া দিলেন। তখন মার্ক্স ও এনজেল্‌স্ বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেল্‌স্ (Brussels) সহরে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে এনজেলস্ (১৮৪৫ খৃঃ অব্দে) ইংলণ্ডের শ্রমজীবীদের অবস্থা (The Condition of the Working Class in England) সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। ইহার দুই বৎসর পরে মার্ক্সের অন্যতম প্রসিদ্ধ পুস্তক "দর্শনশাস্ত্রের দুর্দ্দশা" (*Misere de la Philosophie*) প্রণীত ও প্রকাশিত হয়। ১৮৪৬ খৃঃ অব্দে প্রুধোঁ "দারিদ্র্য দর্শন" *Philosophie del a Misere*) নামে একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। মার্ক্স তাহারই সমালোচনা করিয়া আলোচ্য পুস্তকখানি রচনা করেন।

প্রুধোঁ বলিতেন যে, পরিশ্রম মাত্রেরই মূল্য এক, তাহা একজন সামান্য মিস্ত্রিরই হউক, বা পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাস্করেরই হউক। পরিশ্রমের প্রকারভেদে উহার মূল্যের কোনও ইতরবিশেষ হয় না। একমাত্র সময়ই শ্রমের মূল্য-নির্দ্ধারক, অর্থাৎ যে কাজ করিতে যত অধিক সময়ব্যাপী পরিশ্রমের দরকার, সেই কাজের মূল্যও তত বেশী। প্রুধোঁ বলেন যে, ব্যক্তিগত কার্য্যদক্ষতা বা নিপুণতা বলিয়া বাস্তবিক কোন স্বতন্ত্র জিনিস নাই, বা সমাজের হিতের জন্য উহার দ্বারা কোনও জিনিসের মূল্য নির্দ্ধারিত হওয়াও উচিত নহে।

সম্পত্তি সম্বন্ধে প্রুধোঁ বলেন যে, ইহা দস্যুতা-লব্ধ জিনিস ব্যতীত আর কিছুই নহে। (*La propriete c'est le vol*—Property is theft)। রাজ্য মধ্যে কোন বিদেশী ব্যক্তির মৃত্যু হইলে রাজা যেমন বিনা আয়াসে ঐ ব্যক্তির ত্যক্ত যাবতীয় সম্পত্তির অধিকারী হইয়া থাকেন, সেইরূপ বর্ত্তমান সম্পত্তিশালী ব্যক্তিগণ নানা প্রকারে সকলকে ঠকাইয়া বিনা আয়াসে সম্পত্তি করিয়া লইয়াছেন, এবং এক্ষণে সুদ, খাজনা ও অন্যান্য নানা অসাধু উপায়ে সেই সম্পত্তির পরিমাণ বাড়াইয়া লইতেছেন। সুতরাং সমাজে সাম্য ও শান্তি স্থাপন করিতে হইলে এই প্রথার উচ্ছেদসাধন অবশ্য-কর্ত্তব্য।

গবর্ণমেণ্ট বা শাসন-প্রথা সম্বন্ধেও প্রুধোঁর মত নিতান্ত আশ্চর্য্য রকমেরই ছিল। তিনি বলেন যে, মানুষ মানুষের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে গেলেই কিছু না কিছু অত্যাচার অবিচার হইবেই হইবে। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, সমাজের ক্রমোন্নতির সঙ্গে এমন দিন আসিবে, যখন কোনও প্রকার শাসন-ব্যবস্থার কিছুমাত্র দরকার হইবে না, অথচ সর্ব্বত্রই সাম্য, মৈত্রী, ও স্বাধীনতা পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিবে। যখন এইরূপ অবস্থা আসিবে, তখনই বুঝিতে হইবে যে, মনুষ্য-সমাজের পূর্ণাভিব্যক্তি সাধিত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রুধোঁর সহিত মার্ক্সের বিশেষ প্রণয় ছিল; কিন্তু তথাপি তিনি নিতান্ত নির্ম্মমভাবে প্রুধোঁর এই সমস্ত মতের প্রতিবাদ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। বস্তুতঃ, তিনি যাহা সঙ্গত ও কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করিতেন, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে কোনও ব্যক্তিগত ভাবের দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য করিতেন না। ইহাই মার্ক্সের চরিত্রের সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব ছিল।

ব্রাসেল্‌সে অবস্থান-কালেই মার্ক্স ও এন্‌জেল্‌স্ জার্ম্মাণ শ্রমজীবী-আন্দোলনের সহিত বিশেষভাবে জড়িত হইয়া পড়েন। শ্রমজীবীদের অবস্থার উন্নতি-সাধনের জন্য একটী সমিতি-স্থাপন এবং উহার মুখপত্রস্বরূপ একখানি পত্রিকাও প্রকাশিত করা হয়। ইহার পূর্ব্ব হইতেই জার্ম্মাণ শ্রমজীবীদের "ন্যায়পন্থী-সঙ্ঘ" (The League of the Just) নামে একটী গুপ্ত সমিতি ছিল;—ষড়যন্ত্র প্রভৃতির দ্বারা প্রচলিত গবর্ণমেণ্ট-সমূহের শক্তি হ্রাস করাই এই গুপ্ত সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। বার্লিন, ব্রাসেল্‌স্, প্যারী, লণ্ডন প্রভৃতি ইউরোপের প্রায় সকল প্রধান সহরেই ইহার শাখা ছিল। ক্রমে ক্রমে মার্ক্স প্রভৃতিও এই সমিতির সহিত যোগদান করেন, এবং এই যোগদানের ফলে সমিতির গুপ্ত উদ্দেশ্য পরিবর্ত্তিত হয়। এই সময় হইতে ইহার নাম হয় "শ্রমজীবী-সঙ্ঘ" (The Communist League), এবং প্রকাশ্যভাবে আন্দোলন, আলোচনা দ্বারা অনুকূল জনমত সংগঠন করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য হয়। ১৮৪৭ খৃঃ অব্দে লণ্ডন সহরে "শ্রমজীবী-সঙ্ঘের" একটী বিরাট অধিবেশন হয় এবং এতদুপলক্ষেই মার্ক্স ও এন্‌জেল্‌স্ প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ "প্রচার-পত্র" (Manifest der Kommunisten—Manifesto of the Communist League) প্রকাশিত হয়। এই প্রচারপত্রে ইউরোপীয় সমাজে শ্রমজীবী-আন্দোলনের ক্রমাভিব্যক্তির ইতিহাস, সোসিয়ালিজ্‌ম্ ও সঙ্ঘবাদের সমালোচনা, এবং "উন্নতিধ্বজ" মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রতি শ্রমজীবী সাধারণের মনের ভাব ও তাহার কারণ প্রভৃতি বিষয় বিস্তারিতরূপে আলোচিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা শ্রমজীবীগণকে স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হয় যে, তাহাদের অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে, ক্রমে ক্রমে ব্যক্তিগত সম্পত্তিভোগ প্রথার উচ্ছেদ করিয়া গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত একটী কেন্দ্র ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে হইবে, এবং দেশের সর্ব্বত্রই কৃষি-ব্যবসায়ীদের সভা, সমিতি স্থাপন করিয়া তাহাদের সহায়তাতেই ব্যবহার্য্য যাবতীয় শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করিতে হইবে। মার্ক্স বলেন যে, সমাজের অন্য কোনও শ্রেণীর সহায়তা দ্বারা এই আদর্শ লাভ হইবে না; যদি ইহা করিতেই হয়, তবে শ্রমজীবীগণের নিজেদের কর্ত্তৃকই ইহা করিতে হইবে;—তথাকথিত সংস্কারকদের মুখের দিকে অসহায়ভাবে চাহিয়া থাকিলে কোনও কালে শ্রমজীবীদের অবস্থার উন্নতি হইবে না। এই উদ্দেশ্য সাধিত করিতে যদি বিপ্লব-সংঘটনেরও দরকার হয়, তবে তাহা হইতেও শ্রমজীবীদের পশ্চাৎপদ হওয়া উচিত নহে;—কারণ যদি এই বিপ্লবে তাহাদেরই পরাজয় হয়, তবে তাহাদের অবস্থার বিশেষ কিছুই পরিবর্ত্তন হইবে না—কিন্তু জয়লাভ হইলে, তাহাদের অশেষ লাভ হইবে। মার্ক্স বলেন যে, এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে, পৃথিবীর সমস্ত শ্রমজীবীরই একসঙ্গে মিলিত হইয়া কাজ করা উচিত—কারণ, সকল দেশের শ্রমজীবীই এই একই ব্যাধিতে পীড়িত, এবং তাহার প্রশমনের জন্য একই ঔষধের দরকার। অল্পদিনের মধ্যেই ইউরোপের প্রায় যাবতীয় ভাষায় এই প্রচার-পত্রের অনুবাদ প্রকাশিত হয়, এবং সর্ব্বত্রই একটী বিরাট আন্দোলনের সাড়া পড়িয়া যায়।

ইহার অব্যবহিত পরেই ১৮৪৮ খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ফরাসী বিপ্লবের সংঘটন হয়। এতদুপলক্ষে মার্ক্স ও এন্‌জেল্‌স্‌ কিছুদিন ফ্রান্সে অবস্থান করেন, এবং পরে কোলনে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া স্বমতাবলম্বী আরও কয়েকজন বন্ধুর সহিত সহযোগিতায় "নব রেনিস্‌ গেজেট" (*Neue Rheinische Zeitung*—The New Rhenish Gazette) নামে একখানি দৈনিক পত্রের প্রচার আরম্ভ করেন। ইহার দ্বিতীয় নাম "গণতন্ত্র-মতাবলম্বীর মুখপত্র" (The Organ of Democracy) হইতেই এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইবে। মার্ক্স নিজেই ইহার প্রধান সম্পাদক ছিলেন। কাগজখানি বেশী দিন চলে নাই বটে, কিন্তু যে কয়দিন চলিয়াছিল, সে কয়দিন ইহার খুব কাটৃতি হইয়াছিল। "উন্নতিধ্বজ" মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ই ইহার আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল, এবং বলাই বাহুল্য, প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহ প্রচার করিতেও ইহা কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করে নাই। ১৮৪৮ খৃঃঅব্দে প্রাশিয়ার রাজা জনসাধারণের সভা (The National Assembly) উঠাইয়া দেন। ইহাতে মার্ক্স প্রচার করেন যে,রাজা যখন এইরূপ করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে কর প্রদান করা প্রজাদের আর উচিত নহে ; এমন কি, আবশ্যক হইলে, রাজার বিরুদ্ধে তাহারা অস্ত্রধারণ পর্য্যন্তও করিতে পারে। এইরূপ রাজদ্রোহ প্রচারের অপরাধে শীঘ্রই রাজদ্বারে তাঁহাকে অভিযুক্ত হইতে হয়, এবং যদিও জুরীর বিচারে পরিণামে তিনি বেকসুর খালাস পাইয়াছিলেন, তথাপি রাজাদেশে কাগজখানি উঠিয়া যায়, এবং মার্ক্সকেও প্রাশীয় রাজ্য ত্যাগ করিতে হয়। ইহার পর তিনি প্যারীতে গমন করেন, কিন্তু প্রাশীয় রাজের চক্রান্তে সেখানেও তিনি দীর্ঘদিন থাকিতে পারেন নাই ; অবশেষে তিনি জার্ম্মাণীর সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে লণ্ডন সহরে স্থায়ীভাবে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করেন।

লণ্ডনবাসের প্রথমাবস্থায় অর্থাভাবে মার্ক্সকে নিরতিশয় কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। এমন কি, এই সময়ে বিনা চিকিৎসায় তাঁহার অনেকগুলি পুত্রকন্যাও অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি যাহা কিছু সামান্য অর্থ পাইতেন, তাহাতেই কোনও প্রকারে নিতান্ত কায়ক্লেশে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইত। মত পরিবর্ত্তন করিলে, তিনি হয়ত স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই কাটাইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি সেরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না। একবার যাহা জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, তাহার উদ্‌যাপনের জন্য তিনি কোন কষ্টকে কষ্ট বলিয়াই মনে করিতেন না; ইহা মার্ক্সের চরিত্রের অন্যতম বিশেষত্ব।

লণ্ডনে থাকিবার সময়ে তিনি "শ্রমজীবী-সঙ্ঘের" পুনঃ প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সহযোগীদের মতানৈক্য-বশতঃ এই চেষ্টা ফলবতী হইতে পারে নাই। অবশেষে অনেক যত্ন ও চেষ্টার পর ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে "আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী-সমিতির" প্রতিষ্ঠা হয়, এবং নামে না হইলেও, কাজে কর্ম্মে মার্ক্সই উহার সর্ব্বময় কর্ত্তা হন। শ্রমজীবী-আন্দোলনের সংস্পর্শে আসিয়াই তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, সমগ্র পৃথিবীর শ্রমজীবীগণকে একসূত্রে গ্রথিত করিতে না পারিলে, সফলতা লাভের কোনও আশা নাই। কারণ, মূলধনীদের যেরূপ টাকার জোর, তাহাতে তাহাদিগকে রীতিমতভাবে ঠেকাইয়া দিতে না পারিলে, তাহারা নিরন্ন ভিক্ষাসর্ব্বস্ব শ্রমজীবীকে আদৌ গ্রাহ্যই করিবে না। মূলধনীগণকে আট্‌কাইতে হইলেই সময়ে সময়ে ধর্ম্মঘটের দরকার। কিন্তু পৃথিবীশুদ্ধ শ্রমজীবী যদি একজোট না হয়, তবে একস্থানের লোকেরা ধর্ম্মঘট করিলে, মূলধনীরা অনায়াসেই অন্য স্থান হইতে লোকজন আনাইয়া ঠেকা কাজ চালাইয়া লইতে পারিবে। সুতরাং ইহাতে ধর্ম্মঘটকারীদের অবস্থা ভাল না হইয়া বরং উত্তরোত্তর আরও খারাপ হইতেই থাকিবে। অতএব, যাহাতে সকল দেশের শ্রমজীবীগণ এক সঙ্গে এক-মতাবলম্বী হইয়া কাজ করে, যাহাতে শ্রমজীবীমহলের একস্থানে আঘাত লাগিলে, সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া তাহার সাড়া অনুভূত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্যই মার্ক্স প্রভৃতি

সোসিয়ালিষ্টনেতৃগণ এই "আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী-সমিতির" প্রতিষ্ঠা করেন। মজুরীর পরিমাণ বাড়াইয়া লওয়াই ইহার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল, এবং যতদিন মার্ক্সের কর্তৃত্ব অব্যাহত ছিল, ততদিন আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী-সমিতি এই লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হয় নাই। কিন্তু সময়ের স্রোত অতি দ্রুতগতিতে প্রবাহিত হইতেছিল, এবং সেই গতির সহিত সমতা রক্ষা করিয়া চলা, শুধু মার্ক্স কেন, কাহারও পক্ষেই আদৌ সম্ভবপর ছিল না। এই সময়ে প্রতিদিনই ইউরোপের এক এক স্থানে এক এক ভাবের উদ্ভব হইয়া পূর্ব্বকল্পিত উদ্যোগ, আয়োজন সমস্তই একেবারে ওলটপালট করিয়া দিতেছিল। এই সমিতি প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ফ্রাঙ্কোপ্রাশীয় যুদ্ধের তাণ্ডব নৃত্যে সমগ্র ইউরোপীয় জগৎ একেবারে দোলায়মান হইয়া উঠে; এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গেই বাকুনীন্‌ (Bakunin) প্রভৃতি রুশীয় এনার্কিষ্ট বা অরাজকতাপন্থীগণ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। ফলে শ্রমজীবী-সমিতির উপর মার্ক্সের মুষ্টি ক্রমে ক্রমে শিথিল হইয়া আসে।

১৮৬৭ খৃঃ অব্দে ধনবিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ "মূলধন-তত্ত্বের" (Das Kapital) প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। ইহার পর তিনি যে কয় বৎসর বাঁচিয়াছিলেন, তাহা একপ্রকার শয্যাশায়ী অবস্থাতেই কাটিয়াছিল—সুতরাং উক্ত গ্রন্থের অপরাপর খণ্ড তিনি জীবিতকালে সম্পাদন করিয়া যাইতে পারেন নাই। ১৮৮৩ খৃঃ অব্দের ১৪ই মার্চ্চ তারিখে কার্‌ল্‌ মার্ক্সের মৃত্যু হয়। ইহার পরে তদীয় হস্তলিখিত বিবরণাদি হইতে সঙ্কলন করিয়া এন্‌জেল্‌সের সম্পাদকতায় "মূলধন-তত্ত্বের" দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। মার্ক্সের মৃত্যুর বারো বৎসর পরে ১৮৯৫ খৃঃঅব্দে এন্‌জেল্‌স্‌ও পরলোকে গমন করেন।

সোসিয়ালিজ্‌ম্‌ সম্বন্ধে মার্ক্সের মতামত স্পষ্টরূপে জানিতে হইলে তৎপ্রণীত "মূলধন-তত্ত্ব" গ্রন্থের সবিশেষ আলোচনা দরকার। ইউরোপীয় সমাজ-ব্যবস্থায় কিরূপে মূলধন ও মূলধনী-সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইল, এবং কি প্রণালীতেই বা উহার ক্রমবিকাশ সাধিত হইয়াছে, এই গ্রন্থে তাহার বিস্তারিত ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। পূর্ব্বগামী সোসিয়ালিষ্ট নেতৃগণের মত তিনি শুধু নিজ মত বা বিশ্বাস ব্যক্ত করিয়াই কর্ত্তব্যের সমাধা করেন নাই; পরন্তু ইউরোপের, বিশেষতঃ ইংলণ্ডের ইতিহাস হইতে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া, স্বীয় বক্তব্য নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই হিসাবে "মূলধন-তত্ত্ব" একখানি অতি উপাদেয় গ্রন্থ হইয়াছে।

প্রধানতঃ, দুইটী উদ্দেশ্য লইয়া মার্ক্স এই গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন,—(১) সোসিয়ালিজ্‌ম্‌কে সুদৃঢ় বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা, এবং (২) প্রচলিত সমাজব্যবস্থা যে নিতান্ত অন্তঃসারশূন্য, একদেশদর্শী, এবং অসাধুতার উপর প্রতিষ্ঠিত, ইতিহাসের সাহায্যে জনসাধারণকে তাহা স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দেওয়া।

নূতনত্বের প্রতি সন্দেহ ও অশ্রদ্ধা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, মার্ক্স ইহা বেশ বুঝিতেন। সোসিয়ালিজ্‌মের স্বরূপতত্ত্ব তখন পর্য্যন্তও জনসমাজে বিশেষ প্রচার লাভ করে নাই; পরন্তু এ বিষয়ে নিত্য নূতন মত প্রচারিত হইতে দেখিয়া ইহার মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনেকের মনেই গভীর সন্দেহ ও আতঙ্কের উদয় হইয়াছিল। মার্ক্স দেখিলেন যে, লোকের মন হইতে এই ভাবের উচ্ছেদ সাধন করিতে না পারিলে, তাঁহাদের গন্তব্য পথ সুগম হইবে না। এবং সেই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি ঐতিহাসিক প্রমাণাবলীর সাহায্যে প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করেন যে, উনবিংশ শতাব্দীর সোসিয়ালিজ্‌ম্‌-বাদ স্বার্থান্বেষী বা বিপ্লবপন্থী লোক বা সম্প্রদায়বিশেষের উর্ব্বর মস্তিষ্ক-প্রসূত কোনও "নূতন" জিনিস নহে; পরন্তু বিগত কয়েক শতাব্দী যাবৎ ইউরোপীয় সভ্যতা যে ভাবে বিকশিত হইয়া আসিতেছিল, ইহা তাহারই অবস্থাবিশেষের পরিচায়ক মাত্র। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ইউরোপীয় সমাজক্ষেত্রে উহার বীজ উপ্ত হইয়াছিল, এবং তাহা অবিরত অনুকূল আবহাওয়া পাইয়া ক্রমে ক্রমে বর্ত্তমান মহীরুহে পরিণত হইয়াছে। তিনি বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে, কোনও ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষের চেষ্টায় ইহার জন্ম হয় নাই,

বা ইহার গতি রোধ করিতে পারে, এমন সাধ্যও কাহারও নাই। তবে পূর্ব্ব হইতে চেষ্টা করিলে, এক যুগের অবসান ও অপর যুগের প্রারম্ভ, এতদুভয়ের সন্ধিস্থলে সাধারণতঃ যে একটা প্রলয়কর ব্যাপারের অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার বেগের অনেকটা প্রশমন করা যাইতে পারে; অস্তমান যুগের মৃত্যুযন্ত্রণার কিছু করা না গেলেও, উদীয়মান যুগের জন্মযাতনার যথাসম্ভব লাঘব করা অনেকটা আমাদের সাধ্যায়ত্ত। মার্ক্স বলেন যে, এক্ষণে এইরূপ এক যুগ-সন্ধি উপস্থিত হইয়াছে; মধ্যবিত্তসম্প্রদায়-পরিচালিত মূলধনসর্ব্বস্ব যুগ অস্তমিতপ্রায়, গণতান্ত্রিক যুগের অভ্যুদয়েরও আর বেশী দেরী নাই; এ সময়ে একটা ভয়ঙ্কর রকমের সামাজিক বিপ্লবের অনুষ্ঠান হওয়া আশ্চর্য্য নহে। এই পরিবর্ত্তনের সময় শুধু অতীতকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিলেই চলিবে না—শুধু অতীতের উপর নির্ভর করিয়া কোনও সমাজ কোনও কালে স্থায়িত্ব লাভ করে নাই বা করিতেও পারে না; বরং সেরূপ করিলে, অনেক সময় বিপ্লবের তীব্রতা বাড়িয়াই থাকে। যাহাতে নবযুগের আগমন যথাসম্ভব নিরুদ্বেগে সংসাধিত হয়, তাহারই সম্যক্ বিধান করিবার জন্য এই যুগ-সন্ধির সময়ে সোসিয়ালিজমের আবির্ভাব হইয়াছে। ইহাকে দেখিয়া ভীত হইবার কোনও কারণ নাই, বরং ইহাকে আশ্রয় করিলেই ভবিষ্যতের পথ অনেকটা সুগম হইবে।

মার্ক্সের প্রথম উদ্দেশ্য যে অনেক পরিমাণেই সফল হইয়াছিল, তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। সোসিয়ালিজম্ যে একটা সম্পূর্ণরূপে "নূতন" পদার্থ নহে, ভালই হউক, আর মন্দই হউক, ব্যাধিই হউক বা স্বাস্থ্যের নিদর্শনই হউক, ইউরোপীয় সমাজ-ব্যবস্থার সহিত যে উহার নিতান্ত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, সে বিষয়ে এক্ষণে আর কাহারও মনে কোনও সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মার্ক্স দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, আজকালকার মূলধনী সম্প্রদায় যে অর্থ-গৌরবে এত স্ফীত হইয়াছেন বা হইতেছেন, তাহা তাঁহাদের সাধু উপায়ে অর্জ্জিত নহে—তাঁহারা নানা রকমে সমাজের অধিক-সংখ্যক লোককে প্রতারিত করিয়া, অনেকের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়াই নিজেরা ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছেন। মার্ক্সের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, একবার যদি লোককে এই অসাধুতার, অন্যায় অত্যাচার ও অবিচারের কথা ভালরূপে বুঝাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে মনুষ্যসমাজ দীর্ঘকাল নীরবে এই অবিচার সহ্য করিবে না—আজই হউক, আর কালই হউক, ইহার প্রতিবিধান হইবেই হইবে।

এই উদ্দেশ্য কতদূর সফল হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। কারণ, মানুষের স্বভাবই এই যে, সাধু উপায়েই হউক, আর অসাধু উপায়েই হউক, একবার কোনও অধিকার বা সুখসুবিধা লাভ করিতে পারিলে, সে সহসা শুধু মৌখিক যুক্তিপ্রমাণের বলে তাহা ছাড়িতে চায় না। মূলধনীগণ যে ভাবেই হউক, একবার যখন টাকাকড়ি জমাইয়া লইয়াছে, তখন যে শুধু বক্তৃতা শুনিয়াই তৎসমুদয় পরিত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবে, এরূপ আশা করা বাতুলতামাত্র। তবে ইহাও ঠিক যে, লোকে তাহাদের কার্য্যপদ্ধতি একবার ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে পারিলে, ভবিষ্যতে যাহাতে তাহারা বিনা বাধাতে আর ঐরূপ করিতে না পারে, তাহার চেষ্টা হইতে পারে।

নিজ সিদ্ধান্ত প্রমাণিত করিবার জন্য মার্ক্স ইউরোপের অতীত ইতিহাসকে প্রধানতঃ তিনটী যুগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম যুগে লোকের ব্যবসাবাণিজ্য অত্যন্ত সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল, এবং তাহাদের ভোগলালসা বা অভাব অভিযোগও খুব সামান্য রকমেরই ছিল। সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যখন যাহা দরকার হইত, তখন তাহা তাহাকে নিজের পরিশ্রমে ও নিজের হাতে করিয়া লইতে হইত; বেতন দিয়া মজুর নিযুক্ত করার প্রথা এই যুগে ছিল না। সে যাহা নিজ হাতে তৈয়ারী করিত, তাহার লাভ-লোকসানের জন্য সে নিজেই দায়ী ছিল। ফলতঃ, মূলধন বলিতে আমরা এক্ষণে সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকি, এই প্রথম যুগে তাহার কোনই অস্তিত্ব ছিল না।

কিন্তু সভ্যতার ক্রম-বিকাশের সঙ্গে এমন এক সময় উপস্থিত হইল, যখন মানুষের যাবতীয় অভাব বা ভোগ-প্রবৃত্তি তাহার নিজের পরিশ্রমে পূরণ করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। তখন এই অভাবপূরণের জন্য সমাজে একটী অভিনব শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইল। ইহাদের নিজের কোন অভাব না থাকিলেও বা নিজ হাতে পরিশ্রম না করিলেও, ইহারা সমাজের অভাবপূরণের জন্য নির্দ্দিষ্ট বেতনে মজুর নিযুক্ত করিয়া জিনিস তৈয়ার করাইতে লাগিল। কাহাকেও কিছু না দিয়া থাকিতে পারিলে, লোকে তাহা নিজ ইচ্ছায় কখনই দিতে চাহে না—ইহা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ নিয়ম। বলা বাহুল্য, এই নূতন সম্প্রদায়ও এই সনাতন নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল না। মজুরেরা চিরকালই অভাবগ্রস্ত, এবং অভাবগ্রস্ত লোকের পক্ষে নিজের ন্যায্য পাওনা কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া পাইবার দাবী করা কখনও সম্ভবপর নহে। সুতরাং এই নূতন সম্প্রদায় মজুরদিগকে যে পরিমাণ খাটাইয়া লইত, তজ্জন্য তাহাদিগকে উপযুক্ত মজুরী না দিয়া, তাহা তাহারা নিজেরাই আত্মসাৎ করিয়া লইত। মার্ক্স বলেন যে, এইরূপে তাহাদের হাতে যাহা অতিরিক্ত জমিত, তাহা হইতেই "মূলধনের" প্রথম উৎপত্তি হয়, এবং এই মূলধনের আবির্ভাবই দ্বিতীয় যুগের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা।

মূলধনী সম্প্রদায় কর্ত্তৃক মজুরেরা নিয়ত প্রতারিত হইলেও, এই যুগে তাহাদের অবস্থা তত শোচনীয় হইতে পারে নাই—ধনী-নির্ধন, মূলধনী-মজুরে এক্ষণে যে আকাশপাতাল পার্থক্য লক্ষিত হয়, তখনও তাহা তাদৃশ সুস্পষ্টাকার ধারণ করে নাই। এই অসামঞ্জস্যকে স্পষ্টীকৃত করিয়া তোলাই তৃতীয় যুগের সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব। কোনও একটী মাত্র ঘটনায় বা একজন লোকের চেষ্টায় এই কার্য্য সাধিত হয় নাই। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে এ পর্য্যন্ত ইউরোপীয় জগতে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহাদের সকলেই অল্পবিস্তর ইহার সহায়তা করিয়াছে। সামন্ততন্ত্রের (Feudal System) বিলোপ এবং ইউরোপের অনেক দেশ হইতেই রোমান্ ক্যাথলিক্ ধর্ম্মবিধানের তিরোধানবশতঃ ঐ দুই সম্প্রদায়ের ধনসম্পত্তি সমাজের কয়েক জন মাত্র লোকের মধ্যে ভাগাভাগি হওয়াতে, একদিকে ইহাদের অবস্থার যেমন হঠাৎ উন্নতি হইল, পক্ষান্তরে, যাহারা এতকাল ঐ দুই সম্প্রদায় কর্ত্তৃক নানা উপায়ে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছিল, উদরান্নের জন্য তাহাদের দুঃখদুর্দ্দশার এক শেষ হইল। ভারতবর্ষ ও আমেরিকায় যাইবার পথ আবিষ্কৃত হওয়াতে ব্যবসাবাণিজ্য পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িল, এবং ব্যবসায়ীগণ এই পৃথিবীব্যাপী ব্যবসাবাণিজ্যের কৃপায় অতুল সম্পদের অধিকারী হইয়া ক্রমে ক্রমে সমাজেরও শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়া বসিল। তাহারা যে শুধু বিদেশে বাণিজ্য করিয়াই সন্তুষ্ট ছিল, তাহা নহে; পরন্তু সমাজ-শরীরেও এই বাণিজ্য-নীতির অবাধ প্রয়োগ করিতে ছাড়িল না। একবার অর্থলোভ জন্মিয়া গেলে, তাহার নিবৃত্তি করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। এই "নূতন বড়লোক সম্প্রদায়" সমস্তই টাকার তৌলে ওজন করিয়া ভালমন্দ নির্দ্ধারণ করিতে লাগিলে। শুধু জমীদারীতে বেশী লাভ হয় না, তাই তাঁহারা পুরুষপরম্পরাগত কৃষিব্যবসায়ীগণকে জোতজমী হইতে বিতাড়িত করিয়া সেখানে অধিকতর লাভজনক মেষপালনের ব্যবসায় খুলিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিল না। এদিকে ঔপনিবেশিক রাজ্যসমূহে দাসত্ব-ব্যবসায়ের প্রবর্ত্তনের ফলে তাহাদের সম্মুখে যেন একেবারে কুবেরের ভাণ্ডার উন্মুক্ত হইয়া পড়িল। এই সমস্ত কারণ-পরম্পরার ফলে মূলধনী সম্প্রদায়ের আর্থিক অবস্থার অভূতপূর্ব্ব উন্নতি হইল বটে, কিন্তু নিরন্ন পরনির্ভরশীল শ্রমজীবীর সংখ্যা দিনদিনই হুহু বাড়িয়া চলিল।

সামাজিক অসামঞ্জস্যের যাহা কিছু বাকী ছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে নিত্য নূতন কলকারখানার সৃষ্টি হইতে থাকাতে, অবিলম্বে তাহাও পূর্ণ হইল। এক্ষণে এই অসামঞ্জস্যের সীমা চরমে পৌঁছিয়াছে, এবং সমাজ রক্ষা করিতে হইলে, অবিলম্বে ইহার প্রতিকার আবশ্যক। মার্ক্স বলেন, একমাত্র সোসিয়ালিজম্ দ্বারাই ইহার প্রতিবিধান সম্ভবপর।

নিঃসহায় শ্রমজীবীগণকে ঠকাইয়াই যে মূলধনীরা লাভবান হইতেছে, মার্ক্স তাহাও প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, বিনিময়ের উপরেই ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত এবং প্রত্যেক বিনিময়-কার্য্যেই দুইটী পক্ষ আছে,—ক্রেতা ও বিক্রেতা। বিক্রেতার লক্ষ্য থাকে, ক্রেতার নিকট যতদূর সম্ভব অধিক দাম আদায় করা ; আর, ক্রেতার লক্ষ্য থাকে যথাসম্ভব কম দাম দেওয়া। কিন্তু দুইজনের কেহই যখন কাহারও অধীন নহে, তখন পরস্পরকে ঠকান বড় সহজ নহে। ফলতঃ, ক্রেতা যদি বুঝিতে পারে যে, তাহার নিকট হইতে অধিক দাম আদায় করা হইতেছে, তবে সে উহা নিশ্চয়ই কিনিবে না। অথচ ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা কত লোকে অল্পদিনের মধ্যেই লক্ষপতি হইতেছে, প্রতিনিয়তই ইহা আমরা দেখিতে পাইতেছি। মার্ক্স বলেন, মজুরদিগকে তাহাদের পরিশ্রমের বাবদ ন্যায্য পাওনা হইতে প্রতারণা করিয়াই ব্যবসায়ী বা মূলধনীগণ এই লাভ করিতেছে। শ্রমজীবীরা সর্ব্বদাই ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির ; তাহারা যে জোটবদ্ধ হইয়া প্রবল পরাক্রমশালী মূলধনী সম্প্রদায়ের নিকট হইতে ন্যায্য পাওনা আদায়ের দাবী করিবে, ইহা নিতান্তই অসম্ভব ; বরং তাহারা কোনও রকমে কায়ক্লেশে বাঁচিয়া থাকিতে পারিলেই স্ব স্ব অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিয়া থাকে। শ্রমজীবীগণকে ফাঁকি দিয়া মহাজন বা মূলধনীগণ যাহা আত্মসাৎ করিয়া থাকে, মার্ক্স তাহার নাম দিয়াছেন, "উদ্বর্ত্ত মূল্য" (Surplus Value)। তিনি বলেন যে, যে ব্যবসায়ে এই "উদ্বর্ত্ত মূল্যের" পরিমাণ যত বেশী, সেই ব্যবসায়ে লাভও তত বেশী। পূর্ব্বে ইহার পরিমাণ কম ছিল—কিন্তু আজকাল নিত্য নূতন কলকারখানার সৃষ্টি হওয়াতে, ইহার পরিমাণ ক্রমেই বাড়িতেছে, সুতরাং শ্রমজীবীরা ক্রমেই বেশী ফাঁকিতে পড়িতেছে।

ব্যবসাবাণিজ্যের দ্বারা যে লাভ হয়, তাহাতে শ্রমজীবীদেরও যে একটা ন্যায্য দাবী আছে, তাহাই প্রমাণ করিবার জন্য মার্ক্স দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, মজুরদের পরিশ্রমের ফলেই পণ্য-দ্রব্যের "মূল্য" উৎপন্ন হইয়া থাকে ; এবং এই "মূল্যের" ন্যায়সঙ্গত অংশ হইতে শ্রমজীবীগণকে বঞ্চিত করিয়াই মূলধনীরা লাভবান হইতেছে। মার্ক্স বলেন যে, কোনও দুই জিনিসের বিনিময় করিতে হইলেই, উহাদের এমন একটা সাধারণ গুণ থাকা চাই, যদ্দ্বারা এই দুই দ্রব্যের "বিনিময়-মূল্য" (Value in Exchange) নির্দ্ধারিত হইতে পারে। তাঁহার মতে শ্রমজীবীদের পরিশ্রমই এই সাধারণ মাপকাঠি। যাহাদের প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে পণ্যের মূল্য উৎপন্ন হইতেছে, তাহারাই অন্নাভাবে চক্ষে নিয়ত সরিষার ফুল দেখিতেছে, অথচ অন্যে তাহা বিক্রয় করিয়া লক্ষপতি হইতেছে, এতদপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে। শ্রমের প্রকৃতিগত কোন পার্থক্য আছে, মার্ক্স তাহা স্বীকার করেন না—তাঁহার কাছে, একজন সামান্য রাজমিস্ত্রী ও পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর, উভয়ের পরিশ্রমই তুল্য-মূল্য। তাঁহার মতে যে জিনিস তৈয়ারী করিতে যত অধিক সময়ব্যাপী শ্রমের দরকার, সেই জিনিসের মূল্যও তত অধিক।

মার্ক্স বলেন যে, সমাজের দুঃস্থ শ্রেণীর উপর এই অত্যাচার অবিচার যে শুধু উনবিংশ শতাব্দীরই আবিষ্কার, তাহা নহে। অতি প্রাচীনকাল হইতেই ইহা নানা আকারে ও নানা নামে ইউরোপীয় সমাজে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। গ্রীস ও রোমে দাসত্ব-প্রথা ছিল—মধ্যযুগের ইতিহাস খুলিলে নফর-প্রথার (Serfdom) প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। নাম বিভিন্ন হইলেও, আসল জিনিস কিন্তু একই। দাসত্বপ্রথার আমলেও মুনীবেরা উপযুক্ত পারিশ্রমিক না দিয়া দাসগণকে গায়ের জোরে খাটাইয়া লইতেন ; নফরপ্রথাতেও সামন্ত রাজগণ তাহাই করিতেন। আবার এক্ষণে সেই অতি প্রাচীন জিনিসই "চুক্তি-স্বাধীনতা" (Freedom of Contract) নাম পরিগ্রহ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর সভ্য-সমাজে দেখা দিয়াছে। "চুক্তি-স্বাধীনতা" বলিতে প্রধানতঃ চুক্তিকারী উভয় পক্ষেরই কার্য্য-স্বাধীনতা বুঝায়। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর চুক্তিস্বাধীনতার অর্থ এই যে, কেবল মূলধনীগণই মজুরদিগকে যথেচ্ছভাবে খাটাইয়া লইবে—কেহই তাহাদিগকে এ কার্য্যে বাধা দিতে পারিবে না।

কিন্তু ইহাতে অপর পক্ষের অর্থাৎ শ্রমজীবীদের স্বাধীনতার লেশ মাত্রও নাই। যাহারা পেটের দায়ে সর্ব্বদাই অন্যের দ্বারস্থ, তাহাদেরও স্বাধীনতা আছে বলিলে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেওয়া হয় মাত্র।

বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থাতে শুধু যে শ্রমজীবীরাই প্রতারিত হইতেছে, তাহা নহে। মার্ক্স বলেন যে, ইহাতে মূলধনী-সম্প্রদায়েরও ধ্বংসের পথ ক্রমশঃই বিস্তৃততর হইতেছে।

তীব্র প্রতিযোগিতাই আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যের মূল সূত্র। এই প্রতিযোগিতা-সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া অতি অল্প লোকেই শেষ পর্য্যন্ত টিকিয়া থাকিতে পারে। একটু অসাবধান বা কলকারখানা একটু পুরাণা ধরণের হইলেই, ব্যবসাক্ষেত্রে তাহার তৎক্ষণাৎ পতন অবশ্যম্ভাবী। সর্ব্বদাই যুদ্ধের জন্য সশস্ত্র অবস্থায় প্রস্তুত থাকিতে হয়। এইরূপ ভাবে জীবনযাপন যে কত সুখকর, তাহা সহজেই অনুমেয়। সকলেরই দৃষ্টি লাভের দিকে, এবং দুর্দ্দমনীয় লাভের আশার বশবর্ত্তী হইয়া ব্যবসায়ীমাত্রেই অন্যান্য সকলের আগে যে যত পারে, বাজারে মাল উপস্থিত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে—প্রতিপক্ষকে ঠকাইবার জন্য নিত্য নূতন ধরণের কলকারখানার সৃষ্টি হইতেছে। কিন্তু বাজারে কি পরিমাণ মালের কাট্‌তি হইতে পারে, সেদিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। পক্ষান্তরে, সাধারণ লোকের আর্থিক অবস্থা দিন দিনই খারাপ হওয়াতে, খরিদ্দারের সংখ্যাও ক্রমে কমিতেছে বই বাড়িতেছে না। ফলে, সময়ে সময়ে বাজারে এত মাল জমিয়া যায় যে, সেগুলি গুদামেই পচিতে থাকে। কলকারখানার মালিকগণকে তখন বাধ্য হইয়া খরচ কমাইবার জন্য অনেক মজুরকে বিদায় দিতে হয়;—যাহারা থাকে, তাহারাও পুরা মজুরী পায় না। নিরন্ন শ্রমজীবীদের সংখ্যা যত বাড়ে, মূলধনীদের পক্ষে ততই সুবিধা বটে, কারণ, তাহা হইলে তাহারা ইহাদিগকে রিজার্ভ সৈন্যদলের ন্যায় আবশ্যক মত কাজে লাগাইতে পারে। কিন্তু ইহাও দেখা যায় যে, মূলধনীদেরও অনেকেই এই বিষম ধাক্কা সামলাইতে না পারিয়া একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যায়। পূর্ব্বে ব্যবসায়ের এই "সঙ্কটাবস্থা" (Crisis) অপেক্ষাকৃত অধিক কাল পরে পরে আসিত; কিন্তু প্রতিযোগিতার তীব্রতা যতই বাড়িতেছে—দুইটী সঙ্কটাবস্থার মধ্যবর্ত্তী ব্যবধানও ততই কম হইয়া আসিতেছে। ফলতঃ, এক্ষণে এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, কেহই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না যে, কাল তাহার অদৃষ্টে কি আছে। মার্ক্স বলেন, সর্ব্বদা এই সংশয়াবস্থা কখনই সমাজশরীরের স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহাতে স্পষ্টই দেখা যাইবে যে, মার্ক্স কেবল প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার দোষই দেখাইয়াছেন—কিন্তু তাঁহার কল্পিত ভবিষ্যতের আদর্শ-সমাজ যে কিরূপ আকার ধারণ করিবে, বা কি নীতিতে পরিচালিত হইবে, তৎসম্বন্ধে তিনি কোথায়ও স্পষ্ট করিয়া কিছুই বলেন নাই। তবে তাঁহার পুস্তকাদি হইতে এ সম্বন্ধে একটা মোটামুটী ধারণা অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

মার্ক্সের আদর্শ এই সমাজে উচ্চনীচ, ধনীনির্ধন প্রভৃতি কোনও প্রকার শ্রেণীবিভাগ থাকিবে না। এই সমাজভুক্ত সকলেই স্বাধীন হইবে, সকলেরই সমান অধিকার থাকিবে। বর্ত্তমান সমাজে শ্রেণীবিভাগ থাকাতেই এক শ্রেণীর লোক অপরাপর শ্রেণীর উপর নানাবিধ অত্যাচার অবিচার করিয়াও নিষ্কৃতি পাইতেছে;—কিন্তু ভবিষ্যৎ সমাজ হইতে ইহা উঠাইয়া দিলে কেহ কাহারও উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিবে না, এবং কর্ত্তৃত্ব না থাকিলে, কেহ কাহারও উপর অত্যাচারও করিতে পারিবে না।

আজকাল যেমন দেশের যাবতীয় জোতজমি কয়েকজন মাত্র লোকে ভাগ করিয়া লইয়া নিজেদের লাভের জন্য তাহার যথেচ্ছ ব্যবহার করিতেছে, ভবিষ্যতে কেহ সেরূপ করিতে পারিবে না। সমগ্র জাতির প্রতিনিধিস্বরূপ গবর্ণমেণ্টই দেশের যাবতীয় জমীর মালিক হইবে, এবং উহার যখন যেরূপ ব্যবহার করিতে হয়, গবর্ণমেণ্ট হইতেই তাহার সম্যক্‌ ব্যবস্থা করা হইবে। কলকারখানা প্রভৃতিও কেহ রাখিতে পারিবে না। কারণ, সম্পত্তি ভোগ করিবার অধিকার বংশগত হইলেই, কালে তাহা হইতে শ্রেণীবিভাগের উৎপত্তি হওয়া

অবশ্যম্ভাবী।

সমাজের ব্যবহারের জন্য যাহা যাহা দরকার হইবে, সরকারী কারখানায় গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে তাহা তৈয়ার হইবে। এখনকার মত তখনও দেশের লোকেই এই সমস্ত সরকারী কারখানায় কাজ করিবে, কিন্তু এখন যেমন টাকা পয়সাতে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়, তখন তাহা হইবে না। সরকারী কারখানায় যে যত সময় কাজ করিবে, তজ্জন্য সে একখানি চেক্ বা নিদর্শন-পত্র পাইবে। সরকারী কারখানায় যে সমস্ত জিনিস তৈয়ারী হইবে, তাহা সাধারণের ব্যবহারের জন্য একটা সাধারণ গোলা বা ভাণ্ডারে সংগৃহীত থাকিবে। কাহারও কোনও জিনিসের দরকার হইলে, ঐ গোলার "গোলদারকে" পূর্ব্বোক্ত চেক দেখাইলেই সে তদনুসারে তাহার প্রয়োজনীয় জিনিস তাহাকে প্রদান করিবে। এই সমাজে টাকা কড়ি সোনারূপা বা উহাদের অনুরূপ কোনও মুদ্রার প্রচলন থাকিবে না। কারণ, মুদ্রার প্রচলন থাকিলেই লোকে উহা ক্রমে ক্রমে সঞ্চয় করিয়া অদূর ভবিষ্যতে পুনরায় সমাজে শ্রেণীবিভাগের সঞ্চার করিবে। কিন্তু পরিশ্রমের পরিবর্ত্তে সে যদি মজুরী টাকাতে না পাইয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যে পায়, তাহা হইলে এরূপ ভাবে সঞ্চয় করা সম্ভবপর হইবে না। এই ব্যবস্থাতে আজকালকার মত হাটবাজারেরও দরকার হইবে না। কারণ, প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিস একস্থানেই রক্ষিত হইবে এবং পরিশ্রমের নিদর্শন স্বরূপ চেক্ লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেই, যাহার যে জিনিসের দরকার, পরিশ্রমের অনুপাত অনুসারে সে তাহাই পাইবে।

মার্ক্স আরও বলেন যে, এক্ষণে এক শ্রেণীর লোক সমাজের অপরাপর শ্রেণীর উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেছে বলিয়াই তাহাদের সেই ক্ষমতার রক্ষা ও পরিচালনের জন্যই গবর্ণমেণ্টের দরকার হইয়া থাকে। কিন্তু যখন সমাজ হইতে এই শ্রেণীবিভাগ উঠিয়া যাইবে, যখন সকলেই সমান ও স্বাধীন হইবে, তখন আর কোনও প্রকার গবর্ণমেণ্টেরই আবশ্যক হইবে না; সামাজিক কার্য্য পরিচালনের জন্য একটা "পরিচালন-সমিতি" (Administration) থাকিলেই চলিবে। কিন্তু কি প্রণালীতে এই পরিচালন-সমিতি গঠিত হইবে, মার্ক্স সে সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই।

উপরে সোসিয়ালিজম্ সম্বন্ধে মার্ক্সের যে মতামত প্রদত্ত হইল, তাহাতে স্পষ্টই দেখা যাইবে যে, উহার অধিকাংশই তাঁহার কিছুমাত্র নিজস্ব নহে; রবার্ট ওয়েন্, সাঁ-সিমোঁ, ফুরিয়ে প্রভৃতি পণ্ডিতগণ অনেক পুর্ব্বেই এই সমস্ত কথার যথেষ্ট আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তথাপি তাঁহাদের সহিত মার্ক্সের একটা বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হইবে। ফুরিয়ে প্রভৃতি বিবেচনা করিতেন যে, তাঁহারা একবার যাহা মুখ হইতে বাহির করিবেন, পৃথিবীশুদ্ধ লোক অবনত মস্তকে তাহাই মানিয়া লইবে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই তাঁহারা যখনই যাহা বলিয়াছেন, তাহার প্রমাণের জন্য কোনও যুক্তিতর্কের অবতারণা করা দরকার বোধ করেন নাই। কিন্তু মানুষের স্বভাব সেরূপ নহে; উপযুক্ত যুক্তি বা প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত সে কাহারও মুখের কথা ধ্রুব বলিয়া গ্রহণ করিতে চায় না। মার্ক্স লোকচরিত্রের সহিত বিশেষ পরিচিত ছিলেন; তাই নূতন কিছু না বলিলেও, পুরাতন কথাই নানারূপ যুক্তিতর্কের আবরণ দিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া বলিয়াছেন। তিনি যখনই যাহা বলিয়াছেন, তখনই তাহার সমর্থনের জন্য ইতিহাস হইতে রাশি রাশি প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। অবশ্য এ কথা বলা যায় না যে, তিনি যে সমস্ত প্রমাণ দেখাইয়াছেন, তাহার সবগুলিই ঐতিহাসিক সত্য বা তাঁহার সিদ্ধান্ত সমস্তই অভ্রান্ত; কিন্তু ইহা ঠিক যে তিনিই সোসিয়ালিজম্‌কে একটা বিজ্ঞানসম্মত আকার প্রদান করিয়া অনেকের মনে উহার প্রতি যে একটা নিতান্ত অশ্রদ্ধা ও সন্দেহের ভাব ছিল, তাহার অপনোদন করিয়াছেন। মার্ক্স যদি আর কিছুই না করিয়া শুধু এইটুকুই করিয়া যাইতেন, তাহা হইলেও তাঁহার নাম সোসিয়ালিজমের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইবার যোগ্য হইত।

শ্রীমন্মথনাথ মজুমদার।

পুরলক্ষ্মী

(বসন্তে বিক্রমপুর)

হিজল ফুলে উজল অঙ্গ—শ্যাম বুঝি আজ খেল্‌ছে ফাগ,
কাজল-কাল স্বচ্ছ দীঘী, চা'র ধারে তার কলার বাগ।
আম্র-মৌলি বোলে ভরা, শষ্পে ছাওয়া শ্যামল বাট,
বৃদ্ধ বটের জটিল জটায় জুড়ে গেছে আধেক মাঠ।
"বড়ৈ" গাছে স্বর্ণলতা মেলিয়ে দেছে সোনার চুল,
"বৌয়া"-বৌ এব বাহার কত, কর্ণে মতির শুভ্র দুল।
দুর্ব্বা ঘাসে নীহার হাসে- দ্রব হীরাব বিন্দু রে!
কৌটা খুলে ডালিম-বধূ ললাট লেপে সিন্দুরে।
পলাস-পিসির বেসর নাকে, আনন্দের আর সীমা নাই,
মান্দার মরে "খান্দার" করে জায়গা জমীর সীমানায়!
কৃষ্ণচূড়ার মাথায় চূড়া—মেজাজটা তাই কাপ্তানি,
আল্‌তা নিয়ে পাড়া বেড়ায় শিমুলমণি নাপ্তানী।
কনকচাঁপার সিংহাসনে রাজে আমাব রাজরাণী,—
সে যে আমার পুরলক্ষ্মী—এ যে তারি রাজধানী।

সবুজে আজ বুজে গেছে ডোবা, ডাঙা, গোষ্ঠ, মাঠ ;
"মাউছা রাঙা" অষ্ট প্রহর "মৎস্যপুবাণ" কচ্ছে পাঠ।
"গৈয়া" পাতায় গরদ পাতা, জামে জরীর জামদানী,
কুমড়া ফুলে ভোম্‌রা বুলে—সুর বাহারের আমদানি!
"কানাই লড়ি"র সানাই দোলে, চালে লাউ এর তম্বুরা,
বাস্তুভিটায় আতর ছিটায় যুঁথী, জামির, "জম্বুরা"।
ভাট ফুলের খোলাভাট খোলা আছে গাং-ধারে,
শালিখ, টিয়া গাছে গাছে গাহে রেখাব গান্ধারে!
সখিন প্রাণের দখিণ দুয়ার খুলে গেছে ঝটিতি,
"কুটুম আয়" ডেকে আনে নিত্য নবীন অতিথি।
সঞ্চারিণী তরুণ লতা—ললিতা ও বিশখি,
করুণ সুরে গান ধরেছে—"ঢেউ দিও না গো সখি!"
চরণতলে গাল্‌চে পাতা, মাথায় ফুলের তাজখানি
মা যে আমার পুরলক্ষ্মী—মা যে আমার রাজরাণী!

শ্রীকুলচন্দ্র দে।

অবিমারক *

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

প্রবেশক

বিদূষকের প্রবেশ

বিদূ। বড় লোকের ছেলেরাও তাদের কখন কি অবস্থা হবে বুঝ্‌তে পারে না। রাজকুমার অবিমারক ঋষি-শাপে কুল-ভ্রষ্ট হয়ে চণ্ডাল হয়ে আছেন। সে কথা, নিজেব বিদ্যাবুদ্ধির কথা, আর গুরুজনের কথা না ভেবে যে দিন হাতীর ভয়ে ভীত কুন্তিভোজকুমারী কুরঙ্গীকে দেখেছেন, সেদিন থেকে তিনি যেন আর কেউ হয়ে গেছেন। বেশী আর কি বলব, আমার সঙ্গেও যেন আর মেলামেশা কত্তে চান না! সব সময় যেন ভাবনায় ডুবে থাকতেই ভালবাসেন। লোকে বলে, বিপদ একা আসে না। কথাটা ঠিক। কিন্তু রাজকুমারীর সঙ্গে অবিমারকের মিলন হবে কি ক'রে? রাজকুমারী কুরঙ্গী নিজেই বল্‌ছেন,

---

* ভ্রমক্রমে গত সংখ্যায় নিম্নলিখিত অংশ মুদ্রিত না হওয়ায়, এইবারে মুদ্রিত হইল।—প্র,স।

নাট্যোল্লিখিত পাত্রপাত্রীগণ

পুরুষগণ

কুন্তিভোজ ...	... রাজা (কুরঙ্গীর পিতা)।
কৌঞ্জায়ন ও ভূতিক	... কুন্তিভোজের মন্ত্রী।
জয়সেন ...	... কুন্তিভোজের দ্বাররক্ষক।
অবিমারক ...	... সৌবীররাজ-পুত্র।
সন্তুষ্ট ...	... বিদূষক (অবিমারকের সখা)।
সৌবীর-রাজ ...	... অবিমারকের পিতা।
নারদ ...	... দেবর্ষি।
বিদ্যাধর .	.. গন্ধর্ব্ব।

অবিমারক নীচ বংশের লোক। আমিও ত যাতে কেউ আমাকে নিন্দা কত্তে না পারে, এই ভেবে ব্রাহ্মণদের বাড়ীতেই আনাগোনা করি, কিন্তু রাজকুমারের বাসায় লুকিয়ে যাই।

চেটীর প্রবেশ

চেটী। রাজবংশের (অবিমারকের) অবস্থা-বিপর্য্যয় হওয়ায় বেশী কিছু কাজ করার নেই। তাই নগর দেখতে বেরিয়েছি। ঐ যে বিদূষক সন্তুষ্ট যাচ্ছেন। যাই, ওর সঙ্গে একটু হাসি ঠাট্টা ক'রে খানিকক্ষণ দুঃখের বোঝাটা একটু হাল্‌কা করি। (নেপথ্যে) ও কৌমুদিকা, বামুন পেলে? কি বল্‌ছ? পাও নি!

বিদূ। চন্দ্রিকা, ব্যাপারটা কি!

চেটী। ঠাকুর, একজন বামুন খুঁজ্‌ছি।

বিদূ। বামুনের কি দরকার?

চেটী। বামুনের আর দরকার কি! খাওয়াব জন্য নেমন্তন্ন করব।

বিদূ। আমি তবে কে? শ্রমণক নাকি?

চেটী। ঠাকুর, তুমি ত বেদ পড় নি।

বিদূ। কি! আমি বেদ পড়ি নি! আচ্ছা, তবে তোমাকে শুনিয়ে দিচ্ছি। রামায়ণ নামে একটি নাট্যশাস্ত্র আছে। তার পাঁচটি শ্লোক আমি এক বৎসর ধরে পড়েছি, কিন্তু খাঁটি মুখস্থ কত্তে পারি নি।

চেটী। হাঁ ঠাকুর জানি। তোমাদের বংশেরই এই রকম চমৎকার মেধা।

বিদূ। কেবল যে শ্লোক পড়েছি, তা নয়; শ্লোকগুলির অর্থও বুঝেছি। আর একটা কথা। আমার এটা বিশেষ গুণ। অক্ষর চেনে, অর্থ বুঝে, এমন ব্রাহ্মণ তুমি বড় বেশী পাবে না।

চেটী। আচ্ছা, তবে বল ত এটা কি অক্ষর? (একটা নামমুদ্রা দেখাইল)।

বিদূ। (সভাত) না জেনে কি বলব? আচ্ছা, এ কথাই বলা যাক। (দেখিয়া), দেখুন, আমার পুথিতে এই অক্ষরটা নেই।

চেটী। যদি অক্ষরটা বল্‌তে না পার, তা হ'লে দক্ষিণা না নিয়ে খেতে হবে।

বিদূ। আচ্ছা, বেশ। তাতেই রাজি আছি।

চেটী। আচ্ছা, দেখি ঠাকুর মশাই, আপনার আংটিটি।

বিদূ। দেখ, দেখ, এ দেখবার জিনিসই বটে।

চেটী। (আংটি লইয়া) এই যে রাজকুমার (অবিমারক) এ দিক পানেই আস্‌ছেন।

বিদূ। (ফিরিয়া দেখিয়া) কোথায়? কোথায় রাজকুমার?

চেটী। মূর্খ বামনঠাকুরকে ঠকিয়েছি। এই জনতার ভিতর ঢুকে চৌমাথায়ই বামুনঠাকুরকে ফাঁকি দিয়ে পালাব। [প্রস্থান।

বিদূ। (চারিদিকে তাকাইয়া) চন্দ্রিকে! ও চন্দ্রিকে! অ্যাঁ, কোথা গেল চন্দ্রিকা। কি! আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালাল না কি। আমি জানতুম, এই মাগী গাঁটকাটা। তবু নেমন্তন্নের লোভে ফাঁকিতে পড়লুম! (পরিক্রমণ করিয়া) নেমন্তন্নটা ছল মাত্র এখন বুঝলুম। ঐ যে মাগী পালাচ্ছে! ওরে পাপিষ্ঠা

স্ত্রীগণ

কুন্তিভোজের রাণী।

কুরঙ্গী ... কুন্তিভোজের কন্যা।

সুদর্শনা .. .. অবিমারকের প্রকৃত মাতা, [কাশিরাজের মহিষী, যিনি অবিমারককে তাঁহার ভগিনী সৌবীর-রাজমহিষীর হস্তে দান করিয়াছিলেন।

নলিনিকা, মাধবিকা, বিলাসিনী ... } কুরঙ্গীর সহচরী।

বসুমিত্রা, হরিণিকা...... কুন্তিভোজ-মহিষীর দাসী।

সৌদামিনী .. ... বিদ্যাধরী।

প্রতিহারী, চেটী ও ধাত্রী।

মাগী, দাঁড়া, দাঁড়া। কি! তবু পালাচ্ছে! আচ্ছা, আমিও তা হ'লে মাগীকে তাড়া করব। স্বপ্নে হাতীতে তাড়া করলে পা যেমন যেখানে সেখানে পড়ে, আমার পাও তেমন যেখানে সেখানে পড়ছে। এই মাগীর কথা রাজকুমারকে বলতে হবে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

অবিমারক উপবিষ্ট

অবি। হাতীর শুঁড়ের জলে তার শরীরটি ভিজে গেছিল, তার চোখ দুটি ভয়ে আকুল, বিষণ্ণ ও চঞ্চল হয়েছিল। তেমনি ভাবে রোজ তাকে স্বপ্নে দেখতে পাই। আর কথা যেমন জাতিস্মরের মনে পড়ে, তার কথাও তেমন আমার মনে পড়ে।

অনঙ্গদেবের সঙ্গে যুদ্ধ করে কার সাধ্য।

সেদিন থেকে আর কারও রূপ দেখে আমার চোখের তৃপ্তি হয় না। তাকে মনে ক'রে আমার মন যুগপৎ ক্লিষ্ট ও বিষণ্ণ হয়। আর, (তাকে ভেবে ভেবে) আমার মুখের রং পাণ্ডুর হয়েছে, এবং শরীর কৃশ হয়ে গেছে। দিনের বেলায় কেবল দুঃখে ডুবে থাকি, আর রাত্রে মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ি।

কিন্তু পুরুষের পক্ষে এরূপ চঞ্চল হওয়া উচিত নয়। তার কথা মনে ভাবলেও অনঙ্গদেবের প্রভাবের বশবর্ত্তী হ'তে হয়। যাক্, তার কথা আর ভাব্‌ব না। (মনে ভাবিয়া) আহা! কেমন তার রূপ! আবার যেমন রূপ, তেমন যৌবন যেমন যৌবন, তেমন আবার কমনীয়তা।

হয়, এই যুবতীর সমস্ত সৌন্দর্য্য বিধাতা নিজের মনের মত ক'রে সৃষ্টি করেছেন, নয়, চন্দ্রের সমস্ত সৌন্দর্য্য কুরঙ্গীর রূপ ধারণ করেছে; নয়, স্বয়ং লক্ষ্মী ভীত হয়ে ক্ষীরোদসাগরশায়ী শ্রীকৃষ্ণকে ছেড়ে অন্য স্ত্রীরূপে মহারাজের অন্তঃপুরে বাস কচ্ছেন!

কি! আমি আবার তার কথা ভাবতে লাগলুম যে! কি আর করব? আমি যে মনকে শাসনে রাখতে পাচ্ছি না! অনেক চেষ্টা ক'রেও মুহূর্ত্তের জন্যও ত মনকে শাসনাধীন কত্তে পাচ্ছি না! অসদুপদেশপূর্ণ পুথি যেমন উচ্ছৃঙ্খল পথ দেখিয়ে দেয়, আমার মনও ঠিক তেমনি হয়েছে।

না, মনকে জয় করা অসম্ভব। কুরঙ্গীকে ভাবতেই হবে। রমণীর সমস্ত গুণ তাতেই মিলিত হয়েছে।

(চিন্তাকুলিত চিত্তে উপবেশন)।

ধাত্রী ও নলিনিকার প্রবেশ

ধাত্রী। (চিন্তা করিয়া) সমস্তই পণ্ড হ'ল! যদি তাই করা যায়, তা হ'লে রাজবংশের কলঙ্ক, আর যদি না করা যায়, তা'হলে রাজকুমারীর জীবন সঙ্কট। আমি ত অনেক উপায় ভেবে দেখলুম। আজ পর্য্যন্তও রাজকুমারী আমার কাছে সব গোপন রেখেছে। কিন্তু বলতে গেলে, গোপনই বা কি রেখেছে? সেদিন থেকে বেশবিন্যাস ছেড়ে দিয়েছেন। খাওয়ায় রুচি নেই, কারুর সঙ্গে মেশা নেই। সর্ব্বদাই দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়েন, প্রলাপ বকেন, কি বলেন, নিজেই তা বোঝেন না। নিজে নিজে হাসেন, নির্জ্জনে কাঁদেন, রোগের ভাণ করেন। দিন দিন কৃশ হচ্ছেন। মুখ পাণ্ডুবর্ণ হচ্ছে। কিন্তু একটা বড় আশ্চর্য্যের কথা। এরূপ অবস্থা হ'লেও, লজ্জা, ভয়, বংশগৌরবের বা স্বভাবচাপল্যের বশবর্ত্তী হয়ে কারুর সঙ্গে এ সম্বন্ধে কোন কথা বলেন না।

নলিনিকা। কথা বলেন না, কি বল্লে? আমার কাছে সব বলেন।

ধাত্রী। হাঁ, তোমার মনের ভাবটি আমি জানি। কিন্তু অবস্থাটি ভাল করে জেনে, তবে কুমারীর সঙ্গে তার মিলন ঘটাবার উপায় করো।

নলি। কিন্তু যার এত গুণ, সে কি নীচজাতীয় হতে পারে?

ধাত্রী। হাঁ, এ বিষয়ে সন্দেহ আছে বটে। আমিও মহারাণীর কাছে মন্ত্রীমশায়কে বলতে শুনেছি, সেই লোকটি কখনও এরূপ হতে পারে না। শুধু কোনও কারণে নিজকে নীচজাতীয় বলে পরিচিত কচ্ছে।

নলি। তিনি কে হ'তে পারেন?

ধাত্রী। যদি সে সন্দেহ না থাকে, তা হ'লে এর চাইতে গুণী জামাই আর কোথা পাবে?

(নেপথ্যে)

সম্পত্তি, রূপ, বিদ্যা ও গুণ থাকতে পারে,কিন্তু অন্ত্যজের চরিত্র ভাল হয় না। যথাকালে তাঁর বংশের নাম জানতে পারবে, এটা নিশ্চয়। বংশ সম্বন্ধে সন্দেহ করো না। তোমাদের কর্ত্তব্য সম্পন্ন কর। শেষে মঙ্গল হবে।

ধাত্রী। নলিনিকা, এ কথা কে বল্‌ছে?

নলি। কৈ! এখানে ত কাউকে দেখছি না!

ধাত্রী। আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠল। এ নিশ্চয় দৈববাণী। আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছি যে, ইনি (অবিমারক) সামান্য মানুষ নন।

নলি। এখন তার বংশ সম্বন্ধে সন্দেহ গেল। এখন ইনি আমাদের কথামত কাজ করবেন কি না, জানি না। ইনি ধন্য! এমন ক'রেই রাজকুমারীর মনটি চুরি করেছেন! বেশী আর কি বলব। অনঙ্গদেবও যদি আমাদের রাজকুমারীকে দেখেন, তা হ'লে তিনিও পাগল হবেন, আমার মনে হয়।

ধাত্রী। ওগো, এই যে তার বাড়ী। যে দিন হাতী ক্ষেপেছিল, আমরা দুজন সেদিন এখানেই এসেছিলাম।

নলি। ওগো, দরজাটি বেশ মঙ্গল জিনিস দিয়ে সাজান রয়েছে। বাঃ, দেখতে ত বেশ সুন্দর। এস, ঢুকে পড়ি।

ধাত্রী। ওগো নলিনিকা! ইনি কোথায়? কি বলছ?

অন্তঃপুরে বড় ঘরে আছেন! এই যে ইনি একা যেন বসে বসে কি ভাবছেন!

নলি। এস, ঢুকে পড়ি।

ধাত্রী। আচ্ছা, তাই করা যা'ক। (প্রবেশ করিয়া), ভাল আছেন?

অবি। হায়! কেমন তার রূপ!

ধাত্রী। (আকুঞ্চিত হইয়া) না জানি কি হল! ভাল আছেন?

অবি। (তার) বক্ষস্থলটি উন্নত, আর শরীরটি নিতম্বভারে খিন্ন।

ধাত্রী। এ কি! প্রলাপ বক্‌ছে যে!

অবি। মুখখানি দেখলেই চোখ জুড়ায়, তেলাকুচের মত স্বাভাবিক তাম্রবর্ণ তার ঠোঁট দুটি।

ধাত্রী। যার রূপ দেখে ইনি এত মুগ্ধ হয়েছেন, সেই লোকই ধন্য।

অবি। ভয়াকুল অবস্থায়ও যার শরীরের সৌন্দর্য্য দেখে নয়ন এত মুগ্ধ হয়!

ধাত্রী। ব্যাপারটা এখন ভাল বোঝা গেল।

অবি। স্বাভাবিক কার্য্যে * লিপ্ত থাকলে না জানি তার সৌন্দর্য্য আরও কত বেশী!

ধাত্রী। সেই (রাজকুমারী) তাঁকে এত মুগ্ধ করেছে!

অবি। ঠিকই বলেছেন। তারই জন্যে এঁর এই অবস্থা।

ধাত্রী। তুমি ঠিক বুঝেছ। (অবিমারকের প্রতি) ভাল আছেন?

অবি। (লজ্জিত ভাবে) আসুন, আসুন।

দুজনে। মঙ্গল!

অবি। আপনাদের যখন দেখা পেয়েছি, তখন হবে।

ধাত্রী। মশায়, ভাবছেন কি?

অবি। শাস্ত্রের কথা ভাবছি।

ধাত্রী। নির্জ্জনে ভাবছেন এমন সুন্দর শাস্ত্রটির নাম জানতে পারি কি?

অবি। যোগশাস্ত্রের কথা ভাবছি। †

ধাত্রী। (হাসিমুখে) আপনার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। যোগশাস্ত্রই যেন হয়।

অবি। (স্বগত) এই কথাটার অর্থ কি? আমার মনের ভাব থেকে কি আমি অন্য রকম ভাবছি? (প্রকাশ্যে) আপনাদের কথার অর্থ কিন্তু আমি বুঝতে পাচ্ছি না।

---

* 'সুরতান্তর প্রচুর বিভ্রমং" এই অংশের আর একটি অর্থ আছে।

† 'যোগশাস্ত্রং' দ্ব্যর্থক। 'মিলনের' কথা ভাবছি।

ধাত্রী। আমরা 'যোগ' (মিলন) ঘটাব মনে করেই এসেছি। মশায়ও দেখছি 'যোগই' চান। রাজবাড়ীতে নির্জন যায়গায় আমাদের কাজ স্থির হয়ে আছে। সেখানে আপনার চেয়েও বেশী উৎসুক হয়ে আর একজন মিলনের কথা ভাবছে। তার সঙ্গে কেমন করে মশায়ের মিলন ঘটাব তাই ভাবছি।

অবি। আজ বুঝি আমার ভাগ্য প্রসন্ন হল। (উঠিয়া) আপনারা আমার জীবন ফিরিয়ে দিলেন।

সুধাকরের মত সুন্দর তার মুখখানি থেকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির তেজ ছুটে পড়ছে। যে দিন হাতী ক্ষেপেছিল, ভয়ে সেদিন তার মুখখানির পরিবর্ত্তিত সৌন্দর্য্য দেখে আমি এতদিন উন্মত্ত হয়ে আছি। এখন আপনাদের বাক্যামৃত পান করে পুনরায় প্রকৃতিস্থ হলেম।

ধাত্রী। ভাগ্যে মশায় রাজকুমারীতে অনুরক্ত হয়েছিলেন! আর বাজে কথা বলে ফল নেই। আজই আপনাকে কন্যাপুরে ঢুকতে হবে। কন্যাপুররক্ষক অমাত্য আর্য্য-ভূতিক মহারাজ কর্ত্তৃক সৎকৃত হয়ে কাশিরাজের দূতের সঙ্গে আজ চলে গেছেন।

অবি। হাঁ, বেশ কথা। রোগী ঔষধ পেয়ে কখনও অনাদর করে না।

ধাত্রী। কন্যাপুরে ঢোকাই যা কষ্ট। একবার ঢুকলে চিরকাল থাকতে পারবেন।

অবি। ধরে নিন, ঢুকে গিয়েছি। দালানগুলির সমস্ত দরজা বেশ করে খুলে রাখবেন।

ধাত্রী। হাঁ, ভেতরকার যা কিছু সব আমরা করে রাখব। আপনি সাবধানে ঢুকবেন।*

অবি। আচ্ছা, রাজবাড়ীর অন্দর মহলটি একবার বর্ণনা করুন ত।

ধাত্রী। আচ্ছা।

অবি। রাজার মহলের বর্ণনা শুনে আমার মন বলছে সেখানে আমার কোনও বিপদ ঘটবে না। দৈব প্রতিকূল না হলে পৌরুষকে দোষ দিতে নেই।

(চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, এই ব্যাপারে কি চিহ্ন দেখিয়ে আমি পরে আপনাদের বিশ্বাস জন্মাব ?

দু'জনে। এইটিই আমাদের বিশ্বাসের চিহ্ন। † মশায়ের জয় হোক।

অবি। আচ্ছা, এখন আসুন। দুপুর রাত্রে আমার প্রতীক্ষা করবেন।

দু'জনে। মশায় যা বলেন। [প্রস্থান।

বিদূ। বাঃ! নগরের ত বেশ শোভা হয়েছে! সূর্য্য প্রায় ডুবে এল। দৈয়ের খণ্ডের মত সাদা সাদা নগরের বড় বড় দালানের বাইরের দরজার পাশের ঘরগুলির দেয়ালের উপর দিনের শেষ রৌদ্র পড়েছে। বোধ হচ্ছে যেন দৈয়েতে গুড় ও মধু মাখিয়ে দিয়েছে। * * * ও নাগরিক উভয়েই বেশ সাজ-গোজ করে, পরস্পরকে নিজের সুন্দর চেহারাটি দেখাবার জন্য বড় বড় দালানের (ছাতের) উপর নানারকম হাবভাব দেখিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে! এ সব ব্যাপার দেখে তাঁর (রাজকুমারের) মনও একটু চঞ্চল হয়েছে। আমি রাত্রিতে তাঁরই সহায় হব ব'লে নগর থেকে বেরিয়েছি। কিন্তু আমাদের পোড়া কপাল! কি একটা দুশ্চিন্তায় পড়ে রাজকুমার যেন আর এক রকম হয়ে গেছেন। এই যে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে তাঁর বাড়ীতে এসে পড়েছি। আজ নগরের বড় বড় দোকানের বড় দরজার পাশের ঘরগুলিতে লোকের মুখে শুনে এলুম যে, রাজকুমারীর ধাত্রী ও সখী তাঁর (রাজ-কুমারের) ঘর থেকে (খানিকক্ষণ হল) বেরিয়ে গেছে। তাঁর বাড়ীতে এদের কি কাজ ? তবে বলা যায় না। পুরুষের কপাল হাতীর শুঁড়ের মত চঞ্চল! যাক্‌ আমাদের অনর্থ। অবস্থানুরূপ রাজবাড়ীতে ঢুকতে হবে। হাঃ! হাঃ! এই যে রাজকুমার! সৌখীন লোকেরা যেমন মুখে বিলাস চূর্ণ মেখে বেরোয়, তিনিও তেমনি

"অপ্রমত্ত এব প্রবিশতু আর্য্যঃ"—'অপ্রমত্ত' শব্দের আর একটা অর্থ আছে, দেখবেন যেন ভুলে যাবেন না। অবশ্য যাবেন।

† এখানে আরও একটি কথা ছিল বলিয়া বোধ হয়।

মুখখানিতে যেন সাদা বিলাস চূর্ণ মেখে এদিক পানেই আসছেন। অথবা যে সকল লোকে দেখতে ভাল, সব জিনিসই তাদের পক্ষে অলঙ্কারের কাজ করে। (প্রকাশ্যে) মশায়ের জয় হ'ক।

অবি। সখা, তুমি নগরে বড্ড দেরী করেছ!

বিদু। আপনি যে নিমন্ত্রণ-বঞ্চিত ব্রাহ্মণের ন্যায় কেবল দিন-রাত্রি ভাবছেন! আমিও দিনমান নগরে ঘুরে বেড়িয়ে সুখ না পেয়ে * * * রাত্রিতে আপনারই সঙ্গে থাকব ব'লে এসেছি।

অবি। সখা তুমি শুনে সুখী হবে, এমন একটা কথা তোমাকে বলব।

বিদু। আপনার শাপের অবসান হয়েছে না কি!

অবি। দূর মূর্খ! যা ঘটবেই, তার জন্য আবার আনন্দ করে কে?

বিদু। তবে কি?

অবি। তুমি কি কুরঙ্গীর ধাত্রী ও সখীকে দেখ নাই?

বিদু। হাঁ! হাঁ! তাদের দুজনকেই দেখেছি বটে। তারা কি এনেছে?

অবি। আমার দুঃখের ঔষধ এনেছে!

বিদু। কৈ! দেখি।

অবি। সময় হলে দেখবে বৈ কি। এখন শোন—

বিদু। বলুন! বলুন!

অবি। যাক্ তবে বাজে কথা। রাজকুমারী আমাকে আজই কন্যাপুরে ঢুকতে বলে পাঠিয়েছেন।

বিদু। (হাসিয়া) কেন আর কষ্ট ক'রে ঢুকে প্রাণটি খোয়াতে চাচ্ছেন? কুন্তিভোজের মন্ত্রীরা বড় বিষম লোক।

অবি। কি, তুমিও বিপদ আশঙ্কা কচ্ছ না কি? তুমি কি জান না যে, আমি একা অক্লেশে সসৈন্য শত্রু বিনাশ করেছি। তাতে আজ পর্য্যন্ত আমার লেশমাত্রও বিপদ ঘটে নি। মানুষের ত দূরের কথা, মেষরূপধারী সেই দানবও ত আমারই বাহুবলেই নিহত হয়েছে।

বিদু। হাঁ, আপনার অদ্ভুত বীরত্বের কথা আমি সব জানি কিন্তু অন্ধকার রাত্রিতে পরের ঘরে ঢোকাটায় বিপদ আছে বৈ কি।

অবি। যাক্, আমার মোট কথা হচ্ছে এই যে, কুন্তিভোজের কন্যাপুরে যেমন করেই হ'ক ঢুকতে হবেই। হে মহা-ব্রাহ্মণ, তুমি এই কার্য্যে সম্মতি দাও।

বিদু। আপনি আমাকে ছেড়ে কোথা যাবেন? আমি আপনাকে ছেড়ে কখনও যাব না। চীৎকার দেবার জন্যও ত একটা লোকের দরকার।

অবি। সখা, তুমি শাস্ত্রের উপদেশ জান না। পরের ঘরে একা ঢুকবে। একজনের সঙ্গে পরামর্শ করবে। অনেকের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। শাস্ত্রের মর্ম্ম হচ্ছে এই। তাই আমি একাই কুন্তিভোজের কন্যাপুরে ঢুকব। আমার জন্য ভেবো না, কারণ—কুন্তিভোজের মুষ্টিমেয় সৈন্য আর টাকা খরচ কল্লে রাজ-বাড়ীতে অক্লেশে ঢুকতে পারা যায়। আমার বাহুবলও বেশ আছে। সুতরাং তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই, সখা।

বিদু। যদি আপনি ঢোকাই ঠিক করে থাকেন, তা'হলে চলুন নগরে ঢুকে পড়ি। সেখানে আমার বন্ধুর বাড়ীতে গিয়ে খানিকক্ষণ দেরী করব।

অবি। বেশ কথা। এখন ভিতরে গিয়ে আহ্নিক করে বাবার অনুমতি নিয়া পরে রাত্রির পোষাক পরে কেউ যেন জানতে না পারে এরূপে নগরে ঢুকে তোমার বন্ধুর বাড়ীতে খানিক দেরী করব।

চেটীর প্রবেশ

চেটী। রাজকুমারের জয় হ'ক। স্নানের জল এনেছি।

অবি। এই আমি যাচ্ছি। তুমি যাও।

চেটী। যে আজ্ঞা, রাজকুমার। [প্রস্থান।

অবি। সখা, সূর্য্য ত ডুবে গেল। চেয়ে দেখ। পূর্ব্বদিক অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছে। পশ্চিম দিক সন্ধ্যায় অরুণ হয়ে উঠেছে। এইরূপে অন্তরিক্ষ দুই ভাগ হয়ে অর্দ্ধনারীশ্বরের শোভা ধারণ করেছে।

বিদু। হাঁ, আপনি ঠিক বলেছেন। দিন শেষ হয়ে গেছে। প্রদোষ আরম্ভ হয়েছে।

অবি। আহা! জগতের কি বিচিত্র স্বভাব।

সূর্য্য-তিলকটি মুছে গেছে, নক্ষত্রমালা আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে। তাপ নষ্ট হয়েছে। মনোহর শীতল বায়ু মৃদু মৃদু বয়ে যাচ্ছে। কামুকেরা প্রচ্ছন্ন হয়ে চলতে আরম্ভ করেছে। বীরেরা (চোরেরা?) ছড়িয়ে পড়েছে। এইরূপে মনুষ্য-লোক নূতন পরিচ্ছদ ধারণ করেছে ব'লে বোধ হচ্ছে। [প্রস্থান।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

পাখীর কথা

(৩)

ভোজনপ্রণালী

মানুষ, পশু, পক্ষী সকলেরই সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন, জীবনরক্ষা। জীবনরক্ষার জন্য আবার ভোজনের প্রয়োজনই সব চেয়ে বেশী। ঘর বাড়ী না হইলেও জীবন রক্ষার কোন ব্যাঘাত হয় না; কত অসভ্য মানুষ আছে, যাহারা জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত অরণ্যের মধ্যে বৃক্ষতলে, অথবা মুক্ত আকাশের নীচে নগ্নদেহে কাটাইয়া দেয়। কিন্তু অনাহারে কে কয় দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে? তাই উন্নত মন ও মার্জ্জিত রুচি লইয়াও মানুষকে দিবানিশি এই খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টাই করিতে হইতেছে। এই জন্যই চিত্রকরের আদর্শ চিত্রও সামান্য পণ্যের সহিত বাজারে বিক্রীত হইতেছে, এই জন্যই কবি দারিদ্র্যদোষকে গুণ-রাশিনাশী বলিয়াছেন।

আমিষভোজী পাখী ও খাদ্যসমস্যা

মানুষের মধ্যে দেখিতে পাই, কোন দেশের জনসংখ্যা খাদ্যানুপাতে অধিক বাড়িলে অতিরিক্ত লোকেরা ভিন্ন দেশে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। পাখীরাও এই খাদ্য-সংগ্রহ সমস্যার সমাধানে নিশ্চেষ্ট নহে। সাধারণতঃ, আমিষাশী পাখীদের খাদ্য-সংগ্রহই অধিক কষ্টসাধ্য। এই জন্য কোন গ্রামেই আমিষভোজী পাখীরা আপনাদের সংখ্যা অতিরিক্ত পরিমাণে বাড়িতে দেয় না। চিল ও বাজের শাবক বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে আর তাহাদের জন্মক্ষেত্রে থাকিতে পায় না। ঔপনিবেশিকদিগের ন্যায় তাহাদিকেও খাদ্য সংগ্রহের নূতন ক্ষেত্র খুঁজিয়া লইতে হয়।

বিভিন্ন পাখীর বিভিন্ন খাদ্য

পাখীরা আরও এক প্রকারে খাদ্য-সমস্যার মীমাংসা করিয়াছে। বঙ্গদেশের সকল মানুষই এক প্রকারের খাদ্যে জীবন ধারণ করে, কিন্তু সকল দেশেই বিভিন্ন শ্রেণীর পাখীর আহার্য্য বিভিন্ন প্রকারের। বাজ, চিল, ও মাছরাঙ্গা মৎস্যাশী; চড়ুই, ঘুঘু, পায়রা প্রভৃতি কতকগুলি পাখী শস্যকণা খাইয়া থাকে; আবার দয়েল, শ্যামা প্রভৃতির আহার কীট ও পতঙ্গ; কপোতজাতীয় হরিয়াল প্রধানতঃ ছোট ছোট ফলেই ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ইহারা একই যায়গায় বাস করিলেও খাদ্য সম্পর্কে প্রতিযোগী নহে।

চঞ্চুর গঠন ও ভোজনপ্রণালী

কোন অপরিচিত পশুর ভোজনপ্রণালী ও ভোজ্যের সম্বন্ধে অনুমান করিতে হইলে, তাহার মুখ ও দাঁতের গঠন দেখিতে হয়। বিড়াল ও গরুর দাঁতের পার্থক্য দেখিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায়, ইহাদের একটি মাংসভোজী ও অপরটি তৃণভোজী। শুকরের মুখ ও দন্তের গঠন দেখিলেই বুঝা যায়, ইহারা মাটী খুঁড়িয়া আহার্য্য সংগ্রহ করে। পাখীর দন্ত নাই, তাহার চঞ্চুই তাহার মুখ ও দন্ত। ভোজ্যদ্রব্য ও ভোজনপ্রণালীর তারতম্য অনুসারে পাখীর চঞ্চুর গঠনেও তারতম্য দেখা যায়। কিছু দিন আগে ঠোঁটের গঠন অনুসারেই পাখীর শ্রেণী-বিভাগ করা হইত। কিন্তু সম্প্রতি এই প্রণালীর ভ্রম প্রতিপন্ন হইয়াছে।

তোতা-বর্গ ও বাজ-বর্গ

তোতাজাতীয় (টিয়া, কাকাতুয়া প্রভৃতি) পাখীর ঠোঁট তীক্ষ্ণ, কঠিন ও বক্র; বাজজাতীয় পাখীর চঞ্চুও তীক্ষ্ণ, কঠিন ও বক্র। ঠোঁটের গঠন জাতিত্বের পরিচায়ক হইলে তোতা-বর্গ ও বাজ-বর্গের পাখীদিগকে একই শ্রেণীতে ফেলিতে হয়; কিন্তু শকুনকে টিয়া বা কাকাতুয়ার জাতি বলিয়া ভুল হইবার কোন

সম্ভাবনাই নাই। কিন্তু সমগঠন-সম্পন্ন ঠোঁটবিশিষ্ট এই দুই জাতীয় পাখীই অনেক সময় খাদ্য ছিঁড়িয়া খায়। বাজবর্গের পাখীরা দুই পায়ে চাপিয়া ধরিয়া মাংস ছিঁড়িয়া খায়, তোতা-বর্গের পাখীরাও ফল ছিঁড়িয়া খাইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ভোজনের প্রণালী অনুসারেই পাখীদের চঞ্চুর গঠন বিভিন্ন হইয়া থাকে।

নিউজীলণ্ডের কিয়া তোতা

প্রয়োজন হইলে তোতাবর্গের পাখীরাও মাংস ভোজন করিতে পারে। তাহাদের ঠোঁটের গঠন মাংসভোজনের উপযোগী বলিয়া, নিরামিষ আহার ত্যাগের পরও তাহাদের ঠোঁটের গঠন পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হয় না। নিউজীলণ্ড দ্বীপে কিয়া নামক এক প্রকার তোতা আছে। ইহারা পূর্ব্বে তোতাবর্গের অন্যান্য পাখীদের ন্যায় নিরামিষ ভোজন করিত। কিন্তু নিউজীলণ্ডের য়ুরোপীয় ঔপনিবেশিকেরা তথায় মেষপালন করিতে আরম্ভ করিবার পর এই তোতা নিরামিষ ত্যাগ করিয়া মেষমাংস ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই তোতারা দলবদ্ধ হইয়া জীবিত মেষ হত্যা করিয়া থাকে।

হামিংবার্ড

খাদ্যসংগ্রহের প্রণালীভেদেই যে ঠোঁটের গঠনের তারতম্য হইয়া থাকে, তাহার আরও দৃষ্টান্ত আছে। প্রথম প্রবন্ধে আমরা হামিংবার্ড নামক একটি বিদেশী পাখীর উল্লেখ করিয়াছিলাম। এই পাখীর শৈশবকালে ঠোঁট ত্রিকোণ ও ছোট থাকে; কিন্তু বয়োবৃদ্ধির পর ইহারা যখন পুষ্পের অভ্যন্তর হইতে কীটভোজন ও মধুপান করিতে আরম্ভ করে, তখন ইহাদের চঞ্চুও শরীরানুপাতে অতিশয় দীর্ঘ ও বক্র হইয়া থাকে। কোন কোন জাতীয় হামিংবার্ডের ঠোঁট তাহাদের শরীর অপেক্ষা অধিক লম্বা।

মধুচুষা

আমাদের দেশে মধুচুষা নামক এক প্রকার ক্ষুদ্রকায় পাখী আছে। বঙ্গদেশের পাখীদের মধ্যে ইহারাই বোধ হয় আয়তনে সর্ব্বাপেক্ষা ছোট। ইহাদের শরীরের রেশমের মত উজ্জ্বল রং, এবং পৃষ্ঠের সবুজ পালক সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। লিচু ও জামরুলের গাছে ফুল হইলে, দলে দলে মধুচুষা ফুলের ভিতরে দেখা যায়। ইহাদিগকে বৃক্ষকোটরে কীট অনুসন্ধান করিতেও দেখিয়াছি। লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইবেন, এই পাখীর শরীরের অনুপাতে ঠোঁট অতিরিক্ত লম্বা এবং হামিংবার্ডের ন্যায় ইহাদেরও ঠোঁটের অগ্রভাগ বক্র। কারণ, উভয়েরই ভোজনপ্রণালী একরূপ। মধুচুষার শাবকের চঞ্চু কিন্তু বক্র নহে।

কপোত-শাবক

যাঁহারা পায়রা পুষিয়া থাকেন, তাহারা দেখিতে পাইবেন, পরিণতবয়স্ক কপোত অপেক্ষা কপোতশাবকের চঞ্চু বড়। ইহার কারণ নির্ণয় করাও কঠিন নহে। সাধারণতঃ অন্যান্য পাখীর শাবকেরা ক্ষুধা পাইলে বা কোন প্রকারের শব্দ পাইলে, হা করিয়া থাকে; পক্ষিমাতা তখন শাবকের উন্মুক্ত ঠোঁটের ভিতরে খাদ্য ফেলিয়া দেয়; কিন্তু কপোতেরা শাবকের ঠোঁটের ভিতরে আপনাদের ঠোট ঢুকাইয়া তাহাদিগকে খাওয়াইয়া দেয়। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কপোতশাবকের ঠোঁট ছোট হইয়া যায়।

নিউজীলণ্ডের হুইয়া

খাদ্যসংগ্রহের প্রণালীভেদেই সমজাতীয় পক্ষীর স্ত্রী-পুরুষেরও যে ঠোঁটের বিভিন্ন গঠন হইতে পারে, তাহারও একটি দৃষ্টান্ত আছে। নিউজীলণ্ড দ্বীপে হুইয়া (Huia) নামক একপ্রকার কাকজাতীয় পক্ষী আছে। পুরুষ-হুইয়ার ঠোঁট সোজা ও শক্ত, কিন্তু স্ত্রী-হুইয়ার ঠোঁট শুকরের দন্তের মত বক্র। ঠোঁটের গঠনবৈষম্যে প্রতারিত হইয়া বহুদিন পর্য্যন্ত অনেক বিশিষ্ট প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পুরুষ ও স্ত্রী হুইয়াকে বিভিন্ন জাতির পক্ষী বলিয়া ভুল করিয়াছেন। কিন্তু এখন জানা গিয়াছে, খাদ্য-সংগ্রহের প্রয়োজনেই হুইয়ার স্ত্রী-পুরুষের ঠোঁটের বিভিন্ন গঠন হইয়াছে। ইহারা বৃক্ষের জীর্ণ শাখার ভিতর হইতে পোকা ধরিয়া খায়। পুরুষ হুইয়া তাহার শক্ত সোজা ঠোঁটের দ্বারা প্রথমতঃ বৃক্ষশাখার সকল স্থান খুঁড়িয়া ফেলে। বলা বাহুল্য,

তখন সকল পোকা ধরা পড়ে না ; যাহারা পুরুষ-হুইয়ার সোজা ঠোঁট হইতে নিস্তার পায়, হুইয়া-পত্নী ছিদ্রপথে ঠোঁট চালাইয়া তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলে।

গৃহপালিত হাঁস

আমাদের গৃহপালিত হাঁসের ঠোঁটও বিশেষত্ববর্জ্জিত নহে। হাঁসের প্রধান খাদ্য জলজ কীট ও ছোট ছোট মাছ ; ইহারা কাদার ভিতরে লুকাইয়া থাকে। তাই হাঁসেরা প্রশস্ত কঠিন চঞ্চুপুটে কর্দ্দম লইয়া ঠোঁট ও জিহ্বার দ্বারা চাপ দিতে থাকে। কর্দ্দম ও জলীয় অংশ চঞ্চুপার্শ্বস্থ ছিদ্রপথে বাহির হইয়া যায়, কেবলমাত্র আহার্য্য কীট ও মৎস্য হাঁসের মুখের ভিতর থাকে।

জিহ্বা ও ভোজন

পাখীদের ভোজনেন্দ্রিয়ের মধ্যে ঠোঁটের পরেই জিহ্বার স্থান। আমরা দেখিয়াছি, বিভিন্ন পাখীর ঠোঁটের গঠন-তারতম্যের কারণ —তাহাদের ভোজনপ্রণালী ; ঠিক ঐ কারণেই বিভিন্ন পাখীর জিহ্বাও বিশেষ বিশেষ গঠন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রথমে হাঁসের জিহ্বার কথাই আলোচনা করা যাউক।

হাঁস

হাঁসের পুরু মাংসল জিহ্বার দুই পাশে দুই খণ্ড লোমশ কঠিন মাংস আছে ; জিহ্বার অগ্রভাগেও চামচের মত লোমশ ঠিক ঐরূপ এক খণ্ড মাংস রহিয়াছে এই কঠিন মাংসখণ্ডগুলিই হাঁসের কর্দ্দম পিষিবার যন্ত্র।

কাঠ-ঠোকরা

সকলেই কাঠ-ঠোকরা দেখিয়াছেন ; এই কাঠ-ঠোকরার জিহ্বার গঠনও বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। কাঠ-ঠোকরার প্রধান খাদ্য পিপীলিকা। বৃক্ষাভ্যন্তর হইতে পিপীলিকার বাসা খুঁড়িয়া বাহির করিলে, সন্ত্রস্ত কীটগুলি যখন ভীত-ভাবে ইতস্ততঃ পলাইতে চেষ্টা করে, তখন কাঠ-ঠোকরা তাহাদিগকে তাহার সুদীর্ঘ জিহ্বা দ্বারা ধরিয়া ফেলে। এই জিহ্বায় সর্ব্বদাই আঠার মত একপ্রকার পদার্থ লাগান থাকে ; তাই একবার কাঠ-ঠোকরার জিহ্বার সংস্পর্শে আসিলে আর কোনও কীটেরই পলাইবার উপায় থাকে না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পিপীলিকাভুক্ কাঠ-ঠোকরার জিহ্বার সহিত নিউজীলণ্ডের একপ্রকার পিপীলিকাভুক্ স্তন্যপায়ী পশুর জিহ্বার বিশেষ সাদৃশ্য রহিয়াছে।

পাকযন্ত্র

খাদ্যসংগ্রহের প্রণালীভেদে যেমন পাখীদের ঠোঁট ও জিহ্বার বিভিন্ন গঠন হইয়াছে, সেইরূপ তাহাদের পাকযন্ত্র-গুলিও বিশেষত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ভোজ্য দ্রব্যের প্রকৃতি অনুসারে পাকস্থলী ও বিভিন্ন অন্ত্রের আকারে তারতম্য হয় বলিয়া পাকযন্ত্রের গঠনে তাদৃশ বৈচিত্র্য দেখা যায় না। তাই চড়ুই ও টিয়ার ঠোঁটের গঠনে যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, পাকস্থলীর গঠন সর্ব্বপ্রকারে অভিন্ন। কিন্তু শস্যভোজী চড়ুই ও মাংসভোজী বাজের পাকযন্ত্র এক প্রকার নহে।

পাকযন্ত্রের শ্রেণী-বিভাগ

মোটামুটি পাখীদের পাকযন্ত্র চারিটি,—

১। মুখ।
২। গলনালী
৩। পাকস্থলী।
৪। বিভিন্ন অন্ত্র (Intestines)।

মোরগ, হাঁস ও কবুতরের থলিয়া

আমাদের গৃহপালিত মোরগ, হাঁস, ও কবুতর প্রভৃতির খাদ্য কিন্তু মুখ হইতে গলনালীর পথে একবারে পাকস্থলীতে পৌছায় না। ইহাদের গলনালীর সহিত সংলগ্ন একটি থলিয়া আছে ; এইখানে খাদ্যগুলি কিছুকাল থাকিয়া লালা-সংযোগে কথঞ্চিৎ নরম হইয়া পরে পাকস্থলীতে যায়। ক্ষিপ্রভোজনের জন্য বানরের গালেও খাদ্য সঞ্চয়ের বন্দোবস্ত আছে। এই সকল পাখীর গলনালীর নিকটে খাদ্যসঞ্চয়ের থলির সংস্থানের কারণও ক্ষিপ্রভোজনের প্রয়োজন বলিয়াই বোধ হয়। লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, গৃহ-পালিত পায়রার ভোজনক্ষিপ্রতা আরণ্য জালালী পায়রার অপেক্ষা কোন ক্রমেই কম নহে। হাঁস বা পায়রাকে ধান্য খাওয়াইয়া তাহাদের গলার নীচে হাত দিলেই এই খন্দের থলিয়ার অস্তিত্ব বুঝা যাইবে। মোরগ ও হাঁসের মাংস

প্রস্তুত করিবার কালে, অনেক সময় অবিকৃত খাদ্যে পরিপূর্ণ থলিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

মানুষের মধ্যে ভোজনরীতির বহু তারতম্য দেখা যায়।

ভোজনপ্রণালীর তারতম্য

আমরা হাত দিয়া খাই, সাহেবেরা কাঁটা চামচ ব্যবহার করে, চীনা ও জাপানীরা অসাধারণ ক্ষিপ্রতার সহিত দুইটি কাঠি দিয়া সকল প্রকারের খাদ্যই মুখে দেয়। এ বিষয়ে পক্ষিজাতিও কিন্তু বিশেষত্ববর্জ্জিত নহে।

মাছরাঙ্গা, বক, ও চিল

চিল, বক, ও মাছরাঙ্গা, ইহারা সকলেই মৎস্যাশী। কিন্তু মাছরাঙ্গা তাহার লম্বা ঠোঁটে মাছটি ধরিয়াই টপ্ করিয়া গিলিয়া ফেলে। তবে মাছের পিঠে কাঁটা থাকিলে, বা মাছ আকারে খুব বড় হইলে, গাছের ডালে আছাড় দিয়া মারিয়া লয়। বকের ভোজনপ্রণালীও এইরূপ। মাছ ধরার আগে সে চক্ষু বুজিয়া যতই ধ্যানের ভাণ করুক না কেন, মাছটি ধরা পড়িলে তাহার পেটে যাইতে এক মিনিটও দেরী হয় না। কিন্তু চিলের মাছ ধরিবার ও খাইবার প্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন। চিলের ঠোঁটের মত পায়ের নখরও অতিশয় শক্ত। তাই তাহারা মাছরাঙ্গার মত ঠোঁট দিয়া মাছ না ধরিয়া, পা দিয়া ধরে। তার পরে শিকার দুই পায়ে বৃক্ষশাখায় চাপিয়া ধরিয়া ঠোঁট দিয়া ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খায়। যে মাছ ক্ষুদ্র মাছরাঙ্গা

ফিঙ্গা ও দয়েল

গিলিয়া ফেলিতে একটুও দ্বিধা বোধ করে না, চিল তাহাও না ছিঁড়িয়া খায় না। আবার পতঙ্গভুক্ দয়েল ও ফিঙ্গার ভোজনপ্রণালীতেও এইরূপ তারতম্য লক্ষিত হইবে। দয়েল, শালিক প্রভৃতিরা ঠোকরাইয়া পোকা ধরিয়া খায়। ফিঙ্গা ও তাহার জ্ঞাতিবর্গ আহারকার্য্যে চরণের ব্যবহার করে।

অনেক পাখী পান ও ভোজন বিষয়ে বিশেষ বুদ্ধির পরিচয় দিয়া থাকে বাল্যকালে অনেকেই কাক ও জলের কলসীর কথা পড়িয়া থাকিবেন। কিন্তু কাকেরা আহার-ব্যাপারেও প্রস্তরখণ্ড না হউক, অন্যান্য কঠিন পদার্থের

ভোজনে কৌশল

সাহায্য প্রতিনিয়তই গ্রহণ করিতেছে। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে চাষ আরম্ভ হইলে, মাঠে দলে দলে কাক দেখিতে পাওয়া যায়। উহারা বেশ জানে, চাষ দিলেই মাঠ হইতে অনেক শামুক ও পোকা বাহির হইবে। কাক কিন্তু কেবলমাত্র ঠোঁটের সাহায্যে শামুক ভাঙ্গিতে পারে না। ক্ষেত্রকর্ষণের সময়ে প্রায়ই লাঙ্গলের ফলায় লাগিয়া শামুক ভাঙ্গিয়া যায়। যে দুই একটি না ভাঙ্গে, তাহা লইয়া কাক একটু উপরে উঠিয়া কোন কঠিন পদার্থের উপর ছাড়িয়া দেয়। বিলাতের নাট-হ্যাচ্ (Nut-hatch) নামক পাখীও কঠিন ফল বৃক্ষের ফাটলে ঢুকাইয়া ভাঙ্গিয়া লয়।

বাঙ্গালা দেশে একান্নবর্ত্তী পরিবারে অনেক সময়েই দেখা

পরস্বাপহরণ ও পরভাগ্যোপজীবী

যায়, দশজন একজনের আয়ের উপর নির্ভর করিতেছে। এইরূপ অলসতা ও পরের উপর নির্ভর করিবার প্রবৃত্তি পক্ষিসমাজেও বিরল নহে। যাঁহারা মাছরাঙ্গার প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, কোন একটি মাছরাঙ্গা একটি মাছ ধরিলে, তাহার প্রতিবেশী সুযোগ পাইলে তখনই সেটিকে ছিনাইয়া লইতে চেষ্টা করে। কাক ও চিলদের মধ্যেও এই দোষটি দেখা যায়। ইহাতে বুঝা যায় যে, পরের কষ্টসাধ্য খাদ্যহরণের প্রবৃত্তিটুকু ইহাদেরও আছে। কিন্তু ঐ বিষয়ে

স্কুয়া-গাল

একটি বিদেশী পক্ষীই সমধিক খ্যাতি বা অখ্যাতি লাভ করিয়াছে। ইহার নাম স্কুয়া-গাল (Skua Gull)। ইহারা মৎস্যভোজী, কিন্তু মৎস্যশিকারের কষ্ট সহ্য করিতে একান্তই অনিচ্ছুক। ইহাদের জ্ঞাতিভ্রাতা সি-গাল (Sea Gull) বা সামুদ্রিক গাল কিন্তু মৎস্যশিকারে বিশেষ পটু। সামুদ্রিক গাল যখন গুরু ভোজনের পর সমুদ্র হইতে তীরের দিকে ফিরিতে থাকে, তখন স্কুয়া-গাল তাহাদিগকে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করে।

ক্ষুধার আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য সি-গালেরা ভুক্ত খাদ্যের কিয়দংশ উদ্বমন করিয়া ফেলে। এইরূপে ক্ষুদ্র দুর্ব্বল জাতির পরিশ্রমের উপার্জ্জনে জীবন ধারণ করে।

এ পর্য্যন্ত যে সকল পাখীর কথা বলা হইল, তাহারা সকলেই দিবাভাগে খাদ্য আহরণ করে। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি পাখী আছে, যাহারা দিবাভাগে নিদ্রা যায় ও রাত্রিকালে শিকারসন্ধানে বাহির হয়। আমাদের দেশের নিশাচর পাখীদের মধ্যে পেচক, ও ওয়াক্ নামক বকজাতীয় পাখীর নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নিশাচর পাখী

পেচক

বিড়াল-জাতীয় পশুদের চক্ষুর গঠনের বিশেষত্বের কথা সকলেই জানেন। পেচকের চক্ষুর গঠনও বিড়ালের চক্ষুর গঠনের অনুরূপ, অর্থাৎ অন্ধকারে পেচকের চক্ষুর তারাও বিস্তৃতি লাভ করে। এইজন্য পেচক অতি অল্প আলোতেই দেখিতে পায়, কিন্তু দিনের তীব্র আলোক সহ্য করিতে পারে না। নানাপ্রকারের কীটপতঙ্গ পেচকের আহার। ইন্দুরও নিশাচর। উহারা যখন রাত্রিকালে শিকারসন্ধানে বাহির হয়, তখন পেচক উহাদিগকেই শিকার করে। এই হিসাবে পেচক মানুষের বন্ধু, কিন্তু হুতোম প্যাচা অনেক সময় পুকুরের বড় বড় মাছের চক্ষুতে আঘাত করিয়া অনিষ্ট করে। ওয়াক-বকের গতিবিধি এমন সতর্ক যে, ইহাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে অধিক কিছু জানা যায় না। বিলাতী পাখীদের মধ্যেও নাইট্-জার (Night-jar), কসাই-পাখী (Butcher Bird) প্রভৃতি রাত্রিচর।

মানুষ-ডুবুরিরা মুক্তা'র লোভে সমুদ্রে ডুব দেয়; পাখীদের মধ্যে ডুবুরিদের কিন্তু সামান্য খাদ্যের জন্যই গভীর জলে ডুব দিতে হয়। অনেকেই পানকৌড়ি দেখিয়া থাকিবেন। আমাদের দেশে এই পানকৌড়িই প্রায় একমাত্র ডুবুরি। ইহাদের দেহের ও চরণের গঠন জলের তলে ক্ষিপ্রগমনের বিশেষ উপযোগী। এই ক্ষিপ্রগতির প্রভাবেই ইহারা জলের তল হইতে মাছ ধরিতে সক্ষম হয়। আমাদের দেশের ধীবরেরা যেরূপ মাছ ধরিবার জন্য ধেড়ে (উদ্বিড়াল) পোষে, চীন ও জাপানের ধীবরেরা সেইরূপ মাছ ধরিবার জন্য পানকৌড়ি পুষিয়া থাকে। জলে ছাড়িবার আগে চীনে ধীবরেরা পোষা পানকৌড়ির গলায় একটি রবারের আংটি পরাইয়া দেয়। সুতরাং ইচ্ছা থাকিলেও পক্ষি-ডুবুরি ধৃত মাছ গিলিয়া খাইতে পারে না। অনেক সময়ে পোষা পানকৌড়ি প্রভুর এমন আজ্ঞাবহ হয় যে, রবারের আংটি পরাইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকে না।

ডুবুরিপাখী পানকৌড়ি

এক্ষণে পাখীরা কোন্ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে খাদ্যের সন্ধান পায়, তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাউক।

খাদ্য-সংগ্রহে দর্শন ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের ব্যবহার

বহুদিন পর্য্যন্ত প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণের বিশ্বাস ছিল যে, অন্য পক্ষী সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলেও, শকুনি যে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের প্রভাবেই খাদ্য সন্ধান করে, তাহার আর সন্দেহ নাই; কারণ মৃত পশুর দুর্গন্ধযুক্ত মাংসই শকুনির খাদ্য। এক্ষণে পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতগণের এই সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। পশুদিগের মৃতদেহ তৃণ দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখিলে শকুনি তাহার নিকটেও আসে না। একবার দেখা গিয়াছিল যে, চটে আচ্ছাদিত একটি মৃত অশ্বের উপরে বসিয়াও একটি শকুনি মুহূর্ত্তের জন্যও সন্দেহ করিতে পারে নাই যে, তাহার পায়ের নীচেই প্রচুর আহার্য্য রহিয়াছে। তীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তির সাহায্যে আহার্য্য সন্ধান করিলে শকুন কখনও পায়ের নীচের খাদ্য ছাড়িয়া উঠিত না; কারণ শকুন স্বভাবতঃই অত্যন্ত পেটুক। অথচ কেবল দৃষ্টিশক্তির সাহায্যেই শকুনেরা খাদ্য সন্ধান করে, একথা বলিতেও সাহস হয় না। কারণ, ক্রিমীয় যুদ্ধের (The Crimean War) সময় নাকি বহুশত মাইল দূর হইতে শকুন যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া পৌছিয়াছিল। ফ্রেড স্মিথ ইহার একটি সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তিনি বলেন, আকাশে বহু ঊর্দ্ধে উঠিয়া শকুন যে কেবল খাদ্যই অনুসন্ধান করে তাহা

শকুনি

নহে, আহার্য্যান্বেষণরত অন্যান্য শকুনের গতিবিধিও লক্ষ্য করিয়া থাকে। সুতরাং যখনই কোন একটি শকুন খাদ্যের সন্ধান পাইয়া ভূমির দিকে নামিতে থাকে, তখনই অপরাপর শকুনও তাহার অনুসরণ করে। এইরূপে পরস্পরের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপ্রভাবে বহুশত মাইল দূর হইতে ভিন্ন ভিন্ন শকুন আহারের সন্ধান লাভ করে।

এইরূপে চিল ও মাছরাঙ্গার গতিবিধি লক্ষ্য করিলেও দেখিতে পাইবেন যে, ইহাদের প্রখর দৃষ্টিই ইহাদিগকে শিকারের সন্ধান বলিয়া দেয়। যাঁহারা সাদা ও কালো ডোরাদার মাছরাঙ্গা দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এ কথা বেশী বলিবার প্রয়োজন নাই। রঙ্গিল মাছরাঙ্গার ন্যায় ইহারা গাছের ডালে বসিয়া থাকে না। দ্রুতকম্পিত পাখার সাহায্যে শূন্যে অবস্থিত ডোরাদার মাছরাঙ্গা সূর্য্যকিরণে বড়ই সুন্দর দেখায়। তারপর হঠাৎ যখন সেই শূন্যস্থিত পাখী ঝুপ করিয়া জলে পড়ে, তখনই বুঝিতে হইবে একটি মাছের জীবনলীলা শেষ হইল।

চিল ও মাছরাঙ্গা

কোন কোন পাখী স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্যে খাদ্য সন্ধান করিয়া লয়। ইহারা সাধারণতঃ কাদার তল হইতে খুঁড়িয়া খাদ্য বাহির করে। এই সম্পর্কে আমাদের দেশের স্নাইপ বা কাদাখোঁচার নামের উল্লেখ করা যাইতে পারে। কাদাখোঁচা, শামুকভাঙ্গা, প্রভৃতি পক্ষী ঠোঁট দ্বারা মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে হঠাৎ ঠোঁটে পোকা বা শামুকের সংস্পর্শ হইলেই টের পায়। কাকও ঠোঁটের স্পর্শ দ্বারা পাকা ফল বাছিয়া লইতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ে বোধ হয় কাকেরা দর্শনেন্দ্রিয়েরও সাহায্য পায়। যে সকল পাখী কেবলমাত্র স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্যে খাদ্যের সন্ধান করে, তাহাদের ঠোঁটে বহু স্নায়ুর (nerves) সমাবেশ থাকে।

আহারসন্ধানে স্পর্শেন্দ্রিয়

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন।

পাপিয়া

প্রকৃতির শ্যাম কুঞ্জে বসিয়া গোপনে
নিশিদিন উচ্চৈঃস্বরে এমন করিয়া,
থাকি থাকি কার লাগি কি ভাবিয়া মনে
পাপিয়া মরিস্ তুই ডাকিয়া ডাকিয়া ?
আহ্বান-তরঙ্গ তোর প্লাবিয়া গগন
দেশ হ'তে দেশান্তর করিছে আকুল ;
বধির কাহার হেন হ'য়েছে শ্রবণ,
মরমে পশিয়া যারে করে না ব্যাকুল ?
সুধা-ভাণ্ড কণ্ঠ তোর করিয়া মন্থন,
সঙ্গীত-লহরী লয়ে ব্যোমের দেবতা
করিতেছে মানবের গৃহে বিতরণ
'তৃপ্তি হ'ক', 'তৃপ্তি হ'ক,' মঙ্গল-বারতা।
বিহগ-রাজ্যের ও রে গায়ক প্রধান !
উচ্চ হ'তে উচ্চতর গ্রামে কণ্ঠ তুলি,
গাহিয়া কাড়িয়া নিস্ যবে মোর প্রাণ,
মুগ্ধ হ'য়ে পড়ে থাকি এ জগৎ ভুলি।

শ্রীনলিনীনাথ দাসগুপ্ত।

নেটাইচণ্ডীর ব্রত

ব্রতের নিয়ম—অগ্রহায়ণ মাসে প্রত্যেক রবিবারে এই ব্রত করিতে হয়। কুমারকুমারীরাই এই ব্রত করিয়া থাকে ; তাহাদের অভাবে অন্যেও ব্রত করিতে পারে। সন্ধ্যার সময় উঠানের কতেক স্থান গোময়লিপ্ত করিয়া তাহার মধ্যস্থানে একটি ক্ষুদ্র পুকুর কাটিতে হয়। একজন ব্রতী পূজার আসনে বসিয়া পূর্ব্বমুখ হইয়া পুষ্করিণীর পার্শ্বস্থ সিন্দুরাঙ্কিত দেবীর পূজা করে। চৌদ্দটি কচুপাতায় সাতখানা লবণযুক্ত ও সাতখানা লবণশূন্য চিতৈ পিঠায় নৈবেদ্য সাজাইতে হয়। পূজান্তে পূজার প্রসাদ ব্রতীদের মধ্যে বিতরিত হয়। ব্রত-কথায় এরূপ আশ্বাস আছে যে, যাহার ভাগ্যে লবণযুক্ত পিঠা জুটে, এক বৎসরের মধ্যেই তাহার বিবাহ হয়। সুতরাং

শীঘ্র কাহার বিবাহ হইবে, এই বিষয় লইয়া পূজার আঙ্গিনায় প্রতিযোগিতামূলক অপূর্ব্ব কৌতুকস্রোত প্রবাহিত হয়। মাসের শেষ রবিবারের পূজা অত্যন্ত জাঁকজমকের সহিত নিষ্পন্ন হয়। এ দিন নৈবেদ্যের সংখ্যা পূর্ব্বোলিখিতরূপ নির্দ্দিষ্ট নহে। উৎসাহী বালকবালিকাগণ এ দিন ইচ্ছানুরূপ সংখ্যায় নৈবেদ্য দিয়া থাকে। পূজান্তে একজন প্রাচীনা ব্রত কথা বলেন। কুমারকুমারীরা আগ্রহের সহিত উহা শ্রবণ করে।

ব্রতকথা—এক দেশে এক সওদাগর ছিল। তাঁর এক কন্যা ও এক পুত্র; সওদাগরের সুখের সংসার। এমন সময় হঠাৎ সওদাগরের পত্নীবিয়োগ হইল। পুত্রকন্যার যত্নের জন্য সওদাগর পুনরায় বিবাহ করিলেন, কিন্তু বিবাহের কিছুদিন পর তিনি দেখিলেন যে, শেষ পক্ষের স্ত্রী ছেলেমেয়ে দুটিকে বড়ই ঘৃণার চক্ষে দেখে। সওদাগর ইহাতে যারপর নাই দুঃখিত হইলেন। তিনি সদাই ভাবেন, হায়, আমার এই মা-হারা শিশুসন্তানগুলির কষ্ট দূর করিবার কি উপায় নাই? দেখিতে দেখিতে সওদাগরের বিদেশযাত্রার সময় আসিল। তাই তিনি ছেলেমেয়েদের যাহাতে কোন কষ্ট না হয়, তজ্জন্য গোয়ালা, মুদী প্রভৃতিকে টাকাপয়সা দিয়া কহিয়া গেলেন, আমার ছেলেমেয়ে দুটি তোমাদের নিকট খাবার চাহিলে, তোমরা আদরের সহিত তাহাদের খাবার জিনিষ যোগাইবা। আমি দেশে আসিয়া তোমাদিগকে পুরস্কার দিব। এই বন্দোবস্ত করিয়া সদাগর পুনরায় ভাবিলেন, ইহারা যদি আমার ছেলেমেয়ে দুটিকে খাবার না দেয়, তাহা হইলে তাদের কি উপায় হইবে? এই মনে করিয়া সওদাগর বনের মধ্যে এক মাখন (মাকাল?) ফলের গাছ রোপণ করিয়া মেয়েকে বলিয়া গেলেন, "মা, তোমাদের যদি খাওয়া লওয়ার কষ্ট হয়, তবে এই গাছের ফল খাইয়া কোন প্রকারে জীবন রক্ষা করিও।"

এই সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া সওদাগর খুব চিন্তিত চিত্তে বিদেশযাত্রা করিলেন। যেই সওদাগরের বিদেশগমন, সেই সওদাগরপত্নী যেন সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিলেন। তিনি নিজ পুত্রকে ভাল খাদ্যাদি দিয়া সতীনের পুত্রকন্যাকে পোড়া ছেঁচা যাহা থাকিত, তাহাই দিতেন। অসহায় শিশুদ্বয় ক্ষুধার জ্বালায় মুদীদোকানে, গোয়ালার দোকানে ঘুরাঘুরি করিত। সওদাগরের কথানুযায়ী মুদী ও গোয়ালা সর্ব্বদা তাহাদিগকে দধি, চিড়া, গুড় প্রভৃতি দিত। ইহাতে মাতৃহারা শিশুদ্বয়ের চেহারা দিন দিনই সুন্দর হইয়া উঠিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া সৎমায়ের প্রাণে বড় আঘাত লাগিল; তিনি ভাবিলেন, আমার ছেলেকে এত সরে ঘিয়ে খাওয়াই, তবু বাছা আমার রোদের কচুপাতার মত দিন দিন শুকাইয়া উঠিতেছে; আর এই আপদ দুটীকে অখাদ্য কুখাদ্য দিতেছি, তবু ইহারা এমন লাউয়ের ডোগার মত ফণফণিয়া উঠিতেছে; ইহার অবশ্য কোন কারণ আছে। তাহা জানিবার জন্য সওদাগর-পত্নী সতীনের ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা বাড়ীতে কিছু খাও না, তবু তোমাদের শরীর এমন সুন্দর থাকে কি করিয়া"? ইহা শুনিয়া অল্প বয়সের ছেলে, যে ভাবে গোয়ালা ও মুদীর দোকানে খাদ্যাদি পায়, তাহা সরলচিত্তে সৎমায়ের নিকট বলিয়া ফেলিল। প্রতাপশালিনী সওদাগর-পত্নী পরক্ষণেই গোয়ালা ও মুদীকে ডাকিয়া শাসন করিয়া দিলেন যে, "তোমরা কখনও এই বুনো ছেলেমেয়ে দুটিকে খাবার দিতে পারিবে না। যদি আমার আদেশের অন্যথা হয়, তবে তোমাদের গর্দ্দান লইব।" গোয়ালা ও মুদী ভয়ে আর ছেলে-মেয়ে দুটিকে খাবার দিত না। তাহারা ক্ষুধার জ্বালায় কেঁচোর মত মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। এমন সময় মেয়েটির হঠাৎ মনে হইল, বাবা আমাদের জন্য বনের মধ্যে ফলের গাছ রোপণ করিয়া গিয়াছেন। আমরা সেই গাছের ফল খাই না কেন? এই ভাবিয়া তখন ভাইবোনে বনে গিয়া দেখিল, গাছে অসংখ্য সুন্দর ফল ফলিয়াছে। তাহারা আনন্দের সহিত বনের ফলে ক্ষুধা নিবারণ করিয়া বনে বনে ঘুরে, কখন বা বাড়িতেও উপস্থিত হয়। সওদাগরপত্নী দেখিল, এত চেষ্টায়ও সতীনের ছেলের দিব্যি দেহ একটুও টুটে না। তখন তিনি ভাবিলেন, আচ্ছা দেখা যাবে, ইহারা কি খাইয়া এমন মোটা তাজা হইয়া উঠিতেছে। তদনুযায়ী বালকবালিকার

পশ্চাৎ চর নিযুক্ত হইল। তাহারা দেখিয়া আসিল, ছেলেমেয়ে বনের মধ্যে মাখন ফল খাইয়া ক্ষুধা দূর করে।—এই সংবাদ পাইয়া সওদাগরপত্নী সরোষে বনে প্রবেশ করিয়া মাখন ফলের গাছকে কহিলেন, "গাছ, তুমি কা'র ?" গাছ উত্তর করিল, "আগে ছিলাম সওদাগরের, এখন তোমার।" এই কথা শুনিয়া সওদাগরপত্নী কহিলেন, "তুমি যদি আমার হও, তবে তোমার ফলগুলি আজ হইতে "উপরে হবে কামরাঙ্গা, ভিতরে হবে ছাই।" এই বলিয়া সওদাগরপত্নী গৃহে ফিরিলেন। ইহার পর পূর্ব্ব অভ্যাসমত বালকবালিকা সেই গাছের তলায় আসিয়া দেখিল, তাহাদের সেই মিষ্ট ফল বিটকেল তিতা হইয়া গিয়াছে। বালিকা মনে মনে ভাবিল, হায়, এতদিনে বুঝি সত্যই না খাইয়া মরিতে হইবে। তখন আঘন (অগ্রহায়ণ) মাস; সমস্ত দিবস উপবাসে কাটাইয়া বালিকা ছোট ভাইটিকে কোলে করিয়া গৃহস্থপাড়ায় গমন করিল। সেখানে গিয়া দেখে, পাড়ার ছেলেমেয়েরা ছুটাছুটি করিয়া পূজার জন্য কচুপাতা তুলিয়া আনিতেছে। বালিকা জিজ্ঞাসা করিল, "গৃহস্থসকল, তোমরা এ কিসের পূজা করিতেছ ? এ পূজা করিলে কি ফল হয় ?" গৃহস্থেরা বলিল "কন্যা, আমাদের ছেলেমেয়েরা নেটাইচণ্ডীর ব্রত করিতেছে। এই ব্রত করিলে, (অবিবাহিতের) বিয়া হয়, হারাইলে পায়, ম'লে জীয়ে, দূরে থাকলে উইড়া আসে, আর কত কহিব—যে যে বর মাগে, সে সেই বরই পায়।" ইহা শুনিয়া বালিকা গৃহস্থের ঢেঁকিঘর হইতে কিছু চাউলের গুঁড়া সংগ্রহ করিয়া তাড়াতাড়ি পূজার পিঠা তৈয়ার করিল। তদ্দ্বারা পথের পাশে বসিয়া ভক্তির সহিত নেটাই দেবীর পূজা করিয়া নিজেদের দুঃখ দূর হওয়ার জন্য দেবীর নিকট কাতর প্রার্থনা জানাইল।

পরদিন প্রাতঃকালে ছোট ভাইটি ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া বলিল, "দিদি, আর ত বাঁচি না—ক্ষুধায় বুঝি আমার পেট ছাই হইয়া গেল।" এমন সময় বালিকা দেখিল, একটি ছাগল দুইটি বাচ্চাসহ নিকটে ঘাস খাইতেছে। বালিকা ঐ ছাগলটিকে ধরিয়া আনিয়া মা নেটাইর নাম লইয়া যেই উহার বাঁটে টান দিল, অমনি প্রচুর দুগ্ধ নির্গত হইল। বালকবালিকা ঐ দুগ্ধে ক্ষুধা নিবারণ করিল। অতঃপর তাহারা যত্নের সহিত ছাগলটিকে লালনপালন করিয়া উহার দুগ্ধে ক্ষুধা দূর করিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে বালকবালিকার সুখের দিন আসিল। একদিন বালকবালিকা প্রাতঃকালে নদীর ঘাটে হাতমুখ ধুইতে গিয়া দেখে, ঘাটে কত বড় বড় নৌকা আসিয়া লাগিয়াছে। বালকবালিকা বিস্মিত হইয়া নৌকার দিকে চাহিয়া আছে, এমন সময় নৌকার একজন মাল্লা কলা খাইয়া তাহার ছোবড়া বালকটিকে দেখাইয়া বলিল, "ওরে ছাওয়াল, কলা খাবি ?" এই কথা শুনিয়া বালিকা দুঃখে ক্ষোভে বলিয়া উঠিল, "সামাল, তুমি কা'র সঙ্গে কি কথা বলিতেছ ? আমাদের পিতা এ দেশের শ্রেষ্ঠ সওদাগর। তোমার মত কত মাল্লা আমার পিতার নকরী (দাসত্ব) করিয়া জীবন কাটাইতেছে।" নৌকার মধ্য হইতে সওদাগর বালিকার এই সদর্প উক্তি শুনিয়া বাহিরে আসিলেন, এবং নিজের মমতার পুতুল দুটির এমন শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া ক্ষণকাল বজ্রাহতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি যে বালিকার বিবাহের জন্য মনের মত বর সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন, তাহার অবস্থা এই! যাহা হউক নদীর ঘাটে বেশী আলাপাদি করা অসঙ্গত (কেন না কন্যার জন্য মনোনীত বর নৌকায় আছেন) বোধ করিয়া, সদাগর কন্যাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। কিছুক্ষণ পর সদাগর বাড়ী উপস্থিত হইয়া দেখেন, তাঁহার স্ত্রী গায়ে কাদা, মাটি মাখিয়া মলিন মুখে বসিয়া আছেন। সওদাগরকে দেখিয়াই তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন; বলিলেন "এই দেখ, তোমার ছেলেমেয়েদের ব্যবহার। তাহারা আমাকে মারিয়া হাড়ে হাড়ে সারা করিয়া দিয়াছে।" বাড়ীর দাসদাসীরা এ দৃশ্য দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "আহা, ঠাকুরাইণ, এমন কথা বলিও না। এতদিন যত জ্বালা দিয়াছ, তাহাই যথেষ্ট, এখন মা-মরা ছেলেমেয়ে দুটিকে বাপের আদরে একটু সুখী হইতে দাও।" সওদাগরের সমস্ত ঘটনা অবগত হইতে আর বিশেষ বিলম্ব ঘটিল না।

কিছুদিন পর শুভদিনে সওদাগর মহা উৎসব করিয়া কন্যার বিবাহ দিলেন। বিবাহান্তে কন্যাজামাতা যে ঘরে শয়ন করিবে, সওদাগরপত্নী সেই ঘরে সুন্দর করিয়া বিছানা পাড়িয়া দিলেন, কিন্তু বিছানার নীচে কতগুলি পাটশলা (পাট-খড়ি) রাখিয়া দিলেন। রাত্রে বরকন্যা বাসরঘরে গিয়াছেন, এমন সময় পাড়ার ঘরে ঘরে উলুধ্বনি উঠিল। হঠাৎ কন্যার মনে হইল, "হায়, কি সর্ব্বনাশ! আমার যে মতিভ্রম হইয়াছে, আজ অগ্রাণ মাসের রবিবার, আমার ব্রতের দিন।" তখন বাসরঘর পরিত্যাগ করিয়া পূজার আয়োজন করা সঙ্গত কি না, লজ্জিতা বালিকাবধূ তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, বরণডালায় যে পিটুলীর পিণ্ড ছিল, তদ্দ্বারা সোহাগবাতির শিখায় পিঠা তৈয়ার করিয়া ভক্তির সহিত নেটাই দেবীর পূজা করতঃ প্রণামপূর্ব্বক প্রার্থনা করিল, "মা, এই অসাবধান বালিকার সকল অপরাধ ক্ষমা কর। আমি খুব উৎসব সহকারে তোমার পূজা করিব।"

সওদাগর-জামাতা নবপরিণীতা পত্নীর এই অদ্ভুত কার্য্য দর্শন করিয়া বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কন্যা, তুমি এ কি করিলে? আমি জানি, অনেক নারী স্বামীকে বশীভূত করার জন্য বাসরঘরে নানাপ্রকার অনুষ্ঠান করে; তোমার কার্য্য দর্শনে আমার মনে অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে; শীঘ্র তুমি আমার কৌতূহল নিবারণ কর।" ইহা শুনিয়া কন্যা তাহার জীবনের দুঃখময় ইতিহাস এবং ব্রতের ফল স্বামীর নিকট প্রকাশ করিল। অতঃপর উভয়ে শয্যাগ্রহণ করিল; কিন্তু যেইমাত্র একটুকু নড়াচড়া হয়, অম্‌নি শয্যা মট্ মট্ শব্দ করিয়া উঠে, এবং সঙ্গে সঙ্গে গৃহের বাহির হইতে সৎমা কন্যাকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠেন, "ডাইনি, ছাগল-চরাণি, জামাই বেচারার হাড় মট্ মট্ করিয়া ভাঙ্গিয়া খাইতেছ?" সওদাগর-জামাতা এই কথা শুনিয়া হইলেন। তিনি ভাবিলেন, এ কন্যা নিশ্চয় ডাইনী হইবে। নচেৎ বাসরঘরে এ সব ঘটনা কেন? যাহা হউক, বিবাহ দিবস হইতেই সওদাগর-জামাতার মনে কন্যার প্রতি সন্দেহ হইল।

বিবাহের কিছুদিন পর জামাতা দেশে যাইতে চাহিলেন, কিন্তু এ সংবাদে সওদাগর একান্ত মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন। মাতৃহীনা চিরদুঃখিনী বালিকাকে চিরদিনের জন্য পরগৃহে পাঠাইতে সওদাগরের হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল; তাই তিনি জামাতাকে বর্ষাকাল আপন ঘরে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিছুদিন পর সওদাগরকন্যা গর্ভবতী হইল; সওদাগর তাহার পঞ্চামৃত দেওয়ার আয়োজন করিলেন, কিন্তু জামাতা বলিলেন, "দীর্ঘ দিন আমি এখানে আসিয়াছি। আমার বিবাহের উৎসবও পিতামাতা দেখিলেন না; সুতরাং পঞ্চামৃত আমার নিজ গৃহে সম্পন্ন হইবে।" সওদাগর আহ্লাদের সহিত এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। শুভদিন দেখিয়া সওদাগর কন্যাসহ জামাতাকে নৌকাযোগে স্বদেশে পাঠাইয়া দিলেন।

জামাতার গৃহ সওদাগরের গৃহ হইতে অনেক দিনের পথ। মধ্যে বড় বড় নদী অতিক্রম করিতে হয়। এক দিন সওদাগর-জামাতা পত্নীর ব্রতফল পরীক্ষার জন্য বলিলেন— "তোমার গায়ের সমস্ত গয়না আমার নিকট দাও।" পত্নী বিনা আপত্তিতে স্বামীর আদেশ প্রতিপালন করিলেন। সওদাগর-জামাতা ঐ অলঙ্কারগুলি একটি কৌটায় বন্ধ করিয়া মধ্য নদীতে নিক্ষেপ করিলেন। নিরলঙ্কারা সওদাগরকন্যা ভীত, বিস্মিত চিত্তে স্বামীগৃহে উপস্থিত হইলেন। তত্রত্য মেয়ে-মহলে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল, "হ্যা গা, এত নামকাম শুনিলাম, কিন্তু কাজের বেলায় ত কিছুই না, দেখ্ না বউটির গায়ে একরতি সোনাদানা নাই, এ কেমন দেশের কেমন রীতি!" সওদাগর-জামাতা এই সব আলোচনা শুনিয়া বলিলেন, গহনাপত্র সব আমার নিকট আছে, পরে দেওয়া যাইবে।

সওদাগর-জামাতার গৃহে নববধূর আগমনে বন্ধুবান্ধবের নিমন্ত্রণ হইল। সেই নিমন্ত্রণে নববধূ সকলের পাতে ভাত দিবেন। খাদ্যদ্রব্যাদির প্রচুর আয়োজন। নদীতে জাল ফেলিলে প্রথম টানেই এক রাঘব বোয়াল (বড় বোয়াল) উঠিল। সকলেই মাছ দেখিয়া মহাহর্ষে বলিয়া উঠিল, "আঁর

প্রয়োজন নাই, এই এক মাছেই বর্বা।" সওদাগর-কন্যা প্রস্তাব করিলেন, মাছটি আমি কুটিব। সকলে বলিল, "তুমি ত সেয়ানা বৌ নও, এত বড় মাছ কাটা তোমার কর্ম্ম নয়।" সওদাগর-কন্যা মাছ কুটিতে গেলেন, আর মনে মনে ভাবেন, "আমি যদি সতীর ঘরের সতী হই, নেটাই মায়ে যদি আমার ভক্তি থাকে, তা হইলে আজ যেন আমার লজ্জা রক্ষা হয়। নচেৎ আমি গয়নাশূন্য গায়ে কেমন করিয়া সকলের সামনে থাল লইয়া বাহির হইব।" এই ভাবিতে ভাবিতে যেই বোয়াল মাছের গলা কাটা হইল, অম্নি ঝনাৎ করিয়া মাছের পেট হইতে গহনার কৌটা বাহির হইয়া পড়িল। সওদাগর-কন্যা মাছ কুটিয়া পুকুরঘাটে হাতমুখ ধুইতে গেলেন, এবং সেখানে বসিয়া সমস্ত গয়না পরিয়া বাড়ী ফিরিলেন। সকলে অবাক্ হইয়া গেল। তখন সওদাগর-জামাতা স্ত্রীর ধর্ম্ম-বত্তার পরিচয় পাইয়া প্রকৃত কথা গোপন করতঃ সকলের নিকট বলিলেন, "গয়না আমার নিকট ছিল, আজ উহা বাহির করিয়া দিয়াছি।" গয়না দেখিয়া সকলে বধূর পিতার প্রশংসা করিল।

কিছুদিন পর সওদাগর-কন্যা এক পরম সুন্দর পুত্র প্রসব করিল। দেবের বরে পুত্র তুইদিনের বাড়া (বৃদ্ধি) একদিনে বাড়ে। ক্রমে ছয় মাস উপস্থিত। সওদাগর-জামাতা মহা ধুমধামে পুত্রের অন্নপ্রাশনের উদ্যোগ করিলেন। অন্নপ্রাশনের দিন সওদাগর-জামাতা স্ত্রীর ব্রতের ফল পুনঃ পরীক্ষার মানসে নামকরণের পূর্ব্বক্ষণে অন্যের অলক্ষ্যে পুত্রটিকে পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করিয়া নিজে পলাইয়া রহিলেন। নামকরণের সময় পুরোহিত পিতামাতাকে জাতক লইয়া উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুমতি করিলেন, কিন্তু হায়, পুত্র কোথায়! ঘরে ঘরে জনে জনে তালাস করিল, পুত্র নাই। প্রাচীনারা সওদাগরকন্যাকে কহিলেন, "তুমি স্নান করিয়া আইস, পুত্র হয় ত পিতার নিকট আছে।" সওদাগর-কন্যা তাড়াতাড়ি চিন্তিত মনে স্নান করিতে গিয়া যেই পুষ্করিণীতে ডুব দিলেন, অমনি নেটাই দেবী ছাওয়ালের মায়ের তুই গালে তুই চড় দিয়া বলিলেন, "এই নে তোর ছাওয়াল।" সওদাগর-কন্যা তখন সিক্ত-বসনে পুত্র কোলে লইয়া গৃহে উপস্থিত হইল। সকলে এ রহস্য জানিবার জন্য ব্যস্ত হইল। যথাবিধি নামকরণ সম্পন্ন হইলে সওদাগর-জামাতা তখন সর্ব্বসমক্ষে পত্নীর ব্রতফলের কথা প্রচার করিলেন, এবং তিনি সোনার নেটাই গড়িয়া মহা আড়ম্বরে পত্নীর ব্রতকার্য্য সম্পাদন করাইলেন। যে স্থানে সোনার নেটাই গড়িয়া পূজা করা হইল, সে স্থানে দেবীর মহিমায় রাত্রিমধ্যে এক সোনার মন্দির নির্ম্মিত হইল। দেখিতে দেখিতে দিকে দিকে দেবীর মহিমা প্রচারিত হইল।

শ্রীচিন্তাহরণ দে।

গ্রন্থ-পরিচয়

(১) "পরাগ"—শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত প্রণীত কবিতা গ্রন্থ। সাজসজ্জা অতি মনোরম। কবিতাগুলি বিশুদ্ধ ও মার্জ্জিত। ভাবও অনেক স্থলে উচ্চ স্তরের। দৃষ্টান্ত দেখুন,—"সন্ন্যাসিনী" কবিতায়,—

"তোরা চিনিলি নে তারে; দূর করি দিলি উপেক্ষায়,
দ্বার হ'তে অকাতরে ধিক্কার বরষি'!
সে যে মোর চিরশ্যামা, দাবদগ্ধ হৃদয়-বেলায়,
কল্পান্তের পরিণীতা, পাবনী প্রেয়সী।

কবির ভাষার উপর অধিকারও অসামান্য। কবির বিনয়ও উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিতেছেন—

'তোমরা বুঝেছ ভুল,—আমি নহি কবি।
আমি যে পথিক তুচ্ছ; এই স্নিগ্ধচ্ছবি
হাস্যময়ী প্রকৃতির মন্দির কোণায়
বসিয়াছি দুই পল স্তব্ধ নিরালায়!'

গঙ্গাচরণবাবুর কবিতায় আমরা আশান্বিত হইয়াছি; তিনি কালে বঙ্গবাগ্দেবীর কণ্ঠোপযোগী কোনও স্থায়ী আভরণ গড়িতে পারিবেন বলিয়া আমাদের ভরসা হইতেছে। কিন্তু, আমাদের মনে হয়, কবির এ বিষয়ে প্রচেষ্টাকে গীতি-কবিতার আকারে না হইয়া, তদপেক্ষা গম্ভীর প্রকৃতির কাব্যে নিবদ্ধ হইতে হইবে; কারণ তাঁহার রচনাপদ্ধতি শেষোক্ত বিষয়েরই অধিকতর উপযোগী॥

(২) "সদানন্দ"—শ্রীযুত হেমন্তচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত মিল্টনের "লালিগ্রো" কাব্যের অনুবাদ। অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত। উপক্রমণিকাভাগে কবিবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী লিখিত এক পরিচয়-পত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অনুবাদ—প্রমথ বাবুর ভাষায়—"মাছিমারা নকল" মাত্র হইয়াছে; গতিকেই, গ্রন্থখানিতে বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারের সমৃদ্ধি কিছুমাত্রও বর্দ্ধিত হয় নাই। কিন্তু, অনুবাদক একজন "কিশোর বয়স্ক", "সম্ভ্রান্তবংশীয়", "কলেজের ছাত্র"। শিক্ষানবিশী হিসাবে ভাষা ও রচনা উত্তম হইয়াছে; এখন হইতে একাগ্র সাধনায় রত হইলে লেখকের পক্ষে কালে একজন সুকবির মধ্যে পরিগণিত হওয়া অসম্ভব নহে।

হংসরাজ।

ভাটিয়াল গান *

১

রাধে গ তোমার বস্ত্র, আমার বাঁশী থুইলাম এক স্থানে,
(গ রাধে থুইলাম এক স্থানে);
তোমার বস্ত্র তুমি নিলা, বাঁশী নিল চোরে।
(সুন্দর রাধে গ) ॥

কানাই রে মাঠে থাক, ধেনু রাখ, থাক গোয়ালপাড়া,
(রে কানাই থাক গোয়ালপাড়া);
গোয়ালনীরা ঘাটে আইছিল, বাঁশী নিছে তারা।
(সুন্দর কানাই রে) ॥

রাধে গ মাঠে থাকি, ধেনু রাখি, থাকি গোয়ালপাড়া,
(গ রাধে থাকি গোয়ালপাড়া);
গোয়ালপাড়া থাইকা দেখ্‌ছি, রাধা বাঁশীচোরা।
(সুন্দর রাধে গ) ॥

কানাই রে, বাঁশের দেশে থাক রে কানাই, বাঁশীর কিবা দুঃখ,
(রে কানাই বাঁশীর কিবা দুখ);
আঙ্গুল আষ্টেক বাঁশের লাইগা কটু কর্‌লা মুখ।
(সুন্দর কানাই রে) ॥

---

*আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে অনেক প্রাচীন গান কৃষকদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় মাসে শস্যক্ষেত্র নিড়াইবার সময় সরলপ্রাণ কৃষকগণ দলবদ্ধ হইয় ক্ষেত্রে কাজ করে। দেশজ ভাষায় ইহাকে "যোগাল" কহে। যোগালে গায় বলিয়া এই সকল গানকে এতদ্দেশে "যোগা-লিয়া গান" কহে। একজনের নিকট হইতে অন্যে মুখে মুখে শিখিয়া এই সকল গান যতটুকু সম্ভব আজ পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়াছে। কোন্ সময় কোন্ কবি জন্মগ্রহণ করিয়া এই সকল গান রচনা করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন ব্যাপার। একটী গানেই হয়ত ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন কবির রচনা প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে।

আমরা যে সকল গান সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার একই গান ভিন্ন ভিন্ন জনের নিকট ভিন্ন ভিন্ন ভাবে শুনিয়াছি, অথবা ভিন্ন ভিন্ন গানেও একই পদ শুনিয়াছি। ২।১টী কথা ভুলিয়া গেলে, নিজের ইচ্ছামত পদ যোজনা করিয়া গাহিয়া থাকে। তাহাতেই "তিন নকলে আসল খাস্তা" হইয়া যায়। বিশেষতঃ, যে সকল নিরক্ষর কৃষকের নিকট হইতে এই সকল গান সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাতে যে গানের সকল পদ সঠিক অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়াছি, এমত বোধ হয় না। (২।১টী গানে মুসলমানী ভাষার প্রয়োগদৃষ্টে বোধ হয় কোনও মুসলমান কবি সেই সকলের রচয়িতা)। আমি যে সকল গান সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার অধিকাংশ গানই রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধীয়।

আমার সংগৃহীত গানে পূর্ব্ববঙ্গের ভাষার আধিক্য লক্ষিত হয়। কতকগুলি শব্দ এমন আছে যে, তাহার সুসঙ্গত অর্থ করা অতীব কঠিন কার্য্য। ঢাকা জিলার উত্তরপূর্ব্ব, ময়মনসিংহ জিলার দক্ষিণপূর্ব্ব এবং ত্রিপুরা জিলার উত্তরপশ্চিম অংশে এইপ্রকার ভাষার ব্যবহার দেখা যায়। —সংগ্রহকার

রাধে গ এই ত বাঁশের বাঁশী নয় গ, তরুল বাঁশের আগা,
(গ রাধে তরুল বাঁশের আগা);
লিলুয়া বাতাসে বাঁশী বলত রাধা রাধা।
(সুন্দর রাধে গ)॥

কানাই রে এত ডাঙ্গর হৈছ রে কানাই, বিয়া নাই সে কর,
(রে কানাই বিয়া নাই সে কর);
গলায় কলসী বাইন্ধা জলে ডুইবা মর।
(সুন্দর কানাই রে)॥

রাধে গ কোথায় পাব হাড়ি দড়ি, কোথায় যমুনা,
(গ রাধে কোথায় যমুনা);
তোমার অঙ্গে দিব ঝম্প কৈরেছি কামনা।
(সুন্দর রাধে গ)॥

কানাই রে তুমিত ভাগিনা হও রে, আমি তোমার মামী,
(রে কানাই আমি তোমার মামী);
কোন্ সম্বন্ধে করলে ঠাট্টা আমি নাহি জানি।
(সুন্দর কানাই রে)।

রাধে গ শিশুকালে তোর মায়ে মোরে ডাকছিল বাপ,
(গ রাধে মোরে ডাকছিল বাপ);
নাতিনী সম্বন্ধে তোমার অঙ্গে দিলাম ঝাঁপ।
(সুন্দর রাধে গ)॥

কানাই রে, যে ঝাড়ের বাঁশী রে কানাই, যদি ঝাড়ের লাগাল পাই,
(রে কানাই ঝাড়ের লাগাল পাই);
জড়ে পরে উপাড়িয়া যমুনায় ভাসাই।
(সুন্দর কানাই রে)॥(১)

২

রাধে পসার বান্ধিয়া মাথে, চলিল মথুরার হাটে,
উপস্থিত হৈল রাজঘাটে।

পার করিয়া দেও মোরে, যামু মথুরার হাটে,
কানাইয়া রে, মথুরায় বিকী যায় মোর বৈয়া।
(কানাই রে, কানাইয়া রে)।

কানাই রে, সদা দধি মাঠা মথি, দুয়ারে দুয়ারে যাচি,
কানাই রে, চক্রান কর দধির মূল।
(কানাই রে, কানাইয়া রে)।

কানাই পসার নামাইয়া ভূমে, অঞ্চল ধরিয়া টানে,
কানাইয়া রে, জোর বল কর রাজঘাটে।
(কানাই রে, কানাইয়া রে)।

তোর মামা শুনিলে রে, পরাণে যে বধ্‌বে মোরে,
অ রে কানাই পীরিতির হইব জানাজানি।
(কানাই রে, কানাইয়া রে)।

তুমি ত ননদের পুত্র রে কানাই, আমি তোমার মামী,
কোন্ সম্বন্ধে কর চাতুরালী।
(কানাই রে, কানাইয়া রে)।

ছোট বেলা তোর মায়ে মোরে ডাকছিল বাপ,
নাতিনী সম্বন্ধে আমি কৈরেছি চাতুরালী।
(কানাই রে, কানাইয়া রে)। (২)

(১) তরুল বাঁশ—বাঁশবিশেষ, এই বাঁশে বাঁশী তৈয়ারী হয়।
লিলুয়া বাতাস—মৃদুমন্দ বাতাস।
জড়ে পরে—মূল ও শিকড়সহ।

(২) পসার—দোকান। বৈয়া—বহিয়া, অতীত হইয়া। চক্রান্—চক্রী। ননদ—ননদিনী। চাতুরালী—ঠাট্টা।

৩

অ গ রাধে চড় যাইয়া কানাইয়ার ডিঙ্গায়, কি রাধে গ।

কানাই রে, মাথায় দধির পসার, সুন্দর কানাইয়া রে,
(অরে কানাই খেওয়ানি), ডাকি রে ঘন ঘন,
এক ডাক ডাক নি, দুই ডাক মোর শুন নি,
অ গ রাধে তিন ডাকে সিচি নায়ের পানি।

নাওপানি সিচিলাম, লগ্‌গত করিলাম, অ গ রাধে যমুনা করিয়া দিমু পার,

এই না ঘাটের খেওয়ানি,
ভাই ধনকড়ি নাহিক চাই, অ গ রাধে, কানাই মাগে ছুরুত দিদার।

ছাওয়াল কানাই তুমি, সুন্দর কানাইয়া রে,
অরে কানাই, ছুরুতের কিবা বুঝ রে বাও,
কেশকালা রাধিকা বলি সর্ব্ব অঙ্গ সুন্দরী,
অ গ রাধে কোন্ ডুলায় লুটাইল সর্ব্ব গাও।

কানাই রে, লঘুর ধন হইলে, আতাপিতা নাহি মানে,
অরে কানাই নাহি চিনে আপনা আর পর ;
শৃগালের শৃঙ্গ হৈলে, সে পর্ব্বত ঘাইয়া চলে,
আরে কানাই তোর বাপ নন্দপতি মোর।

এই কথা শুনিয়া ছাওয়াল কানাই (অ কানাই রে)
দশ নখে ছিড়ে বিন্নাবন ;
বিশকরমের নামটী লৈয়া, মায়াচণ্ডী আহরিয়া,
কানাই নায়ে বান্ধে জলটুঙ্গি ঘর। (৩)

৪

ছুইয় না রে নন্দের ঘরের কালা, মোরে ছুইয় না।
ছুইয় না, ছুইয় না রে কালা, কালাআর ছুইয় না রে মোরে ;
তুমি ছুইলে যাইব জাতি রাধার গকুল নগরে।
ঘাটের কুলে বইছ রে কালা, কালা আর কর চাতুরালী,
ছাইড়া দে মোর নেতের অঞ্চল, রে কালা, ডাকে ননদিনী।
তুমি যেই ধন চাও রে কালা, অরে আমি তাহা জানি,
অরে ছিড়িবে মাথার বেণী, ভাঙ্গিবে মুরলী।
মাঠে থাক, ধেনু রাখ, কালা আর রাখালের মতি,
তুমি নি রাখিতে পার রে কালা সুজনের পীরিতি। (৪)

৫

তোমার সনে আমি মথুরায় যাব, (অ গ রাধে গ)।

কাঁচা বাঁশের ভার গ রাধে (রাধে গ), বেলুন পাটের ছিকা,
কানাইর কান্ধে দিয়া দধির পসার রে চৈলেছে রাধিকা।

---

(৩) ডিঙ্গায় = নৌকায়। কানাই খেওয়ানি = কানাই মাঝি। লগ্‌গত = প্রস্তুত, ঠিকঠাক্। পানি = জল। ছুরুত = আকৃতি, সৌন্দর্য্য। দিদার = সাক্ষাৎ। বাও = দর, মূল্য। ডুলায় = বরে। বিন্না = শণজাতীয় ঘাস। বিশকরম = বিশ্বকর্ম্মা। নি = কি ? আতাপিতা = লঘুগুরু। ঘাইয়া = ঠেলিয়া,। লুটাইল = লুণ্ঠিত করিল। জলটুঙ্গি ঘর = জলাশয়ের উপরিস্থ গৃহ।

(৪) নেতের = বস্ত্রের। চাতুরালী = ঠাট্টা।

ভার ভাঙ্গিল, ছিকা ছিড়িল, দধির গড়াগড়ি,
ছিড়া দে তোর মাথার কেশ (গ রাধে), পাকাই ছিকার দড়ি।

কতেক দূর গিয়া কানাই হাটু ভিড়াইয়া বৈসে,
নেতের অঞ্চল মুখে দিয়া চাঁদ বদনে হাসে।

বেহানে লইয়াছি পসার, রাধে গ বেলার আড়াই পর,
তরুতলা নামাও দধির পসার, দেখি চাঁদ বদন।

ভার বইতে না পারু কানাই রে, মজুরি কেন চাও,
আমার মাথার দিব্যি লাগে রে কানাই, আবার ভার উঠাও।

মথুরাতে গিয়া কানাই, বাঁশীতে দিল টান,
যতেক গোপের নারী ধরিছে যোগান।

একেশ্বর আইস গ রাধে, দোসর পাইলা কৈ,
কড়ি দিয়া আইনাছি দাস মথুরায় বেচ্‌তে দৈ।

দধি বেচ দুগ্ধ বেচ রাধে গ, দধির কিবা মূল,
দ্বাদশ গোপিনী হয় এক কড়াইর মূল।

রাধে বেচে দধিদুগ্ধ, কানাই লইব কড়ি,
এক কড়া কম হইলে মারব শাঁখার বাড়ী।(৫)

৬

দোকান নামা দেখি পসার[illegible]া চাই।
যে ঘাটে রাধিকা হৈব পার, চৌকি দিব কানাই।
(গ চিকণ গোয়ালিনী)।

কালা কালা, বিনোদিনী গ কালা কেন নিন্দ,
এক কালা তোর মাথার কেশ, কাজল কেন পিন্দ।
(গ চিকণ গোয়ালিনী)।

আর এক কালা তোর হাড়িপাতিল, ভাত রাইন্ধা খাস্‌,
কালার লগে দরুশন লাগি গাঙ্‌ সিনানে যাস্‌।
(গ চিকণ গোয়ালিনী)।

হাতবৈঠা লইয়া কানাই, কানাই ডাকে ঘন ঘন্‌,
তোরা কে কে যাবি মথুরার হাটে, খেওয়ার কড়ি গণ।
(গ চিকণ গোয়ালিনী)।

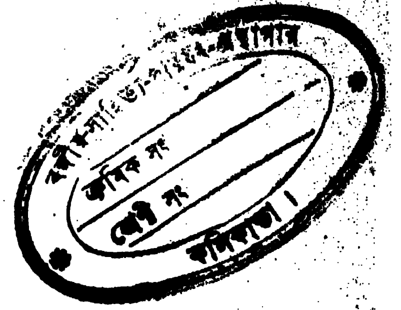
নিত্য নিত্য যাও গ রাধে ফুল বৃন্দাবন,
কানাইয়ার খেওয়ার কড়ি দিতে নাই গ তোর মন।
(গ চিকণ গোয়ালিনী)।

নিত্য নিত্য যাও গ রাধে কানাইরে ভাড়াইয়া।
আজুকা লইমু কড়ি রাজঘাটে ধরিয়া।
(গ চিকণ গোয়ালিনী)।

হাতভরা আঙ্গুটি রাধে গ, বাহুভরা তার,
হাতের লব হাতনাড়া খোপার পুনপুন,
কানাইয়ার বেতন লইমু নয়ালী যৌবন।
গ চিকণ (গোয়ালিনী)।

ঘাট মাইরা যাও গ রাধে, গুমান রাখস্‌ কার,
কেবা তোমার গাইয়া ভুঞা, কেবা অধিকারী।
আবাল ভাগিনা কানাই যৌবনের বৈরী।
(চিকণ)গোয়ালিন গ

(৫) ভার = গোয়ালাদের দধিদুগ্ধ বহন করিবার বংশদণ্ড।
বেলুনপাট = এক রকম পাট। পসার = দোকান।
ছিকা = পাতিল, কলসী রাখিবার জন্য দড়িনির্ম্মিত এক প্রকার জালবিশেষ।
কতেক = কিছু। ভিড়াইয়া = পাতিয়া।
বেহানে = প্রাতে। আড়াই পর = আড়াই প্রহর।
টান = ফু দেওয়া অর্থাৎ বাঁশী বাজান।
যোগান = সারিসারি ভাবে আগমন বুঝাইতেছে। অন্যার্থ সহায়তা। দোসর = সঙ্গী। কড়াই = কটাহ।



প্রতিভা

৫ম বর্ষ চৈত্র ১৩২২ ১২শ সংখ্যা

আদর্শ শিক্ষা

অন্ন-সমস্যা দিন দিনই কঠোরতর আকার ধারণ করিতেছে। যে পরিমাণ পরিশ্রমশক্তি বা কার্য্য-নৈপুণ্য থাকিলে, পূর্ব্বে অনায়াসেই জীবিকা-নির্ব্বাহ করা যাইত, এখন আর তাহাতে কুলায় না। সেকালে কারখানা বা দোকানে শিক্ষানবিশী করিয়াও লোকে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিত। সময়ের পরিবর্ত্তনে এই "শিক্ষানবিশী" প্রথা আজকাল এক-রকম উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। অথচ স্বচ্ছলরূপে জীবিকার্জ্জনের জন্য 'নিপুণতার' প্রয়োজন দিন দিনই বাড়িতেছে। যেরূপ দিনকাল পড়িয়াছে, তাহাতে কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য বা অন্য যে কোন বিষয়েই হউক না কেন, উত্তমরূপ ব্যবহারিক জ্ঞান না থাকিলে কোন জাতির পক্ষেই প্রতিযোগিতা-সংগ্রামে জয়লাভ করা আদৌ সম্ভবপর নহে। কাজেকাজেই বিদ্যালয়াদির স্থাপন করিয়া বালক-বালিকাগণকে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে যথোপযুক্ত শিল্পশিক্ষা প্রদানের আবশ্যকতা উপস্থিত হইয়াছে।

অভাব উপস্থিত হইলে প্রতিকারের ব্যবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়। বুদ্ধিমান জাতিরা এই স্বয়মাগত ব্যবস্থাকে নিজ নিজ দেশের ও অবস্থার প্রয়োজনানুসারে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া লন। বালকবালিকারা আর দীর্ঘকাল নিরুদ্বেগচিত্তে বিদ্যামন্দিরে বাণীর অর্চনায় তন্ময় হইয়া থাকিবার অবসর পায় না; তাড়াতাড়ি বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বা অনেক সময়ে অসমাপ্ত রাখিয়াই তাহারা উদরান্ন-সংগ্রহের জন্য কোন না কোন অর্থকর কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে বাধ্য হয়। উন্নতিশীল দেশমাত্রেই কাচনির্ম্মাণ, ইষ্টক প্রস্তুত, সূত্রধর-কর্ম্মকার প্রভৃতির কাজ, পোষাক-পরিচ্ছদ-নির্ম্মাণ, রন্ধন, পুস্তক বাঁধাই প্রভৃতি দৈনন্দিন জীবনের অত্যাবশ্যক কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে যথোপযুক্ত শিক্ষা প্রদানের জন্য ছোট বড় নানারকম স্কুল কলেজের প্রতিষ্ঠা হইতেছে। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই অল্পাধিক পরিমাণে এই প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হইতেছে। বস্তুতঃ, ইহাই এ কালের যুগধর্ম্ম।

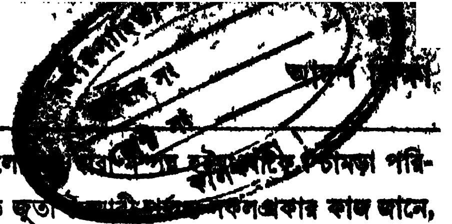
সাধারণতঃ আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যই এই সমস্ত শিক্ষা বিষয়ে সর্ব্বোন্নত দেশ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রণিধান করিয়া দেখিলে স্পষ্টই দেখা যাইবে যে এই

ধারণা সম্পূর্ণ সত্য নহে। বলিতে কি, অনেক বিশেষজ্ঞের মতে যুক্তরাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহর বষ্টনও (Boston) জার্ম্মাণির রাজধানী বার্লিনের বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশেও জার্ম্মাণ কারিগর ও দোকানদার প্রভৃতির সংখ্যা নিতান্ত ভয়াবহরূপে বাড়িতেছিল। যুক্তরাজ্যের গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বৈদেশিক মালের আমদানীর উপরে অত্যধিক শুল্ক ধার্য্য না হইলে, হয়তো জার্ম্মাণির সহিত বাণিজ্যে প্রতিযোগিতায় আত্ম-রক্ষার জন্য আমেরিকার মত প্রবল শক্তিকেও বিশেষ বিব্রত হইতে হইত।

আমেরিকার শিল্পশিক্ষা পদ্ধতির অপেক্ষা জার্ম্মাণীর শিক্ষা-পদ্ধতি যে অনেক উন্নত ও বহু ধর্ম্মাক্রান্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। জার্ম্মাণির সর্ব্বত্রই ঠিক একই আদর্শে শিক্ষা-কার্য্য পরিচালিত হয় না; স্থানীয় অবস্থা ও শিক্ষার্থীগণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মূল আদর্শ, উদ্দেশ্য, ও শিক্ষা-প্রদান-প্রণালীর প্রয়োজনানুরূপ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া লওয়া হয়। শিক্ষার্থীগণ যাহাতে অন্ততঃ একটী বিষয়েও 'বিশেষ জ্ঞান' লাভ করিতে পারে, তৎপ্রতি বিশেষ নজর রাখা হয়। অনেকস্থানে 'সান্ধ্য বক্তৃতার' অনুষ্ঠান আছে,—কোন কোন স্থানে নৈশ বিদ্যালয় বা রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাও আছে। এই সকল বিদ্যালয়ে বিশেষজ্ঞগণ বক্তৃতা দিয়া থাকেন।

বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ আট বৎসর পড়িতে হয় এবং এই আট বৎসরই ফ্রিবেল্ (Froebel) উদ্ভাবিত প্রণালীতে শিক্ষা প্রদান করা হইয়া থাকে। এই প্রণালী সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর না হইলেও, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, এতদ্দ্বারা জার্ম্মাণীর শিল্প-জগতে যুগান্তর আনীত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধারম্ভ হইবার পূর্ব্বে সমগ্র জার্ম্মাণীতে বালকবালিকাগণকে শুধু হাতে কলমে কাজ শিক্ষা দিবার জন্যই অন্যূন ১৫০০ বিদ্যালয় ও কারখানা ছিল। একটী কেন্দ্র সমিতি (The Society for Boys' Handiwork) এই সমস্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতির তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে। এখানে শিক্ষার্থীগণকে কাগজ ও পেষ্টবোর্ড প্রভৃতির সাহায্যে নানা রকম জিনিস তৈয়ারী করিতে শিখান হইয়া থাকে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে হাত পাকিলে, নানাবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির দ্বারাও যথোচিত শিক্ষাপ্রদানের সম্যক্ ব্যবস্থা আছে। ভন্ কেয়াস (Von Kaas) নামক এক ব্যক্তি ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে সর্ব্বপ্রথম এই শিক্ষা-পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। এক্ষণে ইহার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ফ্রান্সেও অনেকটা এইরূপ শিক্ষাপ্রণালীর প্রচলন আছে। বিদ্যালয়ের সকল শ্রেণীতেই যাহাতে সমান যত্নের সহিত শিক্ষা দেওয়া হয়, তজ্জন্য সেখানে শিক্ষকমাত্রকেই সমান বেতন দেওয়া হয়।

কঠোর জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করিবার জন্য যে নিপুণতা ও অভিজ্ঞতার দরকার, দীর্ঘকালব্যাপী ক্রমাগত অভ্যাস দ্বারাই তাহা অধিগত হয়। এই অভ্যাসগত নিপুণতালাভ কৈশোরাবস্থায় যেমন সরল ও সহজসাধ্য, জীবনের আর কোন সময়েই তেমন নয়। এই প্রকার কার্য্যে চিন্তাস্বাধীনতার ভাগ খুব কমই থাকে;—শিক্ষার্থীগণকে সর্ব্বদাই নানাবিধ কলকব্জা, বাঁধাবাঁধি নিয়ম কানুন ও মূল উদ্দেশ্যের অধীন হইয়াই চলিতে হয়। এইরূপ শিক্ষা-প্রণালীর একটী মারাত্মক ত্রুটি আছে। ইহাতে বিষয়-বিশেষে 'বিশেষজ্ঞান' লাভ হয় বটে, কিন্তু ঐ বিষয়ের সহিত সাক্ষাৎ ভাবে সংশ্লিষ্ট নয়, এমন সকল বিষয়েই একটা বিষম সংকীর্ণতা ও অনুদারতাও জন্মিয়া থাকে। বিশেষতঃ, বর্ত্তমান সময়ে যে ভাবে এই শিক্ষা-প্রদান কার্য্য সম্পাদিত হয়, তাহাতে শিক্ষার্থীগণের স্বাস্থ্যভঙ্গের গুরুতর আশঙ্কা সর্ব্বদাই বর্ত্তমান রহিয়াছে। উপার্জিত-শক্তির পূর্ণপরিণতি-সাধন এবম্প্রকার শিক্ষাপদ্ধতির একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য। শিক্ষার্থীগণকে প্রায়ই নিতান্ত অস্বাস্থ্যজনক অবস্থায় দীর্ঘকাল যাবৎ একই স্থানে ও একই ভাবে বসিয়া থাকিতে হয়—কখন কখন শুধু দুই একটী মাংসপেশীবিশেষেরই অনুশীলন করা হইয়া থাকে। শুধু অর্থোপার্জ্জনই যে শিক্ষা-পদ্ধতির একমাত্র মাপকাঠি, সে শিক্ষাপদ্ধতিতে এই সমস্ত গুরুতর



ত্রুটীর প্রতিবিধানের দিকে যথোপযুক্ত দৃষ্টি দেওয়া হয় না, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু মনে. রাখা উচিত যে এইরূপ একদেশদর্শী শিক্ষার দ্বারা আমাদের সমস্ত শক্তির সমতা-সাধন ও পূর্ণ বিকাশ আদৌ সম্ভবপর নহে—বরং অনেক সময়ে এতদ্দ্বারা সমূহ ক্ষতি হইবারই সম্ভাবনা। যাঁহারা সকল বিষয়েই ইউরোপীয় প্রথার হুবহু অনুকরণ করিতে চান, এ বিষয়ের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি সমধিকভাবে আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

উপরে যে শিক্ষা-প্রণালীব কথা বলা হইল, তাহাতে সাধারণতঃ একটী মাত্র বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। যেখানে একাধিক বিষয়ে শিক্ষাদানেব বন্দোবস্ত আছে, সেখানকাব অবস্থা অবশ্য অনেকটা ভাল। বিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট উদ্যান বা কৃষিক্ষেত্রে বহুবিধ কার্য্যব্যপদেশে আমাদের যে বহুবিষয়িণী শিক্ষা, ও সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির মাংসপেশী-সমূহের কার্য্যশক্তির যেরূপ বিকাশ ও পরিণতি সাধিত হয়, অন্য কুত্রাপি তাহা হয় না বা হইতেও পাবে না। বাগানে বা কৃষি-ক্ষেত্রের কাজে একই সময়ে নানা রকম কাজ করিতে হয়;—নিয়ত উন্মুক্ত স্থানে ও বিশুদ্ধ বায়ুতে অবস্থান করাতে স্বাস্থ্যও খুব ভাল থাকে। অধিকন্তু, জন্মজন্মান্তর হইতে যে সমস্ত ব্যক্তিগত ও জাতিগত প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি লব্ধ হইযাছে, এবম্বিধ কার্য্য তৎসমুদযেব বিশেষ অনুকূল বলিয়া, ইহার দ্বাবা ঐরূপ প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির ক্রমোন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। সুতরাং আমাদের শিক্ষাব্যবস্থামাত্রেই এইরূপ শিক্ষাপদ্ধতির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা নিতান্ত দরকাব।

পূর্ব্বে এইরূপ শিক্ষারই সমধিক প্রচলন ছিল;—কিন্তু এক্ষণে ইহা ক্রমেই উঠিয়া যাইতেছে এবং তৎপরিবর্ত্তে একটী মাত্র বিষয়ে শিক্ষা-প্রদানের দিকেই অধিকাংশ লোকের ঝোঁক দেখা যাইতেছে। ইহাতে ফল কিরূপ হইতেছে, তাহা একটী মাত্র দৃষ্টান্ত দিলেই বেশ বুঝিতে পারা যাইবে। জুতা তৈয়ারী করিতে সর্ব্বসাকুল্যে ৮১ প্রকার কাজের দবকার। কিন্তু আধুনিক ব্যবস্থাতে পাশ্চাত্যমণ্ডলে এই ৮১ প্রকাব কাজ প্রায় ৮১·জন লো[illegible] চামড়া পরিষ্কার করা হইতে জুতা[illegible] সকলপ্রকার কাজ জানে, আজকাল ইউরোপ বা আমেরিকায় এমন একজন লোকেরও সন্ধান পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ। আত্ম-নির্ভর-ক্ষম করাই সর্ব্ব প্রকার শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য। তথাপি, জুতানির্ম্মাণ কার্য্যে আজন্মকাল কাটাইয়াও যদি পদে পদে পরমুখাপেক্ষীই থাকিতে হইলে, তবে এতদপেক্ষা ক্ষোভ ও লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে?

সুখের বিষয়, বর্ত্তমান শিক্ষপদ্ধতির একদেশদর্শিতার প্রতি ঐ সকল দেশে আজকাল কাহারও কাহারও দৃষ্টি পতিত হইয়াছে, এবং স্থানে স্থানে বিদ্যালয়াদির প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রাচীন প্রথার যথাসম্ভব পুনঃ প্রবর্ত্তনেরও কিছু কিছু চেষ্টা দেখা যাইতেছে। এই সমস্ত বিদ্যালয়ে নিম্ন শ্রেণীর বালকবালিকাগণের সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষার জন্য বহু সংখ্যক উদ্যান ও কৃষিক্ষেত্রও খোলা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এইরূপ শিক্ষায় সুকুমার-মতি বালকবালিকাগণের হৃদয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যোপভোগের স্পৃহা বলবতী হয়, তাহাদের নবনীত-কোমল হৃদয় উদার ও প্রশস্ত হয়, জন্মভূমির প্রতি অনুরাগ বাড়ে, ও প্রকৃতি-রাণীর রম্যনিকেতন পল্লীগ্রামে বসবাস করিবার ক্ষমতা ও প্রবৃত্তি জন্মে।

কিছু দিন হইল জার্ম্মাণীতেও এইরূপ শিক্ষার আবশ্যকতা অনুভূত হইয়াছে, এবং তাহার ফলে স্থানে স্থানে একই সঙ্গে নানা বিষয়ে শিক্ষা-প্রদানের ব্যবস্থাও প্রবর্ত্তিত হইতেছে। ইচ্ছা করিলে, আজকাল সেখানে একই বালক একই সময়ে পুস্তক বাঁধাই, কাচনির্ম্মাণ, জুতাতৈয়ারী প্রভৃতি অনেক বিষয়ই শিখিতে পারে, এবং বস্তুতঃ অনেকে শিখিয়াও থাকে। এইরূপ বিবিধ-বিষয়িণী শিক্ষা দ্বারা ভবিষ্যৎ জীবনে যথেষ্ট সুবিধা হইয়া থাকে। কোনওকারণে একটী ব্যবসার বাজার মন্দা হইলে, উদবান্নেব জন্য কাহাকেও চক্ষে শরিষার ফুল দেখিতে হয়না। আমেরিকার নিগ্রো, বেড্ ইণ্ডিয়ান্ বা আদিম বাসী ও অপেক্ষাকৃত অশিষ্ট প্রকৃতির বালকদের জন্যও অনেকটা এই প্রকার শিক্ষা ব্যবস্থাবই আয়োজন করা হইতেছে।

ছাত্রদের জন্য যে সকল বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে প্রায় ত্রিশ প্রকার কাজ শিখান হইয়া থাকে। এই সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইয়াছে, এরূপ ছাত্রদের মানসিক ও নৈতিক উন্নতি, শারীরিক স্বাস্থ্যের বৃদ্ধি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির বিকাশ ও পরিণতি, কর্ম্মদক্ষতা প্রভৃতি অবলোকন করিলে বাস্তবিকই বিস্মিত হইতে হয়, এবং তখন আর ইহার উপকারিতা ও আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় ইহার আবশ্যকতা সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে না। যাহারা একবার এইরূপ ভাবে শিক্ষিত হইয়াছে তাহারা কোনও রকমে ঘরের কোণে আজীবন মায়ের অঞ্চলের ধন হইয়া, কোনও আরামপ্রদ কাজ লইয়া জীবনের বাকী দিন কয়েকটা গুজরাইতে পারিলেই আপনাদিকে কৃতার্থ বিবেচনা করে না; পরন্তু, তাহারা যে অবস্থাতেই পতিত হউক না কেন, অথবা পৃথিবীর যেখানেই তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হউক না কেন, প্রতিকূল পরিবেশের নির্দ্দয় পেষণে কিছুমাত্র পিষ্ট না হইয়া অতি সামান্য ভাবে কার্য্যারম্ভ করিয়াও, তাহারা একমাত্র অদম্য বাহুবলও অলোকসাধারণ একাগ্রতার প্রভাবে উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিবেই করিবে। অদৃষ্ট দেবতার ভ্রূকুটি-কুটিল কটাক্ষ-বিক্ষেপে তাহাদের তেজোদৃপ্ত হৃদয় কিছুমাত্র দমিত হয় না; বরং পুরুষকারের সহায়তায় অদৃষ্ট দেবতাই সম্পূর্ণরূপে তাহাদের করকলগত হইয়া থাকেন।

কৃষি, শিল্প, ও বাণিজ্য, এই তিনটাই সর্ব্বপ্রকার জাতীয় সম্পদের মূল প্রস্রবণ; এই তিনের উন্নতি ও অবনতির সহিত জাতীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাদীক্ষা ও উন্নতি-অবনতি প্রভৃতি একান্ত অচ্ছেদ্যভাবে সম্বদ্ধ। আগেকার লোকের ধারণা ছিল যে, যে জাতি যত অধ্যয়নপটু ও যত বেশী মস্তিষ্কের চালনা করিতে পারে, উন্নতির মাপকাঠিতে সে জাতি তত বড়। কিন্তু এই ধারণা নিতান্ত ভ্রমাত্মক বোধে আজকাল ক্রমেই পরিত্যক্ত হইতেছে। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন, জাতীয় জীবনেও মস্তিষ্ক-শক্তির ঠিক তুল্যরূপ প্রয়োজন, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই; কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্যও এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, সেই জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান—যাহা আমরা প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে ঠিক হাতে কলমে সম্যক্‌রূপে ব্যবহার করিতে পারি। ইহাই লব্ধ জ্ঞানের একমাত্র কষ্টি-পাথর। এবম্প্রকার কার্য্যকরী শিক্ষা দ্বারাই প্রকৃত উন্নতি-সাধন সম্ভবপর। শুধু পুঁথিগত বিদ্যায় মনুষ্যত্ব বিকশিত হয় না।

আজকাল বিদ্যালয়ের শিক্ষা-সমাপ্তির পূর্ব্বেই অনেককে উদরান্নের অন্বেষণে বহির্গত হইতে হয়; আবার যাহারা শেষ পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে থাকিবার সুযোগ পায়, তাহাদেরও অনেকে প্রকৃত কার্য্যকরী শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাবে সংসার-সমুদ্রে কর্ণধার-বিহীন তরীর ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। ক্রমশঃ বর্দ্ধমান এই যুবক-সম্প্রদায় যাহাতে দিন দিন নিরন্ন "বেকারের" সংখ্যা বর্দ্ধিত না করিয়া, অপেক্ষাকৃত অল্লায়াসেই জীবিকার্জ্জনে সমর্থ হয়, তদুপযোগী শিক্ষা-ব্যবস্থার উদ্ভাবনই বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমস্যা। উপরে যে শিক্ষাপদ্ধতির কথা বলা হইয়াছে, তাহা সম্যক্‌রূপে কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে এই মহদুদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে সাধিত হইতে পারে বলিয়া আশা করা যায়। এই পদ্ধতিতে শিক্ষিত হইলে, সর্ব্বদা সুখপ্রিয়, ভোগবিলাসপরায়ণ, ও নিতান্ত কর্ম্মকুণ্ঠ "সহুরে" বালকের মনেও নব প্রেরণার—নব শক্তির উন্মেষ হইবার সম্ভাবনা আছে।

প্রাচীন কালের যে সকল বিদ্যালয় প্রভৃতি এখনও বিদ্যমান আছে, তাহাদের জন্মেতিহাসের আলোচনা করিলে প্রায়শঃই দেখা যাইবে যে ইহাদের অধিকাংশই সমাজের দরিদ্র বালকগণের শিক্ষার জন্য পরোপকার-ব্রত মহাত্মাগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা এতই সুন্দর ও সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন ছিল যে এই সমস্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত অনেকেই স্ব স্ব স্বাধীন চেষ্টা ও অন্তর্নিহিত শক্তির সাহায্যে পৃথিবীর ইতিহাসে আপনাদের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং এই জাতীয় বিদ্যালয়-সমূহকে কেন্দ্র করিয়াই আমাদিগকে নূতন ও অভিনব বিজ্ঞান-সম্মত শিক্ষা প্রণালীর প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিতে হইবে।

পুরাকালে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণকে আহার্য্য-সংগ্রহ, বাস-গৃহ নির্ম্মাণ, লজ্জা-নিবারণ ও ব্যবসা-বাণিজ্যাদির জন্য স্ব স্ব মাংসপেশী-সমূহের পরিণতির উপরেই প্রধানতঃ নির্ভর

করিতে হইত। যে জাতির পূর্ব্বপুরুষগণ এই প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে জয়লাভ করিতে পারিয়াছিল, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনানুসারে আজ পর্য্যন্তও তাহারাই বাঁচিয়া থাকিয়া পৃথিবীর ধনসম্পদ ভোগ করিতেছে;—আর যাহারা তাহা পারে নাই, তাহারা ক্রমে ক্রমে ধরাপৃষ্ঠ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে, বা নিতান্ত কোণ-ঠাসা হইয়া কোনও প্রকারে রক্তমাংসপিণ্ডের ভার বহন করিতেছে। ইহাকেই বিজ্ঞানে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন বলে;—'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা' এই মহাজন-বাক্যের ইহাই একমাত্র সদর্থ। যে শক্তির প্রভাবে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এই ভীষণ জীবন-মরণ যুদ্ধে জয়লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, সে শক্তি এখনও বিনষ্ট হয় নাই,—এখনও তাহা প্রচ্ছন্ন ভাবে আমাদের মধ্যেই অবস্থান করিতেছে। বংশপরম্পরালব্ধ এই জাতীয় রীতি-প্রকৃতির উন্মেষ ও বিকাশ সাধনই প্রস্তাবিত শিক্ষা-ব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য।

জনৈক শিক্ষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত বলিয়াছেন যে জীবন-ধারণের জন্য আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণকে সাধারণতঃ যে সমস্ত শ্রমসাধ্য কার্য্যে লিপ্ত হইতে হইত, উত্তরকালে তৎসমুদয়ই আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যকলাপে পরিণত হইয়াছে। মানুষ স্বভাবতঃই শান্তিপ্রিয়, সন্দেহ নাই;—সর্ব্বদা 'যুদ্ধং দেহি' অবস্থায় বাস করা তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ, ইহাও সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া নিয়ত কূর্ম্মের মত হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিলেও জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করা আদৌ সম্ভবপর নহে। এ জন্য তাহাকে সর্ব্বদাই নিজ অন্তর্নিহিত শক্তির উপর ভর করিয়া দণ্ডায়মান থাকিতে হয়। আবার, পরিশ্রমের অভ্যাস হইতেই এই শক্তির বিকাশ হইয়া থাকে। চলিত কথায় বলে, 'বলং বলং বাহুবলম্।' ইহার এক বর্ণও মিথ্যা বা কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে। পরিশ্রমের দ্বারাই আমাদের মাংস-পেশীসমূহের গতি, প্রকৃতি, ও পরিণতি নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। যে যুবক অনায়াসেই ভূমিকর্ষণ, গৃহনির্ম্মাণ, প্রয়োজনীয় শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত ও আবশ্যক মত যন্ত্রাদির সম্যক ব্যবহার করিতে পারে, তাহারই প্রকৃত শিক্ষালাভ হইয়াছে বলিতে হইবে। এই সমস্ত কার্য্য আমাদের বংশানুক্রমলব্ধ চরিত্রের অনুকূল হওয়ায়, এতদ্দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন যতটা সহজসাধ্য হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। আজকাল 'বিজ্ঞান' শিক্ষার প্রতি অনেকের একটা নিতান্ত অস্বাভাবিক ঝোঁক দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই বিজ্ঞান কথাটা আজকাল সাধারণতঃ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা উহার প্রকৃত অর্থ কিনা সর্ব্বাগ্রে তাহাই বিচার্য্য। যে শিক্ষা দ্বারা মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হয় না বা হইতে পারে না, তাহা কিরূপে 'বৈজ্ঞানিক' শিক্ষা পদবাচ্য হইতে পারে, ইহা আমাদের সাধারণ বুদ্ধির অগোচর। সর্ব্বপ্রকার শিক্ষারই প্রধান ও প্রথম উদ্দেশ্য আমাদের অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্ন শক্তি-সমূহকে জাগাইয়া তোলা। তাহা করিতে পারিলেই, পরে যে কোন শিক্ষাই হউক না কেন, অতি সহজেই তাহা অধিগত হইতে পারিবে। প্রথমে মূল ও সাধারণ বৃত্তি, এবং পরে তাহা হইতে ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্মতর ও বিশেষ শক্তির বিকাশ করিতে হইবে, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম; এবং এই নিয়মের অন্যথা-চরণ করিলে তদ্দ্বারা কখনই স্থায়ী উন্নতি সাধিত হইবে না, ইহা সুনিশ্চিত। প্রকৃতির নিয়ম-পালনেই মানুষের মনুষ্যত্ব, উহার বিপরীতে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, আমাদের জীবনের কোন্ সময়ে এই প্রণালীর শিক্ষা দ্বারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল লাভ করা যাইতে পারে। ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, যে সময়ে আমাদের মাংসপেশী ও অন্যান্য বৃত্তি-নিচয়ের অতিদ্রুত বৃদ্ধি ও পরিণতি হইতে থাকে, এবম্প্রকার শিক্ষার পক্ষে তাহাই প্রশস্ত সময়। মোটামুটী ভাবে ১৫ হইতে ২০ বৎসর পর্য্যন্ত বয়ক্রম-কালকে এইরূপ শিক্ষার পক্ষে আদর্শ কাল বলা যাইতে পারে।

শ্রীমন্মথ নাথ মজুমদার।

আমাদের খাদ্য সম্বন্ধে দুচারিটা কথা।

আমরা খাদ্য হিসাবে যে সকল দ্রব্য গ্রহণ করিয়া থাকি, মোটামুটি বলিতে গেলে, তাহারা তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে; (১ম)—প্রোটিড্ (Proteid) বা মাংস জাতীয় খাদ্য; (২য়) কার্ব্বো-হাইড্রেট্ (Carbo-hydrate) বা শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য; (৩য়) হাইড্রোকার্ব্বন (Hydrocarbon) বা তৈল জাতীয় খাদ্য। প্রোটিড খাদ্যের দ্বারা শরীরের গঠন ও পোষণ হয়, এবং শরীরের যে সকল ক্ষয় হয়, তাহার পরিপূরণ হয়। মৎস্য, মাংস ডিম্ব, দুগ্ধ, দাইল প্রভৃতি প্রোটিড্-প্রধান খাদ্য। এই কারণে ইহাদের দ্বারা দেহের যেরূপ পুষ্টি-সাধন হয়, এমন অন্য খাদ্যে হয় না। ভাত রুটি প্রভৃতি শ্বেতসার-প্রধান খাদ্য। ইহাদের মধ্যে প্রোটিড্ যে একেবারে নাই, এমন নহে, কিন্তু তাহার পরিমাণ এত সামান্য যে উল্লেখযোগ্য নহে। চিনিও শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য, ইহাতে প্রোটিডের নামগন্ধও নাই। শ্বেতসার বা কার্ব্বোহাইড্রেট্ জাতীয় খাদ্যের দ্বারা দেহের তাপ সংরক্ষিত হয়, এবং কার্য্য করিবার জন্য যে শক্তির (Energy) আবশ্যক, ইহাদের হইতে সেই শক্তিটি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক কথায়, মৎস্য মাংস দাইল প্রভৃতি যেরূপ প্রধানতঃ দেহের গঠনকারক, ভাত রুটি সাগু প্রভৃতি সেইরূপ প্রধানতঃ দেহের তাপ ও শক্তির সৃষ্টিকারক। ঘৃত তৈল চর্ব্বি প্রভৃতি তৃতীয় শ্রেণীর খাদ্যের দ্বারাও শরীরের গঠন বা পরিপোষণ হয় না; ইহারাও কেবল মাত্র তাপ সৃষ্টি করে, এবং কায করিবার শক্তি যোগাইয়া থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদ্যও ঠিক তাহাই করে বটে, তবে প্রভেদ এই যে, এক ছটাক ঘৃত বা তৈল হইতে যতটা তাপ বা শক্তি পাওয়া যায়, শ্বেতসার হইতে তাহা পাইতে হইলে অন্ততঃ তিনগুণ দ্রব্য আবশ্যক হয়।

আমাদের খাদ্যে এই তিন শ্রেণীর পদার্থই থাকার দরকার। তাহা না হইলে কিছুতেই চলিতে পারে না—কেন পারে না, তাহা বোঝা খুব শক্ত ব্যাপার নহে। মনে করুন, আমাদের যদি শুধু মাংসের উপর নির্ভর করিতে হয়, তাহা হইলে শরীরের তাপ রক্ষা ও কার্য্য করিবার শক্তি যোগাইবার জন্য আমাদের এতটা মাংস খাইতে হয়, যাহা শরীরের ক্ষয় পূরণ ও পরিপোষণের জন্য যতটা আবশ্যক, তাহার অপেক্ষা অনেক বেশি হইয়া দাঁড়ায়। মনে করুন, মাংসাদি না খাইয়া, শুধু ভাতের উপর নির্ভর করা গেল। ভাত শ্বেতসার-প্রধান খাদ্য, ইহাতে যে প্রোটিড্ আছে, তাহা নিতান্ত সামান্য। আমাদের শরীরের ক্ষয়পূরণ ও পরিপোষণ জন্য যতটা প্রোটিডের আবশ্যক, তাহা যদি শুধু ভাত হইতে সংগ্রহ করিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের এতটা পরিমাণে ভাত খাইতে হয়, যাহা আমাদের পেটে ধরে না; যদিও বা ধরে, তাহাতে আর একটি দোষ এই হয় যে, তাপরক্ষা ও শক্তি-সৃজনের জন্য যতটা শ্বেতসারের আবশ্যক, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি শ্বেতসার গ্রহণ করা হয়।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য তাপ ও শক্তি সৃষ্টিকারক। ঘৃত তৈল ও চর্ব্বিরও সেই কাজ। তবে ইহারা অল্পে বেশি কাজ করিয়া থাকে। তাপ ও শক্তির জন্য যদি শুধু ভাত রুটি প্রভৃতির উপর নির্ভর করিতে হয়, তাহা হইলে এগুলি খুব বেশি পরিমাণে খাইতে হয়, কিন্তু ইহাদের সঙ্গে যদি ঘৃত বা তৈল ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে অতটা আবশ্যক হয় না। এখানে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে, তাপ ও শক্তির (Heat and energy) জন্য ভাত রুটি প্রভৃতির উপর একবারে নির্ভর না করিয়া, যদি শুধু ঘৃত-তৈলাদির উপর নির্ভর করা যায়, তাহা হইলে কেমন হয়? ইহা কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না। কেন না, একে ত ঘৃত তৈল বেশী খাইতে পারা যায় না, খাইলেও তাহা জীর্ণ হয় না। অতএব দেখা যাইবে যে, মানুষের খাদ্য-তালিকায় প্রোটিড্, কার্ব্বোহাইড্রেট্, ও হাইড্রোকার্ব্বন এই তিন রকম পদার্থই থাকা আবশ্যক, তা তিনি মাংসাশীই হউন আর চাই কি খাঁটি নিরামিষাশীই হউন। খাঁটি নিরামিষভোজী হইতে হইলে, তাঁহাকে প্রোটিড্-প্রধান উদ্ভিজ্জ পদার্থ-যেমন দাইল, শিম

প্রভৃতি, কিম্বা দধি দুগ্ধ প্রভৃতি খাইতে হইবে। দাইলে প্রোটিডের পরিমাণ খুব বেশি; মৎস্য মাংস ও ডিম্বেও ইহা যথেষ্ট পরিমাণে আছে। দাইলের প্রধান দোষ এই যে, ইহা মৎস্য বা মাংসের তুলনায় অধিক গুরুপাক। এক পোয়া মাংস সকলেই জীর্ণ করিতে পারে, কিন্তু এক পোয়া দাইল হজম করিতে পারেন, এমন লোক অতি অল্পই দেখা যায়।

এখন জিজ্ঞাসা এই, আমাদের প্রতিদিন কি পরিমাণ খাদ্য খাওয়া উচিত? ইহার সহজ উত্তর এই যে, যতটা কম খাদ্য খাইয়া, দেহের স্বাভাবিক ওজন ঠিক থাকে, স্বাস্থ্য সংরক্ষিত হয়, এবং কার্য্য করিবার শক্তি অক্ষুণ্ণ রহে,, সেই পরিমাণ খাদ্যই স্বাভাবিক খাদ্য বলিতে হইবে। ইহাতে আবার আর একটি প্রশ্ন উঠে। এক জনের স্বাভাবিক ওজন কি, তাহা কি করিয়া জানা যাইবে? কাহারও স্বাভাবিক ওজন ১ মণ ২০ সের হইতে পারে, কাহারও ইহার অপেক্ষা অধিক বা অল্প হইতে পারে। সকল মানুষের ত একই ওজন সম্ভব নয়। তাহা হইলে স্বাভাবিক ওজন নির্দ্ধরণের উপায় কি? আর স্বাভাবিক ওজন বলিলে আমরা বুঝিবই বা কি? ইহার উত্তর এই যে. ব্যক্তি-বিশেষের স্বাভাবিক ওজন হইতেছে সেই ওজনটি, যাহার কম হইলে, তাহার স্বাস্থ্য রক্ষা হয় না, এবং তাহার কার্য্য করিবার ক্ষমতা কমিয়া যায়। একটা দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা পরিষ্কার হইবার সম্ভব। মনে করুন, কোন ব্যক্তির বর্ত্তমান ওজন ১ মণ ৩০ সের। মনে করুন তাহার ওজন কমাইতে কমাইতে ১ মণ ২০ সেরে পরিণত করা হইল; তখন পর্য্যন্ত কিন্তু তাহার স্বাস্থ্যের কোন রূপ অবনতি কিম্বা তাহার কার্য্য করিবার শক্তির কোন রূপ ব্যতিক্রম ঘটিল না। ১ মণ ২০ সেরের পর আর তাহার স্বাস্থ্য ও শক্তি পূর্ব্বের মত রহিল না। তাহা হইলে এই স্থির হইল যে ঐ ব্যক্তির স্বাভাবিক ওজন ১ মণ ২০ সের ইহার কমও নয়, অধিকও নয়। যতটা খাদ্য খাইলে, তাহার এই ওজন এবং কার্য্য করিবার শক্তি ঠিক থাকে, তাহার পক্ষে সেই পরিমাণ খাদ্যই তাহার উপযুক্ত স্বাভাবিক খাদ্য। ইহার কম খাওয়াও যেমন দোষ, ইহার বেশি খাওয়াও তেমনি দোষের বিষয়।

ছেলেরা অবশ্য প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি খাইয়া সহ্য করিতে পারে। হয় ত তাহাতে তাহাদের কোন অনিষ্ট হইতে দেখা যায় না। কিন্তু আমাদের সকলেরই এই কথাটি মনে রাখা আবশ্যক। জীবনে একটি করিয়া বৎসর যেই শেষ হয়, প্রয়োজনের অপেক্ষা অধিক খাদ্য খাইয়া সহ্য করিবার শক্তিটিও সেই পরিমাণে হ্রাস হয়। এই রূপে আমরা যখন মধ্যবয়সে উপনীত হই, তখন আমাদের এমন অবস্থা হয় যে, যাহা আবশ্যক তদপেক্ষা একটু বেশি খাইলেও, তাহার দ্বারা অনিষ্ট না হইয়া যায় না। এই কারণে মধ্য বয়সে আহারাদি সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

আমরা যাহা সাধারণ নিয়ম তাহারই উল্লেখ করিলাম। এই সাধারণ নিয়মের ব্যভিচার না ঘটে এমন নয়। খাদ্য বিষয়ে ব্যক্তিগত বিশেষত্ব অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। শিশুরা আবশ্যক অপেক্ষা অধিক খাইয়াও সহ্য করে, ইহাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু এমন শিশু অনেক আছে, যাহারা একটু বেশি খাইলে কষ্ট পাইয়া থাকে। তাহাদের মূত্র "ঘোলাটে" হয়, তাহারা বদমেজাজী ও খিটখিটে স্বভাবের হয়। আবার এমন অনেক ৭০।৮০ বৎসরের বৃদ্ধ আছেন, যাঁহারা অনায়াসে আবশ্যক অপেক্ষা দুই তিন গুণ অধিক খাইয়া দিব্য সহ্য করেন। ইহাদের পরিপাক-ক্ষমতা খুবই তেজস্বী বলিতে হইবে। প্রয়োজনের অধিক ভোজন করিলে, যে সকল অনিষ্ট সম্ভব, তাহাদের প্রধান কয়েকটির উল্লেখ করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব। অধিক ভোজনের প্রথম অনিষ্ট শরীরের মেদবৃদ্ধি,—অকারণ দেহের স্থূলত্ব সাধন। দেহ যদি অসম্ভব রকম স্থূল হয়, তাহার জন্য অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নিতান্ত অল্প নহে। অনর্থক কতকটা মেদ বহন করিয়া বেড়ান ত সুবিধার বিষয় নয়। মনে করুন, একজন বিশ বৎসরের যুবার এখনকার ওজন ১ মণ ৩৫ সের। সে যখন ৩০ বৎসরে পড়িল, তখন দেখা গেল, তাহার ওজন প্রায় এক মণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই যে এক মণ অতিরিক্ত ভার

হয়ে, বহিয়া বেড়ান কি তাহার পক্ষে সুবিধার বিষয় মনে করা যাইতে পারে? সুধু কি তাই? তাহার হৃদ্‌পিণ্ডের কি ইহাতে কম খাটুনি হয়! একজন যুবা পুরুষ যদি দুইচারি বার সিঁড়ি ভাঙিয়া উঠা-নামা করে, যৌবনের শক্তি-সামর্থ্য সত্ত্বেও তাহাকে হাঁপাইতে দেখা যায়, এবং তাহার বুকের মধ্যে ধড়্‌ফড়্‌ না করে এমন নয়। ৬০ বৎসরের বৃদ্ধকে যদি সর্ব্বদার জন্য এক মণ অতিরিক্ত মেদ বহন করিয়া বেড়াইতে হয়, তবে তাহার পক্ষে এ অবস্থায় কতটা হাঁপ লাগা ও বুক ধড়্‌ফড় করার সম্ভব, তাহা অনুমান করা খুব শক্ত ব্যাপার নয়। এই কারণে, বয়স যত বাড়িতে থাকিবে, দেহের ভার বৃদ্ধি হইতে না দিয়া, যাহাতে উত্তরোত্তর হ্রাস হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বিশেষতঃ যে সকল বয়স্ক ব্যক্তির হৃদ্‌পিণ্ড স্বভাবতঃই দুর্ব্বল, তাহাদের পক্ষে, শরীরের ওজন কম করা একেবারে অনিবার্য্য মনে করিতে হইবে।

অধিক ভোজনের দ্বিতীয় অপকার হইতেছে—অজীর্ণ রোগ বা ডিস্‌পেপ্‌সিয়া (Dyspepsia)। শরীরের জন্য যতখানি আবশ্যক, ঠিক ততখানি আহার করিলে, তাহা সম্পূর্ণ জীর্ণ ও দেহজাত হয়। বেশি খাইলে, তাহা পাকাশয় ও অন্ত্র মধ্যে সম্পূর্ণ জীর্ণ হইতে পারে না, সুতরাং এই অসম্পূর্ণ জীর্ণ পদার্থ দ্বারা যকৃতটি (Liver) ভারাক্রান্ত হয়। শেষে এই অসম্পূর্ণ জীর্ণ পদার্থ রক্তে গিয়া রক্তকে দূষিত করে, এবং এই দূষিত রক্ত দ্বারা শরীরের তাবৎ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অসুস্থ হইয়া পড়ে।

যতটা কম খাইয়া, স্বাস্থ্য রক্ষা হয়, এবং কার্য্য করিবার শক্তিটি অক্ষুণ্ণ রহে, আমরা তাহাকেই স্বাভাবিক পরিমিত খাদ্য নাম দিয়াছি। কিন্তু কতখানি হইলে, সাধারণতঃ সেই পরিমাণটি হয়, সে সম্বন্ধে কোন কথাই বলি নাই। আমরা এই মাত্র বলিতে পারি, লোকে যাহাকে খুবই "কম খাওয়া" বলে, প্রকৃত পক্ষে, স্বাভাবিক পরিমিত খাদ্য তাহার অপেক্ষা অনেক অল্প। আমারা এমন লোকের কথা অবগত আছি, যাহারা ২৪ ঘণ্টায় সর্ব্বসুদ্ধ দেড় পোয়ার বেশি খায় না, অথচ তাহাদের দিব্য স্বাস্থ্য আছে, এবং তাহাদের কাজ করিবার শক্তিও একটুকুও কমে নাই। খাদ্য সম্বন্ধে আর একটি কথা সকলেরই মনে রাখা আবশ্যক। খুব ভাল করিয়া চিবাইয়া খাইলে, অতি অল্প খাদ্যেই কাজ চলিতে পারে। সুধু তাহা নহে, যাহারা চিবাইয়া খাওয়া অভ্যাস করিয়াছে, তাহাদের শরীর ও মন উভয়ই বহুকাল ধরিয়া সুস্থ ও শক্তিশালী থাকে। অতএব কাহারও খাদ্যের পরিমাণ হ্রাস করিবার আবশ্যক হইলে, তাহাকে খুব ভাল করিয়া চিবাইয়া খাইতে পরামর্শ দেওয়া উচিত।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ বাগচী।

অবিমারক

তৃতীয় অঙ্ক

কুরঙ্গী ও চেটীদ্বয়ের প্রবেশ

কুর। ওগো, তিনি কি বল্লেন?

চেটী। রাজকুমারি, কার কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছেন?

কুর। (স্বগত) হায়, হায়, ধরা পড়লুম না কি? (প্রকাশ্যে) কন্যাপুর-রক্ষকের কথা বলছি।

মাগধিকা। কন্যাপুর রক্ষকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, কথাও হয়েছে, কিন্তু সে কিছু বলে নি।

কুর। রাণীকে বলে দিতে হবে। কন্যাপুর-রক্ষক আমার শুক পাখীর পিঁজরাটি করে দিচ্ছে না।

মাগ। রাজকুমারীর শুকপাখীর পিঁজরা ভালই তৈয়ার হয়েছে।

কুর। বাচাল মাগী, তবে কি আর একটা তৈয়ার আছে না কি?

মাগ। আছে হয় ত।

কুরঙ্গী। ওগো, কত বেলা আছে বল ত?

মাগ। সন্ধ্যা হয়েছে।

কুরঙ্গী। তা'হ'লে ছাতে উঠতে হবে।

মাগ। বিলাসিনি, তুমি আগে গিয়ে বিছানা ও বসবার জায়গা সব ঠিক কর ত।

বিলা। তুমি এতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলে বুঝি! কোন সময় সব ঠিক করে রেখেছি।

মাগ। তুমি যে অলস তা আমার বেশ জানা আছে। দিনের বেলায় যে বিছানা করেছিলে তাই বুঝি (রয়েছে), তাই বলছ কখন করে রেখেছি!

বিলা। ওগো, এমন কথা ব'ল না। রাজকুমারী ত সেখানে নেই। বিছানা দেখেই বুঝবে।

মাগ। আচ্ছা গিয়েই দেখা যাবে।

[সকলের প্রস্থান।

মাগ। এই যে সেই দালান।

কুরঙ্গী। যাও আগে।

[ছাতে উঠিতে লাগিল]

মাগ। বিলাসিনি, বেশ করেছ। যেমন তোমার নাম তেমন তোমার কাজ। এই পাথরের উপর বিছানা করেছ!

বিলা। ভিতরে বিছানা করেছি। মাগধিকা, এই চেয়ে দেখ আমার আলস্যের ফল।

মাগ। তুমি যে ভারি পণ্ডিত হয়েছ দেখছি। ভগবান করুন, এমন একটি পণ্ডিত চাকরের সঙ্গে যেন তোমার বিয়ে হয়।

কুরঙ্গী। ওগো, এই পাথরটার উপরই খানিক ক্ষণ বসব।

মাগ। রাজকুমারীর যেমন ইচ্ছে। তাই হ'ক।

[সকলের উপবেশন।

মাগ। রাজকুমারী, একটা গল্প বলব।

কুর। তুমি যে (পাগলের মত) বকতে পার তা আমার জানা আছে।

মাগ। রাজকুমারি, এটি ভারি সুন্দর গল্প।

কুর। জ্বালাতন ক'রো না আর বলছি। একটু শুতে দাও।

বিলা। মাগধিকা, রাজকুমারীকে শুতে দাও। আমার কাছে তুমি গল্প বল।

কুরঙ্গী। (স্বগত) কি হবে?

মাগ। ওগো, রাজকুমারীর কথা শুনছ?

কুর। গোপন কথা প্রকাশ হয়েছে। এতে আমার সতীত্ব-গৌরব নষ্ট হবে।

বিলা। ওগো, তুমি শুনলে কোথা?

মাগ। রাণীর দাসী বসুমিত্রার মুখে শুনেছি।

বিলা। হয় ত রাণী নিজেই বলে থাকবেন।

মাগ। কাশিরাজের ছেলে জয়বর্ম্মা। রাজকুমারীর সঙ্গে তাঁরই বিয়ে হবে। কাশিরাজের দূত এসেছে। মহারাজ তাঁর সংবর্দ্ধনা করেছেন, এবং কন্যা দেখবার জন্য কাশি-রাজের দেওয়া রত্নালঙ্কারও গ্রহণ করেছেন।

কুরঙ্গী। এ হতে দেব না। আমার নিজের ইচ্ছাই বজায় থাকবে।

মাগ। রাণীকে কিন্তু বলতে শুনেছি, আমার কুরঙ্গী এখনও বালিকা, তাকে ছেড়ে আমি একদিনও বেঁচে থাকতে পারব না, মহারাজকে অনুগ্রহ করে জামাইকেই এখানে আনতে হবে।

বিলা। তার পর।

মাগ। রাজা তাতেই রাজি হয়েছেন। শুনেছি আজ দিন ভাল (শুভ নক্ষত্র), তাই অমাত্য আর্য্য ভূতিক দূতের সঙ্গে (কাশী) যাত্রা করেছেন।

কুর। (স্বগতঃ) বাঁচা গেল। কাজটায় দেরী পড়ে গেল।

বিলা। বেশ হয়েছে। রাজকুমারীর রূপ-যৌবন সফল হল।

নলিনিকার প্রবেশ

নলি। মা বলেছেন, "রাজকুমারীকে গিয়ে এ কথা বল। প্রিয়জনের মুখে প্রিয় কথা শুনলে সেটা শতগুণ প্রিয় হয়। আমার কাছে রাজকুমারী সকল কথা খুলে বলেন না। সময় হলে আমিও কিছু কাজে লাগব। যাও এখন তুমি গিয়ে রাজকুমারীকে এই শুভ সংবাদটি দিয়ে এস।"

[পরিক্রমণ]

কুর। এটা কি রোগ! এই রোগের কথা ভেবে ভেবে পাগল হয়েছি। অঙ্গরাগ ভাল লাগে না, সখীদের সঙ্গে থাকতে ইচ্ছা হয় না। এটা এক দিকে যেমন দারুণ, আর এক দিকে তেমন প্রীতিকর।

নলিনিকা এটা কি!

মাগ। রাজকুমারী, আমি যে মাগধিকা!

বিলা। রাজকুমারি, আমি যে বিলাসিনী।

নলি। (সম্মুখে আসিয়া) রাজকুমারী, নলিনিকা আমি। সিঁড়ির শব্দ শুনেই রাজকুমারী বুঝেছিলেন আমি আসছি। রাজকুমারি, রাণী মা বলেছেন—

কুর। কি বলেছেন?

নলি। (কানে কানে) এই কথা বলেছেন।

কুর। এতে আমার কলঙ্ক হবে যে!

নলি। তাকে সংবর্দ্ধনা কত্তে হবে। তিনিই সেই।

কুর। নলিনিকা, আমাকে বাতাস দাও।

নলি। যে আজ্ঞা, রাজকুমারী।

বিলা। নলিনিকা, বিয়ে হবে কবে?

নেপথ্যে

আজ।

নলি। বেঁচে থাক।

নেপথ্যে

হে রাজকর্ম্মচারীগণ, মন্ত্রী মশায় চলে গেছেন। কন্যাপুর রক্ষার জন্য কোনও মন্ত্রীর চাকর এল না। যা ইচ্ছে হ'ক। আমিও কাল সব কথা রাজার কাছে বলে দেব।

বিলা। নলিনিকা, কি বল্‌লে?

নলি। রাজকুমার যখন আসবেন তখনই বিয়ে হবে।

বিলা। আসতে যেন তাঁর কোন বিঘ্ন না ঘটে।

নলি। হাঁ, তাই যেন হয়।

মাগ। ওগো, এস এই অন্তঃপুরের আঙ্গিনায়ই বসা যাক।

বিলা। আচ্ছা তাই, এস। সন্ধ্যা প্রায় উত্তীর্ণ হয়েছে। জ্যোৎস্না উঠেছে।

নলি। ওগো, আমার বিছানাটিও ক'রো।

মাগ। হবে এখন। রাজকুমারীকে বাতাস দাও, তাঁর ঘুম আসুক।

নলি। আচ্ছা। [উভয়ের প্রস্থান।

চোরের বেশে খড়্গ ও দড়ি হস্তে অবিমারকের প্রবেশ

অবি। (চিন্তিত ভাবে) যৌবন বড়ই কষ্টের কাল। (যৌবনে) অনুরাগ প্রকাশ পায়, অসাবধানতা বেড়ে যায়, দোষের কথা মনে আসে না, বিষম সাহস জন্মে। মন যেখানে ইচ্ছে যেতে চায়। নীতিপথে চলতে চায় না, আর মন সব দিক বিচার ক'রে কার্য্যে লিপ্ত হয় না।

যে কাজ নিজে কত্তে পারি তাতে শৈথিল্য করব কেন?

আমাকে এই নগরে সকলেই জানে, পাহারা-'য়ালারাও আমার পরিচিত। দুপুর রাত—ভীষণ অন্ধকার! আমিই আমার সহায়, আর আমার মন একটুও (চঞ্চল) অস্থির হয় নি। এই কাজে আর কিছুই বিচার করবার নেই। আমার প্রয়োজন সিদ্ধি দুষ্কর নয়।

দুপুর রাতে বাস্তবিকই ভয়ের কারণ আছে। এখন সমস্ত লোক নিদ্রায় গর্ভস্থ শিশুর ন্যায় যেন মোহপ্রাপ্ত হয়েছে। দালানগুলিতে সকলেই সুখে ঘুমিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে আছে, বোধ হচ্ছে যেন দালানগুলি ধ্যানমগ্ন। রাশিকৃত অন্ধকারে আচ্ছন্ন গাছগুলি না ছুঁলে তাদের অস্তিত্ব বোঝবার যো নেই। গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন সমস্ত পৃথিবী যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে!

আজকে নিশ্চয়ই কালরাত্রি!

রাজপথগুলি নদীর মত। এই সকল নদী দিয়ে যেন অন্ধকার বয়ে যাচ্ছে। রাস্তার দুধারের দালানগুলি নদী-পুলিনের মত বোধ হচ্ছে। অন্ধকারে দশদিকের বিভিন্নতা যেন ডুবে এক হয়ে গেছে। এই অন্ধকার ভেলার সাহায্যেই যেন উত্তীর্ণ হতে হবে। *

(পরিক্রমণ করিয়া ও কান পাতিয়া) গানের স্বর শোনা যাচ্ছে না? কে এই সদা সুখী লোকটি প্রিয়ার সঙ্গে গান গাচ্ছে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, সে বীণাটি নিজে বাজাচ্ছে। দালানটি যথেষ্ট উঁচু। গবাক্ষগুলি সব বন্ধ। বীণার এক একটি স্বর কম্পনের সঙ্গে তন্ত্রী-নাদগুলি স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। রমণীর অঙ্গুলের কি সামর্থ্য

* প্লবতরণীয় ইবাবমন্ধকারঃ = 'প্লবের' সাহায্যে এই অন্ধকার উত্তীর্ণ হতে হবে—আর একটি অর্থ।

যে মুলহস্তী ছাড়া গৌণতন্ত্রীগুলি এরূপভাবে বাজাতে পারে। গানটিতে কিন্তু রমণীর কণ্ঠস্বর—(কেন না) সঙ্গীতের তানটি মৃদু অথচ স্পষ্ট। আর মুখ এবং নাক দিয়ে স্বরটি বেরুচ্ছে। বলয়ের শব্দের সঙ্গে করতালের শব্দ উঠ্‌ছে তবু গলার স্বরটি সুস্পষ্ট।

(পরিক্রমণ করিয়া ও দেখিয়া) হা! হা! হা! এটি আবার কে প্রিয়তমার অভিমান দূর করবার জন্য চেষ্টা কচ্ছে! তার দোষটা গুরুতরই বটে। তা না হলে এত ক্ষণেও প্রিয়তমার মন উঠছে না কেন? অথবা হতে পারে, এখন আর রাগ নেই তবু ছল কচ্ছে। কেন না—

বাষ্পরুদ্ধ হওয়ায় রমণীর কণ্ঠস্বর গদ্‌গদ্ ও কুটিল হয়েছে। প্রেমবশে 'আমি তোমার কে' বার বার এই কথাই বলছে। অনুরাগবশে প্রিয়তমের অনুগত হলেও রমণী-স্বভাবের বশে (তাহার 'প্রতি) প্রতিকূল ভাব প্রকাশ কচ্ছে।

ভীষণ-স্বর এটা কি পাখী! এ নিশ্চয়ই পেঁচা। এ কি, লোকটা হঠাৎ হেসে উঠল কেন? আ—হয়েছে, বুঝেছি। পেঁচার শব্দ শুনে ভয় পেয়ে প্রিয়তমা হতভাগ্যকে জড়িয়ে ধরেছে।

অন্যের এ সকল যৌবন-সুলভ ব্যাপার দেখে লাভ কি? যাওয়া যাক্।

(পরিক্রমণ করিয়া) নগরের এই বড় দালানের মধ্যে এ কে শঙ্কিতভাবে অথবা সস্নেহে আলাপ কচ্ছে! এ হতভাগা কিন্তু আমারই অবস্থাপন্ন।

পরিবারের লোকের হাতে মার খায় বলে অলঙ্কারের শব্দে ভীত হয়ে বলছে "আস্তে আস্তে কথা বল।" অনঙ্গদেবের প্রভাবের বশবর্ত্তী হয়েও বলছে "এই মিলনে কি সুখ," তাই প্রতিক্রিয়ার জন্য সঙ্কেত-স্থানে যেতে ইচ্ছুকও হচ্ছে, অনিচ্ছুকও হচ্ছে।

(পরিক্রমণ করিয়া) একি জ্যোৎস্না দেখা দিলে নাকি? না না এ জ্যোৎস্না নয়। রাস্তার দু'ধারের দালানগুলি থেকে গবাক্ষ দিয়ে আলো এসে পড়ছে। খুব সাবধানে আত্মরক্ষা কত্তে হবে। এ কি। এ বেটা নিশ্চয় চোর—

ভারি উৎফুল্ল, মালকোচা পরা, আর কেবল গৃহস্থের ঘরগুলির দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছে। দীপের আলো গায়ে পড়ামাত্রই দৌড়ে পালাচ্ছে, কিন্তু হুঁচট্ খেয়েও ভয় পাচ্ছে না।

যাক্, এ বেটা যাতে দেখতে না পায় তাই কত্তে হবে।

(একান্তে অবস্থান)।

আপদ গেল! দুষ্ট পালিয়ে গেল! আমিও যাই।

(বিচরণ করিয়া) এ যে সব পাহারা-'য়ালারা! এখন কি করা যায়! আচ্ছা এইই করা যাক্। এই চৌমাথার গুণ্ডাদের আড্ডা ঘরে ঢুকে পড়া যাক্ (লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক গমন)।

এই পাহারা-'য়ালা বেটাদের বেশী সাহস আছে বলে বোধ হচ্ছে না।

আমার হাতের এই খড়্গটি আমার হাতে থেকে যেন আমাকে উপহাস কচ্ছে! এই পাহারা-'য়ালা বেটারা আমার সমকক্ষ নয়। আমি এখানে ঢুকেছি, এখন কাজটা শেষ করব।

যাঃ! পাহারা-'য়ালারাও চলে গেল। আমি নিজেই আত্মরক্ষা কত্তে পারি, আমার আর পাহারা-'য়ালার কি দরকার?

অনেক লোক অনুরাগ, লোভ, ও মোহের বশবর্ত্তী হয়ে রাত্রিকালে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু তাদের প্রায় অনেকেরই বেশী সাহস দেখা যায় না। কিন্তু আমার এই রাত্রিতে ঘুরে বেড়ানটায় পুরুষকার আছে। এতে বিপদও আছে সুখও আছে।

এই যে রাজবাড়ী! কি প্রকাণ্ড ও উঁচু বাড়ী। এটাতেই কোমরের দড়ি লাগাতে হবে। বানরের মাথা-গুলিতে যদি ঠিক দড়ি লেগে যায়, তবেই মনে কত্তে হবে যে (কন্যাপুরে) ঢুকে গেছি। এখানে দাঁড়িয়েই দড়ি ছুঁড়ব।

হে প্রজাপতি, তোমাকে নমস্কার। হে শিবাদি পঞ্চদেবতা, তোমাদিগকে নমস্কার।

হে বলি, শম্বর † ও মহাকাল (যম) তোমরা (আমার প্রতি) প্রসন্ন হও। রাত বেশ হক্। ঘুমও বেড়ে যাক্। পদ্মা দেবী, আমাকে অনুমতি দাও। সকল অশুভের শান্তি হ'ক্। শত্রুবংশ নির্ম্মূল হক্। দেবী কাত্যায়নীর জয়! (রজ্জু ছুঁড়িয়া ফেলিল)

বাঃ, কাঁকড়ার * দড়ি কপিশীর্ষকে লাগিয়েছি! এই হচ্ছে ভবিতব্যের প্রভাব। একবারের চেষ্টায়ই দড়িটা লেগে গেল! এতেই বোঝা যাচ্ছে আমার কার্য্যসিদ্ধিও অবশ্যই হবে। ভগবান প্রজাপতির কি প্রভাব!

যত্ন করে যদি কার্য্যসিদ্ধি না হয় তবে আর দোষ কি? আমাকে এটা কত্তে হবে এরূপ মনে করে কাজ কল্লে কার কার্য্য না সিদ্ধ হয়? পৃথিবীতে লোকের উপযুক্ত চেষ্টাই পুরুষকার। কার্য্য-সিদ্ধির জন্য দৈব চেষ্টারই অনুসরণ করে। যাক্, এইবার দড়ি ধরে উঠা যাক্।

(উঠিয়া) বাঃ; রাজবাড়ীটা কি চমৎকার! যদিও প্রকাণ্ড তথাপি বিভিন্ন অংশের অনুপাতের বেশ সমতা আছে। ক্রমশঃ অবিরলভাবে উঁচু হয়ে উঠেছে। বোধ হচ্ছে যেন রাজবাড়ীর দালানগুলি মাটি থেকে আকাশে উঠতে চেষ্টা কচ্ছে।

এখানে আর থাকতে নেই। বড় বড় বাড়ীর পাশের বড় রাস্তা থেকেই নানা বিপদের সূত্রপাত হয়। (নামিয়া) এ দড়িটা এখন রাখি কোথা? (চিন্তা করিয়া) এই হাতী-ঘরেই কোমরের দড়িটা কেটে ফেলে দেব। (নিক্ষেপ)

(পরিক্রমণ করিয়া) যুবতীর গলার মধুর স্বরের সঙ্গে বীণার শব্দ শোনা যাচ্ছে! আর এক জায়গায় যাব।

মত্তহস্তীকে উত্তেজিত কত্তে পারে এরূপ তীব্র মধুর গন্ধ যে! এক মুহূর্ত্ত থেকে (অন্যত্র) যাব—

এখানে যে দীপের আলো—চারি দিকেই পাহারা-'য়ালা। কি করি?

কমল-সমূহের ন্যায় অনেক রাত্রেই রাজবাড়ী শান্ত হয়ে থাকে।

আচ্ছা যাই। এই পথের কথাই নলিনিকা বলেছিল। এই যে মন্দাকিনী *! এটাই দারুপর্ব্বত। আর এই দেখছি সভাগৃহ।

এই যে এটাই কন্যাপুর-প্রাসাদ। এতে যথেষ্ট কাঠের কাজ, আর কাঠের কাজের এখানে সেখানে অনেক ফাঁকা জায়গা, কাজেই এ দালানে উঠতে কষ্ট হ'বে না। আর যদিও বা উঠতে কষ্ট হয় তাতেই বা কি?

আমি সঙ্কল্প করেছি দালানে উঠবই। আর আমি মনে কচ্ছি যেন তাঁর (রাজকুমারীর)কাছে পৌঁছেছি, সুতরাং আমার আর শঙ্কা কি? পদ্মের নালের কাঁটার ভয়ে কি পিপাসার্ত্ত ব্যক্তি (পুকুর) জল ছেড়ে যায়?

আচ্ছা ওঠা যাক্।

(উঠিয়া) এই যে দেখছি ঝরণা। নলিনিকা এটার কথাই বলছিল।

(প্রবেশ করিয়া ও দেখিয়া) ধন্য কুন্তিভোজ! এই সুন্দর প্রাসাদ স্বর্গকেও (সৌন্দর্য্যে) পরাভূত করেছে। মণিখচিত রত্নশিলার উপর হাঁসগুলি ঘুমুচ্ছে। (ঝরণার?) বিস্তৃত সৈকত-ভূমি বৈদুর্য্য ও মুক্তাখচিত। থামগুলি প্রবালখচিত। বেশী আর কি বলব, মণিদীপগুলির জ্যোতিতে প্রদীপগুলি মলিন হয়ে গেছে!

আর রৌদ্রবেশ ধারণ করে লাভ কি? (চোরবেশ ও কোমরের দড়ি পরিত্যাগ)

নলিনিকা। রাজকুমারের খবর কি? রাজকুমারীর যে অবস্থা তাতে তাঁর চোখে ঘুম নেই, কিন্তু আজ তাঁর প্রিয়-সমাগম হবে মনে করে বেশ সুখে ঘুমুচ্ছে।

অবি। (শুনিয়া ও হঠাৎ অগ্রসর হইয়া) এই যে, (আপনি) আমার কথা বলছেন।

---

* কক্ষ্যাবন্ধঃ=কোমরে যে দড়ি বাঁধিয়া উপরে উঠা যায়।
কপিশীর্ষকাঃ=ছাতের উপর বানরের মাথার ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট ইটের বা কাঠের কাজ।

† পলায়নে বড় দক্ষ। ইন্দ্র ৪০ বৎসর তাঁহাকে খুঁজিয়া পান নাই।—ঋগ্বেদ।

* মন্দাকিনী প্রভৃতি কৃত্রিম নদী ও কৃত্রিম পর্ব্বত।

নলি। (সহর্ষে) রাজকুমার আসুন।

অবি। সহর্ষে) এই যে, এই যে তিনি! তাঁকে দেখে—আমার তৃপ্তি হয় না। তিনি যেন আমাকে আলিঙ্গন কচ্ছেন, তিনি ঘুমিয়ে আছেন, কিন্তু আমার অভিলাষ যেন তাকে জাগিয়ে দিচ্ছে। অনুরাগই আমাকে সকল বিষয়ে উৎসাহিত কচ্ছে, আর আমার শরীর যেন অবসন্ন করে ফেলছে। অতিরিক্ত আনন্দে আমার মন হৃষ্ট হচ্ছে, আবার বিমূঢ়ও হচ্ছে।

নলিনিকা। (স্বগত) ভগবান কামদেব প্রবাহের ন্যায় দুই জনকেই (পক্ষ) পীড়া দিচ্ছে। রাজকুমার, শয্যার শোভাবিধান করুন।

অবি। অবশ্য, অবশ্য। (উপবেশন)

নলি। রাজকুমার, রাজকুমারীকে জাগাব না কি?

অবি। না না বালকের মত এরূপ চঞ্চল হওয়ার প্রয়োজন নেই—দেখুন,

আমার মাত্র দুটি চোখ, হাজার চোখ নয়। আমার বুদ্ধিও সব গোলমাল হয়ে গেছে—অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষা, তাই কি করব বুঝতে পাচ্ছি না। একটু সুবিধা দিন—আমার চোখ দুটি কামনা-সাগরের তীরে পৌঁছে একটু খেলে নিক।

নলি। রাজকুমারীকে পাওয়ার জন্য রাজকুমারের যে কত কষ্ট হয়েছে তা বুঝতে পেরেছি।

অবি। আজ আমার সব পরিশ্রম সফল হল।

কুরঙ্গী। (জাগিয়া) ওগো, সেই নিষ্ঠুর কি বলেছিল?

নলি। রাজকুমারি, আমি ত তা আগেই বলেছি।

অবি। আমার জীবন-ধারণ আজ সার্থক হল, রাজকুমারী এত মুগ্ধ হয়েছেন!

কুর। (আত্মগত) হায় আমার কলঙ্ক হ'ল! (প্রকাশ্যে) ওগো আমি কি বলেছিলাম?

নলি। কৈ, রাজকুমারি, কিছুই বলেন নি ত?

অবি। রাজকুমারীর এইরূপ অবস্থা দেখে আমারও আবার মোহ আসছে!

কুর। নলিনিকে, অনেক ক্ষণ ত বসে আছ। রাত্রি কত হল?

নলি। দুপুর রাত হয়েছে।

কুর। তা হলে তোমার ত বড় পরিশ্রম হয়েছে। এস আলিঙ্গন কর।

নলি। (জনান্তিকে) আমি পা টিপছি। রাজকুমার, আপনি রাজকুমারীকে আলিঙ্গন করুন।

অবি। (সহর্ষে) কি সৌভাগ্য! ভগবান যেন আপনাকেও শত শত প্রিয় কথা শোনান।

কুর। দ্বিধা কচ্ছ কেন? এস।

নলি। রাজকুমারি, এই যে এসেছি।

কুর। (গাঢ়ভাবে নলিনিকা ভ্রমে অবিমারককে আলিঙ্গন) একি! এখনও আমার পা টিপছে কে?

নলি। (কানে কানে) এই হচ্ছে খাঁটি কথা।

কুর। (সোদ্বেগে) হায়! আমি কুচরিত্রার মত কাজ কল্লুম! আমার ভয় হচ্ছে!

অবি। প্রিয়ে, তোমার মনের অনুরাগ আমি জানি। তুমি যে আমার নও, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। বায়ুচালিত লতার ন্যায় কাঁপছ কেন? রাজকুমারি, ভয় ছেড়ে আমাকে অনুগ্রহ দেখাও। আর বাজে কথা বলে লাভ কি—এক কথায় বলছি আমি তোমারই আশ্রিত।

[কুরঙ্গী লজ্জার সহিত নলিনিকার দিকে তাকাইতে লাগিল]

নলি। রাজকুমার উঠুন, উঠুন! রাজকুমারী বলছেন উঠুন।

অবি। আচ্ছা তা'হলে উঠছি। (উত্থান)

ধাত্রীর প্রবেশ

ধাত্রী। রাজকুমারের জয় হ'ক।

অবি। আপনি কে!

ধাত্রী। নলিনিকা, ঘরের ভিতরে বিছানা ঠিক করা আছে। রাজকুমার ও রাজকুমারীকে নিয়ে যাও।

নলি। আচ্ছা, তাই কচ্ছি। [ধাত্রীর প্রস্থান।

নলি। রাজকুমার, ভিতরে বিছানা ঠিক করা আছে। রাজকুমারীকে নিয়ে সেখানে চলুন।

ঋষি।" আপনাকেও যেন ভগবান এরূপ শত শত প্রিয় কথা শোনান। (তাহার হাত ধরিয়া উত্থান)

মলি। আসুন রাজকুমার।

ঋষি। আচ্ছা, এই যাচ্ছি।

(উভয়ের পরিক্রমণ)

ঋষি। (সহর্ষে) যৌবনের ঋণ শোধ!

তাহার দুটি চোখে আনন্দাশ্রু, বক্ষস্থলে বেপথু, নিতম্বদেশ গুরু, পদক্ষেপ সহজভাবে হচ্ছে না, লজ্জায় পদক্ষেপগুলি এখানে সেখানে পড়ছে। এই সপ্ত পদক্ষেপই আমাদের মিলন ঘটাল! আজকের রাত যদি শতযুগব্যাপী হয় তা'হলে আমার চেয়ে সৌভাগ্যশালী আর কে?

[সকলের প্রস্থান।

শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

বাঙ্গালার ইতিহাস *

(সমালোচনা)

সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম ও একাদশ এই পাঁচটি পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার প্রধানতঃ পাল ও সেন রাজবংশের এবং আনুষঙ্গিকভাবে খড়্গ, চন্দ্র ও বর্ম্মবংশের (অথবা বর্ম্মবংশ-দ্বয়ের) বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। এই কয়টি পরিচ্ছেদ বহু জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ, এবং গ্রন্থকার যেরূপ অসীম ধৈর্য্য ও আয়াস সহকারে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশস্থ রাজবংশের বিবরণ হইতে বাঙ্গালার ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা দেখিলে বাস্তবিকই বিস্মিত হইতে হয়। কিন্তু এই কঠোর পরিশ্রমের ফল স্বরূপ বাঙ্গালার ইতিহাসের যে কঙ্কাল তিনি আমাদিগকে উপহার দিয়াছেন, তাহা বিষয়গুলীর নিকট সমুচিত সমাদর লাভ করিতে পারিবে এরূপ [illegible]া অতি অল্প। কারণ উপাদান-সংগ্রহে তিনি বি[illegible]তা প্রদর্শন করিয়া থাকিলেও সংগৃহীত উপাদান অবলম্বনে ইতিহাস-গঠনকার্য্যে তিনি তাদৃশ পারদর্শিতা দেখাইতে পারেন নাই। তাঁহার গ্রন্থের এই অংশে তিনি পাঠকগণের মনে এই সময়কার বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা জন্মাইতে পারেন নাই; কারণ তিনি ইহার নানা স্থানে যে সমুদয় মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পরস্পর-বিরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। পাল ও সেন রাজবংশের কাল-নির্ণয় সম্বন্ধে শেষ মীমাংসা করিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। সুতরাং এ বিষয়ে আমরা অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য।

রাখাল বাবুও কতকগুলি অনুমানের আশ্রয় লইয়াছেন। এজন্য আমরা তাঁহাকে দোষ দেই না। কিন্তু তিনি যে সকল ভিন্ন ভিন্ন অনুমান করিয়াছেন তাহা অনেক স্থলে পরস্পর-বিরুদ্ধ। তিনি যে সকল অনুমান করিয়াছেন তাহা কতদূর সম্ভব, সে বিচার আপাততঃ করিবার আবশ্যক নাই; কারণ একটু অনুধাবন করিলেই দেখা যাইবে যে তিনি নিজেই নিজের অনুমানগুলির অসঙ্গতি প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

(ক) রাখালবাবু লিখিয়াছেন, "রাজ্যপালই বোধ হয় তাঁহার [দ্বিতীয় কৃষ্ণের] আক্রমণের সময়ে গৌড়ের সিংহাসনে আসীন ছিলেন" (২০৩ পৃঃ)। এখানে রাখালবাবু পালবংশীয় রাজা রাজ্যপালের সহিত রাষ্ট্রকূটবংশীয় দ্বিতীয় কৃষ্ণের সমসাময়িকত্ব অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু এই অনুমানের সহিত তাঁহার নিম্নলিখিত অপর অনুমানগুলির সামঞ্জস্য বিধান করা অসম্ভব।

১। "অনুমান হয় দেবপালদেব ৮২৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ৮৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন" (১৮৯ পৃঃ)।

২। "প্রথম বিগ্রহপাল বা প্রথম শূরপাল দেবের দুইখানি মাত্র শিলালিপি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

---

* বাঙ্গালার ইতিহাস—শ্রীরাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ২॥০ টাকা। (সমালোচনার দ্বিতীয় অংশ ভাদ্র মাসের 'প্রতিভায়' প্রকাশিত হইয়াছিল)।

* * * * * এইগুলি তাঁহার তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।" (১৯৫ পৃঃ)

৩। "নারায়ণ পাল সম্ভবতঃ পঞ্চান্ন বৎসর রাজত্ব করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন" (১৯৯ পৃঃ)।

এই তিনটি অনুমান অনুসারে ৯২৩ খৃঃ অব্দের (৮৬৫+৩+৫৫=৯২৩) পরে নারায়ণপালের মৃত্যু ও রাজ্যপালের সিংহাসন লাভ হইয়াছিল। কিন্তু দ্বিতীয় কৃষ্ণের পৌত্র- তৃতীয় ইন্দ্ররাজ ৯১৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই সিংহাসন আরোহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং রাখাল বাবুর পূর্ব্বোক্ত অনুমান (রাজ্যপাল ও দ্বিতীয় কৃষ্ণের সমসাময়িকত্ব) একেবারেই অসম্ভব।

(খ) রাখালবাবু লিখিয়াছেন, ১০৫৯ বিক্রমাব্দে (১০০২ খৃষ্টাব্দ) যশোবর্ম্মদেবের পুত্র ধঙ্গদেব রাঢ় ও অঙ্গ বিজয় করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজ্যের শেষভাগে অথবা প্রথম মহীপালের রাজ্যারম্ভকালে রাঢ় ও অঙ্গ ধঙ্গদেব কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়।" (২১৪ পৃঃ)।

এই অনুমানের সহিত নিম্নলিখিত অনুমান দুইটির কোন-প্রকার সামঞ্জস্য বিধান করা অসম্ভব।

১। "অনুমান হয় যে, সারনাথ লিপির তারিখের ৭৫ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১০২৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম মহীপালদেবের মৃত্যু হইয়াছিল" (২৩০ পৃঃ)।

২। "তিব্বতীয় ইতিহাসকার লামা তারানাথ বলেন যে মহীপালদেব ৫২ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইমাদপুরের মূর্ত্তিগুলির খোদিতলিপির উপরে নির্ভর করিয়া তারানাথের উক্তি, ঐতিহাসিক সত্যরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে"। (২২৯ পৃঃ)।

এই দুইটি অনুমান অনুসারে প্রথম মহীপাল ৯৭৪ হইতে ১০২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুতরাং দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজ্যের শেষভাগে অথবা প্রথম মহীপালের রাজ্যারম্ভকালে ধঙ্গ কর্তৃক রাঢ়-অঙ্গ আক্রমণ একেবারেই অসম্ভব।

(গ) রাখালবাবু লিখিয়াছেন, "নয়পালদেবের রাজ্যকালে জগদ্বিজয়ী বীর কর্ণদেব গৌড় রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। (২৩০পৃঃ) .....নয়পালের সহিত কর্ণের সন্ধি স্থাপিত হইলে, নয়পালের পুত্র বিগ্রহপালের সহিত কর্ণের কন্যা যৌবনশ্রীর বিবাহ হইয়াছিল (২৩৩ পৃঃ)।"

এই অনুমানের সহিত নিম্নোক্ত অনুমানের সামঞ্জস্য বিধানও অসম্ভব।

"চেদিবংশীয় কর্ণদেব ..... তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজ্যকালে গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। কর্ণদেব পরাজিত হইয়া তাঁহার যৌবনশ্রী নাম্নী কন্যার সহিত বিগ্রহ-পালদেবের বিবাহ দিয়াছিলেন" (২৩৬ পৃঃ)

(ঘ) লক্ষ্মণ সেন ১১১৮-১৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, ইহা রাখালবাবু প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। "লক্ষ্মণসেনদেবের রাজ্যাভিষেক-কাল হইতে একটি নূতন অব্দ গণনা আরম্ভ হইয়াছিল। ইহা 'লক্ষ্মণাব্দ', লক্ষ্মণ সংবৎ' বা 'লসং' নামে পরিচিত। .... জগদ্বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ স্বর্গীয় ডাঃ কিলহর্ণ গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে এই অব্দ ১১১৮-১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে গণিত হইতেছে। লক্ষ্মণাব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ...... এই সকল ভিন্ন ভিন্ন মতের নিরসন অতি সহজ" (২৯৯—৩০০ পৃঃ)।

কিন্তু যদি লক্ষ্মণসেনের রাজ্যকাল সম্বন্ধে রাখালবাবুর অনুমান সত্য হয়, তাহা হইলে পাল ও সেনবংশের কালনির্ণয় সম্বন্ধে তিনি অন্য যে সমুদয় অনুমান করিয়াছেন তাহা অসঙ্গত বলিয়া প্রতিভাত হইবে, বাব। কথাটি অদ্ভুত হইলেও সত্য, যে রাখালবাবুর পাল ও সেন রাজবংশের কাল-নির্ণয় সম্বন্ধে মন্তব্যগুলির সহিত এই লক্ষ্মণ সংবতের মন্তব্যের সামঞ্জস্য-বিধান অসম্ভব। তাঁহার গ্রন্থের নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত মন্তব্যগুলি একত্র করিয়া সাজাইয়া দেখাইতেছি, তাহা হইতেই পাঠকগণ আমার কথার যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে

* E I VIII, App II, P 3

পারিবেন।

(ক) "অনুমান হয় যে··· ...১২২৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম মহীপাল দেবের মৃত্যু হইয়াছিল, এবং নয়পালদেব সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন"। (২০০ পৃঃ)

(খ) "অনুমান হয় যে, নয়পালদেব বিংশতি বর্ষ কাল গৌড়-সিংহাসনে আসীন ছিলেন, এবং ১০৪৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।" (২৩৪ পৃঃ)

(গ) "বিগ্রহপালদেবের ত্রয়োদশ রাজ্যাঙ্কে সুবর্ণকার সাহের পুত্র দেহেক একটি বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।" (২৩৭ পৃঃ)।

(ঘ) "তিনি [রামপালদেব] বোধ হয়, পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষকাল গৌড় সিংহাসনে আসীন ছিলেন" (২৬৭ পৃঃ)।

(ঙ) "কুমারপালদেব বোধ হয় এক বা দুই বৎসর গৌড় সিংহাসনে আসীন ছিলেন" (২৮৩ পৃঃ)।

(চ) "বিজয় সেন বোধ হয় মদনপাল দেবের রাজ্যাঙ্কের পরবর্ত্তী সময়ে সমগ্র বরেন্দ্রভূমি অধিকার করিয়াছিলেন ..." (২৮৪ পৃঃ)।

(ছ) "বিজয়সেন গৌড়েশ্বরকে পরাজিত করিয়া কামরূপাধিপতিকে দমন করিয়াছিলেন এবং কলিঙ্গরাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কামরূপ ও কলিঙ্গ বিজয়ের পরে বিজয়সেন নান্য, বীর, রাঘব ও বর্দ্ধন নামধেয় নরপতিগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন।" (২৮৯ পৃঃ)

(জ) "...বল্লালসেন তাঁহার একাদশ রাজ্যাঙ্কে...... বাল্লহিট্ট গ্রাম ....শ্রীশ্রীবাসুদেব শর্ম্মাকে প্রদান করিয়াছিলেন" (২৯৪ পৃঃ)।

রাখালবাবুর নিজের কথায় তাঁহার অনুমানগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছি। এক্ষণে এই অনুমানগুলির সাহায্যে পাল ও সেন রাজগণের কালনির্ণয় করা যাউক। যে সকল রাজ্যকাল বা ঘটনা-কালের পরিমাণ সম্বন্ধে রাখালবাবু কোন অনুমান করেন নাই তাহা প, ফ, প্রভৃতি সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করা গেল

রাজা	অভিষেকের তারিখ	রাজ্যকালের পরিমাণ
নয়পাল	১০২৫	২০ ("খ")
৩য় বিগ্রহপাল	১০৪৫	১৩ + প ("গ"
২য় মহীপাল	১০৫৮ + প	ফ
২য় শূরপাল	১০৫৮ + প + ফ	ব
রামপাল	১০৫৮ + প + ফ + ব	৪৫ ("ঘ")
কুমারপাল	১১০৩ + প + ফ + ব	১ (ঙ)
৩য় গোপাল	১১০৪ + প + ফ + ব +	ভ
মদনপাল	১১০৪ + প + ফ + ব + ভ +	৮ + ম (চ)
বিজয় সেন	১১১২ + (প + ফ + ব + ভ + ম +)	র *(ছ)
বল্লাল সেন	১১১২ + (প + ফ + ব + ভ + ম + র)	১১ + ল (জ)
লক্ষ্মণ সেন	১১২৩ + (প + ফ + ব + ভ + ম + র + ল)	

এক্ষণে যদি প,ফ,ব,ভ,ম,র,ল ইহাদিগের প্রত্যেকে এক বৎসর বলিয়াও ধরা যায়, তথাপি রাখালবাবুর অনুমান-পরম্পরা অনুসারে লক্ষ্মণ সেনের অভিষেক-কালকে ১১৩০ এর পরে ঠেলিয়া ফেলা যায় না, এমন কি এইগুলির সমষ্টিকে শূন্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও লক্ষ্মণ সেনের সিংহাসনে আরোহণ-কাল ১১২৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে অনুমান করা যায় না; অথচ রাখালবাবু ১১১৯ খৃষ্টাব্দ লক্ষ্মণ সেনের অভিষেক-কাল ধরিয়া লইতে কিছু মাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই। একই বিষয়ে তিনি যে ভিন্ন ভিন্ন অনুমান করিয়াছেন তাহার মধ্যে এই অদ্ভুত অসঙ্গতি কখনও তিনি লক্ষ্য করেন নাই।

এই ব্যাপারটি আর এক দিক হইতে লক্ষ্য করিলে রাখালবাবুর অনুমান-পরম্পরার মধ্যে আরও অনেক অসঙ্গতি দৃষ্ট হয়। লক্ষ্মণ সেন যদি ১১১৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া থাকেন (২৯৪ পৃঃ), তাহা হইলে বল্লাল সেন ১১০৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এবং বিজয় সেন ১০৭৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন বলিতে হইবে, কারণ

* রাখাল বাবু লিখিয়াছেন, "বিজয়সেন অন্যূন পঞ্চত্রিংশ বর্ষকাল গৌড় সিংহাসনে আসীন ছিলেন"। ইহা সত্য হইলে "র" = ৩৫, কিন্তু এ বিষয়ে মন্তব্য পরে দ্রষ্টব্য।

বল্লাল সেনের একাদশ রাজ্যাঙ্কের (২৯৪ পৃঃ) এবং বিজয় সেনের ৩১শ রাজ্যাঙ্কের তাম্রশাসন (২৯১ পৃঃ) আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাখালবাবুর মতে যে রামপালের মৃত্যুর তারিখ ১১০৩ খৃষ্টাব্দের পরে তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। সুতরাং বলিতে হইবে যে, রামপালের মৃত্যুর অন্ততঃ ২৬ (১১০৩—১০৭৭) বৎসর পূর্ব্বেই বিজয়সেন সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। অন্যত্র বিজয়সেনের প্রসঙ্গে রাখালবাবু লিখিয়াছেন, বিজয়সেনই সেনরাজবংশের প্রথমে রাঢ় দেশের অংশবিশেষের এবং পরে সমগ্র রাঢ় দেশের অধিপতি হইয়াছিলেন। উৎকলরাজ অনন্তবর্ম্মা চোড়গঙ্গ যখন গৌড় রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন তখন বিজয়সেন বোধ হয় পালবংশীয় গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। যুদ্ধান্তে বোধ হয় সমগ্র উত্তররাঢ়া ও দক্ষিণরাঢ়া তাঁহার করতলগত হইয়াছিল। বিজয়সেনই বোধ হয় পূর্ব্ববঙ্গে বর্ম্মবংশীয় ভোজবর্ম্মা অথবা তাঁহার উত্তরাধিকারীর অধিকার লোপ করিয়াছিলেন" (পৃঃ ২৮৮)। এই সমুদয় ঘটনা কোন সময়ে হইয়াছিল তদ্বিষয়ে রাখালবাবু এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন (২৮০ পৃঃ)। "রামপালদেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে······উৎকলরাজ অনন্তবর্ম্মা চোড়গঙ্গ গৌড়-রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ সেনবংশীয় বিজয়সেন রাঢ়ে স্বাধীনরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন।" (২৮০ পৃঃ) অতএব রাখালবাবুর মতে বিজয়সেন রামপালের মৃত্যুর পরে রাঢ় অধিকার করিয়া স্বাধীন রাজা হইয়াছিলেন, পরে বঙ্গ তাঁহার "হস্তগত হইয়াছিল (২৮৪ পৃঃ)।

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে ১০৭৭ হইতে ১১০৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিজয়সেন যে সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন তাহা কোথায় অবস্থিত ছিল? রাখালবাবু লিখিয়াছেন "বিজয়সেন অন্যূন পঞ্চত্রিংশ বর্ষকাল গৌড়-সিংহাসনে আসীন ছিলেন"। (২৯০ পৃঃ) কিন্তু এ গৌড় কোথায়? সাধারণতঃ গৌড় বলিতে যাহা বুঝি, তাহা এ স্থলে বুঝিবার উপায় নাই। কারণ ১১০৩ খৃষ্টাব্দের পরে যখন বঙ্গ কামরূপ, মগধ বরেন্দ্র, উৎকল, মিথিলা প্রভৃতির, যথাক্রমে বর্ম্মবংশ, তিঙ্গ্যদেব-বৈদ্যদেব, পালরাজবংশ, অনন্তবর্ম্মা চোড়গঙ্গ, ও নান্যদেব (?) কর্ত্তৃক শাসিত হইতেছিল—তখন যিনি রাঢ়ে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন—তাঁহাকে ১০৭৭ খৃষ্টাব্দে (অথবা ১০৭৩ কারণ ১১১৯—১১—৩৫=১০৭৩) সুপরিচিত গৌড়ের সিংহাসনে আসীন বলিয়া স্বীকার করিব কিরূপে? এই অদ্ভুত অসঙ্গতি ও অনৈক্য যে রাখালবাবু লক্ষ্য করেন নাই, ইহা অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয়।

রাখালবাবুর মতে মদনপাল, বিজয়সেন প্রভৃতির সহিত যুদ্ধকালে গাহড়বালরাজ-চন্দ্রদেবের নিকট সাহায্য পাইয়াছিলেন। তাঁহার অনুমান-পরম্পরা মতে মদনপালের রাজ্যলাভকাল যে ১১০৪ খৃষ্টাব্দের পরে, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। ও দিকে গাহড়বাল-রাজ চন্দ্রদেব যে ১১০৪ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন তাঁহার পৌত্র মহারাজ-পুত্র গোবিন্দচন্দ্রের উক্ত বর্ষের লিপিই তাহার প্রমাণ। এই সুতরাং গাহড়বালরাজ চন্দ্রদেবের পক্ষে মদন-পালদেবের সাহায্য করা অসম্ভব। আর অধিকদূর অগ্রসর হইবার আবশ্যক নাই। উল্লিখিত অনৈক্যগুলি দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, পরবর্ত্তী পাল ও সেন রাজবংশের রাজ্যকাল বিষয়ে "বাঙ্গালার ইতিহাস" গ্রন্থে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা কোন স্পষ্ট ধারণার পরিচায়ক নহে; সুতরাং এ সম্বন্ধে আর আলোচনা করা বৃথা।

ধর্ম্মপালের কাল-নির্ণয়-প্রসঙ্গে রাখালবাবু বহু যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়াছেন। ধর্ম্মপাল যে ৮১৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, রাখালবাবু ইহা প্রমাণিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন; কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহার অপরাপর যুক্তিগুলি সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার যুক্তির প্রণালী বিজ্ঞান-সম্মত নহে। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। একখানি তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে ৮০৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে তৃতীয় গোবিন্দ কর্ত্তৃক গুর্জ্জর বংশীয় কোন রাজা পরাজিত হইয়াছিলেন। অপর একখানি তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, নাগভট নামক একজন গুর্জ্জর রাজা তৃতীয় গোবিন্দ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। রাখাল বাবুর

মতে "অতএব ইহা স্থির যে গুর্জ্জর প্রতীহার বংশীয় দ্বিতীয় নাগভট ৮০৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কোন সময়ে তৃতীয় গোবিন্দ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন" (১৬৩ পৃঃ)। একটু ধীরভাবে বিবেচনা করিলেই দেখা যায় যে, ইহা সম্ভব হইলেও, "স্থির" নহে। ৮০৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে গোবিন্দ যাঁহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন, তিনি নাগভটের পিতা বৎসরাজ হইতে পারেন পরে অন্য সময়ে তিনি নাগভটকে পরাজিত করিয়া থাকিতে পারেন। তার পরে, আর একটি কথা। ৮০৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে তৃতীয় গোবিন্দ কর্ত্তৃক পরাজিত গুর্জ্জর-রাজ যদিও দ্বিতীয় নাগভট হন, তাহা হইলেও ১৬৫ পৃষ্ঠায় পঞ্চদশ হইতে বিংশ পংক্তিতে রাখালবাবু যে যুক্তি-পরম্পরার অবতারণা করিয়াছেন, তাহার সমর্থন করা যায় না। ঐ যুক্তি-পরম্পরায় ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, ৮০৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে তৃতীয় গোবিন্দ দ্বিতীয় নাগভটকে পরাজিত করিয়াছিলেন, তাহার তাহার পরে আর কখনও পরাজিত করেন নাই। ইহার কোন প্রমাণ নাই। অসম্ভব নহে যে ৮০৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে গোবিন্দ একবার নাগভটকে পরাজিত করিয়াছিলেন। পরে ধর্ম্মপাল ও চক্রায়ুধ নাগভট কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া, 'গুর্জ্জর-বিজয়ী তৃতীয় গোবিন্দের শরণাগত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাদেরই আহ্বানে গোবিন্দ উত্তরাপথ আক্রমণ করিয়া নাগভটকে পুনরায় পরাজিত করিয়াছিলেন' (১৬৫ পৃঃ)। রাখালবাবুর যুক্তির আর একটু নমুনা তুলিয়া দিয়াই আমরা এই কালনির্ণয়-প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। রাখালবাবু লিখিয়াছেন, "ধর্ম্মপাল দ্বিতীয় নাগভটের ও তৃতীয় গোবিন্দের সমসাময়িক ব্যক্তি; সুতরাং ধর্ম্মপালের পুত্র কখনই দ্বিতীয় নাগভটের পৌত্র অথবা বৃদ্ধপ্রপৌত্র......এবং তৃতীয় গোবিন্দের পৌত্রের * সমসাময়িক ব্যক্তি বলা যাইতে পারে না"। ধর্ম্মপালের পুত্র যে নাগভটের বৃদ্ধপ্রপৌত্রের সমসাময়িক তাহা কেহই বলে না; কিন্তু ধর্ম্মপালের পুত্র নাগভটের পৌত্র অথবা তৃতীয় গোবিন্দের পৌত্রের সমসাময়িক ইহা বলা যাইতে পারে না কেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। রাখালবাবু অন্যত্র দেবপালকে ভোজদেবের সমসাময়িক ধরিয়া লইয়াও, এই দেবপালের পৌত্রকেও ভোজদেবের সমসাময়িক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; যথা "দেবপাল দেবের রাজ্যের শেষভাগ বোধ হয়, প্রথম ভোজদেবের সহিত যুদ্ধে ব্যয় হইয়াছিল। প্রথম বিগ্রহপাল ও নারায়ণপাল ভোজদেবের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন..." (১৯৪ পৃঃ)। যদি ক, 'খ' এর, 'খ' এর পুত্রের, এবং "খ" এর পৌত্রের সমসাময়িক হইতে পারে, তাহা হইলে 'প' ও "প" এর পুত্র, যথাক্রমে 'ব' ও 'ব' এর পৌত্রের সমসাময়িক হইতে পারিবে না কেন, তাহা ভাল বুঝা যায় না। অবশ্য বিশিষ্ট প্রমাণ থাকিলে তৎবিরুদ্ধে কেবল ন্যায়ের জোরে সমসাময়িক করা করা যায় না; কিন্তু যদি অনুমান করিতে হয় তাহা হইলে, সমসাময়িক ব্যক্তিদ্বয়ের পুত্র ও পৌত্রের সমসাময়িকত্ব অস্বীকার করা অসঙ্গত, বিশেষতঃ যখন রাখালবাবু নিজেই এক রাজাকে তাঁহার সমসাময়িক রাজার পৌত্রের সহিত সমসাময়িক বলিয়া উল্লেখ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।

এইবার কালনির্ণয়প্রসঙ্গ ছাড়িয়া দিয়া গ্রন্থোক্ত ঐতিহাসিক ঘটনার আলোচনা করা যাউক। বড়ই দুঃখের বিষয় যে গ্রন্থের এই অংশও ভ্রমপ্রমাদশূন্য নহে। আমি প্রধান প্রধান কয়েকটি ভুলভ্রান্তি মাত্র প্রদর্শন করিব।

রাখালবাবুর মতে, পালরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালদেবের সিংহাসন-লাভের অব্যবহিত পূর্ব্বে যে সমুদয় বহিঃশত্রু কর্ত্তৃক গৌড়-মগধ আক্রান্ত হইয়াছিল, রাষ্ট্রকূটগণ তাঁহাদের অন্যতম। তিনি লিখিয়াছেন, "গৌড়মগধবাসী রাষ্ট্রকূট, গুর্জ্জর প্রভৃতি পরাক্রান্ত রাজগণের আক্রমণে দীর্ণ....." (১৫৩ পৃঃ), "রাষ্ট্রকূটবংশীয় সম্রাট ধ্রুব ধারাবর্ষ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া গৌড়ীয় প্রজাবৃন্দ অবশেষে একজন রাজা নির্ব্বাচন করিতে

* এইখানে মুদ্রিত গ্রন্থে 'পুত্রের' এই শব্দ আছে কিন্তু উপরের কয়েক পংক্তি পাঠ করিলেই দেখা যায় যে রাখালবাবু এখানে 'পৌত্রের' শব্দই লিখিয়াছিলেন, ছাপাখানায় ভুলক্রমে 'পুত্রের' হইয়া গিয়াছে—অবশ্য 'পুত্রের' শব্দ যে এখানে হইতে পারে না তাহা বলা বাহুল্য;

বাধ্য হইয়াছিলেন। (১৪৯ পৃঃ)" ইত্যাদি। গোপালের পূর্ব্বে ধ্রুব ধারাবর্ষ অথবা অপর কোন রাষ্ট্রকূট নরপতি কর্ত্তৃক গৌড় আক্রান্ত হইয়াছিল, এরূপ কোন প্রমাণ আছে বলিয়া জানি না। রাখালবাবুও এরূপ কোন প্রমাণের উল্লেখ করেন নাই। বিনা প্রমাণে এত বড় একটা কথা মানিয়া লইতে পারি না। রাষ্ট্রকূটবংশীয়গণের লিপি হইতে জানা যায় যে গৌড়-বঙ্গের পরাভবকারী গুর্জ্জরপতি রাষ্ট্রকূটরাজকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন—কিন্তু ইহা হইতে এ কথা প্রমাণিত হয় না যে রাষ্ট্রকূট রাজগণ গৌড়বঙ্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন।

অপর দিকে আর একজন দিগ্বিজয়ী রাজা সম্ভবতঃ এই সময়ে গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিয়া অন্ততঃ তাহার কতকাংশ অধিকার করিয়াছিলেন। রাখালবাবু তাহার সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। এই রাজা নেপালের লিচ্ছবী বংশীয় জয়দেব। নেপালে পশুপতিনাথ-মন্দিরে জয়দেবের একখানি খোদিত লিপি আছে। তাহাতে জয়দেবের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোকটি দেখিতে পাওয়া যায়।

"অঙ্গশ্রিয়া পরিগতো জিতকামরূপঃ
কাঞ্চীগুণাঢ্যবনিতাভিরুপাস্যমানঃ।
কুর্ব্বন্ সুরাষ্ট্রপরিপালনকার্য্যচিন্তাং
যঃ সার্ব্বভৌমচরিতং প্রকটীকরোতি॥"

ভগবানলাল ইন্দ্রজী ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

"He, clothed in Beauty, surpassing cupid worshipped by females adorned with beautiful girdles, and giving his mind to the duty of protecting his beautiful kingdom, lives the life of a universal emperor."

এই শ্লোকের মূল প্রচ্ছন্ন অর্থ ইন্দ্রজী ধরিতে পারেন নাই। শেষ পংক্তির "সার্ব্বভৌম" কথাটি হইতেই বুঝা যায় যে এখানে অঙ্গ, কামরূপ, কাঞ্চী ও সুরাষ্ট্র দেশবিশেষের নাম এবং এই সমুদয় জয় করিয়াই জয়দেব সার্ব্বভৌম আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। "সুরাষ্ট্রপরিপালন-কার্য্যচিন্তা" এই কথাটি হইতে এরূপ অনুমিত হইতে পারে যে তিনি এই দেশ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিতে পারেন নাই, কিন্তু তদ্বিষয়ে চে করিতেছিলেন। যতদূর জানি, সুবিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত সিলভান লেভীই সর্ব্বপ্রথম এই শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন। উল্লিখিত শ্লোকের এই ব্যাখা সঙ্গত বলিয়া ধরিলে বলিতে হইবে, অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে জয়দেব কর্ত্তৃক অন্ততঃ মগধের কতকাংশ অধিকৃত হইয়াছিল। ঠিক এই শ্লোকের পূর্ব্বের শ্লোকেই উল্লিখিত হইয়াছে যে জয়দেব গৌড়, ওড্র, কলিঙ্গ, ও কোশলের অধিপতি হর্ষদেবের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। এই শ্লোকের এইরূপ ইঙ্গিত থাকিতে পারে যে, বিবাহসূত্রে জয়দেব ঐ সমুদয় প্রদেশের অধিপতি হইয়াছিলেন, পরে অঙ্গ কাঞ্চী কামরূপ প্রভৃতি স্বীয় বাহুবলে জয় করিয়াছিলেন; কারণ ওড্র, কলিঙ্গ, ও কোশল অন্যের হস্তগত থাকিলে কাঞ্চীতে যুদ্ধযাত্রা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না।

হর্ষদেব যখন গৌড়ের অধিপতি তখন বোধ হয় তাঁহার সহিত দাক্ষিণাত্যের চালুক্য রাজগণের যুদ্ধ হইয়াছিল। চালুক্যরাজ বিনয়াদিত্যের খোদিতলিপি হইতে জানা যায় যে তিনি উত্তরাপথের কোন সার্ব্বভৌম রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। এই রাজা কে, তাহা জানা যায় নাই, কিন্তু অসম্ভব নহে যে ইনি উল্লিখিত হর্ষদেব। কারণ সমনগড় তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, শ্রীহর্ষের পরাভবকারী কর্ণাট সেনা দন্তিদুর্গ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিল।

উক্ত তাম্রশাসনের এই শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া রাখাল বাবু 'শ্রীহর্ষকে' 'উত্তরাপথেশ্বর' এই উপাধিভূষিত করিয়াছেন কেন, তাহার কোন কারণ দেখান নাই। সম্ভবতঃ তিনি স্থাণ্বীশ্বরের সুবিখ্যাত শ্রীহর্ষদেব ও সমনগড়ের তাম্রশাসনে উল্লিখিত শ্রীহর্ষকে অভিন্ন মনে করিয়াছেন—কিন্তু এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। জয়দেব ও দন্তিদুর্গ প্রায় সমসাময়িক ব্যক্তি, সুতরাং জয়দেবের শ্বশুর অনতিকাল পূর্ব্বে কর্ণাট সৈন্য কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন, এবং এই জয়ী কর্ণাট সৈন্যকে দন্তিদুর্গ পরাজিত করিয়াছিলেন, ইহাই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। উত্তরাপথেশ্বর শ্রীহর্ষ দন্তিদুর্গের

প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে কর্ণাট সৈন্য কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন, সুতরাং এই ঘটনার উল্লেখ এখানে সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না।

পালরাজবংশের পূর্ব্বপরিচয় সম্বন্ধে রাখাল বাবু যাহা বলিয়াছেন তাহা কোনমতেই সমর্থন করা যায় না। বৈদ্যদেবের প্রশস্তি এবং সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে এই সম্বন্ধে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, রাখালবাবুর তাহার সামঞ্জস্য-বিধান করিতে না পারিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে "প্রশস্তিকার বোধ হয় পালরাজগণের পূর্ব্ব-পরিচয় সম্যক্‌রূপে অবগত ছিলেন না" (১৪৬পৃঃ)। কিন্তু পালরাজগণের মন্ত্রী ও সেনাপতি বৈদ্যদেব ও তাঁহার কর্ম্মচারিগণ পালরাজগণের বংশ-পরিচয় সম্যক্ অবগত ছিলেন না, ইহা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। রামচরিতের লেখক ও বৈদ্যদেবের প্রশস্তিকার প্রায় সমসাময়িক ব্যক্তি। পালরাজগণের সহিত সংসৃষ্ট সমসাময়িক দুই ব্যক্তি পালরাজগণের বংশ-সম্বন্ধে বিপরীত মত অবলম্বন করিবেন, ইহা অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ এই দুইটি মত যে পরস্পর-বিরুদ্ধ নহে, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতায় তাঁহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। 'মর্ম্মবাণী' পত্রিকায় (১ম বর্ষ ১ম খণ্ড ১০ম সংখ্যা তাঁহার বক্তৃতার সারাংশ প্রকাশিত হইয়াছে. সুতরাং এ বিষয়ে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

পালবংশের প্রথম রাজা গোপালের কাল-নির্ণয়-প্রসঙ্গে রাখাল বাবু লিখিয়াছেন "গোপালদেব পালবংশের প্রথম রাজা। গুর্জ্জরেশ্বর দ্বিতীয় নাগভট ও রাষ্ট্রকূট-রাজ ধ্রুব ধারাবর্ষের ভীষণ আক্রমণ সহ্য করিতে হইলে নবপ্রতিষ্ঠিত পালবংশের অধিকার বোধ হয় গোপালদেবের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইত। তাহা হইলে গোপালদেবের পুত্র ধর্ম্মপাল কখনই সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত জয় করিয়া চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জের সিংহাসন প্রদান করিতে পারিতেন না। শক্রদীর্ণ নব-প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের অধীশ্বরগণ কখনই এক পুরুষের মধ্যে মহারাজ-রাজচক্রবর্ত্তী উপাধি লাভ করিতে পারিতেন না। এই কারণে অনুমান হয় যে, বিদেশীয় রাজগণের আক্রমণ শেষ হইলে গোপালদেব গৌড়-মগধ-বঙ্গের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন।" (১৫৪ পৃঃ)

রাখাল বাবুর এই উক্তি সম্বন্ধে দুইটি গুরুতর আপত্তি আছে—

(১) ধ্রুব ধারাবর্ষ ও দ্বিতীয় নাগভটের "ভীষণ আক্রমণ" শেষ হইবার পূর্ব্বেই গোপালদেব রাজা হইয়াছিলেন। ধ্রুব ধারাবর্ষের "ভীষণ আক্রমণ" সম্পূর্ণ রূপে রাখাল বাবুর কল্পনা-প্রসূত, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আর দ্বিতীয় নাগভটের 'ভীষণ আক্রমণ' যে গোপালদেবের পুত্রকে সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা স্বয়ং রাখাল বাবুই অন্যত্র স্বীকার করিয়াছেন। "গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপাল গুর্জ্জররাজ দ্বিতীয় নাগভট কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন... ...ধর্ম্মপাল ও চক্রায়ুধ বোধ হয়, বার বার নাগভট কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া অবশেষে রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের সাহায্য ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।" (১৬৮ পৃঃ) রাখাল বাবুর মতে এই শেষোক্ত ঘটনার তারিখ ৮০৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে (১৬৫ পৃঃ)। সুতরাং গোপালদেবের পূর্ব্বে নাগভট আদি বিদেশীয় রাজগণের আক্রমণ শেষ হওয়া তো দূরের কথা, তাঁহার মৃত্যুর ১০।১২ বৎসরের মধ্যেই তাঁহার পুত্র বারবার নাগভট কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। (রাখাল বাবুর মতে গোপালদেব ৭৯০-৭৯৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন—১৫৪ পৃঃ)।

(২) রাখাল বাবুর মতে শক্রদীর্ণ নবপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যের অধীশ্বরগণ কখনই এক পুরুষের মধ্যে মহারাজরাজ-চক্রবর্ত্তী উপাধি লাভ করিতে পারেন না। অথচ রাখাল বাবুর মতে, বহ্লীক হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত যাহার বিজয়পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল. সেই চন্দ্রবর্ম্মার ন্যায় দিগ্বিজয়ী বীর কর্ত্তৃক চন্দ্রগুপ্তের নবপ্রতিষ্ঠিত রাজ্য আক্রান্ত হইলেও, চন্দ্রগুপ্তের পুত্র সমুদ্রগুপ্ত ধর্ম্মপাল অপেক্ষা বৃহত্তর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রাখালবাবুর মতে "সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ধর্ম্মপালদেব সর্ব্বপ্রথমে * কান্যকুব্জ আক্রমণ করিয়া উহা অধিকার করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্ররাজ বা ইন্দ্রায়ুধের পরিবর্ত্তে চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জের সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন।' (১৬৭ পৃঃ)। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম। খালিমপুর লিপির "ভোজৈর্ম্মৎস্যৈঃ" ইত্যাদি শ্লোক (গৌড়লেখমালা পৃঃ ১৪) হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়—এবং রাখালবাবুও ইহা স্বীকার করিয়াছেন

* অধোরেখাটি আমার নিজস্ব।

১৬৭১৬৮ পৃঃ)—যে, ভোজ, মৎস্য, কুরু, যদু, যবনাদি দেশ-সমূহের রাজগণ পূর্ব্বেই ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। কারণ অন্যথা কান্যকুব্জরাজের অভিষেক-কালে ঐ সমুদয় নরপালগণ প্রণতি-পরায়ণ-চঞ্চলাবনত মস্তকে সাধু সাধু বলিয়া কীর্ত্তন করিতেন না।

রাখালবাবু অনুমান করেন যে ধর্ম্মপাল পঞ্চত্রিংশদ্বর্ষকাল গৌড়ের সিংহাসনে আসীন ছিলেন (১৭৫ পৃঃ) এবং তদীয় পুত্র দেবপালদেব ৮২৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেন (১৮৯ পৃঃ)। সুতরাং ধর্ম্মপাল ৭৯০ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। অথচ রাখালবাবু অন্যত্র লিখিয়াছেন "গোপালদেব ৭৯০—৭৯৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।" (১৫৪ পৃঃ)।

দেবপালের সহিত বিগ্রহপালের সম্বন্ধ নির্ণয় লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। রাখালবাবু এই মতভেদের পরিচয় দিয়া পরিশেষে মন্তব্য করিয়াছেন যে, "প্রথম বিগ্রহপাল যে জয়পালের পুত্র, বাক্‌পালের পৌত্র এবং তাঁহার নামান্তর শূরপাল, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই" (১৯৩ পৃঃ)। প্রথম বিগ্রহপালের নামান্তর যে শূরপাল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই সত্য, কিন্তু এই বিগ্রহপাল বা শূরপাল যে বাক্‌পালের পৌত্র সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইবার উপযোগী বিশিষ্ট প্রমাণ এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই। রাখালবাবুর গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পর শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় 'রামচরিত' গ্রন্থ হইতে 'বংশে তস্য' ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে সন্ধ্যাকর নন্দী পরবর্ত্তী পালরাজগণকে ধর্ম্মপালের বংশধর বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। এই অভিনব প্রমাণটি ঐতিহাসিকগণের সমক্ষে উপস্থিত করিয়া মৈত্রেয় মহাশয় পালরাজগণের সম্বন্ধ নির্ণয় সম্বন্ধে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। এই নূতন প্রমাণের বলে রাখালবাবুরও মত পরিবর্ত্তিত হইতে পারে সুতরাং এ বিষয়ে অধিক লেখা বাহুল্য।

ভোজদেবের সামন্তরাজ মাণ্ডব্যপুরের অধিপতি কক্কের মুঙ্গের যুদ্ধ সম্বন্ধে রাখালবাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহা কোন মতেই সমর্থন করা যায় না। কক্কের পুত্র কক্কুকের ৯১৮ বিক্রমাব্দে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে কক্কের গৌড় যুদ্ধের কোন উল্লেখ নাই, কিন্তু কক্কের অপর পুত্র বাউকের ৯৪০ বিক্রমাব্দে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে এই যুদ্ধের উল্লেখ আছে। রাখালবাবুর মতে "সুতরাং ইহা স্থির যে, ৯১৮ হইতে ৯৪০ বিক্রমাব্দের মধ্যে কোন সময়ে কক্ক মুদ্গগিরিতে গৌড়েশ্বরের সহিত যুদ্ধে যশোলাভ করিয়াছিলেন"। (১৯৭ পৃঃ)। একটু ধীরভাবে বিবেচনা করিলেই দেখা যায় যে এইরূপ যুক্তি কদাপি বিজ্ঞান-সম্মত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। আর বর্ত্তমান ক্ষেত্রে যে ইহা ভুল সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। কক্কুকের ৯১৮ সংবতে উৎকীর্ণ আরও দুইখানি লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল লিপিতে কক্কুক একজন নরপতি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। ৯১৮ সংবতে যাঁহার পুত্র সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, তিনি ৯১৮ সংবতের পরে জীবিত থাকিয়া গৌড়যুদ্ধে যশোলাভ করিয়াছিলেন ইহা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়।

রাখালবাবু লিখিয়াছেন, "গুর্জ্জর রাজ মহীপাল বোধ হয়, এই সময়ে চন্দেল্লবংশীয় যশোবর্ম্মদেবের সাহায্যে মগধ ও অঙ্গ পুনরধিকার করিয়াছিলেন" (২০৬ পৃঃ)। রাখালবাবু তাঁহার এই অনুমানের কোন কারণ দেখান নাই, কিন্তু এই অনুমানের বিরুদ্ধে শ্রীযুক্ত বাবু রমাপ্রসাদ চন্দ যাহা বলিয়াছেন আমরা তাহার সম্পূর্ণ সমর্থন করি (মানসী, শ্রাবণ ১৩২২ পৃঃ ৬৬৭)।

বাণগড় স্তম্ভলিপিতে কম্বোজ জাতীয় গৌড়েশ্বরের নামোল্লেখ নাই। রাখালবাবুর মতে "ইহা হইতে অনুমান হয় যে, বিদেশীয় ও বিজাতীয় গৌড়েশ্বর শিবোপাসক হইলেও গৌড়রাজ্যে তাঁহার নাম সুপরিচিত হয় নাই।" এইরূপ অদ্ভুত অনুমান যে নিতান্ত অযৌক্তিক ও অসঙ্গত তাহা বলাই বাহুল্য।

রাখালবাবু প্রথম মহীপাল দেবের বাণগড়ে প্রাপ্ত

তাম্রশাসন তাঁহার নবম রাজ্যাঙ্কের লিপি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং পাদটীকায় প্রমাণ স্বরূপ 'গৌড়লেখমালার' নাম করিয়াছেন (২১৮ পৃঃ)। গৌড়লেখমালায় কিন্তু স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে যে "এই তাম্রশাসনের যে স্থানে রাজ্যাব্দ উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাহা কে যেন চাঁছিয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং ইহা মহীপালদেবের শাসন সময়ের কোন বৎসরের লিপি, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই।' (৯২ পৃঃ) রাখালবাবু কি প্রমাণের বলে ইহাকে নবম রাজ্যাঙ্কের লিপি বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহা স্পষ্ট লেখা উচিত ছিল।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক নেপালে আবিষ্কৃত একখানি রামায়ণ গ্রন্থের পুষ্পিকা সম্বন্ধে রাখাল বাবু লিখিয়াছেন "যে ইহা হইতে অবগত (?) হওয়া যায় যে "গৌড়ধ্বজ' উপাধিধারী গাঙ্গেয়দেব ১০৭৬ বিক্রমাব্দে তীরভুক্তির অধিপতি ছিলেন। এই গাঙ্গেয়দেব যে কলচুরি বংশীয় প্রসিদ্ধ বীর কর্ণদেবের পিতা, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ এই বিষয়ে অযথা আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন" (২২৪ পৃঃ)। অধ্যাপক বেণ্ডাল ধৃত এই পুষ্পিকার পাঠ সম্বন্ধে যে মতান্তর আছে রাখাল বাবু তাহার উল্লেখ মাত্র না করিয়া উচিত কার্য্য করেন নাই। আর এই পুষ্পিকায় উল্লিখিত গাঙ্গেয়দেব যে কলচুরি বংশীয় প্রসিদ্ধ বীর কর্ণ দেবের পিতা সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে এবং শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ এ বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন তাহাকে অযথা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

মহীপালের রাজ্যকালে বরেন্দ্র-ভূমিতে যে বিদ্রোহ হয় পরবর্ত্তী পালরাজগণের ইতিহাসে তাহা একটি চিরস্মরণীয় ঘটনা। রামচরিত গ্রন্থে এই বিদ্রোহের এবং রামপাল কর্ত্তৃক বরেন্দ্রের পুনরধিকারের বিস্তৃত বিবরণ পাওরা যায়। রাখাল বাবুও রামচরিত গ্রন্থ অবলম্বনে এই বিদ্রোহ প্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। রাখালবাবু যখন তাঁহার ইতিহাস গ্রন্থ লিখিয়াছেন,তখন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত রামচরিত গ্রন্থই এ বিষয়ে ঐতিহাসিকের এক মাত্র অবলম্বন ছিল। তৎপরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া পাল সাম্রাজ্যের অধঃপতন সম্বন্ধে যে কয়েকটি বক্তৃতা দিয়াছেন তাহাতে রামচরিত গ্রন্থ হইতে বহু নূতন তথ্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন, এবং পুরাতন মতের অসারতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। সুতরাং মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করিয়া রাখাল বাবু যে সকল মত প্রচার করিয়াছেন, তাহা কোন কোন স্থলে অসার বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। মৈত্রেয় মহাশয়ের বক্তৃতাগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইলে উভয় পক্ষের বিচার দ্বারা সত্য-নির্ণয়ের পথ সুগম হইবে। রাখালবাবুর গ্রন্থের যে সকল বিশেষ বিশেষ বিবরণ মৈত্রেয় মহাশয়ের নূতন ব্যাখা অনুসারে, আমার নিকট ভ্রান্ত বলিয়া নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইয়াছে, আমি তাহারই মাত্র উল্লেখ করিতেছি।

রাখালবাবু লিখিয়াছেন, "রামচরিতে শূরপালের সিংহাসন লাভের, তাঁহার রাজ্যকালীন ঘটনার এবং তাঁহার মৃত্যুর বিবরণের অভাব দেখিয়া অনুমান হয় যে, রামপাল কোন উপায়ে শূরপালকে সংহার করিয়া পৈতৃক রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন" (২৫২ পৃঃ)। এইরূপ অনুমান যে নিতান্ত অসঙ্গত ও ভ্রান্ত, রামচরিতের প্রথম পরিচ্ছেদের পঞ্চদশ শ্লোকের টীকা হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ বিষয়ে যুক্তিতর্কসম্বলিত বিস্তৃত বিবরণ নবপ্রকাশিত "মানসী ও মর্ম্মবাণী'র ফাল্গুন সংখ্যায় 'পালরাজগণের অধঃপতন" শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

যে সকল সামন্ত রাজগণ রামপালের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে রামচরিতের টীকায় রামপাল দেবের মাতুল মথনদেব এবং "তদীয়নন্দনমহামাণ্ডলিক কাহ্নুরদেবসুবর্ণদেবভ্রাতৃজমহাপ্রতীহারশিবরাজদেব" প্রভৃতির নামোল্লেখ আছে। এখানে এই সমাসবদ্ধ পদের সম্ভবতঃ দুই প্রকার অর্থ করা যাইতে পারে, যথা মথনের পুত্র কাহ্নুরদেব ও সুবর্ণদেব এবং মথনের ভ্রাতুষ্পুত্র মহাপ্রতীহার

but the Society has honored the Benares School of Pandits generally. Combined with his deep erudition in the ancient astronomical works of the Hindus, the Professor Bapudeva Castrie's abilities were those of no mean mathematical scholar of the modern school of Europe. The English translat on of Suryya Sidhanta published in the Bibliotheca Indica series of the Society bears testimony. What was said of the late professor Bapudeva may equally be said without any curtailment, of Professor Chandrakanta.

The members of the Gonncil have to consider and deliberate whether it would be proper to ignore the Pandits of Bengal, when there are such really deserving scholars amongst them.

Speaking of the Pandit our late lemented Vice president Dr. Raja Rajendralal Mitra said, "The work Vaisesika Bhasya of Pandit Chand-akanta is written in that simple idiomatic graceful and forcible style which received its highest development in the hands of Cankara, Kumarila, Udayana and Vacaspati Micra. Pandit Tarkalankar's style will not in fact suffer by a comparison with that of any one of those ancient philosophers".

In another place, Pandit Tarkalankar has been very highly spoken of "Among the several Pandits who in Bengal earned the high literary title of Mahamohopadhyaya at the Jubilee celebration, the one for whose profound scholarship we have always cherished high veneration was Professor Chandra kanta Tarkalankar. They did honor to themselves who recommended him to Government for that mark of recognition."

অর্থাৎ—"যাঁহাদের মধ্যে মনোনয়ন করিতে হইবে, তাঁহাদের মধ্যে প্রধানতম পণ্ডিত হইতেছেন বারাণসীর অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদী, এবং কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার। ইহাঁরা উভয়েই বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ, এবং এতদ্দেশের প্রাচীন বিদ্যায় অগাধ পণ্ডিত। গতবার অধ্যাপক বাপুদেব শাস্ত্রীকে মনোনীত করিবার সময় সোসাইটী উক্ত (যথার্থই) কৃতবিদ্য পণ্ডিতের গুণাবলী সম্বন্ধে উচ্চ মত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এবং তদ্দ্বারা তাঁহারা জ্যোতিষের অধ্যাপক, বারাণসী কুইন্‌স্ কলেজের গণিতের অধ্যাপক এবং কাশীর মানমন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক উক্ত পণ্ডিতকেই যে শুধু সম্মানিত করিয়াছেন এমন নহে, কিন্তু কাশীর সমুদায় পণ্ডিতমণ্ডলীকেই তদ্দ্বারা সম্মানিত করা হইয়াছে।

হিন্দুদিগের প্রাচীন জ্যোতিষিক গ্রন্থ-সমূহের গভীর জ্ঞানের সহিত উক্ত বাপুদেব শাস্ত্রী আধুনিক ইউরোপীয় গণিতশাস্ত্রের প্রাচীন জ্ঞানেরও অধিকারী ছিলেন। এই সোসাইটীর বিব্লিউথিকা ইণ্ডিকার অন্তর্গত সূর্য্যসিদ্ধান্তের ইংরাজী অনুবাদই তাহার প্রমাণ।

স্বর্গীয় বাপুদেব শাস্ত্রী সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণই চন্দ্রকান্ত তর্কলঙ্কার সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে।

কাউন্সিলের সভ্যগণকে বিবেচনা করিতে হইবে যে যখন এই প্রকার কৃতবিদ্য উপযুক্ত পণ্ডিত বাঙ্গালাদেশেও বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তখন বাঙ্গালার পণ্ডিতমণ্ডলীকে একেবারে আমল না দেওয়া উচিত কি না। তর্কালঙ্কার মহাশয় সম্বন্ধে আমাদের সহঃ-সভাপতি ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলিয়াছেন—: "পণ্ডিত চন্দ্রকান্তের 'বৈশেষিক ভাষ্য' নামক গ্রন্থ, শঙ্কর কুমারিল উদয়ন ও বাচস্পতিমিশ্রের হাতে যে ভাষা সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতিলাভ করিয়াছিল,—সেইরূপ সহজবোধ্য সুন্দর ওজস্বিনী প্রসন্নগম্ভীর ভাষায় লিখিত হইয়াছে। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ভাষা ঐ সমস্ত প্রাচীন দার্শনিকদিগের ভাষায় সহিত তুলিত হইলে কোন অংশেই ন্যূন প্রতিপন্ন হইবে না।"

"অন্য স্থানেও উক্ত পণ্ডিত যথেষ্ট প্রশংসিত হইয়াছেন, যে সমস্ত পণ্ডিত জুবিলী উপলক্ষে "মহামহোপাধ্যায়"

উপাধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের পাণ্ডিত্যের প্রতি আমাদের সকলেরই একান্ত ভক্তি রহিয়াছে, তিনি অধ্যাপক চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার।

যাঁহারা ইহাঁকে উক্ত সম্মানের উপযুক্ত বলিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা তদ্দ্বারা নিজেদের প্রতিই সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন।" (ক্রমশঃ)

শ্রীকালীকৃষ্ণ সিদ্ধান্তশাস্ত্রী।

প্রসেনজিৎ

খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রসেনজিৎ নামে একজন নরপতি উত্তর কোশল প্রদেশে রাজত্ব করেন। প্রসেনজিৎ বুদ্ধদেবের সমসাময়িক, এ জন্য বৌদ্ধ গ্রন্থে প্রসেনজিতের বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়।

বৌদ্ধ গ্রন্থের বিবরণে অবগত হওয়া যায় যে খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব ৬২৩ অব্দে লুম্বিনী উদ্যানে বুদ্ধদেব ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করেন। অশীতি বর্ষ বয়সে কুশীনগরে শাল-তরু-মূলে বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণ হয়। বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি বুদ্ধদেবের জন্মতিথি এবং বৈশাখ পূর্ণিমা তিথিতেই তাঁহার মহাপরিনির্ব্বাণ হয়।

যে পূর্ণিমা নিশিতে সিদ্ধার্থ জন্ম গ্রহণ করেন, সেই পূর্ণিমা নিশির অবসানে প্রসেনজিৎ এবং বৎসরাজ উদয়ন জন্ম গ্রহণ করেন।

পুরাণের বর্ণনা অনুসারে প্রসেনজিৎ সূর্য্যবংশীয় নরপতি ইক্ষ্বাকুর বংশধর। এই বংশীয় বৃহদ্বল নামক নরপতি কুরুক্ষেত্র মহাসমরে অভিমন্যু কর্ত্তৃক নিহত হন।

"বৃহদ্বলঃ যোঽর্জ্জুনতনয়েনাভিমন্যুনা
ভারতযুদ্ধে ক্ষয়মনীয়ত। (১)"

বৃহদ্বলের বংশে বৃহদ্বল হইতে অধস্তন ষড়-বিংশতিতম পুরুষ প্রসেনজিৎ এবং প্রসেনজিৎ, হইতে অধস্তন চতুর্থ পুরুষ সুমিত্র। সুমিত্রের অভাবে সূর্য্যবংশীয় কোন নরপতি উত্তর কোশলে রাজত্ব করেন নাই। এ সম্বন্ধে একটি গাথা আছে :—

"ইক্ষ্বাকুণাময়ং বংশঃ সুমিত্রান্তো ভবিষ্যতি।
যতস্তং প্রাপ্যরাজানং সসং স্থাৎ প্রাপ্স্যতে কলৌ॥"
(২)

ভাগবতের নবমস্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়েও ঐরূপ বৃত্তান্ত আছে

দক্ষিণদিকে অন্য একটি কোশল রাজ্য আছে, এ জন্য সরযূতীরবর্ত্তী কোশল উত্তর কোশল এবং অপরটি দক্ষিণ কোশল বলিয়া কথিত হয়।

প্রসেনজিতের সময়ে শ্রাবস্তী নগর উত্তর কোশলের রাজধানী ছিল। পূর্ব্ব কালে অযোধ্যা উত্তর কোশলের রাজধানী ছিল।

মহর্ষি বাল্মীকি লিখিয়াছেন :—

"কোশল নাম মুদিতঃ স্ফীতো জনপদো মহান্।
নিবিষ্টঃ সরযূতীরে প্রভূত ধনধান্যবান্॥
অযোধ্যানাম নগরী তত্রাসীল্লোকবিশ্রুতা।
মনুনা মানবেন্দ্রেণ যা পুরী নির্ম্মিতা স্বয়ং॥
আয়তা দশ চ দ্বে চ যোজনানি মহাপুরী।
শ্রীমতী ত্রীণি বিস্তীর্ণা সুবিভক্তমহাপথা॥"

রামায়ণ ১।৫।৫—৭

মনুনির্ম্মিত সেই অযোধ্যাপুরী সরযূ নদী গ্রাস করিয়াছেন। বর্ত্তমান অযোধ্যা মনুনির্ম্মিত অযোধ্যা নহে।

প্রসেনজিতের সময়ে ভারতবর্ষে নানা প্রদেশ ছিল, তন্মধ্যে পাঁচটি অপেক্ষাকৃত অধিক প্রসিদ্ধ। তাহা এই :—

১।—উত্তর কোশলে ; নরপতি প্রসেনজিৎ ; তাঁহার অভাবে তাঁহার পুত্র বিরূঢ়ক বা বিড়ূধক। রাজধানী শ্রাবস্তী নগর।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ শ্রাবস্তীর সংস্থান সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে নেপাল প্রদেশের অন্তর্গত খজুরা জিলা মধ্যে অচীরবতী নদীতটে নেপালগঞ্জ হইতে অনতিদূরে

---

(১) বিষ্ণু পুরাণ ৪।৪

(২) বিষ্ণু পুরাণ ৪।২২

শ্রাবস্তীর ধ্বংসাবশেষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অচীরবতী নদীর বর্ত্তমান নাম রাপ্তী নদী।

প্রসেনজিতের সময়ে অভ্রভেদী তুষারমণ্ডিত শুভ্রবেশ হিমালয় গিরি কোশল রাজ্যের উত্তর সীমা ছিল ; পশ্চিমে এবং দক্ষিণে পূতসলিলা ভাগীরথী পর্য্যন্ত কোশল রাজ্য বিস্তৃত ছিল ; পূর্ব্বদিকে হিরণ্যবতী (গণ্ডক) নদী কোশলের পূর্ব্বসীমা ছিল। বারাণসী এবং সাকেত কোশল রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

কপিলবস্তু প্রদেশে শাক্যগণ বাস করিতেন। শাক্য প্রদেশে এক প্রকার সাধারণ-তন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রচলিত ছিল। শাক্যদিগের মহাসভায় রাজকার্য্যের আলোচনা হইত। সভাপতি নরপতির কার্য্য সম্পাদন করিতেন। এইসময়ে শুদ্ধোদন কপিলবস্তুর নরপতি ছিলেন। প্রসেনজিতের সময়ে শাক্যগণ তাঁহার অধীন ছিলেন।

২।—মগধ। রাজধানী রাজগৃহ ; নরপতি বিম্বিসার ; তদভাবে তাঁহার পুত্র অজাতশত্রু। কুরুক্ষেত্র মহাসমরের পূর্ব্বে জরাসন্ধ এই প্রদেশের সম্রাট ছিলেন। তাঁহার সময়ে গিরিব্রজ নগর মগধের রাজধানী ছিল। বসু নামে একজন নরপতি গিরিব্রজ নগর সংস্থাপন করেন। (১) মহাভারতে এই নগরের বিবরণ লিখিত আছে। বৈভার, বরাহ, বৃষভ, ঋষিগিরি, এবং চৈত্যক নামক পরস্পর-সংলগ্ন উচ্চ শৃঙ্গযুক্ত, নানাপ্রকার পাদপ-শোভিত পঞ্চপর্ব্বত গিরিব্রজ নগরের প্রাচীর স্বরূপ বিদ্যমান ছিল।

বিম্বিসার গিরিব্রজনগরের পর্ব্বতের পাদমূলে রাজগৃহ নগর সংস্থাপন করেন। রাজগৃহ নগরের প্রান্তে বৈভার পর্ব্বত পার্শ্বে সপ্তপর্ণগুহাদ্বারে বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণের পরে বৌদ্ধদিগের প্রথম ধর্ম্ম-সঙ্গীতি হইয়াছিল। মহাকাশ্যপ এই মহাসভার সভাপতি ছিলেন। অজাতশত্রু এই সঙ্গীতির ব্যয় বহন করেন। শ্রাবণ মাসের শুক্লাপঞ্চমীতে এই সঙ্গীতির কার্য্য আরম্ভ হয়। সাত মাসে এই মহাসভার কার্য্যশেষ হয়। এই সভাতে ৫০০ ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন।

ভুবনবিখ্যাত পাটলিপুত্র নগর অজাতশত্রুর পরে সংস্থাপিত হয়। নন্দবংশীয় নরপতিগণ, মৌর্য্য সম্রাটগণ, এবং গুপ্তসম্রাটগণের মধ্যে কতিপয় নরপতি পাটলিপুত্র নগরে রাজত্ব করেন। এই সময়ে কোশল রাজ্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছিল। কোশল প্রদেশ মগধসাম্রাজ্যভুক্ত ছিল।

৩।—বৎসদেশ। রাজধানী কৌশাম্বী ; নরপতি উদয়ন। কোন্ স্থানে কৌশাম্বী নগর ছিল, এ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ নানা প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন। কানিংহেম সাহেব বলেন যে প্রয়াগ হইতে ১৯ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে কোশাম গ্রাম কৌশাম্বীর ভগ্নাবশেষ। ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ বলেন যে প্রয়াগ হইতে জব্বলপুর রেল-বর্ত্মের সাটনা (Sutna) ষ্টেশনের অনতিদূরে কৌশাম্বী নগর অবস্থিত ছিল। কেহ কেহ বলেন কৌশাম্বী যমুনার তটে অবস্থিত ছিল। প্রকৃত পক্ষে অদ্যাপি কৌশাম্বীর প্রকৃত সংস্থান নির্ণীত হয় নাই। এই কৌশাম্বী নগরে সম্রাট অশোক যে প্রস্তর-স্তম্ভ স্থাপন করেন, মুসলমান-নরপতি ফিরোজ তোগলক তাহা আনিয়া প্রয়াগে স্থাপন করিয়াছেন। এই স্তম্ভে সমুদ্রগুপ্তের বিজয়–কাহিনী উৎকীর্ণ আছে।

উদয়নের পিতার নাম পরন্তপ। উদয়ন অবন্তী প্রদেশের নরপতি প্রদ্যোতের তনয়া বাসবদত্তার পাণিগ্রহণ করেন। কথিত আছে, অবন্তীশ্বর কৌশল অবলম্বন করিয়া উদয়নকে বন্দী করেন। পরে উদয়ন এবং বাসবদত্তা এক হস্তী আরোহণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। প্রবাদ প্রায় সুভদ্রাহরণের ন্যায়। উদয়ন সম্বন্ধে নানা প্রকার উপাখ্যান প্রচলিত আছে। এ জন্য মহাকবি বলিয়াছেন :—

"প্রাপ্যাবন্তীমুদয়নকথাকোবিদগ্রামবৃদ্ধান্"

বৎসরাজ উদয়ন রাজধানীতে চল্লিশ হাত উচ্চ একটী মন্দির প্রস্তুত করেন এবং তাহাতে চন্দন কাষ্ঠময় বুদ্ধদেবের এক মূর্ত্তি স্থাপন করেন। উদয়ন এবং সিদ্ধার্থ উভয়ে এক দিবসে জন্মগ্রহণ করেন।

এই প্রদেশে ঘোষিল নামক জনৈক শ্রেষ্ঠী এক সঙ্ঘারাম প্রস্তুত করেন। সম্রাট অশোক এখানে ২০০ ফিটের ঊর্দ্ধ উচ্চ এক স্তূপ নির্ম্মাণ করেন।

(১) রামায়ণ ১।৩২।৭

৪।—অবন্তী প্রদেশ। রাজধানী উজ্জয়িনী; নরপতির নাম প্রদ্যোত। তিনি চণ্ড প্রদ্যোত বলিয়া কথিত হইতেন। খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীতে এই প্রদেশ মালব প্রদেশ বলিয়া কথিত হইতেছে। এই প্রদেশে কালপ্রিয়নাথ বা মহাকাল শিবলিঙ্গের মন্দির ছিল। এই মন্দিরের সম্মুখে অমর কবি ভবভূতির উত্তরচরিতের প্রথম অভিনয় হয়।

সম্রাট আলতামাস এই মহাকাল-মন্দির ধ্বংস করেন।

৫।—গান্ধার প্রদেশ। রাজধানী তক্ষশিলা; নরপতির নাম পুক্কসাতি। বর্ত্তমান আফগানিস্থানের এবং পঞ্জাবের কিয়দংশ গান্ধার প্রদেশ। কান্দাহার গান্ধার শব্দের অপভ্রংশ। এই প্রদেশে মহর্ষি পাণিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মস্থান শলাতুর। পাণিনি ব্যাকরণে এ দিকের বহু স্থানের উল্লেখ আছে। (২)।

(২) কাপিশ্যাঃ ষ্ফক্। ৪।২।৯৯। কাপিশী গান্ধারের পশ্চিমে আফগানিস্থানের অন্তর্গত বোধ হয়।

বর্ণৌ বুক্ ৪।২।১০৩। পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্ত বলেন, বর্ণু ইয়াঃ চোয়াং বর্ণিত Falana।

মদ্রেভ্যোঽঞ্ ৪।২।১০৮।

সিন্ধুতক্ষশিলাদিভ্যোঽণ্ অঞৌ ৪।৩।৯৩।

তূদীশলাতুরবর্ম্মতীকূচবারাড্ঢক্ছণ্ঢঞ্যকঃ। ৪।৩।৯৪।

বাহীকগ্রামেভ্যশ্চ ৪।২।১১৭।

কুষাণ সম্রাট কণিষ্কের সময়ে পুরুষপুর (বর্ত্তমান পেশবার) গান্ধারের রাজধানী ছিল। কণিষ্ক পুরুষপুরের অনতিদূরে এক স্তূপ নির্ম্মাণ করেন। ইহা ৪০০ ফিট উচ্চ ছিল; ইহার নিম্নের পরিধি ৪০০ গজ। স্তূপের উপরিভাগ তাম্রপাতে আবৃত ছিল। এই স্তূপের নিকটে এক মন্দিরে শ্বেতমর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত ১২ হাত উচ্চ বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল।

কণিষ্কের স্তূপের ভগ্নাবশেষ হইতে বুদ্ধদেবের যে অস্থি পাওয়া গিয়াছে, তাহা সযত্নে রক্ষা করার জন্য রাজপ্রতিনিধির আদেশে মেণ্ডেলের বৌদ্ধগণ তথায় নিয়াছেন।

বৌদ্ধশ্রমণগণমধ্যে অসঙ্গ, বসুবন্ধু, নারায়ণ দেব, ধর্ম্মতার, মনোরথ, এবং পার্শ্ব এই প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। অশ্বঘোষ পার্শ্বের সহিত বিচারে পরাজিত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং ভিক্ষু সম্প্রদায়ভুক্ত হন।

তক্ষশিলা অতি প্রাচীন স্থান। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে রাজা জন্মেজয় মহাভিষেক যজ্ঞ সম্পাদন করা জানা যায়। এই জন্মেজয় তক্ষশিলা নগর অধিকার করেন। এই স্থানে জন্মেজয় সর্পসত্র সম্পাদন করেন; জন্মেজয়ের নিকটে মহর্ষি বৈশম্পায়ন তক্ষশিলাতে মহাভারত পাঠ করেন। তদনন্তর জন্মেজয় রাজধানীতে প্রত্যাগমন করেন। (৩)

তক্ষশিলাতে অতি প্রাচীন কাল হইতে একটি বিশ্ব-বিদ্যালয় ছিল। কথিত আছে, মহর্ষি পাণিনি এই বিদ্যালয়ের অন্তেবাসী ছিলেন। আয়ুর্বেদ অধ্যাপনার জন্য তক্ষশিলার বিশ্ববিদ্যালয় সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল। বিম্বিসারের এক পুত্র জীবক এই বিদ্যালয়ে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন।

কালক্রমে এই তক্ষশিলাতে যবন সম্রাট আলিকসন্দর (Alexander) পৌরবরাজ বা প্রমার রাজকে (Porus) পরাজিত করেন বলিয়া যবন ইতিবৃত্তলেখকগণ বর্ণনা করিয়াছেন।

সম্রাট অশোকের সময়ে কুমার কুণাল তক্ষশিলার শাসন-কর্ত্তা ছিলেন। কথিত আছে, রাজ্ঞী তিষ্যরক্ষিতার কুপরা-মর্শে সম্রাটের আদেশে কুমারের চক্ষুর্দ্বয় নষ্ট করা হইয়াছিল। পরে ঘোষ নামক একজন অর্হতের অনুগ্রহে কুমার পুনঃ দৃষ্টিশক্তি লাভ করেন।

কলকাসরাই হইতে অর্দ্ধক্রোশ উত্তর পূর্ব্বে সাঢেরি নামক গ্রাম তক্ষশিলার ধ্বংসাবশেষ বলিয়া কানিংহোম সাহেব নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এই স্থান রাউলপিণ্ডি জিলায় অবস্থিত।

বুদ্ধদেবের জন্মসময়ে ব্রহ্মদত্ত অযোধ্যার নরপতি ছিলেন। তিনি অরনেমি ব্রহ্মদত্ত বলিয়া পরিচিত। প্রসেনজিৎ ব্রহ্মদত্তের পুত্র। তিনি বাল্যকালে তক্ষশিলার বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস করেন।

(৩) মহাভারত, বঙ্গবাসী সংস্করণ, স্বর্গারোহণ পর্ব্ব, ৫ম অধ্যায়।

বিদ্যালয় হইতে সমাবর্ত্তনের পরে ব্রহ্মদত্ত প্রসেনজিৎকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। প্রসেনজিৎ প্রথমতঃ বর্ষিকা-নাম্নী এক ক্ষত্রিয়কুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। বর্ষিকার গর্ভে কুমারজেত জন্মগ্রহণ করেন।

এই সময়ে শাক্যগণ অযোধ্যার নরপতির অধীন ছিলেন, কিন্তু শাক্যদিগের আবাসস্থানে একপ্রকার সাধারণ-তন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রচলিত ছিল। সভাতে সমস্ত রাজকার্য্যের আলোচনা হইত। সভাপতি নরপতির কার্য্য করিতেন। শুদ্ধোদন এই সময়ে শাক্যগণের নরপতি ছিলেন।

শাক্যগণ তদানীন্তন ক্ষত্রিয় সমাজে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। প্রসেনজিৎ একটি শাক্যকুমারীর পাণিগ্রহণ করার প্রস্তাব করেন। শাক্যগণের সভাতে এই প্রস্তাবের আলোচনা হইয়াছিল। শাক্যগণ এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। শুদ্ধোদনের ভ্রাতার মল্লিকা নাম্নী এক ব্রাহ্মণ কুমারী দাসী ছিল। শাক্যগণ তাহাকে শাক্যকুমারী বলিয়া প্রসেনজিৎকে সম্প্রদান করেন। মল্লিকার গর্ভে প্রসেনজিতের দুই কুমার জন্মগ্রহণ করেন। এক জনের নাম বিরূধক বা বিড়দভ। অপর কুমার ভোটদেশের (বর্ত্তমান তিব্বত) নরপতি হইয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। এই বিবাহ অযোধ্যা এবং কপিলবস্তুর ধ্বংসের কারণ হইয়াছিল। (৪)

বিরূধক ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করার জন্য কপিলবস্তু নগরে গমন করিলে শাক্যকুমারগণ তাহাকে দাসীপুত্র বলিয়া গালি দিয়াছিল।

মৃগধর বা মৃগার প্রসেনজিতের মন্ত্রী ছিলেন। মৃগধরের পুত্র বিশাখ ব্রহ্মদত্তের নির্ব্বাসিত মন্ত্রীর তনয়া বিশাখার পাণিগ্রহণ করেন। বৌদ্ধগ্রন্থে বিশাখা মৃগারের মাতা বলিয়া কথিত হইয়াছে। বাস্তবিক বিশাখা মৃগারের পুত্রবধু।

প্রসিদ্ধ জেতবন বিহার হইতে অর্দ্ধক্রোশ উত্তরপূর্ব্বদিকে পূর্ব্বারাম নামে এক বিহার ছিল। বিশাখা এই বিহার নির্ম্মাণ করেন। বৌদ্ধধর্ম্মে বিশাখার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ান খ্রীষ্টাব্দের চতুর্থ শতাব্দীর অন্তিম সময়ে এই বিহার দেখিয়াছেন। এই বিহারে ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীদিগের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠ ছিল। ধর্ম্মালোচনা এবং উপাসনার জন্যও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠ ছিল। বিশাখার উপদেশে মৃগার বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করেন। এজন্য পূর্ব্বারাম 'মিজার মাতু পাসাদ' বলিয়া কথিত হইত। (৫)

প্রসেনজিৎ বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করেন। তাঁহার পিতৃস্বসা সুমনাদেবী ভিক্ষুণী সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিলেন। প্রসেনজিৎ শ্রাবস্তী নগরের প্রাসাদের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম প্রচার জন্য এক সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন, এইস্থানে বুদ্ধদেব ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন। তিনি এই অট্টালিকার নিকটে বুদ্ধদেবের বিমাতা প্রজাপতি দেবীর বাসস্থানের জন্য এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। প্রজাপতি দেবী ভিক্ষুণী সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিলেন।

বুদ্ধদেব রাজগৃহ নগরে অবস্থান করার সময়ে শ্রাবস্তী সুদত্ত নামক একজন শ্রেষ্ঠী বুদ্ধদেবের দর্শনার্থ রাজগৃহে আগমন করেন। সুদত্ত দীনদুঃখীদিগকে অর্থ বিতরণ করিতেন; এ জন্য লোকে তাঁহাকে 'অনাথপিণ্ডদ' বলিত। রাজগৃহে ভগবানের ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া সুদত্ত বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করেন। পরিশেষে সুদত্ত শ্রাবস্তী নগরে আগমন করার জন্য বুদ্ধদেবকে আহ্বান করেন এবং তাঁহার আবাসের জন্য এক বিহার নির্ম্মাণ করিতে উদ্যোগ করেন। প্রসেনজিতের জ্যেষ্ঠপুত্র কুমারজেতের এক মনোরম উদ্যান ক্রয় করার জন্য সুদত্ত প্রস্তাব করেন; তাহাতে কুমারজেত প্রকাশ করেন যে তাঁহার উদ্যানের সম্পূর্ণ স্থান সুবর্ণ মুদ্রা দ্বারা আবৃত করিয়া দিতে যে পরিমাণ সুবর্ণমুদ্রা লাগিবে, ঐ পরিমাণ সুবর্ণমুদ্রা পাইলে তিনি তাহা বিক্রয় করিবেন। সুদত্ত তাহাতে সম্মত হইয়া সুবর্ণ দ্বারা উদ্যান আবৃত করিতেছিলেন, অল্পস্থান অবশিষ্ট থাকিতে কুমারজেত সেইস্থান বিক্রয়ের বর্জ্জিত রাখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সুদত্ত যেস্থান ক্রয় করিলেন সেখানে এক বিহার নির্ম্মাণ করেন। বিক্রয়াবশিষ্ট স্থানে কুমারজেত

(8) J. A. S. B. 1892 Extra Number by W. Hoey.

(৫) পালিভাষায় মিগার মাতু পাসাদ

একটি কক্ষ নির্ম্মাণ করেন; এবং তাহা সঙ্ঘের জন্যদান করেন। বুদ্ধদেব এখানে আগমর্ন করার পরে তিনি এইস্থান জেতবন বিহার এবং অনাথপিণ্ডদারাম নাম প্রদান করেন। এই বিহারে বুদ্ধদেবের ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া প্রসেনজিৎ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। জেতবন বিহার শ্রাবস্তী হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দক্ষিণে ছিল।

এই বিহারের পূর্ব্বদ্বারের উত্তর এবং দক্ষিণ পার্শ্বে সম্রাট অশোক দুইটি প্রস্তরময় স্তম্ভ স্থাপন করেন। ফাসিয়ান এবং ইয়াং চোয়াং উভয়েই এই স্তম্ভদ্বয় দেখিয়াছেন।

জেতবনবিহারে ১২০টি অট্টালিকা ছিল। জেতবন বিহারের নিকট এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া প্রসেনজিৎ বুদ্ধদেবের এক মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। চীন পরিব্রাজক ফাসিয়ান এবং ইয়াং চোয়াং জেতবন বিহারেব মাত্র এই মন্দির দেখিয়াছেন, কিন্তু তৎকালে এখানে বুদ্ধমূর্ত্তি ছিল না।

প্রসেনজিতের সময়ে অহিংসক নামে একজন ব্রাহ্মণ শ্রাবস্তীনগরে বাস করিত। তাঁহার সম্বন্ধে নানা প্রকার কুৎসিত উপাখ্যান আছে। এই ব্যক্তি বৌদ্ধ গ্রন্থে অঙ্গুলিমালা বলিয়া কথিত। অঙ্গুলিমালা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল।

মগধাধিপতি বিম্বিসার প্রসেনজিতের ভগিনীর পাণিগ্রহণ করেন। এতৎ ব্যতীত তিনি বিদেহরাজতনয়ার পাণিগ্রহণ করেন। প্রসেনজিতের ভগিনীর পাণিগ্রহণ সময়ে কোশলরাজতনয়া বারাণসী নগর যৌতুক প্রাপ্ত হন। বিদেহবাজতনয়া গর্ভজাত বিম্বিসার-তনয় অজাতশত্রু বিম্বিসাবকে হত্যা করিয়া মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। বিম্বিসার অভাবে তাঁহার পত্নী কোশলরাজতনয়া পরলোক গমন করেন। প্রসেনজিৎ তাঁহার ভগিনীর যৌতুককলদ্ধ বারাণসী নগর অধিকার করিতে চেষ্টা করিলে উভয় নরপতি মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। যুদ্ধাবসানে অজাতশত্রু প্রসেনজিতের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন এবং প্রসেনজিৎ বারাণসী নগর তাঁহার কন্যাকে যৌতুক প্রদান করেন।

এক সময়ে বুদ্ধদেবের সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য প্রসেনজিৎ শাক্যপ্রদেশে গমন করেন। তাঁহার অনুপস্থিত সময়ে মন্ত্রীর সহিত ষড়্‌যন্ত্র করিয়া বিরূধক শ্রাবস্তীর সিংহাসন অধিকার করেন। প্রসেনজিৎ এই সংবাদ অবগত হইয়া অজাতশত্রুর সাহায্য প্রার্থনা করার জন্য রাজগৃহ নগরে গমন করেন। রাজগৃহ নগরে প্রসেনজিৎ পরলোক গমন করেন। তদনন্তর বিরূধক শ্রাবস্তীতে রাজত্ব করেন।

খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে নির্ম্মিত ভরাহুতের স্তূপের প্রাচীরে যে সমস্ত প্রতিকৃতি খোদিত আছে, তাহাতে প্রসেনজিতের প্রতিকৃতি আছে। প্রসেনজিৎ চারিটি অশ্বসংযোজিত শকটে ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। উপরে বৌদ্ধধর্ম্মের ধর্ম্মচক্র।

বিরূধক ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করার জন্য যখন কপিলবস্তু নগরে গিয়াছিলেন, তৎকালে শাক্যগণ তাঁহাকে 'দাসীপুত্র' বলিয়া গালি দিয়াছিল। বিরূধক পিতার মৃত্যুর পরে শাক্যদিগকে সমুচিত শিক্ষাপ্রদানের জন্য সসৈন্যে কপিলবস্তু যাত্রা করিলেন। এ সময় বুদ্ধদেব জীবিত ছিলেন। তিনি জ্ঞাতিদিগের রক্ষার জন্য শ্রাবস্তী হইতে কপিলবস্তুর পথে শাখাপ্রশাখা এবং পল্লববিহীন এক শুষ্কতরুমূলে বসিয়াছিলেন। বিরূধক পথিমধ্যে বুদ্ধদেবকে দেখিয়া এ যাত্রায় রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু তাঁহার জিঘাংসা প্রবৃত্তি অত্যন্ত বলবতী হওয়াতে পুনঃ সৈন্যাদি সহ কপিলবস্তু অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এবার আর বুদ্ধদেব পথিমধ্যে অপেক্ষা করা সঙ্গত বোধ করেন নাই।

বিরূধক কপিলবস্তু অধিকার করিয়া অসংখ্য শাক্যদিগকে নিহত করেন। এবং কপিলবস্তুর প্রাসাদ গুলি ভূমিসাৎ করেন। বিরূধকের অত্যাচারে কপিলবস্তু ধ্বংস হইয়াছিল। ইহার কিয়ৎকাল পরে বিরূধক অগ্নিদগ্ধ হইয়া পরলোক গমন করেন।

এই সময়ে চারিজন শাক্যকুমার কপিলবস্তু পরিত্যাগ করিয়া ভাগ্যপরীক্ষার জন্য স্থানান্তরে চলিয়া যান। তাঁহারা চারিজনে চারিটি রাজ্য অধিকার করিয়া সেই সেই প্রদেশে রাজত্ব করেন। একজন বর্ত্তমান বদক্ষান প্রদেশের (Badakshan) ২০ ক্রোশ পশ্চিমস্থ হিমতল প্রদেশ, একজন

কাশ্মীরের উত্তর পশ্চিমে পার্ব্বত্য প্রদেশে উদ্যান নামক স্থানে, একজন কাবুল নগরের পশ্চিমস্থ বামিয়ান নামক স্থানে, এবং একজন সাংমি প্রদেশ রাজত্ব করেন। সাংমি বোধ হয় বর্ত্তমান চিত্রল প্রদেশ। (৬) খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীতে একজন শাক্য নরপতি চিত্রলের অধীশ্বর ছিলেন। (৭)

শাক্যদিগের সহিত সঙ্ঘর্ষে বিরূধকের বলক্ষয় হইয়াছিল, এবং ইহার অল্পকাল পরে বিরূধকের মৃত্যু হয়। এই সুযোগে মগধেশ্বর অজাতশত্রু উত্তর কোশল রাজ্য অধিকার করেন। তদবধি উত্তর কোশলের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই। মহাভাষ্যের একস্থানে উদাহরণ প্রসঙ্গে ভাষ্যকার লিখিয়াছেন

"অরুণৎ যবনঃ সাকেতম্"

সাকেত বলিতে উত্তর কোশল বুঝা যায়। এই ঘটনা খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দীর। এই যবনরাজ বাহ্লীকাধিপতি মিলিন্দ।

শ্রীরেবতীমোহন গুহ।

পাখীর কথা

(৪)

উড়িবার ক্ষমতা ও পাখা

মানুষ ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, কিন্তু একটি বিষয়ে সে আজও অনেক নিকৃষ্ট প্রাণীরও নীচে পড়িয়া আছে। পক্ষীজাতি গগনপথে যথেচ্ছ ভ্রমণ করে, কিন্তু মানুষের সে শক্তি কোথায়? মানুষেরও গগন-পথে ভ্রমণের প্রবল ইচ্ছা আছে। আর সেই ইচ্ছা-পূরণের চেষ্টার ফলেই বেলুন, এয়ারোপ্লেন ও জেপেলিনের সৃষ্টি। কিন্তু প্রথম যে সকল মানুষ গগন-পথে বিচরণের উপায় উদ্ভাবনে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাহারা পক্ষীর ও পতঙ্গের অনুকরণে যন্ত্র-সাহায্যে মানবদেহে কৃত্রিম পক্ষ যোজনা করিয়া আপনাদের চিরপোষিত অভিলাষ পূরণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইংরেজ কবি জনহীনদ্বীপে পরিত্যক্ত আলেকজাণ্ডার সেলকার্কের আত্ম-বিলাপে বলিয়াছেন 'যদি গো থাকিত মোর বিহগের পাখা', (Had I the wings of a dove). বাঙ্গালা কবিতায়ও এই পক্ষ-লাভের অভিলাষ বিরল নহে। এই পক্ষীর একটি অঙ্গ লাভের জন্য মানুষের প্রাণ কত ব্যাকুল!

বিভিন্ন প্রাণীর আকাশ-ভ্রমণ

কবিরা বিহগের পাখাই আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু উড়িবার শক্তি এক পাখীদের একচেটিয়া নহে। প্রজাপতি, ভ্রমর, মৌমাছিদের ত কথাই নাই, "পীপিলিকাও পাখা ধরে," "পাখী হ'তে আশা করে," এবং "আকাশে উড়িতে চায়।" জলচর মৎস্যদের মধ্যেও লোহিতসাগরবাসী একপ্রকার ক্ষুদ্র মৎস্য তাহাদের দীর্ঘ কানার (Fins) সাহায্যে জল হইতে ৩৪ হাত উপরে উঠিয়া তিনশত গজ পর্য্যন্ত উড়িয়া যায়। বৈজ্ঞানিক হিসাবে ইহাদের শূন্যে ভ্রমণ ও পক্ষী এবং পতঙ্গের উড়িবার মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ থাকিলেও সাধারণের নিকট তাহারা উড়ুক্কু মাছ বা (Flying Fish) নামেই পরিচিত। আর আমাদের স্তন্যপায়ীরাও সকলে আকাশ-ভ্রমণের ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত নহে। বাদুড় ও চামচিকা যত ক্ষুদ্রই হউক, তাহারাও মানুষের মত স্তন্যপায়ী।

পতঙ্গ, প্রজাপতি, ও স্তন্যপায়ী বাদুর এবং শূন্য রাজ্যের প্রবল অধীশ্বর পাখী, সকলেই ত পাখার সাহায্যে উড়িয়া বেড়ায়, কিন্তু ইহাদের সকলের পাখাই কি এক রকম? এই ধরুন,

পতঙ্গের ও পাখীর পাখার প্রভেদ

বাদুড়ের কুৎসিত চর্ম্মমাত্রসার পাখার সহিত পক্ষীর পালকের বিচিত্র-সজ্জা-শোভিত পাখার যতখানি সাদৃশ্য আছে, প্রজাপতির নানাবর্ণরঞ্জিত সূক্ষ্ম পাখার সহিতও কি ততখানি সাদৃশ্য আছে? প্রজাপতির পাখাও পাখীর পাখা দুইটিই উড়িবার যন্ত্র, তাই এই দুইটিকে সমশক্তিসম্পন্ন অঙ্গ বলিতে পারি। কিন্তু বাদুড়ের পাখা ও পাখীর পাখা কেবলমাত্র সমশক্তিসম্পন্ন নহে, ইহারা সম-

---

(৬) Watters Vol. II. P. 9.
(৭) Watters Vol II p. 282.

জাতীয়; অর্থাৎ ইহারা উভয় জীবেরই একই অঙ্গের পরিণতি। কথাটা আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলি। মানুষের চারিখানি হাত পা আছে। পশুদেরও হাত পা চারিখানি। বাদুড়ের ও পাখীরও পক্ষ এবং পায়ের সংখ্যা চার। মানুষের বেলায় আমরা যাহাকে হাত ও পা বলি, পশুর বেলায় তাহাই সম্মুখের ও পিছনের পা, এবং বাদুড়ের অঙ্গে তাহাই পা ও পাখা; ভ্রূণ অবস্থায় একই অঙ্গ পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া এই তিন শ্রেণীর প্রাণীর দেহে এই তিনটি বিভিন্ন আকার লাভ করে। কিন্তু প্রজাপতির পা ছয়খানি। মানুষের পায়ের সাথে ইহাদের এইমাত্র সাদৃশ্য যে ইহার উপরও দেহের ভার ন্যস্ত রহিয়াছে। সুতরাং প্রজাপতির পাখা আমাদের পূর্ব্বকথিত অঙ্গ-চতুষ্টয়ের সহিত সমজাতীয় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। তারপর পতঙ্গের পাখা, মাছের কান্‌সার ন্যায় কোন একটি অঙ্গের বিশেষ পরিণতি বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে।

পাখীর পাখার গঠন সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের। মানুষের হাত ও পাখীর পাখা, উভয়ই সমশ্রেণীর অঙ্গ। কেবল উড়িবার উপযোগী আকার দেওয়ার জন্য যেটুকু কাটিতে ছাটিতে হইয়াছে, তাহারই ফলে মানুষের ও পাখীর এই অঙ্গ দুইটির মধ্যে সামান্য একটু পার্থক্য হইয়াছে। মানুষের হাতের সকল অস্থিই পাখীর পাখায় আছে, কেবল উড়িবার সুবিধার জন্য পাখীর পক্ষ হইতে পাঁচটি অঙ্গুলির মধ্যে দুইটি অন্তর্হিত হইয়াছে। বাদুড়ের পাখার ন্যায় পক্ষীর পাখাও হস্তের রূপান্তরমাত্র।

পাখীর পাখা

সকল পাখীই পাখার সাহায্যে উড়িয়া বেড়ায়, কিন্তু সকল পাখীর উড়িবার ধরণ এক রকম নয়। মানুষের মধ্যেই কি সকলে এক রকম করিয়া হাঁটে? কেহ হয় ত একটু নীচের দিকে ঝুকিয়া হাঁটে, কাহারও হয় ত পা ফেলিবার একটু বিশিষ্ট কায়দা আছে, আর কাহারও হাঁটিবার সময় কটিদেশ আন্দোলিত হয়। বিভিন্ন জাতির পক্ষীও উড়িবার সময় ভিন্ন ভিন্ন কায়দায় পক্ষ-সঞ্চালন করে।

উড়িবার প্রকার-ভেদ

যাঁহারা কখন বটবৃক্ষের হরিৎ-পত্রান্তরালে লুক্কায়িত হরিয়ালের ঝাঁকে ঢিল ছুড়িয়াছেন তাহারাই জানেন, ইহারা উড়িবার সময় কিরূপ একটা হ-র-র—র করিয়া শব্দ হয়। জালালী কবুতর ঝাক বাঁধিয়া উড়িবার সময়ও এইরূপ শব্দ হইয়া থাকে। ইহার কারণ আর কিছুই নহে,—কপোত জাতীয় পাখীরা উড়িবার সময় ডানা দুইটির দ্বারা খুব জোরে ঘন ঘন বাড়ি মারিয়া চলে। কেবল যে কপোত জাতীয় পক্ষীরই এই স্বভাব তাহা নহে। সুগোল ভারিদেহবিশিষ্ট পাখীর অপেক্ষাকৃত ছোট ও গোলগাল পাখা থাকিলেই তাহাদের উড়িবার রীতি এই প্রকার হয়। এবং সাধারণতঃ তাহারা অধিক দূর উড়িয়া যায় না। তিত্তির ইহার অন্যতম দৃষ্টান্ত।

কপোত জাতীয় পক্ষী

তিতির

আবার যাহারা গাঙ্গচিল দেখিয়াছেন, তাহাদের উড়িবার অন্য একটি ধরণ লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। গাঙ্গচিলের লঘু দেহের অনুপাতে ডানার আকার লম্বা। কাযেই গাঙ্গচিল কখনও বা ডানার ক্ষিপ্র আঘাত করিয়া, কখনও বা ডানা স্থির রাখিয়া, কখনও বা উপরের দিকে উঠিয়া, আবার কখনও বা চারি দিকে বিচিত্র লীলাভরে ঘুরিয়া ফিরিয়া উড়িয়া বেড়ায়। গাঙ্গচিলের নানা ভঙ্গীর লঘু গতি দেখিতে বড়ই সুন্দর।

গাঙ্গচিল

আবার কাকের উড়িবার ভঙ্গী ইহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কাকও উড়িবার বেলায় পাখা নাড়িয়া চলে, কিন্তু কপোত-বর্গের মত তাহারা বলিষ্ঠ পক্ষের ক্ষিপ্র সঞ্চালন আবশ্যক হয় না। কাকের গমনভঙ্গী কতকটা আত্মনিবিষ্ট ভাব ও গাম্ভীর্য্যের সূচক। কাক যে দিকেই যাউক সোজা উড়িয়া যায়।

কাক

কালো ঝুঁটিওয়ালা বুলবুলের উড়িবার প্রণালী আবার

বুলবুল

পূর্ব্বোল্লিখিত সকল পক্ষী হইতে বিভিন্ন। ইহারা কখনও সোজা চলে না। একবার কতটুকু উপরে উঠিয়া, আবার কতটুকু নীচে নামিয়া, বারংবার পাখা বন্ধ করিয়া ও মেলিয়া চলাই বুলবুলের উড়িবার বিশেষত্ব। বাস্তবিক পক্ষি-জগতে উড়িবার এত বিভিন্ন ভঙ্গী প্রচলিত আছে যে এখানে তাহার সকলের উল্লেখ অসম্ভব। পতঙ্গভুক্ (Fly catchers) বিভিন্ন পক্ষীর গতিবিধি লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইবেন, প্রত্যেক পক্ষীরই উড়িবার একটি স্বতন্ত্র নিজস্ব ভঙ্গি রহিয়াছে।

উর্দ্ধে আরোহণ

এতক্ষণ উড়িবার যে বিভিন্ন প্রণালীর আলোচনা করিলাম, তাহা কেবল বিভিন্ন স্থানে গমনাগমনের প্রতিই প্রযোজ্য। এতদ্ব্যতীত কোন কোন পাখী কেবল মাত্র ক্রীড়াচ্ছলে চক্রাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে আকাশে বহু উর্দ্ধে আরোহণ করে। যাঁহারা "গিরিবাজ' পায়রা পুষিয়া থাকেন, তাহারাই ইহা দেখিয়াছেন। আরণ্য পক্ষীদের মধ্যে বাজ এবং শকুনিরা বহু উর্দ্ধে আরোহণ করে।

পায়রা, বাজ, ও শকুনি

এই প্রকার শূন্যমার্গে আরোহণ-কালে ইহাদের মধ্যে ব্যস্ততা বা চাঞ্চল্যের কোন লক্ষণই দেখা যায় না, এমন কি ইহারা অনেকক্ষণের মধ্যে পক্ষসঞ্চালন পর্য্যন্ত করে না। শকুনিরা কত উর্দ্ধে আরোহণ করে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। বিরাটকায় শকুনি ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইতে হইতে একেবারে দৃষ্টিপথের অতীত হইয়া যায়। একজাতীয় শকুনি ৬ মাইল পর্য্যন্ত উর্দ্ধে আরোহণ করে। শকুনি বাজ জাতীয় পক্ষীরা অবশ্য খাদ্যসন্ধানের উদ্দেশ্যেই শূন্যমার্গে আরোহণ করিয়া থাকে, কিন্তু অন্য সকল আরোহী পাখীরা (সুবিধার জন্য এই প্রকৃতির পাখীদিগকে আরোহী পাখী বলা গেল) কেবল আনন্দের জন্যই উর্দ্ধে আরোহণ করে।

স্কাই লার্ক

আমাদের দেশের কোন কোন জাতীয় পায়রার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বিলাতী স্কাইলার্কও (Sky-lark) ইহার আর একটি দৃষ্টান্ত। আয়তনানুপাতে এই পাখী যতদূর উঠে তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। লার্কের বাসা থাকে মাটিতে ঘাসের ভিতরে, খাদ্যান্বেষণের জন্যও ইহাদের গগন-পথে আরোহণ করিতে হয় না। সুতরাং কেবল মাত্র আনন্দলাভ ব্যতীত ইহার উর্দ্ধারোহণের আর কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে? লার্ক গগন-পথে আরোহণ-কালে উচ্চকণ্ঠে মধুর সঙ্গীত আরম্ভ করে।

খাদ্যানুসন্ধানে আরোহণ

খাদ্যান্বেষণেও বহু আমিষাশী পক্ষী গগন-পথে আরোহণ করিয়া থাকে। সাধারণতঃ এই উদ্দেশ্যে পক্ষীরা বহু উর্দ্ধে উঠে না; কিছুদূর উঠিয়া চক্রাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে নিম্ন দিকে লক্ষ্য করিতে থাকে। শাদাগলাওয়ালা বাজ পুষ্করিণীর তীরে ডালে বসিয়া মাছের সন্ধান করে। কিন্তু তাহার জ্ঞাতিদের মধ্যেই অনেকে খাদ্যের সন্ধানে গগন-পথ অবলম্বন করে। ধীবরেরা জাল ফেলিয়া মাছ ধরিতে আরম্ভ করিলে পুষ্করিণীর উপরেও শঙ্খচিলেরা উড়িয়া বেড়ায়। রঙ্গিন মাছরাঙ্গারা গাছের ডাল হইতেই ঝুপ করিয়া জলে পড়ে, কিন্তু তাহাদের সাদা ও কালো ডোরাদার জ্ঞাতিরা শূন্যমার্গ হইতে শিকার সন্ধান করে। ডোরাদার মাছরাঙ্গারা শিকার অন্বেষণ কালে চিল বাজ প্রভৃতির ন্যায় চক্রাকারে ভ্রমণ করে না, দ্রুত পক্ষসঞ্চালনে একই স্থানে অবস্থান করে। সূর্য্যকরসম্পাতে ইহার শূন্যে অবস্থিত বিচিত্র দেহ বড়ই সুন্দর দেখায়।

গতির ক্ষিপ্রতা

পাখীদের উড়িবার প্রণালী সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইল। এক্ষণ ইহাদের গতির ক্ষিপ্রতার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। ক্ষিপ্রগমনে প্রাণি-জগতে পক্ষি-জাতি যে অদ্বিতীয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বেগবান অশ্বের কথা দূরে

থাকুক, অনেক শক্তিশালী ইঞ্জিনও দ্রুত গতিতে পাখীর সাথে আঁটিয়া উঠিতে পারে কিনা সন্দেহ। সুন্দরের অশ্বের গতি অতিরঞ্জিত করিয়া রায় গুণাকর যাহা বলিয়াছেন, তাহা পাখীর সম্বন্ধে অনেকটা খাটে; আমরা সত্যই বলিতে পারি, "তীর তারা উল্কা আর বেগগামী যে বা। বেগ শিখিবারে বেগে সঙ্গে যাবে কে বা॥"

পূর্ণ শক্তিতে চলিলে পাখীর গতিবেগ কত হয়, তাহা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না।

বেগের হিসাব

তবে এ পর্য্যন্ত যাহারা পাখীর গতিবেগ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের হিসাব কতকটা অতিরঞ্জন-দুষ্ট বলিয়া বোধ হয়। পাখীর গতির মাত্রা নির্ণয় করিবার চেষ্টা একেবারে আধুনিক নহে। বিখ্যাত রোমান লেখক প্লিনি (Pliny) দ্রুতগামী সোয়ালো (Swallow) পাখীর সাহায্যে অল্পকাল মধ্যে সংবাদ প্রেরণের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। একটি সোয়ালো কবারো হইতে প্যারী পর্য্যন্ত ১৬০ মাইল পথ ঘণ্টায় ১০৬ মাইল বেগে ৯০ মিনিটে উড়িয়া গিয়াছিল। ১৮৯০ সালে একটি পায়রা ঘণ্টায় ৮ মাইল বেগে ১১৪ মাইল পথ ভ্রমণ করিয়াছিল। ঐ বৎসরই আর একটি পায়রা ঘণ্টায় ৭১ মাইল বেগে ৮০ মাইল গিয়াছিল। বোধ হয় উর্দ্ধে আরোহণ করিলে পাখীরা অধিক বেগে উড়িতে পারে। আমেরিকার গোল্ডেন প্লোভার (Golden Plover) বিদেশে যাত্রা করিলে এক রাত্রিতে ১৭০০ মাইল পর্য্যন্ত অতিক্রম করে দেখা গিয়াছে।

প্রসিদ্ধ জর্ম্মণ পণ্ডিত গেটকি (Gatke) পক্ষীজাতির গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণেই জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, উত্তরমেরু প্রদেশের ব্লুথ্রোট (Blue throat) নামক পাখী একই রাত্রিতে

গাটকির অনুমান

আফ্রিকা হইতে রওনা হইয়া, ১৬০০ মাইল অতিক্রম করিয়া হেলিগোল্যাণ্ড (Heligoland) দ্বীপে পৌছায়। হেলিগোল্যাণ্ড উত্তর সাগরের জর্ম্মাণ উপকূলের সন্নিহিত ক্ষুদ্র দ্বীপ। ডাক্তার সার্প (Sharpe) গেটকির এই কথায় আস্থাস্থাপন করিতে পারেন নাই। কারণ, তাহা হইলে বিশ্বাস করিতে হয় যে, দয়েলের মত একটি ছোট পাখী ঘণ্টায় ১৮০ মাইল বেগে বিনা বিশ্রামে প্রায় ১২ ঘণ্টা কাল ভ্রমণ করিতে পারে। গ্যাটকি সাহেব কার্লু (Carlen) ও প্লোভার (Plover) সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে ইহারা হেলিগোল্যাণ্ড হইতে চারি মাইল দূরবর্ত্তী কোন স্থানে ১ মিনিটের মধ্যে পৌছায়। এই কথা সত্য হইলে ইহারা ঘণ্টায় দুইশত চল্লিশ মাইল বেগে ভ্রমণ করিতে পারে।

এই সকল পাখীর গতিবেগ কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জিত হইলেও পক্ষিজাতি যে অতিশয় ক্ষিপ্রগামী তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কয়েক বৎসর

গাঙ্গচিলের গতিবেগ

পূর্ব্বে ষ্টীমারে ভ্রমণকালে দেখিয়াছিলাম যে একটি গাঙ্গচিল তাহার স্বাভাবিক বিচিত্র ভঙ্গিতে উড়িতে উড়িতে এক একবার ষ্টীমারের সন্নিহিত হইতেছে, আবার বহুদূর পিছাইয়া পড়িতেছে। এইরূপ ভ্রমণের জন্য ইহার স্বাভাবিক গতিবেগ কিছুমাত্র বর্দ্ধিত করিতে হয় নাই। ষ্টীমারখানি তখন ১০ মাইলের কিছু বেশী বেগে ছুটিতেছিল। সুতরাং গাঙ্গচিলটিকেও তখন ঘণ্টায় অন্ততঃ ২৫ মাইল বেগে উড়িতে হইয়াছিল।

পক্ষির উড়িবার শক্তি ও ক্ষিপ্রতা পক্ষসঞ্চালক মাংসপেশীর আয়তনানুসারে কম বেশী

পক্ষসঞ্চালক মাংসপেশী ও উড়িবার বেগ

হইয়া থাকে। এই মাংসপেশীগুলির আয়তন নিতান্ত কম নহে। হেডলি (Headly) সাহেব হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে পায়রার পক্ষ-সঞ্চালক মাংসপেশীর ওজন সমস্ত দেহের ওজনের এক পঞ্চমের কম নহে।

এইখানে পক্ষি-শাবকগণের পক্ষোদ্গম সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক বোধ করি।

এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকার একটি পক্ষির নামোল্লেখ

সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। ইহার নাম হোয়াটজিন (Hoatjin)

দক্ষিণ আমেরিকার হোয়াটজিন

সাধারণতঃ যে সকল গাছ জলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, তাহারই নিবিড় পত্রান্তরালে হোয়াটজিনেরা বাসা নির্ম্মাণ করে। হোয়াটজিন-শাবকের শৈশবে পক্ষস্থিত অঙ্গুষ্ঠে ও অপর একটি অঙ্গুলিতে তীক্ষ্ণ নখর থাকে। এই নখরের সাহায্যেই গাছের ডাল বাহিয়া শিশু হোয়াটজিন পিতামাতার নিকট যাইয়া খাদ্য গ্রহণ করে। হোয়াটজিন-শাবকের পক্ষের নিম্নভাগেই প্রথম পালক উদ্গত হয়। নিম্নভাগের পালক বড় হইবার পর, পক্ষের অগ্রভাগেও পালক জন্মিতে আরম্ভ করে, ও সেই সঙ্গে পক্ষস্থিত নখর খসিয়া যায়। একটু চিন্তা করিলেই ইহার কারণ বুঝিতে পারা যায়। হোয়াটজিনের পক্ষের অগ্রভাগে পালক প্রথম জন্মিলে সে তাহার নখর হারাইত, কিন্তু পক্ষ সাহায্যে বৃক্ষে অবস্থান করিতে পারিত না। পক্ষের নিম্নভাগের পালক প্রথম বড় হওয়াতে কোন অবস্থাতেই বৃক্ষ হইতে নীচে পড়িয়া আহত হইবার আশঙ্কা থাকে না। কারণ যখন পক্ষের নখর খসিয়া পড়ে, তখন তাহার নিম্নভাগের পালকগুলি এত বড় হয় যে তৎসাহায্যেই হোয়াটজিন-শিশু পতনের বেগ অনেকটা সামলাইয়া লইতে পারে। হোয়াটজিনের পক্ষের আর একটি বিশেষত্ব এই যে শিশুকালে ইহাদের হস্ত (কব্জি হইতে অঙ্গুলি পর্য্যন্ত অংশ) বাহু (কনুই হইতে কব্জি পর্য্যন্ত) অপেক্ষা লম্বা থাকে, কিন্তু পরিণত বয়সে হোয়াটজিনের বাহুই হস্ত অপেক্ষা দীর্ঘ হইয়া থাকে।

হোয়াটজিন-শিশুর আরও একটি স্বভাব বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। হোয়াটজিন-শাবক কোন কারণে হঠাৎ জলে পড়িয়া গেলে, অপূর্ব্ব দক্ষতার সহিত ডুবাইয়া এবং সাঁতরাইয়া আত্মরক্ষা করে, কিন্তু পরিণত বয়সে হোয়াটজিনকে কখনও সাঁতরাইতে দেখা যায় না।

পক্ষোদ্গম-বিষয়ে হোয়াটজিন-শিশুর সহিত মুরগী-শাবকেরও কিছু আশ্চর্য্য সাদৃশ্য রহিয়াছে। হোয়াটজিনের ন্যায় ইহাদেরও নীচের পালক আগে বড় হয় তারপর উপরের পালক উঠিতে আরম্ভ করে। সুতরাং ইহা হইতে অনুমান হয় যে মুরগী-শিশুর পক্ষও এক সময়ে গাছ বাহিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। কিন্তু মুরগীর পক্ষে হোয়াটজিনের ন্যায় নখর না দেখিয়া এ বিষয়ে সন্দেহ

মুরগী-শাবকের পক্ষোদ্গম

হইতে পারে। ডিম্ব ফুটিবার পরে কুক্কুট-শিশুর পক্ষে নখর না থাকিলেও ভ্রূণ অবস্থায় কিন্তু হোয়াটজিন শাবকের ন্যায় কুক্কুট-শাবকের পক্ষেও নখর দৃষ্ট হয়। কেবল কুক্কুট কেন ফিজাণ্ট ও তিতিরেরও ভ্রূণ অবস্থায় পক্ষে নখর থাকে। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে ইহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এক কালে হোয়াটজিনের মত তরু-নিবাসী ছিল।

পক্ষির পালক সম্বন্ধে আরও একটি আশ্চর্য্য তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিগত পয়ত্রিশ বৎসর কাল পর্য্যন্ত পণ্ডিতবর্গ ইহার সম্যক্ ব্যাখ্যা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ঠিক পয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে জার্ব (Gerbe) নামক একজন ফরাসী পক্ষিতত্ত্ববিদ হঠাৎ আবিষ্কার করিলেন যে পারাবত, তোতা প্রভৃতি কোন কোন পক্ষির বাহুতে একটি কুইল পালক নাই। পালকের সংস্থান সম্বন্ধে যে নিয়ম আছে তদনুসারে ঐখানে আর একটি পালক থাকা উচিত ছিল।

হারাণ পালক, জার্ব ও রের আবিষ্কার

জার্বের দশ বৎসর পরে রে (Wray) নামক একজন ইংরেজ পণ্ডিতও পক্ষিবাহুতে ৫নং পালকের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করেন। জার্ব ও রে উভয়েই নানা পাখীর বাহুতে এই হারান পালকের কোন না কোন প্রকার সন্ধান পাইবার চেষ্টায় হয়রাণ হইয়াছেন। অবশেষে এখন ঠিক হইয়াছে যে বাস্তবিক ৫নং পালক হারাইয়া যায় নাই। কেবল অন্যান্য পালকের সম্পর্কে ইহার সন্নিবেশ-প্রণালীর একটু ব্যত্যয় ঘটিয়াছে মাত্র।

সাধারণের একটা বিশ্বাস আছে যে পক্ষই পক্ষীর গগন-পথ-বিচরণের একমাত্র যন্ত্র। কিন্তু এই কার্য্যে তাহাদের

ফুসফুস ও বায়ুসঞ্চয়ের থলিয়াগুলিতেও কম সাহায্য হয় না। পক্ষীর ফুসফুস ও অন্যান্য প্রাণীর ফুসফুসে অনেক পার্থক্য আছে। আমাদের বক্ষপঞ্জরের মধ্যে ফুসফুস দুইটি আলগা ভাবে ঝুলান রহিয়াছে, কিন্তু পক্ষীর ফুসফুস পিঠের সহিত শক্ত করিয়া আঁটা। তার পর দেহের অনুপাতে পক্ষীর ফুসফুসের আয়তনও খুব বড়। কাটিয়া বাহির করিলে ইহার উপর পঞ্জরের দাগ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল স্থানে পক্ষির ফুসফুস পঞ্জরের ফাকে ফাকে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। পক্ষির দেহের দুই ধারেই বায়ুসঞ্চয়ের নিমিত্ত কতগুলি বড় বড় পাতলা থলিয়া আছে। ফুসফুস হইতে অনেকগুলি নল বাহির হইয়া বায়ু-সঞ্চয়ের থলিয়াগুলিতে গিয়াছে। আগে অনেকের বিশ্বাস ছিল যে গগন-পথে বিচরণকালে দেহের ভার কিয়ৎপরিমাণে লঘু করিবার জন্যই পক্ষিদেহে এই সকল থলিয়া সন্নিবেশিত হইয়াছে। কিন্তু হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহাতে পক্ষি-দেহের যে সামান্য ভারের লাঘব হয়, তাহাতে তাহার শূন্য-ভ্রমণের বিশেষ সুবিধা হইবার সম্ভাবনা নাই। খুবই সম্ভব, উড়িতে উড়িতে শ্রান্ত হইয়া পড়িলে, অথবা অবিশ্রান্ত গান করিয়া ক্লান্ত হইলে পাখীরা এই সকল থলিয়ার বায়ু হইতেই শ্বাস-প্রশ্বাসের কায চালায়।

উড়িবার যন্ত্র-ফুসফুস ও বায়ু রাখিবার থলিয়া

কোন কোন পাখীর অস্থির ভিতরও ফাকা। সুতরাং আমাদের অস্থির অভ্যন্তরে যেখানে মজ্জা থাকে, সেই যায়গাটুকুতেও ইহারা বায়ু-সঞ্চয়ের থলিয়া হইতে বায়ু লইয়া পাঠাইয়া দেয়। অনেকের ধারণা, ইহাতে এই সকল পাখীর গতির ক্ষিপ্রতা বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু এই অনুমান সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কারণ যে সকল পক্ষী ক্ষিপ্রগমনের জন্য প্রসিদ্ধ, তাহাদের সকলের অস্থিই আমাদের ন্যায় মজ্জায় পরিপূর্ণ। আবার কোন কোন পাখীর দেহের সর্ব্বত্রই বায়ু সঞ্চয়ের থলিয়া আছে; এমন কি চামড়ার ও মাংসের ভিতরের ফাঁকটুকুও বাদ যায় নাই। দক্ষিণ আমেরিকার স্ক্রিমার (Screamer) নামক পক্ষীর দেহ এইরূপ বায়ু রাখিবার থলিয়াতে পরিপূর্ণ।

সছিদ্র অস্থি

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন।

ধ্যানলোক

(গ্রন্থ-সমালোচনা)

"ধ্যানলোক"—কবিতা বহি, শ্রীযুত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত প্রণীত। কবিতাগুলি সরল, সুমিষ্ট ও ভাবময়। ভাষা সর্ব্বত্র একেবারে নিখুঁত না হইলেও অনেক স্থলেই যথার্থ কবিত্বে মণ্ডিত। জীবেন্দ্র বাবু বাগ্দেবীর সাধনায় অনেকাংশে সফলকাম হইয়াছেন; সাময়িক প্রতিষ্ঠার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া সযত্ন ও একাগ্র সাধনায় রত থাকিলে তিনি কালে চিরস্থায়ী কবিযশঃ অর্জ্জন করিয়া যাইতে পারিবেন বলিয়া আমাদের ভরসা হয়। "বর্ষা-মধ্যাহ্নে"—"কদলীর কুঞ্জ-তীরে আকবনে ঘেরা চারিধার" জাতীয় অতি অল্পসংখ্যক কয়েকটি ছত্র কবির ত্রস্ত রচনার দৃষ্টান্ত; কিন্তু অধিকাংশ কবিতাপুঞ্জেই তাঁহার নির্দ্দোষ কবিত্ব স্ফুরিত হইয়াছে। নিম্নে উদ্ধৃত পদগুলি হইতে জীবেন্দ্র বাবুর কবি-প্রতিভার পরিচয় পাইবেন।

স্বদেশবাসীর বর্ত্তমান আলস্য দর্শনে দত্ত-কবি মর্ম্মাহত হইয়া গাহিতেছেন—

"হে বরেণ্য স্বদেশ আমার!
প্রভাতের স্বর্ণরশ্মি প্রাণস্পর্শী বিহগ-ঝঙ্কার
এখনো না হতে শেষ, না উদিতে মধ্যাহ্ন তপন
আবার আসিছে সুপ্তি, তন্দ্রালস যুগল নয়ন?"

আবার,

"হে উপাস্য স্বদেশ আমার!

হেরিনু কি এত কাল স্বপ্ন শুধু নব-চেতনার
ছুটিনু আলেয়া পিছে ? মুগ্ধ কিবা মৃগতৃষ্ণিকায় ?
জীবন-শোণিত-দান সব ভ্রান্তি ? সকলি বৃথায় ?

কিন্তু, কবি দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ নহেন। তাই তিনি আরও গাহিয়াছেন—

"গভীর জীমূত স্বনে কে কহিছে অন্তরে আমার
সাধনা নিষ্ফল কভু নাহি হয় বসুধা মাঝার।"

"ধ্যানলোকের" প্রধান বিশেষত্ব এই যে ইহাতে কবির সাধনার ক্রম-বিকাশ প্রগাঢ়তার সহিত সরস ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু, কবিতাগুলি সুশৃঙ্খলার সহিত সজ্জিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না; কারণ, কবি গ্রন্থের প্রথম ভাগেই তাঁহার সিদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। পরে, দ্বিধা ও প্রার্থনায় গ্রন্থ পরিসমাপ্ত হইয়াছে। আমরা কবির ক্রমের বিপর্য্যয় করিয়া তাঁহার সাধনার স্তরাবলীর পরিচয় দিব।

"অজ্ঞাত" কবিতায় কবির দ্বিধার আক্ষেপ শুনুন—

"হৃদয় আমার মুক্ত রাখিয়া
তোমার পানে
না বুঝি কোথায় চলেছি ভাসিয়া
কিসের টানে !"

"নির্ভরে" কবির সনির্ভর প্রার্থনা আসিয়াছে—

"যদি আসে অন্ধকার, হয় কভু স্খলিত চরণ
অটল নির্ভর তবু তোমা প্রতি রেখো চিরন্তন !"

"আকিঞ্চন" কবিতায় কবি একান্ত মনে প্রার্থনাপর হইয়াছেন—

"অন্তরে বাহিরে মোর হতে তব যোগ্য মনোমত
হে দেবী, জীবন পণে চাহিতেছি নিত্য অবিরত,
কোনখানে নাহি রবে তিলমাত্র তার ব্যবধান,
তোমারি পবিত্র প্রেমে তুচ্ছ ধূলি হবে গরীয়ান্ !"

তারপর, কবি—(অল্প আয়াসেই যেন !)—সিদ্ধির পূর্ণতৃপ্তি উপলব্ধি করিলেন।—

দৃষ্টান্ত স্বরূপ, "মিলন ও "সম্ভোগ" কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

"ধ্যানে লভিয়াছি তোমা প্রাণের মাঝারে
জীবন-মরণে আজি শাশ্বত মিলন,
পূজিব এবার সদা প্রেম-অর্ঘ্যভারে
ভুলি অশ্রু হাহাকার মরম বেদন!
হে কল্যাণী ! দীন ভক্ত আজি পূর্ণ-কাম !
মরুভূ ধরণীখানি সুস্নিগ্ধ সুশ্যাম !"—("মিলন")

"আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয়ে আমার,
নিবিড় করে,
তুমি দিয়েছ যে ধরা আমার সকল
জনম তরে ;—("সম্ভোগ")

"ধ্যান-লোকে" জীবেন্দ্র বাবুর অন্য ভাবের বিচ্ছিন্ন কবিতাও আছে ; সেগুলির রচনাও সরস, প্রাঞ্জল, ও ভাবময়। উৎকর্ষের দৃষ্টান্ত স্বরূপ আর একটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াই আমাদের বক্তব্য পরিসমাপ্ত করিব।

"তুমি ভালবাস মোরে অবসরহীন,
হে দেবতা, বৃথা কাজে যাপি নিশিদিন
আমি শুধু অবসর খুঁজিয়া বেড়াই
তোমারে বাসিতে ভাল সময় না পাই !—("প্রেম")

হংসরাজ।

উত্তর ফ্রান্সের রাসায়নিক শিল্প

পাশ্চাত্য খণ্ডের ধ্বংসকারী মহাসমরে লিপ্ত শত্রু ও মিত্র সেনার বর্ত্তমান অবস্থান হইতে দেখা যায় যে শত্রু সেনা বৎসরাধিক কাল যাবৎ বেলজিয়ামের প্রায় সমগ্র ভাগ ও ফ্রান্সের উত্তরাংশ অধিকার করিয়া রহিয়াছে। শত্রু কর্ত্তৃক অধিকৃত ভূখণ্ডের শিল্প ও বাণিজ্যের যে অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে তাহা শীঘ্র বা সহজে পূরণ হইবার নহে। বহু বৎসর ব্যাপী যত্ন ও চেষ্টায়, অসংখ্য বৈজ্ঞানিক এবং বিশেষজ্ঞগণের

উত্তম ও অধ্যবসায়ের ফলে, শত অবসাদ ও বাধা বিঘ্নের পর যে শিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কালস্রোতের একটী মাত্র তরঙ্গাঘাতে সেই শিল্পের আজ একপ্রকার সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। বেলজিয়মের শিল্প-গৌরব সম্বন্ধে পত্রিকান্তরে আলোচনা করা হইয়াছে। যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উত্তর ফ্রান্সের শিল্প-সমূহের কিরূপ অবস্থা ছিল, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

ফরাসীদেশের কারখানায় উৎপন্ন শিল্পজাত তিনটি প্রধান কেন্দ্র অবলম্বন করিয়া উহাদের চতুর্দ্দিকে প্রতিষ্ঠিত। ঐ তিনটি কেন্দ্রের নাম প্যারী (Paris), লায়ন্স (Lyons),ও লিল্ (Lille)। প্যারি ফরাসীদেশের রাজধানী ও রাজ্যের মধ্যভাগে অবস্থিত। লায়ন্স রোন-নদী তটস্থিত সমৃদ্ধিশালী নগর। লিল ফ্রান্সের উত্তরাংশে নর্ড (Nord) প্রদেশান্তর্গত শিল্প ও বাণিজ্যের কেন্দ্র। নর্ড প্রদেশের অধিকাংশ ভাগই বর্ত্তমান সময়ে শত্রুপক্ষের আয়ত্ত। মাত্র উক্ত প্রদেশের শিল্প-সমূহের অবস্থা-সম্বন্ধেই এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হইবে।

ফ্রান্সের উত্তরাংশে পূর্ত্ত, বয়ন, ও রাসায়নিক শিল্প-সংশ্লিষ্ট বহু কারখানা সুচারুরূপে পরিচালিত হইতেছে। বিশ্রুতনামা "লিল" সূত্রের নাম "লিল" নগরের সহিত জড়িত। আর্-মেন্টিয়ারেস্ (Armentieres) ক্ষৌমবস্ত্রের জন্য প্রসিদ্ধ। রুবে (Roubaix) পশম-শিল্পের কেন্দ্র। বয়ন-শিল্পের আনুষঙ্গিক শিল্পসমূহ অর্থাৎ বস্ত্ররঞ্জন, ছাপ দেওয়া, মসৃণ করা প্রভৃতি বিষয়েও উত্তর ফ্রান্স বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ধাতব তৈল (Minerel oils) শোধন, ক্ষার লবণ, গন্ধকাম্ল, কৃত্রিমসার ও রঞ্জন-শিল্পে ব্যবহার্য্য নানাপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুতের জন্য বহু কারখানা রহিয়াছে। উত্তর ফ্রান্সের শিল্প-সমূহকে মোটামুটী তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা—রঞ্জন-শিল্প, বয়ন-শিল্প, ও খাঁটি রাসায়নিক শিল্প। নিম্নে এক একটী করিয়া উহাদের বিবরণ দেওয়া গেল।

রঞ্জন শিল্প :—উত্তর ফ্রান্সের রঞ্জনশালাসমূহের মধ্যে রুবের নিকট অবস্থিত একটি কারখানা (Hannurt Freres) সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম, এবং সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে একটী সুপরিচালিত ও আদর্শ রঞ্জনশালা বলিয়া বিখ্যাত। এইস্থানে সাধারণতঃ পশমজাত পণ্য রং করা হয়। উৎপন্ন দ্রব্যের অধিকাংশ ভাগ রুবের বণিক-সম্প্রদায় ক্রয় করিয়া নেয়, অবশিষ্ট ভাগ প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ভাবে ইংলণ্ডে বিশেষতঃ "ব্রেডফর্ড" ও 'মেনচেষ্টারে' প্রেরিত হয়। এই কারখানায় দৈনিক গড়ে ১৮০০০ খণ্ড বস্ত্র রঞ্জিত হয়। রুবে নগরের দুইটি কারখানা (Vve Gaydel et Fils এবং Motte and Meillasum) অতি প্রসিদ্ধ। প্রথমোক্ত কারখানার মূলধন ২৫০০০০০ ফ্রাঙ্ক* এবং ঐ স্থানে দৈনিক ২০০০০ কিলো-গ্রাম † পরিমাণ ওজনের বস্ত্র রং হয়। পাজামা, ইজের প্রভৃতির জন্য ছিট প্রস্তুত করা ও নিজেদের আবিষ্কৃত বিশেষ প্রণালীতে সূতা রং করা এই কারখানার বিশেষত্ব। শেষোক্ত কারখানায় পশম ও কার্পাস সূত্র বা বস্ত্র পরিষ্কার করা (Bleaching) হইতে আরম্ভ করিয়া রঞ্জন, মসৃণ করা ও মাড় দেওয়া, অর্থাৎ সকল প্রকার কাজই হইয়া থাকে। পশম বস্ত্রাদি হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড় (Hydrogen Peroxide) সাহায্যে শুক্ল বা পরিষ্কার করা হয়। অন্যান্য স্থানে সাধারণতঃ পশম পরিষ্কার করিতে হইলে 'সাল্ফার ডাইঅক্সাইড্' (Sulpherdioxide) ব্যবহৃত হয়। কিন্তু রুবের নগরপালগণ বিধান করিয়াছেন, উক্ত নগরে শিল্পীগণ সালফার ডাইঅক্সাইড্ ব্যবহার করিতে পারিবে না। কারণ, কর্ত্তৃপক্ষের ধারণা যে যথেচ্ছ পরিমাণে এই পদার্থের ব্যবহারে চারিপাশের বায়ু দূষিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষের এইরূপ সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। কারণ, যে পরিমাণ অতিরিক্ত

---

* ফ্রাঙ্ক = ॥৴০। † এক কিলোগ্রাম = ৴২।

সাল্‌ফার ডাইঅকসাইড্ কারখানার বাহিরে চলিয়া যায়, চেষ্টা করিলেই যন্ত্র-সাহায্যে উহা বায়ুর সহিত এইরূপ ভাবে মিশাইয়া দেওয়া যাইতে পারে যে, তাহাতে বায়ু দূষিত হইবার ভয়ের কোনও কারণ থাকিতে পারে না।

রুবেস্থিত আর একটি কারখানার (Emile Roussal) নামও এস্থলে উল্লেখযোগ্য। শীতকালে ব্যবহার্য্য নানাবিধ পোষাক রং করিতেই এই কারখানা সমধিক ব্যাপৃত। ইহাদের কাপড় ছাপ দিবার বন্দোবস্ত অতি সুন্দর। রঞ্জিত পরিচ্ছদ-সমূহের কিয়দংশ ইংলণ্ডে রপ্তানী হয়; অবশিষ্টাংশ ফরাসী দেশেই বিক্রীত হয়। প্রত্যেকটি পৃথক রংএর জন্য এক একজন করিয়া স্বতন্ত্র রঞ্জনকার নিযুক্ত আছে। উহারা কাজ অনুসারে প্রতি সপ্তাহে ৪০ হইতে ৫০ ফ্রাঙ্ক উপার্জ্জন করিয়া থাকে। নির্দ্দিষ্ট বেতনভোগী একজন বিশেষজ্ঞ ও পারদর্শী পরিচালক পূর্ব্বোক্ত রঞ্জনকারদের কার্য্য তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। সাধারণ শ্রমজীবীগণ যোগ্যতা অনুসারে গড়ে প্রতি সপ্তাহে ৪ ফ্রাঙ্ক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। লোক নির্ব্বাচনের জন্য চাকুরিজীবিগণের সমিতির (Trade Union) উপর নির্ভর না করিয়া ব্যবসায়ের কর্ত্তা তাঁহার প্রয়োজনীয় লোক সংগ্রহ করিয়া লন। কারণ, দীর্ঘকালার্জ্জিত অভিজ্ঞতা ফলে দেখা গিয়াছে যে এই সমিতি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত লোকদিগকে সংযত রাখিয়া তাহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এ স্থলে মনে রাখিতে হইবে যে, ইয়ুরূপে বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্যে ব্যাপৃত শ্রমজীবীদিগের নানাপ্রকার সমিতি আছে; কাহারও কোনও লোকের দরকার হইলে উক্ত সমিতি-সমূহের নিকট আবেদন করিলেই তাহারা লোক নির্ব্বাচন করিয়া দেয়। রুবেজেলার রঞ্জন-শিল্প সংশ্লিষ্ট চাকুরিজীবিগণের এরূপ একটি সমিতি (Syndicat des ouvriers Teinturiers et Apprenteurs Roubaix et environs) আছে।

উত্তর ফ্রান্সে কারখানা-সমূহ সাধারণতঃ অতি বৃহদায়তন। এবং এই হিসাবে জার্ম্মেণীর 'বারমেন' "এলবারফিল্ড এর রঞ্জন-কারখানাগুলির তুলনায় সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের। অবশ্য উত্তর ফ্রান্সেও ২।১টি ছোট রঞ্জন-শালা দৃষ্ট হয়। উদাহরণস্বরূপ "ওবায়ন" কর্ত্তৃক পরিচালিত লিল নগরে অবস্থিত রঞ্জনশালাটির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই স্থানে কেবল নীল দ্বারা বস্ত্রাদি রং করা হয়। প্রয়োজনীয় কৃত্রিম নীল জার্ম্মেণি হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে।

বয়ন শিল্প।—রুবে পশম-শিল্পের কেন্দ্র। রুবের পশম ও তৎসংশ্লিষ্ট রঞ্জনশিল্পের অধিকাংশ ভাগই মট (Motte) পরিবারের কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত। পূর্ব্বোক্ত প্রকার কার-খানা-সমূহের মধ্যে কয়েকটি সমধিক প্রসিদ্ধ ("Motte et Meillassoux" "Motte et Delescluses") প্রভৃতি। রুবে নগরে পশমশিল্পিদিগের বহু সভা ও সমিতি আছে। একদিকে শ্রমজীবী অপরদিকে ব্যবসায়ী এই উভয় পক্ষ, এবং ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের সুবিধা ও অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখাই ঐ সমস্ত সভা-সমিতির কার্য্য। উহাদের মধ্যে রুবে পশমের এক্সচেঞ্জ ("Roubaix Wool Exchange")ও সর্ত্তনির্দ্ধারণ মন্দির, ("Conditioning House") অত্যন্ত ক্ষমতাপন্ন। শেষোক্ত স্থানে ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের মধ্যে সর্ত্ত প্রভৃতি নির্দ্ধারিত হইয়া কোন প্রকার পশমের জন্য ক্রেতাকে কি পরিমাণ মূল্য দিতে হইবে তাহা স্থিরীকৃত হয়। কোন পক্ষ সর্ত্ত ভঙ্গ করিলে তজ্জন্য দণ্ডিত হইয়া থাকে। মোট কথা এই প্রতিষ্ঠানটি থাকাতে কোন পক্ষেরই অন্যায় রূপে লাভবান হইবার আশা বা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার আশঙ্কা নাই। উত্তর ফ্রান্সে পশম, কার্পাস, ও রেশম-শিল্প সম্পূর্ণরূপে রুবের সর্ত্ত-নির্দ্ধারণ-মন্দিরের আয়ত্ত। উক্ত সভা আবার ফরাসী বাণিজ্য-সচিবের অধীন। প্রসার্য্যশক্তি (Textile strength), স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity) ও আর্দ্রতা অর্থাৎ সংলগ্ন জলের পরিমাণ অনুসারে তন্তুসমূহকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া উহাদের মূল্য নির্দ্ধারিত করা হয়।

রাসায়নিক শিল্প :—উত্তরফ্রান্সে রাসায়নিক দ্রব্য-সমূহের প্রস্তুত কার্য্যে ব্যাপৃত কারবারের সংখ্যাও অল্প নহে। ইহাদের

মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম কারবারের (Society Anonyme des Etablissements Kuhlman) কর্ত্তৃত্বাধীনে লিলের চতুঃপার্শ্বস্থ বহু রাসায়নিক কারখানা পরিচালিত হইতেছে। ঐ সমস্ত কারখানায় ধাতব অম্ল, কৃত্রিম সার, দ্রাক্ষা উৎপাদন-কারীদের জন্য বিবিধ তাম্রজ লবণ এবং অন্যান্য বহুবিধ রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। সরবরাহ করার অসুবিধা প্রভৃতি কারণে উত্তর ফ্রান্সে উৎপন্ন পূর্ব্বোল্লিখিত ধাতব অম্লাদি ইংলণ্ডে রপ্তানী করা হয় না। বিশেষতঃ নর্ড প্রদেশে যে সকল রঞ্জন-শালা ও বস্ত্র ধৌত ও শুষ্ক করার কারখানা আছে, তাহাতেই প্রচুর পরিমাণে ধাতব অম্ল ব্যবহৃত হয়, এবং প্রকৃত পক্ষে বিদেশে প্রেরণ করিবার উপযুক্ত কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। লিলের সন্নিকটে একেন ও লিরয়ের (Eycken & Leroy) রাসায়নিক কারখানাটিও অতি বৃহৎ। সাধারণতঃ রঞ্জন-শিল্পে যে সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্যের দরকার তাহাই মাত্র এই স্থানে প্রস্তুত হয়। এই কারখানায় দৈনিক গড়ে ২০,০০০ কিলো-গ্রেম (Kilogram) পরিমাণ গন্ধকাম্ল ও ১২০০০ কিলোগ্রেম পরিমাণ সোডিয়াম্ সালফেট্ (Sodium Sulphate) উৎপন্ন হইয়া থাকে। ফরাসি দেশের আদর্শ রাসায়নিক কারখানা-সমূহে কি পরিমাণ দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, পূর্ব্বোক্ত উদাহরণটি হইতে তাহার অনেকটা ধারণা করা যায়। উৎপাদিত গন্ধকাম্ল ফিটকারী প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য কারখানাতেই ব্যবহৃত হয়। এই কারখানায় তাড়িৎ-প্রবাহ সাহায্যে সোডিয়াম হাইপো-ক্লোরাইট এবং কষ্টিক পটাশ (Sodium Hypo-chlorite এবং Caustic potash) প্রস্তুতের জন্য একটি ভিন্ন বিভাগ আছে। প্রত্যেক বিভাগই মৌলিক গবেষণায় নিযুক্ত একজন পারদর্শী রাসায়নিকের কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইতেছে।

উত্তর ফ্রান্সের শিল্প-সমূহের আলোচনা প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে ফ্রান্সে অবাধ-বাণিজ্য-বিরোধী শুল্ক (Protective Tariff) থাকায় বহু শিল্প বৈদেশিক প্রতিযোগিতা-সত্বেও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিয়াছে। উদাহরণ-স্থলে খনিজ তৈল সম্পর্কীয় শিল্পের নাম করা যাইতে পারে। ফরাসি দেশের আইন অনুসারে বিদেশ হইতে যে খনিজ তৈল রপ্তানী হয়, তন্মধ্যে অপরিশোধিত তৈলের উপর নামমাত্র শুল্ক নির্দ্ধারিত আছে, পক্ষান্তরে বিদেশাগত পরিশোধিত তৈলের উপর অতি উচ্চ শুল্ক দিতে হয়। এইরূপ বিধানের ফলে ফ্রান্সে প্রচুর পরিমাণে অপরিশোধিত খনিজ তৈল আমেরিকা, রুশিয়া, ও রুমেনিয়া হইতে আমদানী হইলেও পরিশোধিত তৈল বিদেশ হইতে মোটেই সংগৃহীত হয় না। বিগত কয়েক বৎসর মধ্যে উত্তর ফ্রান্সে খনিজ তৈল পরিশোধিত করিবার জন্য বহু কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অপরিশোধিত অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় প্রাপ্ত খনিজ তৈল-সমূহকে উপযুক্তরূপে শোধিত করিয়া বিশেষ বিশেষ কার্য্যের জন্য ব্যবহারোপযোগী করাই এ সকল কারখানার কাজ। বিদেশাগত পরিশোধিত খনিজ তৈলের উপর উচ্চ শুল্ক থাকিলেও যে তৈল দেশে শোধিত হইয়াছে তাহার জন্য কোনও শুল্ক দিতে হয় না। এমতাবস্থায় বিদেশ-জাত শোধিত খনিজ তৈল যে, মূল্যানিবন্ধন প্রতিযোগিতায় ফরাসি দেশে মোটেই স্থান পাইবে না তাহা সহজেই অনুমেয়। এইরূপ অবাধ-বাণিজ্য-বিরোধী ও দেশীয় বাণিজ্যসংরক্ষক শুল্ক হেতু উত্তর ফ্রান্সে খনিজ তৈল পরিশোধন একটি বিশেষ লাভজনক ও উন্নত শিল্পরূপে পরিগণিত হইয়াছে। তৈল-পরিশোধন-কার্য্যে ব্যাপৃত কারখানাসমূহের মধ্যে রুরের সন্নিকটে অবস্থিত এর একটির নাম (Raffinerie de Petrol du Nord) সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। অপরি-শোধিত তৈলকে পরিশ্রুত করিয়া ফুটন তাপ (Boiling point) অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত করাই ইহাদের প্রধান কাজ। কোনও অংশ মটরগাড়ী ও অন্যান্য নানা প্রকার যন্ত্র-পরিচালনের জন্য ব্যবহৃত হয়; কোনও অংশ হইতে সাধারণ প্রদীপে জ্বালিবার উপযোগী তৈল বা মোম প্রস্তুত হয়; কোনও অংশ হইতে ভেসেলীন (Vaseline) প্রভৃতি, চর্ব্বি জাতীয় দ্রব্য উৎপন্ন হয় এবং নানা কল্পিত শ্রুতিমধুর নামে (Motrieine, Electrienne প্রভৃতি) বিক্রীত হইয়া থাকে। উত্তর ফ্রান্সে খনিজ

তৈল ব্যবসায়ীদের একটি সভা আছে। ফ্রান্সে পরিশোধিত বা উৎপন্ন খনিজ তৈলের মূল্য নির্দ্ধারণ করা, যাহাতে বৈদেশিক প্রতিযোগিতা নিবন্ধন দেশীয় শিল্পের কোনও অনিষ্ট না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা এবং প্রয়োজন বোধ করিলে গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে বিদেশজাত পরিশ্রুত খনিজ তৈলের উপর শুল্কের পরিমাণ বৃদ্ধি করা, উক্ত সভার প্রধান কার্য্য।

পশমের স্বাভাবিক অবস্থায় উহার সহিত পটাসিয়ম ধাতু-ঘটিত একপ্রকার লবণ সংলগ্ন থাকে। উহা জলে সম্পূর্ণ ভাবে দ্রবণশীল এবং উহাহইতে সহজেই অন্যান্য নানাপ্রকার পটাস-লবণ এবং চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত লেনোলীন (Lanoline) নামক এক প্রকার চর্ব্বিজাতীয় পদার্থ প্রস্তুত করা যায়, উত্তর ফ্রান্সে স্বাভাবিক পশম ধৌত জল হইতে কষ্টিক পটাশ, পটাশিয়াম ক্লোরাইড প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য ("Society Anonyme de Croix ইত্যাদি) কতিপয় সুচারুরূপে পরিচালিত কারখানা রহিয়াছে। পটাস লবণসমূহ জমির সার রূপে এবং কাচ, সাবান ও অন্যান্য বহুবিধ দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অবশ্য কতক পরিমাণে পটাস লবণ ইংলণ্ডেও রপ্তানী হয়। এতদ্ব্যতীত উত্তর ফ্রান্সে বীট মূল হইতে পটাস লবণ প্রস্তুতেরও কএকটি কারখানা আছে।

উত্তর ফ্রান্সের শিল্প-সমূহের এই উজ্জ্বল ছবি যুদ্ধের পূর্ব্বের ছবি। বর্ত্তমান সময়ে ফ্রান্সের উত্তরাংশের শিল্প-সমূহ একপ্রকার সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়াছে।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সরকার।

বসন্তের অশ্রু

মধু মাধবীর মদির পরশে
টুটিল আজিকে আকুল হরষে
বিশ্বের ঘুম-ঘোর ;—
ওগো সুন্দর ! অন্তর-ধন !
আহ্বান তব পশিবে কখন
সুপ্ত হৃদয়ে মোর ?

কোকিল-কণ্ঠে মিলাইয়া তান
গাহিছে ধরণী তব জয়-গান
ললিত মধুর সুরে ;—
কেন গো জাগে না নিশিদিন আর
চির-সুধামাখা লহরী তাহার
মোর এ মানস-পুরে ?

তরু-লতা ধরে নব কিশলয়,
খেলিয়া বেড়ায় মৃদুল মলয়,
হাসে চারু ফুল-কলি ;—
পুরাণ কথায় পুরাণ ব্যথায়
আমি কেন শুধু ডুবে আছি হায়,
মরমে মরমে জ্বলি ?

গগন-ভবন পুলকে উলসি,
রচে মায়া-জাল জ্যোছনারূপসী,
মুগ্ধ ভুবন ভাসে ,—
আমি কেন রোধি' সকল দুয়ার,
একা বসে রই লয়ে হাহাকার
শূন্য আঁধার বাসে ?

জগতের এত হরষ মাঝার
এ জীবন হায়, দেবতা আমার!
নহে কি তোমার দান?—
এ কি শিশিরের জড়তা গভীর!
এ কি বাদলের নয়নের নীর!
মাধবীর অপমান!

হে নাথ! না বুঝি কহিব কেমনে
সকল হাসির ভিতরে গোপনে
অশ্রু লুকায়ে রয়;—
মাধবীর এই হাসি মাঝে স্বামী!
সেই আঁখি-বারি আজি কিগো আমি
অপার পিপাসাময়?

তাই এ বিষাদ, তাই এ বেদনা,
নিখিল মেলায় আমি একজনা
কেবলি একেলা তাই;—
অশ্রু তোমার পূজা-উপায়ন;
গড়েছে মাধবী তাই এ জীবন;
কিছু না ভাবিয়া পাই!

দয়াল ঠাকুর! তোমারি দয়ার
দাও পরিচয় তবে এইবার,
প্রসন্ন মোরে হও;—
মাধবীর পূজা সফল করিয়া
জীবন যৌবন গৌরবে ভরিয়া
অশ্রু তাহার লও!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

গ্রন্থ-পরিচয়

ব্যথা—শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরি প্রণীত দ্বাদশটি ছোট গল্পের সমষ্টি, মূল্য ॥০ আনা। শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় ভূমিকা স্বরূপ দুটি কথা লিখিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন যে মানুষের ব্যথার কথাই এই কয়েকটি গল্পে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাই পুস্তকের নাম 'ব্যথা'।

আজ কাল এই শ্রেণীর যে সকল পুস্তক বাহির হয়, তন্মধ্যে এই বইখানির একটু বিশেষত্ব আছে। পাঠান্তে আমাদের মনে বাস্তবিকই একটী ব্যথার দাগ লাগিয়া থাকে। গল্পগুলির মাঝে মাঝে অবান্তর, অনাবশ্যক কথা এবং হাস্যরস অবতারণার চেষ্টা আসিয়া রসবোধে ব্যাঘাত জন্মাইয়া না দেয়, এমন নহে। 'আমার সময় অতি অল্প' বলিয়া অজুহাত না দিয়া, গ্রন্থকারের নিজেরই এ সমস্ত সতর্ক দৃষ্টিতে দেখিয়া কাটছাট করিয়া দেওয়া উচিত ছিল। এরূপ কারণ দেখান কোন গ্রন্থকারের পক্ষেই শিষ্টতার পরিচায়ক নহে, নবীন গ্রন্থকারের পক্ষে এরূপ অহমিকা বিশেষতঃ দোষাবহ। কিন্তু তথাপি মোটের উপর এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে আমরা বিরক্তি বোধ করি নাই। 'স্মৃতি', 'ব্যর্থ', 'দোলের দিনে' প্রভৃতি কয়েকটি গল্পে যথার্থ করুণ রস বিদ্যমান রহিয়াছে।

এপারে সেপারে মানুষ রাধে গ বৈসা রঙ্গ চায়,
কানাইয়ায় রাধিকায় যেমন বাইছালী খেলায়।
(গ চিকণ গোয়ালিনী)।

সকল সখী পার করতে লব আনা আনা
রাধিকার পার করিতে লইমু কানের সোনা।
(গ চিকণ গোয়ালিনী)।(৬)

৭

অরে নাইয়া সকালে রাধারে কর পার।

হৈলে মোরে পার কর, না হৈলে মোরে প্রাণে মার।
(হেদে রে রসিক নাইয়া),
নৈলে মোরে দেও পদছায়া। (রে চিকণ নাইয়া)।

পার কর এই নদী, নষ্ট হৈল মোর ভাণ্ডের দধি।
(হেদে রে রসিক নাইয়া),
নষ্ট হৈলে দিবা দধির কড়ি। (রে চিকণ নাইয়া)।

যে মোরে করিব পার, তারে দিমু গলার হার।
(হেদে রে রসিক নাইয়া),
এ রূপ যৌবন দিমু দান। (রে চিকণ নাইয়া)।

যে মোরে করিব দয়া, সে গেল বৈরাগী হৈয়া।
(হেদে রে রসিক নাইয়া),
আমি রইলাম পন্থ পানে চাইয়া। (রে চিকণ নাইয়া)।

সব সখী হৈল পার, আমি রইলাম গাঙের পার,
(হেদে রে রসিক নাইয়া),
আমি রাধা কত অপরাধী। (রে চিকণ নাইয়া)।

হরিণী পলাইয়া যাইতে, ঠেকে যেমন ব্যাধের হাতে,
(হেদে রে রসিক নাইয়া),
আমি নারীর হৈল সেই দশা। ('রে চিকণ নাইয়া)। (৭)

৮

গাভী দোয়াইয়া মোরে দে রে সুন্দর ভাগিনা,
গাভী দোহাইয়া মোরে দে।

আমি যে দোহামু গাভী, মামায় গেছে কৈ ;
তোর মামায় গেছে রে ভাগিনা মথুরায় বেচ্‌তে দৈ।
গাই করে ওম্বা ভেম্বা, বাছুরে করে রব,
শরীরে না সহে রে দুখ বাছুরের কান্দন।

সোনালী কাড়িয়া হাতে নিয়া, রাধে গোয়ালঘরে যায়,
নেতের অঞ্চল ধরিয়া ভাগিনা সমজায়।

(৬) পসার = দোকান। দোকানপসার একত্রও প্রয়োগ হয়।
চাই = দেখি' প্রশ্নবোধক রূপেও ব্যবহৃত হয়।
চৌকী = পাহাড়া। চিকণ = সুশ্রী, চক্‌চকে।
কাজল = কজ্জল। পিন্ধ = পরিধান কর। দরুশন = দর্শন।
গাঙ্ = নদী। সিনান = স্নান। যাস্ = গমন করিস্।
ভাড়াইয়া = ফাকি দিয়া। আঙ্গুটি = অঙ্গুরী।
তার = অলঙ্কারবিশেষ। পুন্‌পুন্ = কবরীভূষণবিশেষ।
নয়ালী = নূতন।
ঘাট মাইরা = খেওয়ার পয়সা না দিয়া অন্য নৌকা প্রভৃতি দ্বারা পার হইয়া যাওয়া। গুমান্ = গৌরব।
গাইরা = স্বগ্রামবাসী। মুরুব্বি = প্রধান ব্যক্তি। আবাল = বালক।
বৈরী = শত্রু। বাইছালী = নৌকা বাইছ।

(৭) চিকণ = সুশ্রী, চক্‌চকে।
দিমু = দিব। পন্থ = পথ। নাইয়া = নাবিক।
ওম্বাভেম্বা = হাম্বা হাম্বা। দুখ = দুঃখ।
কাড়িয়া = দোনা, দোহনপাত্র। সোনালী = সোনার মত বর্ণের।

উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম চৌদিকে পরিল বাধা,
মাটিয়ার কলসী কাক্কে উঠাইয়া যমুনায় চলেছে রাধা।

আগর বাটায় চুয়া চন্দন, রূপার বাটায় তেল,
হেলিয়া ছুলিয়া সুন্দর রাধে যমুনাতে গেল।

সিনান কর সুন্দরী রাধে সিনানে তোর মন,
আয়রে থাইকা ভাগিনা কানাই দেখ্‌ল * * *। (৮)

৯

বিনোদিনী গ রাই, রসবতী গ রাই,
হিয়া মোর ঝুর্‌ ঝুর্‌, প্রাণ তোর ঠাই।

খাট খোট বিনোদিনী, দীঘল মাথার কেশ,
এমন সন্ধ্যাবেলা জলেরে যাইতে ধৈরাছ নানান্‌ বেশ।

কার ঘরের বিনোদিনী, কে করেছে বিয়া,
এমন সন্ধ্যাবেলা জলেরে পাঠাইছে কলসী কাক্কে দিয়া।

খাট খোট বিনোদিনী, গলায় রসের কাঠি,
এমন সুন্দর কাক্কে দেখি মাটিয়া কলসী।

হেথা আইস বিনোদিনী মরমকথা কৈ,
লোকে যদি মন্দ না বলে কলসী আন লৈ। (৯)

১০

মধুরি মধুরি হাসি, অ গ শ্রীমতী রাধে বাজাও বাঁশী।

অরে বাঁশী না হয় রাধার গলার ফাঁসি রে,
আজ রাধার পীরিতির বিষম রে হায়।
(ভরসার বন্ধু রে শ্যাম)।

যে বা রাধার বন্ধু হয়, আগ বাড়াইয়া রাধার কলসী লয়,
না লইলে রাধার বধ লাগে রে।
(ভরসার বন্ধু রে শ্যাম)।

রাধে অতি ভাগ্যবতী, কৃষ্ণ হেন জনে যার পতি
তার পতি না হয় রাধার প্রাণের সারথি রে।
(ভরসার বন্ধু রে শ্যাম)।

রাধায় জানে কানু, কানু জানে রাই, যে দুঃখ রাধার মনে;
কাল বাঁশী বন্ধুর হাতে, কাল রৌদ্র লাগ্‌ল অঙ্গে।
(ভরসার বন্ধু রে শ্যাম)।

তোমার লাগিয়া সখী বৃন্দাবন বানাইলাম,
প্রেম করিয়া ছাইড়া গেলে ঐ যে প্রেমের জ্বালায় জ্বৈলা মরব গ
(ভরসার বন্ধু রে শ্যাম)। (১০

১১

চিকণ গোয়ালিনী, গ রসের গোয়ালিনী,
এই রূপ যৌবন তোমার জোয়ারের পানি।
গোপাল রে সের বেচ আনা আনা, পোয়া বেচ পণ,
তোমারে যে দান করিব এই লাখের যৌবন।
গোপাল রে কিনা মচ্ছ মার রে গোপাল, গলায় চন্দ্রহার,
মচ্ছত না মারি গ কন্যা তোমার পানে চাই।

---

(৮) নেতের = বস্ত্রবিশেষের। সমজায় = প্রবোধ দেয়।
কাক্কে = কক্ষে। আগর = বোধ করি অগুরু হইবে।
সিনান = স্নান। আয়রে = অন্তরালে। কৈ = কোথা।

(৯) হিয়া = হৃদয়। ঝুর্‌ ঝুর্‌ = ছিন্নবিচ্ছিন্ন, ভগ্ন।
খাট খোট = বেঁটে। দীঘল = দীর্ঘ।
রসের কাঠি = মালাবিশেষ, রসিকতার নিদর্শনস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কৈ = বলি, কহি।

(১০) এই গানটীর আগাগোড়ার সমতা রক্ষা পায় নাই।
আগ বাড়াইয়া = অগ্রসর হইয়া। হেন = মত, তুল্য।

'মথনের পুত্র কাহ্নুরদেব এবং মথনের মহাপ্রতীহার শিবরাজদেব। কিন্তু একটি মাত্র অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। য় অর্থই গ্রহণ করিয়া সুবর্ণদেবকে মথনের পুত্র এবং অন্যত্র (২৬৮ পৃঃ) নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার উপর

বিদ্রোহী সেনা পরাজিত হইলে হরি ক পুনরায় তাহাদিগকে একত্রিত করিয়া াবাবুর মতে এই হরি যুদ্ধান্তে ধৃত হইয়া (২৬৩ পৃঃ)। যে শ্লোকার্দ্ধের প্রতি লক্ষ ইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এই— ানং জেতা স [স্বং] পরাক্রমেণ হরেঃ ॥' যুক্ত হরিশব্দ কথনই 'নিন্যে' ক্রিয়ার র না। প্রথমা বিভক্তিযুক্ত 'জেতা'ই সুতরাং যে 'মৃত্যুস্থানে অথবা শমনসদনে হরি নহে হরির জেতা। অর্থাৎ হরিকে ছিল যুদ্ধস্থলে তাঁহারই মৃত্যুর কথা কবি হরির মৃত্যুর কথা নহে।

খিয়াছেন "বিদ্রোহ-দমনান্তে রামপালদেব মধ্যে রামাবতী নাম্নী একটি নূতন নগরী লন। শ্রীহেতুর চণ্ডেশ্বর ও ক্ষেমেশ্বর এই নূতন স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন" (২৬৪ পৃঃ) াতটি সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। যে শ্লোকটির উপর ালবাবু এই মত প্রচার করিয়াছেন তাহা এই ং (শ) দেবেন শ্রীহেত্বীশ্বরেণ দেবেন। ানেন কিল ক্ষেমেশ্বরেণ চ সনাথৈঃ ॥ (৩।২) শ্লোকের শ্রীহেত্বীশ্বর, চণ্ডেশ্বর, প্রভৃতিকে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু অক্ষয় বাবু নিঃ-

সংশয়ে প্রমাণিত করিয়াছেন যে, এগুলি ব্রহ্মাদি দেবতার নাম মাত্র।

রাখালবাবুর মতে "রামপাল রামাবতী নগরে জগদ্দল মহাবিহার নামে একটি বিহার নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন"। এইরূপ মনে করিবার কোনই কারণ নাই। জগদ্দল মহাবিহার রামপালের পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল, এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ আছে।

শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুকরণে রাখালবাবু 'মায়ন'-নামে এক রাজার সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এবং তাঁহার কামরূপ বিজয়-যাত্রা পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়াছেন। রামচরিতের তৃতীয় পরিচ্ছেদের ৪৭শ শ্লোকে 'মহিমানমায়ন' পদ আছে। রাখালবাবু শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুকরণে 'মহিমান+মায়ন' এইরূপ পদচ্ছেদ করিয়াছেন ; কিন্তু সংস্কৃতে 'মহিমান' বলিয়া কোন কথা নাই। 'মহিমন' শব্দ দ্বিতীয়ার একবচনে মহিমানম্ হয়, কিন্তু কোন বিভক্তিতেই মহিমান পদ পাওয়া যায় না। একটু অনুধাবনা করিলেই দেখা যায় যে ঐ 'মহিমানম্' এবং ক্রিয়াপদ 'আয়ন্' এই উভয়ের সন্ধি দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু এই ক্রিয়াপদ 'আয়ন' 'মায়ন' নৃপে পরিণত হইয়া "বাঙ্গালার ইতিহাসে" স্থানলাভ করিয়াছে, এবং কামরূপ পর্য্যন্ত ইঁহার জয়পতাকা উড্ডীন হইয়াছে।

রাখালবাবুর মতে মদনপাল, গাহড়বাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রদেবের নিকটে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছিলেন। প্রমাণ স্বরূপ তিনি রামচরিতের চতুর্থ পরিচ্ছেদের বিংশ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু এই শ্লোকোক্ত 'চন্দ্রেণ' যে গাহড়বালরাজ চন্দ্রদেব নহে, অক্ষয়বাবু তাহা বিশেষ দক্ষতার সহিত প্রতিপন্ন করিয়াছেন। (আর রাখাল বাবুর এই অনুমান যে তাঁহার অন্যান্য অনুমানের বিরোধী তাহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি।)

াক্তে যে সকল মত ব্যক্ত হইয়াছে তাহা আমার মহাশয়ের নহে।